বিক্রমপুর

প্রথম খণ্ড

(প্রাচীনকাল হইতে ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত)

শ্রীহিমাংশুমোহন চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত

বিক্রমপুর-প্রতিভা কার্য্যালয় হইতে
শ্রীদয়াময় চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।

১৮৫৪ শকাব্দঃ

মূল্য পাঁচ টাকা।



প্রিন্টার
শ্রীহেমচন্দ্র সরকার
রিনাথ মেসিন প্রেস, ঢাকা

ভূমিকা

"সার্থক জনম আমার জন্মেছি এ দেশে।
সার্থক জনম মাগো, তোমায় ভালোবেসে॥"

কর্ম্মক্লান্ত জীবনের ক্ষণিক অবকাশ বিনোদনের জন্য জন্মভূমি বিক্রমপুরজননীর স্নিগ্ধ অঞ্চলচ্ছায়ায় আশ্রয় লইয়াছিলাম, এমন সময় স্নেহভাজন শ্রীমান্ হিমাংশু তাঁহার "বিক্রমপুর" গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিবার প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইলেন। বড় আনন্দের সহিত তাঁহার এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলাম। মাটীর তত্ত্ব ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া বিদেশে জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছি; শ্রীমানের পুস্তকের ভূমিকা লিখিবার সুযোগে আমার জন্মমাটীর সম্বন্ধে দুটি খাঁটী কথা বলিয়া মাতৃপূজা করিয়া ধন্য হইব, এ কামনা আমার প্রাণে অপরিসীম আনন্দ প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু বিধাতা আমার সে কামনা পূর্ণ করিতে দিলেন না। বার্দ্ধক্যজনিত জরাজীর্ণ দেহমন অকস্মাৎ ব্যাধির আক্রমণে এরূপ শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে যে নানা উপচার সংগ্রহ করিয়া পিতৃযজ্ঞে আহুতি দিবার আমার সামর্থ্য নাই। আয়ুঃসূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ! আমি জীর্ণকরপুট কোনও রূপে ললাটে স্পর্শ করাইয়া পিতৃগণের চরণে গভীরতম শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করিতেছি :—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ॥

আর সঙ্গে সঙ্গে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে আন্তরিক নিবেদন জানাইতেছি, শ্রীমান্ হিমাংশুর আরব্ধ এই বিরাট পিতৃযজ্ঞ সাফল্যমণ্ডিত হউক!

জন্মভূমির ইতিহাস সঙ্কলন—পিতৃযজ্ঞ। পূর্ব্বপুরুষগণের গুণকীর্ত্তন, পিতৃগণের চরণে শ্রদ্ধা নিবেদন, পিতৃযজ্ঞ—গৃহিগণের আচরণীয় পঞ্চ মহাযজ্ঞের অন্যতম মহাযজ্ঞ! শ্রীমান্ হিমাংশু এই মহাযজ্ঞে ব্রতী হইয়া আদর্শ গৃহস্থের নিত্যকর্ম্ম সম্পাদনে উদ্যত হইয়াছেন; তাঁহার এই সাধু-উদ্যম সফল হউক! আমার বিক্রমপুরবাসি-ভ্রাতৃগণ শ্রীমানের এই সাধু কার্য্যে যথাশক্তি উপদেশ এবং উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করুন!—পরপারযাত্রী বৃদ্ধের তাঁহাদের নিকট এই শেষ সনির্ব্বন্ধ নিবেদন।

যুগযুগান্তের অবদান-খ্যাতি-মণ্ডিত জ্ঞান-বিজ্ঞান-সভ্যতার লীলাস্থল বিক্রমপুর আজ ধ্বংসোন্মুখ!—কীর্ত্তিনাশা, মেঘনাদ ও ধলেশ্বরী প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাতে আমাদের চিরগৌরবিনী জননীর একে একে সমস্ত কীর্ত্তিচিহ্ন লুপ্ত করিয়া বিকট বদন ব্যাদানে সর্ব্বস্ব গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। জননীর কৃতী সন্তানগণ পরবাসী। আমাদেরই মায়ের ছেলে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, আমাদেরই অপর ভাই বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ ধনিক। এত মস্তিষ্কশক্তি ধনবল থাকিতেও পিতৃপিতামহের চরণধূলিপূত বাস্তুভিটার মাটীটুকু রক্ষা করিবার উপায় অদ্যাপি উদ্ভাবিত হইল না, বড়ই পরিতাপের বিষয়।

যদি ভিটামাটী রক্ষার ক্ষমতা না হয়, তবে আসুন আমরা সার্দ্ধ নয় লক্ষ ভ্রাতা ও ভগিনী সকলে সমবেত কণ্ঠে মায়ের গান গাই—বিক্রমপুরের ঐতিহ্যকীর্ত্তিগাথা—সঙ্কলনে সাহায্য করিয়া পিতৃগণের শ্রাদ্ধকার্য্য নির্ব্বাহ করি—অন্তরের গভীরতম শ্রদ্ধা নিবেদন এই তো শ্রেষ্ঠ শ্রাদ্ধ! মহাকালের ধ্বংস-লীলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অক্ষম—আমরা আর কি করিতে পারি? আসুন পিতৃ-পিতামহের গুণ কীর্ত্তন করিয়া জননীর অতীত গৌরবগাথা গাহিয়া লক্ষ কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া গভীরতম ভক্তিভরে বলি,— **ত্বমেক কৃপাহি কেবলম্।** ইতি—

৩রা শ্রাবণ ১৩৩৮ সন
৯৫।১ গড়পার রোড, কলিকাতা।

শ্রীপার্ব্বতীনাথ দত্ত।

স্বস্তি বাচন।*

ভুলেছ সবে কি এইত সে দেশ আদিশূর যার রাখিল মান,
পুণ্যতটের দ্বিজের তনয় ধর্ম্ম যাহারে করিল দান ;
দেখ একবার এই সে তোমার হৃত গরিমার চিতার শেষ-
বিক্রম যার বঙ্গে অপার কীর্ত্তি যাহার ছিল অশেষ !

চক্র ধরিয়া ভিক্ষু যথায়, মুক্তি-মন্ত্র করিল দান,
সুগত-নিরত, ভারত-বিদিত, পুত্র যাহার যতি শ্রীজ্ঞান ;
সাগর-মুকুরে বদন হেরিত, যেই সমতট এই সে দেশ—
তড়াগে, দেউলে, সৌধে, শিবিরে, ধারণ করিয়া মোহন বেশ ;
দেখ একবার এই সে তোমার হৃত গরিমার চিতার শেষ-
গৌরব যার বঙ্গে অপার, কীর্ত্তি যাহার ছিল অশেষ !

কৃপাণ যাহার শক্তি ঘোষিল, কামান যাহার গাহিল জয়,
লীলায় নাচিল সমর-তরণী, মেঘনার বুকে অকুতোভয়।
'হর হর বলি' 'বম্ বম্ বম্' ধাইল যাহার তনয় বীর—
বিজয়-শোভিত, পাল-পূজিত, কেদার-সেবিত পুণ্যতীর ;
দেখ একবার এই সে তোমার হৃত গরিমার চিতার শেষ-
বিক্রম যার বঙ্গে অপার কীর্ত্তি যাহার ছিল অশেষ !

বিদ্যার ভাতি কুন্দ ধবল, ফুটিল যেথায় বঙ্গে আর,
মাল্য পরা'লো কণ্ঠে যাহার, বয়ন-শিল্প কলা কুমার—
এই সে ধরণী, বল্লাল-জননী, বিজয়-বাহিনী বিপুল যার,
ধনের মানের যশের স্মৃতিটী বহিছে আজিও শ্রীপুর তার ;
দেখ একবার, দেখ একবার হৃত গরিমার চিতার শেষ—
বিক্রম যার বঙ্গে অপার, কীর্ত্তি যাহার ছিল অশেষ !

সম্পদ যার বক্ষে ধরিয়া গরবে পদ্মা বহিছে সে,
সিংহ দুয়ারে রক্ষী বসা'য়ে ভীম-দরশন মেঘনাদে ;
দেখ একবার এই সে তোমার হৃত গরিমার চিতার শেষ—
দেবী তোমার, সাধনা তোমার, স্বর্গ তোমার, তোমার দেশ।

* শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য—

গ্রন্থকারের নিবেদন।

"শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে আমাদের বংশের জননী প্রপিতামহী দেবী তরুণ যৌবনে বৈধব্য প্রাপ্ত হইয়া একমাত্র শিশু পুত্র সন্তানসহ ভ্রাতৃগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুত্রের লালন পালন ও সুশিক্ষার ভার লইয়া প্রপিতামহী দেবী যখন নানা প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষতা, তখন একদিন তদীয় শিশুপুত্র শিক্ষকের তাড়নায় অন্তঃপুরে আসিয়া স্নেহময়ী মাতার অঞ্চল প্রান্তে আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছিল। যিনি একমাত্র পুত্রের উন্নতিকল্পে সমুদয় শক্তি প্রতিদিন তিল তিল করিয়া ক্ষয় করিতেছিলেন, সেই স্নেহময়ী জননী মুহূর্ত্তে তেজস্বিনীর মত অম্লান বদনে প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রের হস্তপদ বন্ধন করতঃ তাহাকে শিক্ষকের হস্তে অর্পণ করেন। ভাবিয়া দেখিলে আমার মাতৃভূমি বিক্রমপুর আমার তেজস্বিনী বংশজননীর মত সন্তানদিগকে বিক্রম ও পৌরুষে উদ্দীপ্ত হইতে তাড়া দিয়া তাহাদের প্রতি আপনার গভীর বাৎসল্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি তাহার পুত্রগণকে স্বীয় অঙ্কে আবদ্ধ রাখিয়া আলস্যে কালহরণ করিতে দেন নাই; পরন্তু জগতের অগ্নিময় কর্ম্মশালায় তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিয়াছেন "সংসারের কঠোর সংগ্রামে যখন যশ, বিক্রম ও পৌরুষ সংগ্রহ করিতে পারিবে তখনই আমার ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিতে পারিবে।" মাতার আদেশ পালন করিবার জন্য বহু শতাব্দী পূর্ব্বে বৌদ্ধাচার্য্য অতীশ শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর হিমালয় পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া তিব্বত গমন করিয়াছিলেন। প্রাচীন যুগ হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত বহু বিক্রমপুরবাসী জগতের বিভিন্ন প্রদেশে গমন করিয়া কর্ম্ম, যশ ও অর্থ আহরণ করিয়াছেন। বিক্রমপুর বিক্রমশালী সন্তানের জন্মভূমি, মনুষ্যত্বহীন দুর্ব্বলের নহে।"

বিগত ১৩২২ সনের ১১ই পৌষ মুন্সীগঞ্জ সম্মিলনীতে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের অভিভাষণে যেদিন এই কথাগুলি আমার কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিল, সেইদিন অবধি আমার প্রাণে মাতৃভূমির একখানা ইতিহাস রচনা করিবার দুরাশা জাগরিত হয়। আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তির পক্ষে মাতৃভূমির একখানা ইতিহাস রচনা দুরাশা ও ধৃষ্টতা বই কি? তবে অস্ত্রদ্বারা সমুৎকীর্ণ হইলে কঠিন মণির ভিতর দিয়া সুকোমল সূত্রও যেমন প্রবেশ করিতে পারে তেমন সুধীজন বিমর্দ্দিত বিক্রমপুরের পথে আমার ন্যায় ব্যক্তিও অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারিবে এই ভরসায় বিক্রমপুরের ইতিহাস লেখার এই প্রচেষ্টা। বহু ভাষাবিদ্ পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ বিক্রমপুরের ইতিহাসের ভূমিকায় একস্থলে লিখিয়াছেন :—"একটা আক্ষেপবাণী আমাদের ইতিহাস নাই—এই কথাটা দেশে এতটা প্রচলিত হইয়া গিয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে আমরা এতদূর অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি যে আজকালকার এই শিক্ষা সুলভ দিনে এই উচ্চতর শিক্ষার প্রভাবের দিনে ঐ আক্ষেপের পশ্চাতে যে একটা তীব্র লজ্জা লুকায়িত আছে তাহা আমরা বুঝিতে পারিলেও অনুভব করি না বা সে লজ্জা নিবারণের কল্পনাও করি না। ইতিহাস নাই বলিয়া ক্ষুণ্ণ হইতে বেশ শিখিয়াছি, কিন্তু লজ্জিত হইয়া উহার জ্বালা অনুভব করিতে শিখি নাই। যতদিন না এই লজ্জাটুকু—এই লজ্জার জ্বালাটুকু আমাদের অভ্যস্ত হইবে ততদিন আমাদের দ্বারা ইতিহাসের অভাব মোচনের কোন চেষ্টাও হইবে না। ইতিহাস ছিল না—কেন? আমাদের দোষে। এখনও ইতিহাস হইতেছে না—কেন? আমরা লিখিতেছি না। আমরা ইতিহাসের আদর করিতে জানি না। তাই প্রতিদিন ইতিহাসের উপকরণ চক্ষের সামনে দৃষ্টিপথ হইতে বিলুপ্ত হইতেছে—আমরা কিছুই সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিতেছি না। সুতরাং ইতিহাস নাই—কেন? আমরা লিখি না—সেইজন্যই নাই।"

ইতিহাস সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়া ১৩৩২ সনে সচিত্র "বীণা" নামে একখানা সাময়িক পত্র প্রকাশ করি। "বীণা"তে বিক্রমপুরের অনেক প্রবন্ধই বাহির হইয়াছিল। নানা কারণে বীণার তন্ত্রী অকালে ছিন্ন হয়। পরে "পল্লীমঙ্গল"

নামে সাপ্তাহিক পত্রিকায় বিক্রমপুরের গ্রাম্য বিবরণের ধারাবাহিক আলোচনা হইয়াছিল। ১৩৩৫ সনের অগ্রহায়ণ মাস হইতে বৎসরাধিক কাল নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন ও আকস্মিক বিপদ্‌পাতের দরুণ বিক্রমপুরের উপাদান সংগ্রহে বিরত ছিলাম। পূজ্যপাদ সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "বিক্রমপুর প্রতিভার" উপকরণ সংগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন; আমার ইতিহাস সঙ্কলনের সংবাদ শুনিয়া তিনি এ কার্য্য হইতে বিরত থাকেন এবং আমাকে উপদেশ দেন এবং উৎসাহিত করেন। এইজন্য তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ।

বিক্রমপুর হাসারা নিবাসী পণ্ডিত ৺ পদ্মলোচন ঘোষ মহাশয় আমাকে পুনঃ পুনঃ উৎসাহ প্রদান করিয়া এ কার্য্যে ব্রতী করিয়াছেন। এইরূপ বিরাট ব্যাপার আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না গত আট বৎসরের পরিশ্রমের ফলে উত্তর ও দক্ষিণ বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া উপাদান সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকিয়াও পত্নী ও পিতামহী দেবীর বিয়োগে এবং শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন এক বৎসর কাল এ কার্য্যে বিশেষ অগ্রসর হইতে পারি নাই। অতঃপর প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ আমার পরম শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ কার্য্যে আমাকে পুনঃ পুনঃ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন।

আমার দুর্ভাগ্য রাখালদাস বাবু আজ জীবিত নাই।—"বিক্রমপুর" প্রকাশ হইল সত্য কিন্তু গ্রন্থ মধ্যে বহু ভ্রম প্রমাদ রহিয়া গেল। এই গ্রন্থ সম্পাদনে প্রাচীন ও আধুনিক বহু ঐতিহাসিক বিবরণ হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার, ৺ দুর্গাচন্দ্র সান্ন্যাল, শ্রীযুক্ত রসিকলাল গুপ্ত, ৺কেদারনাথ মজুমদার, ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায় প্রভৃতির ইতিহাস পাঠেও অনেক উপকার পাইয়াছি। প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায়, ৺ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মণীষিগণের ইতিহাস হইতেও বিশেষরূপ সাহায্য পাইয়াছি। গৌড় রাজমালা, বাঙ্গালার ইতিহাস, চাঁদ কেদার রায়, বারভুইঞা, বিক্রমপুরের ইতিহাস, গৌড়ের ইতিহাস, ঢাকা জিলার ইতিহাস, অষ্টাদশ শতাব্দীর নবাবী আমল, বঙ্গীয় সমাজ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে কয়েকটী অধ্যায় উদ্ধৃত করিয়াছি। ঐ সমস্ত গ্রন্থকারগণের ঔদার্য্যের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদের ইতিহাস হইতে স্থানে স্থানে অংশ বিশেষ ও অধ্যায় বিশেষ উদ্ধৃত করিতে সাহসী হইয়াছি, এই হেতু তাঁহাদের নিকট চিরঋণে আবদ্ধ আছি। বস্তুতঃ এই গ্রন্থের কোন বিষয়ে যদি কোন উৎকর্ষ লক্ষিত হয় তবে সে প্রশংসা তাঁহাদেরই—উহার দোষ ত্রুটী যাহা কিছু তাহা আমার নিজস্ব। আমার শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক মহোদয়গণ আমার এই অনধিকার চর্চ্চা ক্ষমা করিবেন।

দক্ষিণ বিক্রমপুর নিবাসী কার্ত্তিকপুর স্কুলের ভূতপূর্ব্ব সহঃ প্রধান শিক্ষক সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন সেন মহাশয় এই গ্রন্থের অনেক অসম্পূর্ণাংশ সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন,—তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম, ঐকান্তিক যত্ন এবং আন্তরিক সহানুভূতি ব্যতিরেকে এই ইতিহাস প্রকাশ করা আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর হইত না। তিনি আমার অগ্রজ প্রতিম, তাঁহার ঋণ অপরিশোধ্য।

নারায়ণগঞ্জ মোক্তার লাইব্রেরী হইতে এই ইতিহাস প্রণয়ণ কল্পে অনেক পুস্তকের সাহায্য পাইয়াছি—তজ্জন্য আমি উক্ত লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমার বন্ধুবর সুলেখক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অপ্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে স্থলবিশেষে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়াছি। এজন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আমার পূজ্যপাদ ঢাকা চিত্রশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও প্রবীণ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহোদয়গণ এ কার্য্যে নানা উপদেশ প্রদান করিয়া আমাকে চির কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিদ্ বিক্রমপুরের অন্যতম কৃতীসন্তান শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীনাথ দত্ত মহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া আমাকে অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থ মুদ্রণকালে শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন অপারগ বিধায় আমার পরম শুভাকাঙ্খী "পঞ্চায়েৎ" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত জানকীনাথরায় বি, এল এবং

"হরিনাথ মেসিন প্রেসের" স্বত্বাধিকারী সহোদর-প্রতিম শ্রীযুক্ত রাধানাথ রায় বি, এস্-সি, বিদ্যাবিনোদ মহোদয় এই গ্রন্থের প্রুফ দেখিয়া অসুস্থ গ্রন্থকারকে চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থ মুদ্রণকালে শ্রদ্ধেয় প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয় ভ্রমক্রটী প্রদর্শন করিয়া আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমি চিরঋণে আবদ্ধ।

পরিশেষে বক্তব্য এই, যদি এই ইতিহাস পাঠে একটী বিক্রমপুরবাসীর হৃদয়েও নব প্রেরণা আনয়ন করে, একটী যুবকের অন্তরেও আমাদের পূর্ব্ব পিতামহগণের কীর্ত্তিগাথা স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত হয়,—একজন বিক্রমপুরবাসীও যদি তপ্ত অশ্রু সেঁকে পূর্ব্বপুরুষগণের তর্পণ করিয়া নিজের জীবন ধন্য করিতে পারে তবেই এই অধম গ্রন্থকারের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অর্থ ব্যয় সার্থক এবং সাফল্য মণ্ডিত হইবে। ইতি—

বেজগাঁ—বড় বাড়ী
(ঢাকা)
২রা বৈশাখ ১৮৫৪ শক

শ্রীহিমাংশুমোহন চট্টোপাধ্যায়

এই গ্রন্থ মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ "লক্ষ্মণসেনের নবাবিষ্কৃত তাম্র-শাসন" এবং শ্রীযুত রমাপ্রসাদ চন্দ, শ্রীযুত আনন্দনাথ রায়, শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য, শ্রীযুত নিশিকান্ত ঘোষ, শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন শর্ম্মা মহোদয়গণ তাঁহাদের নিজ নিজ প্রবন্ধ হইতে বচন প্রমাণ অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিতে অনুমতি দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। শ্রীযুত শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ তদীয় পিতামহ ৺ কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনার অংশ বিশেষ মুদ্রণের অনুমতি এবং শ্রীযুত অদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তদীয় পিতৃদেব স্বর্গগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "বাঙ্গালার ইতিহাস" হইতে কয়েক পৃষ্ঠা সন্নিবিষ্ট করিবার অধিকার দিয়া আমাকে অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। ঢাকা চিত্রশালার সম্পাদক রায় সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র বাহাদুর রামপালের মানচিত্র, ভোজবর্ম্মা ও শ্রীচন্দ্রের তাম্র-শাসনের ব্লক ব্যবহার করিবার অনুমতি দিয়া এবং উক্ত চিত্রশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় অম্বরের শিলামাতার ব্লকখানি ব্যবহার করিবার অনুমতি প্রদানে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যে সকলজীবিত বা মৃত মহাত্মগণের রচনা বা ভাব এই গ্রন্থ মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের সকলেরই নিকট এই দীন গ্রন্থকার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছে।

সূচী।

চিত্র সূচী



"বিক্রমপুর"

কালীপাড়ার জমিদার ও পূর্ব্ববঙ্গের সমাজপতি—

শ্রীযুক্ত সুরেশকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরী।

H N. Pres

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীজনার্দ্দন

শরণম্

স্বনামধন্য

বিক্রমপুর-কালীপাড়া-জমিদার-বংশাবতংস

শ্রীযুত সুরেশকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরী

মহোদয় শ্রীকরকমলেষু

মহাত্মন্!

আপনি যে কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সেই সুসম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশ পূর্ব্ব হইতেই স্বধর্ম্মপরায়ণতা, বিদ্যোৎসাহিতা, উদারতা, গুণগ্রাহিতা প্রভৃতি উচ্চ গুণগ্রামে বিভূষিত হইয়া বিক্রমপুর সমাজে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

কালীপাড়ার জমিদারগৃহ বাণীকমলার যুগপৎ অনুগ্রহ লাভ করিয়া কোবিদকলাবিদের স্তবালাপে এবং অর্থী অভ্যাগতের কৃতজ্ঞতা ব্যঞ্জক জয়োচ্চারণ রোলে নিয়ত মুখরিত থাকিত। আপনারই পূর্ব্ব পুরুষ, সর্ব্বাগ্রে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া বিক্রমপুরের বিদ্যাচর্চ্চার অবদান রক্ষা করিয়াছিলেন, পূর্ব্বতনগণের যাবতীয় গুণ আপনাতে সুপ্রকাশিত হইয়াছে। সৎসাহিত্য বহুল আপনার রম্য পাঠগৃহ, ঐকান্তিকী সাহিত্যপ্রীতি এবং অসামান্যা জ্ঞান স্পৃহার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

মুদ্রিত এই প্রথম খণ্ড "বিক্রমপুর" আপনার দেশপ্রেম বিদ্যোৎসাহিতা এবং উদারতার অন্যতম নিদর্শন। আপনার উৎসাহ এবং অর্থানুকূল্য ব্যতীত মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির দ্বারা কোন ক্রমেই ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে পারিত না। তাই মহাশয়ের নামে "বিক্রমপুর" প্রথম খণ্ড উৎসর্গ করিয়া শ্রদ্ধাবনতঃ হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

বিক্রমপুর প্রতিভা কার্য্যালয়,
নারায়ণগঞ্জ।
অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৩৮ সন।

গুণমুগ্ধ—
শ্রীহিমাংশুমোহন শর্ম্মা।

বিক্রমপুর



প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়



উপক্রমণিকা

বর্ত্তমান ভারত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ লইয়া অতীব বিব্রত—একটি প্রধান চিন্তা, একমাত্র রাজনৈতিক অধিকার লাভের সমস্যা সমস্ত দেশবাসীর মস্তিষ্ক মন অধিকার করিয়া আছে। অতীতের কথায় কর্ণপাত করিবার আগ্রহ এবং অবসর আজ কাহারও নাই। নূতনের চাপে পুরাতন একেবারে দমিত হইয়া গিয়াছে। যেই সৃষ্টি নব্য ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করিবার অনুকূল বার্ত্তা বহন করিয়া উপস্থিত হইতে না পারে, যতই কেন উচ্চ স্তরের না হউক সেই সৃষ্টি—কাব্য সাহিত্য কলা কৃষ্টি; বর্ত্তমানে আর দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে না। এ বিপ্লবের যুগ, পুরাতন প্রসঙ্গ বা ইতিহাস আলোচনার মোটেই অনুকূল নয়। তাই ইতিহাস বা প্রত্নতত্ত্বের আলোচনার কথা উঠিলেই কেহ কেহ উহাকে "মড়া ঘাটিবার" সঙ্গে উপমিত করিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া থাকেন। আমরা উঁহাদের এই মন্তব্য যথার্থ বলিয়া মানিয়া লইয়া বলি,

মানব দেহে স্বাস্থ্য এবং জীবনীশক্তি ফিরাইয়া আনিতে যেমন চিকিৎসকের প্রয়োজন, তেমনই ঐ চিকিৎসক শ্রেণীর সাহায্য করিবার নিমিত্তই "মড়া-ঘাটা লোকের"ও প্রয়োজন আছে। ঐতিহাসিক মড়া ঘাটিয়া জাতির প্রকৃতি, ধাত্ নির্ব্বাচন করিয়া দিলেই রাজনৈতিক চিকিৎসক যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া এই মুমূর্ষু জাতিকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন। ইতিহাস, রাজনীতির ঘনিষ্ঠ-তম সুহৃদ্, ইতিহাস-নির্দ্দিষ্ট পন্থায় পরিচালিত রাজ-নীতিই জাতিকে সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ করিতে পারে।

ইতিহাস আলোচনার প্রয়োজনীয়তা

'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, রাজেন্দ্র লাল মিত্র প্রভৃতি মহাত্মগণ এইটি বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। ইতিহাসের আলোচনা ব্যতীত দেশাত্মবোধ জন্মিতে পারে না, জাতির কোনরূপ প্রগতি সম্ভব হইতে পারে না। আমাদের লুপ্ত গৌরবের কথা যতই আলোচিত হইবে, ততই পূর্ব্ব গৌরব ফিরাইয়া আনিবার জন্য চিত্তে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে। কিরূপে আমরা সেই গৌরব লাভ করিতে পারিব এবং ভবিষ্যতে আমরা কি হইতে চাই, ইত্যাদি নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, আমরা কি ছিলাম এবং কিরূপে আমরা বর্ত্তমান হীনদশায় উপনীত হইলাম এ সমস্ত বিষয় আমাদের জানা আবশ্যক।

আমরা 'আত্মবিস্মৃত জাতি', আমাদের ইতিহাস ছিল না। বিদেশীয় পণ্ডিতগণ, যে দুই একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, উহা একান্ত অসম্পূর্ণ এবং বিকৃত। এসিয়াটিক সোসাইটি স্থাপনার পর হইতে সার উইলিয়াম জোন্স, কোল-ব্রুক, জেমস্ প্রিন্সেপ প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুসন্ধান—রীতিতে ভারতের পুরাতত্ত্ব সংগ্রহে প্রথম ব্রতী হন।

রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক ভারতের প্রাচীন বিবরণ সঙ্কলনের প্রথম চেষ্টা

কিন্তু স্বদেশীয়ের দ্বারা স্বদেশের ইতিহাস রচনা যেরূপ সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হইতে পারে, বিদেশীয় পণ্ডিতগণের দ্বারা ঐরূপ সম্ভব হয় না। ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়া আমাদের দেশীয় মনীষিবৃন্দ ক্রমে ভারতের পুরাতত্ত্ব সংগ্রহ কার্য্যে আত্ম নিয়োগ করেন। তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহোদয়ের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ যোগ্য। মিত্র মহোদয়ের পরে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেক বাঙ্গালী মনস্বী, দেশের অনুসন্ধান মূলক ইতিহাস রচনা জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তির ঐকান্তিক আগ্রহে বাঙ্গা-লার নানা স্থানে ক্রমে কয়েকটি ঐতিহাসিক গবে-ষণা সমিতি গঠিত হইয়াছে। মৈত্রেয়-রায়-চন্দের পরিচালিত বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি ইহাদের শীর্ষ স্থানীয়। ইঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অনেকে জিলা বা পরগণা বিশেষের ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে বঙ্গদেশে কতিপয় বৎসরের মধ্যে ফরিদপুর, ঢাকা, বাকলা, খুলনা, হুগলি প্রভৃতি জেলার ইতিহাস রচিত হইয়াছে।

বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ভারতের ইতিহাস সঙ্কলনে রাজেন্দ্র লাল মিত্র এবং অন্যান্য বাঙ্গালী পণ্ডিত মণ্ডলী।

গৌড়-বঙ্গের অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া ৺অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ সুযশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত আনন্দ নাথ ও যতীন্দ্র মোহন রায় ফরিদপুর এবং ঢাকার ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

আধুনিকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত নলিনী কান্ত ভট্টশালী এবং শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক পূর্ব্ব বাঙ্গালার ইতিহাসে কয়েকটি নূতন তথ্যের যোজনা করিয়া ঐতিহাসিকগণের শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন।

একটি পরগণার একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখিবার প্রথম প্রচেষ্টা, সম্ভবতঃ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত মহাশয়ের দ্বারাই হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে ৺অম্বিকাচরণ ঘোষ মহাশয়ের বিক্রমপুরের একখানি ক্ষুদ্র বিবরণ, ৺স্বরূপ চন্দ্র রায়ের "স্বুবর্ণ গ্রামের ইতিহাস", "ভাওয়ালের বিবরণী" প্রভৃতি দুই তিন খণ্ড পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু শ্রীযুক্ত গুপ্ত মহাশয়ের ন্যায় ইতিহাসকে পূর্ণাঙ্গ করিবার প্রয়াস ঐ সকল পুস্তিকায় দৃষ্ট হয় না। যোগেন্দ্র বাবুর "বিক্রমপুর ইতিহাসের ভূমিকায়" শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ যথার্থই বলিয়াছেনঃ—"গ্রাম্য খেলা ধূলা, আচার ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ এবং যোষিদ্ ব্রতাদি সংগ্রহ করিয়া যোগেন্দ্র বাবু ইতিহাস রচনার এক বিশেষ পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।"

পরগণার ইতিহাস রচনায় শ্রীযুত যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত

৺অম্বিকাচরণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত বিক্রমপুরের অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উঁহাদের প্রকাশিত গ্রন্থ সকলের অসম্পূর্ণতা দূর করিবার ধৃষ্টতা আমাদের নাই। তথাপি আমরা বিক্রমপুরের আর একটি • বিবরণী প্রকাশে ব্রতী হইলাম। বিক্রমপুর আমাদেরও জন্মভূমি—জননী। মাতৃনাম শুনিয়াই শুধু সন্তানের তৃপ্তি হয় না, কর্কশকণ্ঠ আড়ষ্টজিহ্ব সন্তানও 'মা' ডাক স্বয়ং ডাকিয়া, তবে তৃপ্ত হয়। হীনশক্তি হইলেও আমরা স্বয়ং 'মা' ডাক ডাকিব, মায়ের গান গাহিব। দশের নিকট শ্রুতি-মধুর, হৃদয়গ্রাহী না হইলেও মায়ের গান গাহিবার, মায়ের কথা বলিবার আমাদেরও অধিকার আছে। মাতৃ-মন্দিরের প্রাঙ্গনতলে কত রত্ন লুক্কায়িত আছে, কে বলিতে পারে? আমাদের অগ্রগামিগণ খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া অনেক বহুমূল্য রত্ন বাহির করিয়াছেন, আমরাও খুঁড়িব, গভীর শ্রদ্ধার সহিত মাতৃ-মন্দির প্রাঙ্গণের ধূলিকণা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিব,

বর্ত্তমান গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য

মিলিলে মিলিতে পারে অমূল্য রতন!

বিক্রমপুরের নামোৎপত্তি

বিক্রমপুর অতি প্রাচীন স্থান হইলেও, প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে বিক্রমপুরের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না। ইহার কারণ এই, যে ভূমিখণ্ডকে এখন আমরা বিক্রমপুর নামে অভিহিত করিয়া থাকি, পূর্ব্বে উহার নাম বিক্রমপুর ছিল না। বিক্রমপুরের প্রাচীন নাম সমতট। কোন্ সময়ে কোন্ নরপতির শাসনকালে সমতট বিক্রমপুর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা সঠিক অবগত হইবার উপায় নাই। "দিগ্বিজয় প্রকাশ" নামক একখানা প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বঙ্গাল পরতাল বর্ণনে নিম্নলিখিত শ্লোকাবলীতে বিক্রমপুরের এক বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে—

'দিল পুরোত্তরে ভাগে ব্রহ্মপুত্রস্য পশ্চিমে।
বৃদ্ধগঙ্গা দক্ষিণে চ পূর্ব্বে পদ্মানদী বরাৎ॥
বিক্রমভূপবাসত্বাৎ বিক্রমপুরমতো বিদুঃ।
অর্দ্ধোদয়স্য যোগে চ অভূৎ কল্পতরুর্নৃপঃ॥
ইচ্ছামতী নদীতীরে স্বর্ণমানঞ্চকার সঃ।
দরিদ্রেভ্যো দ্বিজেভ্যশ্চ দত্তবান্ বহুলং ধনম্॥
বিদ্বজ্জনানাং বাসশ্চ বিক্রমপুর্য্যাঞ্চ ভূরিশঃ
পরতাল ভূমিপস্য তোষিস্থলং বিদুর্বুধাঃ॥

ইহা হইতে জানিতে পারা যায় বিক্রম নামক রাজার বাস হেতু এই স্থানের নাম বিক্রমপুর হইয়াছিল। এক্ষণে প্রশ্ন এই, এই বিক্রম নামক রাজা কে ছিলেন? ইনি কি ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্য অথবা সেন বংশীয় বিক্রম সেন? পণ্ডিতবর হাণ্টার Statistical accounts of Bengal নামক গ্রন্থে বলেন—"There is a tradition that the celebrated Hindu Raja Bikramaditya held his court in the Southern portion of the district for some years and gave his name to the Purgana of Bikrampur, জনপ্রবাদে বিক্রমাদিত্যকে বিক্রমপুর নামোৎপত্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও, ইতিহাস ইহার সমর্থন করে না। বিশেষতঃ দিগ্বিজয় প্রকাশের গ্রন্থকার—"বিক্রমপুর ভূপ" দ্বারা উজ্জিয়নীপতিকে নির্দ্দেশ করিলে, নিশ্চয় তাঁহার সম্বন্ধে আরও বিশেষণ প্রয়োগ করিতেন, এত অল্প কথায় সেই বিখ্যাত নরপতির গুণ কীর্ত্তন করিয়া কিছুতেই ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেন না। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সেন-বংশীয় বিক্রম সেনকে বিক্রমপুরের স্থাপয়িতা মনে করিয়া ইহার সমর্থনে বিপ্রকুল কল্পলতিকা নামক কুলগ্রন্থের নিম্নলিখিত বচনাবলী উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

দাক্ষিণাত্য বৈষ্ণরাজশ্চৈকোঽশ্বপতিসেনকঃ।
তদ্বংশে জনিতশ্চন্দ্রকেতুসেনো মহাধনঃ॥
তস্তবংশে বীরসেনো ভূপঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
তদ্বংশে বিক্রমসেনোজাতঃ পরম ধার্ম্মিকঃ॥
কৃতবান্ বিক্রমপুরীং স্বনাম্নাভিহিতাং সুধীঃ॥

আমাদের নিকটও এই সিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। অনেকের মতে বিক্রমাদিত্য একটি কাল্পনিক নাম, কিন্তু বিক্রমসেন একটি কাল্পনিক নাম নহে। কথাসরিৎসাগর, বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী তন্ত্রবিভূতি গ্রন্থে বিক্রমসেনের নাম দৃষ্ট হয়। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের এই অংশ সমতট নামেই পরিচিত ছিল। বিক্রমসেনের রাজত্বকালে ইহা বিক্রমপুর আখ্যা প্রাপ্ত হয়, বল্লাল ও লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে ইহার গৌরবচ্ছটা সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

বিক্রমপুরের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় বলেন—"বিক্রমপুর নাম কতকালের ঠিক করা দুঃসাধ্য, রাজা বিক্রমাদিত্য হইতে, কি বিক্রমশালী সেনরাজগণ হইতে নাম হইল, তাহা ঠিক বলা যায় না। * * * সেনরাজগণের তাম্রশাসনে বিক্রম-পুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ আছে। এতদ্বারা অনুমিত হয়, এই নামটি হয় সেনরাজত্বকালে নতুবা তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পালরাজগণের রাজত্বকালে সংসিদ্ধ হইয়াছিল। অতএব বলা যাইতে পারে অন্যূন ১০০০ বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমপুরের নামকরণ হইয়াছিল।"

জয়স্কান্ধাবার বিক্রমপুর

আজ কতিপয় বৎসর হইল প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ সেনরাজগণের জয়স্কান্ধাবার বিক্রম-পুরের অবস্থিতি লইয়া, এক মহা সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছেন। রাঢ়দেশে কাটোয়ার নগণ্য পল্লী দেবগ্রামে 'বিক্রমভিটা' নামে একটি স্থান আছে। বসু মহাশয় উহাকে সেনরাজগণের গৌরব নিকেতন শ্রীবিক্রমপুর বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন। ঢাকার ইতিহাস লেখক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় একটি অতি যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধে, প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণবের এই মত খণ্ডন করিয়াছেন।

আমরা আবশ্যক বোধে ঐ প্রবন্ধ এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

দেবগ্রামের প্রাচীন অধিবাসিগণ দমদমার ভিটাকে "দেবল রাজার ভিটা" বলিয়াই জানেন, বল্লালের সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ থাকার বিষয় তাঁহারা একেবারেই অনবগত (১)। গত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে "গৌড় রাজমালা" প্রণেতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের বাচনিক অবগত হইয়াছি যে, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির অনুসন্ধানের ফলেও দমদমার ভিটার সহিত বল্লালের কোনও সম্বন্ধ নির্ণীত হয় নাই। প্রথিতনামা ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বহুবার এই দেবগ্রামে গিয়াছেন, কিন্তু তিনিও দেবগ্রামে বল্লাল সম্বন্ধীয় কোনও কিম্বদন্তীর সন্ধান পান নাই। শুনিয়াছি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় না কি নগেন্দ্রবাবুর এই বিক্রমপুর আবিষ্কারের অনেক রহস্য অবগত আছেন। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছেন যে শ্রীবিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার পূর্ব্ববঙ্গ ব্যতীত অপর কোথায়ও হইতে পারে না। যাহা হউক এ বিষয়ে আর অধিক কিছু লিখিব না। এস্থলে প্রথমতঃ বর্দ্ধমানের ইতিকথা নামক পুস্তকের স্থান পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিত—"দেবগ্রাম-বিক্রমপুর" শীর্ষক প্রবন্ধের আলোচনা করিয়া পরে শ্রীবিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবারের অবস্থান নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব।

আলোচ্য পুস্তকের ৫৬ পৃষ্ঠার ১৯শ ও ২০শ সংখ্যক চিত্রের পাদদেশে লিখিত "বল্লালের ভিটা হইতে প্রাপ্ত পাথরের একধার," "বল্লালের ভিটা হইতে প্রাপ্ত পাথরের অপরধার" সম্ভবতঃ লিপিকর প্রমাদ। কারণ এই প্রস্তর খণ্ড আমি দেবগ্রামে জনৈক ভদ্রলোকের অন্তঃপুরস্থিত একটি ক্ষুদ্র গৃহের দ্বারদেশে দেখিয়া আসিয়াছিলাম। অনুসন্ধানে অবগত হইয়াছিলাম যে, ইহা তাঁহার অন্তঃপুরের একটি কূপ খনন করিবার সময় ভূগর্ভ মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল। দমদমার ভিটা বা নগেন্দ্রবাবুর বল্লালের ভিটা হইতে এই স্থান অনেক দূরে অবস্থিত। সুতরাং ঐ ভিটার সহিত এই প্রস্তর খণ্ডের কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না।

(১) দেবগ্রাম নিবাসী যে সমুদয় বৃদ্ধ ভদ্র মহোদয়গণ দেবগ্রাম বিক্রমপুরের সহিত বল্লালের সংশ্রব সম্বন্ধে কোনও কথা শুনেন নাই বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ নগেন্দ্র বাবুকে পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন যে, আমার উক্তি অলীক কল্পনা মাত্র, সত্যের সহিত উহার কোনও সংশ্রব নাই। তাঁহারা নাকি বংশ পরম্পরা ক্রমেই শুনিয়া আসিতেছেন যে, দেবগ্রামস্থ দমদমা নামক স্থানে যে প্রাচীন স্তূপ অদ্যাপি বিদ্যমান, উহা সেনবংশীয় প্রসিদ্ধ বঙ্গাধিপ বল্লালসেনের রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ। সম্প্রতি নবদ্বীপ নিবাসী পণ্ডিত কুল বরেণ্য পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অজিত নাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় বিক্রমপুরের প্রধান স্মার্ত্ত আচার্য্যপাদ শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের চিঠির উত্তরে জানাইয়াছেন যে, দেবগ্রামে যে বল্লালের কোনও প্রাসাদ বর্ত্তমান ছিল, তাহা দেবগ্রামের কোনও ব্যক্তিই অবগত নহেন। দেবগ্রামে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কুটুম্বিতা আছে, সেই সূত্রেই অনেকবার তিনি তথায় যাইয়া থাকেন। মুরসিদাবাদ নিবাসী মুঙ্গের জেলা স্কুলের এসিষ্টাণ্ট হেড মাষ্টার, অতীত পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়স্ক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় বি এ, মহাশয় বহুবার দেবগ্রামে গিয়াছেন; তিনিও জানাইয়াছেন যে, দেবগ্রামে বল্লাল সম্বন্ধীয় কিম্বদন্তী সর্ব্বৈব মিথ্যা। ইহা নাকি সম্প্রতি রচিত হইয়াছে।

নগেন্দ্রবাবু, গোপাল ভট্টের এবং আনন্দ ভট্টের এজমালিতে লিখিত এবং পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের যত্নে এসিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত বল্লাল চরিতের-

"বসতিস্ম নৃপঃ শ্রীমান্ পুরা গৌড়ে পুরোত্তমে
কদাচিদ্বা যথাকামং নগরে বিক্রমে পুরে ॥
স্বর্ণগ্রামে কদাচিদ্বা প্রাসাদে সুমনোহরে।
রমমাণঃ সহ স্ত্রীভির্দ্দিবীব ত্রিদিবেশ্বরঃ ॥

এই শ্লোকদ্বয় অধ্যাহার করিয়া লিখিয়াছেন,—"চারিশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত আনন্দ ভট্টের বল্লাল চরিতেও লিখিত আছে—বল্লালসেন কখন গৌড়ে কখন বিক্রমপুরে এবং কখন স্বর্ণগ্রামে অবস্থান করিতেন। চারিশত বর্ষের এই প্রবাদ-বাক্য হইতেও মনে হয় যে, বরেন্দ্রের মধ্যে গৌড় নগরে, রাঢ়দেশে বিক্রমপুরে এবং বঙ্গদেশে স্বুবর্ণ গ্রামে বল্লালসেন রাজকার্য্যোপলক্ষে সময় সময় অবস্থান করিতেন।" বিক্রমপুর যে রাঢ়দেশে অবস্থিত, তাহা বল্লাল চরিতের এই শ্লোকটি হইতে পাওয়া যায় না। পরন্তু বল্লাল চরিত পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আনন্দ ভট্ট বিক্রমপুর বলিতে ঢাকা—বিক্রমপুরকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

সাধারণতঃ দুইখানি বল্লাল চরিত দেখিতে পাওয়া যায় (১)। তন্মধ্যে একখানি ৺ হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন কর্ত্তৃক সংশোধিত এবং যোগী জাতীয় ৺ পদ্ম চন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত। এই গ্রন্থে যোগী জাতীর প্রাচীন সামাজিক মর্য্যাদার বিষয় বর্ণিত আ[illegible] অপর খানি পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের যত্নে নাথ-প্রকাশিত পুস্তকের বহু পরে এসিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে স্বুবর্ণবণিক জাতীর প্রাচীন সামাজিক মর্য্যাদা বর্ণিত আছে। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার অনুল্লিখিতনামা (আমরা শুনিয়াছি স্বুবর্ণ বণিক জাতীয়) জনৈক বন্ধুর নিকট দুইখানি বল্লাল চরিতের হস্ত লিখিত পুঁথী পাইয়াছিলেন বলিয়া লিখিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের গ্রন্থ এই দুইখানি আদর্শ পুঁথীর উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার একখানি ১৬২৯ শকাব্দে বা ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে এবং অপরখানি ১১৮৯ বঙ্গাব্দে লিখিত। আচার্য্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া ১৯০১ সালে প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তদীয় Notices of Sanskrit Mss, গ্রন্থের কোথায়ও এই পুঁথীর বিষয় উল্লেখ করেন নাই। "আভিজাত্যের অনুরোধে এখন পর্য্যন্তও ইয়োরোপীয় সভ্য সমাজে কৃত্রিম বংশ পত্রিকা প্রস্তুত হইতেছে। সেই আভিজাত্যের অভিমান রক্ষা করিবার জন্য এতদ্দেশীয় ধনিগণ যে কতশত কুলগ্রন্থ রচনা করাইয়াছিলেন তাহা কে বলিতে পারে।"

উভয় বল্লাল-চরিতই গোপাল ভট্ট ও আনন্দ ভট্ট কর্ত্তৃক লিখিত বলিয়া উল্লিখিত হইলেও এই উভয় পুস্তকের ভাষা ও বিষয়গত পার্থক্য যে যথেষ্ট রহিয়াছে তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। বিশেষতঃ নগেন্দ্র বাবুর উদ্ধৃত শ্লোক নাথ-প্রকাশিত বল্লাল চরিতে দৃষ্ট হয় না। স্বুতরাং কোন্ খানিকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিব? আচার্য্যপাদ

(১) বল্লাল চরিত সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা একাদশ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। "বিশ্বকোষে নগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন, "গোপাল ভট্ট কর্ত্তৃক দুইখানি বল্লালচরিত রচিত হইয়াছে। এই দুই খানিই আধুনিক গ্রন্থ। এই উভয় গ্রন্থে এমন অনেক কথা আছে যাহা আলোচনা করিলে অনৈতিহাসিক কবিকল্পনা বলিয়াই মনে হইবে।"

শাস্ত্রী মহাশয় যে দুইখানি হস্ত লিখিত পুঁথী অবলম্বন করিয়া বল্লাল-চরিত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কাগজে লেখা, তালপাতায় নহে। সুতরাং শাস্ত্রী মহাশয়ের আদর্শ পুঁথী যে প্রাচীন নহে তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। যদি নাথ-প্রকাশিত পুস্তক কৃত্রিম বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রী মহাশয়ের আদর্শ পুঁথীও যে পরবর্ত্তীকালে রচিত হয় নাই তাহাই বা কে বলিতে পারে? শাস্ত্রী মহাশয়ই বা তাঁহার বন্ধুর নাম গোপন রাখিলেন কেন তাহাও বুঝা যায় না।

শাস্ত্রী মহাশয়ই রামচরিত গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। রামচরিতের ঐতিহাসিক কথাগুলি যেরূপ সরল, বল্লাল-চরিতের কথাগুলি তদ্রূপ সরল নহে। ইহাতে বৃথা বাগাড়ম্বরেরও বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়। রাম-চরিতে শত শত ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে এবং তাহার সমুদয়গুলিই তাম্রশাসন বা শিলালিপির প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু বল্লাল-চরিতে ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ নাই বলিলেই হয়। যাহাও দুই একটি আছে, তাহার সমর্থনকারী প্রমাণ অদ্যাবধি কিছুই আবিষ্কৃত হয় নাই। বল্লাল সেনের একখানি মাত্র তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং অপর পক্ষ যদি এ কথা বলেন যে, ভবিষ্যতে আরও খোদিতলিপি আবিষ্কার হইলে বল্লাল-চরিতোক্ত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির সমর্থন বাহির হইবে, তবে তাঁহাদের কথার উত্তরে বলিতে হয় যে, সমর্থক প্রমাণ আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত বল্লাল-চরিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত নয়।

রাম-চরিত সমসাময়িক ব্যক্তির লেখনী প্রসূত। পক্ষান্তরে বল্লাল-চরিত বল্লালের মৃত্যুর প্রায় চারি শত বৎসর পরে রচিত হইয়াছে। অতএব রাম-চরিতের কথা যেমন করিয়া বিশ্বাস করা যায়, বল্লাল-চরিতের কথা তেমন করিয়া বিশ্বাস করা উচিত নয়। অতএব বল্লাল-চরিতের ঐ শ্লোক দুইটির মূল্য অতি অল্প। বিশেষতঃ বল্লাল-চরিতেও এমন কোন কথা উল্লিখিত হয় নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া বিক্রমপুরকে অনায়াসে রাঢ়দেশে স্থাপিত করা চলে।

নগেন্দ্র বাবু দেবগ্রাম-বিক্রমপুরে বহুবার যাতায়াত করিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি, কিন্তু তিনি প্রাচীন বিক্রমপুর নগর যেখানে অবস্থিত ছিল সেখানে কখনও যান নাই। দমদমার ভিটা হইতে বিক্রমপুরের দূরত্ব প্রায় পাঁচ মাইল। এই দমদমার ভিটাতেই বল্লাল সেনের শ্রীবিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার, রাজধানী বা প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া নগেন্দ্র বাবু প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহা হইলে তাম্র-শাসনাদিতে দেবগ্রামের নাম উল্লিখিত না হইয়া বিক্রমপুরের নাম উল্লিখিত হইয়াছে কেন? বিক্রমপুর হইতে পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী দমদমার ভিটায় জয়স্কন্ধাবার বা রাজধানীই বা কেন প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল? নগেন্দ্র বাবু বলিতে পারেন যে, বিক্রমপুর সহর দমদমার ভিটা পর্য্যন্তই বিস্তৃত ছিল, কিন্তু তাহা হইলে বিক্রমপুর ও দমদমার মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ প্রান্তরমধ্যে কোনও প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন নাই কেন? নগেন্দ্র বাবু হয় ত বলিবেন, রাজধানী ছিল বিক্রমপুরে, কিন্তু রাজবাড়ী ছিল তাহা হইতে পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী দমদমায়; কিন্তু পুরাকালে রাজপ্রাসাদ নগরের কেন্দ্রস্থানেই নির্ম্মিত হইত, বড়জোর নগর-প্রাসাদের মধ্যেই অবস্থিত থাকিত। নগরের বাহিরে পাঁচ মাইল দূরে রাজপ্রাসাদ, ইহা অশ্রুতপূর্ব্ব। সুতরাং যদি দমদমার ভিটা বল্লালের ভিটা বলিয়াই পরিচিত থাকে, তবুও

উহা বল্লাল সেনের রাজধানী, রাজপ্রাসাদ বা জয়স্কন্ধাবার হইতে পারে না। দমদমার ভিটা ও সাওতার দীঘী হইতে দুইটি জাঙ্গাল রামপাল ও নবদ্বীপ পর্য্যন্ত যে সম্প্রসারিত ছিল, তাহা সত্য বটে, এবং এই জাঙ্গাল হয় ত বল্লালসেনেরই নির্ম্মিত। কিন্তু তাহা দ্বারা কি প্রমাণিত হইবে যে, এই জাঙ্গাল যে স্থানে আসিয়াছে, সেই স্থানেই বল্লালের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল ?

নগেন্দ্র বাবু "বিক্রম-তিরস্কৃত-সাহসাঙ্ক" পদের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া দেবগ্রামপতি বিক্রমরাজকে বিক্রমাদিত্যের সমতুল্য বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। দেবগ্রামের বিক্রমরাজ যে সাহসাঙ্ক নামে পরিচিত হইতেন, তাহার প্রমাণ কি ? এই সাহসাঙ্ক পদ ব্যবহার করিয়া প্রশস্তিকার হয় ত পুরাকালের বিক্রমাদিত্যকে অথবা চালুক্য-বংশের সাহসাঙ্ককে বিজয়সেন অপেক্ষা খাটো করিয়াছেন। দেব-গ্রামের বিক্রমরাজ সম্বন্ধীয় এরূপ কোনও প্রমাণই আদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দে তাঁহাকে ভারত-প্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্য অথবা চালুক্যবংশীয় সাহসাঙ্ক নৃপতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সুতরাং এ স্থলে সাহসাঙ্ক পদ দ্বারা দেবগ্রামাধিপতি বিক্রমরাজের কোনও ইঙ্গিত কল্পনা করা যায় না। সাহসাঙ্ক নামে একজন রাজা ছিলেন; তিনিও বিজয়সেনের সমসাময়িক ব্যক্তি। সুতরাং তাঁহাকে ছাড়িয়া আমরা ক্ষুদ্র গ্রামের ক্ষুদ্র ভূস্বামীকে কেন ধরিতে যাই ? নগেন্দ্র বাবু "দিক্" শব্দটিকে বন্ধনীর মধ্যে রাখিয়া "দিক্‌পাল চক্রপূট ভেদন গীত কীর্ত্তি" পদের যে স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিবার উপায় নাই। তাম্রশাসনে কিন্তু দিক্‌পাল শব্দ স্পষ্ট রূপেই উৎকীর্ণ রহিয়াছে। সুতরাং এই পদের ব্যাখ্যা দিক্‌পাল-গণের (বিভিন্নরাজগণের) নগরে তাঁহার কীর্ত্তি গীত হইত এইরূপই করিতে হইবে।

দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ-বালবলভিপতি বিক্রমরাজই যে উজানী, মঙ্গলকোট, অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের প্রবাদে বিক্রমকেশরী, বিক্রমাদিত্য বা বিক্রমজিৎ, তাহার কোনই প্রমাণ নাই। দেবগ্রাম-বিক্রমপুর যে বিক্রমরাজ বা বিক্রমাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত, তাহারই বা প্রমাণ কোথায় ? বাঙ্গালার বহু স্থানেই ত "জিতের মাঠ" বা "জিতের পুষ্করিণী" রহিয়াছে' সুতরাং নগেন্দ্র বাবুর যুক্তি অনুসরণ করিলে বলিতে হয় যে, তৎসমুদয়ের সহিতই বিক্রমজিৎ নামক এক রাজার বা বহু রাজার স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে।

জয়স্কন্ধাবার শব্দ শিবিরার্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং কেশব বা বিশ্বরূপের তাম্রশাসনে বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবারের পরিবর্ত্তে ফল্গু গ্রাম-জয়স্কন্ধাবারের উল্লেখ থাকিলে বিস্মিত হইবার কোনই কারণ নাই। বিক্রমপুর পরগণার মধ্যে বিক্রমপুর নামে কোনও সহর বা গ্রামের অস্তিত্ব নাই বলিয়াই যে মনে করিতে হইবে যে, মুসলমান অধিকারের পর দেবগ্রাম বিক্রমপুর হইতে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্ব বঙ্গের যে অংশে গিয়া বাস করেন, তাহাই পরে "বিক্রমপুর ভাগ" বা বিক্রমপুর পরগণা নামে খ্যাত হইয়াছে, তাহার কোনই অর্থ নহে। বিক্রমপুর পরগণার কোথায়ও নাই হয়ত বিক্রমপুর নগর প্রতিষ্ঠিত ছিল। পুণ্ড বর্দ্ধন নগর অধুনা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না বলিয়াই কি পুণ্ড বর্দ্ধন ভুক্তির বাহিরে পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগর আবিষ্কার করিতে হইবে ? পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের ন্যায় বিক্রমপুর সহরের নামও হয়ত বিক্রমপুর পরগণা হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে ! বিশেষতঃ তাম্র-শাসনোক্ত বিক্রমপুর যে পরগণা বা বিভাগ হইতে

পারে না তাহাও স্বীকার করা যায় না। দনুজ মর্দ্দনের মুদ্রা চন্দ্রদ্বীপ হইতেই মুদ্রিত হইয়াছিল; এই চন্দ্রদ্বীপ একটি পরগণা মাত্র। চন্দ্রদ্বীপ পরগণা মধ্যে চন্দ্রদ্বীপ নামে কোনও গ্রাম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভুলুয়া, ময়মনসিংহ, ভাওয়াল, তালিপাবাদ, বড় বাজু প্রভৃতি পরগণা মধ্যে ঐ নামের কোনও গ্রাম নাই। ত্রিপুরা প্রদেশের কোনও স্থানেই ত্রিপুরা সহর নাই; অথচ ত্রিপুরা একটি জেলা বলিয়া পরিচিত। সুতরাং নগেন্দ্র বাবুর যুক্তির কোনই মূল্য নাই।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইল রামপালের নিকটবর্ত্তী জোড়াদেউল নামক স্থানে এক মুসলমান স্বর্ণনির্ম্মিত একটি তরবারির খাপ ও কয়েকটি স্বর্ণগোলক পাইয়াছিলেন। রামপালে একবার সপ্ততি সহস্র মুদ্রা মুল্যের একখণ্ড হীরক পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া টেইলার সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন (১)। রামপালের সন্নিকটস্থ ধামদ গ্রামের প্রান্তস্থিত দীঘিতে একখানা স্বর্ণপত্রের পুঁথী পাওয়া যায়। পুঁথীর এক একখানা পাতা ৩০ ভরি ওজনের ছিল এবং এরূপ ২৪ খানা পাতাতে পুঁথীখানা সমাপ্ত ছিল (২)।

রামপালের পূর্ব্বস্থিত পঞ্চসার গ্রাম হইতে পশ্চিমে মীরকাদিমের খাল, উত্তরে ফিরিঙ্গি বাজার ও রিকাবি বাজার হইতে দক্ষিণে মাকহাটীর খাল পর্য্যন্ত প্রায় ২৫ বর্গ মাইল ভূমির নিম্নভাগ ইষ্টক গ্রথিত বলিয়াই মনে হয়। বরেন্দ্র ভিন্ন এরূপ প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ বাঙ্গালার অন্য কোনও স্থানেই দৃষ্ট হয় না। সুতরাং বিক্রমপুর পরগণার মধ্যে, ইহারই কোনও স্থানে যে প্রাচীন বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার প্রতিষ্ঠিত ছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

প্রসিদ্ধ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীস পালবংশীয় নয়পাল দেবের সমসাময়িক। এই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের বাড়ী "বিক্রমণিপুর বাঙ্গালায়" ছিল বলিয়া তাঁহার তিব্বতীয় ভাষার জীবন চরিতে উল্লিখিত আছে। ঐতিহাসিকগণের মত এই যে ইহা বঙ্গদেশান্তর্গত বিক্রমপুর ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিক্রমপুরে প্রবাদ বজ্রযোগিনী গ্রামই দীপঙ্করের জন্মস্থান। সুতরাং একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতেই যে বিক্রমপুর নামের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

নগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন (৩) "দেবগ্রামবাসী বয়োবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে প্রবাদ শুনিয়াছিলাম যে, বল্লালসেন যখন বিক্রমপুরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপে চলিয়া যান। সেই সময় পুত্রবধুর বিরহব্যঞ্জক শ্লোক পাঠ করিয়া সেই রাত্রি মধ্যে লক্ষ্মণসেনকে আনিবার জন্য রাজা বল্লালসেন কৈবর্ত্তদিগকে আদেশ করেন। কৈবর্ত্তেরা সেই রাত্রি মধ্যে লক্ষ্মণসেনকে বিক্রমপুর রাজধানীতে আনিয়া দিয়াছিল। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বল্লাল সেন কৈবর্ত্তদিগের জলচল করিয়া লয়েন। তদবধি গঙ্গাতীরস্থ কৈবর্ত্তগণ জলাচরণীয় হইয়াছে; কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুর পরগণায় আজও কৈবর্ত্তগণের জল চলে নাই। এ অবস্থায় লক্ষ্মণসেন ঘটিত প্রবাদের মুলে যদি কিছু মাত্র সত্য থাকে, তাহা যে এই নদীয়া জেলার বিক্রমপুরেই হইয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।"

(১) Taylor's Topography of Dacca, Page 101.

(২) প্রবাসী ১৩২২, আষাঢ়, ৩৯১ পৃষ্ঠা।

(৩) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ২২শ ভাগ, ১ম সংখ্যা ৭৬ পৃষ্ঠা।

নগেন্দ্রবাবুর উল্লিখিত প্রবাদটি বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই প্রচারিত। তবে দুই একস্থানে তাঁহার শ্রুত প্রবাদটির সহিত অন্যস্থানে প্রচলিত প্রবাদের অসামঞ্জস্য আছে। নগেন্দ্রবাবুর প্রামাণ্য গ্রন্থ বল্লালচরিতেও ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। (১) তাহা হইতে জানা যায় যে, লক্ষ্মণসেন বিক্রমপুর হইতে পলায়ন করিয়া নবদ্বীপে যান নাই; কোথায় গিয়াছিলেন তাহা লিখিত হয় নাই। বল্লালসেন কৈবর্ত্তদিগকে এক রাত্রির মধ্যে লক্ষ্মণসেনকে বিক্রমপুর রাজধানীতে আনিয়া দেয় নাই। দ্বিসপ্ততি ক্ষেপণী যুক্ত তরণীর সাহায্যেও লক্ষ্মণসেনকে বিক্রমপুরে আনয়ন করিতে দিবস দ্বয় (দ্বাভ্যামহোভ্যাং) অতিবাহিত হইয়াছিল। এজন্য রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে ধন রত্ন বস্ত্র এবং হালিক্য উপজীবন দিয়াছিলেন।

দেবগ্রামের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করিতে যাইয়া নগেন্দ্রবাবু লিখিতেছেন। * "খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে গুড়বমিশ্রের গরুড়স্তম্ভলিপিতে বর্ণিত হইয়াছে—

"দেবগ্রামভবা ধন্যা দেবীস্থ তুল্যবলয়ালোকসন্দীপিতরূপা।
দেবকীব তস্মাদ্গোপালপ্রিয়কারকমসূত পুরুষোত্তমম্" ॥

এই শিলালিপির প্রমাণেও আমরা বলিতে পারি যে, খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতেই দেবগ্রাম প্রসিদ্ধ ছিল। এই স্থানে গৌড়েশ্বর নারায়ণপালের প্রধান মন্ত্রী গুড়বমিশ্রের মাতুলালয় ছিল বলিয়া তাঁহার প্রশস্তিকার সগৌরবে এই দেবগ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন"।

নগেন্দ্রবাবুর উদ্ধৃত শ্লোক গরুড়স্তম্ভলিপিতে দৃষ্ট হয় না। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় গরুড়স্তম্ভলিপির একটি ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ পাঠ প্রকাশিত হইয়াছিল। (১) অবশেষে অধ্যাপক কিলহর্ণের অধ্যবসায়বলে একটি মূলানুগত পাঠ মুদ্রিত হইয়াছিল বটে, (২) কিন্তু তাহাতেও সমুদয় সংশয়ের নিরসন হইয়াছিল না। পরে গৌড়লেখমালায় একটি বিশুদ্ধ পাঠ প্রকাশিত হইয়াছে (৩)। কিন্তু কি এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ, কি অধ্যাপক কিলহর্ণের পাঠ, অথবা কি গৌড়লেখমালা-ধৃত পাঠ, কোথায়ও

---

(১) "শ্রুত্বা স্বস্য বধা দেশং তপস্বী লক্ষ্মণ স্তুতঃ।
ব্যাকুলো মন্ত্রয়ামাস কান্তয়া সহ নির্জ্জনে ॥
ব্রজন্ত্যাং গাহমানায়ামামন্ত্র্য রহসি প্রিয়াম্।
গুপ্তাং তরণি মারুহ্য পলায়ত মহাভয়াৎ ॥
প্রভাতায়াং বিভাবর্য্যাং জ্ঞাত্বা তস্য পলায়নম্।
দুর্গাবাড়ীং যযৌ রাজা চিন্তাজৃম্ভ বিলোচনঃ ॥
প্রবিশন্ মন্দিরং তত্র ভিত্তি কায়াং মহীপতিঃ।
স্নুষা লিখিতং শ্লোকং দৃষ্টে্বমমপঠৎস্বয়ম্ ॥
পতত্যবিরতং বারি নৃত্যন্তি শিখিনো মুদা।
অদ্য কান্তঃ কৃতান্তো বা দুঃখস্যান্তং করিষ্যতি ॥
শ্লোক মেতং বাচয়িত্বা বল্লালো ধরণীপতিঃ।
পুত্রস্নেহ চলচ্চিত্তঃ কৈবর্ত্তানাজুহাবহ" ॥
নাবিকা উচুঃ।
"ইত্যুক্ত্বা চাভিবাদ্যাথ রাজানং নাবিকা মুদা।
আনেতুং লক্ষ্মণং জগ্মঃকৃত্বা কোলাহলং ভৃশম্ ॥
অরিত্রাণাংদ্বি সপ্তত্যা বাহয়ন্ত স্তরীং দ্রুতম্।
আনিন্যুর্লক্ষ্মণং দ্বাভ্যামহোভ্যাং জালজীবিনঃ ॥
তত স্তেভ্যো দদৌ রাজা সন্তোষ বিমলাননঃ।
ধন রত্ন বস্ত্রভারান্ হালিক্যঞ্চোপজীবনম্" ॥
বল্লাল চরিত—সোসাইটির সংস্করণ, ৫ম অধ্যায়

* বর্দ্ধমানের ইতিকথা—৫৫ পৃষ্ঠা।

(১) J. A. S. B. 1874. Pages 356-358.

(২) Epigraphia Indica Vol. II. Pages 161-164.

(৩) গৌড়লেখমালা—৭১-৭৬ পৃষ্ঠা।

নগেন্দ্রবাবুর উদ্ধৃত শ্লোকটির সন্ধান পাইলাম না। গরুড়স্তম্ভলিপির ১৭শ শ্লোকে লিখিত আছে ;—

"দেববগ্রাম-ভবা তস্ত পত্নী বব্বাভিধাঽভবৎ।
অতুল্যাচলয়া লক্ষ্যা সত্যা চাপ্য (নপত্য) য়া॥
সা দেবকীব তস্মাৎ যশোদয়া স্বীকৃতং পতিং লক্ষ্যাঃ।
গোপাল-প্রিয়কারকমসূত পুরুষোত্তমং তনয়ং॥"

—গৌড়লেখমালা, ৭৪-৭৫ পৃঃ।

নগেন্দ্রবাবু কি উদ্দেশ্যে গরুড়স্তম্ভলিপির শ্লোকটির এরূপ দুর্দ্দশা করিয়াছেন, তাহা বুদ্ধির অগম্য। যাহা হউক, ইহা হইতে জানা যায় যে, গুড়বমিশ্রের মাতুলালয় এক দেবগ্রামে ছিল। কিন্তু গরুড়স্তম্ভলিপি হইতেও নগেন্দ্রবাবুর দেবগ্রামের প্রাচীনত্ব প্রমাণ হয় না। বঙ্গদেশে দেবগ্রাম নামে বহু গ্রাম রহিয়াছে। সুতরাং দেবগ্রাম নামক কোনও গ্রামের সন্ধান পাইলেই যে তাহাকে গুড়বমিশ্রের মাতুলালয় বলিয়া পরিচিত করিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। আলোচ্য দেবগ্রামেই যে গুড়বমিশ্রের মাতুলালয় ছিল, তাহার প্রমাণ কি!

নগেন্দ্রবাবু রামচরিতের টীকায় রামপালের সামন্তচক্রমধ্যে দেবগ্রামাধিপতি বিক্রমরাজের (১) নাম উল্লিখিত রহিয়াছে দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রামচরিতের দেবগ্রামই নদীয়া জেলায় অবস্থিত বিক্রমপুরের অনতিদূরবর্ত্তী দেবগ্রাম। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতানুসরণ করিয়া তিনি বালবলভীকে বাগড়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (২)। কিন্তু এই উক্তির সমর্থক কোন প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। "রামচরিতে" বালবলভীর বিবরণ দেখিয়া বোধ হয় যে, উক্ত দেশ নদীবহুল ছিল। হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রী ভট্ট ভবদেবের উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরে আবিষ্কৃত প্রশস্তিতে বালবলভীর উল্লেখ সর্ব্বপ্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। ভুবনেশ্বর-প্রশস্তি এবং রামচরিত ব্যতীত ভবদেব ভট্ট-বিরচিত "প্রায়শ্চিত্ত-নিরূপণ" ও "তন্ত্রবার্ত্তিকটীকা" নামক গ্রন্থদ্বয়ে তাঁহার বালবলভীভুজঙ্গ উপাধিতে বালবলভীর নাম দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বালবলভী যে নদীয়া জেলায় অবস্থিত ছিল, এ কথা নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে না (৩)। যাহা হউক, বালবলভীকে বাগড়ী এবং দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ-বালবলভী-পতি বিক্রম রাজকে দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও সিদ্ধান্ত-বারিধি মহাশয়ের যুক্তিই তাঁহার সিদ্ধান্তের অন্তরায় হইয়া উঠে। কারণ, দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ-বালবলভীপতি বিক্রমরাজ রামপালের সামন্তচক্রমধ্যে অন্যতম ছিলেন। রামপাল ১০৫৫—১০৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে (৪)। সুতরাং ১০৫৫-১০৯৭ খৃষ্টাব্দ মধ্যেই যে দেবগ্রাম-বিক্রমপুরে রামপালের সামন্ত বিক্রমরাজের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু ১০৫৫—১০৯৭ খৃষ্টাব্দ মধ্যে যে বিক্রমপুরে রামপালের সামন্ত বিক্রমরাজের অভ্যুদয় হইয়াছিল, সেই বিক্রমপুরে বিজয়সেন, ভোজবর্ম্মা, সামলবর্ম্মা,

(১) "দেবগ্রামপ্রতিবদ্ধবসুধাচক্রবালবালবলভীতরঙ্গবহুলগলহস্তপ্রশস্তবিক্রমো বিক্রমরাজঃ" ।—রামচরিত, ২য় পরিচ্ছেদ, ৫ম শ্লোক, টীকা।

(২) Memoris of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III. p. 14. বর্দ্ধমানের ইতিকথা—৫৫ পৃষ্ঠা। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্য কাণ্ড)—১৯৮ পৃষ্ঠা।

(৩) বাঙ্গালার ইতিহাস—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত, ২৬০ পৃষ্ঠা।

(৪) Archaeological Survey Report 1911-12. Page 162.

জাতবর্ম্মা, হরিবর্ম্মা, ও শ্রীচন্দ্র প্রভৃতি নরপতির স্থান হইতে পারে না।

দেবগ্রাম বিক্রমপুরের অবস্থান লইয়া নগেন্দ্র বাবু একটু গোলে পড়িয়াছেন; সেই জন্যই তিনি এই স্থানগুলিকে একবার রাঢ়ে, একবার বাগড়ীতে, এবং আবার বঙ্গে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে সমুৎসুক। ভাগীরথীর প্রাচীন খাড়ির চিহ্ন দেবগ্রাম বিক্রম পুরের সমীপবর্ত্তী স্থান হইতে এখনও বিলুপ্ত হয় নাই এবং এই স্থানগুলি যে ঐ খাড়ির পশ্চিমদিকে অবস্থিত তদ্বিষয়েও কোনই সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে নগেন্দ্রবাবুর আবিষ্কৃত দেবগ্রাম-বিক্রমপুর ভাগীরথীর প্রাচীন প্রবাহের পশ্চিমতীরবর্ত্তী বলিয়া বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত, এবং উহা বাগড়ী বা রাঢ় প্রদেশ-সংস্থ। এমতাবস্থায় দেবগ্রাম বিক্রমপুর কখনই পুণ্ড্র বর্দ্ধন ভুক্তির অন্তঃপাতি বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না।

বিশ্বরূপসেনের মদনপাড়ে তাম্রশাসনোক্ত "পৌণ্ড্র বর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতি বঙ্গে বিক্রমপুরভাগে" এবং কেশবসেনের ইদিলপুর তাম্রশাসনোল্লিখিত "পুণ্ড্র বর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতি বঙ্গে বিক্রমপুরভাগ প্রদেশে" প্রভৃতি উক্তিতে বিক্রমপুরের অবস্থান স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, বিশ্বরূপ ও কেশবসেনের তাম্রশাসনোক্ত বিক্রমপুর, বিজয়সেন, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের শ্রীবিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার, ভোজবর্ম্মা, শ্রীচন্দ্র ও হরিবর্ম্মার শ্রীবিক্রমপুর যে অভিন্ন, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। তাম্রশাসনাদিতে এরূপ কোনই কথা পাওয়া যায় না, যাহাতে উপরোক্ত বিভিন্ন রাজ বংশের শ্রীবিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবারকে পৃথক্ বলিয়া মনে করিতে হইবে।

ভবদেবভট্টের কুলপ্রশস্তিতে গৌড় ও বঙ্গ স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রথম ভবদেব গৌড়াধিপতির নিকট হইতে হস্তিনীভট্ট গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ভবদেব ভট্ট (বলবলভীভুজঙ্গ) বঙ্গরাজ হরিবর্ম্মার সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। এই ভবদেবের পিতামহ আদিদেবও বঙ্গরাজের রাজলক্ষ্মীর বিশ্রাম-সচিব মহাপাত্র ও অব্যর্থ সন্ধিবিগ্রহী ছিলেন। বঙ্গরাজ হরিবর্ম্মদেবও শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত-জয়স্কন্ধাবার হইতেই তাম্রশাসন প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীবিক্রমপুরকে বঙ্গ ব্যতীত রাঢ় বা বাগড়ীতে স্থাপন করা যায় না।

রামপালে প্রাপ্ত শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনে ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র পরে বঙ্গরাজ হইয়া ছিলেন বলিয়াই রাজকবি তাঁহার পিতাকে "হরিকেল রাজ-ককুদ-চ্ছত্র-স্মিতানাং শ্রিয়াং আধারঃ" রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই শ্রীচন্দ্রও শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত-জয়স্কন্ধবার হইতেই ভূমি দান করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীচন্দ্রের বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার যে হরিকেল-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। শ্রীচন্দ্র রামপালের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা। তিনি রামপালের প্রপিতামহ প্রথম মহীপালদেবের সমসাময়িক। সুতরাং তাঁহার তাম্রশাসনে যে বিক্রমপুরের উল্লেখ রহিয়াছে, সেই বিক্রমপুর কখনও রামপালের সমসাময়িক বিক্রমরাজের স্থাপিত বিক্রমপুর হইতে পারে না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীচন্দ্রের বিক্রমপুর হরিকেল-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এক্ষণে কথা হইতেছে, এই হরিকেল-রাজ্য কোথায়? খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র সুরিকৃত "অভিধান-চিন্তামণি"তে হরিকেল বঙ্গের (পূর্ব্ববঙ্গের) প্রাচীন নাম বলিয়া উক্ত হইয়াছে (১)। রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরী গ্রন্থে কামরূপ ও রাঢ়ের সহিত হরিকেল রাজ্যের নাম

(১) "বঙ্গাস্ত হরিকেলিয়া"—ইতি হেমচন্দ্রঃ।

উল্লিখিত হইয়াছে (১)। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং হরিকেল রাজ্যে এক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশমতে হরিকেল পূর্ব্বভারতের পূর্ব্বসীমায় অবস্থিত। (২) সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ যে হরিকেলীয়ের অন্তর্গত ছিল, এ কথা কিছুতেই বলা যায় না। নগেন্দ্র-বাবু লিখিয়াছেন, "ই-চিং খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর শেষভাগে চন্দ্রদ্বীপের রাজসভায় একবর্ষ কাল অবস্থান করেন। তাঁহার বর্ণনায় পাইতেছি যে, হরিকেল চন্দ্রদ্বীপের পশ্চিমে অবস্থিত"। কিন্তু আমরা ইৎচিংএর বিবরণী অনুসন্ধান করিয়া এরূপ কোনও উক্তিই দেখিতে পাইলাম না।

সন্ধ্যাকর নন্দী-বিরচিত রামচরিত গ্রন্থে লিখিত আছে,—"পূর্ব্বদিকের অধিপতি বর্ম্মরাজা নিজের পরিত্রাণের জন্য উৎকৃষ্ট হস্তী ও স্বীয় রথ প্রদান করিয়া রামপালের আরাধনা করিয়াছিলেন"। বেলাব তাম্রশাসনের প্রতিপাদয়িতা ভোজ-বর্ম্মাকেই এই প্রাগ্দেশীয় বর্ম্মরাজা বলিয়া ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করিয়াছেন। এই ভোজ-বর্ম্মাও শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিতজয়স্কন্ধাবার হইতেই ভূমি দান করিয়াছেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, সন্ধ্যাকর নন্দীর বাসভূমি অথবা রামপাল বা মদনপালদেবের রাজধানী রামাবতী নগরী হইতে ভোজবর্ম্মার রাজ্য বা রাজধানী পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ছিল বলিয়াই রাজকবি ভোজবর্ম্মাকে প্রাগ্দেশীয় বর্ম্মরাজা বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। সন্ধ্যাকর নন্দী আত্মপরিচয় প্রদানকালে বলিয়াছেন যে, তাঁহার কুলস্থান পৌণ্ড্র বর্দ্ধনপুরের সহিত প্রতিবদ্ধ ছিল; তাহা পুণ্যভূ ও বৃহদ্বটু বলিয়া পরিচিত ছিল এবং সমগ্র বসুধামণ্ডলের শীর্ষস্থানে অবস্থিত বরেন্দ্রীমণ্ডলের তাহাই চূড়ামণি ছিল (৩)। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ডে, করতোয়া-মাহাত্ম্যের প্রমাণ উল্লেখ করিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর ও বগুড়া জেলান্তর্গত মহাস্থান গড় অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (৪)। দেবগ্রাম-বিক্রমপুর এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরের দক্ষিণ দিকে এবং ঢাকা-বিক্রমপুর ইহার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। রামপালের সমসাময়িক যে সমুদয় নরপতি কামরূপের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাহারা কেহই বর্ম্মবংশীয় বলিয়া পরিচিত নহেন। সুতরাং ঢাকা-বিক্রমপুরকেই প্রাগ্দেশীয় ভূপতি ভোজবর্ম্মার জয়স্কন্ধাবার বলিয়া নির্দ্দেশিত করিতে হয়। রামপাল এবং তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র মদন-পালের রাজ্যকালে রামাবতী যে গৌড়-রাজ্যের রাজধানী ছিল, তাহা রামচরিত এবং মদনপালের তাম্রশাসন হইতে জানা যায়। রামাবতীর অবস্থান লইয়া মতভেদ রহিয়াছে, সন্দেহ নাই। নগেন্দ্রবাবু বগুড়াজেলার মহাস্থানগড়ের নিকট রামপুরা নামক স্থানে রামাবতীর অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন (৫)। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে রামাবতী সরকার

(১) "বৈতালিকঃ। * * * লীলাণিজ্জি অরাঢ়দেশ! বিক্কমকংত কামরূত! হরিকেলী কেলি আরঅ।"
কর্পূরমঞ্জরী—জীবানন্দবিদ্যাসাগরের সংস্করণ, ১৫ পৃঃ।

(২) J Takakusu's I.Tsing P. XLVI

(৩) "বসুধাশিরোবরেন্দ্রীমণ্ডলচূড়ামণিঃ কুলস্থানং।
শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরপ্রতিবদ্ধঃ পুণ্যভূঃ বৃহদ্বটুঃ॥—রাম চরিত, কবি প্রশস্তি, ১।

(৪) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড), ২০৯ পৃঃ।

(৫) বাঙ্গালার ইতিহাস—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, ২৭২ পৃঃ।

জন্নতাবাদ বা গৌড়ের সীমামধ্যে অবস্থিত (২)। রামাবতীর অবস্থান গৌড়মণ্ডলেই হউক বা বগুড়া জেলায়ই হউক, দেবগ্রাম-বিক্রমপুর এই উভয় স্থানেরই দক্ষিণদিকে এবং ঢাকা-বিক্রমপুর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। সুতরাং শ্রীবিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার যে ঢাকা-বিক্রমপুরেই প্রতিষ্ঠাপিত ছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

বিক্রমপুরের সীমা নির্দ্দেশ করিবার পূর্ব্বে প্রাচীন ভারতের ভূমিবিভাগ প্রণালী অবগত হওয়া প্রয়োজন। ভূমির বিভাগ দ্বিবিধ :— (১) স্বভাব গঠিত, (২) রাজশক্তি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট। এই দ্বিবিধ বিভাগই পরিবর্ত্তনশীল। নদ-নদীর গতি এবং ভূস্তরের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভূমি বিশেষের আয়তন এবং আকৃতি বর্দ্ধিত বা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আকস্মিক ভূকম্পাদি দুর্ঘটনায় সমতলভূমি কখনও কখনও জলাভূমিতে পরিণত হয়, আবার অনেক বিলঝিল বাসযোগ্য সমভূমিতে পরিণত হইতেও দেখা গিয়াছে। অনেক নদনদীর মুখ হাজিয়া মজিয়া, নদীগুলি বিলের রূপ ধারণ করে। সাগর সঙ্গমে নদীর দ্বারা বাহিত বালুকণা জমিয়া জমিয়া সিকতা ভূমিকে বিস্তার করিয়া তটরেখার পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া থাকে। ক্ষুদ্র জলপ্রণালী সময়ে বিশালকায়া স্রোতস্বিনীতে পরিণত হয়। এই সকল প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের সহিত স্বভাব গঠিত বিভাগ স্বতঃই পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কালধর্ম্মে রাজ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভূমিবিভাগের যে রূপান্তর ঘটিয়া থাকে উহাকেই রাজনৈতিক বিভাগ বলে। শাসন কার্য্যের সুবিধার জন্য রাজারা ইচ্ছামুরূপ বিভাগ সৃষ্টি করেন। হিন্দুরাজাদের আমলে এইরূপ বিভাগের নাম ছিল, বর্দ্ধন, ভুক্তি, মণ্ডল। মুসলমান বাদসাহগণ ভূমিকে সরকার, পরগণা, মৌজা প্রভৃতি নামে বিভক্ত করিয়া লয়েন। বর্ত্তমান ইংরেজ আমলে ভূমির এইরূপ রাষ্ট্রনৈতিক বিভাগের নাম প্রদেশ, বিভাগ, জেলা, মহকুমা।

বিক্রমপুরের সীমা

ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন অতি প্রাচীনকালে বঙ্গদেশ বিদ্যমান ছিল না, হিমালয়ের মূল পর্য্যন্ত বঙ্গোপসাগর বিস্তৃত ছিল। সামুদ্রিক জীবের কঙ্কাল অদ্যাপি হিমালয় পর্ব্বতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের স্রোতোবাহিত কর্দ্দমে ক্রমে বঙ্গদেশ গড়িয়া উঠিয়াছে। পণ্ডিত প্রবর স্যার চার্লস লায়েল তদীয় Principles of Geology নামক গ্রন্থে ইহার সুন্দর প্রমাণ দিয়াছেন। বঙ্গে প্রথম আর্য্য উপনিবেশ স্থাপিত হওয়ার সময় যশোহর, পাবনা এবং ফরিদপুরের উত্তরাংশ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ গঠিত হইয়াছিল *। যশোহর পাবনা এবং ফরিদপুরের পূর্ব্ব ও দক্ষিণাংশ অপেক্ষাকৃত আধুনিক ইদিলপুর, সাহাবাজপুর, চন্দ্রদ্বীপ, সন্দ্বীপ প্রভৃতি স্থান নদীর মোহনায় চড়া পড়িয়া অনেক পরে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে বঙ্গদেশের সীমা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

সমতট শব্দের অর্থ সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী স্থান। ফার্গুসন ঢাকা জেলাকে, ওয়াটসন ঢাকার দক্ষিণ ফরিদপুরের পূর্ব্বভাগ পর্য্যন্ত স্থানকে এবং ক্যানিংহ্যাম যশোহরের সন্নিকট গঙ্গার বদ্বীপকে সমতট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কালক্রমে সমুদ্রের তটভূমির বিস্তৃতির সহিত সমতটের দক্ষিণ সীমারেখার যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহাই উঁহাদের ঐরূপ বিভিন্নরূপ সীমা নির্দ্দেশের কারণ বলিয়া আমাদের মনে হয়। সমতট কালে বিক্রমপুর আখ্যা

(৩) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড), ২০৫ পৃঃ।

প্রাপ্ত হইয়া হিন্দুরাজাদের আমলে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অন্তর্গত হয়। মুসলমান আমলে উহা পরগণে বিক্রমপুর নাম প্রাপ্ত হইয়া সরকার সোণারগায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। ব্রিটিশ রাজত্বকালে, এই স্থানের কতকাংশ ঢাকা জেলা এবং কতকাংশ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত হয়। মুসলমানরাজত্বের পরবর্ত্তী সময়ে ভূস্বামিগণের অধিকার নির্দ্দেশের সৌকর্য্যার্থে পরগণার মধ্যে আবার কতকগুলি সামিল পরগণার উদ্ভব হইয়াছিল। এইরূপে বিক্রমপুর পরগণার মধ্যে বিভিন্ন সময়ে পরগণে কার্ত্তিকপুর সুজাবাদ,পরগণে বহর, পরগণে রাজনগর প্রভৃতি কয়টি সামিল পরগণা সৃষ্ট হইয়াছিল। বিক্রমপুরের সীমা নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুত আনন্দ নাথ রায় এসম্বন্ধে লিখিয়াছেন, —

অধুনা বিক্রমপুর বলিতে যে স্থানটুকু নির্দ্দিষ্ট হয়, বাস্তবিক পক্ষে প্রথমোদ্ভূত বিক্রমপুর কিন্তু এতটুকু স্থান লইয়া গঠিত ছিল না। তৎকালে বহু-বিস্তীর্ণ ভূভাগ লইয়া উহার সংস্থিতি ছিল, পরে উহার অনেক স্থান বিভিন্ন পরগণায় পরিগণিত হইয়াছে। কার্ত্তিকপুর, ইদিলপুর, পারজোয়ার প্রভৃতি স্থানগুলি নিশ্চয় বিক্রমপুরের অন্তর্গত ছিল। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ঐ পরগণাগুলির কোন অস্তিত্ব ছিল না।

ইদিলপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে লিখিত আছে— "বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগ প্রদেশে প্রশস্ত * লতা * ঘোড়াঘটক পূর্ব্বে * স * একা * ধীগ্রাম সীমা দক্ষিণে শঙ্কর বসাগোবিন্দ বল্লান্ত ভূসীমা পশ্চিমে *" ইত্যাদি।

এই তাম্রশাসনে "লতা" ও ধীগ্রাম বলিয়া যে দুইটি স্থানের পরিচয় আছে উহা বর্ত্তমান ইদিলপুরের অন্তর্গত লতা ও ধীপুর গ্রাম, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্যামলবর্ম্মার তাম্রশাসনে নগরকুণ্ডী, সমন্তসার, লঙ্কাচুয়া ও ধীপুর নামের উল্লেখ আছে। ঐ সকল শাসনপত্রে কোথায়ও ইদিলপুর বা কার্ত্তিকপুর নামের উল্লেখ নাই। যে সকল নাম বিক্রমপুরের অন্তর্গত বলিয়া শাসনপত্রে দেওয়া হইয়াছে, বর্ত্তমান সময়ে কিন্তু ঐ সকল স্থান ঐ দুই পরগণার অন্তর্গত। ঐ শাসনপত্র দুইখানি ৮।৯ নয় শত বৎসরের পূর্ব্বের বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, ইদিলপুর ও কার্ত্তিকপুর এই দুইটি নাম পরগণা বিভাগেরও বহু পরে উৎপন্ন হইয়াছে।

সাহনসাহ আকবর বাদসাহের রাজত্বকালে ১৮৫২ খৃঃ রাজা টোডরমল্ল দ্বারা বঙ্গদেশ উনিশটি চাকলায় বিভক্ত হয়। এই সময়ে সরকার সোণারগায়ের অন্তর্গত ৫১টি মহালের মধ্যে বিক্রমপুর ও কার্ত্তিকপুর এবং সরকার বাক্‌লার অন্তর্গত চারিটি মহালের মধ্যে ইদিলপুরের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদের বিশ্বাস বিক্রপুরের অংশ হইতেই অন্যান্য নূতন পরগণার ন্যায় এই সময়ে কার্ত্তিকপুর সুজাবাদ ও ইদিলপুর নামে দুইটি পৃথক পরগণা নির্দ্দেশ করা হয়। * * সুজাবাদ ও ইদিলপুর এই দুইটি নাম যে মুসলমান নামের সহিত সংশ্লিষ্ট ও জড়িত তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব হিন্দুরাজত্বে উহারা বিক্রমপুর বলিয়াই পরিচিত ছিল।

রাজার ইচ্ছায় দেশ-বিভাগের পরিবর্ত্তন ঘটে সেন রাজগণের সময়ে বিক্রমপুরের পরিধি যতটা ছিল, তাহার বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। তৎপরে নবাবী আমলে এই বিক্রমপুর মধ্যে আবার আরঙ্গবাদ,

* J-A-S-B. Ancient countries in Eastern India.

রাজনগর ও বৈকুণ্ঠপুর প্রভৃতি তিন চারটি পরগণার সন্নিবেশ সাধিত হইয়াছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬০ অব্দ পর্য্যন্ত গেষ্ট্রেল ও ডেলি কর্ত্তৃক যে সার্ভে হয়, তাহাতে দেখা যায় যে বিক্রমপুর পরগণাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা, ৮।৯ নং মকিমাবাদ, ১০ নং বিক্রমপুর, ১৩।১৪ নং রাজনগর ও বৈকুণ্ঠপুর।

কীর্ত্তিনাশার দক্ষিণতীরস্থ স্থানগুলি সম্প্রতি ফরিদপুরের অন্তর্গত হওয়ায় উহা দক্ষিণ বিক্রমপুর নামে অভিহিত হইতে চলিয়াছে।" *

প্রবীণ ঐতিহাসিক মহোদয়ের এই উদ্ধৃত প্রবন্ধ হইতে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি এক সময় বিক্রমপুর হয়ত ইদিলপুরের দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরে ইদিলপুরের উত্তর সীমা পর্য্যন্ত বিক্রমপুরের সীমা নির্দ্দিষ্ট হয়, তাই প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে নিম্নলিখিতানুরূপ সীমা নির্দ্দেশ দেখিতে পাই :--

"ঢাকেশ্বরী পূর্ব্বভাগে যোজনদ্বয়ব্যত্যয়ে।
ইচ্ছামতী নদীপার্শ্বে স্বর্ণগ্রামো বিরাজতে॥
"দিলপুরোত্তরেভাগে ব্রহ্মপুত্রস্য পশ্চিমে।
বৃদ্ধগঙ্গা দক্ষিণে চ পূর্ব্বে পদ্মানদী বরাৎ॥"

বিক্রমপুরের সীমানির্দ্দেশ করিতে যাইয়া স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় বিক্রমপুর সম্মেলনের সভাপতিরূপে এক সুন্দর কথার অবতারণা করিয়াছিলেন। উহার মর্ম্ম এই, যতদূর পর্য্যন্ত বিক্রমপুরের বিশিষ্ট আচার রীতিনীতি সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যাইবে, ততদূর পর্য্যন্তই বিক্রমপুর বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এই বাক্যানুযায়ী ইদিলপুরের উত্তরসীমা পর্য্যন্তই বিক্রমপুরের দক্ষিণ সীমা নির্দ্দেশ করিতে হয়। বিক্রমপুর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ইদিলপুর বহুকাল যাবৎ একটি স্বতন্ত্র সমাজগঠন করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু কার্ত্তিকপুর, বৈকুণ্ঠপুর, রাজনগর প্রভৃতি ছোট ছোট সামিল পরগণাগুলি আচার রীতিনীতিতে বিক্রমপুর হইতে অভিন্নই. রহিয়া গিয়াছে, কোনওরূপ স্বতন্ত্র সমাজ গঠন করিতে পারে নাই। উহারা আদিতে যেমন বিক্রমপুরের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এখনও সর্ব্ববিষয়েই বিক্রমপুরের অন্তভু ক্তই আছে। সুতরাং আমরা বর্ত্তমান বিক্রমপুরের সীমানা নিম্নলিখিতরূপ নির্দ্দেশ করিলাম :—

উত্তরে ধলেশ্বরী, পূর্ব্বে মেঘনাদ, পশ্চিম সীমা পদ্মা এবং চন্দ্রপ্রতাপের কতকাংশ দোহার গালিমপুরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্থান, দক্ষিণ সীমা ইদিলপুরের উত্তর লেদাম নামক ক্ষুদ্র নদীর পার।

অবস্থিত—উত্তর নিরক্ষ ২৩°-১৪′—ও ২৪°-২৮′ কলার মধ্যে এবং পূর্ব্ব দ্রাঘিমা ৮৯°-৪৫′ ও ৯০°-৫৯′ কলার মধ্যে বিক্রমপুর অবস্থিত।

আয়তন—উত্তর বিক্রমপুরের আয়তন ৩৮৬ বর্গমাইল, দক্ষিণ বিক্রমপুরের আয়তন ১০০ বর্গ-মাইল। উত্তর বিক্রমপুরের গ্রাম সংখ্যা প্রায় ১০১২, এবং দক্ষিণ বিক্রমপুরের গ্রাম সংখ্যা প্রায় ৩৫০।

প্রাকৃতিক বিবরণ—প্রায় সমগ্র বিক্রমপুর বর্ষার প্লাবনে প্লাবিত হইয়া যায়। উত্তর বিক্রমপুরের রামপাল এব দক্ষিণ বিক্রমপুবের চান্দনী নামক স্থান অপেক্ষাকৃত উচ্চ। পদ্মানদী মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়া বিক্রমপুরকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে এবং উহারই স্বল্প পরিসর অপর একটি শাখা উত্তরবাহিনী হইয়া বহর, বালিগাঁ, তালতলা প্রভৃতি স্থান দিয়া ধলেশ্বরীর সহিত সঙ্গত হইয়া উত্তর বিক্রমপুরকে পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছে। উত্তর বিক্রমপুরের এই পশ্চিম অংশে আরিয়ল বিল নামে একটি বৃহৎ বিল আছে। মৃত্তিকা দোঁআশ স্থানে স্থানে এঁটেল, কোনও কোনও স্থানের মৃত্তিকায় উদ্ভিজ পদার্থের সংমিশ্রণ থাকাতে উহা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। তিনদিকে নদী এবং মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ খাল থাকায়, বিক্রমপুরের ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা।

* শ্রীযুত আনন্দ নাথ রায়, বিক্রমপুর—২য় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা।

জলবায়ু ঃ—কর্কটক্রান্তির উত্তর সীমান্ত রেখা বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়াছে। সমুদ্রের উপকূলে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনাদের 'ব'-দ্বীপের উত্তরাংশে বিক্রমপুর অবস্থিত। ভূমি সমুদ্র হইতে অতি সামান্য উচ্চ। বিক্রমপুরের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। বর্ষাকালে সমস্ত ভূমি প্লাবিত হওয়ায় বায়ু আর্দ্র থাকে। মৌসুমিবায়ু প্রবাহিত হওয়ায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং মাঝে মাঝে প্রবল ঝড় তুফান উঠিয়া থাকে। বিক্রমপুরে বর্ষা আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। অধুনা এই ঋতুতে বিক্রমপুরের স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল থাকে না; কিন্তু পৌষ মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত বিক্রমপুরের স্বাস্থ্য বেশ ভাল থাকে। বসন্তকালে পদ্মার তটবর্ত্তী স্থানগুলি বিশেষ স্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। তখন ঐ সকল স্থানে অনেকে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য অবস্থান করিয়া থাকেন।

* **বিক্রমপুরের জনসংখ্যা ঃ**—উত্তর এবং দক্ষিণ বিক্রমপুরের জনসংখ্যা প্রায় ৯,১৩,৮৩৭। তন্মধ্যে হিন্দু ৪,১১,৯২৬ মুসলমান ৪,৯৪,৬৬৯ এবং ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী পুরুষ ও স্ত্রীলোক মোট ৭,২৪২। তন্মধ্যে পুরুষ ৪,০৭৯ স্ত্রীলোক ৩,১৬৩।

(ক) **উত্তর বিক্রমপুরের জনসংখ্যার বিবরণী ঃ—**

	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
হিন্দু ঃ—	১,৫৯,৪০৩	১,৭৪,৭৭৫	৩,৩৪,১৭৮
মুসলমান ঃ—	২,০৮,৭১০	২,১৪,০৩৫	৪,২২,৭৪৫
ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ঃ—	২,৭০৫	২,০৭৮	৪,৭৮৩

(খ) দক্ষিণ বিক্রমপুরের জনসংখ্যার বিবরণী ঃ—

	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
হিন্দু ঃ—	৩৮,১৭৬	৩৯,৫৭২	৭৭,৭৪৮
মুসলমান ঃ—	৩৪,৪৭৭	৩৭,৪৪৭	৭১,৯২৪
ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ঃ—	১,৩৭৪	১,০৮৫	২,৪৫৯

লুপ্তগ্রাম সমুহ ঃ—উত্তর ও দক্ষিণ বিক্রমপুরের বহুস্থান নদীর কুক্ষিগত হইয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ—সঙ্কট, শ্রীপুর, রাজনগর, জপসা, তারপাসা, রূপটা, ভোজেশ্বর, লড়িকুল, কানারগাঁ, পোঁড়াগাছা, আকসাইল, সোনারদেউল, গজনাইপুর, মূলপাড়া, মুলগা, দেভোগ, খিলগাঁ, খারচাকা, বকসীবাজার, রাজপাশা রাউতপাড়া, পশ্চিমপাড়া, নারিকেলতা, পশাইল, কান্দাপাড়া, রণক, নবীপুর, শ্যামপুর, বিলাসপুর, আমবাড়িয়া, দক্ষিণ সিমুলিয়া, পারগাঁ, গার্গের জোড়া, দিয়াপাড়া, হাসেরকান্দী, চণ্ডীপুর, বাউলাসার, হাত্‌রাভোগ, গোপালপুর, মজগুন্নী, ছয়পাড়া, গোকুলগঞ্জ, গোড়াইল, করণগাঁ, করগাঁ, চামালদি, বাসগাঁ মাইজপাড়া, একান্দল, লক্ষ্মীপুরা, কাঁচাদিয়া, সাড়া দগরী, আকিয়াধল, কালীপাড়া, বহর, কোমরপুর, বিদগাঁ, চাঁচুড়তলা রাজাবাড়ী, সাহাবাজনগর, বটেশ্বর, মাগুরখণ্ড, ভাস্কুলদী সোহাগদল, চৌদ্দহাজারী, রামনীল, ব্রাহ্মণগাও, ধানকুনিয়া, লৌহজঙ্গ, সেনহাটি, কোরহাটি, উয়ারি, ধলছত্র ইত্যাদি।—

নদ-নদীর ধ্বংসলীলা ঃ—মেদনাদ, পদ্মা এবং ধলেশ্বরীর ধ্বংসলীলায় বিক্রমপুর শতাধিক বর্ষ যাবৎ নিপীড়িত হইয়া হৃতসর্ব্বস্ব হইতে বসিয়াছে। পদ্মার এক ক্ষীণতোয়া স্রোতরেখা কালে বিশালমূর্ত্তি ধারণ করিয়া একে একে প্রাচীন রাজপাট সমতট (সঙ্কট), চাঁদ কেদারের শ্রীপুর, মহারাজ রাজবল্লভের "রতন-মণ্ডিত" রাজনগর গ্রাম ধ্বংস করতঃ কীর্ত্তিনাশা অপমান অর্জ্জন করিয়া আজ কয়েক বৎসরের মধ্যে দক্ষিণ ও উত্তরের প্রধান দুইটি কীর্ত্তি—পতাকা কার্ত্তিকপুরের 'মসজিদ' ও রাজাবাড়ীর মঠ কবলিত করিয়াছে; বিক্রম-

* বিস্তারিত জনসংখ্যার বিবরণ গ্রন্থের শেষভাগে দ্রষ্টব্য।

পুরের প্রাচীন তীর্থস্থান চাঁচুড়তলার কালীবাড়ী কুক্ষিগত করিয়া সহস্র সহস্র নরনারীকে 'ভিটে-মাটী'-ছাড়া করিয়া রুদ্র-তাণ্ডবে প্রবাহিত হইতেছে। অপরদিকে ধলেশ্বরীর অত্যাচারে বিক্রমপুরের উত্তর সীমান্ত-বাসী নিতান্ত উপদ্রুত। তদুপরি পুনঃ পুনঃ জল-প্লাবন। পেটের দায়ে বর্ত্তমান বিক্রমপুরের অধিকাংশ লোক পর-বাসী; প্রকৃতির নানা অত্যাচারে যাহারা নানা ক্লেশ সহ্য করিয়াও জন্মমাটী আশ্রয় করিয়াছিল, তাহারা ও অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ ধ্বংসলীলা আর কিছুকাল স্থায়ী হইলে হয়ত গৌড়-বঙ্গের সভ্যতার আদি নিকেতন বিক্রমপুর অচিরে নিচিহ্ন হইয়া শুধু-ইতিহাসের কলেব রঅলঙ্কৃত করিয়া থাকিবে।

পর-বাসী বিক্রমপুরবাসী :—বিক্রমপুরের বহুলোক কর্ম্মব্যপদেশে বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন প্রদেশে অবস্থান করিতেছেন। পৃথিবীতে এমন স্থান কমই আছে যেখানে বিক্রমপুরের কোন লোক নাই।—কর্ম্মনৈপুণ্যে, সাহসিকতায়, এবং বুদ্ধির প্রাখর্য্যে বিক্রমপুরবাসী ভারতে শীর্ষ-স্থানীয়। নদীর ভাঙ্গন-নিমিত্ত বাস্তুহীন হইয়া অনেকে জেলান্তরে গমন করিয়া স্থায়ী বসবাস নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কেহ বা কর্ম্মব্যপদেশে প্রদেশান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া পুরুষানুক্রমে তথায় বাস করিতেছেন। কিন্তু ইঁহারা বিক্রমপুরের অধিবাসী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেই গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকেন এবং বিক্রমপুরবাসিগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধাদি স্থাপন করিয়া পৈত্রিক-ভূমির সহিত বরাবর যোগসূত্র রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

বঙ্গের প্রাচীন সামাজিক ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়, উচ্চ শ্রেণীর অনেক-হিন্দু রাজ-কোপে নিপতিত হইয়া বিক্রমপুর হইতে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিলেন। চট্টল, ময়মনসিংহ ত্রিপুরার অনেক ব্রাহ্মণ-বৈদ্য কায়স্থের পূর্ব্বপুরুষ এক সময়ে বিক্রমপুরের অধিবাসী ছিলেন। ইঁহারা বিক্রমপুর সমাজে ছেলে মেয়ের বিবাহ দিতে পারিলে গৌরব বোধ করেন।

বিক্রমপুর-বাসীর ক্রমাগত বাস্তু পরিবর্ত্তন :—সার্দ্ধশতাধিক বৎসর যাবৎ ক্রমাগত নদ-নদীর অত্যাচারে বিক্রমপুরবাসিগণ পুনঃ পুনঃ বাস্তু পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইতেছেন। পৈত্রিক বাসভূমি এবং তৎসহ ভূসম্পত্তি নদী সীকস্থ হওয়ায় অনেক বুনিয়াদ-ঘর দুই, তিন বা তদধিক বার গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে আবাস পরিবর্ত্তন করিয়া একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন। এই কারণে বিক্রমপুর-বাসী অনেক ভদ্র সন্তানেরই নগদ অর্থ বল, অথবা যথেষ্ট খাস খামার ভূসম্পত্তি নাই। ঘরে খাওয়া-পরার যোগাড় না থাকায়-বিক্রমপুরবাসিগণ বিদেশে গমন করিয়া চাকুরী বা অন্য কর্ম্মদ্বারা বহুদিন যাবৎ জীবিকার সংস্থান করিয়া আসিতেছেন। ফলে কি বিদ্যাবুদ্ধিতে কি কর্ম্ম-তৎপরতায় ইঁহাদের সমকক্ষ লোক ভারতে দুর্ল্লভ। বিক্রমপুরের একটি গ্রামে যত গ্রাজুয়েট আছেন, অন্য জেলায় একটি পরগণায় ও হয়ত তত গ্রাজুয়েট মিলিবে না। ভারতের কোন ও স্থানে বিক্রমপুরবাসীর মত এত অধিক লোক উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত নাই।

শিক্ষা বিস্তারে বিক্রমপুর :—সুপ্রাচীন কাল হইতে বিক্রমপুর বিদ্যাশিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। হুয়েঙ্গসাঙ্ সমতটে ৩৯ বৌদ্ধবিহার দেখিয়াছিলেন বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল বিহার বৌদ্ধদের রেসিডেনসিয়াল ইউনিভার্সিটির মত ছিল। বিক্রমপুরের অন্যতম প্রধান বৌদ্ধ পণ্ডিত শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর তিব্বতে বৌদ্ধমত প্রচার

করিয়াছিলেন। ন্যায়, জ্যোতিষ, কাব্য ব্যাকরণ এবং আয়ুর্ব্বেদের আলোচনায়—বিক্রমপুরের পণ্ডিতগণ সেকালে ভারতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বিক্রমপুরের পণ্ডিতগণ স্বয়ং পঞ্জিকা গণনা করিতেন, এককালে ভূগোল-শাস্ত্রের ভূমধ্য রেখা বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া অতিক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া কল্পিত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্র সাহিত্য-দর্পণ সম্ভবতঃ বিক্রমপুরে রচিত হইয়াছিল। মহারাজ বল্লাল এবং তৎপুত্র লক্ষ্মণ সেনের সংস্কৃত কবিতা সুধী সমাজে বিশেষ আদরণীয়।

বিক্রমপুরের বৈদ্যগণ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার এক বিশিষ্ট ধারা উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইদানীন্তন যুগে স্বর্গত গঙ্গাপ্রসাদ সেন ঐ প্রণালীর চিকিৎসা দ্বারা জগৎবাসিগণকে স্তম্ভিত করিয়া আয়ুর্ব্বেদের লুপ্ত গৌরব আংশিক উদ্ধার করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন! ইংরেজ আমলের পূর্ব্বে স্বর্গীয় শিবচন্দ্র সেন ও মহিলাকবি স্বর্গীয় আনন্দময়ী কাব্য রচনায় অসামান্য প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। মুসলমান শাসন কালে বিক্রমপুরে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য অনেক টোল এবং পারসী আরবী শিক্ষার জন্য অনেক মক্তব প্রতিষ্ঠিত ছিল।—ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হইলে বিক্রমপুরবাসিগণ সর্ব্বাগ্রে ঐ শিক্ষা বিস্তারে কৃতযত্ন হন। কালীপাড়ার জমিদারবাবুগণের যত্নে বিক্রমপুরে সর্ব্বপ্রথম ইংরেজী উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ক্রমে বজ্রযোগিনী,মালখাঁনগর প্রভৃতি গ্রামে অনেক উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিক্রমপুরের অনেক কৃতী সন্তান কালীপাড়া বিদ্যালয়ের ছাত্র। বিক্রমপুরের অন্যতম রত্ন স্বর্গীয় গুরুপ্রসাদ সেন পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বপ্রথম এম, এ।

বর্ত্তমানে উত্তর ও দক্ষিণ বিক্রমপুরে ৬১টী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় এবং ৩৫টী মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় ও দুই শতাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। টোল এবং মক্তবের সংখ্যা প্রায় ২৫০। বিক্রমপুরের অন্যতম ধনকুবের ভাগ্যকুলের রায় শ্রীযুত হরেন্দ্রলাল রায় বাহাদুর মহোদয়ের অর্থানুকুল্যে ও উদ্যমে মুন্সীগঞ্জে একটি অবৈতনিক কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নানা কারণে উহা উঠিয়া গিয়াছে। রামপালে একটি কলেজ স্থাপনায় স্বর্গগত দেশবন্ধুর একান্ত আগ্রহ ছিল, বিক্রমপুরের কতিপয় কৃতবিদ্য সন্তান দেশবন্ধুর এই কামনা পূর্ণ করিবার চেষ্টায় আছেন।

বিক্রমপুরের নদ-নদী :—বিক্রমপুরের প্রধান নদীর সংখ্যা চারিটি যথা,—

মেঘনাদ (১) :—ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব্ব সীমা দিয়া প্রবাহিত হইয়া ঢাকা জেলার পূর্ব্বোত্তর দিয়া আসিয়া বিক্রমপুরের পুর্ব্ব সীমা ধৌত করিয়া ত্রিপুরা হইতে ঢাকা ফরিদপুরের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতঃ ঢাকা জেলার দক্ষিণ-পূর্ব্ব এবং ফরিদপুর জেলার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে আসিয়া পদ্মার সহিত মিলিয়া দক্ষিণ বাহিনী হইয়াছে। গাড়ো, কাছাড় এবং শ্রীহট্টের পাহাড়ের অনেক ছোট ছোট নদী মিলিয়াই মেঘনাদ উৎপন্ন হইয়াছে।

মেঘনাদের জলরেখা সমুদ্রের প্রায় সমসূত্রে থাকায়, বিশাল হইলেও এই নদের স্রোতের বেগ অপেক্ষাকৃত কম। উদ্ভিজ ও জান্তব পদার্থের মিশ্রণে ইহার জল কৃষ্ণবর্ণ। এত অধিক মৎস্য পৃথিবীর অপর কোন নদীতে দৃষ্ট হয় না। বিক্রমপুরের কয়েকটি প্রধান বাজারে প্রচুর মেঘনাদের মাছ বিক্রীত হইয়া থাকে। লৌহজঙ্গ, মীরকাদিম এবং বহর ষ্টেশন হইতে ঐ সকল মাছ নানা জেলায় প্রেরিত হয়। স্রোত না থাকায়,

মেঘনার ইলিশ মৎস্য স্বাদহীন ও কদাকার। মেগেস্থিনিস তদীয় ভ্রমণ বৃত্তান্তে এই নদকে 'মেগোন'-নামে অভিহিত করিয়াছেন।

মেঘনাদ হইতে অনেক ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর উদ্ভব হইয়াছে, তন্মধ্যে সুবর্ণরেখা বা সেরাজাবাদের নদী উত্তর বিক্রমপুরের পূর্ব্ব সীমা ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। অপর কাচিকাটার নদী কীর্ত্তিনাশার সহিত মিলিত হইয়াছে।

ধলেশ্বরী (২) :—যমুনা হইতে প্রাচীন, কিন্তু অধুনা ইহা যমুনার শাখা নদী বলিয়াই গণ্য। পূর্ব্বে ইহা করতোয়া এবং আত্রেয়ীর সহিত ছুরা সাগরের সহিত মিলিত ছিল। শেষে যমুনার সহিত মিলিয়া করতোয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ময়মনসিংহের অন্তর্গত সলিমাবাদের নিকট যমুনা হইতে বাহির হইয়া মাণিকগঞ্জ, সাভার প্রভৃতি স্থান দিয়া নারায়ণগঞ্জ কলাগাছিয়ার নিকট লক্ষ্যা এবং মেঘনাদের সহিত মিলিত হইয়াছে। বিক্রমপুরের কয়েকটি প্রসিদ্ধ বন্দর তালতলা, ফিরিঙ্গীবাজার, রিকাবিবাজার মীর-কাদিম প্রভৃতি ইহার দক্ষিণ তটে অবস্থিত। বিক্রমপুরের উত্তর সীমান্তের অনেক স্থান ইহার কুক্ষিগত হইয়াছে।

বর্ষাকালে বিক্রমপুরের উত্তর পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত কলাগাছিয়ার ত্রিস্রোতার সঙ্গমস্থান অতি ভীষণ আকার ধারণ করে।

ধলেশ্বরীর নিম্নলিখিত প্রধান শাখা কয়টি বিক্রমপুরের মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়াছে :—

(ক) ইছামতী নদী।

(খ) তালতলার খাল, পদ্মার সহিত যাইয়া মিশিয়াছে।

(গ) মীরকাদিমের খাল, সেরাজাবাদের নিকট মেঘনা নদীতে পড়িয়াছে।

(ঘ) শ্রীনগরের খাল তারাটিয়া খালে পড়িয়াছে।

পদ্মা (৩) :—ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণ ও দেবীভাগবতে-পদ্মার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পদ্মা গঙ্গার শাখা নদী। আইন-ই-আকবরী এবং ডি, বেরোসের মানচিত্রে 'পদ্মার' নাম দেওয়া হইয়াছে, **বড়নদী**।

প্রাচীনকালে পদ্মা ফরিদপুর জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বাখরগঞ্জের কন্দর্পপুর নামক স্থানের সন্নিকটে মেঘনার সহিত মিলিত হইয়াছিল। এই প্রবাহই এখন আড়িয়ল খাঁ নামে পরিচিত।

মেজর রেণেলের মানচিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, পদ্মা বিক্রমপুরের অনেক পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভুবনেশ্বর-নদের সহিত সঙ্গত হইয়াছে।

পদ্মার গতি-পরিবর্ত্তন এক অদ্ভুত ব্যাপার। আজ যেখানে অথই জল, কাল সেখানে চড়া; আজ যেখানে ক্ষীণধার গণ্ডুষ জলে সফরীর ক্রীড়া, কালে সেখানে প্রবল প্রবাহে হাঙ্গর কুম্ভীরের সঞ্চরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

"ব্রহ্মপুত্র মেঘনাদের সহিত মিলিত হইয়া যখন প্রবাহিত হইত, তখন উহার স্রোতোবেগ প্রবল থাকায় পদ্মাকে বহু পশ্চিমে রাখিয়াছিল। পরে আবার যখন ব্রহ্মপুত্রের সহিত মেঘনাদের ততটা সম্বন্ধ রহিল না এবং ব্রহ্মপুত্র যমুনার অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া গোয়ালন্দের নিকট পদ্মার সহিত সম্মিলিত হইল, তখন পদ্মার বেগই প্রবল হইয়া ক্রমে পশ্চিম দিক পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার ফলস্বরূপই কীর্ত্তিনাশা ও নয়াভাঙ্গনী নদীর উদ্ভব।" *

* শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় (ঢাকার ইতিহাস ১ম খঃ ৪২পৃঃ

১৭৮০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে কীর্ত্তিনাশার নাম দৃষ্ট হয় না, বিক্রমপুরের রাজনগর এবং ভদ্রেশ্বরের মধ্যে প্রাচীন কালীগঙ্গার শেষ চিহ্ন স্বরূপ একটি অতি ক্ষীণা স্রোতঃস্বিনী বর্ত্তমানা ছিল। পরে শত বৎসরের মধ্যে ঐ স্রোতধারা 'রথখোলার খাল' "ব্রহ্মবধিয়া, কাথারিয়া"—নাম প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে বিশালাকার ধারণ করতঃ চাঁদকেদার, নওপাড়ার চৌধুরীদের কীর্ত্তি ধ্বংস করিয়া সর্ব্বশেষ রাজনগরের কীর্ত্তি-সৌধমালা কুক্ষিগত করিয়া কীর্ত্তিনাশা নাম সার্থক করিয়াছে। চাঁদকেদারের শেষ কীর্ত্তি-চিহ্ন বিখ্যাত 'রাজা বাড়ীর' মঠ আজ কতিপয় বৎসর হইল ইহার উদরে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

কীর্ত্তিনাশা বর্ত্তমান বিক্রমপুরকে দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়াছে, বিক্রমপুরের উত্তর অংশ ঢাকা জেলার অন্তর্গত; দক্ষিণাংশ ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত।

পদ্মা হইতে নির্গত পয়ঃপ্রণালী মধ্যে নিম্নলিখিত খাল কয়টি বিশেষ উল্লেখ যোগ্যঃ—মৈনটের খাল, ইলিসামারী, তরতিয়া, বহরের খাল। দক্ষিণ বিক্রমপুরে, ভোজেশ্বর, ঘড়িসার, নড়িয়ার খাল, মহিষ খোলার খাল ইত্যাদি।

প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র (৪)ঃ—প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র এখন লুপ্ত। সম্ভবতঃ এক সময়ে ইহা কার্ত্তিকপুর সুজাবাদের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইয়া নলমুড়ির কিঞ্চিৎ উত্তরে মেঘনাদের সহিত মিলিত হইয়াছিল।

বিক্রমপুর, জৈনসার মধ্যপাড়া ও ধাইরপাড়ার নিকটে একটি জলধারাকে লোকে পোড়াগঙ্গা বলিয়া থাকে। হয়তঃ কোনও সময়ে উহা কালীগঙ্গার অংশ ছিল। সেরাজদীঘার নীচে লুপ্তাবশিষ্ট ইচ্ছামতীর চিহ্ন বর্ত্তমান। লৌহজঙ্গ বন্দরের পূর্ব্বদিক দিয়া পদ্মার একটি শাখা-উত্তর গামিনী হইয়া ধানকুনিয়া, কনকসার, কোরহাটী, হলদিয়া, হাসাড়া প্রভৃতি গ্রামের মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়া ধলেশ্বরীর সহিত মিশিয়াছে, এই বৃহৎ খাল এবং তালতলার খালটি উত্তর বিক্রমপুরকে চার ভাগে বিভক্ত করিয়াছে।

দক্ষিণ বিক্রমপুরের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ খাল কাঞ্চনপাড়ার খাল একদিকে মেঘনার সহিত মিলিয়াছে, অপরদিকে ভোজেশ্বরের খালের সহিত মিশিয়া পদ্মায় পতিত হইয়াছে।

এই সকল নদনদী খাল এবং অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণিত এবং স্বাভাবিক জলপ্রণালীর প্রাচুর্য্য থাকায় বিক্রমপুরে নৌবাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ভূমি অপেক্ষাকৃত নিম্ন হওয়ায় যানবাহনের তেমন সুযোগ নাই, কিন্তু বৎসরের নয়মাস কাল বিক্রমপুরের মহাজনগণ নৌকা যোগে অক্লেশে মালপত্র আমদানী ও রপ্তানী করিয়া থাকে। ফলে এই সকল নদীর পারে বহু হাট-বাজার ও বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছে।

বিক্রমপুরের প্রধান বন্দর, হাট-বাজার ঃ—

ভাগ্যকূল, লৌহজঙ্গ, ধানকুনিয়া, দীঘিরপাড়, হলদিয়া, গাওদিয়া, আবদুল্লাপুর, কনকসার, ফিরিঙ্গীবাজার, রিকেবিবাজার, মীরকাদিম, মুন্সীগঞ্জ, ছটফটিয়াবাজার, তালতলা, সেরাজদীঘা, কমলাঘাট, টঙ্গিবাড়ী, শ্রীনগর, বহর প্রভৃতি উত্তর বিক্রমপুরের প্রধান বন্দর।

ভোজেশ্বর, পালং, নড়িয়া, ঘড়িসার, কার্ত্তিকপুর, ভেদেরগঞ্জ, মুলফৎগঞ্জ, ডোমসার প্রভৃতি দক্ষিণ বিক্রমপুরের প্রধান বন্দর।

পূর্ব্বে সেরাজাবাদ, ইছাপুরা, হাসাইল, রাজানগর, হাঁসেরকান্দী প্রভৃতি স্থানে নীলের কুঠী ছিল।

মুন্সীগঞ্জের নিকট কমলাঘাটার কার্ত্তিক-বারুণীর মেলা, বিক্রমপুরের সর্ব্বপ্রধান ও প্রাচীন মেলা। আজ কয়েক বৎসর হয়, ইহা লুপ্ত হইয়াছে। রাজনগরের বিখ্যাত কাল-বৈশাখীর মেলার কথা এখনও প্রাচীনগণ গৌরবের সহিত উল্লেখ করিয়া থাকেন। দক্ষিণ বিক্রমপুরে কার্ত্তিকপুরের মেলায় ও বহুজিনিষ আমদানী রপ্তানী এবং নানা আমোদ প্রমোদ হইত।

মুন্সীগঞ্জের উত্তর প্রান্তেই প্রাচীন গঙ্গানগর বা গঙ্গারাড়ী বন্দর অবস্থিত ছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই গঙ্গানগর এবং শ্রীপুর একসময়ে বিক্রমপুরের প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল। মহারাজ রাজবল্লভের "রাজসাগরের" হাট জনাকীর্ণ সুবৃহৎ বন্দর ছিল। অধুনা নিম্নলিখিত স্থানগুলি বিক্রমপুরের প্রধান কারবারের স্থান ঃ—

(ক) পদ্মাতীরে ঃ—

ভাগ্যকূল—পাট ও কাঠের আমদানী ও রপ্তানীর স্থান।

যশইলদা—জোলাদের তৈয়ারী কাপড় এবং কাঠের ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

মাওয়া—এখানে আসাম হইতে আনীত প্রচুর কাঠ, মুলিবাঁশ বিক্রয় হয়।

লৌহজঙ্গ বা তারপাশা—বিক্রমপুরের সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য বন্দর। প্রাচীন বন্দর পদ্মার কুক্ষিগত। এখানে বহুসংখ্যক কাসাপিত্তলের কারখানা, জুতা, ট্রাঙ্ক মনোহারী জিনিস, মিঠাই ও কাপড়ের দোকান এবং মোজা-গঞ্জি, ও সোডার কল আছে। অনেক পাটের আড়ত, বেত-খলফা, তৈল ও বাঁশ বিক্রয়ের বড় দোকান আছে। দুইটি পুস্তকের দোকান এবং কয়েকটি ঔষধালয়ও আছে। প্রচুর যুগির কাপড়, এই বন্দরে বিক্রয় হয়। তারপাশা ষ্টেশন বিক্রমপুরের আমদানী রপ্তানীর প্রধান দ্বার।

দিঘীর পাড়—মৎস্য ও কাঠের জন্য এই হাট বিশেষ প্রসিদ্ধ।

বহর—প্রাচীন বন্দর পদ্মার কুক্ষিগত। বহর ষ্টেশন হইতে প্রচুর মৎস্য নানাস্থানে প্রেরিত হয়।

(খ) দক্ষিণ বিক্রমপুরে ঃ—

পালং—এখানে পিত্তল-কাঁসার বাসন তৈয়ারীর অনেক কারখানা আছে। এই স্থানে এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের নিম্ন শ্রেণীর লোকগণ তামা-কাঁসার জিনিস বিক্রয় এবং কুম্ভকারের হাঁড়ি পাতিলের 'গাওয়াল'* করিয়া থাকে। এখানে মারোয়ারীদের পাটের আড়ত ও আছে।

ভোজেশ্বর—পাটের গুদাম ও কাঠের কারবারের জন্য প্রসিদ্ধ।

নৈরা—একটি প্রধান সমৃদ্ধিশালী বন্দর। এখানে অনেক দুধ বিক্রয় হয়। গোয়ালাগণ প্রচুর দুগ্ধজাত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া থাকে।

মুলফৎগঞ্জ—এখানে খুব বড় হাট মিলে।

ডোমসার—রসগোল্লা ও ছানার জিনিষের জন্য বিখ্যাত।

চিকন্দী—এখানে প্রচুর ক্ষীর প্রস্তুত হইয়া নানা-স্থানে রপ্তানী হয়।

ঘড়িসার—কার্ত্তিকপুর—দুইটি পরস্পর সংলগ্ন বন্দর। পূর্ব্বে সুপারীর জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ঘড়িসারে পাটের গুদাম

* পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া নৌকা যোগে অথবা মাথায় বোঝা লইয়া জিনিসের বিনিময়ে ধান্য লইয়া ব্যবসায় করাকে বিক্রমপুর অঞ্চলে "গাওয়াল" বলে।

আছে। তিন মাস স্থায়ী মেলায় বহু বাজে মাল বিক্রয় হয় বিস্তৃত কাঠের ব্যবসায়ের স্থান। প্রসিদ্ধ সুরেশ্বরের খেজুর গুড় প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হয়।

ভেদেরগঞ্জ—একটি বড় হাট। এখানে যথেষ্ট বালাম চাউল আমদানী হইয়া থাকে এবং প্রচুর সুপারী বিক্রয় হয়।

(গ) ধলেশ্বরীর তটে অবস্থিত প্রধান বন্দর যথা :—

তালতলা—পাট ও কাঠের ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ। ধলেশ্বরী ইহার অনেক অংশ নষ্ট করিয়াছে।

মীরকাদিম—অনেক রবি শস্যের আড়তদারী দোকান আছে।

আবদুল্লাপুর—একটি উৎকৃষ্ট বাজার। এখানে প্রচুর পরিমাণে কারুকার্য্যপূর্ণ সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হয়।

ফিরিঙ্গিবাজার, রিকিববাজার—ইংরেজ আমলের পূর্ব্ব হইতেই পর্ত্তুগীজগণ এখানে আসিয়া বাণিজ্য করিত। উহাদের কতক ফিরিঙ্গি নামে পরিচিত হইয়া এখানে স্থায়ী উপনিবেশ স্থাপন করে। বর্ত্তমানে ঐ সকল ফিরিঙ্গি সন্তান অতি হীনাবস্থায় কালযাপন করিতেছে।

মুন্সীগঞ্জ,—রামপালের গুড়, কলা, মুলা, কফি, বেগুন, শাক, সব্জী—এখানে প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হইয়া থাকে।

(ঘ) ইছামতীর তীরে অবস্থিত বন্দর :—

সেরাজদিঘা—পাটের আড়ত, পাথুরিয়া কয়লা, লবণ প্রভৃতির বড় বড় কারবার আছে।

বাড়ৈখালি—একটি উৎকৃষ্ট বাজার। এখানে ডেঙ্গার কই মাছ ও প্রচুর শাক-আলু বিক্রয় হয়। অনেক নৌকা প্রস্তুতের শিল্পী আছে।

(ঙ) খালের পারে অবস্থিত বন্দর :—

খরিয়া—প্রতি মঙ্গলবার হাট বসে। প্রতি হাটে বার তের হাজার টাকার কাপড় বিক্রয় হয়। একটি বড় 'বেদের বহর' আছে। বহু পরিমাণে আসাম হইতে আনীত কাঠ বিক্রয় হয়। অনেক নৌকা প্রস্তুতের শিল্পী আছে।

হলদিয়া—বিক্রমপুরের একটি সমৃদ্ধিশালী প্রসিদ্ধ বন্দর, স্বনাম প্রসিদ্ধ খালের তীরে অবস্থিত। পূর্ব্বে বন্দরটি কালীপাড়ার বাবুদের অধিকারে ছিল, কিন্তু ইদানীং গবর্ণমেণ্টের দখলে আছে। এখানকার জোলাদের তৈয়ারী কাপড় বিভিন্ন জেলায় আদর লাভ করিয়াছে। লৌহ—ব্যবসায়ের জন্য এস্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ। এ অঞ্চলের হল্‌দিয়াতেই সর্ব্বপ্রথম কাঠের 'থল' স্থাপিত হয়। হল্‌দিয়ার বাদসাভোগ মেঠাই অতি উপাদেয়। অনেক বড় বড় ঔষধের দোকান আছে। এখানকার বাজনাদারগণ নানা জেলায় প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছে।

গয়ালীমান্দ্রা—মহারাজ রাজবল্লভ হইতে প্রাপ্ত গয়াধামের মোহন্তের ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি। বন্দরে প্রচুর শালকাঠ আমদানী হয়। স্থানীয় রিষিগণ প্রচুর অসংস্কৃত চামড়া সংগ্রহ করিয়া বিদেশে রপ্তানী দিয়া থাকে।

শ্রীনগর—প্রসিদ্ধ ভূম্যাধিকারী লালা কীর্ত্তিনারায়ণ শ্রীনগর পত্তন করেন। অতিথিশালা আজিও তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। "প্রতি বৎসর এই বন্দরে প্রায় ৩৷৹ লক্ষ টাকার পাট খরিদ বিক্রয় হয়।"* রথের মেলা বিশেষ প্রসিদ্ধ।

দেউলভোগ—হাটে গরু ও ঘোড়া বিক্রয় হইয়া থাকে।

* বিক্রমপুর ৪র্থ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা। শ্রীযুত নগেন্দ্রলাল চন্দ।

ষোলঘর—রেণেলের ম্যাপে এই গ্রাম অঙ্কিত আছে। ডেঙ্গার কই মাছ এবং কাজীবাড়ীর আম বঙ্গে বিখ্যাত।

মোহনগঞ্জ, রাজনগর—পাট ও ধান চাউলের কারবারের জন্য প্রসিদ্ধ।

গাউদিয়া—রেণেল ইহাকে ধাউদিয়া বলিয়া লিখিয়াছেন। বড় হাট মিলে। ধান ও খৈল বিক্রয়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

কলমা—গ্রামে একটি বটগাছের নাম 'কালাপাহাড়'। জনশ্রুতি এই—প্রতিমাভঙ্গকারী ইতিহাস প্রসিদ্ধ কালাপাহাড় কোনও সময়ে এই বৃক্ষের নীচে বিশ্রাম লইয়া ছিলেন। নৌকা বিক্রয়ের জন্য কলমার হাট প্রসিদ্ধ।

ভোগদিয়া—ধান বিক্রয়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

শিমুলিয়া—প্রতি মঙ্গলবার হাটে ১২।১৩ হাজার টাকার কাপড় বিক্রয় হয়।

ভাওয়ার—বাঁশ, ঘাস, ছাগ ও কচ্ছপ বিক্রয়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

নাগের হাট—জোলাগণ উৎকৃষ্ট কাপড় তৈয়ার করে। কুম্ভকারগণ মৃৎশিল্পের কাজে বিশেষ দক্ষ। ৺ তিলকচন্দ্র পাল সে কালের একজন নিপুণ শিল্পী ছিল।

দক্ষিণ চারিগাও—লেবু ও শাকসব্জীর জন্য প্রসিদ্ধ।

নওপাড়া—খুব উৎকৃষ্ট পাট জন্মে।

শিলিমপুর, শুবচনী—বড় হাট মিলে। পান ও খেজুরী গুড় বিক্রয়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

শেখের নগর—রেলের মানচিত্রে নাম শেখীনগর। হাটটি প্রসিদ্ধ।

টঙ্গিবাড়ী—এখানে একটি দীর্ঘিকার মধ্যে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের জলটঙ্গ অবস্থিত ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য—পান, গুড় ও তরকারী।

মাকুহাটি—রেণেলের মানচিত্রে লিখিত আছে। বিক্রমপুরে বস্ত্র শিল্পের উন্নতির যুগে এখানে প্রচুর তাঁতের 'মাকু' ক্রয় বিক্রয় হইত।

সেরেজাবাদ—রেণেলের মানচিত্রে উল্লেখ আছে। অদ্যাপি নীলের কুঠির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত ও ক্ষীর প্রস্তুত হয়।

আরিয়ল—হাটে অনেক নৌকা বিক্রয় হয়। এখানে ৫।৬ হাজার 'কাগজি'র বাস। পূর্ব্বে এই কাগজি মুসলমানগণ প্রচুর দেশীয় কাগজ প্রস্তুত করিত। এখনও পুস্তকের মলাটের জন্য ইহারা কিছু কিছু কাগজ প্রস্তুত করিয়া থাকে।

ভীরুজ খাঁ—গরু ও ঘোড়া বিক্রয়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

হাসাইল—এখানে পূর্ব্বে নীলের কুঠি ছিল। হাটটি বেশ বড়।

কাটাখালী—অনেকগুলি পাটের গুদাম আছে। এই বন্দরে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার পাট খরিদ বিক্রয় হয়। *

(চ) দক্ষিণ বিক্রমপুরের খালের পারের বন্দর ঃ—

কাঞ্চনপাড়া—ধান চাউল এবং খেজুর গুড় প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হয়।

গঙ্গানগর, চিকন্দী—প্রচুর গব্যঘৃত এবং ক্ষীর নানা স্থানে রপ্তানী হয়।

পণ্ডিতসার—পুস্তকের দোকান, প্রেস এবং কয়েকটি কাঠের দোকান আছে।

মাঐসার—প্রসিদ্ধ শ্রীশ্রী৺দিগম্বরী তলায় প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ হইতে ৭ দিবস ব্যাপী সুবৃহৎ মেলা মিলিয়া থাকে।

সেনের বাজার—উৎকৃষ্ট খেজুর গুড় বিক্রয় হয়।

বুড়ীর হাট—বিক্রমপুরের দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তী এই হাটে প্রচুর গরু, নৌকা এবং উলুখড় বিক্রয় হয়।

এই সকল বন্দর ব্যতীত বিক্রমপুরে অভ্যন্তর ভাগে আরও কতকগুলি বড় হাট বাজার আছে যথা, ভরাকৈর, কনকসার, বেজগাঁ, কামারখাড়া, ব্রাহ্মণগাঁ, হরলালগঞ্জ, ডহরী, বালিগাঁ, কুমারভোগ, মাইজপাড়া, রাড়ীখাল, বাসাইল, বীরতারা, লক্ষ্মীনারায়ণগঞ্জবন্দর, সিংপাড়া, ইছাপুরা, তন্তর, বিবন্দী, ইমামগঞ্জ; বেজেরহাটী, আউটসাহী, তারাটিয়া, ভীলাকান্দি, করিমগঞ্জ, পঞ্চসার, খালিপাশা, গারুরগাও, বাঘিয়া, ছয়গা, সোনারং, মধ্যপাড়া, ভবাণীপুর ইত্যাদি।

* শ্রীসুধাংশুমোহন চট্টোপাধ্যায় (Jute Report 1927).

—অনুন্নত নদীবহুল দেশ বলিয়া বিক্রমপুরে রাস্তার প্রাচুর্য্য নাই। রেণেলের মানচিত্রে উত্তর দক্ষিণ বিক্রমপুর ব্যাপিয়া একটি বৃহৎ বর্ত্ম অঙ্কিত আছে। ঐ রাস্তা দক্ষিণ বিক্রমপুরের মুলফৎগঞ্জ হইতে আরম্ভ হইয়া অপসা লড়িকুল হইয়া রাজনগর পর্য্যন্ত, তথা হইতে কালীগঙ্গা অতিক্রম করিয়া উত্তরাভিমুখে ধানকুনিয়া সেরাজদীঘা হইয়া ঢাকার দিকে চলিয়া গিয়াছে। অপর প্রাচীন রাস্তার নাম "কাচকির দরজা"। এই রাস্তা ইদিলপুরের প্রান্তবর্ত্তী দেওভোগ হইতে আরম্ভ হইয়া ঐ মুলফৎগঞ্জের রাস্তার সহিত মিলিয়াছিল এবং বক্রগতিতে নানামুখী হইয়া উত্তর বিক্রমপুরের মধ্যদিয়া ধলেশ্বরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই রাস্তার একটি শাখা মেঘনার তট হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমদিকে বরাবর পদ্মাতট পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। বর্ম্ম ও সেনরাজগণের সময়ে যে সমস্ত রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছিল তাহার অনেকাংশ এই কাচকীর দরজার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। চাঁদরায় কর্ত্তৃক এই রাস্তার পত্তন আরম্ভ হইয়া কেদাররায়ের সময়ে পরিসমাপ্ত হয়। কিম্বদন্তী এই, রাণীর নিমিত্ত সুবিধামত কাচকী নামক ক্ষুদ্র মৎস্য সরবরাহ করিবার জন্য এই রাস্তাটী নির্ম্মিত হইয়া এইরূপ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। বিক্রমপুরের অপর একটি প্রাচীন বর্ত্মের নাম, "মুকুটপুরের দরজা"। এই রাস্তাটি বিশেষ প্রশস্ত ছিল।

ইছামতীর তটস্থ পাথরঘাটা হইতে একটি রাস্তা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া কাজিশাল, আসোরা আলমপুর প্রভৃতি গ্রামের মধ্যদিয়া চুড়াইনের নিকট সুর্দ্দার রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে; ইহার অপর শাখা ষোলঘর হইয়া মুরপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আর একটি রাস্তা মীরগঞ্জ, আবদুল্লাপুর, মীরকাদিম, ফিরিঙ্গিবাজার প্রভৃতি স্থানের মধ্যদিয়া ইদ্রাকপুর পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত হইয়াছে।

কার্ত্তিকপুরের পূর্ব্বভাগে খালের উত্তর পার হইতে একমাইল ব্যাপী একটি প্রাচীন রাস্তা আছে, ঐ রাস্তাটি এবং উহার উপরে হস্তি পৃষ্ঠ সদৃশ সুন্দর ইষ্টক নির্ম্মিত পুলটি জিন্দারখাঁ নামক এক দস্যু কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল এইরূপ কিম্বদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন রাস্তাগুলির অনেকাংশ ধ্বসিয়া গিয়া হালটে পরিণত হইয়াছে, কতকাংশ নব নির্ম্মিত রাস্তার সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

নূতন রাস্তা—মুন্সীগঞ্জের রাস্তা—এই রাস্তাটী মুন্সীগঞ্জের সহর হইতে উত্তরে ধলেশ্বরী তীরে অবস্থিত বারুণীঘাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মুন্সীগঞ্জের দক্ষিণ কাটা খালী হইতে একটি রাস্তা পদ্মাতটে রাজাবাড়ী পর্য্যন্ত ১০ মাইল বিস্তৃত। মুন্সীগঞ্জ হইতে অপর একটি রাস্তা ফিরিঙ্গিবাজার, রিকাবীবাজার, মীরকাদিম, আবদুল্লাপুর, তালতলা, ইছাপুরা, সিংপাড়া, হইয়া ১৮ মাইল দুরবর্ত্তী শ্রীনগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। শ্রীনগরের নিকট ইহা অতিশয় উচ্চ। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ইহার নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়, ৩।৪ বৎসরে শেষ হইয়াছিল। জৈনসারের রাস্তা বজ্রযোগিনীর রাস্তা, কাটাখালীর রাস্তা, সা আলিসার দরজা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটী রাস্তাও উল্লেখযোগ্য। উত্তর বিক্রমপুরের পশ্চিমাংশে রাস্তার সংখ্যা খুব কম।

দক্ষিণ বিক্রমপুরের পালংএর রাস্তা দক্ষিণদিকে বুড়ির হাটের উপর দিয়া ইদিলপুর পর্য্যন্ত এবং উত্তরদিকে কেদারপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে, নড়িয়ার রাস্তা নড়িয়া হইতে ঘড়িসার পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই রাস্তাগুলির সহিত প্রাচীন কাচকির দরজা স্থানে স্থানে মিশিয়া গিয়াছে। ঘড়িসার হইতে কার্ত্তিকপুর পর্য্যন্ত ২½ মাইল ব্যাপী রাস্তাটী কার্ত্তিকপুরের জমিদার মুন্সী চৌধুরী সাহেবদের নির্ম্মিত। বিঝারী হইতে একটী রাস্তা মাঐসার পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে।

বিক্রমপুরের শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রের পাশ দিয়া বক্রগতিতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথ চলিয়া গিয়াছে, এসকল পথকে 'হাতাল' বলে। দুই ক্ষেত্রের মধ্যস্থিত আলি গুলিই ঐ সকল পথ। ঐ সকল পথের পার্শ্বে পূর্ব্বে কিছু কিছু পতিত জমি থাকিত। ঐ সকল জমি গোচারণের জন্য ব্যবহৃত হইত। পাটের টাকার লোভে ঐ সকল গোপাট এক-রকম লোপ পাইয়াছে, হাতালগুলি নামে মাত্র বিদ্যমান আছে। বর্ষায় প্লাবনে মাঠের সহিত হালট ডুবিয়া যায়। তখন উহার মধ্যদিয়া ছোট ছোট নৌকা চলিয়া থাকে।

অনেকে বলেন রাস্তা অপেক্ষা বিক্রমপুরে খালের উপযোগিতা বেশী। লুপ্ত পয়ঃ প্রণালীগুলি সংস্কৃত হইলে, এবং আবশ্যক মত নূতন খাল কর্ত্তিত হইলে, বিক্রমপুরের

ব্যবসায়-বাণিজ্যের বারমাস সুবিধা হইতে পারে, এবং এইরূপে জলনিকাশের সুবন্দোবস্ত হইলে বিক্রমপুরের আভ্যন্তরভাগেও স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে পারে। ঐ সকল খালের মধ্যদিয়া স্বচ্ছন্দক্রমে জল চলাচল করিতে পারিলে বেগ কমিয়া ধলেশ্বরী ও পদ্মার ভাঙ্গন এবং প্লাবন কিছু কমিতে পারে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস আছে।

যানবাহন—বিক্রমপুরবাসীর বর্ষাকালের গমনাগমনের প্রধান অবলম্বন নৌকা। বিক্রমপুরের ছোট নৌকাকে ডিঙ্গি বলে। 'বৈঠা' বা 'লগিয়' সাহায্য বিক্রমপুরের মাঝিগণ ডিঙ্গি নৌকা চালাইতে বড়ই নিপুণ। তালগাছ খুদিয়া একরকম নৌকা তৈয়ার হয়, উহার নাম 'খোদা'। দক্ষিণ বিক্রমপুরে পূর্ব্বে একরকম নৌকা ছিল, উহার নাম ধূরী (সম্ভবতঃ দ্রোণী শব্দজ) কতকগুলি কাষ্ঠফলক নারিকেলের আঁশ দিয়া গাথিয়া এই ধূরী, প্রস্তুত হইত, ইহাতে লৌহ ব্যবহৃত হইত না। ডিঙ্গি এবং 'খোদা' হইতে ধূরী প্রাচীনতর। লৌহের ব্যবহার না হওয়াতে বুঝিতে পারা যায়, যখন সমুদ্র বিক্রমপুরের সন্নিকটে ছিল তখন 'লোণা' ধরিবার ভয়ে লৌহবাদ দিয়া এইরূপ নৌকাই নির্ম্মিত হইত। যাত্রী লইয়া যাইবার জন্য, গহনার নৌকা—এই নৌকা চালু এবং দীর্ঘাকার। বড় লোকেরা পান্সী এবং লালডিঙ্গি ব্যবহার করিতেন। উহাতে ৩২ খানা পর্য্যন্ত দাঁড় থাকিত। একটি মেয়েলি গানে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়—

বত্রিশ দাঁইড়া নৌকাখানি
ঝলকে উঠে পানি,
রইয়া রইয়া গাওরে মাঝি
মায়ের কান্দন শুনি!

গরীবেরা, নৌকার সংস্থান করিতে না পারিলে, ভেলা এবং মাটীর গামলা ব্যবহার করিয়া থাকে। খরার দিনে মেয়েরা 'ডুলি' ও 'মহাপায়া' এবং সম্পন্ন ব্যক্তিগণ পাল্কী ব্যবহার করিয়া থাকেন। গরীবদের পায়ে হাটিয়া চলিবারই অভ্যাস। কোনও কোনও গ্রামে দুই একখানা দ্বিচক্রযান কচিৎ দুই একটি অশ্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে। মাল টানিয়া নিবার জন্য নানা আকারের নৌকা আছে। 'খরার' দিনে মাথায় বোঝা ভিন্ন মাল বহন করিবার অন্য উপায় নাই। গর্দ্দভ এবং অশ্বতরের পৃষ্ঠে মাল বহন করিতে কচিৎ দৃষ্ট হয়।

বাণিজ্য—গঙ্গারাড়ী এবং শ্রীপুর বিক্রমপুরের প্রাচীন বাণিজ্য বন্দর। এই দুই বন্দরে সমুদ্রগামী জাহাজ সর্ব্বদা যাতায়াত করিত। শ্রীপুরে একটি প্রধান পোতাশ্রয় ছিল। শ্রীপুরের দক্ষিণ পূর্ব্বে ঘড়িসারের উত্তরে হাজিঘাটা নামে একটি স্থান আছে। সম্ভবতঃ হজযাত্রীগণ ঐ স্থান হইতে জাহাজে উঠিতেন। সাহসুজা আরাকাণে পলায়ন কালে ইহারই কোন স্থান হইতে জাহাজে চাপিয়া ছিলেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ঢাকার বস্ত্র শিল্পের উন্নতির যুগেই তদঞ্চলে বহির্বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়, তখন বিক্রমপুরের ও চীন তুরস্ক, সাইরিয়া, আরব, পারস্য, ইতালী, স্পেন, গ্রীস প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল। আরমানী, মগ, ফিরিঙ্গি প্রভৃতি বহু বিদেশীয়গণ আসিয়া ক্রয় বিক্রয়ের কাজ করিত। বস্ত্রশিল্পের পতনের সঙ্গেই বহির্বাণিজ্য লোপ পাইতে থাকে। নীল ও কুসুম ফুলের চাষ যতদিন ছিল ততদিন ঐ দুই দ্রব্য বিক্রমপুর হইতেও প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হইত। বর্ত্তমানে পাটই বহির্বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ।

বাস্তুনির্ম্মাণ প্রণালী ও গ্রাম সংগঠন—ভূমি নিম্ন বলিয়া বাস্তু নির্ম্মাণের পূর্ব্বে বিক্রমপুরবাসী প্রথমে একখণ্ড ভূমির উপরে পুকুর কাটাইয়া, ঐ মাটি ফেলিয়া বাড়ীর খণ্ড উচু করিয়া লয়। বিলাজমীতে ঐ মাটীর স্তূপ টীলার মত দেখায়। মাটি ভালরূপ বসিলে পরে উহার উপর গৃহ নির্ম্মাণ করে। প্রায় বাড়ীতেই অন্দর বাহির দুই খণ্ড থাকে। দুই খণ্ডের দুইটি পুকুর, সদর পুকুর ও পাছ পুকুর। প্রাচীন বাড়ীগুলির চারিদিকে পরিখা দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে ডাকাতের ভয়ে ঐরূপ পরিখা কাটাইয়া, উহার পারে পারে কণ্টকময় বেতঝোপ ও 'মান্দার' বৃক্ষ রোপণ করা হইত। ঐরূপ এক একটী বাটী যেন এক একটী দুর্গ।

অতি উচ্চ মৃত্তিকার স্তূপের উপরে দেউল বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছিল। কোনও স্থলে ঐরূপ একটি দেউল বাড়ীকে কেন্দ্র করিয়া এক একটি গ্রাম গড়িয়া উঠিয়াছিল। ঐ সব গ্রামের নামের শেষে প্রায়ই দেউল বা মন্দির বাচক শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। সম্পন্ন ব্যক্তিগণ সেকালে বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া অর্থের সদ্ব্যবহার করিতেন। বড় বড় দীঘিকার নাম দেওয়া হইত সাগর। সাগর, সায়র

ক্রমে সারে পরিণত হইয়া কতকগুলি গ্রাম যে ঐরূপ দীর্ঘিকাকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত হইয়াছিল, তাহার পরিচয় দিতেছে।

বিক্রমপুরের মৃত্তিকা পলিময় বলিয়া ইষ্টক গৃহ নির্ম্মাণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নয়। পলির নরম মাটিতে দালান ক্রমে নিম্নে বসিতে থাকে। এইরূপে প্রাচীন দালানগুলি মাটির নিম্নে অনেকদূর বসিয়া গিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রধানতঃ এই কারণেই ভূমিকম্পে উহারা ভাঙ্গিয়া একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই। পুরাণ দালান গুলিতে প্রায়ই অত্যধিক মসলা সংযোগে জাফ্রি ইট ব্যবহৃত হইত। যতটুকু পুরু ইট যোড়ার ফাঁকে তদধিক পুরু চূণ সুরকির লেপ দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহ যতটুকু উচ্চ সমগ্র ভিত্তি মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থ 'নেওয়ার' পর্য্যন্ত ততটুকু—এই পরিমাপে প্রায়ই প্রাচীন ইষ্টক গৃহ সকল নির্ম্মিত হইত।

সাধারণতঃ গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে উলুখড় বাঁশ, বেত, 'ইকড়' ব্যবহৃত হইত। গৃহগুলি দোচালা, চৌচালা, আটচালা ভেদে তিন রকম। বহির্বাটীর নাটমন্দির আটচালা, ভিতর খণ্ডের ঘরগুলি দোচালা বা চৌচালা রূপে নির্ম্মিত হইত। অনেকের বাটীতে চৌচাল গৃহ নির্ম্মাণের "আর্য্য" (কুলানুমোদিত প্রথা) ছিল না। ঐ সকল বাটীর হস্তি—পৃষ্ঠাকারে নির্ম্মিত সুবৃহৎ দোচাল ঘরগুলি দেখিতে মনোরম। অর্থশালী লোকেরা 'রঙ্গীন' গৃহ নির্ম্মাণ করাইতেন। ঐরূপ গৃহের চৌকাট, কপাট কাষ্ঠ স্তম্ভের উপর নানা কারুকার্য্য, চাল এবং বেড়ার বাঁশের কাঠামের উপর বেতের 'ফুলকারি' থাকিত, ছাদের অভ্যন্তর ভাগে, উপরের বেড়ার গায়ে স্থানে স্থানে 'অভ্র' বসান হইত। রজনী যোগে 'ঝাড় লণ্ঠন' 'ফানুসের' আলো অভ্রের উপর ঝলমল করায় ঐ সকল বিচিত্র বর্ণের গৃহগুলি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিত।

মৃত্তিকার আঁশ কম বলিয়া বিক্রমপুরে মেটে কোঠার প্রচলন নাই। বাঁশ, হোগলা পাতা, ইকড়ের সাহায্যে বেড়া তৈয়ার হইত। ইকড়ের গায়ে গোবর মাটী লেপিয়া যে বেড়া তৈয়ার হইত, উহা যেমন সুন্দর তেমনই মজবুতও হইত। গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে বিক্রমপুরের ঘরেমীগণ বিশেষ দক্ষ ছিল। খড়ের ঘরের স্থল টীনের ঘর দখল করায়, বর্ত্তমানে আর তেমন নিপুণ ঘরেমী দেখিতে পাওয়া যায় না।

শিল্প—প্রাচীনকাল হইতেই বিক্রমপুর নানা শিল্প কার্য্যে প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছিল। আব্দুল্লাপুর প্রভৃতি স্থানের তাঁতি, যুগী, জোলাগণ বহুদিন যাবৎ বস্ত্র নির্ম্মাণে দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে। 'আইড়ল' গ্রামের কাগজি মুসলমানগণ ও শতাধিক বৎসর যাবৎ দেশীয় কাগজ প্রস্তুত করিতেছে। কুম্ভকার, কর্ম্মকার, পাটীকার, কংসকার, মালাকার, চর্ম্মকার প্রভৃতি শিল্পিগণ নানা শিল্পকর্ম্মে নিযুক্ত আছে। রাজনগর (পরে পালং) এবং লৌহজঙ্গের কাঁসারীগণ পিতল ও কাঁসের কাজে বেশ নিপুণ। ফুল মালিদের শোলার মুকুট, ফুল, ঝাড় প্রভৃতি নানা জেলায় সমাদৃত হইয়াছে। রীষিগণ স্বয়ং দেশীয় প্রথায় চামড়া কসাইয়া পাদুকা তৈয়ার করিয়া থাকে।

গ্রামের কুম্ভকারগণ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ কার্য্য প্রাচীন কাল হইতেই বিশেষ দক্ষ। শ্রীপুরের কাঠেরমিস্ত্রীগণ নৌ-নির্ম্মাণ কার্য্যে দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিল। শ্রীপুরের কর্ম্মকারগণ লোহার কামান বন্দুক তৈয়ার করিতে জানিত। বিক্রমপুরের ঘরেমীগণ সেকালে এইরূপ সূক্ষ্ম রূপে বেত 'তোলাইতে' পারিত যে ঐরূপ বেত ক্ষুদ্রতম সূচীর ছিদ্র পথ দিয়া প্রবেশ করান যাইত। পরবর্ত্তী কালে মহারাজ রাজবল্লভের রাজধানী রাজনগরকে কেন্দ্র করিয়া নানা শিল্পীর সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল। রাজনগরাধিপতির উৎসাহে রাজমিস্ত্রী, কংসকার, স্বর্ণকার কর্ম্মকার প্রভৃতি শিল্পিগণ স্ব স্ব কার্য্যে বিশেষ দক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। রাজনগরের রাজমিস্ত্রীর প্রস্তুত ইষ্টক নির্ম্মিত "ঝিকটি ঘর" একুশ রতন প্রভৃতি বিদেশীয়গণের নিকটও মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে।

কৃষি—বিক্রমপুরে সাধারণতঃ তিন রকম মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়, যথা (১) এঁটেল (২) দোঁয়াশ ও (৩) চরা। উচ্চস্থানের মৃত্তিকা প্রায়ই এঁটেল। ঝিল সমূহের মৃত্তিকা, দোঁয়াশ। পদ্মা এবং মেঘনার চরের মাটি বালুকাময়। খুব শক্ত এঁটেল মাটি বিক্রমপুরে কম। এতদঅঞ্চলের প্রধান উৎপন্ন ফসল ধান, পাট, খেসারী, মটর, মসুর, কলাই, তিল, কাউন, চিনা, যব, ইক্ষু,

লটাঘাস, হোগলা, উলুখড়, কচু, কলা, মূলা, আদা, আলু, গোলআলু, মরিচ, গিমি কুমড়া, তরমুজ, উচ্ছে, ক্ষিরাই, ফুটি, সর্ষপ, পান প্রভৃতি।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এতদঞ্চলে নীলের চাষ আরম্ভ হয়। নূতন চরা জমীতে এবং যে জমীতে আশু ধান্যের চাষ হয়, তথায় প্রচুর পরিমাণে নীল উৎপন্ন হইত। রাজানগর, সিরাজাবাদ, ইচ্ছাপাশা প্রভৃতি স্থানে অদ্যাপি নীলকুঠীর ধ্বংসাবশেষ আছে। নীলের পরে প্রধান অর্থকরী ফসল কুসুম ফুল। বিক্রমপুরের নানাস্থানে উৎকৃষ্ট কুসুমফুল জন্মিত। কুসুম ফুল ১৬৲ হইতে ২৫৲ মণ দরে বিক্রীত হইত। বর্ত্তমানে এই দুই ফসলের চাষ একেবারে লোপ পাইয়াছে।

রামপালের জমি শাকসব্জী চাষের পক্ষে বড়ই উপযোগী। রামপালের কৃষকগণ বারমাস নানা শাকসব্জী উৎপন্ন করিয়া থাকে। পদ্মা এবং মেঘনাদের চরা ভূমিতে কন্দজাতীয় উদ্ভিদ ধান্য, ফুটি, তরমুজ, লাউ, কুমড়া, ঘাস প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। উত্তর বিক্রমপুরের ভূমিতে লবণের অংশ কম বলিয়া—নারিকেল এবং সুপারী ও খেজুর প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় না। বন্যার জল বাঁশ ও বেতের ক্ষতি করিয়া থাকে। কতিপয় বৎসর যাবৎ উপর্য্যুপরি জল প্লাবনের দরুণই সম্ভবতঃ অনেক গ্রামে এই দুই উদ্ভিদ মরিয়া যাইতেছে।

রামপালে এখনও কিছু কিছু তুলার চাষ হয়। "ঢাকা সহরের ১২ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত ফিরিঙ্গি বাজার নামক স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া ইদিলপুর পর্য্যন্ত প্রসারিত ৪০ মাইল দীর্ঘ এবং ৩ মাইল প্রশস্ত মেঘনার তীর্থবর্ত্তী ভূভাগে, অর্থাৎ কেদারপুর, বিক্রমপুর, রাজনগর, কার্ত্তিকপুর শ্রীরামপুর এবং ইদিলপুর প্রভৃতি পরগণায় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্পাস জন্মিত বলিয়া অবগত হওয়া যায়। মরিসস এবং বরবোন প্রদেশজাত তূলা প্রতীচ্যজগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেও উহা ঢাকা জেলাস্থ উপরোক্ত স্থান সমূহের তূলার নিকটে অপকৃষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল।"*

বিক্রমপুরে সাধারণতঃ চারি প্রকারের ধান্যের চাষ হয়। (১) আউস (২) আমন (৩) দীঘা (৪) রোঁয়া। "সাধারণতঃ প্রতি কানিতে আউস ধান ১০/—২৫/, আমনধান ১৫/—৩০/ মণ, দীঘাধান ১২/—২৫/০ এবং বোরো ধান ১৫/—২৫/ পর্য্যন্ত জন্মে।" "অধিকাংশ ধানের ক্ষেতেই আউশ ও দীঘা বা আউশ ও আমন একত্রে মিশ্রিতভাবে বপন করা হয়।" বোরো এবং রোঁয়া ধানের চাষ বিক্রমপুরে খুব কম হয়। সম্বৎসর মধ্যে পৌষের শেষভাগ হইতে চৈত্রের প্রথমভাগ পর্য্যন্ত প্রায় তিনমাস ব্যতীত, আর সকল মাসেই বিক্রমপুরের কৃষকেরা লক্ষ্মীর দানা বা ধান কাটিয়া ঘরে আনয়ন করিয়া থাকে ইন্দাহাল, ভুঁড়িয়াল, কালামাণিক খাইটা, জমির ফুল, চিনিশঙ্কর, চন্দ্রগোটা প্রভৃতি ভেদে ৪০ প্রকার আউস ধান্য, আঘুনিয়া, ইদা, কালা সোণা, গরচা, গুয়াখুবরী, পানকাইজ, পঙ্কিরাজ, ভবানীভোগ, রাজামোহন লোথা, লক্ষ্মীবিলাস, সেচী আমন প্রভৃতি ৮০ প্রকারের আমন ধান্য লক্ষ্মীদীঘা, ধলাদীঘা, আশ্বিনী, কার্ত্তিকসাইল প্রভৃতি বিংশতি প্রকার দীঘা ধান্য, এবং কালাবোরা গইলারি, জামালভোগ প্রভৃতি ৬।৭ রকমের বোরা ধান বিক্রমপুরে উৎপন্ন হয়।

বিবিধ উদ্ভিদ—করই, হিজল, জারৈল, উড়িআম, দেবদারু, ঝাউ, বট, পাকুরকানী অশ্বত্থ, ছাইতন, কানাইলরী, ডহর করঞ্জ, করঞ্জা, নাটা, বউনা, পিঠক্ষীরা, রয়না, কদম্ব, বাঁশ প্রভৃতি বিক্রমপুরে সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যজ্ঞ ডুম্বর, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারী পিপুল, নাও সোণা, বেল, খদির, জবা, রক্তচন্দন, পুনর্ণবা, নিসিন্দা, রক্ত এরণ্ড, আকন্দ, হাতীশুঁড়া, ত্রিফলা, চিতা, শ্যামালতা, ভূমিকুষ্মাণ্ড প্রভৃতি ভেসজ উদ্ভিদ স্বতঃই জন্মিয়া থাকে। বেত, নল, খাগড়া ইকড় জলা প্রদেশে এবং 'খালিয়া কাসিয়া হোগলা প্রভৃতি চরা জমিতে প্রচুর উৎপন্ন হয়। কুমুদ, পদ্ম, ঘেচু, কলমী, হিঞ্চে, 'বাইচা' প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদ, নানা রকম লতা পাতা, বনের শাক, গেন্দা, যূঁই, বেলি, মালতী, অপরাজিতা, কনকচাঁপা, ভুঁই, চাঁপা, কাঠালে চাঁপা, করবী, ঝুমকো দ্রোণ, টুনী প্রভৃতি ফুলের গাছ সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। ফলবান্ বৃক্ষের

* History of the Cotton Industry of Dacca District হইতে শ্রীযুত যতীন্দ্র মোহন রায় কর্ত্তৃক ঢাকার ইতিহাসে উদ্ধৃত অংশ।

*কৃষি সম্পদ,—১২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।

মধ্যে আম, কাঠাল, কুল, বেল, পেয়ারা, আতা, নোনা, জাম, গোলাবজাম, গাব, আমরুল, জামরুল, ডহুয়া, ডেফল, তেতুল, চাল্‌তা, কাউ, বিবিধ লেবু, নারীকেল, সুপারী, কুচই, ময়না,আমড়া, পেপে, বথই, আনারস উল্লেখ যোগ্য।

জীবজন্তু—গরু, কুকুর, বিড়াল, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, গাধা গৃহপালিত জন্তু। খেঁকশিয়াল, ভোঁদর, বানর, উদ, সজারু, শশক, ইন্দুর, কাঠবিড়াল, ছুঁচো, দীর্ঘ লেজ, খাটাশ, প্রভৃতি বনের পশুর অভাব নাই। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, বনবাদারে প্রচুর বন্যবরাহ দৃষ্ট হইত। প্রাচীনগণ বাঘের উৎপাতের গল্প করিয়া থাকেন। এখন শূকর এবং দুই একটি চিতা বাঘ ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। বাঘডাশা নামে এক রকমের বন্য-বিড়াল দেখিতে পাওয়া যায়। 'ভাম' নামক এক রকম জন্তু সময় সময় গৃহে প্রবেশ করিয়া খাদ্য দ্রব্য নষ্ট করিয়া ফেলে। ডোরাবাঘ বা 'রয়েল টাইগার' পূর্ব্বে মাঝে মাঝে উপস্থিত হইয়া গরু ছাগল খাইয়া ফেলিত। পদ্মা, আইড়ল খা প্রভৃতি নদীগুলি বিশালাকার ধারণ করায়, সুন্দরবন হইতে বড় বাঘ কি বন্য মহিষ নদী সাঁতারাইয়া এক্ষণে আর বিক্রমপুরে উপস্থিত হইতে পারে না।

কচ্ছপ, কমঠ, কাকলাস, টিকটিকি, গোসাপ, দারাইস, দুধরাজ, উলবোরা, জিঙ্গলাপোরা, লাউটেপো, ঘনিয়া, ধোড়া, মেটেসাপ, শঙ্খিনী প্রভৃতি সরীসৃপ অনেক দৃষ্ট হয়।

পদ্মা মেঘনা এবং ধলেশ্বরীর জলে বর্ষাকালে বড় বড় কুমীর ভাসিয়া থাকে।

গৃধিনী, শকুনি, চিল, বাজ, কোড়াল, টিয়া, চন্দনা. শালিক, চরুই, বাবুই, পায়রা, হরিকল, ঘুঘু, টুনী, ডাহুক, পেচক, দয়েল, মাছরাঙ্গা, বক, হাড়গিলা, শামুক-ভাঙ্গা, কাক, বুলবুল, পিপি, তিতর, খঞ্জন, কুক্কুট, বেলেহাঁস, পাণিকাউর, বউকথাকও প্রভৃতি পাখী বিক্রমপুর অঞ্চলে যথেষ্ট দৃষ্ঠ হয়।

এতদঞ্চলের নদী, ঝিল, খাল, বিল, পুকুর প্রভৃতি পূর্ব্বে নানাজাতীয় মৎস্তে পূর্ণ ছিল। এখন ঐ সকল হাজিয়া মজিয়া যাওয়ায় মৎস্তের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। কতকগুলি মাছ যেমন ঘনে, সরপুটী নির্ব্বংশ হইয়া যাইতেছে। রোহিত, কাতল, মিরগেল, আইর, কালী বাউস, ভাঙ্গনা, এলাঙ্গি, চিতল, চেলা, মৌরলা, পুটী, ফেসা, ইলিস, চাপিলা, কৈ, খলিসা, সিং, মেনি, টেংরা, গোলসা, পাবদা, চাঁদা, গজার, শৌল, তপস্বী, পোয়া, বাইলা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। মেঘনার বাঘ-আইর, পদ্মা মেঘনার সঙ্গমে ভোল এবং কোরাল বা ভেটকী অতি বৃহৎ মৎস্য। প্রায় ৩৫।৪০ বৎসর পূর্ব্বে লৌহজঙ্গের নিকট এক অতিকায় খড়্গা মৎস্য জালে উঠিয়াছিল, উহা ১৫ ফিটের অধিক লম্বা ছিল। ১৮৩৬ খৃঃ অব্দে মেঘনায় ১০ ফিট লম্বা একটি হাঙ্গর পাওয়া গিয়াছিল। বিক্রমপুরের নদীতে হাঙ্গর নাই। কিন্তু তিনটি নদীতেই বহু শিশুক দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ধর্ম্ম—বর্ত্তমান কালে বিক্রমপুরে হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুসলমান ও সামান্য পরিমাণে খৃষ্টিয়ান দেখিতে পাওয়া যায়। অতি প্রাচীনকালে এতদঞ্চলে কোন্ ধর্ম্মের প্রচলন ছিল তাহা সঠিক অবগত হইবার উপায় নাই। ভূতত্ত্ববিদেরা প্রমাণ দিয়াছেন বঙ্গদেশ আধুনিক। বঙ্গদেশে আর্য্য উপনিবেশ স্থাপনের সময় সমগ্র দেশ গঠিত হয় নাই, সম্ভবতঃ তখন বিক্রমপুর সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল। মনীষি রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয় বৌধায়ণসূত্র আলোচনা পূর্ব্বক খৃঃ পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দী আর্য্যগণ কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ বিজয়ের সমাপ্তি কালরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং কোনও কালে ও বিক্রমপুরে খৃঃ পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বের প্রচলিত বৈদিক হিন্দু ধর্ম্ম প্রচারিত ছিল না। আর্য্যগণ এতদঞ্চলে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে সম্ভবতঃ চান্দালগণই পূর্ব্ববঙ্গে বাস করিত। ঢাকা, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ জেলায় নাগপূজার প্রচলন থাকিলেও উহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়াই মনে হয়। দ্রাবিড় জাতি এবং উহাদের ধর্ম্ম যে এক সময়ে এতদঞ্চলে প্রচলিত ছিল ইহার কোনও বিশিষ্ট প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। চান্দালগণ অনার্য্য। ঐ সকল অনার্য্যদের তদানীন্তন ধর্ম্মমত জানিবার উপায় নাই। "পৌণ্ড্রক বাসুদেবের আখ্যানে আমরা বাঙ্গলাদেশে আর্য্যপ্রভাবের সূচনা দেখিতে পাই। বাঙ্গলাদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে এই প্রভাব কতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই। মনু-সংহিতায় বঙ্গ, অঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ এবং

সৌরাষ্ট্রে তীর্থযাত্রা ব্যতীত অন্যকারণে গমন। নিষিদ্ধ হইয়াছে। খৃষ্টের জন্মের ৪র্থ শতাব্দীতে মনুসংহিতার রচনা কালে ঐ সকল দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম বা জৈনধর্ম্ম প্রবল ছিল ইহাই সংহিতাকারগণের বিরাগের কারণ।” এই বচন হইতেই ঐ সময়ের পূর্ব্বেই বঙ্গে হিন্দু তীর্থের উদ্ভব হইয়াছিল. ইহারও আনুষঙ্গিক প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সমস্ত বিষয় আলোচনা করিলে ৺উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের মন্তব্য—“বৌদ্ধ ভিত্তির উপরেই ব্রাহ্মণের দ্বারা বাঙ্গলা দেশে হিন্দুয়ানী গঠিত হইয়াছে” * সমীচীন বলিয়া মনে হয়। এক সময়ে বিক্রমপুরে এই হিন্দুয়ানী সবিশেষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। বিক্রমপুরে বৌদ্ধ প্রভাবের ভূরি ভূরি নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। হিউয়েঙ্গসান সমতটে অনেকগুলি বৌদ্ধ বিহার দেখিতে পাইয়াছিলেন। বজ্রযোগিনী, যোগিনীঘাট প্রভৃতি গ্রাম, দেউল বাড়ীর ভগ্নাবশেষ, অবলোকিতেশ্বর, মারীচি প্রভৃতি বৌদ্ধ দেব দেবীর মূর্ত্তি, এখন ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রভাবের স্মৃতি বহন করিতেছে। অনার্য্যবহুল তদানীন্তন বিক্রমপুরের পক্ষে জাতিভেদের উচ্ছেদ সাধক বৌদ্ধদের সাম্যমত গ্রহণ করাই স্বাভাবিক। বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে সে সকল উপমতের উদ্ভব হইয়াছিল, বিক্রমপুরে সে সকল মতাবলম্বীর ও অভাব ছিল না। অদ্যাপি এতদঞ্চলে “গোক্ষের লাড়ু দানে” নাথধর্ম্মের প্রবর্ত্তক গোরক্ষনাথের পূজা, এবং অন্ত্যজ জাতির মধ্যে “আশা-সোটা-আসনের” পূজার প্রচলন আছে। কালক্রমে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বিক্রমপুরেও বৌদ্ধদের পতন আরম্ভ হয়। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ে বৌদ্ধেরা অন্ত্যজজাতিতে মিশিয়া যায়। বিক্রমপুরের যুগী জাতির মধ্যে কতিপয় বৎসর পূর্ব্বেও মৃতদেহ সমাহিত করিবার প্রথা ছিল। এ অঞ্চলের যুগিরা আপনাদিগকে মুনি-ঋষির সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। অনেকে উঁহাদিগকে নির্য্যাতিত পতিত বৌদ্ধদের সন্তান বলিয়া মনে করেন। আদিশূর কর্ত্তৃক পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন বঙ্গে পুনঃ সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের অভ্যুদয়েরই সূচনা করে। পরবর্ত্তী কালে মহারাজ বল্লাল পুনরায় সাগ্নিক ক্রিয়া কুশল ব্রাহ্মণ আনিয়া এতদঞ্চলে আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া হিন্দু সমাজকে সুসংস্কৃত করিতে প্রয়াস পাইয়া ছিলেন। সেই সময় হইতে বিক্রমপুরে বল্লালী হিন্দুয়ানীই প্রচলিত আছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে মহারাজ রাজবল্লভ এবং তাঁহার অনুকরণে বিশিষ্ট বিশিষ্ট জমিদার ও অর্থশালী লোকেরা নানারূপ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান মঠ মন্দির প্রতিষ্ঠা, দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর ভূমিদান প্রভৃতি কর্ম্মদ্বারা এই হিন্দুয়ানীকে জাগাইয়া রাখিতে যথাশক্তি চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

ব্রাহ্মণগণ পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের বিদ্রোহী হইলেও উপনিষদের ধর্ম্মে আস্থাবান হিন্দু। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের আরম্ভ হইতেই কলিকাতা, ঢাকা, বরিশাল প্রভৃতি নগরবাসী বিক্রমপুরের বহুলোক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রভৃতির উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া ঐ ধর্ম্মের প্রভৃতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। ব্রহ্মানন্দের ঢাকার বক্তৃতায় বিক্রমপুরের বহু কৃতী সন্তান নূতন মতে দীক্ষিত হন। এইরূপ কয়েকটি উন্নত পরিবারকে হারাইয়া বিক্রমপুরের হিন্দু সমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। নূতন মতাবলম্বী বিক্রমপুরের কয়েকজন পুরুষ নানা ব্রাহ্মসমাজে আচার্য্যের কার্য্যে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন। আজ পর্য্যন্ত বিক্রমপুরে দুইটি সুন্দর ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, একটি উত্তর বিক্রমপুরের বেজগাঁ নামক গ্রামে, অপরটি দক্ষিণ বিক্রমপুরের রাহাপাড়া গ্রামে। এই দুই মন্দিরেই প্রতি বৎসর আড়ম্বরের সহিত বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের প্রচারিত মতের উদারতা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিস্তৃতি রোধ করিয়া বাঙ্গালীর প্রাণে পুনঃ হিন্দুধর্ম্মের প্রতি নিষ্ঠার ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছে। বিক্রমপুর 'বিবেকের ডাকে' সাড়া দিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব করে নাই। এতদঞ্চলের অনেক যুবক শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কর্ম্মী সন্ন্যাসী। বিক্রমপুরের বহু পল্লীতে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম স্থাপিত হইয়াছে।

সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবের ফলেই, বিক্রমপুর বাসিগণ তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রতি পূর্ব্ব হইতেই অধিকতর

* প্রাচীন রাজমালা। ৪১১পৃঃ। * সাহিত্য।

অনুরক্ত। বিক্রমপুরের অধিকাংশ উচ্চশ্রেণীর হিন্দু শৈব এবং শাক্ত। মেয়েলি কয়েকটি ব্রতে সূর্য্যোপাসনার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণব মত এতদঞ্চলে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে বিশেষ সমাদর লাভ করিতে পারে নাই। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে রাজনগরে এবং জপশায় অন্যান্য দেবদেবীর সহিত শ্রীচৈতন্যদেব ও পূজা পাইতেন। নবশাখ ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণ অধিকাংশই বৈষ্ণব ধর্ম্মের সাম্যবাদে এবং সহজসাধ্য ভক্তিতন্ত্রে আকৃষ্ট হইয়া ঐ মত গ্রহণ করেন। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণের প্রায় প্রতি গৃহে নারায়ণশিলার পূজা হইয়া থাকে। তথাপি শাক্ত মতই উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যে অধিকতর প্রবল। তন্ত্রেরদ্বারা বিক্রমপুরের বৈষ্ণব মতও অনেক প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িয়াছে। বিক্রমপুরের সেরজাবাদ নামক গ্রামে 'সুধারাম' নামে একজন সাধক তান্ত্রিক বৈষ্ণব ধর্ম্ম—'বাউল মত' প্রচার করেন। পূর্ব্ববঙ্গের নানা জেলায় সুধারামী মতের অনেক 'বাউল' আছে। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে সহজিয়া মতের বৈষ্ণবেরও অভাব নাই।

পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য স্থানের ন্যায় বিক্রমপুরে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা অনেক। মুসলমানদের সুন্নিমতই প্রবলতর। অর্ব্বাচীন কালে 'দুধু মিঞার' মত অনেকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। চরের করাজিগণ সকলেই দুধু মিঞার মতাবলম্বী। দরবেশী মতের মুসলমানও প্রতি গ্রামেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর এক শ্রেণীর ফকিরিমতের উপাসক আছেন, উহারা মুসলমান হইয়াও নিরামিষাশী এবং 'অজপার' সাধনা করেন।

দীর্ঘকাল একত্র বসবাস হেতু, বিক্রমপুরের হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যথেষ্ট প্রীতিরভাব বিদ্যমান আছে। উভয় সমাজের রীতিনীতি কিছু কিছু উভয়ের মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছে। এতদঞ্চলের অনেক মুসলমান জমিদারের দান বহু দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর ভূমি আছে। আবার হিন্দু ভূস্বামীদের অনেকে মুসলমানের দরগার জন্য ভূমি দান করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। মাঐসারের ৺শ্রীশ্রী দিগম্বরী তলায়, চাঁচুরতলায় ৺শ্রীশ্রীকালী বাড়ীতে অনেক মুসলমানও 'মানস' করিয়া কবুতর পাঠা ছাড়িয়া থাকেন। আবার হিন্দু মাঝিরা নৌকা খুলিবার সময় 'দুর্গা' নামের সঙ্গে 'বদরপীরের' নাম লইয়া থাকেন। 'পীরের' সিন্নি দিতে হিন্দুকেও দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুদের নীল পূজার নাচের মত, মুসলমানেরাও 'সা মান্দারের' বাঁশ লইয়া বাড়ী বাড়ী নাচিয়া 'মাগন' আদায় করেন। ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বেও হিন্দুদের কোন কোন মেয়েলি ব্রত মুসলমান রমণীরাও অনুষ্ঠান করিতেন, বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছি। শ্রীশ্রী৺শীতলামাতার থালাঘট লইয়া হিন্দু রমণীর মত বহু মুসলমান রমণীকেও দলে দলে 'মাগন' তুলিয়া বেড়াইতে আজিও দেখিতে পাওয়া যায়।

বিক্রমপুরের প্রতি গ্রামেই ইষ্টক নির্ম্মিত মসজেদ অথবা টীনের 'নেমাজ ঘর' আছে।

খৃষ্টধর্ম্ম বিক্রমপুরে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। খৃষ্টীয়ানের সংখ্যা বিক্রমপুরে নগণ্য।

জাতি—হিন্দুদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত শ্রেণী বিভাগ দৃষ্ট হয়:—ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, শূদ্র, গন্ধবণিক, কামার, কুমার, তাম্বুলী, সদ্গোপ, শূদ্র, মাহিষ্য, তিলি, মালী, কাঁসারী, শাঁখারী, নাপিত, বৈষ্ণব, বারুই, কৈবর্ত্ত, গাররী, মদক, গোপ, স্বর্ণ বণিক, সেকরা, সূত্রধর, সাহা, নথাই-সাহা, কলু, তাঁতী, যুগী, কাপালী, চুনারী, পাটীকার, জেলে, কারাল, কায়লী, মাল, মাঝী, পাটনী, টীয়র, পুবর, বেহারা, শিকারী, কোয়রী, চাষা, ধোপা, কাচুরী, নমঃশূদ্র, নর, মুচি, ভুঁইমালী ইত্যাদি।

মুসলমানদের মধ্যে সেখ, সৈয়দ, পাঠান প্রধান। মৎস্য ব্যবসায়ী নিকারী এবং বেদেরাও মুসলমান। আরব, তুরস্ক এবং পারস্য দেশ হইতে আগত মুসলমানের সংখ্যা এতদঞ্চলে অতি সামান্য, মোগল বংশীয় দুই একজন থাকিলেও সেখের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। অধিকাংশ মুসলমানই ধর্ম্মান্তরিত হিন্দু-সন্তান।

হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থগণ উচ্চ বর্ণের সন্তান। ইহাদিগের মধ্যেও অবিমিশ্র আর্য্য শোণিতের অস্তিত্ব প্রমাণ করা অতি দুরূহ। আদিশূর এবং বল্লাল কর্ত্তৃক আনীত কণৌজি ব্রাহ্মণগণের সন্তান ব্যতীত, বহু সপ্তশতী ব্রাহ্মণ বিক্রমপুরে আছেন। কোন কোন বংশ নানা জেলায় নানা শ্রেণীর ব্রাহ্মণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করায়, কৌলিক বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। 'ভরার মেয়ে' নিশ্চয়ই অনেক

বংশের রক্তের বিশুদ্ধতা নষ্ট করিয়া দিয়াছে। বৈদিকগণের কেহ কেহ দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়াছেন। বৈদ্যগণ নিজদের গোত্র প্রবরের সহিত ব্রাহ্মণের গোত্র প্রবরের মিল এবং আরও নানা প্রমাণ দেখাইয়া ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিতেছেন। কায়স্থগণের ও অনেকে ক্ষত্রিয় সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। কর্ম্মকারগণ ক্ষত্রিয়ত্বের, বারুজীবিগণ বৈশ্যত্বের দাবী লইয়া উপস্থিত। যুগী কাপালীরাও অধিকাংশই উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে কেহই 'শূদ্র' হইয়া ক্ষুদ্র থাকিতে চাহে না। বৈদ্যগণের কুলানুগত বৃত্তি এবং আচার সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে, উহাদিগের দাবী অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই। চাল-চলন এবং আত্ম-মর্য্যাদা-জ্ঞান বিষয়ে উহারা পূর্ব্ব হইতেই বিক্রমপুর সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন, না বলিলে সত্যের অপলাপ হয়। কায়স্থগণ পাঠশালার গুরুগিরি, জমিদার ও মহাজনের সরকারের কর্ম্ম এবং নানারূপ লিখ্য বৃত্তিতেই পুর্ব্বে নিযুক্ত ছিলেন। ক্ষত্রিয়োচিত গুণগ্রাম উহাদের অনেকের ছিল। অনেক কায়স্থ বংশ হয়তো ক্ষত্রিয়ের সন্তান। কিন্তু অপরদিকে অনেক শূদ্র এবং দুই এক ঘর নব শাঁখ—আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিয়া উচ্চ বংশীয় কায়স্থগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন দ্বারা কায়স্থে পরিণত হইয়াছেন, এইরূপ প্রমাণেরও অভাব নাই। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যেও কে পূর্ব্বে কি ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। শাস্ত্র মতে চণ্ডালগণ ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত শূদ্র সন্তান। কিন্তু ব্রাহ্মণের সংখ্যা অপেক্ষা ইহাদের সংখ্যা অনেক বেশী। বর্ণ সংকরের মূলবর্ণ অপেক্ষা সংখ্যাধিক্য হইতে পারে না।*

বর্ত্তমানে গুণকর্ম্ম বিভাগানুযায়ী—কোন বর্ণ নাই। অতি উচ্চ বর্ণের সন্তান বলিয়া যাহারা দাবী করিয়া আসিতেছেন, তাহাদের ও অনেকে পেটের দায়ে শূদ্রবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। আবার অনুন্নত শ্রেণীর অনেকে হয়তো উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন। এমতাবস্থায় জাতির বড় ছোট লইয়া আন্দোলনে বৃথা শক্তির অপচয় ব্যতীত অন্য কোনও রূপ লাভ নাই। জাতি উপজাতির কলহকে আমাদের আধুনিক বলিয়াই মনে হয়। রাজকোপে পতিত হইয়া সুবর্ণ বণিক, সূত্রধর প্রভৃতি সমাজে অপাংক্তেয় হইয়াছিল। বৌদ্ধদের প্রভাব হইতে হিন্দুদিগকে মুক্ত করিয়া সেন রাজাদের আমলে সমাজের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য বাঙ্গালায় বর্ণভেদ কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়াছিল। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে ঘৃণারভাব প্রবল ছিল, এইরূপ কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। অবস্থা বুঝিয়া রাজশক্তি কোন কোন জল অনাচরণীয় জাতিকেও 'চল' করিয়া লইয়াছিলেন, এইরূপ প্রমাণ আছে। কেদার শূদ্রজাতীয়া ধাত্রী মাতার নামে পুষ্করিণী খনন করাইয়া তাঁহাকে সম্মান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বিক্রমপুরের বড় ঘরে নফর শূদ্রগণ গৃহের সর্ব্বময় কর্ত্তারূপে থাকিয়া সেদিন পর্য্যন্তও যথেষ্ট আদর পাইতেন। শূদ্রজাতীয় 'ধাইমা' এবং 'আতাভাইকে' উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণও মা খুড়ি এবং ভাইয়ের মতই দেখিতেন। আমাদের ধারণা, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের জাতিতত্ত্ব নির্ণয়ের চেষ্টার পর হইতেই দেশে জাতিগত আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে। ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে চতুর্বর্ণের উৎপত্তি, চতুর্বর্ণ হইতেই—সমস্ত বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে—শাস্ত্রের এই যুক্তি মানিয়া লইলেও, সকল বর্ণই সমান শ্রদ্ধার পাত্র, সমাজ দেহের অত্যাবশ্যক অঙ্গ। সাধারণ মানুষের 'পদ' ও 'মুখের' সম্মানের পার্থক্য বরং স্বীকার করা যায়, কিন্তু—'ব্রহ্মা' মানুষ নহেন, তাঁহার 'মুখ' এবং পদ আমাদের নিকট সমান শ্রদ্ধার বস্তু; মুখ জাত 'ব্রাহ্মণ' হইতে পদজাত শূদ্র কিছুতেই ক্ষুদ্র নহেন। বিক্রমপুরের আদিম অধিবাসী এই শূদ্র অনুন্নত জাতি, এখনও ইহারাই সংখ্যায় গরিষ্ঠ। ইহাদের বিবরণ কিছুমাত্র সংগৃহীত হয় নাই। আরব্ধ গ্রন্থের পরবর্ত্তী খণ্ডে ইহাদের ইতিহাস গড়িয়া তুলিতে আমরা বিশেষরূপে চেষ্টা করিব।

* Ancient India R. C. Dutta. জাতিভেদ—শ্রীদিগেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য।

বিক্রমপুর

দ্বিতীয় অধ্যায়

আদিযুগ

ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ দেশ। কেহ কেহ ইহাকে ব্রিটিশ মুকুটের "কোহিনুর" বা উজ্জ্বল রত্ন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। মোক্ষমুলর প্রমুখ পাশ্চাত্য সুধীগণ ভারতবর্ষের এতই প্রশংসা করিয়াছেন যে, তাহাদের স্বদেশ-বাসিগণ এজন্য তাঁহাদিগকে (১) "India-worshippers" বা ভারতোপাসক বলিয়া বিদ্রূপ করিতেও ত্রুটি করেন নাই।

ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গভূমি শ্রেষ্ঠা, (২) বঙ্গ-দেশের মধ্যে আবার বিক্রমপুর শ্রেষ্ঠ। এরূপ সর্ব্বর্ত্তু সুখকরী সুজলা, সুফলা, মলয়জ-শীতলা, শস্য-শ্যামলা, মৎস্য-গব্য-বহুলা ভূমি পৃথিবীতে বিরল। বিক্রমপুর একটী ক্ষুদ্র জনপদ—একটী পরগণা মাত্র। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের ভীষণ প্লাবন-পীড়নে ইহার বহু অংশ ক্ষয়িত হইয়াছে ও হইতেছে। কীর্ত্তি-নাশা নদী দ্বারা ইহা এখন দুইভাগে বিভক্ত। উত্তরভাগ ঢাকা জিলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার অধীন এবং দক্ষিণ ভাগ ফরিদপুর জিলার মাদারিপুর মহকুমার অধীন। বিক্রমপুরের অধি-কাংশ স্থান অতি নিম্ন। অনেকে বলেন, ভূমিকম্পে এরূপ হইয়াছে। কিন্তু আমার ধারণা, এ দেশের অধিকাংশ ভাগ নদীগর্ভজাত "চর" বা পুলিন।

---

(১) পূর্ব্ববঙ্গের প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার মহাশয়ের একান্ত অনুরোধে "সেবা" হইতে উদ্ধৃত হইল।

(২) পৃথিবীর ইতিহাস "ভারতবর্ষ"—৪র্থ খণ্ড ১৪১ পৃঃ সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রাচীন বঙ্গের গৌরব বিভব—সমষ্টিভাবে বিচার করিতে গেলে পুরাবৃত্তে ভারতবর্ষের যেমন গৌরব গরিমার অবধি নাই, ব্যষ্টিভাবে বিচার করিতে গেলে ভারতবর্ষের অঙ্গীভূত এই বঙ্গদেশেরও তেমনই গৌরব গরিমার তুলনা নাই। সমষ্টিভাবে বিচার করিতে গেলে ভারতবর্ষের সভ্যতার প্রাচীনত্ব যেমন পৃথিবীর সকল দেশের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, ব্যষ্টিভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বঙ্গদেশকেও তেমনই পৃথিবীর সভ্য-জনপদের আদিভূত বলিয়া বুঝা যায়। এ কথায় এক সম্প্রদায় হয় তো নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন; বলিবেন,—"বঙ্গদেশ সবে মাত্র সেদিন সাগর-গর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে; বঙ্গদেশের আবার প্রাচীনত্বের গৌরব গরিমার কথা কি আছে?" তাঁহারা আরও বলিবেন, এ একটা অপবিত্র দেশ; এ দেশে অনার্য্য অসভ্যজাতির বাস ছিল; এ দেশে আসিতে হইলে প্রায়শ্চিত্ত করার প্রয়োজন হইত; এ দেশের আবার গৌরব গরিমার কথা কি আছে?" কি জানি কি কারণে, না জানি কাহার-কোন্ উদ্দেশ্য-সাধন ব্যপদেশে, বঙ্গদেশ সম্বন্ধে এই সকল কাহিনী প্রচারিত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা অনেকেরই প্রাণে বঙ্গদেশের এবম্বিধ কলঙ্ক-কথা বদ্ধমূল হইয়া আছে! কিন্তু, একটু অনুসন্ধান করিলে, একটু গবেষণা

"পুরা যত্র স্রোতং, পুলিনমধুনা।" কেবল পূর্ব্বকার নদীর গভীরতম অংশগুলি এখন "বিল" নামে বিদ্যমান আছে।

লোকসংখ্যার হিসাবে বলিতে গেলে, বিক্রমপুরের ন্যায় জনাকীর্ণস্থান কম দৃষ্ট হয়। এখানে প্রতি বর্গমাইলে হাজার বার শ লোকের বেশী বাস করে। এই লোক-বাহুল্যের একটা কারণ এই যে, সুদীর্ঘ কাল বিক্রমপুরে বঙ্গদেশের প্রধান রাজধানী অবস্থিত ছিল। আবার, যুগে যুগে বিক্রমপুর ছাড়িয়া, বহুলোক বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন জিলায় গিয়া চিরন্তন অধিবাসী হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কুলীনবর্গ, অন্যান্য সমুন্নত ভদ্রপরিবার সবই বিক্রমপুর হইতে বিনির্গত। তিন চার পুরুষতক পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগরূক থাকে, তারপর ক্রমেই পূর্ব্বস্থান "বাঙ্গালদেশ" নামে অভিহিত হয়। একমাত্র রাজসাহী বিভাগে বিক্রমপুরের অধিবাসী অতি বিরল। বর্ত্তমানে কলিকাতা, ঢাকা, কাশী, এলাহাবাদ, লাহোর প্রভৃতি স্থানে অসংখ্য বিক্রমপুরী লোক স্থায়িভাবে অধিবাসী হইয়াছে। এইরূপ স্বদেশত্যাগের প্রথম কারণ, বিক্রমপুরে স্থানাভাব। দ্বিতীয় কারণ, লোকের অভিরুচি। তৃতীয় কারণ, নদীর তাড়না। চতুর্থ কারণ, মগ, ফিরিঙ্গি প্রভৃতি জলদস্যুর উপদ্রব। পঞ্চম কারণ, উপার্জ্জন।

খৃঃ পূঃ ২৮০০ হইতে ১৩৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিক্রমপুরে বঙ্গের প্রধান রাজধানী ছিল। ১৩৩০ হইতে ১৭০৪ খৃষ্টাব্দতক ঢাকা-নগরীতে মুসলমান রাজধানী ছিল। এত সুদীর্ঘকাল স্থায়ী রাজধানীর ফলে বিক্রমপুরে ধর্ম্ম, সমাজ, রীতি, নীতি, জ্ঞান, গুণ, কলা, শিল্প, বাণিজ্য-বিদ্যা প্রভৃতি বহু

করিয়া দেখিলে, বঙ্গদেশ-সম্বন্ধে এ সকল ভ্রম-ধারণা অনায়াসে দূর হইতে পারে। ভারতবর্ষ যখন সভ্যতার উচ্চ চূড়ায় সমারূঢ়, জ্ঞান-সূর্য্য যখন ভারতবর্ষের উপর মধ্যাহ্ন কিরণ বিকীরণ করিতেছিলেন, এই বঙ্গদেশ তখন সর্ব্ব বিষয়েই সমুন্নত ছিল, জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্র-স্থান-মধ্যে পরিগণিত হইত, পবিত্র-ভূমি পুণ্য-ক্ষেত্র বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারিত ; আর তখন, বিদ্যার বিভবে, বীরত্বের গৌরবে বঙ্গের বিজয় কেতন গগন চুম্বন করিত। আপনার জন্মভূমি বলিয়া অযথা গৌরব খ্যাপন করিতেছি না ; ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের কৃতিত্ব-কাহিনী কীর্ত্তন করিতে গিয়া, যে দুই চারিটা বিষয়ের সন্ধান পাইতেছি, তাহাতেই প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইবে, প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-বিভবের পরিচয় পাইব।

বঙ্গদেশের অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক যে কলিঙ্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, ভারত-সাগরীয়-দ্বীপপুঞ্জে সেই কলিঙ্গ রাজ্যের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। ইহার পর পাল-বংশের ও সেন-বংশের বিভব ঐশ্বর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। পাল-বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল ৮১৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করেন। তিনি মগধাদি রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। পাল-বংশীয় রাজা দেবপাল কামরূপ রাজ্য ও উড়িষ্যা অধিকার করেন। ঐ বংশীয় নারায়ণ পাল উত্তর ভারতে একছত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ১০১৭ খৃষ্টাব্দে গজনীর মামুদ যখন কনোজ আক্রমণ করেন, কনোজ তখন পাল-বংশের অধিকার ভুক্ত ছিল। মামুদ কর্ত্তৃক কনোজ লুণ্ঠিত হওয়ার পর, "বারি-নগরে পাল-বংশের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। মহীপাল ১০২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুরে এই পাল-বংশের কীর্ত্তি স্মৃতির বহু ধ্বংসাবশেষ আছে। কোথায় বিক্রমপুর আর কোথায় কনোজ ? পাল-বংশীয় নৃপতিগণ এতদূর পর্য্যন্ত আপনাদের প্রভাব বিস্তারে সমর্থ ছিলেন। পাল-বংশের পর, বঙ্গে সেন-বংশের প্রতিষ্ঠা, সেন-বংশীয় রাজা বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন দক্ষিণে উড়িষ্যা ও প্রদেশ ও পশ্চিমে বারাণসী পর্য্যন্ত আপনাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ করিয়াছিলেন।

বিষয়ের উৎকর্ষ প্রাপ্তির অবকাশ যথেষ্ট ঘটিয়াছে। তাই আজও বিক্রমপুর বহু গুণীর স্থান। বঙ্গ বিচ্ছেদের পূর্ব্বে লর্ড কার্জ্জন বলিয়াছেন—"আমি বিক্রমপুরবাসীদের গুণ বেশ অবগত আছি। এরূপ সুনিপুণ রাজকর্ম্মচারী পৃথিবীর মধ্যে কোথাও নাই। বঙ্গ বিচ্ছেদ সম্পন্ন হইলে, উভয় বঙ্গের রাজ-সরকারে বিক্রমপুরীদের অবাধ নিয়োগের আমি বন্দোবস্ত করিব।"

বিক্রমপুর অতি ক্ষুদ্র স্থান কিন্তু ইহার বিজয়-গরিমা সামান্য নহে। পৃথিবীর বর্ত্তমান সভ্যতা ও উন্নতির মূলে বিক্রমপুর। এ কথার সমর্থন ও সার্থকতা, পাঠকগণ পরে দেখিতে পাইবেন।

আমরা বাঙ্গালী ইতিহাস-পরাঙ্মুখ আত্ম-বিস্মৃত জাতি। ইতিহাস জীবিত জাতির সামগ্রী। আমরা জীবন্মৃত, আমাদের ইতিহাসও তদ্রূপ; কেবল কতগুলি গল্প-গুচ্ছ। বিক্রমপুরের ইতিহাস উদ্ধার সহজ সাধ্য নহে। তবে চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? নিম্নে আমি বিক্রমপুরের শিথিল-গ্রন্থি কিছু বিবরণ দিতেছি; বিগত প্রায় পাঁচ হাজার বৎসরের মোটামোটী কথা তাহা হইতে জানা যাইতে পারে।

আর্য্যগণ যখন ভারতের উত্তরে মধ্যএশিয়ায় বাস করিতেন, তখন তাঁহারা নানা শাখায় বিভক্ত ছিলেন। তন্মধ্যে দৈত্য-আর্য্যগণই বাহুবলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল। দেব-আর্য্যগণ বীরত্ব, বিদ্যা ও আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান্ ছিল। মিটানি আর্য্যগণ এশিয়ামাইনরে গিয়া বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বোঘাজ্ কিয়ঐ নামক স্থানে ভূগর্ভস্থ এক প্রাচীন মন্দির হইতে উত্থাপিত খৃঃ পূঃ ১৩৮৫ সনের তাদের একখানা শিলালিপিতে বৈদিক দেবগণের নিকট প্রার্থনায় উল্লেখ আছে। দৈত্যকুলপ্রদীপ প্রহ্লাদের নাম সকলেই জানেন। কাশ্মীরের নীচে উপর-সিন্ধু দেশে প্রহ্লাদের রাজ্য ছিল। ধর্ম্মপ্রাণ প্রহ্লাদ প্রজারঞ্জক ছিলেন। তাঁহার পুত্র বিরোচন; বিরোচনের পুত্র বলি। বলির প্রকৃত নাম অজ্ঞাত; শৈশব হইতে মহাবলপরাক্রান্ত ছিল বলিয়া, অভিষেকের কালে তাহার "বলি" নাম হয়।

বলি অচিরে নিজ বাহুবলে সমগ্র সিন্ধুদেশে নিজ রাজ্য সু-প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার দুই ভাই তাহার পরম সহায় ছিল। হিন্দু ঐতিহাসিকগণ বলিকে "আদি সম্রাট" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। মহাভারতে ও অন্যান্য গ্রন্থে বলির ইতিবৃত্ত দৃষ্ট হয়। বলি কিন্তু প্রজা-রঞ্জক ছিল না। দেব-আর্য্যগণের রাজ্যে মুনিঋষিগণ "নিষ্কর" ভূ-সম্পত্তি ভোগ করিতেন, রাজ-দরবারে যথেষ্ট সম্মানিত হইতেন এবং সময় সময় আবশ্যকমত মন্ত্রণা দিতেন।

বলির রাজ্যে এসব কিছুই ছিল না। তিনি ঋষিগণকেও করপ্রদ ও অবজ্ঞাত করিয়াছিলেন। প্রজার উপর দৌরাত্ম্যও কম ছিল না। সুতরাং সর্ব্বত্র আন্তরিক রাজদ্বেষ ছিল। সম্পদ-মদ-মত্ততায় বলি যেন ধরাকে শরা জ্ঞান করিতেন, প্রজার অসন্তোষকে তৃণ-তুল্য মনে করিতেন। বলির রাজ-সভায় স্তাবক ও জ্ঞানী মন্ত্রিগণের অভাব ছিল না। কিন্তু প্রায়ই সে স্তুতিবাদের দিকে নত্র হইত। চাটু-পটু মূর্খজন বলিকে প্রত্যক্ষ-ঈশ্বর বলিয়াই বন্দনা করিত। জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ মন্ত্রিগণ বিস্তর চেষ্টাতেও বলির চৈতন্য জন্মাইতে পারিলেন না। বলা বাহুল্য, অসুরবল রাজ্য-শাসনের অঙ্গ নহে; রাবণের রাজত্ব ক্ষণ-বিধ্বংসি। শীঘ্রই বলির ভীষণ প্রমাদ উপস্থিত হইল।

এই সময়ে মধ্য এশিয়ায় এক তুমুল যুদ্ধ বাধিল। ইহা "দেবাসুর" যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। মধ্য এসিয়া হইতে মধ্যভারত পর্য্যন্ত এই যুদ্ধের

রণস্থল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ৩২ বৎসর পর্য্যন্ত এই সংগ্রাম চলিয়াছিল। দেব-আর্য্যগণ একদিকে, দৈত্য, দানব, পণি প্রভৃতি "অসুর" নামক আর্য্যগণ অপর পক্ষে ছিল। যুদ্ধের কারণ সংক্ষেপে এই ঃ— ভারতীয় চন্দ্রবংশের আদি পুরুষ অত্রিপুত্র বীরবর সোম মঙ্গোলিয়ার রাজা ছিলেন। তিনি বীরদর্পে রাজসূয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষী হইয়া অন্যান্য আর্য্য রাজগণকে আহ্বান করেন।

দৈত্য-পতিগণ রোষে ও অভিমানে জ্বলিয়া, দেব-আর্য্যগণকে আক্রমণ করে। যুদ্ধে দেবগণ পরাস্ত এবং তাহাদের ২১টী রাজ্য দৈত্যদের অধীন হয়। দৈত্যদের অত্যাচারে দেবগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিল।

ব্রহ্মা থিয়ান্‌শান্ ছাড়িয়া, বহু উত্তরে সাই-বিরিয়ায় গিয়া "সিন্ধুপরী" নির্ম্মাণ করেন। ঐস্থান এখনও মানচিত্রে "সিদ্‌রব্" (Sid-rov) নামে উল্লিখিত আছে। দেবগণের রাজা ইন্দ্র, বীরবর বিষ্ণু ও অন্যান্য নেতৃগণের চালনায়, দেব-আর্য্যগণ বিতাড়িত হইয়া ভারতে আশ্রয় লন। ইন্দ্র ১১ জন আর্য্য-পতিকে আফগান স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। তন্মধ্যে বরুণ শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এই বরুণই গ্রীক্‌দের আদিপুরুষ বলিয়া কথিত হয়।

ইন্দ্র ও বিষ্ণু অবশিষ্ট আর্য্যগণকে লইয়া ভারতে প্রবেশ করিলেন। পরে সিন্ধুনদী উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমে বলির রাজধানীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। এ স্থান দেবদলের বেশ মনোনীত হইল। তাই, ইন্দ্র ও বিষ্ণু বলির নিকট উপস্থিত হইয়া নবাগত আর্য্যদের উপনিবেশের জন্য কিছু স্থান প্রার্থন করেন। কিন্তু মন্ত্রিগণ অজ্ঞাত কুলশীল নবাগত আর্য্যগণকে বাসস্থান দেওয়ার বিরুদ্ধে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু বলি সে কথায় কর্ণ-পাত করিলেন না। স্তাবকদলের প্ররোচনায় তিনি ইন্দ্র ও বিষ্ণুর প্রার্থনা পূরণ করিলেন। দেবগণ আনন্দে বসবাস করিতে লাগিল।

ঋগ্বেদের এই ঐতিহাসিক তত্ত্ব পরবর্ত্তীকালে এক বিচিত্র আখ্যানে পরিণত হইয়াছে ঃ—বিষ্ণুর বামনবেশে বলির নিকট ত্রিপাদ-ভূমি যাচ্ঞা, বলির দান, পরে বিষ্ণুর স্বরূপ গ্রহণ ও ছলে বলির রাজ্য হরণ ইত্যাদি।

দ্বাদশ আদিত্য ভ্রাতাদের মধ্যে বিষ্ণু সর্ব্বকনিষ্ঠ ও বামন অর্থাৎ খর্ব্বাকৃতি ছিলেন। কিন্তু জ্ঞানে, গুণে, বিদ্যা ও বীরপরাক্রমে তিনি একরূপ অদ্বিতীয় ছিলেন। ছলে বলে কৌশলে বলির রাজ্য হরণ করার ইচ্ছা ইন্দ্র বা বিষ্ণুর ছিলনা। কিন্তু ঘটনা চক্রে অচিরে তাহাই হইয়া পড়িল। দলে দলে মুনি ঋষিগণ, বিবিধ প্রজাগণ বলির দৌরাত্ম্যের বিষয় ইন্দ্র-বিষ্ণুকে জ্ঞাপন করিতে লাগিল। তখন দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য ইন্দ্র ও বিষ্ণু অস্ত্র ধারণ করেন। অচিরে বলির সঙ্গে ঘোর যুদ্ধ বাধিল। বলি পরাজিত হইয়া ভ্রাতৃদ্বয় সহ বন্দী হইলেন। এই ঘটনা স্মরণ করিয়াই ভট্টি-কাব্যকার লিখিয়াছেন ঃ—

"বলির্ব্ববন্ধে, জলধির্ম্মন্থে।"

ইন্দ্র ও বিষ্ণু বলিকে বলিলেন, "আপনি স্তাবক ও নর্ত্তকীবৃন্দে বেষ্টিত থাকিয়া,হয় এই রাজধানীতেই বন্দীভাবে জীবন যাপন করিতে পারেন, না হয়, কোনও দূরতর প্রদেশে গিয়া নূতন রাজ্য স্থাপন করিতে পারেন।"

বলি বীরের পুত্র, বীর, বীরবংশসম্ভূত, তরুণ বয়স্ক। কেন তিনি স্বস্থানে বন্দী-দশায় থাকিবেন? তিনি নূতন রাজ্য স্থাপনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। তখনও আর্য্যগণ ভারতের সকল অংশ জানিতেন। কাশ্মীরাদি উত্তরস্থ সুখকর স্থানকে তাহারা স্বর্গ (Land of Promise) বলিতেন।

ব্যাধি, পীড়া, অকালমৃত্যু-বহুল ভারতীয় মধ্য-ভূমিকে "মর্ত্ত্য" বলিতেন। প্রয়াগ হইতে গয়া এক ভাগকে "কীকট" বলিতেন। ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলকে "পাতাল" বা নিম্নদেশ বলিতেন

আসাম তখন 'কামরূপ' ছিল এবং বিন্ধ্যের দক্ষিণে "দাক্ষিণাত্য" অবস্থিত ছিল। পরাজয়ে বলির কিছু চৈতন্য জন্মিয়াছিল। তিনি আর এখন মূর্খ নিয়া স্বর্গের রাজত্বও চাহেন না, অথচ পণ্ডিত নিয়া পাতালে যাইতেও খুব অভিলাষী। অচিরেই বলি ও তাহার ভ্রাতৃদ্বয় নূতন রাজ্য স্থাপন করিলেন। বলি "পাতালে" আসিয়া বঙ্গেশ্বর হইলেন, দ্বিতীয় ভাই গঙ্গার দক্ষিণে "বগধ" দেশ অধিকার করিলেন এবং তৃতীয় ভাই দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণা-নদীর মুখে সমুদ্রকূলে "চেরপাদ" নামক দেশে রাজ্য পত্তন করিলেন। এই চেরপাদ পরে "চোর মণ্ডল" এবং এখন করমণ্ডল উপকূল নামে কথিত। বগধের শেষ দৈত্যরাজ "ঋষভ"কে যুদ্ধে নিহত করিয়া খৃঃ পূঃ ১৫শ শতাব্দীতে জরাসন্ধের পিতা বৃহদ্রথ রাজা মগধ নামে নূতন রাজ্য গঠন করেন। চেরপাদের অন্ধ্র রাজগণ ভারতের ইতিহাসে অতি প্রসিদ্ধ। কোন রাজবংশ ভারতে এত দীর্ঘকাল রাজত্ব করে নাই। অন্ধ্রগণ ক্রমে বোম্বাই প্রদেশে, পরে উত্তর ভারতের পূর্ব্বার্দ্ধে সাম্রাজ্য-বিস্তার কারিয়াছিল। প্রহ্লাদের ৬ষ্ঠ অধস্তন পুরুষ বিন্ধ্যাচলের নিকট ও মধ্য-ভারতে অনেক রাজ্য স্থাপন করে। এইরূপে ভারতের সর্ব্বত্র প্রহ্লাদের বংশ বিস্তার ও প্রাধান্য লাভ করে। আমার বিশ্বাস, মধ্য-ভারতের দেশীয় রাজগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রহ্লাদ বংশ-সম্ভূত।

বলির সিন্ধুরাজ্য বিভক্ত করিয়া, ইন্দ্র ও বিষ্ণু কতিপয় আর্য্য-পতিকে দিলেন। ক্রমে উত্তর ভারতের অন্যান্য দেশ জয় করিয়া, দেবরাজ মনু, শংখু প্রভৃতিকে স্থাপিত করিলেন। এইরূপে মনু অযোধ্যার রাজা হইয়া সূর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতের কার্য্য শেষ করিয়া, ইন্দ্র ও বিষ্ণু পুনরায় উত্তর দিকে গিয়া, অসুরগণকে পরাজয় করিয়া, দেব-গৌরব ও রাজ্য উদ্ধার করেন। অসুর-পতি বৃত্র ও তাহার ভ্রাতা "বল" (Baal) দেবগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া পারস্য ও তুরস্কে গিয়া নূতন রাজ্য স্থাপন করেন। অসুরগণের প্রিয় অনুচর পণিগণ এশিয়ামাইনরে গিয়া "ফিনিসিয়া" স্থাপন করেন। ইহারা বাণিজ্য-নিপুণ ছিল। খৃঃ পূঃ ২৭৫০ অব্দে ইহারা প্রসিদ্ধ টায়র (Tyre) নগরী নির্ম্মাণ করেন।

বলি স্বদল-বলে পাতালে উপস্থিত হইয়া ক্রমে এ দেশ অধিকার করেন। তখন এ দেশে বড় বীর কেহ ছিল না। বঙ্গের পশ্চিমে তখন কোল জাতি (Kolarians) বাস করিত। পূর্ব্ববঙ্গে ঋগ্বেদোক্ত নিষাদ জাতি (Tibeto Burmans) প্রবল ছিল। বলা বাহুল্য, সুশিক্ষিত আর্য্য-বীরগণের সহিত ইহারা দীর্ঘকাল বিরোধ করিতে পারে নাই। পশ্চিমবঙ্গে বর্দ্ধমান অঞ্চলে দ্রাবিড়গণ প্রবল ছিল। তাহাদের প্রধান গঞ্জ (Port) "তমালিকা" (Tomluk) অদ্যাপি বর্ত্তমান। দ্রাবিড়গণ বাণিজ্যে অতীব পটু ছিল। তাহারা সিন্ধু-বাণিজ্যে বড়ই ধনশালী ছিল। সংস্কৃত "দ্রবিণ" (wealth) শব্দ হইতে দ্রাবিড় কথার উদ্ভব। এই দ্রাবিড় হইতে ক্রমে দাবিড়=দাবিল=দামিল=তামিল হইয়াছে। দ্রাবিড়গণ বশ্যতা স্বীকার করিল। সমগ্র বঙ্গ বলির হস্তগত হইল। বলির পণ্ডিতগণের এদেশের "বঙ্গ" নামকরণ অতি সুন্দর, ও সার্থক। বঙ্গ অর্থ অপুষ্টদেশ (Country of stunted growth); কেননা, উত্তর-পশ্চিম হইতে আগত সমুন্নত ও বলিষ্ঠ আর্য্যগণ এ দেশের লোক, জীবজন্তু ও

বৃক্ষাদি অতি ক্ষুদ্রকায় দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা এ দেশের লোককে "তুর্ব্বল ও তুরাহার" বলিয়াছেন। সংস্কৃত হ্রস্বার্থক "বম্" ধাতু হইতে বাম, বামা, বামন, বঙ্গ প্রভৃতি শব্দ উৎপন্ন। ঋগ্বেদের পরবর্ত্তী অংশে "হস্তি-মৃগ" (elephant), ব্রীহি (ধান্য) প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ দৃষ্টে স্পষ্টই প্রমাণিত হইয়াছে যে, আর্য্যগণ ভারতের সুদূর পূর্ব্বাঞ্চলে বসতি বিস্তার করিয়াছিলেন, ঋগ্বেদের কৌষিতকী ব্রাহ্মণ-গ্রন্থেও এই "বঙ্গ-বগধ-চেরপাদ" রাজ্যের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

ইন্দ্র কর্ত্তৃক বিতাড়িত বৃত্র নামক অসুরের পারস্যে রাজ্য স্থাপন, তদীয় ভ্রাতা বল নামক (Baal) অসুরের মেজোপোটেমিয়ায় রাজ্য স্থাপন, পণিগণের ভূমধ্য সাগরতীরে ফিনিসিয়া স্থাপন, মনুর অযোধ্যা-লাভ এবং বলির বঙ্গজয় প্রায় সম-সাময়িক—খৃঃ পূঃ ২৮০০ অব্দ। বলি পূর্ব্ববঙ্গের বর্ত্তমান বিক্রমপুরে গঙ্গাতীরে "গঙ্গানগর" নির্ম্মাণ করেন এবং ইহাকেই তাহার প্রধান রাজধানী করেন। বলি ইহার নিকটে এক মহতী মেলার সৃষ্টিকর্ত্তা। এই মেলা প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর চলিয়া প্রায় বিশ বৎসর যাবত উঠিয়া গিয়াছে।

পাটলীপুত্রের গ্রীক্-দূত মেগাস্থিনিসূই সর্ব্ব প্রথমে এই গঙ্গানগরের সমৃদ্ধি ও মহামেলার উল্লেখ করেন (খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী)। এখানে বলা হইতেছে খৃঃ পূঃ ২৮০০ বৎসরের কথা। রামায়ণ, মহাভারতে গঙ্গানগরের নাম স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত না থাকিলেও অত্রত্য বীরত্ব, শিল্প, শস্য-সমৃদ্ধির যথেষ্ট উল্লেখ আছে। বিক্রমপুরে নীল (Indigo) ও মস্‌ণ বস্ত্র (muslin) চিরকাল জগৎ প্রসিদ্ধ।

প্রাচীন মিশর ও এসিরিয়ান সাম্রাজ্যের কথা অনেকে শুনিয়াছেন। কোন কোন প্রত্নবিৎ বলেন, এখন হইতে দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বেও ঐ তুই দেশ সুসভ্য ও সমুন্নত ছিল। অন্য এক দল প্রত্নবিৎ বলেন, এখন হইতে প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঐরূপ অবস্থা ছিল। আমাদের ঋগ্বেদের কালাঙ্কের সহিত এই শেষোক্ত দলের মতের ঐক্য আছে। যাহা হউক, মিশরের জনৈক রাজার Mummy অর্থাৎ সংরক্ষিত শবে ব্যবহৃত নীলবস্ত্র অণুবীক্ষণ-যন্ত্র যোগে আবিষ্কৃত হইয়াছে। চিরকালই নীল ভারতের একমাত্র পণ্য। ইহার ইংরাজী নাম Indigoও সে কথা ব্যক্তকরে। এই নীল ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলে প্রস্তুত হইয়া পৃথিবীর নানা দেশে যাইত। আধুনিক ইউরোপীয়গণ কৃত্রিম উপায়ে নীল তৈয়ার করিতে শিখিয়া ভারতীয় নীলকে অপসৃত করিয়াছে। নীলের স্থানে এখন "যুথ (Jute)" দাঁড়াইয়াছে। এই পাটেরও প্রধান কেন্দ্র পূর্ব্ববঙ্গ।

এসিরিয়ার শিলাপট্টে ভারতীয় হস্তি-ময়ূর প্রভৃতির চিত্র অঙ্কিত আছে। ভারতে একমাত্র "গারো" পর্ব্বতে হস্তী প্রাপ্য। এসিয়ার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ "মস্‌ণ" বস্ত্রের বড়ই আদর ও ব্যবহার করিতেন। "মস্‌ণ" বস্ত্রের মূলস্থান বিক্রমপুর। বলির সহাগত শিল্পীকুল এদেশের গুটিপোকা হইতে সূক্ষ্ম রেশম লইয়া এই "মস্‌ণ" কাপড় তৈয়ার করিত। ১৩২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই শিল্প এখানে চলিয়াছিল। ১৩২৮-৩০ খৃষ্টাব্দে মুসলমান-গণ পূর্ব্ববঙ্গ জয় করেন এবং বিক্রমপুর ত্যাগ করিয়া ঢাকাতে রাজধানী আরম্ভ করেন। তদবধি রামপালের শিল্পীকুল ঢাকাতে চলিয়া যায়। অদ্যাবধি ঢাকাতেই এই সব সূক্ষ্ম সূত্র-শিল্প বেশ চলিতেছে।

পূর্ব্ব ভারতে গঙ্গানগর ও তমালিকা দক্ষিণে কলিঙ্গ-নগরী, এবং পশ্চিম ভারতে "ভৃগু-কচ্ছ"

(বর্ত্তমান Broach)—এই ৪টীই অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতের প্রসিদ্ধ বন্দর (port)। পাশ্চাত্যগণের মধ্যে একমাত্র বিজ্ঞবর টেলর সাহেবই গঙ্গানগরের প্রকৃত অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "মুন্সীগঞ্জের নিকটস্থ 'চরের' উপর যে বার্ষিকী মেলা মিলে, তাহা প্রাচীন মেলার ছায়ামাত্র। ইহারই নিকটে গঙ্গানগর অবস্থিত ছিল। লক্ষপতি ভিন্ন অন্য বণিক এখানে বাস করিতে পারিত না।" গঙ্গানগরের প্রাচীন সমৃদ্ধি বাণিজ্যৈশ্বর্য্য এবং পণ্যসম্ভার এখন কল্পনা করাও কঠিন। হস্তী, ঘোড়া অদ্ভুত জীবজন্তু, মণিমাণিক্য, রত্ন-কাঞ্চন, অলঙ্কার, মর্ম্মর-প্রস্তর-রচিত মন্দির ও মূর্ত্তি, কারুপট্ট, ক্ষৌম বস্ত্র, "বাঙ্গকং শ্বেতং স্নিগ্ধং দুকূলম্" (Muslin), বিচিত্র শাড়ী, বিবিধ চূয়া চন্দন, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি এখান হইতে বিদেশে যাইত। গঙ্গাবক্ষ নিরন্তর দেশী বিদেশী বাণিজ্য-পোতে সমাচ্ছন্ন থাকিত।

গ্রীক্‌গণ বলিয়াছেন—"গঙ্গা পূর্ব্বাবাহিনী হইয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। গঙ্গার মোহনার নিকটেই গঙ্গা-নগর অবস্থিত।" এই বর্ণনা খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর। এই সুদীর্ঘকালে প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন অনেক হইয়াছে। গঙ্গা বর্ত্তমান গোয়ালন্দ হইতে পূর্ব্ব মুখে ধাবিত হইয়া মাণিকগঞ্জ ও ঢাকার দক্ষিণ দিয়া পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে কিছু ঘুরিয়া পূর্ব্বমুখী হইয়া সমুদ্রে পড়িত। নারায়ণগঞ্জের দক্ষিণ অংশ বন্দর, মদনগঞ্জ প্রভৃতি স্থান তখন গঙ্গা-গর্ভে ছিল। বঙ্গোপসাগরের এক শাখা তখন শ্রীহট্ট, কাছাড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পূর্ব্বে স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের পশ্চিমদিকস্থ "মণিমতি" গিরি বর্ত্তমান ময়নামতির পাহাড়ের নীচেই তখন সমুদ্র ছিল। এই সমুদ্রের কথা মহাভারতেও উল্লিখিত হইয়াছে।

"অর্জ্জুন সমুদ্র তীরে তীরে চলিয়া পরে মণিপুর রাজ্যে উপস্থিত হইলেন।" ত্রিপুরা জিলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা অতি প্রাচীন। মৃত্তিকাস্তর ইহার প্রধান সাক্ষী। ত্রিপুরার বাকী অংশ ও নোয়াখালী জিলা পূর্ব্বে দুইটী বৃহৎ দ্বীপ ছিল। কালে নদীগুলি শুকাইয়া, একটী বিশাল ভূ-ভাগে পরিণত হইয়াছে। একখানা তন্ত্রোক্ত "নব কোশল"ই এখন নোয়াখালী নাম ধারণ করিয়াছে। মহাভারতে চট্টগ্রাম বিভাগ "পাতালে নাগলোক" বলিয়া কথিত। গ্রীক্‌দের সময়ে উহাকে Kiradia অর্থাৎ "কিরাত" দেশ বলা হইত। তখন ও আর্য্যগণ ঐ দিকে যায় নাই।

সমুদ্রের পশ্চিম পারতকই "লাঙ্গলবন্ধ" অর্থাৎ আর্য্যদের কৃষিকার্য্যের শেষ সীমা ছিল। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী হইতে সম্ভবতঃ ঐ নূতন দেশদ্বয় "সমতটের" অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে এবং আর্য্যগণের বাসভূমি হইয়া দাঁড়ায়। সাগর-মুখের হাতিয়া, সন্দ্বীপ, ভোলা প্রভৃতি দ্বীপগুলিও কালে পরস্পর সংলগ্ন হইয়া, এক নূতন জিলার সৃষ্টি করিবে।

ভীষণ ভূমিকম্পে ভূমি উৎক্ষিপ্ত হওয়ায়, ভারতের এই সুদূর পূর্ব্বাঞ্চলের বড় বড় নদীগুলি অনেক শুকাইয়া যাইতেছে।

ঢাকার দক্ষিণে এখন আর গঙ্গা পূর্ব্ববাহিনী নাই। বহুকাল যাবত বিশাল গঙ্গা বক্ষে "পারজোয়ার" নামক পরগণা উঠিয়া, গঙ্গাকে শীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। কেবল তন্নুতটিনী "বুড়ীগঙ্গা" এখন পূর্ব্ব নাম কিয়ৎ পরিমাণে জাগরুক রাখিয়াছে। পূর্ব্বদিকে সমুদ্র ক্রমশঃ সংকীর্ণ হইয়া মেঘবন্নাদী 'মেঘনাদে' পরিণত হইয়াছিল। তাহারও এখন অতীব শোচনীয় অবস্থা। যাহার প্রশান্তোজ্জ্বল মুক্তিপ্রদ বিশাল বারিরাশি সন্দর্শন করিয়া, এক দিন ব্রাহ্মণ-বীর পরশুরাম, নিখিল ক্ষত্রিয় সংহার জনিত পাপ

দূর করিয়াছিলেন, নিজ ক্ষুব্ধ আত্মার বিশদ প্রকাশ লাভ করিয়াছিলেন, বিরাট জল-দর্পণে বিশ্বরূপের প্রতিবিম্ব অনুসরণ করিয়াছিলেন, সেই "তীর্থরাজ সুগভীর, সুঠাম, সুগতি উজ্জ্বল-নীর" ব্রহ্মপুত্র এখন সমাজের ব্রহ্মপুত্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণের মলিন নিষ্প্রভ যজ্ঞসূত্রবৎ হইয়া পড়িয়াছেন !!

আহা ! সেই একদিন, আর এই একদিন !! এখন আর জলযুদ্ধনিপুণ পূর্ব্ববঙ্গবাসীগণ স্বকীয় রণতরী যোগে দিগ্বিজয়ী রঘুর গতি প্রতিরোধে অশেষ বিক্রম প্রদর্শন করিতেছেন না। এখন আর ধনপতি সদাগরের বাণিজ্য-বহর কামাখ্যা হইতে সিংহল পর্য্যন্ত যাতায়াত করে না। এখন আর চন্দ্র-সদাগরের সপ্ত ডিঙ্গা এবং মনোজ্ঞ "মধুকর" বারিরাশির উপর দৃষ্ট হয় না। ছদ্মবেশী বিক্রমের যুদ্ধ, কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্কের "ব্রহ্মপুত্র যুদ্ধ", "বিক্রমপুরের যুদ্ধ" প্রভৃতি সবই এখন অতীতের কথা, এবং স্বপ্ন। নীরব গঙ্গার জল, শান্ত মেঘনাদ। চীন ও আরবের পণ্য পোতসকল পালিভরে অরিত্র-ক্ষেপে জল বিদীর্ণ করিয়া এখন আর গঙ্গানগরে উপস্থিত হয় না।

গঙ্গানগর ক্রমে "নগর" নাম ধারণ করিল; মুসলমানগণ তাহাতে 'কসবা' (Port) নাম যোগ করিলেন। পার্শী কস্‌বা শব্দের অর্থ গঞ্জ বা বন্দর (Port)। তাই গঙ্গানগর এখনও 'নগরকস্‌বা' নামে দ্বৈভাষিক মূর্ত্তিতে (Bilingual form) বিরাজমান। এই গঙ্গানগর হইতেই ইদানীং মদনগঞ্জ, মীরকাদিম নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি বাণিজ্য স্থানের সৃষ্টি হইয়াছে।

স্ব-বাহু-প্রতাপার্জ্জিত বিশাল বঙ্গের একচ্ছত্র প্রভূত্ব লাভ করিয়া বলির পূর্ব্বতন পরাজয়-খেদ দূর হইয়াছে। তিনি এখন সুযোগ্য সচিব ও কর্ম্মচারীগণকে অনুবল করিয়া বিবিধ রাজ্য-হিতকর কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। এদেশের লোক "দুর্ব্বল, দুরাহার, অনাস (উত্তম ভাষা হীন), অযাজ্ঞিক" ছিল।

তিনি সর্ব্বত্র সমুন্নত আর্য্য-সভ্যতার বিমল আলোক প্রজ্জ্বলিত করিলেন। বিদ্যা, বাণিজ্য, শিল্পাদির প্রভূত উৎসাহ দান করিতে লাগিলেন এইরূপে বলির রাজত্বের প্রথম ১০।১২ বৎসর অতীত হইল। দেশ নিরুপদ্রব হইল; সঙ্গে সঙ্গে শান্তির অনুবর্ত্তিনী নানাবিধ উন্নতি সমৃদ্ধি বাড়িতে লাগিল। কিন্তু বলির মানস-রাজ্যে এক নূতন খেদ কালিমা বিস্তার করিতে লাগিল। রাজ্য, লোকজন, ভোগসুখ কিছুই আর এখন তাহার নিকট প্রীতিপ্রদ নহে। তিনি শূন্যপ্রাণে রাজসভায় আসেন, উন্মনস্কভাবে রাজকার্য্য করেন এবং বিরস মনে অন্তঃপুরে যান। সেখানে তাঁহার মনের খেদ আরও বাড়িয়া যায়। প্রিয়তমা মহিষীর প্রসন্নোজ্জ্বল মুখমণ্ডলে বিষাদের ছায়াপাত দেখিয়া তিনি কাতর হইয়া পড়েন। এই রাজপুরে কিসের অভাব, কিসের দুঃখ? বলি এখনতক নিঃসন্তান, তাই রাজ-দম্পতি, সচিবগণ ও অন্যান্য সকলে দুঃখে ম্রিয়মাণ। রাণী সুদেষ্ণার এখনও সন্তান হওয়ার বয়স অতীত হয় নাই; তথাপি বিলম্বে গভীর দুঃখ উৎপন্ন হইয়াছে।

একদিন বলি এক নিভৃত কক্ষে স্বকীয় বিশ্বস্ত অমাত্য ও মিত্রগণকে ডাকিয়া বলিলেন— "আপনারা সকলে দেখুন, আমি আজ পর্য্যন্ত নিঃসন্তান, অনপত্যতার ন্যায় দুঃখ ও পাপ, বোধ হয়, আর নাই। বংশ-লোপ ও রাজ্য নাশের আশঙ্কায় আমি বড়ই বিচলিত হইয়াছি। রাজ-জ্যোতিষী বলেন আমার নিজের সন্তান

হইবে না ; অথচ রাণীর বহু সন্তান হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য।” তন্মধ্যে জনৈক বিচক্ষণ সচিব বলিলেন, “মহারাজ, বংশরক্ষার জন্য, ঔরস পুত্রের অভাবে, ঋষিগণ বহুবিধ পুত্রের বিধান করিয়াছেন। যথা, জারজ, কৃত্রিম, দত্তক, কানীন, স্বয়মাগত, অনুকল্পিত প্রভৃতি।

“সাধারণ কাহাকেও পুত্র লইলে বংশরক্ষা হইতে পারে বটে, কিন্তু সে সুমানুষ না হইলে, এই বিপুল বিষয় রক্ষা হইবে না। তাই আমার মত, কোনও সচ্চরিত্র জ্ঞাতি বা ঋষিতুল্য ব্যক্তি দ্বারা রাণীতে সন্তান উৎপাদন করা।” সর্ব্বসম্মতিক্রমে এ কথাই গৃহীত হইল। প্রথমে ভাল একজন জ্ঞাতি, অথবা ব্রহ্মাবর্ত্ত, অযোধ্যা প্রভৃতি আদর্শ আর্য্যস্থান হইতে একজন ঋষিকল্প ব্যক্তির আনয়ন আবশ্যক হইয়া পড়িল। ভাগ্যক্রমে বিধাতা প্রসন্ন হইয়া অচিরেই এই সমস্যার এক সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিলেন। গঙ্গার অনেক উপরের দিকে দীর্ঘতমা নামে এক মুনি বাস করিতেন। তাহার তরুণ বয়স, কান্ত বপু, অভ্রান্ত জ্ঞান, একনিষ্ঠ ধ্যান, এবং অসাধারণ তপঃপ্রভাব ছিল। তিনি নিজ ব্যয়ে বহু শিষ্যকে বিদ্যা দিয়াছেন। কিন্তু এখন অকালে দৈবক্রমে অন্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। নিজ পরিণীতা স্ত্রী ও ঔরস-পুত্র এই অন্ধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইল। তাহারা এই অন্ধ বিপ্রকে বড় ক্লেশকর গলগ্রহ মনে করিতে লাগিল। কিছু দিনের আহার্য্য সঙ্গে দিয়া, এই রাক্ষসী পত্নী ও নরাধম পুত্র ঐ দীর্ঘতমাকে এক ভেলায় করিয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দিল। গঙ্গদত্ত নামে দীর্ঘতমার এক প্রিয়শিষ্য গুরুর এরূপ বিপদের কথা শুনিয়া, তখনি তাঁহার রক্ষার জন্য অগ্রসর হইলেন। এক-খানা নৌকা সংগ্রহ করিয়া গুরুকে তাহাতে উঠাইলেন এবং নিম্ন-স্রোতানুসারে পূর্ব্বদিকে চলিলেন। মহারাজ বলির পূর্ব্ব পরাজয় এবং পাতালে নবাভ্যুদয় সর্ব্বত্র বিদিত হইয়াছিল। বলি একজন বেশ দাতা এবং গুণগ্রাহী বলিয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। দীর্ঘতমা তাঁহার নিকট উপ-স্থিত হইয়া শরণ প্রার্থী হইবেন মনন করিলেন।

দীর্ঘকালে উহারা গঙ্গানগরে উপস্থিত হইলেন। এই দীর্ঘতমার ঔরসে রাণী সুদেষ্ণার গর্ভে ক্রমে পাঁচটি দিগ্বিজয়ী পুত্র জন্মিল। কুমারগণ যত্নে লালিত পালিত, পরে নানা বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিল। তখন বলি তাহাদিগকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এক পুত্র অঙ্গ দেশের (বর্ত্তমান ভাগলপুর বিভাগের) কর্ত্তৃত্ব পাইলেন। এক পুত্র বঙ্গের (বর্ত্তমান ঢাকা বিভাগের) রাজকার্য্য পরিচালনে সদরে রহিলেন। এক পুত্র কলিঙ্গের (বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সী বিভাগের) উপরাজ (Viceroy) হইলেন। বহু পরবর্ত্তী কালের গ্রীকদূত এই ভাগকে “মধ্য কলিঙ্গ” নাম দিয়াছেন। এককালে ইহা একটী প্রকাণ্ড দ্বীপ ছিল। পরবর্ত্তী হিন্দুগণ ইহাকে “নবদ্বীপ” (New Island) বলিত। নবদ্বীপ এক্ষণে নদীয়া জিলা। গ্রীকদের সময় গঙ্গা পঞ্চ-মুখে সাগরে পড়িত। ফরিদপুর জেলার পশ্চিম সীমাস্থ নদীটি এখন একেবারে লুপ্ত হইয়াছে। কলিঙ্গনাথ ক্রমে সরিয়া মান্দ্রাজের উপকূলে উপস্থিত হয়। ইহার পরই “ত্রি-কলিঙ্গ” নামের উৎপত্তি। তাহার অপভ্রংশে “তেলিঙ্গ” প্রভৃতি নাম পরে উৎপন্ন হয়। অন্য এক পুত্র পুণ্ড্র দেশের (বর্ত্তমান রাজসাহী বিভাগের) কর্ত্তৃত্ব পান। এই দেশ অতি প্রাচীনকাল হইতে পুণ্ড্র জাতি (কৈবর্ত্ত) বহুল ছিল। পুণ্ড্র হইতে বর্ত্তমান “পোঁদ” কথার সৃষ্টি।

রাজসাহী বিভাগে, নিজ কলিকাতায় এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে এখনও বহু পোঁদ জাতীয় জমিদার ও সমৃদ্ধ মৎস্য-ব্যবসায়ী লোক আছেন।

আর এক পুত্র সুহ্ম দেশের (বর্ত্তমান বর্দ্ধমান বিভাগের) রাজা হইলেন। ইহারা সকলেই বলির অধীনে থাকিয়া বেশ দক্ষতার সহিত রাজ-কার্য্য চালাইতে লাগিলেন এবং দেশের নানাবিধ শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তৎপর হইলেন। পুরাণে উক্ত আছে, অশ্বত্থামা, বলি, ব্যাস, হনুমান, বিভীষণ, পরশুরাম প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় সাত জন মহাপুরুষ অতি দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হন। সম্ভবতঃ ইহাদের প্রত্যেকেই ন্যূনাধিক দেড়শত বৎসর জীবিত ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে দ্রোণের ৮৫ বৎসর ও যুধিষ্ঠিরের ৭৫ বৎসর বয়স ছিল। এই প্রাচীন বয়সেও দ্রোণ পূর্ণ-বিক্রমে যুবার ন্যায় যুদ্ধ করিয়াছিলেন :—"রণে পর্য্যচরৎ দ্রোণো বৃদ্ধঃ ষোড়শবর্ষবৎ।" (মহাভারত)। সে কালের আয়ুর কথা স্বতন্ত্র।

বলির বংশের ইতিহাস, এমন কি বংশ-লতাটি পর্য্যন্ত এখন বিলুপ্ত। "বঙ্গে ও বগধে" (মগধে) বলি ও তাহার ভাইএর বংশ খৃঃ পূঃ ১৪০০ পর্য্যন্ত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। মহাভারতে উক্ত আছে, দৈত্যরাজ "ঋষভ"ই মগধের শেষ রাজা। তাহাকে যুদ্ধে নিহত করিয়া, জরাসন্ধের পিতা বৃহদ্রথ তথায় "বার্হদ্রথ" রাজবংশ স্থাপিত করেন। খৃঃ পূঃ ১৪০০ বর্ষে জরাসন্ধ ভারতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। ভারতের পূর্ব্বাঞ্চল তাঁহার অনুগত ছিল এবং অন্যত্রও তাঁহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি অসাধারণ ছিল।

এই সময়ে বঙ্গে—বিক্রমপুরে গঙ্গানগরে সমুদ্র-সেন ও চন্দ্রসেন রাজা ছিলেন (মহাভারত)। বিক্রমে ও বাহুবলে দৈত্যবংশ চিরকাল অদ্বিতীয় ছিল। সগরের যজ্ঞাশ্ব একমাত্র বঙ্গেই ধৃত হয় এবং তাহার ৬০০০০ সৈন্য একটিতক নিহত হইয়াছিল। আসাম জয় করিয়া রঘু বঙ্গে উপস্থিত হইলে, বিক্রমপুরীগণ জলযুদ্ধে রঘুকে বড়ই বিব্রত করিয়াছিল। অবশেষে পরাজিত হইলেও, যুদ্ধে তাহাদের সিংহ-বিক্রম দেখিয়া রঘু বিস্মিত হইয়াছিলেন। সূর্য্যবংশীয় রাজগণ আর্য্যাবর্ত্তে পূর্ণ-প্রভাব বিস্তার করিয়া দাক্ষিণাত্য জয়ে অগ্রসর হইলে, বিন্ধ্যাচলের দৈত্য-রাজগণ কেবল তাঁহাদের গতিরোধই করিয়াছিল না, পরন্তু সূর্য্যগণকে এরূপ পরাজিত ও অপদস্ত করে যে, সূর্য্যবংশীয় রাজগণ নিরুপায় হইয়া অগস্ত্যের শরণ লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অগস্ত্য দক্ষিণদেশ হইতে আসিয়া উভয়-পক্ষের মধ্যে সন্ধিস্থাপন করিয়া দেন। দশরথের কালে অঙ্গদেশে তাঁহার প্রিয়বন্ধু লোমপাদ রাজা ছিলেন। ইনি নিঃসন্তান বলিয়া দশরথ তাঁহাকে নিজ কন্যা শান্তাদেবীকে দত্তকরূপে প্রদান করেন। বিভাণ্ডক মুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ এই শান্তাদেবীকে বিবাহ করেন। এই লোমপাদ কোন্ বংশের ছিলেন জানি না। দুর্য্যোধন অঙ্গদেশ জয় করিয়া কর্ণকে তথায় রাজা করেন।

দশরথের সময় বঙ্গদেশ অযোধ্যার অধীন ছিল। দশরথ কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন :—"ধন-ধান্যপূর্ণ বিশাল ও সমৃদ্ধ বঙ্গদেশ তোমার ভরতকে দেই, তথাপি তুমি রামের বনবাস কথাটী ত্যাগ কর" ইত্যাদি। পাণ্ডবের দিগ্বিজয়কালে বঙ্গের পাঁচটি বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন রাজা ছিলেন এরূপ উল্লেখ আছে।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে ও কুরুক্ষেত্র-সমরে (খৃঃ পূঃ ১৩৮৯) বিক্রমপুরের রাজা উপস্থিত ছিলেন জানা যায়। হস্তিনাপুরের পাণ্ডব-বংশের ক্রমিক নিস্তেজ অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে মগধের পুনরভ্যুদয় আরম্ভ হয়।

খৃঃ পূঃ ৭৩০ অব্দে "গৌড়" নামক জনৈক ভোজ-বংশীয় রাজকুমার মালদহ জিলায় স্বনামে গৌড়নগর স্থাপন করেন। প্রথমে গৌড় একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। কিন্তু কালে উহা বিশাল হইয়া সমগ্র বঙ্গদেশকে "গৌড় ও বঙ্গ" এই দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত করিয়াছিল। মগধের প্রসিদ্ধ রাজা বিম্বিসার অঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন কিন্তু বঙ্গ স্বাধীন ছিল।

খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে নির্ব্বাসিত বাঙ্গালী রাজকুমার বিজয়সিংহের লঙ্কা-জয়ের কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। সিংহ-বংশ হইতে লঙ্কার বর্ত্তমান সিংহল নাম। "অনুরাধাপুরে" এই বংশের রাজধানী ছিল। তথায় এখনও বহু প্রাচীন কীর্ত্তি বর্ত্তমান আছে। জনৈক সিংহল পর্য্যটকের নিকট শুনিয়াছি উক্ত বিজয়সিংহের বংশধরগণ এখনও সিংহলে আছেন; তাঁহাদের আকৃতি, পরিচ্ছদ ও ভোজন প্রভৃতি সবই বাঙ্গালীর ন্যায়। "মহাবংশ" ও "দীপবংশ" ইহাদের ইতিহাস।

খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে মালবরাজ্য ভারতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল। মহাকবি ভাস নিজ "প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ" নামক নাটকে লিখিয়াছেন, "অবন্তি-রাজ প্রদ্যোৎ নিজ মহিষী অঙ্গারবতীকে বলিতেছেন, মহিষি! বাসবদত্তাকে কোথায় বিবাহ দেই? কোশলরাজ, পরাক্রান্ত বঙ্গাধিপ প্রভৃতি অনেক রাজাই তাঁহাদের ছেলের জন্য শ্রীমতীকে চাহিতেছেন ইত্যাদি"। এসময়েও বিক্রমপুর বেশ গৌরবে ছিল।

বুদ্ধদেব সাদরে আহুত হইয়া ২।৩ বার বিক্রমপুরে আসিয়াছিলেন। তিনি এ দেশের পর্ণ-কুটীরের বড় প্রশংসা করিতেন এবং নিজ শ্রমণদিগকে ঐরূপ গৃহে বাস করিতে অনুমতি দিতেন। অশোকের সময় হইতে এই অঞ্চলে বৌদ্ধ-প্লাবন আরম্ভ হয়। সম্ভবতঃ জৈনধর্ম্মের এখানে প্রসার বেশী হয় নাই। তবে উত্তরবঙ্গের বগুড়া জিলা হইতে সুদূর পশ্চিমে গুজরাট পর্য্যন্ত নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে এক সময়ে জৈন-ধর্ম্মের বহুল প্রচার ও প্রাদুর্ভাব ছিল।

বিক্রমপুরের অযথা গৌরব প্রদর্শনের জন্য আমি উর্ণনাভের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত বিবরণগুলি নিজে রচনা করি নাই। কৌতুহলী পাঠক নিম্নোক্ত পুস্তকগুলি দেখিলে স্পষ্ট প্রমাণ পাইবেন :—

(১) ঋগ্বেদের 'ঐতরেয় আরণ্যক' (২-১-১)।

(২) রামায়ণ, অযোধ্যা কাঃ, ১০ম স্বর্গ ৩৭।৩৮ শ্লোক।

(৩) মহাভারত, আদি-পর্ব্ব, ১০৪-৫।

(৪) হরিবংশ, হরিবংশপর্ব্ব, ৩২অঃ, ৩২-৪২ শ্লোক।

(৫) "বলিবন্ধ" নামক সংস্কৃত নাটক।

(৬) সুপ্রাচীন বঙ্গের তীর্থবাহুল্য সত্বেও অনার্য্য ভাব ও বৈদিক আচারভ্রংশ :— মনু (মনুসংহিতা, ১০ম অঃ), দেবল, বৌধায়ন (১-১-২), তীর্থযাত্রা ভিন্ন বঙ্গে আগমন নিষেধ করিয়াছেন।

(৭) পরশুরামের লৌহিত্য তীর্থ অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র-তীর্থ-স্নান (মহাভারত বনপর্ব্ব, তীর্থযাত্রা প্রকরণ)।

(৮) মহাকবি ভাসের "প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণ" নামক নাটক।

(৯) বিষ্ণুপুরাণ, ৪।১৮; গরুড়পুরাণ, ১।১৪৪ অধ্যায় ৭১ শ্লোক; মৎস্যপুরাণ ৪৮অঃ ৭৭-৭৮ শ্লোক; ভীম বঙ্গ জয় করেন, অর্জ্জুন সমুদ্রতীরস্থ বাঙ্গালীদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করেন, (মহাভারত অশ্বমেধ পর্ব্ব)। বঙ্গাধিপ শরহস্তে ১০,০০০ হস্তী লইয়া ভীমপুত্র ঘটোৎকচের পশ্চাদ্ধাবমান হইলেন, (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব্ব)। অর্জ্জুন তাঁহার

দ্বাদশ-বার্ষিক বনবাসকালে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশের সমস্ত তীর্থ দর্শন করেন এবং ধনিগণের হর্ম্ম্যাদি দর্শন করিতে করিতে গমন করিলেন; অবশেষে তাপসগণ-শোভিত মহেন্দ্র পর্ব্বত দেখিয়া দক্ষিণ সমুদ্র-তীরস্থ পথে ধীরে ধীরে মণিপুরাভিমুখে গমন করেন (মহাভারত, আদি-পর্ব্ব)। মহাবংশের ষষ্ঠ সর্গে এবং শিয়ূকী নামক গ্রন্থের ১১শ অধ্যায়ে বাঙ্গালীর সিংহল-বিজয় বর্ণিত আছে।

উদ্ধৃত কথাগুলির সর্ব্বত্রই "বঙ্গ বা বঙ্গদেশ" নামের উল্লেখ। ইহার সঙ্গে বিক্রমপুরের কি সংশ্রব ? বিজ্ঞবর হেমিলটন সাহেব বলেন,—

"The capital of Bengal, both before and afterwards having long been near Dacca in the province of Banga the name is said to have been communicated to the whole." Hamilton's Hindustan, Vol. I. প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ ব্লকমেনও (Dr. Blochman) এইরূপ বলিয়াছেন। পাঠক দেখিতেছেন, ঢাকার নিকটে (বিক্রমপুরে) সুদীর্ঘকাল বঙ্গ অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী থাকায় সমগ্র দেশের নাম "বঙ্গদেশ" হইয়াছে।

বিক্রমপুরে সত্য সত্যই দীর্ঘকাল রাজধানী ছিল, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান্য হইতে সমগ্র দেশ "বঙ্গদেশ" নাম ধারণ করিয়াছে, জনসাধারণের এই ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক।

বলির সহগামী পণ্ডিতগণই—"অঙ্গ" হইতে পূর্ব্ব-সমুদ্র পর্য্যন্ত বিশাল দেশকে "বঙ্গদেশ" নাম দেন। পূর্ব্বে কেবল স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই তিন নাম ছিল। কাশ্মীরাদি উত্তরস্থ দেশকে ঋষিগণ "স্বর্গ" বা সুখকর স্থান (Land of promise) বলিতেন। পঞ্জাব হইতে "কীকট" অর্থাৎ গয়া প্রদেশ পর্য্যন্ত "মর্ত্ত্য" অর্থাৎ ব্যাধি, পীড়া অকাল-মৃত্যু বহুল স্থান বলিতেন। পূর্ব্ব-ভারত পাতাল অর্থাৎ নিম্নস্থান (Lower Provinces) আখ্যা পাইত। সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগ তখন পাতালস্থ "নাগ লোক" নামে কথিত হইত।

আর্য্যগণের বসতি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর-ভারতের নূতন নূতন নাম আরম্ভ হইল, যথা,—আপ—আফগান স্থান, সুবাস্তু—Swat, সপ্তসিন্ধু, ব্রহ্মাবর্ত্ত (বর্ত্তমান বিঠুর) ব্রহ্মর্ষি, বগধ (মগধ), কীকট—গয়াপ্রদেশ, বঙ্গ—(Bengal), নাগলোক, প্রাগ্‌জ্যোতিষদেশ (আসাম), চেরপাদ (Coromandal Coast), রক্ষা বা লঙ্কা (Ceylon) ব্রহ্মদেশ (Burma)। ব্রহ্মাই সর্ব্ব প্রথমে আর্য্যসমাজে ঐ দেশের বিবরণ প্রকাশ করায় আমেরিকার ন্যায় ঐ দেশ পরে ব্রহ্মদেশ নামে পরিচিত হয়। বৈদিক-সাহিত্যে উক্ত হইয়াছে, এক সময় দেবগণ অসুরগণ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া, মধ্য এশিয়া ছাড়িয়া ব্রহ্মদেশে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন।

গ্রীক্-লেখকগণ "বঙ্গ" নামের উল্লেখ করেন নাই। তাহারা পূর্ব্ব-ভারতে "কিরাদিয়া" অর্থাৎ কিরাতদেশ ও তৎপশ্চিমস্থ "গঙ্গারাষ্ট্র" অর্থাৎ বঙ্গদেশের নাম করিয়াছেন। অথচ খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর চাণক্য নিজ "অর্থশাস্ত্রে" (২য় খণ্ড, ১ম অধ্যায়) বঙ্গের "শ্বেত" "স্নিগ্ধ" "মসৃণ" বস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রীক্‌দের "গঙ্গা-রিডয়" আমাদের "গঙ্গারাষ্ট্র"। এই রাষ্ট্র হইতে ক্রমে রাঢ়, পরে তাহা হইতে "রাঢ়"দেশ নাম। মহা-ভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ ও অন্যান্য কতিপয়-লোকে বর্ত্তমান বর্দ্ধমান বিভাগকে "রাঢ়"দেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এটি ভ্রমাত্মক। গঙ্গা-রাষ্ট্র বলিতে সমগ্র বঙ্গ, বিশেষতঃ গঙ্গার

দক্ষিণ দিকস্থ দেশগুলি বুঝাইত। পুণ্ড্রদেশ পরে "বরেন্দ্র" নাম ধারণ করে। তাই, গঙ্গার উত্তর ও দক্ষিণ দুই তীরের দেশের লোকেরা "বারেন্দ্র-শ্রেণী" ও "রাঢ়ীশ্রেণী বলিয়া" এখনও প্রসিদ্ধ।

মেগাস্থিনিস্, এরিয়ান্, ডাইডোরাস্, টলেমি প্রভৃতি গ্রীক্-লেখকগণ বলেন, "গঙ্গারাষ্ট্রীয় লোকদের—অর্থাৎ বাঙ্গালীদের অসংখ্য প্রকাণ্ড হস্তী ছিল। তাই, কোন বিদেশী কখনও এ দেশ জয় করিতে পারে নাই।

সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের পূর্ব্বসীমায় "গঙ্গা-রিডয়" রাজ্য অবস্থিত। কাজেই, কেবল বর্দ্ধমান বিভাগ "গঙ্গা-রিডয়" হইতে পারে না। বর্দ্ধমানের ন্যায় একটী ক্ষুদ্রস্থানের রাজার ৬০,০০০ পদাতি ও অসংখ্য হস্তি বল এবং মৌর্য্য-রাজগণের সঙ্গে যুঝিয়া স্বাধীনতা রক্ষা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

মৌর্য্যকালেও বঙ্গ পাটলিপুত্রের অধীন ছিল না। থাকিলে, গ্রীক্‌গণ পূর্ব্বোক্তরূপ বিবরণ দিতেন না, অথবা রাজকীয় অনুশাসনে স্পষ্ট উল্লেখ থাকিত। তবে, অশোকের ধর্ম্মপ্লাবন বঙ্গে যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছিল। বঙ্গাধিপগণ অতঃপর প্রায়ই বৌদ্ধ ছিলেন এবং বঙ্গের-সর্ব্বত্র অশোক-স্তূপ, স্তম্ভ, চৈত্য প্রভৃতি বিস্তৃত হইয়াছিল। গ্রীক্‌গণ "পার্থেলিস্" (Parthalis) নামে গঙ্গা-রিডয় অর্থাৎ গঙ্গারাষ্ট্র বা বঙ্গের এক প্রাচীন রাজধানীর নাম করিয়াছেন। এই "প্রস্থলী" কোথায়, আজ পর্য্যন্তও তাহার কোনই নির্ণয় হয় নাই। তারপরই "গঙ্গানগরের" নাম করিয়াছেন। গঙ্গার মোহনায় এই রাজধানী ও গঞ্জ (Port) অবস্থিত ছিল। আমি একবার কৌতূহলবশে এই গঙ্গানগর বা বর্ত্তমান "নগর-কস্‌বা"য় উপস্থিত হইয়াছিলাম। স্থানীয় কতিপয় প্রাচীন ব্যক্তি বলিলেন, ঐ স্থানের অতি নিকটে "পুরাণ দেউল" নামক একটা স্থান আছে, তথায় ভূগর্ভে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি প্রোথিত আছে বলিয়া সকলের বিশ্বাস। বর্ত্তমান নগর-কসবা যে প্রাচীন "গঙ্গা-নগর", স্থানীয় লোকে ইহার কোনই সংবাদ রাখে না। এখানে এখনও বহু ধনী-ব্যবসায়ীর বাস। এই গ্রামের অনতিদূরে "পঞ্চসার" নামক প্রসিদ্ধ গ্রাম। তত্রত্য জনৈক ভদ্রলোক কর্ত্তৃক একবার একটী বৃহৎ পুষ্করিণী খনন কালে একটী দালানের ছাদ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মুন্সীগঞ্জ হইতে পশ্চিমে "রামপাল" পর্য্যন্ত ৫।৬ মাইল স্থান ব্যাপিয়া, বঙ্গের বহু প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ মাতা বসুন্ধরার ক্রোড়ে শায়িত আছে।

সদাশয় ব্রিটীশ জাতির অক্লান্ত শ্রম, যত্ন ও অর্থব্যয়ে মিশরের প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি অনেক আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের (U. S. A.) চেষ্টায় পর্ব্বতপ্রমাণ স্তূপরাশি হইতে প্রাচীন এসিরিয়ান্ সাম্রাজ্যের শৌর্য্যবীর্য্য, সভ্যতা, শিল্প, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতির অশেষ নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতেও নানাদিকে প্রাচীন কীর্ত্তির উদ্ধার অবিরত চলিতেছে। বোম্বাইর বদান্য টাটা ভ্রাতাদের অর্থে পাটনায় অশোকের রাজধানীর কত নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে; কিন্তু গঙ্গা-নগর এ পর্য্যন্ত উপেক্ষিত! ভূ-পৃষ্ঠ হইতে বার হাত মাটীর নীচে অশোক রাজধানীর প্রাচীর, থাম, মূর্ত্তি প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে।

আমার বিশ্বাস বর্ত্তমান ভূ-পৃষ্ঠ হইতে অন্ততঃ বিশ হাত মাটির নীচে বলির রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ মিলিতে পারে। পূর্ব্বোক্ত ৫।৬ মাইল স্থানের মধ্যে ভূ-গর্ভে বহু প্রাচীন রাজধানীর নিদর্শন বিদ্যমান। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ যদি দৈবাৎ গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিপথে পতিত হয় তবে ভরসা

করি বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট ও ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রত্ন-সচিব মহাশয় একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন, এই গঙ্গানগরাদির প্রাচীন কীর্ত্তিগুলির উদ্ধার সাধন কোনরূপে সম্ভবপর কিনা।

ধর্ম্মোন্মাদে মৌর্য্যদের বিশাল সাম্রাজ্যের অধঃপতন ঘটিল। তৎপর মিত্ররাজগণ, তৎপর কান্বায়গণ, তৎপর অন্ধ্রগণ, তৎপর বিদেশী কুশানগণ পাটলিপুত্রের অধীশ্বর হইলেন। ইহাদের কাহারও সময়েই 'বঙ্গ' পরাধীন ছিল বলিয়া জানা যায় না। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বঙ্গের এক সমূহ বিপদ উপস্থিত হইল। আসামের উদীয়মান 'বর্ম্মণ'রাজগণ বঙ্গ-বিজয়ে উদ্যোগী হইলেন। এই সঙ্কট কালে উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্য বঙ্গাধিপের পক্ষে ভীষণ সংগ্রামে জয়ী হইয়া কামরূপ সৈন্যকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করেন। বঙ্গাধিপ বিক্রমকে এক বিশাল ভূভাগ 'জায়গীর' স্বরূপ প্রদান করেন। তাহা এখনও 'বিক্রমপুর পরগণা' নামে প্রচলিত। মুসলমানগণ ইহার 'হায়দরাবাদ' নাম দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা প্রোজ্জ্বল হয় নাই।

বিক্রম স্থাপিত 'বিক্রমপুর' সহর পরে 'ইদ্রাকপুর' এবং অধুনা মুন্সীগঞ্জ নামে পরিচিত। বিক্রমের বাসস্থান এখনও 'দেভোগ' নামে খ্যাত। এখানেই বিক্রম-রবি 'বিক্রমাদিত্য' কবি-রবি কালিদাসকে পাইয়াছিলেন। প্রায় এই সময় হইতেই চট্টগ্রাম বিভাগে আর্য্যজাতির বসতি বিস্তার আরম্ভ হয়। আসামের ব্রাহ্মণ বর্ম্মণ-রাজগণ নাগলোক অধিকার করিয়া ঐ অনার্য্য-দেশকে আর্য্য-ভূমে পরিণত করেন।

খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে মগধে হিন্দু গুপ্ত রাজগণের অভ্যুদয় হয়। সমুদ্রগুপ্ত উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহু দেশ জয় করেন। রাজকবি হরিসেন বিজয়-প্রশস্তিতে ভারতের পূর্ব্বভাগে তিনটি প্রত্যন্ত রাজ্যের নাম করিয়াছেন; তাহা এই:—সমতট, ডবাক, কামরূপ। মহাভারতের 'অনূপদেশ' গ্রীকদের 'গঙ্গারাষ্ট্র' এবং এই সময়ের সমতট একই স্থান। সমতট অর্থই Land on the sea level.

সম্ভবতঃ বর্ত্তমান হুগলী নদীই গুপ্তরাজগণের পূর্ব্বসীমা ছিল। তারপর গঙ্গার দক্ষিণদিগস্থ দেশ এবং বর্ত্তমান ত্রিপুরা ও নোয়াখালী জিলার অনেক অংশ লইয়া এই সমতট রাজ্য গঠিত ছিল। কালে আবার সমতট 'হরিকেল' রাজ্য নাম ধারণ করে। বর্ত্তমান ঢাকা হইতে উত্তরে গারো পাহাড় পর্য্যন্ত এবং রাজসাহী বিভাগের অধিকাংশ অংশ 'ডবাক' রাজ্য নামে অভিহিত ছিল।

কামরূপ বর্ত্তমান আসাম। ডাঃ ফ্লীট বলেন, 'এই ডবাকই ঢাকা নামের আদিরূপ।' এই অনুমানটি বড় সত্য বলিয়া মনে হয় না। প্রাচীন সংস্কৃত অভিধান 'ভূরিপ্রয়োগ' প্রভৃতি গ্রন্থে 'ঢক্ক' দেশের উল্লেখ আছে। প্রাকৃত ভাষার তালিকায়ও 'ঢক্কী' প্রাকৃতের নাম আছে। এই ঢাকাই ভাষাই দুইশত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের আদর্শ ভাষা ছিল। 'ডবাক' শব্দটি সংস্কৃতমূলক কিনা সন্দেহজনক। মনে হয় লিপিকর প্রমাদে বা অন্য কোনও কারণে 'ঢক্ক' নামই এলাহাবাদ প্রশস্তিতে ডবাক নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

যদিও পূর্ব্ববঙ্গ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মৌর্য্যগণের অধীন ছিল না, তথাপি একথা সুনিশ্চিত যে বঙ্গে বৌদ্ধপ্রভাব বেশ প্রবল ছিল। স্বয়ং বুদ্ধ বিক্রম-পুরে আসিয়া সাতদিন পর্য্যন্ত নিজ ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং অশোকের প্রচারকগণ এ দেশ মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। এখনও চট্টগ্রাম অঞ্চলে বহু বৌদ্ধের বাস।

য়ুএন চুয়াং বলেন যে, তিনি তাম্রলিপ্ত, সমতট, পুণ্ড্রবর্দ্ধন ও কর্ণসুবর্ণ রাজ্যে অনেকগুলি 'অশোক স্তূপ' দেখিয়াছিলেন। 'অশোকাবদান' গ্রন্থে উল্লেখিত আছে যে অশোক তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যে ৮৪০০০ চৈত্য (Chapels) প্রতিষ্ঠিত করেন।

বিক্রমপুরে এখন আর কোনও আশোক-স্তূপ বা অশোক-স্তম্ভ বিদ্যমান নাই। নদীর গতি এ দেশে এত পরিবর্ত্তনশীল যে, প্রবল স্রোতে সমস্ত পুরাকীর্ত্তিই ভূগর্ভে নিহিত হইয়াছে। ঢাকার পশ্চিমে 'ধামরাই' নামে একটি প্রসিদ্ধ স্থান আছে। উহা বৌদ্ধ 'ধর্ম্মরাজিকা' নামের অপভ্রংশ হওয়ার সম্ভব। ঢাকার উত্তর-পশ্চিমে ভাওয়াল পরগণায় মৃজাপুরের নিকট শাকাসর নামক স্থানে একটি প্রস্তর স্তম্ভ আছে। উহা ৬ ফিট উচ্চ, বেড় ১ফুট ৫ইঞ্চি, এবং ইহা একটি অষ্টকোণ স্তম্ভ (Octagonal monolith)। বৌদ্ধতান্ত্রিক যুগে উহার উপরিস্থ মুর্ত্তিগুলি ক্ষোদিত হইয়াছিল। এখন ইহা হিন্দু মহাদেবের স্তম্ভরূপে পূজিত। যদি প্রকৃতপক্ষে এটি অশোক-স্তম্ভ হয়, তবে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত অশোকের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল বলিয়া প্রমাণিত হয়। কিন্তু উক্ত স্তম্ভে কোনও লিপিই বিদ্যমান নাই। কাজেই ইহার অশোক-মূল মূলহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। অশোকের জনৈক উপরাজ (Viceroy) 'তোষলি' নামক স্থান হইতে সাম্রাজ্যের পূর্ব্বাংশ শাসন করিতেন। এই তোষলি কোথায় ছিল ?

সমতটের তদানীন্তন রাজধানী লইয়া পাশ্চাত্য সুধীগণ বিতর্ক উপস্থিত করিয়াছেন। ফার্গুসন সাহেব বলেন, সোনারগাঁয়ে রাজধানী ছিল; ওয়াটার্স সাহেব বলেন, ফরিদপুর জিলার দক্ষিণ অংশে কোনও স্থানে রাজধানী ছিল। কানিংহাম সাহেব বলেন, যশোহরে রাজধানী ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, য়ুএন চুয়াং তমলুক হইতে সমতটের রাজধানীর যে দূরত্ব দিয়াছেন, উক্ত তিনটির কোনটির সহিতই তাহা মিলে না। মেজর রেনেল সাহেব সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালা দেশ জরীপ করেন। তাঁহার ১৭নং মানচিত্রে বিক্রমপুরে "সমকূট" বা "সমকোট" নামে একটি অতি প্রাচীন কীর্ত্তি ও ধ্বংসাবশেষ সম্পন্ন স্থান প্রদর্শিত হইয়াছে। উহা এখন আর নাই, কীর্ত্তিনাশা নদীতে তাহা অদৃশ্য হইয়াছে। এই স্থানের দূরত্ব তমলুক হইতে ১৭০ মাইল পূর্ব্বদিকে। জানি না এটি সমতটের প্রকৃত রাজধানী ছিল কিনা? খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত গঙ্গানগরই খুব প্রসিদ্ধ ছিল (টলেমী)।

গ্রীক্ লেখক টলেমী ব্রহ্মপুত্রতীরস্থ "অন্তিবল" (Antibal) নামক একটী স্থান উল্লেখ করিয়াছেন। উইলফোর্ড সাহেব ইহাকে ঢাকার দক্ষিণ-পূর্ব্বস্থ বর্ত্তমান "ফিরিঙ্গিবাজার" বলেন। ডাঃ টেলর বলেন, ইহা হইতে পারে না; টলেমির "অন্তিবল" ব্রহ্মপুত্রতীরস্থ; আর ফিরিঙ্গিবাজার ধবলেশ্বরীর পারে অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন "আটী ভাওয়াল"ই অন্তিবল। পূর্ব্বে হস্তিমল্ল বা হস্তিবন্ধকে "আন্তোমেলা বলিত। হিন্দুরাজগণ এখানে হাতী ধরিতেন। বানার এবং লক্ষ্যা নদীর সঙ্গমে অবস্থিত "একডালাই" সম্ভবতঃ অন্তিবল। নিকটেই হাতি-বন্ধ স্থান, সেখানে হিন্দু রাজাদের হস্তী রক্ষিত হইত।

ম্যাক্ ক্রিন্ডোল্ সাহেব বলেন বুড়ীগঙ্গা নদীই অন্তিবল। উক্ত অন্তিবলের প্রসিদ্ধি কিসে? টলেমি (Ptolemy, 140-150 A. D.) একজন প্রসিদ্ধ গ্রীক্ ভূগোলবিৎ ও জ্যোতির্ব্বিৎ ছিলেন। তিনি পশ্চিমে আফ্রিকা হইতে পূর্ব্বে রেঙ্গুণ পর্য্যন্ত সমস্ত সিন্ধুতটের বন্দর, বাণিজ্য দ্রব্য, দ্রাঘিমা প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত ক্রিন্ডোল্ সাহেব বলেন,

তখনকার দিনে অর্থাৎ ১৮০০ বৎসর পূর্ব্বে "অস্তি-বলই" ভারতবর্ষের পূর্ব্ব-সীমা ছিল। উজ্জয়িনী ভারতবর্ষের মধ্যভাগ এবং লঙ্কা পৃথিবীর মধ্যভাগ অর্থাৎ নিরক্ষবৃত্তে (Equator) অবস্থিত। হিন্দুরা ভারতের পূর্ব্ব সীমায় পূর্ব্বোক্ত "অস্তিবলের" মধ্য দিয়া দ্রাঘিমা (Longitude) গণনা করিতেন।

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর রাঘবেন্দ্র কবিশেখরের "ভবভূমি বার্ত্তায়" লিখিত আছে যে, গঙ্গাগতি ব্রহ্মপুত্রতীর্থে উপস্থিত হইয়া, স্নান তর্পণাদি সম্পাদন করেন। পরে তথা হইতে "সুবর্ণ গ্রামে" বা বর্ত্তমান সোণারগাঁয়ে উপস্থিত হয়েন। এই সোণারগাঁয়ের উপর দিয়া তখন দ্রাঘিমার লাইন পড়িত। তিনি এইখানে ৬টি নক্ষত্র ও অন্যান্য বিষয় দর্শনান্তে নিজ আবাস কোটালিপাড়ায় প্রতিগমন করেন।

পূর্ব্বে বিক্রমপুরে পঞ্জিকা প্রস্তুত হইত; তাহাতে বিক্রমপুরের সময় দেওয়া হইত। জরীপ সংক্রান্ত সরকারী রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, উজ্জয়িনী ও বিক্রমপুরের মধ্যে ২ দণ্ড ৩৪ পল সময় ব্যবধান ছিল।

উজ্জয়িনী ও কলিকাতার মধ্যে ২ দণ্ড ৮ পল সময় ব্যবধান। পঞ্জিকা রচনায় তখন নবদ্বীপও বিক্রমপুরেরই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিত। তাই তাহারাও সেই ২।৩৪ পল পার্থক্যই গণনা করিত। এখন কলিকাতায় পঞ্জিকা তৈয়ার হয়। তাহাতেও পূর্ব্ববৎ ২ দণ্ড ৩৪ পল সময় ব্যবধান করা হয়। ইহাতে প্রকৃতপক্ষে ২৬ পল ভুল হইতেছে। রাঘ-বেন্দ্রের ২ দণ্ড ৩৪ পল বিক্রমপুরের সময়, নবদ্বীপ বা কলিকাতার নহে।

অতি প্রাচীনকাল হইতে বিক্রমপুরের বেড়পাড়া ও ফতেজঙ্গপুর জ্যোতিষ-চর্চ্চার জন্য সুপ্রসিদ্ধ ছিল। এখন ধর্ম্মারণ্য বা ধামারণে গণক সম্প্রদায়ের সামান্য চর্চ্চা দৃষ্ট হয়। মধ্যরেখা হইতে বেড়পাড়ার দেশান্তর ২ দণ্ড ৩৪ পল। বেড়পাড়ার Maridian বা দ্রাঘিমা ঠিক মধ্যরেখা না হইলেও বঙ্গদেশে জ্যোতিষ-গণনায় উহাই প্রধান অবলম্বন ছিল। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রামপালও ঐ দ্রাঘিমায় অবস্থিত; কেবল ঢাকা কিছু পশ্চিমে সরিয়া অবস্থিত। কার্ত্তিক-বারুণী মেলার স্থান রামপাল হইতে বেশী দূরে ছিল না। হিন্দুরাজাদের সময় হইতেই সোণারগাঁ ও বিক্রমপুর জ্যোতিষ-চর্চ্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল। উভয়স্থানেই "মানমন্দির" ছিল। পূর্ব্বোক্ত গঙ্গানগরের নিকটেই মানমন্দির (Obse-vatory) ছিল এবং ইহার নিকটেই কোনও স্থানে কার্ত্তিক-বারুণীর মেলা বসিত।

সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তিকার লিখিয়াছেন, "সমতট, ডবাক, কামরূপ, নেপাল, কর্ত্তৃপুর প্রভৃতি প্রত্যন্ত-রাজগণ এবং মালব, অর্জ্জুনায়ন, যৌধেয়, মাদ্রক, আভীর, প্রার্জ্জুন, সনকানীক, কাক, খরপরিক প্রভৃতি গণতন্ত্রপ্রধান রাষ্ট্র সকল সমুদ্রগুপ্তকে কর, সম্মান এবং আজ্ঞাকারিতা প্রদান করিত।" কাজেই, এগুলি তখন গুপ্তদের আশ্রিত "দেশীয় রাজ্য" (Native or Indian States) ছিল। ৫৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গুপ্তগণ সম্রাট ছিলেন। ততদিন বঙ্গও গুপ্তদের সার্ব্বভৌমত্ব (Overlordship) স্বীকার করিত। গুপ্তদের অনেক মুদ্রা ফরিদপুর জিলায় পাওয়া গিয়াছে।

গুপ্তগণের নিস্তেজ অবস্থায়, গুপ্তরাজগণের পূর্ব্বতন মিত্র ও সামন্তরাজ মালবের যশোধর্ম্মদেব উত্তর ভারতে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হূণপতি মিহিরকুলকে পরাজিত, প্রণমিত ও বিতাড়িত করিয়া সগর্ব্বে "বিক্রমাদিত্য" উপাধি ধারণ করেন। কেহ কেহ বলেন, কালিদাস ইঁহারই রাজকবি ছিলেন। বস্তুতঃ একথা সত্য

নহে। মাতৃগুপ্ত ইঁহার রাজকবি ছিলেন। যশোধর্ম্ম দেব ইঁহাকে কাশ্মীর সিংহাসনে স্থাপিত করেন। "কালিদাস" ইহার শিষ্ট উপাধি ছিল বলিয়া বোধ হয়। ইনি ৩ বৎসর সুন্দররূপে কাশ্মীর শাসন করেন। কাশ্মীরের জনৈক রাজকুমার তখন সিংহাসন প্রার্থী হইলে মাতৃগুপ্ত স্বেচ্ছায় ও সানন্দে তাহাকে কাশ্মীর ছাড়িয়া দিয়া কাশীতে আসিয়া জীবনের শেষভাগ যাপন করেন। যশোধর্ম্মের সামাজ্য বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। অচিরেই থানেশ্বর ও কনৌজের বর্দ্ধন-রাজগণ সম্রাট্ হইয়া দাঁড়ান। বলা বাহুল্য, পূর্ব্ববঙ্গ এইসব সম্রাট্গণের বশ্যতা স্বীকার করিত। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে সমগ্র বঙ্গ (Bengal) ২টি রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে, যথা,—গৌড় ও বঙ্গ। গৌড়ের কথা পরে বলিতেছি।

এই সময়ে পূর্ব্বভারতে কামরূপ রাজ্য বড়ই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। তাই প্রসঙ্গক্রমে কামরূপের কয়েকটি কথা এখানে বলা আবশ্যক। ঋগ্বেদে কামরূপের উল্লেখ নাই। মনুসংহিতায় ইহা কিরাতদেশ বলিয়া উক্ত আছে।

চট্টগ্রাম বিভাগ তখন "নাগলোক" নামে অভিহিত হইত। এগুলি পতিত বা সংস্কারহীন ক্ষত্রিয়-রাজ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। কালিকা-পুরাণ ও অন্যান্য গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, দেব আর্য্যগণের জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রথমে কামরূপে আসিয়া দূরবীক্ষণাদি যন্ত্র যোগে আকাশস্থ নক্ষত্র ও গ্রহাদির গতিবিধি, কারকতা প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করেন। ব্রহ্মার আবিষ্কারগুলি "ব্রহ্ম-সিদ্ধান্ত" নামে পরিচিত। ৮০ খৃষ্টাব্দে বরাহ-মিহির নামা একজন জ্যোতির্ব্বিৎ ঐ "ব্রহ্ম-সিদ্ধান্তের" এক পুনঃ সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই আবিষ্কার প্রায় খৃঃ পূঃ ২৯০০ অব্দের কথা।

বি—৭

তদবধি কামরূপ "প্রাগ্‌জ্যোতিষ" দেশ নামে উক্ত হইয়া আসিতেছে। উহার রাজধানী কখন কখন "প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর" নামেও অভিহিত হয়। সম্ভবতঃ ইহা বর্ত্তমান গৌহাটি হইবে। দৈত্যরাজ বলির কোনও আত্মীয় বা অনুচর আসাম জয় করিয়াছিল কিনা জানি না। খৃঃ পূঃ ১৫শ শতাব্দী হইতে আসামের ইতিহাস স্পষ্ট ও উজ্জ্বল। রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড, ৪২ সর্গ, ৩০-৩১ শ্লোকে সীতার অন্বেষণ প্রসঙ্গে সুগ্রীব নিজ লোকদিগকে বলিতেছেন— "সাগর মধ্যে ৬৪ যোজন বিস্তৃত বরাহ নামক মহাপর্ব্বত। তথায় "প্রাগ্‌জ্যোতিষ" নামক স্বর্ণময় পুরী; তথায় নরকাসুর রাজত্ব করে, ইত্যাদি"। বাল্মীকির এই কথা হইতে ২টি তত্ত্ব পাওয়া যায়। নরক শ্রীরাম-চন্দ্রের সম-কালিক এবং বঙ্গোপসাগর ভারতের পূর্ব্বদিকে শ্রীহট্ট ও কাছাড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এখন নরকের পরিচয় বলিতেছি,—মহীরঙ্গ নামে জনৈক বীর প্রাগ্‌জ্যোতিষের প্রথম আর্য্য রাজা। তৎপর আরও ৪জন ক্রমে তথায় রাজা হন। ইঁহাদের পর নরকের নাম শ্রুত হয়। (বিভিন্ন পুরাণ) হরিবংশ, ১২১ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—"বাল্যে রাজর্ষি জনক নরককে প্রতিপালন করেন। ১৬ বৎসর বয়সে নরক নিজ বীরত্বে প্রাগ্‌জ্যোতিষে নিজ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। নরক প্রথমে বেশ ভাল হইলেও ক্রমশঃ বড় অত্যাচারী ও প্রজাপীড়ক হইয়া উঠেন। নরক দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। উপর আসামের বলি নামক জনৈক রাজার পুত্র বাণের সহিত নরকের বড়ই সখ্য ছিল। বাণ অসুর প্রকৃতির, তাই নরকও ক্রমে মন্দ হইলেন। দেবতা ও ব্রাহ্মণের উপর অত্যাচারের ত্রুটী ছিল না। একদা বশিষ্ঠদেব কামাখ্যা দেবী দর্শনে আগমন করেন। নরক তাঁহাকে পুরে

প্রবেশ করিতে দিলেন না; বরং বশিষ্টের উপর নানা অত্যাচার ও উপদ্রব হইল। বশিষ্ট নরককে শাপ দিলেন। নরকের চারি পুত্র ছিল। বশিষ্ট আর্য্যাবর্ত্তে ফিরিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতিকে অবস্থা জ্ঞাপন করেন। অচিরে শ্রীকৃষ্ণ সসৈন্যে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরী আক্রমণ করেন। তুমুল যুদ্ধের পর শ্রীকৃষ্ণহস্তে নরক নিহত হন। নরকের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভগদত্তকে তত্রত্য সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া নরকের ধনরত্ন গ্রহণান্তে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ভগদত্ত অতি সুযোগ্য নরপতি ছিলেন। তাঁহার সময় প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের এইরূপ সীমানা দৃষ্ট হয়:—উত্তরে কঞ্জগিরি (ভোটান), পূর্ব্বে দীক্ষু নদী, দক্ষিণে সমুদ্র এবং পশ্চিমে করতোয়া নদী। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, সমগ্র আসাম, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, রঙ্গপুর, ইন্দ-চায়না প্রভৃতি দেশ তখন এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এই প্রাগ্‌জোতিষ বা কামরূপ রাজ্য কতকটা ত্রিভূজাকার ছিল। ইহা দৈর্ঘ্যে ৮০০ মাইল এবং প্রস্থে ২৪০ মাইল ছিল। স্কন্দপুরাণ মতে এই কামরূপ রাজ্যে একসময়ে ৯ লক্ষ গ্রাম ছিল।

অর্জ্জুনের দিগ্বিজয় কালে, ভগদত্ত কিরাত, চীন এবং সাগরতীরস্থ অন্যান্য অনূপদেশবাসী যোদ্ধৃগণে পরিবৃত হইয়া অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন (মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ২৬ অধ্যায়)।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে, ভগদত্ত নিজ কিরাত ও চীন সৈন্য লইয়া দুর্য্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পাণ্ডবদের অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্ব, ভগদত্ত পুত্র বজ্রদত্ত কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছিল; তাহাতে ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। পরিণামে বজ্রদত্ত পরাজিত হইয়া পাণ্ডবদের সামন্ত শ্রেণী ভুক্ত হন (মহাভারত, অশ্বমেধ পর্ব্ব, ৫৭ অধ্যায়)।

বজ্রদত্তের পর ধর্ম্মপাল, রত্নপাল, কামপাল, পৃথ্বীপাল, সুবাহু প্রভৃতি রাজগণ ক্রমান্বয়ে ঐ রাজ্য শাসন করেন। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে "ভাস্কর বর্ম্মা" এই রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। য়ুএন্ চুয়াং ইহাকে "পূর্ব্ব ভারতের অধীশ্বর" বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ইনি কনৌজের শেষ হিন্দু সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধন শীলাদিত্যের একজন প্রিয় বন্ধু ছিলেন। V. A. Smith, Sir E. A. Gait প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ আসামের এই "বর্ম্মণ" রাজগণকে অনার্য্য কোচ জাতীয় বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন।

চীন-পর্য্যটক কিন্তু ইহাঁদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কতিপয় বৎসর হইল, শ্রীহট্টের এক কৃষক কর্ত্তৃক প্রাপ্ত একখানা বড় তাম্র-শাসনে এই রাজবংশের আদি হইতে ভাস্কর বর্ম্মা পর্য্যন্ত সকল রাজগণের নাম, রাজত্বকাল প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। গেইট সাহেব তখন লিখিয়াছিলেন—The find is one of extra-ordinary value"—এই আবিষ্কার যারপর নাই মূল্যবান, তাহার সন্দেহ নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম আসামে কখনও প্রবেশ করিতে পারে নাই। আসামে বিশেষতঃ কামরূপ জিলায় এখনও অসংখ্য মৈথিল ব্রাহ্মণের বাস।

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীতে বিক্রমপুরের রাজগণ সম্ভবতঃ উক্ত বর্ম্মণ রাজগণের আধিপত্য স্বীকার করিতেন।

ফরিদপুর জিলার কোটালিপাড়া ও ঘাঘরাহাটী নামক গ্রামদ্বয়ে প্রাপ্ত চারিখানি তাম্র-শাসনে ৩ জন "মহারাজাধিরাজের" নাম পাওয়া গিয়াছে, যথাঃ—ধর্ম্মাদিত্য, গোপচন্দ্র এবং সমাচার দেব। ইহারা কে ছিলেন? বিজ্ঞবর হর্ণলি সাহেব বলেন—এই ধর্ম্মাদিত্য মালবের প্রসিদ্ধ "যশোধর্ম্মা" বই অন্য

কেহ নহেন। ৫২৮-২৯ খৃঃ অব্দে পূর্ব্বভারতে তাঁহার পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়; তাই প্রথম তাম্র-লেখখানা ৫৩১ খৃষ্টাব্দে, ২য় খানা ৫৬৭ খৃষ্টাব্দে এবং ৩য় খানা ৫৮৬ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। তিনি প্রায় ৪০ বৎসর রাজত্ব করেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় এই শিল্প-লিপি-গুলিকে কৃত্রিম (false) বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু মিঃ পার্জিটার ইহাদের সত্যতা বেশ প্রমাণিত করিয়াছেন। তিনি অনুমান করেন, উক্ত "ধর্ম্মাদিত্য"প্রায় ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-ভারত শাসন করেন। তাঁহার রাজত্বের ৩য় বর্ষে ১ম খানা এবং শেষভাগে ২য় তাম্রলিপি খানা উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ধর্ম্মাদিত্যের পর গোপচন্দ্র রাজত্ব করেন। যদি এই উভয়ের মধ্যে আর কেহ রাজত্ব করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার রাজত্ব অতি অল্পকাল স্থায়ী ছিল। ডাঃ হর্ণলি সাহেবের মতে ধর্ম্মাদিত্য ও যশোধর্ম্ম একই ব্যক্তি। গোপচন্দ্র পাটলিপুত্রের প্রসিদ্ধ গুপ্ত বংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের পুত্র।

পূর্ব্ববঙ্গের ধর্ম্মাদিত্য ও মালবের যশোধর্ম্মা যে একই ব্যক্তি ইহার কোনই স্পষ্ট প্রমাণ নাই, কেবল প্রবল অনুমান মাত্র। গুপ্ত-রাজগণের সকলের উপাধির শেষভাগে "আদিত্য" দৃষ্ট হয়, তাই সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী কালের কোনও গুপ্ত-রাজ ধর্ম্মাদিত্য উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মালবের যশোধর্ম্মা তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া লৌহিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র তীরস্থ দেশে স্বকীয় বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। যশোধর্ম্মার অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে উক্ত ধর্ম্মাদিত্য পূর্ব্ব-ভারত শাসন করিতেন এবং নিজেকে "পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ" বলিয়া ঘোষণা করিতেন।

তিব্বতের লামা তারানাথের গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত গোপচন্দ্রের নাম উল্লিখিত আছে। তিনি বলেন, গোপচন্দ্র বালাদিত্যের পৌত্র এবং সম্রাট দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের পুত্র। যশোধর্ম্মা এই সম্রাট ২য় কুমারগুপ্তকে পরাজিত করিয়াছিলেন। যশোধর্ম্মার রাজত্বের শেষভাগে এই গোপচন্দ্র সম্ভবতঃ পূর্ব্বভারতের পুনরুদ্ধার করেন।

সমাচারদেবও "মহারাজাধিরাজ" ছিলেন, কিন্তু "পরমভট্টারক" নহেন। থানেশ্বরের হর্ষবর্দ্ধন শীলাদিত্য ৬০৬-৬৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উত্তর-ভারতের সম্রাট ছিলেন। সম্ভবতঃ ৬২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পূর্ব্ব-ভারত জয় করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সাম্রাজ্য ভগ্ন হইয়া পড়ে। এই সুযোগে গুপ্তরাজপুরুষগণের বংশীয়গণ পূর্ব্ববঙ্গে প্রতাপশালী হইয়া উঠেন। পার্জিটার সাহেব বলেন, হর্ষবর্দ্ধনের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে সমাচারদেব পূর্ব্বভারত শাসন করিতেন।

এখানে মালবের যশোধর্ম্মের পরিচয় কিছু দেওয়া আবশ্যক। ইনি বীরপ্রসবিনী মালবদেশের একজন সাধারণ রাজকুমার ছিলেন। ভাগ্যদেবী ইহাঁকে ভারতের এক অতি প্রসিদ্ধ ভাবী সম্রাট-রূপে বরণ করিয়াছিলেন। ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এশিয়া হইতে অসভ্য হূণ-জাতি দলে দলে পঙ্গপালের ন্যায় ভারতে প্রবেশ করে। এই সময়ে মগধের গুপ্ত-সম্রাটগণ ভারতের অধীশ্বর ছিলেন। এই হিন্দু-গুপ্তসাম্রাজ্য ধ্বংসের জন্যই বিধাতা হূণদিগকে কালস্বরূপ প্রেরণ করিলেন। এই হূণগণ রোম ধ্বংস করিয়াছিল,রোমান্ সাম্রাজ্য নষ্ট করিয়াছিল এবং ইউরোপে "হূণাগার" বা হাঙ্গেরী-রাজ্য (Hungary) স্থাপন করিয়াছিল, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান। প্রসিদ্ধ মগধ-সম্রাট স্কন্দগুপ্তের যৌবনকালেও এই হূণ-বিপ্লব ঘটিলে সম্ভবতঃ বিশেষ কোনও ক্ষতি হইত না। স্কন্দগুপ্ত এখন প্রায় বৃদ্ধ। তথাপি নিজ রাজ্য ও দেশ-রক্ষায় দৃঢ়ব্রত

হইয়া তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। মালবের পূর্ব্বোক্ত যশোধর্ম্মা একজন সাধারণ সৈনিকবেশে স্কন্দগুপ্তের সৈন্যদলে প্রবেশ করেন এবং বিভিন্ন হূণ-যুদ্ধে অশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া বহুবার স্কন্দগুপ্তের জীবন রক্ষা করেন। বর্ত্তমান এলাহাবাদের নিকটস্থ "প্রতিষ্ঠানের যুদ্ধে" হূণ-হস্তে স্কন্দগুপ্তের দেহান্ত হয়। তখনও বিশ্বস্ত-বীর যশোধর্ম্মা তাঁহার পার্শ্বে ছিলেন। স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর, যশোধর্ম্মা তাঁহার হস্ত হইতে উৎক্রোশ পক্ষী অঙ্কিত স্বর্ণ-পতাকা লইয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়েন এবং সন্তরণ করিয়া নিজের জীবন রক্ষা করেন। এই সময়ে জনৈক বৌদ্ধ ভিক্ষু এই ক্লান্ত ও মৃতপ্রায় যাশাধর্ম্মাকে সযত্নে শুশ্রূষা করিয়া সুস্থ করিয়া তোলেন। যশোধর্ম্মা প্রকৃতিস্থ হইয়া বিদায়ের পূর্ব্বে ঐ জীবন-রক্ষক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে থাকিলে, বৌদ্ধ-সাধু সজল-নয়নে বৌদ্ধধর্ম্মের পতন, হিন্দুদের পুনরভ্যুদয় ও বৌদ্ধ-বিদ্বেষ প্রভৃতি বর্ণন করিতে আরম্ভ করেন। বৃদ্ধ বৌদ্ধ-ভিক্ষুর কাতর-উক্তিগুলি যেন বিদ্যুদ্‌বেগে যশোধর্ম্মার মর্ম্মে প্রবেশ করিল। তিনি বিচলিত হইলেন এবং দ্বিতীয় অশোকের ন্যায়, বৌদ্ধ-হিতৈষী হইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া সেই আশ্রম হইতে প্রস্থান করিলেন।

প্রবল অধ্যবসায় ও অমিতবিক্রম অবলম্বন করিয়া যশোধর্ম্মা অচিরেই ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইলেন। এখন মগধ ও উত্তর-পশ্চিমের গুপ্তরাজগণ তাঁহার শরণাপন্ন, প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা আসামের বীর বর্ম্মণ-রাজগণ তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া গভীর নিশীথে দেব-মন্দিরে বলি প্রদান করেন! হিমালয়ে, মরুভূমে খশ ও হূণগণ তাঁহার ভয়ে এখন কদলীবৎ কম্পিত! তাঁহার বিজয়স্তম্ভ এখন পূর্ব্বসমুদ্রতীরে মহেন্দ্র পর্ব্বতের গঞ্জামে রোপিত হইয়াছে।

প্রতিষ্ঠানের মহাযুদ্ধে জয়ী হইয়া হূণরাজ মিহিরকুল এখন বীরদর্পে মগধের দিকে অগ্রসর। বুঝিবা আ-ব্রহ্মপুত্র পূর্ব্বভারত এখন হূণজাতির পাদপীঠ হইয়া পড়ে। দৈত্যকুল-কমল-দিবাকর ধর্ম্মপ্রাণ প্রহ্লাদের পবিত্র পদ-ধূলিতে যে পূর্ব্ব-ভারত একদিন ধন্য হইয়াছিল, বিধাতা আজ সেই পুণ্য-ভূমি রক্ষা করিলেন। মগধের তরুণ সম্রাট্ বালাদিত্য সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া মিহিরকুলের গতিরোধ করিলেন এবং এক মহারণে হূণপতিকে এরূপভাবে নির্জ্জিত করিলেন যে, হূণরাজ বাধ্য হইয়া হতাবশিষ্ট সৈন্যসহ পশ্চিমদিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ওদিকে দক্ষিণদিক্ হইতে উদীয়মান সম্রাট্ যশোধর্ম্মা অগ্রসর হইয়া পঞ্জাবের কোরর নামক স্থানে এক মহাসমরে মিহিরকুলকে একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া বন্দী করিলেন (৫৩৩ খৃঃ অঃ)। হূণ-গর্ব্ব চূর্ণীকৃত হইল। নিরুপায় হইয়া মিহিরকুল এখন যশোধর্ম্মার নিকট সন্ধি প্রার্থী হইলেন। উদার যশোধর্ম্মা হূণপতির প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন; সন্ধি হইল—মিহিরকুল আর কখনও ভারতের সমতলে পদার্পণ করিবেন না এই প্রতিজ্ঞা করিয়া নিজ রাজ্য কাশ্মীরে চলিয়া গেলেন। এই কথা স্মরণ করিয়াই রাজ-কবি মন্দাশোর প্রশস্তিতে সগর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছেন যে, মিহিরকুল পরাজিত ও বন্দী হইয়া যশোধর্ম্মার রাজপদে মস্তক অবনত করিয়াছিল।

৫৩০ খৃঃ অব্দে গুপ্তরাজ বালাদিত্যের মৃত্যু হয়। তাই তখন আর যশোধর্ম্মার প্রতিদ্বন্দী কেহ রহিল না। মালবের দশপুর শিলা-লেখে (Mandasor Inscription) উক্ত হইয়াছে যে, বিজয়ী গুপ্তরাজগণ এবং হূণগণও যে সব দেশ জয়

করিতে পারে নাই, যশোধর্ম্মা তাহাও করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র হইতে পশ্চিমে আরব-সাগর, উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে পঞ্জাব পর্য্যন্ত প্রায় সমগ্র ভারত যশোধর্ম্মার শাসনাধীন ছিল। তিনি "রাজাধিরাজ পরমেশ্বর বিক্রমাদিত্য" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মাতৃগুপ্ত নামে একজন কবি ইঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিতেন। কেহ কেহ এই যশোধর্ম্মাকেই প্রকৃত বিক্রমাদিত্য এবং মাতৃগুপ্তকেই কালিদাস বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু বলা বাহুল্য যে, এ সব তত্ত্ব বিচারসহ নহে।

তদানীন্তন দেশের অবস্থা ও ধর্ম্ম-বিপ্লব সম্বন্ধে এখানে কতিপয় কথার অবতারণা করিতে বাধ্য হইতেছি। সম্রাট অশোক নিজে বৌদ্ধ হইয়া দেশকে দেশ বৌদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু তাঁহার অশেষ চেষ্টাতেও ভারত বৌদ্ধ হইল না। তাই পরে পৃথিবীর নানা দেশে বৌদ্ধ প্রচারকগণকে পাঠাইলেন। ২২০০ শত বৎসর হইল অশোক গিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বিশাল মৌর্য্য সাম্রাজ্যও নষ্ট হইয়াছে। ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম এখন লুপ্তপ্রায়; কিন্তু অশোকের একটী কার্য্যে ভারতের এখনও বহু ক্ষতি হইতেছে বলিয়া মনে হয়।

বৌদ্ধধর্ম্ম জনপ্রিয় করিবার জন্য অশোকই সর্ব্বপ্রথমে বিবিধ মূর্ত্তি পূজার প্রচলন করেন। বুদ্ধের মূর্ত্তি, বৌদ্ধ দেবদেবীগণের মূর্ত্তি অতি ভূষিত করিয়া, বহু আড়ম্বরে শোভাযাত্রা করিয়া বাহির করা হইত। এই মূর্ত্তি-পূজাটি এদেশে বদ্ধমুল হইয়া পড়িয়াছে। ভাষ্যকার পতঞ্জলি (১৫০খৃঃ পূঃ) বলেন—"মৌর্য্যৈ র্হিরণ্যার্থিভির্রর্চ্চা কল্পিতা।"

বেদ, রামায়ণ, মহাভারতাদি প্রাচীন পুস্তকেও দেবতার মূর্ত্তির উল্লেখ আছে সম্ভবতঃ সেগুলি নিম্ন শ্রেণীর লোকদের জন্য বিহিত ছিল। ঋষিগণ "বাহ্য পূজাকে" অধমাধম অর্থাৎ অতীব নিকৃষ্ট উপায় বলিয়াছেন, কারণ ইহাতে মস্তিষ্ক শক্তি নিস্তেজ, হৃদয় সংকীর্ণ এবং আত্মা বলহীন হইয়া পড়ে। রক্ষা, এদেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে অতি প্রাচীন কাল হইতে, দর্শন বিজ্ঞানাদির উচ্চ তত্ত্বগুলি অতি সরলভাবে বোধগম্য হইয়া রহিয়াছে। অন্যথা, এতদিনে এদেশ অসভ্য বর্ব্বরতার লীলাভূমি হইয়া পড়িত। শ্বেত শারদ চন্দ্রমাও যেমন কলঙ্কহীন নহে, উন্নত ভারতীয় সমাজও এখন তদ্রূপ। কোন দেশের কতিপয় লোক সখে সখে চস্‌মা ব্যবহার করিত। অচিরেই সেই দেশটা "চস্‌মার দেশ" হইয়া পড়িল। চা ও চুরট প্রভৃতি জিনিষগুলি সামান্য বিলাস-মাদকদ্রব্য বই আর কি? কিন্তু আজ সমগ্র ভারতে ইহাদের কি পর্য্যন্ত প্রভাব ও প্রসার! ধনী, দীন, ভদ্র, ইতর সর্ব্বসমাজ ইহার পদানত। ভারতের ন্যায় গরম দেশে এগুলি বিষের ন্যায় ক্রিয়া করে। এ চিন্তা কে করে? মস্তিষ্ক শক্তি দুর্ব্বল হইলে তাহা কেবল নানা দোষ ও পাপের মধূ-চক্র হইয়া দাঁড়ায়। বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক, মন ও আত্মা অতি বলহীন হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই পবিত্র-বিবাহ আজ এক অদ্ভুত নরমেধ যজ্ঞে পরিণত হইয়াছে।

বৌদ্ধ মৌর্য্য-সম্রাট্‌গণের অধীনে হিন্দুগণ অতি নিষ্প্রভ ও মলিন অবস্থায় ছিল। অচিরেই রোহিলখণ্ডের ব্রাহ্মণবীর পুষ্পমিত্র বৌদ্ধগণকে নিরস্ত করিয়া, ভারতে পুনরায় হিন্দু-সাম্রাজ্য গঠন করেন। গুরু পতঞ্জলি পুষ্পমিত্রের অশ্বমেধযজ্ঞ মহাসমারোহে সম্পন্ন করেন। তদবধি হিন্দুদের দিন ফিরিল। পাটলিপুত্রের গুপ্ত-সম্রাটগণ বৈশ্য-রাজপুত ছিলেন। তাহাদের বীর প্রকৃতি স্বভাবতঃই বৌদ্ধধর্ম্ম বিরোধী ছিল। সংস্কৃত—সুমার্জ্জিত

সুললিত সংস্কৃত—তখন রাজভাষা হইল, পালিভাষা অনাদৃত হইতে চলিল। কাব্য, নাটক, শিল্পকলা, ধর্ম্মবিজ্ঞান, দর্শনপুরাণ—সবই সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতে লাগিল। নিজে সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত সংস্কৃত কবিতা লিখিয়া "কবিরাজ" উপাধি পাইলেন। ব্রাহ্মণগণ আবার নায়ক হইয়া চলিলেন; কিন্তু ৪৮০ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ স্কন্দগুপ্ত পুরুষপুর (Peshawar) হইতে সুপ্রসিদ্ধ সাধু "বসুবন্ধু"কে মহাগৌরবে পাটলিপুত্রে আনয়ন করেন।

সম্রাট স্কন্দগুপ্তের বৌদ্ধভাব ও বহু বন্ধুর উপর প্রগাঢ় ভক্তি এবং বহুবিধ রাজকীয় সম্মান ও গৌরব প্রদর্শন দর্শনে ব্রাহ্মণগণ অতীব রুষ্ট হইয়া, পূর্ব্বোক্ত পুষ্পমিত্রের বংশধর মিত্ররাজগণের শরণাপন্ন হন। অচিরেই মিত্র ও গুপ্ত সমর ঘটে, প্রথমতঃ মিত্ররাজগণ নানা যুদ্ধে জয়ী হন; অবশেষে সম্রাট স্কন্দগুপ্তের বীরত্বে ও কৌশলে মিত্রগণ পরাস্ত হন। কিন্তু ইহাতেও গুপ্তগণের বিপদ দূর হইল না। অসভ্য হূণরাজ তোরমান ও তৎপুত্র মিহিরকুল গুপ্ত-সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিল। তদবধি নূতন গুপ্তরাজগণ ব্রাহ্মণদিগকে বড়ই ভয় করিতেন। এদিকে বৌদ্ধ-ঋষিগণ নূতন "তান্ত্রিক-ধর্ম্ম" প্রচার করিলেন। ইহা পূর্ব্ব-ভারতে বড়ই জয়লাভ করিল। বৌদ্ধ মহাযান এবং হিন্দু, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ই এই তান্ত্রিক মতে আস্থাবান্ হইলেন। গুপ্তরাজগণ বৈদিক হিন্দু-ধর্ম্মের পরিপোষক ছিলেন; কিন্তু এই নূতন "তান্ত্রিক-বাদ" বৈদিক-ধর্ম্মের প্রভাব হ্রাস করিয়া ফেলিল। পূর্ব্বভারত হইতে বৈদিকধর্ম্ম একরূপ লুপ্ত হইয়া পড়িল। বলা বাহুল্য যে, এই বৌদ্ধ-তান্ত্রিক মতই কালে হিন্দু-তান্ত্রিক-ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে।

এখানে একটী বাঙ্গালী-বীরের সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ইনি কর্ণ-সুবর্ণরাজ শশাঙ্ক। খৃঃ অঃ ৬০০ হইতে ৬২৫ সনা পর্য্যন্ত ইনি প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া অনেক দূর কৃতী হইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সমগ্র বঙ্গদেশ "গৌড় ও বঙ্গ" এই দুই রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। এই রাজ্যদ্বয় কখন কখন পৃথক্, কখন বা একত্র—একই রাজার অধীন ছিল। খৃঃ পূঃ ৭৩০ সনে ভোজ-বংশীয় গৌড়-নামক রাজকুমার বঙ্গের মালদহ জিলায় গৌড়নামে নগর স্থাপন করেন। ক্রমে সেই নগর রাজ্যে পরিণত হয়। এখন সেই গৌড়-রাষ্ট্র বেশ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত শশাঙ্ক 'গৌড়াধিপ' ছিলেন এবং 'কর্ণ-সুবর্ণ' নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। এই কর্ণ-সুবর্ণের অবস্থান এখনও সুনিশ্চিত হয় নাই। কেহ বলেন মুর্শিদাবাদ জিলার বর্ত্তমান 'কাণসোণা'ই পূর্ব্বতন কর্ণসুবর্ণ; কেহ কেহ বা অন্যত্র অনুমান করেন।

মান্দ্রাজ প্রদেশের গঞ্জাম নামক স্থানে প্রাপ্ত একখানা তাম্র-শাসনে শশাঙ্ক "সম্রাট" বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন; সম্ভবতঃ ইহা অতিরঞ্জিত। বাস্তবিক শশাঙ্ক "গৌড়াধিপ" ছিলেন। এই সময়ের অনেকগুলি মুদ্রা বঙ্গদেশে পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের কতকগুলিতে শশাঙ্ক নাম এবং অন্যগুলিতে "নরেন্দ্র গুপ্ত" নাম দৃষ্ট হয়। অনেকেই মনে করেন, এই "শশাঙ্ক" পাটলিপুত্রের গুপ্ত-রাজবংশীয় জনৈক রাজকুমার। ইনি পূর্ব্বাঞ্চলে আসিয়া গৌড় রাজ্য অধিকার করেন এবং সুযোগ পাইয়া নূতন সাম্রাজ্য গঠনে ব্রতী হন। ইঁহারই নাম শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত।

ভারত-গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব প্রত্নতত্ত্বসচিব ডাঃ বুহ্‌লার (Dr. Buhler) প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার বাণভট্টের হর্ষ-চরিত নামক পুস্তকের একখানা প্রতিলিপিতে "নরেন্দ্র গুপ্ত" নাম পাইয়াছিলেন।

এই শশাঙ্ক কি সত্যই গুপ্ত বংশীয়? তিনিই কি নরেন্দ্র গুপ্ত? এপর্য্যন্ত ইহার কোনই বিশিষ্ট প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। আমাদের মনে হয় ইনি গুপ্ত-বংশীয় নরেন্দ্র গুপ্ত নহেন। ইনি গৌড়ের সামন্তরাজকুল-জাত। ইহাঁর প্রতিভা, কর্ম্মনিষ্ঠা, বীরপরাক্রমাদি অসাধারণ ছিল। সুতরাং নূতন সাম্রাজ্য স্থাপনের উদীপ্সা (ambition) ইহাঁর পক্ষে স্বপ্ন বা ক্ষিপ্ততা নহে, প্রত্যুত অতীব প্রশংসনীয় বীরোত্তম!

৬ষ্ঠ শতাব্দীতে মালবের যশোধর্ম্মাই ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী না থাকায় তদীয় সাম্রাজ্য তাঁহার মৃত্যুর সহিতই তিরোহিত হয়। তাই ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতে কতগুলি ক্ষুদ্র রাজ্য মাত্র দাঁড়াইল। গুপ্তরাজগণ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছেন। আসামের বর্ম্মণ-রাজগণ পূর্ব্ব-ভারতের অধীশ্বর ছিলেন। এই সময়ে বীর শশাঙ্ক কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। "বিক্রমপুরের যুদ্ধে" জয়ী হইয়া শশাঙ্ক বঙ্গরাজ্য অধিকার করেন। অতঃপর বর্ম্মণ-রাজগণের সঙ্গে "মেঘনাদের" যুদ্ধে অসীম বিক্রম প্রদর্শন করিয়াও অসামাদি পূর্ব্বাঞ্চল লাভ করিতে পারিলেন না। ক্রমে তিনি ব্রহ্মপুত্র হইতে দক্ষিণে গঞ্জাম পর্য্যন্ত সমগ্র ও বিশাল ভূখণ্ডে একাধিপতিত্ব প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পরে পশ্চিম-ভারতে অভিযানের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে থানেশ্বরে "বর্দ্ধন" রাজগণের অভ্যুদয় হইতেছিল। ৫৯০ খৃষ্টাব্দে প্রভাকর বর্দ্ধন পশ্চিম-ভারতে এক সুবৃহৎ রাজ্য পত্তন করিয়া "মহারাজাধিরাজ" উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার দুই পুত্র "রাজ্য বর্দ্ধন" ও "হর্ষবর্দ্ধন" এবং কন্যা "রাজ্যশ্রী"। কনৌজের মৌখরিবংশীয় রাজা গ্রহবর্ম্মার সহিত উক্ত রাজকুমারীর বিবাহ হইয়াছিল। ৬০৫ খৃঃ অব্দে প্রভাকর বর্দ্ধনের মৃত্যু হয়। তখন উত্তর-ভারতের আধিপত্য লইয়া প্রতিপক্ষগণের মধ্যে এক ভীষণ রণরঙ্গ উপস্থিত হয়। প্রভাকরের মৃত্যুর পরই, মালবপতি দেবগুপ্ত অসংখ্য সৈন্যসহ কনৌজ আক্রমণ করেন। ভীষণ যুদ্ধে গ্রহবর্ম্মা নিহত হয়েন। এবং তাঁহার বীর্য্যবতী রাণী রাজ্যশ্রী তৎপর যুদ্ধে অবতীর্ণা হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রাজ্যশ্রী শত্রুহস্তে বন্দিনী হইয়া পড়েন।

কনৌজ অধিকার করিয়া দেবগুপ্ত থানশ্বরের দিকে অগ্রসর হইলেন। তখনি রাজ্যবর্দ্ধন ১০,০০০ উৎকৃষ্ট অশ্বরোহী সৈন্যসহ অগ্রসর হইয়া দেবগুপ্তকে আক্রমণ করিলেন। অচিরে এক তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হইল এবং দেবগুপ্ত পরাস্ত হইয়া পশ্চাৎপদ হইলেন। এই পরাজয়ের কারণ শশাঙ্কের অনুপস্থিতি। পূর্ব্ব কথামত শশাঙ্কের দেবগুপ্ত সহ মিলনে বিলম্ব হওয়ায় সব নষ্ট হইল। রাজ্যবর্দ্ধন ভগ্নী রাজ্যশ্রীর অনুসন্ধান করিয়া কোথায়ও ঠিকানা পাইলেন না। শত্রুগণ রাজ্যশ্রীকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় বিন্ধ্যাচলের এক গুহামধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এদিকে সসৈন্যে শশাঙ্ক কর্ণ-সুবর্ণ হইতে যেন বিদ্যুদ্‌বেগে থানেশ্বরের অভিমুখে ছুটিয়াছেন। মিত্র দেবগুপ্ত দক্ষিণ দিক্ হইতে এবং নিজে পূর্ব্বদিক হইতে যুগপৎ থানেশ্বর আক্রমণ করিলে, বিজয়-লাভে বঞ্চিত হইতে হইবে না ইহাই তাঁহার ধারণা ছিল। কিন্তু ভাগ্য-লক্ষ্মী বর্দ্ধনকুলকেই ভারতের রাজমুকুটের উপযোগী মনে করিলেন। শশাঙ্কের দ্রুত অভি-যানের সংবাদে ব্যস্ত হইয়া ভগিণীর উদ্ধার চেষ্টা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া রাজ্যবর্দ্ধন শশাঙ্কের গতিরোধে অগ্রসর হইলেন। এলাহাবাদের নিকটে ঘোর যুদ্ধ হইল; শশাঙ্ক আর অগ্রসর হইতে

পারিলেন না। কনিষ্ঠ হর্ষবর্দ্ধনকে যুদ্ধের ভার দিয়া রাজ্যবর্দ্ধন তখন উর্দ্ধশ্বাসে ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে ধাবিত হইলেন। কারণ, অসভ্য হূণগণ আবার ভারতে উপস্থিত! ঘোর যুদ্ধে তিনি হূণদিগকে দূরীকৃত করিলেন বটে, কিন্তু শেষ যুদ্ধে তাঁহার প্রাণ গেল (বাঁশখেড়া তাম্রশাসন)। হিন্দু শশাঙ্ক-বিদ্বেষী বৌদ্ধগণ লিখিয়াছেন, "শশাঙ্ক সন্ধির প্রস্তাব করিয়া মিত্রভাবে রাজ্যবর্দ্ধনকে নিজ শিবিরে আহ্বান করিয়া গুপ্তভাবে তাঁহার হত্যাসাধন করেন"—কি ভয়ঙ্কর মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ? পূর্ব্বোক্ত "বাঁশখেড়া তাম্রশাসনে" রাজ্যবর্দ্ধনের হূণরণে প্রাণত্যাগ আবিষ্কৃত না হইলে শশাঙ্কের এ কলঙ্ক কদাপি ঘুচিত কিনা সন্দেহ?

বৌদ্ধদের অপর একটি মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ "শশাঙ্ক কর্ত্তৃক বোধি-দ্রুম কর্ত্তন।" হর্ষবর্দ্ধন ভগিনীর উদ্ধার সাধন করিয়া শশাঙ্ক-সমরে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি বিপুল সৈন্যসহ যুদ্ধ করিয়া ছয় বৎসরে শশাঙ্ককে বিজিত করিতে পারেন। ৬০৬ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধন রাজা হন। তাঁহার রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষেও শশাঙ্ক "সম্রাট" বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সত্য বটে থানেশ্বরের বিপুল বাহিনী মাধবগুপ্ত ও ভাস্করবর্ম্মার সাহায্য প্রভৃতি সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগে শশাঙ্ক গৌড়বঙ্গ হইতে বিতারিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পূর্ব্বঘাট (মহেন্দ্র পর্ব্বত) পর্ব্বতের পাদমূলে গঞ্জামে আশ্রয় লইয়াছিলেন। কুচক্রী মাধবগুপ্তই শশাঙ্কের পতন ও মৃত্যুর কারণ।

৬২৫ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তাঁহাব ক্ষুদ্র সাম্রাজ্য হর্ষবর্দ্ধনের হস্তগত হয়। হর্ষবর্দ্ধনই ভারতের শেষ হিন্দু সম্রাট। হিমালয় হইতে বিন্ধ্যপর্ব্বত, ব্রহ্মপুত্র হইতে আরবসাগর পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যবর্ত্তে বর্দ্ধনরাজগণের বিজয় পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল। তাই ঐতিহাসিক ভাবে বর্দ্ধনগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদান করিলাম।

থানেশ্বরে (প্রাচীন "থানীশ্বর") বর্দ্ধনরাজগণের অভ্যুদয় হয়। ইহাঁরা প্রাচীন ভারতের পৌরব-কুলের অধস্তন শাখা। ইহাঁরা ঐ যুগোচিত হিন্দুবৌদ্ধমিশ্র ভাবাপন্ন রাজা ছিলেন। এই বংশের প্রথম রাজার নাম পুষ্পভূতিবর্দ্ধন। ৫৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে মগধের গুপ্ত-সম্রাটগণ মলিন হইয়া পড়েন; একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তৎপর মালবের যশোধর্ম্মা উত্তর-ভারতে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপর গুপ্তগণের আবার অভ্যুদয় হইয়াছিল। পুষ্পভূতির পুত্র জয়বর্দ্ধন গুপ্তসম্রাটগণের এক রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ও ঐশ্বর্য্য লাভ করেন। ক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে গুপ্ত-রাজগণের অধঃপতন ঘটে। এই সুযোগে ৫৯০ খৃষ্টাব্দে জয়বর্দ্ধননন্দন প্রভাকর বর্দ্ধন পশ্চিম-ভারতে এক বিশাল রাজ্য পত্তন করিয়া "মহারাজাধিরাজ" উপাধি গ্রহণ করেন। থানেশ্বরে ইহাঁদের রাজধানী ছিল। পূর্ব্বভারতে ভাস্করবর্ম্মা ও পশ্চিমভারতে প্রভাকরবর্দ্ধন এই জ্বলন্ত তেজোদ্বয় সমগ্র আর্য্যা-বর্ত্তকে উদ্ভাসিত করিত। প্রভাকরের বীর পরাক্রমে হিমালয়ে কাম্বোজগণ ভয়ে কদলীবৎ কম্পিত হইত।

প্রভাকরের দুই পুত্র এবং এক কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠপুত্রের জন্মকালে রাজ্যের অতি বৃদ্ধি হইয়াছিল বলিয়া তাহার নাম রাজ্যবর্দ্ধন, দ্বিতীয় কুমারের জন্মে সর্ব্বত্র "হর্ষ" অর্থাৎ আনন্দাতিশয় হইয়াছিল বলিয়া তাহার নাম হর্ষবর্দ্ধন এবং কন্যার জন্মকালে বর্দ্ধনকুলের বিজয়-লক্ষ্মী পূর্ণশ্রী ধারণ করেন বলিয়া রাজকুমারীর নাম "রাজ্যশ্রী" হইল।

কনৌজের রাজা মৌখরি-বংশীয় গ্রহবর্ম্মার সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। রাজ্যশ্রী যেমন রূপবতী ও গুণবতী, তেমনি বীর্য্যবতী ছিলেন।

সকলেই প্রভাকর-বর্দ্ধনকে বেশ ভাগ্যবান পুরুষ বলিয়া মনে করিতেন। বস্তুতঃই প্রভাকর বেশ ভাগ্যশালী ছিলেন। তবে কমলা চঞ্চলা। ঋষিগণ বলেন, "শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি।" এই পৃথিবীর ধনজন সুখ সম্পদ প্রভৃতি সমস্ত শ্রেষ্ঠ বস্তুই বহু বিঘ্নে কণ্টকিত! প্রভাকরের শেষ জীবনে দুইটী ঘোর বিপদ উপস্থিত হইল। হূণগণ আবার দুর্দ্ধর্ষভাবে ভারতের সমতলে উপস্থিত হইল। সুদূর পূর্ব্বে গৌড়াধিপ শশাঙ্ক ভারতের পূর্ব্বাকাশ আলোকিত করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছিলেন। প্রভাকরের জীবন শেষ হইল। রাজ্যবর্দ্ধন হূণ-রণে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। এখন হর্ষবর্দ্ধনের বীরগরিমা পূর্ণ প্রকাশের সুযোগ পাইল। তিনি হূণ-দর্প চূর্ণ করিলেন, সদ্য বিধবা ভগিণী রাজ্যশ্রীকে বন্দী-দশা হইতে মুক্ত করিলেন এবং সুদক্ষ সেনাপতি অর্জ্জুন অরুণাশ্বসহ বিপুল বাহিনী লইয়া শশাঙ্কের গতিরোধ করিলেন।

শশাঙ্ক হতাকাঙ্ক্ষ হইয়া পশ্চাৎপদ হইলেন। এদিকে হর্ষবর্দ্ধনও জয় করিতে করিতে ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া পাটলিপুত্র অধিকার করিলেন এবং তথায় একজন সুযোগ্য উপরাজ (Viceroy) রাখিয়া ক্রমে বঙ্গের দিকে ধাবিত হইলেন। শশাঙ্ক গৌড়-বঙ্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া মান্দ্রাজের নিকট গঞ্জামে আশ্রয় লইলেন। এই সময় আসামের ভাস্করবর্ম্মা হর্ষবর্দ্ধনের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনিই বঙ্গের অধিকাংশ ভাগ হর্ষবর্দ্ধনকে জয় করিয়া দিয়াছিলেন। ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর পূর্ব্ব-ভারত ভাস্করবর্ম্মার করগত হইয়াছিল। এ জন্যই তদানীন্তন চীনদেশীয় পর্য্যটকগণ ভাস্করবর্ম্মাকে "পূর্ব্ব-ভারতের অধীশ্বর" (Lord of Eastern India) বলিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। এ প্রশংসার মূল্য কম নহে। চীনপরিব্রাজকগণ সকলেই ঘোর বৌদ্ধ ছিলেন; কিন্তু ভাস্করবর্ম্মা গোঁড়া হিন্দু, তাঁহার কামরূপ-রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের নামগন্ধও ছিল না; কাজেই বিপক্ষের প্রশংসা মিথ্যা নহে।

সম্ভবতঃ কামরূপ সাম্রাজ্যের বিস্তার এই সময়েই সব চেয়ে বেশী হইয়াছিল। তাই স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, একদা কামরূপ রাজ্যে ৯ লক্ষ গ্রাম ছিল। সমস্ত ভারতে এখন ৭ লক্ষ গ্রাম। তা হ'লে এ উক্তি সত্য কিসে? খুবসম্ভব, তখনকার দিনে গ্রামগুলি (Hamlets or townships) খুব ছোট ছোট ছিল।

মগধের গুপ্ত-সাম্রাজ্য প্রায় ৩০০ বৎসর পর্য্যন্ত বেশ সুদৃঢ় ছিল। তাঁহাদের পতন দেখিয়া, সাম্রাজ্য-লোভে পাঁচটি, শক্তি জাগরূক হইল তন্মধ্যে বীরপ্রসূ মালবের যশোধর্ম্মা প্রথম ও প্রধান। তিনি অচিরে এক আর্য্যাবর্ত্তব্যাপি সাম্রাজ্য সৃষ্টি করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তৎপর প্রায় একই সময়ে অপর ৪টি শক্তি রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল, উত্তর-ভারত এখন রণ-রঙ্গের লীলাভূমি হইয়া পড়িল। তুরস্কজাতীয় হূণগণ কাশ্মীর হইতে আবার বীর-বিক্রমে ভারতের সমতলে অবতীর্ণ হইলেন, কিন্তু তাঁহাদের আশা ও উদ্যম ব্যর্থ হইল। থানেশ্বরের বর্দ্ধনগণ শির উত্তোলন করিলেন। এ দিকে সুদূর পূর্ব্বাঞ্চলে ২ জন বাঙ্গালী বীর নিজ নিজ ভাগ্য-পরীক্ষায় ব্রতী হইলেন। সুবীর সুস্থিতবর্ম্মা যোগ্য কুমার ভাস্কর-বর্ম্মাকে নিয়া প্রথমতঃ বঙ্গ-জয়ে সচেষ্ট হইলেন; কিন্তু যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া কামরূপে প্রত্যাবর্ত্তন

করিলেন। তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্তই রহিয়া গেল। বর্ম্মণগণ বহুকাল হইতে অন্ততঃ বঙ্গ-জয়ের চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু সফলকাম হইতে পারেন নাই। আসামের বর্ম্মণরাজগণকে এখানে আমি বাঙ্গালী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি।

ভারতীয় পুরা-তত্ত্বের অজ্ঞাত ও নিবিড় অরণ্যচারী কোন কোন পুরুষ-ব্যাঘ্র ইহাতে রুষ্ট হইয়া আমাকে আক্রমণের উদ্যোগ করিতে পারেন। আমি কিন্তু এ ক্ষেত্রে একেবারে গো বেচারী। আক্রমণ প্রবল হইলে আমার মৃত্যু নিশ্চিত। তাহা হইলে, একই সময়ে একাধারে গোবধ ও ব্রহ্মবধের পাতক দাঁড়াইবে!!!

বাঙ্গালীর গৌরব প্রদর্শনের জন্য আমি কামরূপরাজ বর্ম্মণগণকে বাঙ্গালী বলি নাই। মহাভারতে, পশ্চিমে মগধ হইতে পূর্ব্বে কামরূপ পর্য্যন্ত সমগ্র ভূ-ভাগকে "বঙ্গদেশ" বলা হইয়াছে। আবার এ কথাও উক্ত হইয়াছে যে, এই বিশাল দেশ কতকগুলি পৃথক্ পৃথক্ ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। এই দেশের জীবজন্তু বৃক্ষলতা সবই অতি ক্ষুদ্রকায় বলিয়া বলির পণ্ডিতগণ ইহাকে 'বঙ্গদেশ'* আখ্যা দিয়াছিলেন। বৈদিকযুগের "পাতালই" (Netherlands i. e. Lower Provinces) পরে বঙ্গদেশ-নামে অভিহিত। আসামের বর্ণমালা, ভাষা, রীতি-নীতি, পরিচ্ছদাদি সবই বাঙ্গালীর। কেবল "অহম্" জাতির প্রবেশের পর তত্রত্য বাঙ্গালা-ভাষায় কিছু কিছু বৈদেশিক সংমিশ্রণ চলিয়াছে।

পশ্চিম-গগনে প্রভাকর অস্তমিত হইলে, অন্ধকার দেখা দিল। তখন কতকটা পূর্ব্বাকাশে "শশাঙ্ক" অল্পকালের জন্য শারদ-শোভা বিস্তার করিয়া একবিধ নৈশ-রাজত্ব ভোগ করিলেন। "শশি-কলা বিকলা ক্ষণদা-ক্ষয়ে।" রাত্রির অবসানে পূর্ব্বদিকে "ভাস্কর" সমুদিত হইলে, "শশাঙ্ক" ক্রমে মলিন, নিষ্প্রভ ও বিতাড়িত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্র হইতে তিরোহিত হইলেন। হর্ষবর্দ্ধন এখন অধিকাংশ ভারতের সম্রাট। হিমালয় হইতে নর্ম্মদা-নদী, পেশোয়ার হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র তাঁহার সাম্রাজ্য। শশাঙ্কের পতনের পর, হর্ষবর্দ্ধন নিষ্কণ্টক। য়ূয়েন চুয়াং বঙ্গের তাৎকালিক কোনও বিভাগেরই রাজার নাম করেন নাই। অনুমান হয় শশাঙ্ক সেই সব রাজাকে উন্মূলিত করিয়াছিলেন। কাজেই বঙ্গের সর্ব্বত্র উন্নত রাজপুরুষগণ বিরাজ করিতেন।

৬৪৮ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যু হয়। কাজেই ২৩ বৎসর তাঁহার সাম্রাজ্য অটল, শান্তিপূর্ণ ও উন্নতিশীল ছিল। বহু কবি ও লেখক তাঁহার সভাসদ ছিলেন। তাঁহাদের উৎকৃষ্ট রচনাবলী এখনও সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডারের রত্নস্বরূপ। হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে দারুণ বিষাদ-কালিমার আবির্ভাব হইতে লাগিল। সাম্রাজ্যশক্তি, বাহুবল, শান্তি, বিদ্যাচর্চ্চা, বিভূষণশিল্পাদি দিনের দিন নিষ্প্রভ ও নিস্তেজ হইয়া পড়িতে লাগিল। পরবর্ত্তী ৫।৬ শত বৎসর দেশে ঘোর অরাজকতা ও লুণ্ঠনাদি প্রবল হইয়া পড়িল।

---

*বাঙ্গালা [প্রা, দ্রুত উচ্চারণে—বাঙ্গলা, বাংলা, বাঙ্‌লা। আইন-ই-আকবরীতে আছে—"নামি আস্‌লি বাংলা বঙ্গ" অর্থাৎ বাঙ্গালার আসল নাম বঙ্গ। আবুল ফজলের মতে বঙ্গ পূর্ব্বে আলস আড়াল দিয়া ঘেরা ছিল বলিয়া বাঙ্গাল এই নাম

মতান্তরে, বঙ্গ+আলয়="বঙ্গালয়।" অপভ্রংশে বাঙ্গালা। তঞ্জোরে ১১ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ প্রশস্তিতে আছে "বঙ্গলম্" তাহা হইতে বাঙ্গালা পূর্ব্বে এই সমগ্র প্রদেশ করতোয়া ও গঙ্গার দ্বারা বিভক্ত হইয়া পশ্চিমাংশ গৌড় এবং পূর্ব্বাংশ বঙ্গ নামে অভিহিত ছিল। মোগল শাসনকালে মিলিত "গৌড়বঙ্গ" বাঙ্গালা নাম প্রাপ্ত হয়]

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস কৃত অভিধান পৃ—১০৮১।

বৰ্দ্ধনরাজকুলের কোন নিকট উত্তরাধিকারী ছিল না। তাই হর্ষবর্দ্ধনের মাতুল-পুত্র ভণ্ডীকে রাজা করা হইল। কিন্তু সে বড় বীর বা বিচক্ষণ ছিল না। এই সুযোগে সেনাপতি অর্জ্জুন অরুণাশ্ব রাজ্য অধিকার করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু সমস্ত লোক তাঁহার বিরোধী হইল।

ভাস্করবর্ম্মা অর্জ্জুনকে পদচ্যুত করিতে সচেষ্ট হইলেন। দৈবক্রমে অর্জ্জুনও একটী গর্হিত কার্য্য করিয়া ফেলিলেন। চীনসম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের নিকট এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। উক্ত দূতের পৌঁছিবার পূর্ব্বেই হর্ষবর্দ্ধন মানবলীলা সম্বরণ করেন। এদিকে অর্জ্জুন চীনদূতকে গুপ্তশত্রু মনে করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করেন এবং উপহারের দ্রব্যজাত লুণ্ঠন করেন। নানা চক্রে অর্জ্জুন বেশী দিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই।

বিক্রমপুর, এমন কি বঙ্গের অধিকাংশ ভাগ, এখন ভাস্করবর্ম্মার অধীন। বঙ্গ ও মগধের রাজগণের সহিত বর্ম্মণ-রাজগণের চিরন্তন শত্রুতা ও বিবাদ ছিল। এখন কতকটা সাম্য ও মৈত্রীর সঞ্চার উপস্থিত। গৌড়, বঙ্গ ও রাঢ় যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বর্ম্মণগণের অধীন ছিল এরূপ নহে। বৌদ্ধ সামন্তরাজগণ বর্ম্মণরাজগণের রাজচ্ছত্রতলে থাকিয়া দেশ শাসন করিতেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে লোকে হিন্দু-বৌদ্ধ মিশ্র-ভাবাপন্ন হইয়াছিল। হিন্দুগণ বৌদ্ধদেবদেবী এবং বৌদ্ধগণও হিন্দুদেবদেবীর পূজা করিত। ভারত হইতে বৈদিক ধর্ম্ম একরূপ লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল।

৬২৫ খৃষ্টাব্দে শশাঙ্কের পতন হয়। ইহার একশত বৎসর পর (৭২৫—৩০ খৃঃ অঃ) গৌড়ে স্বনাম ধন্য আদিশূরের অভ্যুদয় ঘটে। এই শত বৎসরে ভারতে অনেক অকাণ্ড ঘটিয়াছিল। এখানে একটি অপ্রাসঙ্গিক অথচ আবশ্যক কথার অবতারণা করিতে বাধ্য হইতেছি। সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের কনিষ্ঠা ভগিনী "রাজ্যশ্রী" কনৌজের মৌখরি-বংশীয় গ্রহবর্ম্মার রাণী ছিলেন। শশাঙ্ক-সমরে গ্রহবর্ম্মার পতন হইলে বীর্য্যবতী রাজ্যশ্রী নগর ও দেশ রক্ষার্থ সমরে অবতীর্ণা হয়েন। কিন্তু অবশেষে শত্রুহস্তে ধৃতা, বন্দিনী ও কারারুদ্ধা হন। কোন কোন ঐতিহাসিক এই ব্যাপারকে প্রাচীন ভারতের অমোচ্য-কলঙ্ক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃই ইহা কি নারী-নিগ্রহ? রাজ্যশ্রীর প্রতি কোনও অবৈধ-অত্যাচারের কথা ইতিহাস বলে না। এক সময়ে ইংরেজজাতি ফ্রান্স জয় করেন। কতককাল পরে, বীর্য্যবতী ফরাসী কৃষক-বালা জোয়ান্‌ডার্ক (Joan D. Arc) স্বদেশ উদ্ধার-কল্পে সৈন্যসহ অগ্রসর হন। ইংরেজ সৈন্যসহ তুমুল যুদ্ধে জোয়ান্ শত্রুহস্তে ধৃতা ও বন্দিনী হন। শত্রুগণ তাঁহাকে "ডাকিনী" মনে করিয়া জ্বলন্ত-আগুণে পুড়িয়া মারে! একি রমণী-নিগ্রহ? বোধ হয় না। যুদ্ধের ফল নানারূপই হইতে পারে। রাম তারকাকে যুদ্ধে বধ করেন, কলঙ্কের কথা কি? সুলতানা রিজিয়া যুদ্ধ করিয়া বিপক্ষের হস্তে বন্দিনী হ'ন এবং পরে নিষ্ঠুরভাবে নিহতা হন। ইহাও কলঙ্ক কি? কবিত্ব যেমন পদ্য ও গদ্য উভয় রচনাতেই থাকিতে পারে, বীরত্বও তেমনি নর ও নারী উভয়েতেই থাকিতে পারে। বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিলেই নারীর "স্ত্রীত্ব" দূর হয়। যুদ্ধের ফলে জয় পরাজয়, বন্ধন, লাঞ্ছনা সবই ঘটিতে পারে। তবে স্ত্রীজাতির প্রতি অবৈধ অত্যাচার, অবজ্ঞাদি কিছুতেই সহনীয় নহে। মধ্যভারতের প্রসিদ্ধ এক প্রাচীন রাজধানী, "খাজুয়াহো"র প্রস্তরগাত্রে খোদিত একটী শ্লোকে এরূপ আছে—

কা ত্বং?—কাঞ্চী-নৃপতি-বনিতা, কা ত্বং—
অন্ধ্রাধিপ-স্ত্রী,

কা ত্বং—রাঢ়া পরিবৃঢ়বধূঃ, কা ত্বমঙ্গেন্দ্র পত্নী
ইত্যালাপাঃ সমরজয়িনো যস্য বৈর-প্রিয়াণাম্
কারাগারে সজলনয়নেন্দীবরাণাং বভূবুঃ।

বিজ্ঞবর স্মিথ্ সাহেব তাঁহার "প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের" ১৪৫ পৃষ্ঠায় এইটি উল্লেখ করিয়া বলেন "এখানে প্রাচীন হিন্দুরাজগণের নারী-নিগ্রহরূপ অমোচ্য কলঙ্কচ্ছবি অঙ্কিত রহিয়াছে।" এ বিষয়ে আমরা নিরুত্তর। ভারতে না হইয়াছে এমন বিষয় নাই—সৎ, অসৎ, অমৃত, বিষ, সভ্যতা ও বর্ব্বরতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত ভারতে বিদ্যমান। মগধের রাজা জরাসন্ধ মহাদেবের নিকট ১০০ রাজাকে বলি দিতে সংকল্প করিয়া, ৯৭ জন রাজাকে পরাজিত করিয়া, কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। আর ৩ জন হইলেই "রাজমেধযজ্ঞ" সম্পন্ন হইত !! পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ কাণ্ড আর কোথাও আছে কি ? শ্রীকৃষ্ণ তখন দেশ রক্ষা না করিলে আর্য্যসভ্যতা উড়িয়া যাইত। শ্রীকৃষ্ণই তখন কৌশলে জরাসন্ধকে নিহত করাইয়া উক্ত ৯৭ জন রাজাকে মুক্তি দেন।

চীন-পরিব্রাজক য়ুএন্‌চুয়াং (Yuen Chwang) এই সময়ের সমতট রাজ্য ও তত্রত্য লোকদের সম্বন্ধে এক পরিষ্কার বর্ণনা দিয়াছেন। সমতটের রাজধানীর নিকটে একটী 'অশোকস্তূপ' ছিল। ঐস্থানে (বিক্রমপুর আসিয়া) পূর্ব্বে বুদ্ধদেব এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত স্বকীয় বৌদ্ধধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ঐ অশোকস্তূপের নিকটে একটি বৌদ্ধ "বিহার" ছিল এবং তাহাতে পীতবর্ণের একটী প্রস্তরময় বৌদ্ধমূর্ত্তি ছিল। ঐ মূর্ত্তিটী ৮ ফিট উচ্চ। সমতট হইতে পশ্চিমে তাম্রলিপ্তির দূরত্ব ১০০ মাইল।

এইখানে বিশ্ব-বিখ্যাত "শীলভদ্র" নামক জনৈক পণ্ডিতের কথা বলা আবশ্যক। ইনি সমতটের বজ্রাসন গ্রামের (বর্ত্তমান বজ্রযোগিনী) এক ব্রাহ্মণ-রাজবংশে জাত। ইহাঁরই নিকট ইউয়েন্ চুয়াং বহু বিদ্যা শিক্ষা করেন। শীলভদ্র অদ্বিতীয় শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিত ছিলেন। ইহাঁর বিদ্যার খ্যাতি তখন এশিয়ার সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি বিদ্যা ও জ্ঞানের অন্বেষণে সমস্ত ভারত পর্য্যটন করেন এবং অবশেষে মগধ-দেশের "নালন্দ" নামক প্রসিদ্ধ স্থানে উপস্থিত হয়েন।

এখানে তিনি সাতিশয় মনোযোগের সহিত অধ্যাপক ধর্ম্মপালের নিকট সমগ্র বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বৌদ্ধদের সহিত তর্কযুদ্ধের জন্য ভারতের নানা দেশ হইতে বড় বড় হিন্দু-পণ্ডিতগণ তখন নালন্দে আসিতেন। শীলভদ্র তাঁহাদের সহিত বিচার করিবার জন্য গুরুর অনুমতি চাহিলেন। গুরু অনুমতি দিলেন। তখন শীলভদ্রের বয়স মাত্র ৩০ বৎসর। তিনি বহু বিচার-যুদ্ধে জয়ী হইলেন। অতঃপর চারিদিকে যশঃ বিস্তৃত হইল এবং তাঁহার নামে "শীলভদ্র সংঘারাম" প্রতিষ্ঠিত হইল। মগধরাজ তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য একটি গ্রামের উপস্বত্ব ঐ আশ্রমে প্রদান করিলেন। আসামের ভাস্করবর্ম্মা ইউয়েন্ চুয়াংকে তাঁহার দেশে যাইতে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু চীন-পরিব্রাজকের ঐ হিন্দুবহুল স্থানে যাইতে বড় মত ছিল না। পরে গুরু শীলভদ্রের অনুমত্যানুসারে কামরূপে যান।

শ্রীহট্ট জিলার "পঞ্চখণ্ড" নামক স্থানে আবিষ্কৃত ভাস্কর-বর্ম্মার তাম্র-শাসনে প্রায় ৩০০ বৎসরের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাতে উক্ত হইয়াছে, ভাস্করবর্ম্মা এক সময়ে কর্ণসুবর্ণ পর্য্যন্ত জয় ও অধিকার করিয়াছিলেন সম্ভবতঃ এ টুকু হর্ষবর্দ্ধনের জন্য। কিছুকালের মধ্যেই মাধবগুপ্তের পুত্র "আদিত্য সেন" পুনরায় পূর্ব্ব-ভারত

অধিকার করিয়া "মহারাজাধিরাজ" উপাধি ঘোষণা করেন।

ইতিপূর্ব্বে গৌড়াধিপ শশাঙ্কের বিজয়-কাহিনী অনেকটা বিবৃত হইয়াছে। ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলে তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় আর একটু অধিকতর পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করা আবশ্যক। তাই নিম্নে আরও কতিপয় কথা যোজনা করিতেছি :—

ভারতের পূর্ব্বাঞ্চল তখনও অর্থাৎ প্রায় ১৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে সাগরমাতৃক ছিল। পূর্ব্বদেশ নদীজলে সমাচ্ছন্ন ছিল। নিজে ব্রহ্মপুত্র সমুদ্রবৎ বিশাল ছিল। তাহার সুনীল বারিরাশি তখনও নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর নিকট "কালাপানী" বলিয়া অগম্য অস্পৃশ্য ছিলনা। তখন এদেশে বিস্তর বাণিজ্য-জাহাজ ও যুদ্ধ-জাহাজ নির্ম্মিত ও ব্যবহৃত হইত। এ দেশের যুদ্ধ তখন প্রধানতঃ জলযুদ্ধই ছিল। সুশিক্ষিত ও সুদক্ষ গৌড়ীয় কৈবর্ত্ত-সৈন্য সংগ্রহ করিয়া এবং অসংখ্য রণতরী নানা অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত করিয়া, শশাঙ্ক মন্ত্রিগণ সহ গঙ্গাবক্ষে পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে প্রধান সেনাপতি ও মন্ত্রী যশোধবল। হিতৈষিগণের মঙ্গলধ্বনি, প্রজাগণের বিজয়-নাদ, সুতার রণবাদ্য, সৈনিকগণের জয়োল্লাস মেদিনীকে কম্পিত ও গগনমণ্ডলকে যেন বিদীর্ণ করিতে লাগিল। নীচে প্রসন্ন-পুণ্য-সলিলা সুনাব্য গঙ্গা গৌড়ীয় নাবী (Navy) বক্ষে লইয়া সাগর-গামিনী। শশাঙ্কের উদ্দেশ্য কামরূপ (Assam) জয় করা। এই সময়ে কামরূপ-রাজ্য অতীব পরাক্রান্ত ছিল।

ভারতের সুদূর পূর্ব্বাঞ্চলে রাজনীতির লীলা খেলা কখনই বড় বেশী হয় নাই। তাই নরকাসুরের বংশধরগণ সুদীর্ঘকাল এই অংশে রাজত্ব করিয়া আসিতেছিলেন। বহুকাল হইতে বর্ম্মণরাজগণ বঙ্গ জয়ের আশা পোষণ আসিতেছিলেন, কিন্তু কখনও তাহা ফলবতী হয় নাই। মগধ ও বঙ্গরাজগণের সহিত বর্ম্মণগণের চিরন্তন শত্রুতা। ভাস্কর বর্ম্মার পিতা সুস্থিত বর্ম্মা একবার বহু সৈন্য নিয়া বঙ্গজয়ে আসিয়াছিলেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ভাস্করের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুপ্রতিষ্ঠিত বর্ম্মাও এতকাল কোনও সুপ্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন নাই। এখন বিক্রান্ত ভাস্কর বর্ম্মা কামরূপে প্রধান। এবার শশাঙ্ক ভাস্করকে গ্রাস করিতে উদ্যত!! কেবল রাজ্যলোভই কি শশাঙ্কের সংযাত্রার কারণ? তাহা নহে। শশাঙ্কের অভ্যুদয় ও বিজয়শ্রী ভাস্করের চক্ষুশূল। উভয়েই হিন্দু—খাঁটি হিন্দু। এদিকে বঙ্গের প্রজাগণ তখন অধিকাংশই বৌদ্ধ, মহাযানীয় বৌদ্ধ-সম্প্রদায়-ভুক্ত। মেঘনার পশ্চিম তীরের বৌদ্ধগণ ব্রাহ্মণ-দ্বেষী ছিল না, কিন্তু পূর্ব্ব তীরের কৃষকগণ পর্য্যন্ত হিন্দুর, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের উপর ঘোর অত্যাচার করিত। হিন্দুর পুনরভ্যুদয় বৌদ্ধদের প্রাণে যেন শেলসম বিদ্ধ হইত। তাই সে সময়, সমস্ত ভারত ব্যাপিয়া বৌদ্ধ-নায়কগণ পুনরায় ভারতে বৌদ্ধ-সাম্রাজ্য গঠনের চেষ্টায় ব্রতী হইয়া পড়িয়াছিলেন। থানেশ্বরে অমোঘ-রক্ষিত বর্দ্ধন-রাজগণকে এই জন্য জাগরিত করিতেছিলেন। বঙ্গে শত্রুসেন, বন্ধুগুপ্ত প্রভৃতি বৌদ্ধনায়কগণ শশাঙ্কের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ-প্রজাগণকে বিদ্রোহী করিতেছিলেন।

ভাস্কর বর্ম্মা সুযোগ বুঝিয়া এই বিদ্রোহানলে বাতাস দিতেছিলেন। কখন কখন তিনি প্রকাশ্যে সৈন্যাদি দ্বারা বিদ্রোহিগণকে সাহায্য করিতেও ত্রুটি বা ভয় করিতেন না। পূর্ব্ববঙ্গ এখনও শশাঙ্কের হস্তগত হয় নাই। তাই শশাঙ্ক অগ্রে ভাস্কর বর্ম্মার দমনই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। কিন্তু এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হওয়ার পথে বিষম

অন্তরায় উপস্থিত হইল। পূর্ব্ববঙ্গবাসীগণ ঘোর যুদ্ধার্থ প্রস্তুত। কাজেই শশাঙ্ক হেমন্তকালে বঙ্গ আক্রমণ করিলেন; তাঁহার নৌ-বাহিনীর অধ্যক্ষ মাধব বর্ম্মা, সেনাপতি নরসিংহ দত্ত। যশোধবল মহানায়ক ছিলেন। ভাস্কর বর্ম্মা এক লক্ষ সৈন্য সহ পূর্ব্ববঙ্গের সাহায্যার্থ সশরীরে উপস্থিত। অচিরে শঙ্করনদে উভয় পক্ষের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তুমুল যুদ্ধের পর কামরূপ-সেনা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। ইহার একমাস পর ২৫,০০০ সৈন্য লইয়া শশাঙ্ক ভাস্কর বর্ম্মাকে আক্রমণ করিবেন বলিয়া মনস্থ করিলেন, কিন্তু এ অঞ্চলে বিদ্রোহ দমনে একান্ত বিব্রত হইয়া পড়ায়, শশাঙ্কের সেই সঙ্কল্প ভাসিয়া গেল। অচিরে শশাঙ্ক মেঘনাদের পূর্ব্বতীর আক্রমণ করিয়া তথায় শিবির সংস্থাপন করিলেন। কিন্তু ঘোরযুদ্ধে বিদ্রোহীদের জয় হইল। ত্রিপুরাবাসীগণ নৌ-যুদ্ধে তখন অতি নিপুণ ও সাহসী ছিল। তাহাদের বীরত্বে গৌড়ীয় সেনা একান্ত অস্থির হইয়া উঠিল। বহুকষ্টে ও চেষ্টায় কোনমতে আত্ম-রক্ষা করিয়া চলিল। অনেক যুদ্ধের পর শশাঙ্ক জয়লাভ করিয়া পূর্ব্বদেশ অধিকার করিলেন। কিন্তু প্রজাবৃন্দ বশীভূত হইল না। তখন শশাঙ্ক সন্ধির প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু বৌদ্ধ-প্রজাগণ বৌদ্ধ-নায়ক বন্ধুগুপ্ত কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া বলিল,—"আমরা থানেশ্বরের প্রজা, আমরা শশাঙ্কের আধিপত্য স্বীকারে কিছুতেই সম্মত নহি।"

বসন্তের প্রারম্ভে পুনরায় যুদ্ধোদ্যোগ চলিল। এবার ধবলেশ্বরী-তীরে শশাঙ্ক শিবির স্থাপন করিলেন। প্রবলবেগে যুদ্ধ চলিল; চৈত্রের শেষে সুবর্ণগ্রাম অধিকৃত হইল। তৎপর যশোধবল ও শশাঙ্ক বিক্রমপুর আক্রমণ করিলেন। ঘোর যুদ্ধ বাধিল, কিন্তু প্রথম প্রথম বিক্রমপুরীগণ পরাজিত হইল। যুদ্ধে বিরত না হইয়া বহু নৌ-সেনা সংগ্রহ করিয়া আবার তাহারা শশাঙ্কের সম্মুখীন হইল। সহসা শশাঙ্ক সাংঘাতিকরূপে আহত হইলেন এবং মূর্চ্ছিত হওয়ায় নদীতে পড়িয়া গেলেন। মেঘনার এই নদী তখন শীতলা নামে কথিত হইত। ইহার বর্ত্তমান নাম "শীতল-লক্ষ্যা।" মধ্যে "চর" পড়িয়া মেঘনা এখন শীতললক্ষ্যা হইতে প্রায় ৩।৪ মাইল পূর্ব্বদিকে সরিয়া পড়িয়াছে।

সুস্থিত বর্ম্মণের বিজেতা মগধের মহাসেন গুপ্তের মৃত্যু হওয়ায় মাধবগুপ্ত রাজ্যগ্রহণ করিয়া, থানেশ্বরের বর্দ্ধন রাজগণের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। শশাঙ্কের অনুমিত মৃত্যুর কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। শক্রসেন কর্ত্তৃক জল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া, শশাঙ্ক এক দয়ালু ধীবর গৃহে বাস করেন। ধীবর বহু চেষ্টায় ও যত্নে শশাঙ্ককে প্রকৃতিস্থ করে। এই ধীবরের পরিচয় বা বাসস্থানের কোনই উল্লেখ নাই। ধবলেশ্বরীর দক্ষিণ তীরে "ফিরিঙ্গিবাজারের" নিকটে বহুকাল হইতে ধীবরকুল বাস করিয়া আসিতেছে। পর্ত্তুগীজ পাদরীগণ ইহাদের অনেককে খৃষ্টান করিয়াছিলেন। এখনও তথায় অনেক খৃষ্টান বিদ্যমান। তাহাদের নামেই—"ফিরিঙ্গিবাজার" নামকরণ হইয়াছে। সম্ভবতঃ এখানেই শশাঙ্ক রক্ষিত হইয়াছিলেন। শশাঙ্কের মৃত্যু স্থির করিয়া তাহার বীর অনুচরগণ বিদ্রোহী হইল।

দিগ্বিজয়ী গ্রীক্ বীর আলোকচন্দ্রের (Alexander) মৃত্যুর পর তাঁহার সেনানীগণ যেমন তাঁহার বিশাল-সাম্রাজ্য নিজদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন, শশাঙ্কের নায়কগণও তদ্রূপ তাঁহার বিজিত রাজ্যগুলি ভাগ করিয়া লইলেন। যশোধবল ও অনন্তবর্ম্মা বিক্রমপুরে শিবিরে থাকিয়া ৫ বৎসর পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গের রাজকার্য্য পরিচালনা

করিতে লাগিলেন। বীরেন্দ্রসিংহ গৌড়ে, বসুমিত্র বঙ্গে, মাধববর্ম্মা সমতটে, এবং নরসিংহ দত্ত রাঢ়ে, এখন প্রতিষ্ঠিত। ভাস্কররূপী সূর্য্যের গ্রহণ হইল না। শশাঙ্কই ৫ বৎসর লোকচক্ষুর অন্তরালে রহিল। খুব সম্ভব যশোধবলই শশাঙ্ককে গুপ্ত অবস্থায় রাখিয়াছিলেন।

মগধে মাধবগুপ্ত রাজা। যশোধবল বেগে বিক্রমপুর হইতে সৈন্যসহ মগধে অগ্রসর। বৌদ্ধ-নায়কগণ মগধের ব্রাহ্মণদের উপর ঘোর অত্যাচার করিতেছিলেন; হিন্দু-মন্দিরে বুদ্ধের মূর্ত্তি পূজার্থ প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। প্রজাগণ উপদ্রুত কিন্তু কোনও প্রতীকার ছিল না। যশোধবল সেখানে গিয়াও কিছুই করিতে পারিতেছিলেন না; এমন সময় শশাঙ্ক সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইলেন। সকলেই উচ্চৈস্বরে শশাঙ্ককে বন্দনা করিল। বৃদ্ধ মন্ত্রিদ্বয় মাধবগুপ্তকে সিংহাসন হইতে টানিয়া নামাইল, এবং শশাঙ্কের শিরে রাজমুকুট প্রদান করিলেন। ভয়ে হংসবেগ ও মাধবগুপ্ত পাটলিপুত্র হইতে পলায়ন করিলেন। বৌদ্ধনায়ক বুদ্ধঘোষ রাজসভা ত্যাগ করিলেন। পরিণামে হর্ষবর্দ্ধন মগধ জয় করিয়া আত্মীয় পূর্ণবর্ম্মাকে পাটলিপুত্রে উপরাজ (Viceroy) রূপে স্থাপিত করেন। ঘোর হিন্দু-দ্বেষী ও রাজদ্রোহী বৌদ্ধ-নায়ক বুদ্ধঘোষ শশাঙ্কের আদেশে নিহত হইল। ভয়ে বন্ধুগুপ্ত পলায়ন করিলেন কিন্তু রক্ষা পাইলেন না। অনেক চেষ্টায় বন্ধুগুপ্ত ধৃত হইয়া রাজসকাশে আনীত হইলেন। একদিন এই পাপাত্মা বন্ধুগুপ্ত যশোধবলের পুত্রের হত্যাসাধন করিয়াছিলেন; তাই আজ যশোধবল সেই বৌদ্ধনায়ক বন্ধুগুপ্তের শিরশ্ছেদ করিলেন।

অতি প্রাচীনকালে হইতেই বাঙ্গালীরা কৃষি, শিল্প, বিদ্যা, বাণিজ্য, শৌর্য্যপ্রভৃতি পুরুষোচিত গুণে ভূষিত ছিল। বিগত মহাসমরে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সাদরে আহূত হইয়া বাঙ্গালীরা ইউরোপ ও এশিয়ার রণক্ষেত্রে বেশ প্রশংসার সহিতই কার্য্য করিয়াছে। জলযুদ্ধে পূর্ব্ববঙ্গবাসীগণ চিরকাল সুপ্রসিদ্ধ। গত ১৪শ শতাব্দী হইতে মগেরা জলপথে আসিয়া পূর্ব্ববঙ্গের বহুস্থানে ঘোর অত্যাচার করিত। পরে পর্ত্তুগীজগণ মগ-দস্যুগণের সঙ্গে যোগ দিয়া উপদ্রবের মাত্রা শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছিল। শাহজাহান যখন ঢাকাতে নবাব ছিলেন, তখন তিনি স্বচক্ষে এসব অত্যাচার দেখিয়াছিলেন। পরে তিনি সম্রাট হইয়া দিল্লীর সিংহাসন অলঙ্কৃত করিলেন, কিন্তু নানা রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও পূর্ব্ববঙ্গের জলদস্যুগণের অত্যাচারের কথা ভুলিলেন না। তিনি ঢাকার নবাবকে দস্যু দমনের জন্য আদেশ করিলেন এবং দিল্লী হইতেও সৈন্য এবং অর্থ পাঠাইলেন। উপদ্রব শান্ত হইল, কিন্তু বেশী দিনের জন্য নহে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফিরিঙ্গি ও মগেরা পুনরায় রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করে। ঢাকা নবাব-সরকার হইতেই রণতরী, অস্ত্র-শস্ত্র প্রভৃতির বিপুল আয়োজন হয়। এই সময়ে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজবল্লভ ঢাকা নবাব-সরকারে মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে সামান্য মোহরের চাকুরী করিতেন। তিনি এই ফিরিঙ্গি-দমন রণ-বহরে এক কাজ নিয়া অগ্রসর হইলেন। মেঘনাদে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। রাজবল্লভের রণ-কৌশল ও অসীম সাহসিকতায় অনেক ফিরিঙ্গি ও মগ নিহত হইল। যুদ্ধ চলিতে লাগিল। দস্যুদল পরাজিত হইয়া বঙ্গোপসাগরের দিকে ছুটিল। রাজবল্লভ ও মোগল সেনানী ফিরিঙ্গিদিগকে তাড়াইয়া নিয়া পরে বন্দী করিলেন। সন্ধি হইল, চট্টগ্রাম ও ফিরিঙ্গিবাজার এই দুই স্থানে

পর্ত্তুগীজগণ চিরদিনের জন্য অবরুদ্ধ হইল। আজ পর্য্যন্তর ও উহারা এই দুই স্থানে বাস করে। এই ঘটনার পর হইতে রাজবল্লভ ঢাকা নবাব সরকারে ক্রমে দেওয়ানী পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

বহু প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে জাহাজ-নির্ম্মাণ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। জাহাজ-নির্ম্মাতাকে সংস্কৃতে "নৌ-কার" (Ship-wright) বলে। পূর্ব্বে শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, ঢাকা, নোয়াখালী প্রভৃতি দেশের সর্ব্বত্র জাহাজ নির্ম্মিত হইত এবং নাবিকতাও ছিল। বঙ্গোপসাগরের এই অংশ শুকাইয়া যাওয়ায়, এখন কেবল চট্টগ্রামে জাহাজ নির্ম্মাণের স্থান (Dock) হইয়াছে। এখনও শ্রীহট্ট এবং ত্রিপুরার স্থানে স্থানে হল-কর্ষণ কালে ভগ্ন-জাহাজের মাস্তুল ও অন্যান্য অংশসকল উত্তোলিত হইতেছে।

শ্রীহট্টের কুলাউড়া রেলপথে "ভাটেরা" টিলায় প্রাপ্ত শিলা-লিপির বর্ণিত বিশাল রণ-পোতের বহর ইত্যাদি প্রাচীন জাহাজ নির্ম্মাণ ও নৌ-যুদ্ধের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। চট্টগ্রামের দক্ষিণে হালিসহর, পতেঙ্গা প্রভৃতি স্থানে এখনও স্বদেশী জাহাজ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ভারত গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব রাষ্ট্রতত্ত্ব-সচিব বিজ্ঞবর হাণ্টার সাহেব বলেন, "This Dock maintained its glory till 1875 অর্থাৎ চট্টগ্রামের এই জাহাজ-নির্ম্মাণের কারখানা ইং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নিজ গৌরব রক্ষা করিয়াছিল।" এখনও চট্টগ্রাম অঞ্চলে হিন্দু-ধরণের জাহাজ শ্লুপ ইত্যাদির নির্ম্মাণ কার্য্য বেশ চলিতেছে। হালিসহরের কালীকুমার দে একজন বেশ সুদক্ষ নৌ-কার (Ship-builder)। কতিপয় বৎসর হইল, সে "আমিনা খাতুন" নামে একখানা বড় জাহাজ নির্ম্মাণ করে। বড় বড় ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ারগণ উহা দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে Engine (যন্ত্র) বসাইলে ঐ জাহাজখানা বিদেশী জাহাজ অপেক্ষা যে উৎকৃষ্ট হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

হিন্দুগণ জাহাজে চড়িয়া সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিতেন। এ অঞ্চলে ধনপতি চন্দ্র সদাগর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বণিক্গণ বড় বড় পণ্য-পোত (Merchantmen) লইয়া মঘদ্বীপ (Pegu), মন্দহরিণ (Aracan), সিংহল ও পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যাতায়াত করিতেন। নাবিকগণ "দূরবীক্ষণ" (Telescope) ব্যবহার করিত। বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ কবি শিবচন্দ্র সেন তদীয় "সত্যনারায়ণের পাঁচালি" নামক খণ্ড-কাব্যে ধনপতি সদাগরের সমুদ্রযাত্রা-প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ—

দূরবীণ ধরি পশ্চিম দিকে।
এক আঁখি দিয়া দেখিতে লাগে ॥"

কখন কখন চুম্বক পাথরের আকর্ষণ এড়াইবার জন্য লৌহের পেরেকের পরিবর্ত্তে বেতের ব্যবহার হইত।

হিন্দুরা এখন সমুদ্রের সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছেন। সাগরের "কালা-পানী" দেখিলে এখন হাঁপানী উপস্থিত হয়! সম্প্রতি গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া মহারাজ এক "ফ্লোটিলা কোম্পানী" খুলিয়াছেন ; তাহা বোম্বাই অঞ্চলে চলিতেছে।

চট্টগ্রামের ও নোয়াখালীর মুসলমানগণ এখন দেশী বিদেশী সব জাহাজে সারেঙ্গ, লস্কর ও নাবিকাদির কার্য্য করিয়া থাকে। ইহারা বেশ নিপুণ। এখন বাঙ্গালী হইলেও, ইহারা খাঁটি বঙ্গজ নহে। পূর্ব্বে আরব ও চীনা জাহাজ "গঙ্গা-নগরে" আসিত। ক্রমে বহু আরব-পরিবার দক্ষিণ ভারতের মালাবার উপকূলে, সিংহলে

এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করে। এ অঞ্চলে মুসলমান-ধর্ম্ম বিস্তৃত হইলে ইহারাও মুসলমান হয়। কিন্তু ইহারা নাবিকতা ছাড়িয়া "কেরাণীর জাতিতে" পরিণত হয় নাই। ভারতীয় নাব্য-জীবনের ইহারাই শেষ দৃষ্টান্তস্থল। নৌ-চালন-বিদ্যায় সুদক্ষ হইয়াও ইহারা অপেক্ষাকৃত কম বেতনে তুষ্ট, তাই সমুদ্রগামী বিদেশী জাহাজে ইহাদের এত নিয়োগ ও আদর।

বঙ্গে—পূর্ব্বে গঙ্গানগর এবং পশ্চিমে তমালিকা এই দুই প্রধান বন্দর ছিল। কিন্তু সমুদ্র এই দুইস্থান হইতে কালে বহুদূরে সরিয়া যাওয়ায় ইহারা উত্তরোত্তর শ্রীহীন হইয়া পড়ে। বিজ্ঞবর ডাঃ স্যার হাণ্টার সাহেব তাঁহার "উড়িষ্যা" নামক গ্রন্থের ৩১৪-১৫ পৃঃ বলিয়াছেন,—"বাঙ্গালীরা বৌদ্ধযুগে বিদেশে বাণিজ্য ও যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণ করিত। ইহারা বহুস্থানে রাজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু কালে বন্দরগুলি হইতে সমুদ্র সরিয়া যাওয়ায় এবং শাস্ত্রকারগণের সমুদ্র-যাত্রায় নিষেধ বিধির ফলে, বাঙ্গালীরা সমুদ্র সংস্রব হইতে একেবারে বিরত হইয়াছে।"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে ভারতের শেষ পরাক্রান্ত হিন্দুসম্রাট হর্ষবর্দ্ধন শীলাদিত্যের মৃত্যুর পর তাঁহার বংশের কেহই ছিল না। সেনাপতি অর্জ্জুন অরুণাশ্ব বলপূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু মন্ত্রী ও অন্যান্য রাষ্ট্র-নেতৃগণ অল্পকালের মধ্যেই সেনা-পতিকে দূরীভূত করিয়া হর্ষবর্দ্ধনের মাতুল-পুত্র রাজকুমার ভণ্ডিকে আনিয়া সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন; কিন্তু কিছুতেই সাম্রাজ্য রক্ষা হইল না। এই সুযোগে মগধের মাধবগুপ্তের পুত্র আদিত্য-সেন পুনরায় গুপ্তরাজ্য উদ্ধারে যত্নশীল হইয়া পড়িলেন। অতুল পরাক্রমে তিনি ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলে নিজ-আধিপত্য অনেক পরিমাণে বিস্তৃত করিয়াছিলেন। এই সময় "জীবধারণ পরমেশ্বর" নামক জনৈক বঙ্গের রাজা উক্ত আদিত্যসেনের প্রচেষ্টায় পুনঃ পুনঃ বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। গুপ্তগণের সহিত মৈত্রী করিয়া বঙ্গের পূর্ব্বাঞ্চলে সামন্তরাজ "লোকনাথ" এই সময়ে বেশ বীর দর্পে শির উত্তোলিত করিতেছিলেন। উক্ত জীবধারণ তাহাতে ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহাকে দমন করিতে বিপুল সৈন্য সহ অগ্রসর হইলেন। কিন্তু মন্ত্রিগণের পরামর্শে পথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই জীবধারণ কে, কোন্ বংশীয়, কোথায় রাজত্ব করিতেন ইত্যাদি বিষয় এ পর্য্যন্ত অজ্ঞাত। ইঁহার বিবরণ ভাবী আবিষ্কারের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। বর্দ্ধন-রাজগণের তিরোভাবের পরই ভারতে শতবর্ষব্যাপিনী (৬৫০-৭৫০ খৃঃ অঃ) অরাজকতা উপস্থিত হইল। ধন মান প্রাণ সুখ শান্তি বিদ্যা বাণিজ্য সবই তিরোহিত হইল!! দেশ অরাজক, প্রাচীন গুপ্তরাজ বংশ নির্ম্মূল, দরিদ্র-প্রজাগণ-বিধ্বস্ত!!

কামরূপের সৈন্যগণ আসিয়া বরেন্দ্রমণ্ডল ও রাঢ়মণ্ডল লুণ্ঠন করিতে লাগিল এবং জ্বালাইয়া দিতে লাগিল। জয়বর্দ্ধন ও প্রমথসিংহ সে সময়ে রাজা ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই দেশ রক্ষা করিতে পারিলেন না।

গুর্জ্জরগণ হূণজাতির এক শাখা। ইহারা ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এক পরাক্রান্ত রাজ্য গঠন করিয়াছিল। বহু পূর্ব্ব হইতেই ইহারা হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু নাম ব্যবহার করিয়া আসিতেছিল। বর্ত্তমান অরাজকতার সুযোগে, ইহারা স্বদেশ হইতে বহির্গত হইল। 'ইহারা আর্য্যাবর্ত্তের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রাম ও নগর ধ্বংস করিতে লাগিল।

সর্ব্বত্র সামন্ত-রাজগণ ভয়ে পলায়নপর হইলেন। গৌড়-বঙ্গের সৈন্যগণ গুর্জ্জরগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইতেছিল। এই দুঃসময়ে মহারাষ্ট্রপতি রাঠোর-কুল-তিলক "ধ্রুব" রক্ষা না করিলে সমস্ত দেশ গুর্জ্জরগণের অত্যাচারে ভীষণ মরুভূমে পরিণত হইত। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে ইতিহাস প্রসিদ্ধ যশোবর্ম্মা কনৌজের রাজা ছিলেন। কনৌজ "কোলাঙ্ক" প্রদেশের রাজধানী ছিল। বহুকাল হইতে হিন্দু-জাতির শৌর্য্য বীর্য্য জ্ঞান গুণ ধর্ম্ম প্রভৃতি বহু বিষয় কনৌজকে আশ্রয় করিয়াছিল। যশোবর্ম্মা পরাক্রান্ত এবং বিদ্যানুরাগী ছিলেন। মহাকবি ভবভূতি ইঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া অনেক সুন্দর নাটক রচনা করেন। যশোবর্ম্মা এখন বিজয়ে বহির্গত হইলেন। ক্রমে পূর্ব্বদিকে পাটলিপুত্রে উপস্থিত হইলেন। তিনি যথেচ্ছভাবে পাটলিপুত্র লুণ্ঠন করিলেন। মণি-মাণিক্য রত্নকাঞ্চন ও রাজপতাকা হস্তগত করিলেন। এখানেই যদি বিরত হইতেন তবে অনেক ভাল হইত! তিনি এক অতীব নিষ্ঠুর কার্য্য সাধন করিলেন—প্রাচীন গুপ্ত রাজবংশের সমস্ত লোককে অতি নৃশংসভাবে নিহত করিলেন!!! যে পাটলিপুত্র এক হাজার বৎসরেরও অধিক কাল ভারত কেন, সমগ্র পৃথিবীর নিকট বিজয় গৌরবে দেদীপ্যমান ছিল, যাহার বীরগণের শৌর্য্যনাদে বসুধা কম্পিত হইত, বহু সম্রাটের পীঠস্থান, বহু বিদ্বানের আশ্রয়ভূতা, বহু শিল্পের উৎকর্ষ ভূমি, সেই পাটলিপুত্র আজ একজন আদর্শ-হিন্দুরাজার করে ধর্ষিতা, বিধ্বস্তা, অশ্রুক্লিন্না ও শোকে মলিনা!! পতিপুত্রহীনা হৃত-সর্ব্বস্বা বিধবার ন্যায় আজ পাটলিপুত্রের দশা!

শিবিরে সুখ-সুপ্ত যশোবর্ম্মাকে কে যেন নিশিযোগে বলিল—"কাপুরুষ বীর একদিন কনৌজেরও এ দশা ঘটিবে।" সত্য সত্যই, ইহার তিনশত বৎসর পর সুলতান মামুদের হস্তে কনৌজের এরূপ দশা ঘটিয়াছিল। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর প্রারম্ভে তদানীন্তন সভ্য জগতের অধীশ্বরী রোম (Rome) বর্ব্বর হূণজাতির করে এইরূপ দুর্দ্দশাপ্রাপ্ত হইয়াছিল!!! গুর্জ্জরগণ পাটলিপুত্র বিধ্বস্ত করিলেও এত দুঃখের বিষয় হইত না! যশোবর্ম্মা তথা হইতে গৌড়-বঙ্গেও আসিয়াছিলেন। কনৌজে ফিরিয়া, যশোবর্ম্মার যশঃ রাহুগ্রস্ত হইয়াছিল। কাশ্মীরের বীরপুঙ্গব ললিতাদিত্য দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া এই যশোবর্ম্মাকে পরাজিত করেন এবং সন্ধির একটী সূত্র অনুসারে, ভবভূ ও অন্য একজন কবিকে কাশ্মীরে লইয়া যান।

এই শতবার্ষিক অরাজকতায় গৌড়-বঙ্গের বেশ উপকারও হইয়াছিল। পুনঃ পুনঃ বহিশত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা ও দেশরক্ষার জন্য বাঙ্গালীদিগকে বাধা দিতে উদ্যম করিতে হইয়াছিল। ইহাতে অল্পাধিক যুদ্ধশিক্ষা, জন-সংহতি গঠন, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি বহু বিস্মৃত বিষয় সঞ্জীবিত হইয়াছিল।

৬৭২ খৃষ্টাব্দে চীন-পরিব্রাজক "আই-চিং" ভারতবর্ষে ছিলেন। তিনি বলেন, তাঁহার পূর্ব্বে "সেং-চি" নামক অন্য একজন চীন-পর্য্যটক দক্ষিণ সমুদ্রপথে সমতটে আসিয়াছিলেন। সেং-চি সমতটের সিংহাসনে একজন বৌদ্ধ নৃপতিকে দেখিয়াছিলেন। তাঁহার নাম "হলশো-পোট" (Holosho-pote) তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের একজন অতি ভক্ত পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে (৬৩৮ খৃষ্টাব্দে) ইউয়েন্ চুয়াং সমতটের রাজধানীতে মাত্র ২০০০ বৌদ্ধ শ্রমণ দেখেন; সেংচি সেখানে ৪০০০ শ্রমণ দেখিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে এই বৌদ্ধ শ্রমণগণ প্রাচীন স্থবির-মতাবলম্বী ছিলেন; কিন্তু সেংচি তাহাদিগকে এখন "মহাযান" সম্প্রদায়ভূক্ত দেখিলেন।

"বিশ্বকোষ" সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন,—"দেবখড়্গ তনয় "রাজভট্ট"ই এই বৌদ্ধ সমতট-রাজ ছিলেন। প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত "শিভেনিজ" ইঁহার নাম বলেন হর্ষভট্ট। Watters বলেন "রাজভট্ট", বিল সাহেব (Beal) ওয়াটার্সের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিষয়টি এখনও অনিশ্চিত। ভবিষ্যৎ আবিষ্কারে অবশ্যই সন্দেহ দূরীভূত হইবে।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী ভারতীয় ইতিহাসে একটী স্মরণীয় যুগ। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বাঙ্গীন বিজয়লাভ। গর্ব্বিত আর্য্যাবর্ত্ত এখন দাক্ষিণাত্যের নিকট মস্তক অবনত করিল। কি রাজনীতি, কি ধর্ম্ম, কি শিল্প—সর্ব্ব বিষয়েই দাক্ষিণাত্য এখন সমগ্র ভারতের অধিনায়ক হইয়া দাঁড়াইল। এই সকল উক্তির যথার্থতা পরে পরিস্ফুটরূপে ব্যক্ত করিব।

উত্তর ভারতের অরাজকতার সুযোগে দাক্ষিণাত্য হইতে যে সকল হিন্দু বীরগণ বঙ্গে আসিয়া ক্রমে উত্তর ভারতে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শূররাজগণ প্রথম ও প্রধান। এই শূর-বংশের প্রথম রাজার নাম আদিশূর।

আদিশূর নাম বাঙ্গালীর নিকট অতি প্রিয়। হারূণ-অল্-রসিদ যেমন আরবের, বিক্রমাদিত্য যেমন ভারতীয় হিন্দুর, এলফ্রেড্ যেমন ইংরেজ জাতির গৌরব ও আদরের জিনিষ, আদিশূর নামও বাঙ্গালীর নিকট তদ্রূপ। তিনিই বঙ্গে হিন্দু ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন; তিনিই কনৌজ হইতে আদর্শ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বঙ্গে আনিয়া এদেশে উচ্চ সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই শিল্প, বিদ্যা, বাণিজ্যের নূতন যুগ-প্রবর্ত্তক। অদ্যাপি সমস্ত বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আদিশূর নাম ভুলে নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত আদিশূরের কোনও মুদ্রা বা শিলা-লেখ আবিষ্কৃত হয় নাই। তাই বিদেশী ঐতিহাসিকগণ আদিশূরের অস্তিত্বে পর্য্যন্ত শ্রদ্ধাবান্ নহেন। এদেশের কুল-শাস্ত্রগুলিতে আদিশূরের প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু সেগুলি এত দুর্ব্বল ও বিসদৃশ যে, কেবল মাত্র তাহাদের উপর নির্ভর করা চলে না। তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠক রঙ্গপুরের উকীল মহিমচন্দ্র মজুমদার প্রণীত "গৌড়ে ব্রাহ্মণ"নামক উপাদেয় পুস্তকখানা পড়িলে বহু বিষয় জানিতে পারিবেন। ঐ গ্রন্থখানা এখন আর আমার নিকট নাই। অন্যথা, উহা হইতে অনেক গবেষণার কথা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারিতাম।

আদিশূরের অস্তিত্ব ও রাজত্বকালের প্রমাণ:—

(১) হরিমিশ্র ও এড়ুমিশ্রের কারিকা। ১২৫০ খৃষ্টাব্দে সেনবংশীয় দনুজমাধবের সমকালবর্ত্তী হরিমিশ্র বলেন যে, কনৌজ হইতে বৈদিক ব্রাহ্মণগণের বঙ্গে আগমনের অল্পকাল পরে পালরাজগণের অভ্যুদয় এবং ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার ঘটিয়াছিল। প্রায় ৭৮০ খৃষ্টাব্দে ৭ জন সামন্তরাজ গোপালকে গৌড়-বঙ্গের সর্ব্বভৌম পাটে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন; তাই আদিশূর ৭৮০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন।

(২) দেশব্যাপী জনশ্রুতি:—সমস্ত কুলগ্রন্থেই আদিশূরের রাজত্ব এবং কনৌজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন প্রসঙ্গ আছে। "নহ্যমুলা জনশ্রুতিঃ"— কিম্বদন্তীর মুলে কিছু না কিছু সত্য থাকেই।

(৩) জয়সেনের "বৈদ্য-কুল চন্দ্রিকা" এবং রবিসেন মহামণ্ডলের "কুলপ্রদীপ" নামক গ্রন্থদ্বয়ে বলা হইয়াছে যে, আদিশূর নাম নহে, উপাধি।

(৪) বিজয়সেনের তাম্রলিপিতে উল্লেখ,—তাঁহার মহিষী বিলাস দেবী (বল্লাল সেনের মাতা) শূরবংশের কন্যা ছিলেন।

(৫) ১০২৩ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ রাজেন্দ্র চোলদেবের "তিরুমলয়" লিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, রণশূর দক্ষিণ রাঢ়ের রাজা ছিলেন। অবশ্যই ইনি আদিশূরের ১৩।১৪ পুরুষ অধস্তন এবং তখনও শূর বংশীয় কেহ কেহ বঙ্গের কোন কোন ভাগে রাজত্ব করিতেছিলেন।

(৬) পণ্ডিতকুলশিরোমণি পূজ্যপাদ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত সন্ধ্যাকর নন্দীর "রাম-চরিত্র" নামক কাব্যে লিখিত হইয়াছে যে, "অপার মন্দার" রাজা লক্ষ্মীশূর ধর্ম্মপালের একজন সামন্তরাজ ছিলেন।

(৭) বিজয়সেনের তাম্রশাসনে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বাৎস্য-গোত্রীয় জনৈক ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করা হইল, যাহার প্রপিতামহ "মধ্য-দেশ-বিনির্গত" অর্থাৎ কোলাঞ্চের রাজধানী কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গে আসিয়াছিলেন।

(৮) ভোজবর্ম্মার "বেলার" লিপিতেও উল্লিখিত যে, সাবর্ণ-গোত্রীয় জনৈক ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করা হইল, যাঁহার প্রপিতামহ মধ্যদেশ হইতে বঙ্গে আসিয়াছিলেন।

(৯) আদিশূর গৌড়মণ্ডলের অর্থাৎ বঙ্গ ও বিহারের "একচ্ছত্র মহারাজ", কামরূপ ও কলিঙ্গের "অধিরাজ", বঙ্গে বৈদিক-ধর্ম্মের স্থাপয়িতা। ৭৮০ খৃঃ অঃ হইতে ১০৮০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত বঙ্গে পালরাজগণ সার্ব্বভৌম নরপতি ছিলেন। তাহা হইলে আদিশূর কিরূপে গৌড়-মণ্ডলে সার্ব্বভৌম রাজা হইতে পারেন? কাজেই খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর প্রথমভাগে আদিশূর বর্ত্তমান ছিলেন। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকা হইতে দেখা যায়, আদিশূর হইতে বল্লালসেন ১২।১৩ পুরুষ অধস্তন। গড়ে ৩০ বৎসর জীবিতকাল ধরিলে ৩৯০ বৎসর হয়। ১১১৯ খৃষ্টাব্দে "লক্ষ্মণ সংবৎ" আরম্ভ হয়। ১১১৯—৩৯০ = ৭২৯ খৃষ্টাব্দ। তাই খুব সম্ভবতঃ আদিশূর ৭৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গে সমাসীন ছিলেন।

(১০) গৌড় কবি চতুর্ভুজের "হরি-চরিত" নামক কাব্যের ১৩শ সর্গে লিখিত হইয়াছে যে, বরেন্দ্র-ভূমির অন্তর্গত "করঞ্জ" গ্রাম বহু বিদ্বান্ ও সুব্রাহ্মণের আবাসস্থল। ঐ করঞ্জ গ্রামের পণ্ডিতবর স্বর্ণরেখ নামক ব্রাহ্মণ স্থানীয় রাজা ধর্ম্মপাল হইতে ঐ গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন। এই সামন্ত-রাজ ধর্ম্মপাল বিখ্যাত পাল বংশীয় সম্রাট ধর্ম্মপালের ২০০ বৎসর পর বিদ্যমান ছিলেন। এই স্থানীয় রাজা ধর্ম্মপালের অস্তিত্ব বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের কুলশাস্ত্র গৌড়-কবি চতুর্ভুজের "হরি-চরিত" কাব্য এবং রাজেন্দ্র চোলদেবের "তিরুমলয়" লিপি হইতে বেশ প্রমাণিত হইয়াছে। (South Indian Inscriptions Vol. III)। সুতরাং একথা সুনিশ্চিত যে পূর্ব্বোক্ত স্বর্ণরেখ ১০২০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই বিদ্যমান ছিলেন। বারেন্দ্রকুলগ্রন্থানুসারে স্বর্ণরেখ আদিশূর আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম কাশ্যপ গোত্রীয় সুষেণ হইতে ১০ পুরুষ অধস্তন। গড়ে ৩০ বৎসর ধরিলে, ১০ পুরুষে ৩০০ বৎসর হয়। ১০২৪-৩০০ = ৭২৪ খৃষ্টাব্দ। তাই, খুব সম্ভবতঃ আদিশূর ৭২৫-৩০ খৃষ্টাব্দে বা ইহার অতি নিকটবর্ত্তী কালে রাজত্ব আরম্ভ করেন।

(১১) "লাহিড়ী বংশাবলী" হইতে দৃষ্ট হয় পাল সম্রাট ধর্ম্মপাল, আদিশূর আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ক্ষিতীশের পৌত্র এবং ভট্ট নারায়ণের পুত্র "আদিগাঁই ওঝাকে" "ধামসার" নামক গ্রাম দান করিয়াছিলেন।

রাঢ়ী কুলপঞ্জী মতে, আদিবরাহ বন্দ্য বা বন্দ্যোপাধ্যায়, এই উভয় একই ব্যক্তির নাম, সন্দেহ নাই। সম্রাট ধর্ম্মপাল অনুমান ৭৯৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করেন। সুতরাং ক্ষিতীশ ও আদিশূর খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর প্রথমভাগে বিদ্যমান ছিলেন।

(১২) জৈনগ্রন্থ "বাপ্পা ভট্টসূরি চরিত" এবং রাজশেখরের "প্রবন্ধকোষ" প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, কনৌজপতি যশোবর্ম্মার পুত্র আমরাজ, গৌড়াধিপ ধর্ম্মপালের একজন ভীষণ শত্রু ছিলেন। এই উভয়ের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটিত। ইহা হইতে অনুমেয় যে, যশোবর্ম্মা এবং আদিশূর প্রায় সমকালিক। ডাঃ ভণ্ডারকর বলেন, পূর্ব্বোক্ত যশোবর্ম্মা প্রায় ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে মারা যান (Skr. Mss. 188-384 p. 15)। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন,—ভবভূতি কনৌজপতি যশোবর্ম্মার রাজকবি ছিলেন। বেহারের কুমারিল ভট্ট বৌদ্ধধর্ম্ম নিরসন জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন। কুমারিলের শিষ্য ভবভূতিও বৈদিকধর্ম্ম প্রসার সমিতিতে যোগ দেন; নিজের নাটকগুলিতেও বৈদিক ভাবের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যে নিজ অন্নদাতা যশোবর্ম্মাকেও বৈদিক ধর্ম্মানুরাগী ও সহায় হওয়ার জন্য উত্তেজিত করেন, একথা নিশ্চিত।

এই অবস্থায় হিন্দু যশোবর্ম্মা যদি হিন্দু আদিশূরের ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য পাঁচজন বৈদিক ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া থাকেন, তবে তাহা বড় বিস্ময়জনক নহে। কনৌজ তখন ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের কেন্দ্র ও জননী। এখনও "কনৌজ ব্রাহ্মণগণ" ভারতীয় ১০ শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বৈদিক ব্রাহ্মণগণ স্বেচ্ছায় ও সানন্দে যে সুদূর "শাস্ত্র নিষিদ্ধ" ম্লেচ্ছ বহুল বঙ্গে আসিতে সম্মত হইয়াছিলেন, বোধ হয় না। ধর্ম্মের জন্য এবং যশোবর্ম্মার প্ররোচনায় ব্রাহ্মণগণ এদেশে আসিতে সম্মত হইয়াছিলেন। তাই আদিশূর কর্ত্তৃক কনৌজ হইতে সুব্রাহ্মণ আনয়ন প্রসঙ্গ চতুর ব্রাহ্মণ্যগণের মিথ্যা রচনা বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে না।

যশোবর্ম্মা দ্বিতীয় হর্ষবর্দ্ধন হইতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাই তিনি সুদূর বঙ্গ পর্য্যন্ত জয় করিতে করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার দিগ্বিজয় কাহিনী রাজসভার অপর কবি "বাক্‌পতি রাজ" নিজ "গৌড় বহো" (গৌড় বধ) নামক প্রাকৃত কাব্যে বর্ণন করিয়াছেন। তাহাতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যশোবর্ম্মা মগধের পলাতক রাজাকে (সম্ভবতঃ আদিত্যসেনের প্রপৌত্র দ্বিতীয় জীবিতগুপ্ত) বধ করেন। তথা হইতে তিনি বঙ্গদেশে আসেন। বঙ্গরাজ্য সমুদ্র তীরস্থ ছিল। বঙ্গাধিপ তাঁহার বিশাল সৈন্য ও অসংখ্য হস্তী লইয়া যশোবর্ম্মাকে বাধা দিতে দণ্ডায়মান হইলেন; কিন্তু তুমুল যুদ্ধান্তে পরাজিত হইয়া বিজেতার নিকট বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

(১৩) (গৌড়বহো, Bombay Skr. Series, No. 34.) চীন গ্রন্থকারগণ যশোবর্ম্মাকে "ইচফম" (I-cha for-mo) নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এই যশোবর্ম্মা চীন সম্রাটের নিকট ৭৩১ খৃষ্টাব্দে এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। মগধরাজগণ তখনও সগর্ব্বে শশাঙ্কের "গৌরাধিপ" উপাধি ধারণ করিতেন। কিন্তু বঙ্গের রাজগণ কখনও সে উপাধি স্পর্শ করেন নাই। গৌড় বধ কাব্যে বর্ণিত এবং যশোবর্ম্মা কর্ত্তৃক বিজিত এই বঙ্গপতি কে ছিলেন অদ্যাপি তাহা অবিদিত।

(১৪) মহাত্মা এল্‌ফিনষ্টোন্ (Elphinstone) তাঁহার ভারতবর্ষের ইতিহাসে আদিশূরের কাল ৯০০ খৃষ্টাব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উর্দ্ধৃত প্রমাণগুলির পর, একথা স্বীকার্য্য কি?

(১৫) যুগের উপযোগিতাও একটী প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে:— ইউ এন্ চুয়াং ভারতের সর্ব্বত্র হিন্দুধর্ম্মের উন্নতি ও বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি প্রত্যক্ষ করেন। বেহারের কুমারিল ও তাঁহার শিষ্যগণের বৌদ্ধ নিরসন চেষ্টা। বঙ্গদেশেও বৌদ্ধ নিরসনের আবশ্যকতা ছিল, হিন্দুরাই এ দেশে সংখ্যায় বেশী ছিল; তথাপি রাজশক্তি ও ধর্ম্মশক্তি বৌদ্ধপ্রধান হওয়ায়, হিন্দুরা এ দেশে নিষ্প্রভ নক্ষত্রবৎ মলিন দশায় ছিল। আদিশূরের বঙ্গে আবির্ভাবের কালে এদেশে "সপ্তশতী" অর্থাৎ ৭০০ ঘর ব্রাহ্মণ ছিল, কিন্তু শূদ্রবৎ: ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় কেবলং সূত্র-ধারণাৎ। সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্ববঙ্গের সামন্ত-রাজ "লোকনাথের" ত্রিপুরালিপি হইতে জানা যায়, তিনি ত্রিপুরা জিলার বহু সুব্রাহ্মণকে ভূমি দান করেন। তৎকালীন "দ্বিজসত্তমেরা"ও শূদ্রার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিতেন; সমাজে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল। এই সপ্তম শতাব্দীতে বেহারেও এই প্রথা দৃষ্ট হয়। "হর্ষচরিত"কার বাণভট্ট লিখিয়াছেন, তাঁহার মাতা রাজদেবীর মৃত্যুর পর, তাঁহার পিতা একজন শূদ্রাকে বিবাহ করেন। তৎগর্ভে তাঁহার দুইটী ভাই জন্মিয়াছিল। ভাই দুইটী "পারসাব" বলিয়া পরিচিত। বৌদ্ধ প্রাধান্যে হিন্দুর কিরূপ অধোগতি ঘটিয়াছিল, পাঠক চিন্তা করিয়া দেখুন। কাজেই এরূপ যুগে সংস্কারপন্থী আদিশূরের আবির্ভাব সর্ব্বথা সমীচীন।

অনেকেই বলেন, আদিশূর প্রকৃত নাম নহে, উপাধি। শূর বংশের হিন্দু ও মুসলমান লেখকগণ প্রদত্ত যে সব বংশলতা (King-lists) দৃষ্ট হয়, তাদাদের সর্ব্বত্রই প্রথম নাম "আদিশূর"। অন্যান্য নামের বৈষম্য আছে। কেহ কেহ বলেন, আদিত্যশূর নাম "আদিশূর" হইয়াছিল। কেহ বলেন, "পঞ্চ গৌড়েশ্বর জয়ন্তই" আদিশূর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখন দেখা যাউক, জয়ন্ত আদিশূর কি না।

কহ্লন ১১৪৮-৪৯ খৃষ্টাব্দে "রাজ তরঙ্গিণী" নামে পদ্যে কাশ্মীরের এক ইতিহাস লিখেন। তাহার ৪র্থ তরঙ্গে, ৪১৯ হইতে ৪৬৮ শ্লোকে জয়াপীড় ও জয়ন্তের প্রসঙ্গ আছে। কাশ্মীররাজ জয়াপীড় জজ্জা কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া অনুচরগণ সহ বঙ্গদেশে আসেন। এখানে ক্রমে গঙ্গাতীরস্থ পুণ্ড্রবর্দ্ধনে উপস্থিত হন। একদিন সন্ধ্যার পর জয়াপীড় এক কার্ত্তিকের মন্দিরে কমলা নাম্নী এক রূপসী নর্ত্তকীর নৃত্য দেখিতেছিলেন জয়াপীড় ও কমলার পরস্পর প্রেমাবেশ হয়। নৃত্যান্তে জয়াপীড় কমলার বাড়ীতে গমন করেন। তথায় এক বন্য সিংহকে বধ করিয়া ঐ স্থান নিরুপদ্রব করেন। চারিদিকে জয়াপীড়ের যশোবিস্তার হয়। তাহা শুনিয়া পুণ্ড্র বর্দ্ধন রাজ "জয়ন্ত" জয়াপীড়কে সাদরে নিজ প্রাসাদে লইয়া যান এবং নিজ দুহিতা কল্যাণীকে তাঁহার সহিত বিবাহ দেন। বীর জয়াপীড় গৌড়ের ৫ ভাগ জয় করিয়া শ্বশুরকে অর্পণ করেন এবং "পঞ্চ গৌড়েশ্বর" উপাধিভূষিত করেন। ঐতিহাসিক স্মিথ্ ও ষ্টাইন এই প্রসঙ্গ-টীকে মিথ্যা বলেন। ষ্টাইন সাহেব জয়াপীড়ের রাজত্ব ৭৭২ হইতে ৭৮০ খৃষ্টাব্দ বলেন। কহ্লন বলেন ৭৫১ খৃষ্টাব্দে। জয়াপীড়ের পূর্ব্বপুরুষ স্বনামধন্য "ললিতাদিত্য" (৭২৩—৭৬০ খৃষ্টাব্দ) কনৌজ রাজ যশোবর্ম্মাকে পরাস্ত করিয়া রাজকবি বাক্‌পতিরাজ এবং ভবভূতিকে কাশ্মীরে লইয়া যান। যশোবর্ম্মার পুত্র "আমরাজ" তরুণ বয়সে জৈন-যতি বপ্পটভট্টসূরি কর্ত্তৃক জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া-ছিলেন। বঙ্গাধিপের অনুরোধে গোঁড়া জৈন আম-রাজের বঙ্গে ব্রাহ্মণ প্রেরণ সম্ভবপর কি? যদি

স্বীকার করা যায় যে, জামাতা জয়াপীড়ের সাহায্যে, শ্বশুর জয়ন্ত ৭৭৫ খৃষ্টাব্দে পঞ্চ গৌড়েশ্বর হইয়াছিলেন, তবে গৌড়বঙ্গে অরাজকতা কেন? তবে গৌড়বঙ্গের প্রজাগণ, নায়কগণ, সামন্ত রাজগণ ৭৮০ খৃষ্টাব্দে গোপালদেবকে গৌড়বঙ্গের "মহারাজ" করিয়াছিলেন কেন? কানিংহাম, রমেশ দত্ত, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি সুধীগণ "বীর সেনকে" আদিশূর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত এখন অমূল প্রতিপন্ন হইতেছে। ডাঃ হর্ণলি বলেন, "বিজয়সেনই" আদিশূর! এ কথাই বা কি করিয়া টিকে? আদিশূর ও বল্লালসেনের মধ্যে বহু পুরুষ ব্যবধান।

নেপালের মহারাজ জয়দেব, কামরূপের রাজা হর্ষদেবের দুহিতা রাজ্যমতির পাণিগ্রহণ করেন। জয়দেবের ৭৫৩ খৃঃ অব্দে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে একথা আছে, (Indian Antiquary Vol. IX, p. 178) কামরূপের রাজাগণ মহাভারত প্রসিদ্ধ নরকদত্তের বহু অধস্তন বংশীয়। এই "হর্ষদেব" গৌড়, ওড্র, কলিঙ্গ, কোশল-পতি বলিয়া উল্লিখিত। ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে যশোবর্ম্মার মৃত্যুর পর তৎপুত্র জৈন আমরাজ পিতার বিশাল সাম্রাজ্য সুদৃঢ় রাখিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। এই সুযোগে কামরূপ-পতি হর্ষদেব পশ্চিম সীমাস্থ করতোয়া নদী অতিক্রম করিয়া ক্রমে বঙ্গরাজ্য ছাড়িয়া, একে একে গৌড়, উৎকল, কলিঙ্গ এবং কোশল জয় করেন। এটি একটি ক্ষণস্থায়ী ক্ষুদ্র সাম্রাজ্য বটে। এই সময় বঙ্গাধিপ হয় হর্ষদেবকে সাহায্য করিয়ছিলেন, অথবা তাঁহার রাজ্য ঐ সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ সময়ে বঙ্গে কে হর্ষদেবের সমকালীন ছিলেন, জানা যায় না। বোধহয় আদিশূর অথবা তাঁহার পুত্র হর্ষদেবের সমকালিক ছিলেন।

সমস্ত "কুল-গ্রন্থই" বলে, আদিশূরের পূর্ব্বে গৌড়-বঙ্গের সর্ব্বত্র বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ও বৌদ্ধ রাজন্যগণের প্রাধান্য ছিল। আদিশূর বৌদ্ধরাজগণকে পরাস্ত করিয়া গৌড়-বঙ্গে আধিপত্য বদ্ধমূল করেন; তদবধি বৌদ্ধধর্ম্মের হ্রাস এবং হিন্দুধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ঘটে। ধনঞ্জয়ের "কুল প্রদীপ" এবং "বারেন্দ্র-কুল পঞ্জিকা" প্রভৃতি বলে যে— "জিত্বাবুদ্ধান্ চকারস্বয়নপি নৃপতিগৌড়রাজ্যান্নিরস্তান্।"
রবিসেনের "কুল-প্রদীপে"ও এতত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে।

গৌড়ই আদিশূরের প্রথম ও প্রধান রাজধানী ছিল। পরে সুবর্ণগ্রাম ও বিক্রমপুর অপর দুইটী রাজধানী হয়।

আদিশূরের গৌড়-বঙ্গে আকস্মিক অবির্ভাবটা আমার নিকট যেন শনির দৃষ্টিতে ছিন্নমস্ত গণেশের হস্তিমুণ্ড লাভের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। আদিশূর কে, কোথায় ছিলেন এবং কি ভাবেই বা রাজ্যলাভ করেন, তাহা অজ্ঞাত। অথচ আদিশূর যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি, তাহার অনুমাত্র সন্দেহ নাই। "রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী" প্রভৃতি পুস্তক হইতে দেখা যায় যে শূর বংশীয় ৭ জন রাজা হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রথম দুইজন আদিশূরের পূর্ব্ববর্ত্তী। ইহার মধ্যে কনৌজের পরাক্রান্ত হিন্দু নৃপতি যশোবর্ম্মার ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত বিজয় লাভ। এইরূপ নানা ব্যাপার চিন্তা করিয়া আমার ধারণা এই যে, অনুমান ৬৭০ খৃষ্টাব্দে কবিশূর দক্ষিণ হইতে আসিয়া দক্ষিণ রাঢ়ে ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। তৎপর মাধবশূর রাজা হয়েন। তাঁহার রাজত্বের প্রায় শেষ ভাগে, কনৌজের যশোবর্ম্মা মগধ জয় করিয়া গৌড়-বঙ্গ জয় করিতে আসেন। এসময় দেশের

সমস্ত বৌদ্ধ রাজন্যসঙ্ঘ সমবেত শক্তি লইয়া কনৌজপতিকে বাধা দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। উভয় পক্ষের বিরোধ কেবল রাজনৈতিক নহে, হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের ভীষণ সংঘর্ষও বটে।

এই সময় যুবরাজ আদিশূর যশোবর্ম্মার সহিত যোগ দিয়া হিন্দুপক্ষ সমর্থন করেন এবং বৌদ্ধদিগকে পরাজিত ও নির্জ্জিত করেন। সম্ভবতঃ যশোবর্ম্মা মিত্র আদিশূরকে গৌড়-বঙ্গের মিত্ররাজ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহার প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে কুমার ভাস্করবর্ম্মাও হর্ষবর্দ্ধনের জন্য পূর্ব্ব-ভারত জয় করিয়াছিলেন এবং কিছুকাল পর স্বয়ংই পূর্ব্ব-ভারতের অধীশ্বর (Lord of East India) হইয়াছিলেন। এইরূপে আদিশূর গৌড়-বঙ্গের অধীশ্বর হইলেন। গৌড়-বঙ্গে কোনও প্রবল রাজা থাকিলে নিশ্চিতই বাক্‌পতিরাজ তাহার নামোল্লেখ করিতেন। শূররাজগণের বংশলতাটি এইরূপ দৃষ্ট হয়:—কবিশূর—মাধবশূর—আদিশূর—ভূ-শূর—ক্ষিতিশূর—ধরাশূর—প্রদ্যুম্ন ও বরেন্দ্রশূর—অনুশূর—। শেষোক্ত ৫ জন গৌড়ে রাজা ছিলেন। তাঁহাদের মোট রাজত্বকাল ৫০ বৎসর অনুমিত হয়। গৌড়ে শূরবংশের রাজত্ব এবং কনৌজ হইতে ব্রাহ্মণ আগমন একাধিক তাম্রশাসন দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। তবে শূরগণের রাজত্বকাল এখনও অনিশ্চিত। একটা নূতন আবিষ্কারে পূর্ব্বোক্ত কালাঙ্কগুলি উড়িয়া যাইতে পারে। তবে এ পর্য্যন্ত যুক্তিযুক্ত অনুমান অনুসারে আদিশূর ৭২৫ হইতে ৭৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোনও সময়ে রাজত্ব আয়ত্ব করিয়াছিলেন।

"ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত" মতে আদিশূরের প্রাদুর্ভাবকাল ১০৭৭ খৃষ্টাব্দ। বংশীবদন বিদ্যারত্নের "কুলপঞ্জিকা" মতে ১০৩২ খৃষ্টাব্দ। বলাবাহুল্য, পূর্ব্বোক্ত কারণে ইহাদের যথার্থতা অস্থির হইয়া পড়ে।

আদিশূর গৌড়ের সিংহাসনে বসিয়াই কনৌজ হইতে ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন, এরূপ নহে। তাঁহার রাজত্বের প্রথম ১০।১২ বৎসর ঘোর অশান্তিতে কাটিয়াছিল। বৌদ্ধ-রাজগণ ধর্ম্ম ও রাজত্বের জন্য বঙ্গের পূর্ব্বাঞ্চলে সমবেত হইয়া বিদ্রোহ আচরণ করিয়াছিলেন। সুতরাং বিদ্রোহ দমনে আদিশূরকে খুব বেগ পাইতে হইয়াছিল। যাহাহউক ক্রমে "সুগতবৃন্দ" "সুজিত" হইল। বিক্রমপুর ও সুবর্ণগ্রাম তাঁহার অন্যতম রাজধানী হইল। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে তিনি আসাম জয়েরও চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কামরূপ-রাজ আদিশূরকে "অধিরাজ" (overlord) স্বীকার করিয়া তাঁহার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন।

ক্রমে সমগ্র দেশ অনেকটা শান্তিময় হইল। আদিশূর সুস্থির চিত্তে গৌড়ের রাজপাটে বসিলেন, কিন্তু তাঁহার মনে নূতন অশান্তি জাগিয়া উঠিল, তাঁহার মহিষী নিঃসন্তান। অনেক চিন্তার পর তিনি "পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ" করিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু যজ্ঞের পুরোহিত কোথায়? বঙ্গদেশের তৎকালীন ব্রাহ্মণগণ নামেমাত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। উচ্চ ধরণের যজ্ঞ সম্পাদনের যোগ্যতা কাহারই ছিল না। কাজেই আদিশূর বাধ্য হইয়া মিত্র কনৌজপতিকে শিষ্টভাবে লিখিলেন, "সুজিত-সুগত-বৃন্দে গৌড়-রাজ্যে মদীয়ে" ইত্যাদি। কনৌজপতি আদিশূরের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। তিনি কনৌজ হইতে সুযোগ্য শ্রেষ্ঠ ও সুপণ্ডিত ৫ জন সাগ্নিক যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণকে গৌড়ে পাঠাইলেন। ৭৪৬ খৃষ্টাব্দেই ইহাঁরা গৌড়ে পৌঁছিলেন। তাঁহাদের আগমন প্রণালী এইরূপ লিখিত হইয়াছে—"অগ্রতশ্চতুরো বেদাঃ, পৃষ্ঠতঃ সশরং

ধনুঃ”—ইহাঁদের সম্মুখে ৪ বেদ এবং পশ্চাতে শরপূর্ণ ধনু ছিল। সম্ভবতঃ পথ তখনও নিষ্কণ্টক ছিল না। শুভদিনে যজ্ঞ সম্পন্ন হইল। আদিশূর তাঁহাদিগকে প্রচুর পুরস্কার দিয়া, এদেশেই স্থাপিত করিবার অভিপ্রায় বিনীত ভাবে জ্ঞাপন করিলে, ব্রাহ্মণগণ “পরিজন ও রাজার সহিত পরামর্শ করিয়া পরে জানাইব” বলিয়া বিদায় হইলেন। বঙ্গের প্রাকৃতিক শোভা, ধন-ধান্য ও সমৃদ্ধি দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ বেশ তুষ্ট হইয়া গেলেন। ৭৫৩-৭৫৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে উক্ত ৫ জন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পুনরায় “বসবাসের” জন্য বঙ্গে আসিলেন।

রুচি ও প্রয়োজনানুসারে আদিশূর কখনও গৌড়ে কখনও বিক্রমপুরে (বর্ত্তমান মুন্সীগঞ্জে) কখনও বা সুবর্ণগ্রামে (সোনারগাঁ) থাকিতেন। এসময়ে তিনি বিক্রমপুরে ছিলেন। কনৌজাগতগণ গৌড় হইয়া বিক্রমপুরে আসিলেন। যজ্ঞের ফলে আদিশূর “ভূ-শূর” নামক বীর পুত্র পাইয়া বড়ই আনন্দে ছিলেন। ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে সাদরে গ্রহণ করিয়া নিকটস্থ গ্রামে উপনিবিষ্ট করিলেন।

স্থানীয় প্রবাদানুসারে ঐ “পঞ্চসার” গ্রাম অদ্যাপি প্রায় বারশত বৎসর পূর্ব্বকার ঐতিহ্য ঘোষণা করিতেছে।

শূর-রাজগণের কার্য্য

১। আদিশূর বঙ্গে বৌদ্ধ নিরসন, সুব্রাহ্মণাদি আনয়ন, ধর্ম্ম সংস্কার ও হিন্দুধর্ম্ম বিস্তার করেন।

২। ভূ-শূর রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও সপ্তসতী ব্রাহ্মণদের শ্রেণী বিভাগ করেন।

৩। ক্ষিতীশূর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগকে ৫৬ খানি, এবং সপ্তসতী ব্রাহ্মণদিগকে ২৮ খানি গ্রাম দান করেন।

৪। ধরাশূর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগকে “কুলাচল ও সৎ-শ্রোত্রীয়ে” ভাগ করেন। বন্দ্য প্রভৃতি ২২টী গাঁই “কুলাচল” বলিয়া প্রসিদ্ধ। এবং সিদ্ধল প্রভৃতি ৩৪টী গাঁই সৎ-শ্রোত্রীয় বলিয়া কথিত।



বিক্রমপুর

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাচীন সমাজ

প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ বিক্রমপুরের প্রাচীন সমাজ সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখিয়া গিয়াছেন, ইহার বিশেষ কোন প্রমাণ সংগ্রহ করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার—স্বর্গীয় রাজমোহন চট্টোপাধ্যায় বলেন,—ঘটকগণের কারিকা অনুসারে, দেখা যায়, বঙ্গদেশে রাজশাসন ও প্রজাপালনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজেরও সুশৃঙ্খলা ছিল। বিশেষ অনুসন্ধানের ফলে অবগত হওয়া যায় বিক্রমপুরের সমাজের বন্ধন বিশেষভাবে গ্রথিত ছিল।

সময়ের সঙ্গে নানাপ্রকার ঘাতপ্রতিঘাতে সমাজ শিথিলও যে না হইয়াছিল তাহা কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে? যেদিন সমাজের দামামা বাজিয়া উঠিয়াছিল—সেদিন আসমুদ্র হিমাচল টলমল—দিকে দিকে আর্য্যগণের বিজয় অভিযান, দিকে দিকে নব জাগরণ, দিকে দিকে আর্য্যদিগের জয়যাত্রা—সেই শুভ দিনের কথা শুদ্ধাগত চিত্তে বিক্রমপুরে আর্য্যদিগকে কে বরণ না করিয়া লইয়াছিল।

প্রাচীন যুগের ইতিহাস ও সমাজ সংশোধনের উপায়—বহু ঐতিহাসিকগণ ও পণ্ডিতমণ্ডলী ইতিপূর্ব্বে অনেক ইতিহাসেই প্রকাশ করিয়াছেন। আর্য্যগণের অধিকৃত স্থান সমূহই আর্য্যাবর্ত্ত। বৈদিকযুগের সমাজ ও সমাজিকতার বর্ত্তমান সময়ে কি এক অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহাই সর্ব্বপ্রথমে আলোচ্য বিষয় বটে বৈদেশিক পর্য্যটকের গ্রন্থকে বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ অতি উচ্চে স্থান দিয়াছেন বটে, কিম্বদন্তী ও প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া ইতিহাস লেখা চলে না। ইতিহাসের কীর্ত্তিকাহিণী প্রাচীন প্রবচনের উপর নির্ভর না করিলেও একেবারে উপেক্ষনীয় নহে—দেশের অতীত গৌরব নষ্ট হইয়া যাইবে, ইহাতে সন্দেহ কি?

স্বনামপ্রসিদ্ধ চৈনিক বৌদ্ধ-পরিব্রাজক হিরাংসাঙ বাংলাদেশের তাম্রশাসনগুলি দেখিয়া পবিত্র-স্মৃতি বলিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সৃষ্টির প্রথম প্রভাতেই মানুষের প্রাণে সমাজের জীবনের সংস্কার গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। একে অন্যের প্রতি সহানুভূতি প্রেম ও শ্রদ্ধা হইতে সমাজের উৎপত্তি হয়। আদিমযুগে সমাজের ইতিহাস তেমন শৃঙ্খলাবদ্ধ না থাকিলেও পরবর্ত্তী যুগে নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যে সমাজের জীবন সফল হইয়া উঠিয়াছিল। সভ্য অসভ্য সকল জাতির প্রাণেই একতাবদ্ধ জীবনযাত্রা প্রণালীর উপর আন্তরিক বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা হইতেই সমাজের ইতিহাস সফল হইয়া উঠিয়াছিল।

ভারতীয় সমাজ প্রথমতঃ মনুসংহিতার দ্বারাই শাসিত হইত। পরবর্ত্তী যুগে ভারতীয় সমাজ প্রাদেশিক ভাবে গঠিত হইলেও কয়েকটী কেন্দ্র হইতে প্রাদেশিক সমাজগুলি গঠিত হইত। রামায়ণ ও মহাভারতের যুগের সমাজ নৈমিষারণ্য হইতে শাসিত হইত। পরবর্ত্তীযুগে কনৌজ, মিথিলা, কাঞ্চী, নাসিক, বিক্রমমণ্ডল প্রভৃতি স্থান প্রাদেশিক সমাজ দ্বারা শাসিত হইত। বিক্রমমণ্ডলই বঙ্গের সমাজ শাসনের কেন্দ্র ছিল। বিক্রমমণ্ডল বলিতে বর্ত্তমানের বিক্রমপুর পরগণাকে কেবল বুঝাইত না। ঢাকা জিলার প্রায় অধিকাংশ স্থান, ফরিদপুর জিলা, ত্রিপুরার কতকাংশ নিয়া বিক্রমমণ্ডল ছিল। এই বিক্রমমণ্ডলই একসময়ে বাংলার সমাজকে উন্নতির পথে চালিত করিয়াছিল। ইহার পরবর্ত্তী যুগে নবদ্বীপ উন্নত হইয়া উঠে। বাংলার সমাজ শাসনের কেন্দ্র বিক্রমমণ্ডলের ইতিহাস পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

*জগতের বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে সামাজিকতার মধ্যদিয়া যে জাতীয় জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা একদিনে বা দশ বিশ বৎসরে হয় নাই, শত শত বৎসরের ঘাত-প্রতিঘাতে, শত শত বৎসরের পরিবর্ত্তনের মধ্যে পারিপার্শ্বিক জাতিগুলির চিন্তা ও ভাবধারার আদানপ্রদানে প্রত্যেক জাতিরই সামাজিক জীবন গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। একে অন্যের প্রতি সহানুভূতি নিয়া প্রত্যেক জাতিই ভাবের আদানপ্রদানে নিজের সমাজকে পুষ্ট করিয়াছে। অতি প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষ বাণিজ্য-জগতে একচ্ছত্র সম্রাট ছিল। ভারতবর্ষ হইতে যুগে যুগে বহু উপনিবেশ জগতের বিভিন্ন অংশে স্থাপিত হইয়াছে; আবার যুগে যুগে বহু জনপ্লাবন ভারতের বক্ষে আসিয়া নিজেদের বৈশিষ্ট্য বিসর্জ্জন দিয়া হিন্দুর জাতীয় জীবনের বিশাল ছায়ায় মিশিয়া গিয়াছে।

এই যে আদান প্রদান, তাহা আর্য্যগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেও যে ছিল না তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, সভ্যতার প্রথম বিকাশ হয় মধ্যএশিয়া নিবাসী আর্য্যনামে পরিচিত কতকগুলি বিশিষ্ট মানুষের মধ্যে। কালক্রমে তাহারা জগতের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়েন। উন্নত সভ্যতা নিয়া তাঁহারা জগতের যে প্রদেশেই গিয়াছেন; তথায়ই আদিম অধিবাসী অসভ্য বর্ব্বরদিগের সহিত শক্তির পরীক্ষায় ধীরে ধীরে ঐ সমস্ত প্রদেশে নিজেদের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন। আর্য্যগণ ভারতে এবং জগতের অন্যান্য প্রদেশে যে সমস্ত আদিম নিবাসিগণের সহিত যুদ্ধাদি করিয়া দেশ জয় করিয়াছেন, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আচার ব্যবহার, ভাষা এবং যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রে এত সাদৃশ্য আছে যে অধুনা আমাদিগকে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। ঐতিহাসিক টেলর সাহেব বলেন :—

"These tribes are now generally classed as Turanian, and belong to a large section of one of the most ancient people on the Earth, who inhabited India, the Eastern and part of the Pacific Islands, and Australia. They have been also termed as Negritos, because of certain points of similarity with the Negroes of Africa.........A striking instance of this agreement is afforded in "boomerang," which was first met within Australasia, and was supposed to be peculiar to its inhabitants; but the wild tribes of Southern

* শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত রবীন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী লিখিত খচিত বীণা পত্রিকার ২৬৩ পৃষ্ঠা

India possess exactly the same weapon and use it in the same manner. So also the science of language when applied to all the tongues of this wildly spread people, finds agreement in construction in roots of words, in idioms and phrases, and often in the very words themselves."

দ্রাবিড়গণ দাক্ষিণাত্যের এক প্রবল প্রতিপত্তিশালী জাতি। প্রাচীন যুগেও এই জাতি অসভ্য বর্ব্বর ছিল বলিয়া মনে হয় না। তাহাদের সভ্যতা আর্য্য সভ্যতা হইতে কোন অংশে ন্যূন ছিল না, অথচ দ্রাবিড়গণও সেই অনার্য্যজাতি যাহাদিগকে কৃষ্ণকায় অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া আর্য্যগণ ঘৃণা করিতেন। দ্রাবিড়গণ পূর্ব্বোক্ত বিশ্বব্যাপ্ত বিশাল অনার্য্যশাখার বংশধর। দ্রাবিড় ভাষার সহিত অন্যান্য অনার্য্যভাষার সাদৃশ্য আছে, ইতিহাস তাহাই বলে—"These Dravidian languages are found by philologists to be akin to the Turanian or Sythian of remote times."—Mannual of Indian History, Page 40—প্রাগৈতিহাসিক যুগে তমসাচ্ছন্ন অতীতের কোন সুদূর মুহূর্ত্তে যে দ্রাবিড়গণ ভারতে প্রবেশ করতঃ কোন্ পথে তাহারা ভারত আক্রমণ করে, তাহার সঠিক ইতিহাস নাই। অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ঐতিহাসিক বলেন যে অতি প্রাচীন যুগে তাহারা ভারত জয় করে—"It may be assumed therefrom that a Turanian or Sythian race become settled in the Southern portions of India after an invasion or invasions, by a more southern route than the Aryans."—দ্রাবিড়গণ জগতের সভ্যতাভাণ্ডারে যত উপাদান যোগাইয়াছে অনেক সভ্যজাতিই তাহা পারে নাই। ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যএকপ্রকার তাহাদের হাতেই ছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে তাহারা উত্তাল তরঙ্গান্দোলিত সমুদ্রবক্ষ অকুতোভয়ে অতিক্রমকরতঃ প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সুদূর দেশসমূহ বাণিজ্যের যোগসূত্রে ভাবের আদান প্রদানের মধ্য দিয়া বিশাল বিশ্বের বিভিন্ন মানবশাখার উন্নতির যেমন সহায়ক হইয়াছিল তেমনি নিজেদেরও সামাজিক জীবনে এমন একটা গৌরবময় অঙ্কের অভিনয় করিয়াছিল যাহা অধুনা নব নব বিস্ময়ে জগত প্লাবিত করিতেছে। দ্রাবিড় সভ্যতাসম্ভূত অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভসমূহ আজও দাক্ষিণাত্যে বিজন গহনে পার্ব্বত্য কান্তারে দণ্ডায়মান থাকিয়া দ্রাবিড় সভ্যতার গৌরবময়ী কাহিনী জগতে উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত করিতেছে। দ্রাবিড়সভ্যতা একসময়ে আর্য্য-সভ্যতার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছিল। দ্রাবিড়-বংশসম্ভূত রাবণ আর্য্য অযোধ্যরাজ হইতে সভ্যতা হিসাবে কোন অংশ ন্যূন ছিলেন না। তাহারই মৃত্যু সময় সুসভ্য রামচন্দ্র তাহার পার্শ্বে বসিয়া রাজনীতির পাঠ নিয়াছিলেন।

ধরিত্রীর সর্ব্বত্রই আর্য্যগণ অনার্য্যগণকে পরাজিত করিয়া তাহাদের দেশসমূহ অধিকার করিয়াছেন। এই সমস্ত অনার্য্য শৌর্য্যবীর্য্য বা পরাক্রমে তথাকথিত আর্য্যসম্প্রদায় হইতে কোন অংশে খাটো ছিল বলিয়া বোধ হয় না। বরং তাহাদের স্বাধীনতার স্পৃহা, তাহাদের স্বসমাজের প্রতি স্বাভাবিক প্রেম, তাহাদের চরিত্র এমন ভাবে গঠিত করিয়া তুলিয়াছে, যে তাহারা আর্য্যপ্লাবন দ্বারা যুগে যুগে বিজিত, নির্জিত, লাঞ্ছিত হইলেও প্রাগৈতিহাসিক যুগের সেই সরলতা, সেই স্বজাতি প্রেম ভুলিয়া এখনও আর্য্যসমাজে সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া যাইতে পারে নাই। বিশ্বব্যাপী এই যে বিরাট অনার্য্যজনসমূহ, তাহারা সহস্র বৎসরেও

আর্য্যগণের উন্নত সভ্যতানুমোদিত উৎকৃষ্টতর যুদ্ধপ্রণালীর সম্মুখে নতশির হয় নাই। প্রতিপদে তাহারা আর্য্যগণকে বাধা দিয়াছে—উভয়পক্ষে বহু রক্তপাত হইয়াছে। অনেকবার তাহারা পরাজিত হইয়াছে—আবার বহুবার আর্য্যবিক্রম তাহাদের শৌর্য্যের নিকট নতশির হইতে বাধ্য হইয়াছে। অতি প্রাচীন যুগে রোমের সাম্রাজ্যগর্ব্ব এক সময়ে বর্ব্বরগণের পদতলে নিষ্পেষিত হইয়াছিল এবং বহুবর্ষ পর্য্যন্ত রোমের আর্য্যসভ্যতা অনার্য্য-সভ্যতার পদসেবা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। যাহারা এমন ভাবে পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে, তাহাদের মধ্যে কোনপ্রকার সামাজিক শৃঙ্খলা ছিল না বলিলে সত্যের অপমান হয়। আর্য্য শিক্ষা সভ্যতার নিকট অনার্য্য শিক্ষা সভ্যতা ও ধর্ম্ম বিশ্বাস নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইলেও একথা অতি খাঁটী যে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি নিত্য প্রয়োজনীয় আইনকানুন ছিল। এখনও ভারতের কোল, ভীল, সাঁওতাল, গাড়ো, খাসিয়া প্রভৃতি অসভ্যজাতির মধ্যে কিয়দংশে সামাজিক শৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি দেশেও অসভ্যগণ সর্ব্বদাই কতকগুলি নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া একজন প্রধানের অধীনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। আর্য্য-গণের চক্ষে এই সমস্ত আইন কানুন যতই উপহাসাস্পদ হউক না কেন, ঐ কথা অতি খাঁটী যে বিংশ শতাব্দীর আর্য্য সভ্যতার গৌরবের ঘোর কোলাহলের মধ্যেও এই সমস্ত প্রাচীন জাতি তাহাদের প্রাচীন আইন কানুনের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করে নাই, বর্ত্তমান শিক্ষা সভ্যতার ইন্দ্রজালে তাহাদের বন্যপ্রাণ আকৃষ্ট হয় নাই, বর্ত্তমান সভ্যতার গৌরবময় দীপ্তিতে তাহাদের চক্ষু ঝলসিয়া গিয়া তাহারা মরীচিকার পশ্চাতে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ছুটে নাই।

মানব-সভ্যতার আদিযুগে কোনপ্রকার সমাজ-বন্ধন ছিল না। মানবসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বন্ধনের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে মানব যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিত। স্ত্রীপুরুষের সম্মিলন শুধু ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিতেই আবদ্ধ ছিল। একই স্ত্রী বহুপুরুষের পত্নীরূপে ব্যবহৃত হইত। ইচ্ছামত যৌন-সম্মিলন, ইচ্ছামত আহার বিহারই ছিল সেই যুগের মানুষের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য।

পুরাণানুসারে প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রথমে মানসী সৃষ্টি আরম্ভ করেন; কিন্তু বহুকালগত হইলেও মানসী প্রজাবৃদ্ধি হয় না দেখিয়া প্রজাপতি মৈথুনধর্ম্মে বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিবার অভিলাষী হইলেন।

"যদাস্তু মানসী বিপ্রা ন ব্যবর্দ্ধতি বৈ প্রজা।
তদা সঞ্চিন্ত্য ধর্ম্মাত্মা প্রজাহেতোঃ প্রজাপতিঃ
স মৈথুনেন ধর্ম্মেন সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ॥"
ব্রহ্মপুরাণ ৩য় অধ্যায়—

তখন এই মৈথুনধর্ম্মটা কোনপ্রকার নিয়মানুবর্ত্তিতায় আবদ্ধ ছিল না। আত্মসুখই ছিল সেই যুগে প্রত্যেক প্রাণীর উদ্দেশ্য। মৈথুনধর্ম্মে প্রজাবৃদ্ধি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে লাগিল। কিন্তু প্রজা-গণের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত কোন প্রকার সামাজিক বন্ধন না থাকাতে সংসারে এক বিপ্লবের সৃষ্টি হইল। সেই অবস্থায় সন্তান মায়ের নামে পরিচিত হইত। অবাধ যৌনসম্মিলনের বিষময় ফল ফলিতে আরম্ভ করিল। তখন এই সমস্ত অত্যাচারের বিষময় প্রতিক্রিয়া হইতে নিস্তার পাইবার জন্য কতকগুলি নিয়ম ধীরে ধীরে প্রচলিত হইল, মৈথুন ধর্ম্মটাকে নিয়মে আবদ্ধ করা হইল, ইচ্ছামত যৌনসংসর্গকে নিরোধ করা

হইল। তখনই প্রকৃতপক্ষে সমাজের সৃষ্টি; কিন্তু সমাজ ছিল তখন সদ্যজাত শিশু।

নিয়মানুবর্ত্তিতায় আবদ্ধ যৌনসম্মিলন হইতে বিভিন্ন বংশধারার সৃষ্টি হইল। তখন সেই আদি উচ্ছৃঙ্খলতার যুগ ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছিল। অল্পকালমধ্যেই প্রত্যেক বংশ নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে শিখিল। এইভাবে এক একটা বংশ ধীরে ধীরে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তখন কিন্তু মানবসমাজ আত্মপর ভেদাভেদে অন্ধ ছিল। তাই একবংশ অন্য পার্শ্ববর্ত্তী বংশের সঙ্গে সর্ব্বদাই শত্রুতায় লিপ্ত থাকিত; এই শত্রুতা হইতে যুদ্ধাদি পর্য্যন্ত হইত। পুরাণে দেখিতে পাই বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রবংশীয়গণের মধ্যে ঘোরতর শত্রুতা বহুকাল পর্য্যন্ত সমভাবে চলিয়াছিল। সেই রেষারেষি হিংসাদ্বেষের যুগে এক বংশ অপরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য স্ববংশীয় একজনকে প্রধান করিয়া তাহার অধীনে সর্ব্বদা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকিত। এইভাবে সর্ব্বদা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত থাকাতে তৎকালীন সমাজে ক্ষাত্রশক্তির বিকাশ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল।

এইরূপে এক একটা গোত্র বা বংশ যখন নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া উঠে তখন কতকগুলি গোত্র বা বংশসমষ্টি একত্রিত হইয়া গ্রামের সৃষ্টি করে। যখন এক একটী গ্রাম কোন বিশেষ নিয়মানুবর্ত্তীতায় সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে শিখিল, তখন কতকগুলি গ্রামসমষ্টি 'বিশ্' আখ্যায় অভিহিত হইত। এই বিশের উপরে যে কর্ত্তৃত্ব করিত, ঋগ্বেদে তাহাকে বিশ্‌পতি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বিশ সমষ্টিকে 'জন' বলা হইত এবং জনের উপরে যিনি প্রাধান্য করিতেন, তিনি 'রাজন্' আখ্যায় অভিহিত হইতেন। পূর্ব্বে আর্য্যগণ একজনকে বিশ্‌পতি নিযুক্ত করিয়া তাহার অধীনে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেন। অভিযান সময়ে রাজন্যগণ একজন পরাক্রমশালী মহাবীরকে বিশ্‌পতি নিযুক্ত করিতেন। এই প্রধানকে জার্ম্মাণ ভাষায় বিশ্‌পতি, ঝেন্দ পারসীক বেশপৈতে, লিথোনীও উইঝ্‌পতি, এবং রুষ ভাষায় বিঝ্‌পতি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বিশ্‌পতি শব্দটীর বিভিন্ন ভাষায় উচ্চারণের সাদৃশ্য দেখিয়া মনে হয় যে ইহারা এক আর্য্যবংশসম্ভূত।

সভ্য আর্য্যগণ যখন জগতের বিভিন্ন প্রদেশে ভীমবেগে রাজ্যবিস্তার করিতেছিলেন, তখন অনার্য্যগণ প্রাণপণে তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিয়াছিল; কিন্তু আর্য্যগণের উন্নত সভ্যতার নিকট, সুশৃঙ্খলতার নিকট অনার্য্যগণ প্রতিপদে পরাজিত হইয়া সরিয়া পড়িতে লাগিল। আর্য্যগণ ভারতাক্রমণ করেন নানাবিধ উন্নত অস্ত্রশস্ত্র নিয়া। তাঁহারা শিরে শিরস্ত্রাণ, শরীরে বর্ম্ম ধারণকরতঃ রথে আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতেন। পৃষ্ঠদেশে তাঁহারা শরপূর্ণ তূণীর এবং হস্তে খড়্গ ধারণ করিতেন। ভারতাক্রমণের সময় বীরেন্দ্রকেশরী সুদাস ছিলেন আর্য্যগণের বিশ্‌পতি। সুদাস ইরাণদেশের দেবদাস রাজার পুত্র এবং দেববান্ রাজার পৌত্র। সভ্যতানুমোদিত উন্নততর অস্ত্র-শস্ত্রে সুশোভিত সুশৃঙ্খল যোদ্ধৃগণ সমভিব্যাহারে বীরপুরুষ সুদাস অদীনপরাক্রমে এবং অলোক-সামান্য বীরত্বে দুরারোহ হিমালয়ের পার্ব্বত্য অনার্য্যগণকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিয়া শেতয়াবরী, শর্য্যণাবতী, বিয়সী, 'কুভা, অসিক্লী, শতদ্রু প্রভৃতি নদী অতিক্রম করতঃ পঞ্চনদপ্রান্তে আর্য্যের বিজয়-বার্ত্তা কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন। বহু যুদ্ধের পর সুদাস ধীরে ধীরে পঞ্চনদ জয় করেন। সুদাসের

ভারতজয়ের ইতিহাস ঋগ্বেদে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন যুদ্ধে ৩০ হইতে ৫০ হাজার কৃষ্ণকায় অনার্য্য হত হইয়াছে। সুদাসের সময়ে ভারতের নানাপ্রদেশে আর্য্য সামন্তরাজগণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সুদাসের সাম্রাজ্য মগধদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া ঋগ্বেদে বর্ণিত হইয়াছে। আর্য্যপ্লাবনের সময় ভারতীয় অনার্য্য সম্প্রদায় বনে জঙ্গলে পশুর মত জীবন যাপন করিত তাহা নহে; পরন্তু তাহারাও কিঞ্চিৎ পরিমাণে সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতেছিল। ঋগ্বেদের ৪র্থ মণ্ডল, ৩৮সূঃ উল্লেখ আছে যে—"শত শত দুর্ভেদ্য পাষাণ নির্ম্মিত পুরীর অধীশ্বর দাসরাজ কুলিতরের পুত্র শাম্বর সুদাস কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হন।" আর্য্যগণ ভারতজয়ের পর ভারতের আদিম অধিবাসীগণকে দাস বলিয়া অভিহিত করিতেন। শত শত পাষাণ নির্ম্মিত পুরীর যিনি অধীশ্বর তাহাকে নিতান্ত অসভ্য বর্ব্বর বলিলে ঠিক হয় না। তবে আর্য্য সম্প্রদায় সভ্যতা হিসাবে অনার্য্যগণ হইতে অনেকটা উন্নত ছিলেন সন্দেহ নাই এবং তাহাদের সামাজিক জীবন তাহাদিগকে আরও উন্নত করিয়াছিল তাহাতেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। একটা বিরাট সাম্রাজ্য শাসনের ক্ষমতা হয় তো আর্য্যাবর্ত্তের আদিম অধিবাসীগণের ছিল না। কিন্তু আর্য্য সুদাসের সেই ক্ষমতা ছিল। অনার্য্যগণের যদি সে ক্ষমতা, ততটা একতাবন্ধন, ততটা সামাজিক সংগঠন থাকিত, তাহা হইলে আর্য্যগণ তাহাদের উন্নততর সভ্যতা সত্ত্বেও এত সহজে ভারতে প্রবেশ করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ।

ধীরে ধীরে, দিনের পর দিনে আর্য্যগণ অনার্য্যগণকে পরাজিত, বিপর্য্যস্ত করিয়া দেশের পর দেশ হস্তগত করিতে লাগিলেন; কিন্তু শত শত যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও অনার্য্যগণ বক্ষশোণিতের বিনিময়ে আর্য্য সম্প্রদায়কে সর্ব্বদা সন্ত্রস্থ রাখিয়াছিল। আর্য্যগণ নির্ব্বিবাদে ধর্ম্মকর্ম্ম ও যজ্ঞাদি করিতে পারিতেন না। যজ্ঞাদির সময় তাহাদিগকে সর্ব্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইত। অনার্য্যগণের এই পুনঃ পুনঃ আক্রমণ এবং উৎপীড়নের ইচ্ছা আর্য্য সম্প্রদায়কে সুদৃঢ় একতাবন্ধনে বদ্ধ করিল। এই সময় সমস্ত অবস্থা বিপর্য্যয়ে আর্য্যসমাজ নূতন ভাবে গড়িয়া উঠিল। জাতিভেদের প্রথম সূত্রপাত হয় ভারতে আর্য্যাভিযানের পূর্ব্ব হইতেই। প্রাচীন পারসীকগণের মধ্যে অথর্ব্বান অর্থে ব্রাহ্মণ পুরোহিত, ক্ষত্র অর্থে যুদ্ধশীল রাজন্য এবং বিশ্ অর্থে সাধারণ প্রজা বুঝাইত। অনেকের মতে আর্য্যগণ পারসীকগণের সহিত একত্রাবস্থানের সময় হইতেই জাতিভেদের সৃষ্টি হয়। পূর্ব্বে প্রত্যেক যুদ্ধেই মন্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া ইন্দ্রকে আহ্বানকরতঃ তাঁহার দ্বারা জয়দান করিতেন। সময় সময় তাহারা যুদ্ধাদিও করিতেন। ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রবিদ্, জ্যোতির্ব্বিদ্, তপস্বী ও বীর ছিলেন। বহুকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণগণ সংগ্রামশীল বীর ছিলেন।

পারসিকগণের সহিত একত্রাবস্থানের কালে আর্য্যগণের ধর্ম্ম বিশ্বাস একই ছিল; কিন্তু কালক্রমে ধর্ম্মবিশ্বাসে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইলে জ্ঞাতি আর্য্য সম্প্রদায়কে পরিত্যাগ করিয়া পারসীকগণ ভারতের পশ্চিমদিকে চলিয়া যান এবং অসি বলে রাজ্য স্থাপন করেন। ধর্ম্মবিশ্বাস পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আর্য্য সমাজেও নূতন প্রাণের সন্ধান পাওয়া যাইতে লাগিল। পারসীকগণের মত আর্য্যগণও পুরাকালে অগ্নিহোত্র করিতেন—ইহা তাহাদের নিত্য কর্ত্তব্য ছিল। কলির প্রারম্ভে আদিত্য পুরাণের নিম্নলিখিত শ্লোক দ্বারা অগ্নিহোত্র নিষিদ্ধ বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। যথা—

"অগ্নিহোত্রংবন্যাশ্চ লেহোলীঢ়া পরিগ্রহঃ
এতানি লোক গুপ্তর্থ্যং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মানি ব্যবস্থা পূর্ব্বকং বুধৈঃ ॥"

আর্য্যগণ শীতপ্রধান দেশে ছিলেন। শীতের প্রাণান্তকর কুহেলিকার মধ্যে অগ্নি জীবনদায়ক সন্দেহ নাই। শীতপ্রধান দেশে স্বভাবতঃ উত্তাপ বৃদ্ধির জন্য প্রত্যেক গৃহেই অগ্নি রক্ষা করা হয়। সেই সময়ই সম্ভবতঃ অগ্নিকে শীতের প্রকোপ হইতে রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া দেবতার সম্মানে উক্ত অগ্নিহোত্রের প্রচলন হইয়া থাকিবে। তারপরে আর্য্যগণ ভারতে অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীষ্ম প্রধান দেশে গৃহে অগ্নি রক্ষা করার বিশেষ প্রয়োজন নাই দেখিয়া অগ্নিহোত্র ত্যাগ করিয়াছেন। তবে আর্য্যগণ ভারত জয়ের পর এই বিশাল দেশের প্রকাণ্ড মহীরুহ সমাচ্ছাদিত বনভূমি দর্শনে বৃহৎভাবে অগ্নিহোত্র করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ হন; অগ্নিহোত্রের ক্ষুদ্র অগ্নি-ক্রীড়া হইতেই বিরাট ভাবে যজ্ঞের প্রবর্ত্তন করেন। বিরাটভাবে যজ্ঞের জন্য যেমন বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ পুরোহিত দরকার হইত, তেমনি তাঁহাদের রক্ষার জন্য অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত বহুসংখ্যক যোদ্ধ্ পুরুষেরও দরকার হইত। কারণ যজ্ঞাথী ব্রাহ্মণগণকে যদি আবার যজ্ঞস্থল রক্ষার জন্য সজ্জিত থাকিতে হয় তাহা হইলে যজ্ঞ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ গণ তৎকালে সামাজিক কল্যাণসাধনে আরব্ধ হইতেন। এই সময় হইতেই ধীরে ধীরে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিভাগে পরিণত হইতে আরম্ভ হইল।

অনেকে বলেন বৈদিক সময়ে বর্ণভেদ ছিল না। বেদে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের উল্লেখ নাই। একথা ঠিক নহে। ঋগ্বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ। ঋগ্বেদের বহুস্থলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদ বলিতেছেন :—

"ব্রাহ্মনাসঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ।
শিবে নো দ্যাবা পৃথিবী অনেহসা॥" ৬ম, ৭৫ সূ, ১০ ঋক "হে ব্রাহ্মণগণ, পিতৃগণ, সোম্যগণ তোমরা এবং পাপরহিতা দ্যাবা পৃথিবী আমাদের মঙ্গলকর হও।" সপ্তম মণ্ডল, ১০৩সূ, ১ ঋক, বলিতেছেন—

সংবৎসরং শশয়ানা ব্রাহ্মণাঃ ব্রতচারিণঃ।
বাচং পর্জ্জন্যজিন্বিতাং প্রমংস্পকা অবাদিভুঃ॥"

"সংবৎসর ব্রতচারী ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় মণ্ডূকগণ পর্জ্জন্যের প্রীতিকর বাক্ উচ্চারণ করেন।" পুনরায় ৪ম, ৪২সূ, ১ম ঋক বলিতেছেন—

"মম দ্বিতা রাষ্ট্রং ক্ষত্রিয়স্য।
বিশ্বা বিশ্বে অমৃতা যথানঃ॥"

"আমি ক্ষত্রিয় ও সমস্ত বিশ্বের অধিপতি। আমার রাজ্য দ্বিবিধ। সমস্ত অমরগণ আমার।" এই সমস্ত ঋক হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বৈদিক সময়েও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। আর্য্যদের মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্য এবং কৃষিকর্ম্ম যাঁহারা করিতেন তাঁহারা বৈশ্য আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দ্বিজ আখ্যায় অভিহিত হইতেন। উপনয়ন ও অঙ্গিরা ঋষি প্রবর্ত্তিত অগ্নিহোত্রাদি তাহাদের সাধারণ সংস্কার। সৃষ্টির প্রারম্ভে বর্ণবিভাগ বা জাতিভেদ অবশ্য ছিল না। তখন সকলেই সমান পদবীতে সমাজে বিচরণ করিতেন। পরে কর্ম্মানুসারে বিভিন্ন বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। মহাভারত তাহাই বলেন—

"ন বিশেষোঽস্তিবর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টংহি কর্ম্মভি বর্ণতাং গতম্॥
কামভোগপ্রিয়স্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্ত স্বধর্ম্মাঃ রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতা কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজাঃ বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতাপ্রিয়ালুব্ধা সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ রভ্রষ্টাস্তে
ইতৈতেঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ॥
শান্তিপর্ব্ব ১৮৮ অধ্যায়॥

কর্ম্মানুসারে অতি প্রাচীন যুগেই এই বর্ণবিভাগ সমাজে গৃহীত হইয়াছিল। কামভোগপ্রিয়, তীক্ষ্ণ, ক্রোধী এবং সাহসিক কার্য্যে তৎপর, রক্তাঙ্গ দ্বিজগণ ক্ষত্রিয়, পীতবর্ণ কৃষিকর্ম্মে নিরত দ্বিজগণ বৈশ্য এবং হিংসা, অসত্যপ্রিয় লুব্ধ, কৃষ্ণকায়, শৌচপরিভ্রষ্ট অনাচারী দ্বিজগণ শূদ্র আখ্যায় অভিহিত হইত। সর্ব্বোপরি শুভ্র-সত্যগুণসম্পন্ন যাঁহারা, তাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাজে গৃহীত হইয়াছিল। আর্য্যগণের মধ্যে প্রথমতঃ শূদ্র বলিয়া কোন বর্ণভেদ ছিল না। তাঁহাদের বঙ্গদেশে অবস্থানের ফলে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আব্‌হাওয়ার গুণে যাহারা অনার্য্যদিগের সহিত সংমিশ্রণে অশুচিকার্য্যে রত, লোভী এবং অসত্য-বাদী হইয়া পড়িলেন, তাহারাই শূদ্র নামে খ্যাত হইয়াছেন এবং বিজিত অনার্য্যদিগের মধ্যে যাহারা আর্য্যদের অধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহাদের সংশ্রবে রহিয়া গেল, তাহারা আর্য্য-সভ্যতার মহিমময় দীপ্তির সম্মুখে নিজেদের বৈশিষ্ট বিসর্জ্জন দিয়া আর্য্যের ধর্ম্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী হইয়া শূদ্র নামে সমাজে গৃহীত হইয়াছিল। আর যাহারা স্বাধীনতা বিসর্জ্জনে দাসত্ববরণ ঘৃণ্য মনে করিয়া দূরে সরিয়া রহিল ভারতের নানাস্থানে তাহারা ভীল, কোল, সাওতাল, নাগা, গারো, খাসিয়া, আবর প্রভৃতি নানা নামে পরিচিত হইয়া প্রাগৈতিহাসিক যুগের সেই শিশুসভ্যতা আকড়াইয়া আজও জগতে জীবিত আছে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—"বর্ণাশ্রম ভারতীয় সভ্যতার তাঁত।" বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই যে ভারতীয় সভ্যতার একমাত্র সহায়ক তাহা অস্বীকার করা যায় না। বর্ণাশ্রমানুযায়ী কর্ম্মবিভাগ প্রচলিত না থাকিলে যে প্রাচীন সভ্যতা গৌরবে গৌর-বান্বিত আমরা জগতের বক্ষে সভ্য বলিয়া গর্ব্ব করি, তাহার উপায় ছিল না। প্রাচীন ভারতে দেখিতেছি সত্য ত্যাগের জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তি জটাচীর ধারী ব্রাহ্মণ জগতের সমস্ত ভোগবিলাস সুখ সম্পদ পদদলিত করিয়া বিশ্বের সমগ্র দারিদ্র্য সাদরে মাথায় তুলিয়া নিয়া নির্জ্জনে লোকচক্ষুর অন্তরালে বিশ্ববাসীর হিতের জন্য প্রাণপাত করিয়াছেন। আমাদের মানসনেত্রের দ্বারে ভাসিয়া বেড়ায় ব্রাহ্মণ দধিচীর মহিমোজ্জল মুর্ত্তি, যিনি "জগদ্ধিতায়" অম্লান বদনে, অকুতোভয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতে আমরা পাই ব্যাস, বাল্মিকী, গৌতম, কপিল, কনাদ, যাজ্ঞবল্ক্য, মনু, পরাশর, বশিষ্ঠ নিবিড় অটবী বিভাগে আজন্ম সাধনা সলিল সিঞ্চনে যে সমস্ত অতুল রত্নাবলী সৃষ্টি করিয়াছেন সে সমস্ত আজিও দেশে বিদেশে বিদ্বন্মণ্ডলীর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রাপ্ত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের বিজয়দুন্দুভি কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে। নহিলে আজ আমাদের কি আছে?

বর্ণাশ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত বেদ বেদান্ত-প্রসবিনী, ভক্তিতত্ত্বের-জন্মস্থানরূপিনী, পুণ্যপুঞ্জময়ী ভারতীয় সভ্যতা একদিন স্বীয় বিভায় দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিয়া জগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিল। বর্ত্তমান ভারত তো প্রাচীন ভারতের আত্মবিস্মৃত কঙ্কাল মাত্র। অতি প্রাচীন যুগে ভারতীয় আদর্শে সমগ্র জগতের সমাজ সংগঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতীয় সভ্যতার সম্মোহিনী মন্ত্র নিয়া যুগে যুগে বহু জনপ্লাবন পৃথিবীর অন্যান্য দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ভারতীয় সভ্যতার বিস্তারে তদ্দেশীয়-গণকে আলোকের সন্ধান দিয়াছিল। মিশরের সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতার ছায়া মাত্র। প্রাগৈতি-হাসিক যুগের অন্ধকারে ভারতীয়গণই মিশরে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা

বিস্তার করেন। ঐতিহাসিক Pocock সাহেব তাঁহার "Indian in Greece" নামক পুস্তকে বলেন—"An Egyptian is made to remark that the heard from his father that the Indians were wisest of men and that the Egyptians, a colony of the Indians, preserved the wisdom and usages of their fathers and acknowledged their ancient origin."—মিশরের পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ক্রুগস্ বে বলেন—"স্মরণাতীত সময়ে একদল ভারতবাসী নীলনদের উপকূলে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন।"

মিশরীয় সমাজে জাতিভেদের মধ্যে আমরা ভারতীয় প্রভাব দেখিতে পাই। ঐতিহাসিক টেলর বলেন—"মিশর দেশেও ভারতবর্ষের মত জাতিভেদ ছিল। পুরোহিত এবং যোদ্ধগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসম্মানভাজন ছিলেন। তাহাদের নীচে কৃষক, বণিক, নাবিক, শিল্পী ও সর্ব্বনিম্নে মেষপালকগণ স্থান পাইত। পুরোহিতগণের মধ্যেই আবার বিচারক, ভবিষ্যদ্বক্তা ও চিকিৎসক ছিল। রাজা ও রাজপরিবার যোদ্ধৃজাতির অন্তর্গত ছিল। সমুদয় ব্যবসায় বাণিজ্য বংশানুক্রমিক ছিল। আত্মার পুনর্জ্জন্মবাদ মিশরে প্রচলিত ছিল; ইহা সম্ভবতঃ ভারতবর্ষ হইতেই আনীত হইয়াছিল। মিশরবাসীরা গাভীর পূজা করিত, তাহারা পৌত্তলিক ছিল, তাহাদের দেবমন্দিব ছিল।" প্রাচীন মিশরের দুইট নাম্নী দেবমূর্ত্তি ভারতীয় কালীমূর্ত্তিরই প্রতিবিম্ব মাত্র। মিশরের পুরোহিত সম্প্রদায় ভারতীয় প্রথাতে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেন এবং অধুনাও আবিসিনিয়াবাসিগণ খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার সময় প্রাচীন সংস্কারকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। যথা—Another survival of the Hindu influence seems to be mateb or blue silk neck cord, the bagde of baptism, in modern Abysinian christianity, which suggests, more than one Arab custom, the Zenner or sacred cord of the Brahmin priest"—Ibid. P. 139—অতি প্রাচীন যুগে ভারতীয় প্রভাব য়ুরোপের বিভিন্ন প্রদেশে, এমন কি বৃটেনেও সামাজিক জীবনের উপর বিস্তৃত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক Godprey Higins বলেন—"ভারতবাসী ব্রিটনে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল এবং বৃটনের Druidsগণ হিন্দু পুরোহিত সম্প্রদায়।"

ভারত এবং জগতের বিভিন্ন দেশের মধ্যে অতি পুরাকাল হইতে যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল তাহার আরও বহু প্রমাণ আছে এবং আরও দিন দিন আবিষ্কৃত হইয়া বিশ্ববাসীর নিকট এক অদ্ভুত রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিতেছে। ভারত এবং অন্যান্য দেশের মধ্যে আচার ব্যবহার, ভাষা এবং ধর্ম্ম বিশ্বাসের সামঞ্জস্য দেখিয়া মনে হয় যে একই সামাজিক প্রভাব বিভিন্ন সমাজের গঠনে সহায়তা করিয়াছিল। এই যে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের যোগসূত্র, ইহা বাণিজ্য এবং উপনিবেশের সাহায্যে সেই যুগেই সফল হইয়াছিল প্রাচ্যের সামাজিক প্রভাবে পাশ্চাত্য সমাজ প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। অতি প্রাচীন কালেই এই ভারতীয় সমাজের প্রভাব আমরা মিশরে, গ্রীসে, রোমে এবং য়ুরোপের অন্যান্য প্রদেশের সমাজ এবং ধর্ম্মের উপর দেখিতে পাই।

মানুষের ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা যে প্রাচীনতম যুগের তথ্যানুসন্ধানে অন্ধকারের ক্রোড়ে শেষ শয্যা পাতিয়াছে, সেই যুগেই ভারতীয় আর্য্যগণের ঐকান্তিক চেষ্টা ও আপ্রাণ যত্ন সাফল্যমণ্ডিতকরতঃ

সৌভাগ্যলক্ষ্মী একদিন উপযাচিকার মত তাঁহাদের প্রেম ভিক্ষা করিয়াছিলেন। ভুবনবিজয়ী আর্য্যনৃপতিবৃন্দ সেই প্রাচীন যুগেই বলদর্পিত হস্তে ঘন ঘন কোদণ্ড টঙ্কারে বিশ্ববাসীকে চমকিত, চতুরঙ্গদলের বীরপদভরে ধরণী কম্পিত, অশ্বক্ষুরোত্থিত ধূলিপটলে গগুল সমাচ্ছাদিত করিয়া পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যের গগন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অতি প্রাচীন যুগেই ভারতীয় সম্রাট প্রিয়ব্রতের বীরেন্দ্রাগ্রগণ্য সপ্তপুত্র সপ্তদ্বীপা সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া বহু রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। "পুরাণানুসারে ঐ সপ্তদ্বীপের নাম জম্বু, কুশ, শাল্মলী, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর ও প্লক্ষ। তাহারা পর্য্যায়ক্রমে এশিয়া, ভারত সাগরের দ্বীপপুঞ্জ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলেশিয়া, য়ুরোপ, উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা।"—Hindu Superiority, Page 160. ভারতীয় চন্দ্রবংশোদ্ভব নহুষ-তনয় রাজচক্রবর্ত্তী যযাতি অসামান্য শৌর্য্যবলে সপ্তদ্বীপা পৃথিবী জয় করিয়া পঞ্চভাগে বিভক্ত করেন। যথা :—

সপ্তদ্বীপাং যযাতিস্তু জিত্বা পৃথ্বীং সসাগরাম্।
বিভজ্য পঞ্চধা রাজ্যং পুত্রানাং নাহুষস্তদা॥

ব্রহ্মপুরাণ, ১২ অধ্যায়, ১৮ শ্লোক।

বীরেন্দ্রপ্রবর কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের ভীম পরাক্রমে সপ্তদ্বীপা সসাগরা পৃথিবী বিজিত হইয়াছিলেন। তিনি পৃথিবী জয় করিয়া নানাস্থানে উপনিবেশের পত্তন করেন।

যথা :—"যোহসৌ বাহুসহস্রেন সপ্তদ্বীপেশ্বরোহভবৎ।
জিগায় পৃথিবীমেকো রথেনাদিত্যবর্চ্চসা॥

ব্রহ্মপুরাণ, ১৩ অধ্যায়, ১৬০ শ্লোক।

তিনি এক রথে সমগ্র পৃথিবী জয় করেন! ব্রহ্মপুরাণের উল্লিখিত অধ্যায়ের ১৬৬ শ্লোক বিজয়ের আরও সাক্ষ্য দিবে। যথা :—

"তেনেয়ং পৃথিবী সর্ব্বা সপ্তদ্বীপা সপত্তনা।
সসমুদ্র সনগরা উগ্রেন বিধিনা জিতা॥"

ভারতীয় সূর্য্যবংশোদ্ভব বীরেন্দ্রকুলাগ্রগণ্য সম্রাট মান্ধাতার সাম্রাজ্য সমগ্র পৃথিবীব্যাপী ছিল। বর্ত্তমান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মত তাঁহার সাম্রাজ্যেও সূর্য্যদেব অস্তগমন করিতেন না। যথা :—

যাবৎ সূর্য্য উদেতিস্ম যাবচ্চপ্রতিতিষ্ঠতি।
সর্ব্বং তদ্ যৌবনাশ্বস্য মান্ধাতুঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে॥"

বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশে ২য় অধ্যায়।

যুগে যুগে ভারতীয় সার্ব্বভৌম রাজচক্রবর্ত্তীগণের পৃথিবী বিজয়ের ইতিহাস আজ নাই; কিন্তু পুরাণাদি পাঠে তাহার কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত পাওয়া যায় মাত্র। ভারতীয় নৃপতিগণের বিশ্ববিজয় খৃষ্ট পূর্ব্ব কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে সংঘটিত হইয়াছিল তাহার সঠিক কাল নির্ণয় এখন দুঃসাধ্য। তবে এ'কথা অতি সত্য যে সমগ্র পৃথিবী যখন অজ্ঞানতার তিমিরান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, আধুনিক য়ুরোপের পূর্ব্বপুরুষগণ যখন মৃত্তিকাগহ্বরে অথবা বৃক্ষকোটরে বাস করিত, দিগম্বরবেশে ঘুরিয়া বেড়াইত এবং পশুপক্ষীর অপক্ক মাংস জঠরানলে আহুতি প্রদান করিত।—এক কথায়, সভ্যতার অণুকণাও যখন মিশরে, গ্রীসে, রোমে প্রবেশ করে নাই—তখনি ভারতবর্ষ সুখৈশ্বর্য্য-বিলাস বিলোলা ইন্দ্রাণীর মত সমগ্র জগতের সম্মুখে সগর্ব্বে মহিমময় দীপ্তিতে মহা-ভারত রূপে প্রতিভাত হইয়াছিল এবং এই মহা-ভারতের পদতলে বসিয়াই সমগ্র দর্শন, বিজ্ঞান ও সভ্যতার জটিল প্রশ্নসমূহের সমাধান প্রাপ্ত হইয়া সভ্য সমাজে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। দিগ্বিজয়ী ভারতীয় আর্য্যনৃপতিবৃন্দ চেঙ্গিজ বা তৈমুরের ন্যায় ধনৈশ্বর্য্য লুণ্ঠনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়া অথবা বিকটব্যাদান শার্দ্দুলের মত শোণিত-তৃষ্ণায় লোলুপ রসনা নিয়া পৈশাচিক আনন্দের তীব্র তাড়নায় বিশ্ববিজয়ে ব্রতী হন

নাই ;—ঝঞ্ঝাবাতের মত বিজিত দেশের উপর দিয়া তাঁহারা রক্তাক্ত শকট পরিচালিত করেন নাই। তাঁহারা সভ্যতার উজ্জ্বল বর্ত্তিকাহস্তে বিজিত দেশসমূহের চক্ষে এক নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ে ব্যাপৃত সৈনিকগণ ঐ সমস্ত দেশে যে সভ্যতার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা ফলপুষ্প প্রসব করিয়াছিল বিজিত দেশে ভারতীয় শাসন এবং উপনিবেশকে কেন্দ্র করিয়া।

পৌরাণিক যুগে ভারতবর্ষের পশ্চিমসীমা বর্ত্তমান North-Western Frontier পর্য্যন্ত শুধু সীমাবদ্ধ ছিল না;—পরন্তু যবন, পহ্নব, গান্ধার, বাহ্লীক, পহ্লব, কেকয় প্রভৃতি দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তথা উক্তঞ্চ বায়ুপুরাণে:—

বাহ্লীকা বাটধানাশ্চ আভীরাঃ কালতোয়কাঃ।
অপরীতাশ্চ শূদ্রাশ্চ পহ্নবাশ্চর্ম্ম খণ্ডিকাঃ॥ ১১৫ শ্লো
গান্ধারা যবনাশ্চৈব সিন্ধু সৌবীর ভদ্রকাঃ।
শকা হ্রদাঃ কুলিন্দাশ্চ পরিতা হারপুরিকাঃ॥ ১১৬
রমটা রুদ্ধকটকাঃ কেকয়া দশমালিকাঃ।
ক্ষত্রিয়োপনিবেশাশ্চ বৈশ্যশূদ্রাকুলানিচ॥ ১১৭
কাম্বোজা দরদাশ্চৈব বর্ব্বরাঃ প্রিয়লৌহিকাঃ।
আত্রেয়াশ্চ ভরদ্বাজাঃ প্রস্থলাশ্চ কসেরুকাঃ॥ ১১৮
লম্পকা স্তনপাশ্চৈব পীড়িকা জুহুড়ৈ সহ।
অপসাশ্চালিমদ্রাশ্চ কিরাতানাঞ্চ জাতয়॥
তোমরা হংসমার্গাশ্চ কাশ্মীরাস্তঙ্গনাস্তথা।
চুলিকাচাহুকাশ্চৈব পূর্ণদর্ব্বাস্তথৈবচ॥
এতে দেশাঃ উদীচ্যশ্চ.........

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়—

উপরোক্ত দেশসমূহ ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশে অবস্থিত ছিল; পুরাণবর্ণিত বাহ্লীকদেশ বর্ত্তমান বল্‌ক (Bulkh) প্রদেশ। গান্ধারের বর্ত্তমান নাম কান্দাহার। অনেকে রামায়ণের বর্ণনা দৃষ্টে অনুমান করেন কেকেয় দেশ ককেশাস পর্ব্বতের পাদমূলস্থ কোন জনপদ ছিল। রাজা দশরথ তৎদেশীয়া রাজকুমারী কৈকেয়ীর পাণিগ্রহণ করেন। কুরুবংশীয় রাজা শান্তনুর পিতা বহ্লীক দেশের রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। পহ্নব দেশ ও মদ্রদেশ বর্ত্তমান কাবুল রাজ্যের উত্তরাংশে অবস্থিত ছিল। হিন্দুগণ গ্রীকগণকে যবন আখ্যায় অভিহিত করিতেন। চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতি জরাভারগ্রহণে অস্বীকৃত পুত্র তুর্ব্বসুকে যবনগণের অধিনায়ক হইবেন বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন এবং নির্ব্বাসিত করেন। যথা:—

"তুর্ব্বসোর্যবনা জাতাঃ"—মহাভারত

মহাভারতে কথিত আছে রাজা বিশ্বামিত্র ঋষি বশিষ্ঠের ধেনু বলপূর্ব্বক অপহরণ করিতে গেলে তাঁহার শরীর হইতে শক, যবন, পহ্লব প্রভৃতি পরাক্রমশালী ম্লেচ্ছ জাতির উদ্ভব হয় এবং তাহারা বিশ্বামিত্রকে পরাজিত করে। এই সমস্ত জাতির সহিত ভারতীয় আর্য্যগণের বিবাহাদি পর্য্যন্ত হইত। ধৃতরাষ্ট্র—গান্ধাররাজকন্যা গান্ধারীর পাণিগ্রহণ করেন। চন্দ্রবংশীয় দ্রুহ্যর প্রপৌত্র গান্ধার নামক এক রাজা গান্ধার জনপদ স্থাপন করেন। ভারতবর্ষের পূর্ব্বদিকে কিরাত এবং পশ্চিমে যবনগণের বাস। উহার মধ্যভাগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণের অবস্থান। তথা উক্তঞ্চ ব্রহ্মপুরাণে—

পূর্ব্বে কিরাতাঃ যস্যাসন পশ্চিমে যবনাস্তথা।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াবৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চান্তে স্থিতা দ্বিজাঃ॥
২৭ অঃ, ১৭ শ্লোক।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে গ্রীকগণকে যবন বলা হইত। ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্ত্তী Ionia দ্বীপপুঞ্জ গ্রীক অধ্যুষিত দেশ; Ioniaকে যুনানী বলা হইত যুনানী অর্থাৎ যবন অধ্যুষিত দেশ ভারতবর্ষের পশ্চিমে অবস্থিত হইলে ভারতের পশ্চিমসীমা

Asia Minor পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া ধরা যায়। মধ্যযুগে য়ুরোপীয় ভৌগলিকগণও তাহারই সমর্থন করেন। যথাঃ—"European Geographers in mediaeval times clssified East Africa as one of the Indies and Marco Polo located Abyssinia in "middle India."—Ibid, Page 92. ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া এই বিশাল ভূখণ্ড প্রাচীন যুগে ভারতীয় শিক্ষাসভ্যতায় দীক্ষিত ও ভারতীয় অনুশাসনে শাসিত হইত সন্দেহ নাই। পূর্ব্বকালে আফগানিস্থান এবং পারস্য প্রভৃতি দেশেও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। মনুসংহিতায় উল্লেখ আছে যে পহ্লব, পারদ, যবন, শক, দরদ, কিরাত, চীন প্রভৃতি জাতি পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিল কিন্তু বহুকাল যাবত ব্রাহ্মণগণের সহিত সাক্ষাৎ না হওয়ায় তাহারা পতিত হইয়াছিল। মহাভারতও ঐ উক্তির সমর্থন করেন। ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপতি বাহুর রাজ্যহরণে শক, যবন, পারদ, কাম্বোজ ও পহ্নবগণ হৈহয় ও তালজঙ্ঘকে সাহায্য করায় তাঁহার পুত্র বীরেন্দ্রকেশরী রাজচক্রবর্ত্তী সগরনৃপতি ঔর্ব্ব ঋষির প্রসাদে আগ্নেয়াস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়া তাঁহার পৈত্রিক রাজ্যাপহরণে প্রধানতঃ লিপ্ত হৈহয়গণকে নির্ম্মূল করিয়া শক, যবন, পারদ, কাম্বোজ ও পহ্নবগণের বিনাশ সাধনে উদ্যত হইলে তাহারা ইক্ষ্বাকুকুল-পুরোহিত ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হন। বশিষ্ঠের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে সগর তাহাদিগকে প্রাণে মারিলেন না বটে কিন্তু বেশবিন্যাস ব্যত্যয় করিয়া তাহাদিগকে ক্ষাত্র ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিয়া দিলেন। তিনি শকদিগের মস্তকার্দ্ধ এবং কাম্বোজ ও যবনদিগের সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করতঃ বিতাড়িত করিলেন। তাঁহার প্রভাবে পারদগণ মুক্তকেশ, ও পহ্নবগণ শ্মশ্রুধারী হইল। শক, কাম্বোজ, যবন, পারদ ও পহ্নবগণের স্বাধ্যায় ও বষট্কার প্রভৃতি রাজা সগর বারিত করিয়া দেন। যথা :—

"সগরঃ স্বাং প্রতিজ্ঞাং তু গুরোর্বাক্যং নিশম্যচ।
ধর্ম্মং জঘান তেষাং বৈ বেশানন্যাংশ্চকারহ॥ ৪৭
অর্দ্ধং শকানাং শিরসো মুণ্ডয়িত্বা ব্যাসর্জয়ৎ।
যবনানাং শিরঃ সর্ব্বং কাম্বোজানাং তথৈবচ॥ ৪৮
পারদা মুক্তকেশাশ্চ পহ্নবা শ্মশ্রুধারিনঃ।
নিঃস্বাধ্যায় বষট্কারাঃ কৃতাস্তেন মহাত্মনা॥" ৪৯

৮ম অধ্যায়, ব্রহ্মপুরাণ।

বাণিজ্য ও উপনিবেশের যোগসূত্রে ভাবের আদান প্রদানে যেমন প্রত্যেকের জাতীয় জীবন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল—তেমন বিভিন্ন ধর্ম্মের ঐক্যতানে সমাজের জীবন পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল। অতি প্রাচীন কালে ভারতীয় বণিকগণ ভীষণ বোলান বা খাইবার গিরিশঙ্কট অতিক্রম করিয়া কাবুল, পারস্য ওইরাণ দেশের মধ্য দিয়া কৃষ্ণসাগর অতিক্রম করতঃ ইয়ুরোপে বাণিজ্য করিতেন। ইয়ুরোপ এশিয়ার মধ্যে বাণিজ্যের এই পথ বহুকাল পর্য্যন্ত ব্যবহৃত ছিল। প্রাচীন বণিকগণ এই স্থলপথে কি অকুতোভয়ে, কি অসীম অধ্যবসায়ে পণ্য দ্রব্য নিয়া যাইতেন তাহা ভাবিলে শরীর আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। ভারতীয় পণ্য দ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গে মধ্য-এশিয়ার বুকের উপর দিয়া যুগে যুগে ভারতীয় জ্ঞান ও সভ্যতার ধারাও বিভিন্ন দেশে বিস্তারিত হইয়াছে। প্রাচীন যুগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের সন্ধিস্থল এই মধ্য এশিয়াও ইরাণ। ভাবের আদান প্রদানে অতি প্রাচীন যুগেই ভারত ও ইরাণ জ্ঞান গরিমায় বিভূষিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই যুগেই উভয়ের জাতীয় জীবন ও সামাজিক জীবন একই ধর্ম্ম বিশ্বাসের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। একই

ধর্ম্ম বিশ্বাসের নবীন আলোক তরুণ উষার স্নিগ্ধ আলোরেখার মত বিশ্ববাসীর প্রাণে এক অননুভূত সৌন্দর্য্যবোধের সৃষ্টি করিয়াছিল। যে ধর্ম্মবিশ্বাস নিয়া ইরাণে ভ্রাতৃবিচ্ছেদের সূচনা হয়,—সেই ধর্ম্মবিশ্বাস পঞ্চনদের সরস্বতী তীরে আর্য্য ঋষির ত্রিতন্ত্রীতে নূতন ছন্দে ঝঙ্কৃত হইয়া বেদের ভাষায় সেই মোহন মূর্চ্ছনায় রেশ মিশাইয়া দিয়া পূর্ণ সাফল্য লাভ করিয়াছিল। সরস্বতীর পুণ্যময় তটে নবলব্ধ জ্ঞানের অমিয়সিক্ত বার্ত্তা ইরাণের ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিতরণ করিতে আর্য্যগণ কার্পণ্য করেন নাই। মহিমময় অতীত যুগের পূর্ণ গৌরবের মধ্যে পূণ্যপুঞ্জময় মহাতীর্থ পঞ্চনদের প্রান্তে আর্য্য ঋষি উদাত্ত কণ্ঠে প্রচার করিয়াছিলেন—"শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।" খৃষ্টের জন্মের কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইরাণের অদ্বিতীয় ধর্ম্মগুরু, জরথুশত্র দেব প্রভাতের বিহগ কাকলীর মত সুমধুর স্বরে বেদের প্রতিধ্বনি করিয়া ইরাণের ধর্ম্মজীবনের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেন। এই নূতন ধর্ম্মস্রোত স্বীয় পবিত্রতায় ইরাণের লক্ষ লক্ষ নরনারীকে ধন্য করিয়া মধ্য-এশিয়া প্লাবনে ভাসাইয়া দিকে দিকে উদ্দাম গতিতে প্রবাহিত হইয়াছিল।

দ্বৈতাদ্বৈত উভয় মতই বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। বেদোপনিষদ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলিয়া কম্বুকণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন; আবার একই "বহুধা ভবন্তি" বলিয়া প্রচার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। "সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষ সহস্র পাদঃ" বলিয়া বেদে বিরাটরূপেরও কল্পনা করা হইয়াছে। জ্ঞানের প্রথম প্রভাবে প্রথমতঃ প্রকৃতির সুন্দর ২ রূপকে ঈশ্বরের প্রতীক বলিয়া উপাসনা করা হইত। প্রকৃতির বিভিন্ন দৃশ্যকে ঈশ্বরের প্রতীকরূপে উপাসনা হইতেই পরবর্ত্তীকালে সাকার উপাসনার সৃষ্টি হয়। ভগবানকে কেবল সৌন্দর্য্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা হয় নাই। তিনি "ভয়ানাং ভয় ভীষণং ভীষণানাং"—উদ্যত বজ্রের সহিতও উপমিত হইয়াছেন। মিত্র, অর্য্যমা, বরুণ প্রভৃতি দেবগণের উল্লেখও বেদে পাওয়া যায়। মানুষের দার্শনিক প্রাণ যখন ভাবের নব নব ধারায় অভিসিঞ্চিত হইয়া নূতন তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তখনি রূপের নানা কল্পনা ও ধর্ম্মবিশ্বাস সামাজিক জীবনে পরিবর্ত্তন সংঘটিত করে। "একম্ অদ্বিতীয়ম্" এর এই যে রূপের কল্পনা তাহা মানবের সমাজপ্রিয়তার একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। মানুষ যখন "এক অদ্বিতীয়" গুণাতীত, নিরাকার পরম ব্রহ্মের উপাসনায় স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে পৃথক করিয়া শান্তি পাইতেছিল না;—নিরাকার ব্রহ্মের কল্পনার বিড়ম্বনায় যখন সে অন্ধকারে ইতস্ততঃ সাঁতার কাটিতেছিল, তখন দুই একজন ভাবুক সাধক সাধনালব্ধ অপূর্ব্ব বাণী প্রচার করিলেন—

"বহুরূপে বিরাজিছে সম্মুখে তোমার,
বৃথা কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর—

* * * *

আব্রহ্মস্তম্ভ সকলি তাঁর রূপের বিকাশ। নদ নদী, বৃক্ষলতা, সাগরভূধর, মনুষ্য, কীটপতঙ্গ, প্রতি ধূলিকণা সকলি তাঁর বিভিন্নরূপ। ধর্ম্মের এই যে নূতন তত্ত্ব স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে অভেদ করিয়া দিয়াছে তাহা সামাজিক জীবনের মধ্য দিয়াই গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। মানুষের যখন আত্মসম্মান জ্ঞান হইল, সে যখন সামাজিক জীবনের পূর্ণ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারিল, তখনই প্রকৃতপক্ষে এই ধর্ম্ম বিশ্বাসের জন্ম। শক্তি-বাদের মধ্য দিয়া এই ধর্ম্মমত অতি প্রাচীনকালেই সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং সাফল্য মণ্ডিত হয়। শাক্ত জানেন আধার ও আধেয়ে যে সম্বন্ধ,—অগ্নি ও

তার দাহিকাশক্তির মধ্যে যে সম্বন্ধ—শক্তি ও শাক্তে সেই সম্বন্ধ। অগ্নি ও দাহিকাশক্তির মধ্যে যেমন একটী বাদ দিলে অপরটীর কোন মূল্য থাকে না, তেমনি শক্তি ও শাক্তের মধ্যে সম্বন্ধ। এই দ্বৈতবাদই শক্তিবাদের মূল সূত্র। শক্তিবাদের উৎপত্তি স্থল বাংলা; তন্ত্রসকল বাংলাতেই রচিত। বাংলা হইতেই এই ধর্ম্ম তাঁহার সুযোগ্য বরপুত্রগণের মারফতে জগতের বিভিন্ন দেশে প্রচারিত হইয়া তদ্দেশীয়গণের সামাজিক জীবনকে সফল করিয়া তুলিয়াছিল। বাংলার গৌরব এখন ধূলাবলুন্ঠিত, সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত; বাংলার শক্তি পঙ্গু, বাংলার শাস্ত্র লুপ্ত, সাহিত্য কীটদষ্ট, বাংলার বাণী এখন নিষ্ক্রিয়; কিন্তু এই বাংলাই একদিন ভাবপ্রবণতার বিজয়-দুন্দুভি নিনাদে নীরস কঠোর জ্ঞানমার্গের সংস্কার সাধনে ভক্তির পীযূষ-নিঃস্যন্দিনী ধারায় ভারত এবং বহির্ভারত প্লাবিত করিয়া ধর্ম্ম এবং সমাজে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। বাংলা সেই যুগেই 'মাকে চিনিয়াছে—শক্তি এবং শাক্তকে অভেদ দেখিতে শিখিয়াছে। জগতে মূর্ত্তিপূজার প্রথম প্রচারক শাক্ত সম্প্রদায়। বাংলা হইতেই এই ধর্ম্ম ধীরে ২ জগতে বিস্তৃত হইয়াছিল। রোমে, গ্রীসে, মিশরে, আফ্রিকায়, প্যালেষ্টাইনে, মক্কা ও মদিনায় এক সময়ে ভারতীয় প্রথাতে প্রতিমা পূজা হইত। Moses তাহাই নিবারণ করিতে যাইয়া বাইবেল লিখেন; হজরত মহম্মদ সেই সাকার উপাসনার মূলে কুঠারাঘাত করেন। আজও ভারতের শৈব, সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ধ্যান ধারণা, পূজাপদ্ধতি শাক্ত প্রণালীতে নিয়মিত হয়। জগতের বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে আচারগত এবং আনুষ্ঠানিক যত বৈষম্যই থাকুক না কেন ধর্ম্মের মূলসূত্র পৃথক নহে। বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ—বৈদিক বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভিত্তিকেই মূলসূত্র করিয়া বিভিন্ন ধর্ম্ম বিশ্বাসের জাতীয় জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে। বেদ, বাইবেল, কোরাণ, জেন্দাভেস্তা, এড্ডা, প্রভৃতি গ্রন্থ এবং প্রতীচ্যের ব্যাস, বাল্মিকী, গৌতম, কপিল, কণাদ, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহা মনিষীগণের উপদেশাবলীর পার্শ্বে পাইথাগোরাস, সক্রেটীশ, প্লেটো, আরিষ্টাটল, হোমার, সিসিরো, ভার্জিল, হাফেজ, ওমর খৈয়াম প্রভৃতির উপদেশাবলী রাখিলে সাদৃশ্য দেখিয়া অবাক হইতে হয়। তখন স্বতঃই মনে হয় এত সৌসাদৃশ্য প্রত্যক্ষ আদান প্রদান ভিন্ন হইতে পারে না। তাই Col. Alcot বলেন "প্রাচীন ভারতের আর্য্য ঋষিদের মতের সহিত পরবর্ত্তী গ্রীস ও রোমের দার্শনিকগণের মতের এত সৌসাদৃশ্য আছে যে জ্ঞান হয় যে প্রথমেরই প্রতিবিম্ব পরবর্ত্তী দর্শনরূপ দর্পণে দেখিতেছি। শিক্ষক বা পুস্তক প্রাচ্যদেশ হইতে পাশ্চাত্য দেশে না আসিলে এরূপ সাদৃশ্য হইতে পারে এরূপ বিশ্বাস বুদ্ধির অগম্য। আবার উহা আমাদের ধারণা আরও বদ্ধমূল করিয়াছে যে, ভারতবাসীরাই মিশরে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল এবং মুসা হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রীক Plato পর্য্যন্ত প্রায় সমুদয় প্রাচীন দার্শনিকগণই জ্ঞান আহরণার্থে মিশরে গিয়াছিলেন। ধর্ম্মতত্ত্বের নূতন আলো যখনই ভারতে প্রস্ফুটিত হইয়াছে তখনি ভারতীয় আর্য্যগণ ইরাণে প্রচার করিতে বিলম্ব করে নাই। প্রাচীন যুগে ভারত ও ইরাণ সৌভ্রাতৃসূত্রে আবদ্ধ ছিল। সেই যুগে প্রাচীগগণে এই দুইটী বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃজাতি জ্ঞানগরিমায় শ্রেষ্ঠ,শৌর্য্যবীর্য্য ও সভ্যতায় অতুলনীয় হইয়া তরুণ তপনের মত বিমল কিরণ বিচ্ছুরিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। উভয় জাতিই তখন আদান প্রদানের স্বর্ণ শৃঙ্খলে দৃঢ়বদ্ধ ছিল তাই অতি সহজে ভারতীয়

ধর্ম্মের প্রতিবিম্ব ইরাণের সামাজিক জীবনে প্রতিফলিত হইতে পারিয়াছিল। বেদান্ত যখন বিশ্ববাসীর সমক্ষে আধ্যাত্মিক জগতের এক নূতন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া গুরু গম্ভীরে গাহিয়া উঠিলেন —"অহং ব্রহ্মাস্মি"—তখন পূর্ণ জ্ঞানের এই চরম সত্যকে অহঙ্কারের কণ্ডুয়ন আখ্যায় বিভূষিত করিলেও পরবর্ত্তী যুগে পারস্যের পার্ব্বত্যকান্তারে ভারতের এই চরম সত্যের প্রতিধ্বনি উঠিয়াছিল। এই সত্য সাধারণের ধারণার অতীত হইলেও পারস্যের দার্শনিক বজ্রস্বরে জগতে "আনহলক" প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। রাজরোষের ভ্রূকুটি-কুটিল-নেত্র তাঁহাকে এই সত্য প্রচারে বিরত করিতে পারে নাই। তারপরে ভারতের পঞ্চরসের শ্রেষ্ঠ মধুর ভাবের উপাসনাও ইরাণীগণের দ্বারা সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। পারস্য কবির সুমধুর লেখনী নিঃসৃত "লায়লা মজনুর" আখ্যায়িকা তদ্দেশীয় সমাজে প্রেমের বন্যা ছুটাইয়াছিল। সুফীধর্ম্ম বৈষ্ণব ধর্ম্মের মত প্রেমের ধর্ম্ম ;—প্রেমকে কেন্দ্র করিয়া এই উভয় মতবাদই পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণবের যেমন "রাধাকৃষ্ণ" একে,অন্যের প্রেমে আত্মহারা; তেমনি সুফীর "লায়লা মজনু"। বাস্তবিক পক্ষে ধর্ম্মের প্রভাব অতি পুরাকালেই আদান প্রদানের মধ্য দিয়া এই উভয় জাতির সামাজিক জীবনকে পূর্ণ সাফল্য দান করিয়াছিল।

বৈদিক যুগে যৌবন-বিবাহই প্রচলিত ছিল ; কিন্তু পৌরাণিক যুগে যৌবন-বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে বাল্য-বিবাহও ভারতীয় সমাজে প্রচলিত হয়। সমাজে কখন্ বাল্য-বিবাহের প্রচলন হয় তাহা নিয়া নানা মুনির নানা মত। গান্ধর্ব্ব-বিবাহ যৌবন-বিবাহ সন্দেহ নাই। গান্ধর্ব্ব-বিবাহও যখন সমাজের কল্যাণ সম্যক্‌রূপে সাধন করিতে অসমর্থ হইল, তখন উক্ত বিবাহ-প্রথা সময়োপযোগী পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত হইতে হইতে বর্ত্তমান ব্রাহ্ম বিবাহ প্রথায় পরিণত হইয়াছে। ভারতীয় সমাজে অর্দ্ধাঙ্গিনীর এক আখ্যা সহধর্ম্মিণী। পত্নীর সহিত গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালন করা হয় বলিয়া তিনি সহধর্ম্মিণী। পতিপত্নী একত্রে এক মন এক প্রাণে গৃহস্থের নিত্য কর্ত্তব্য পঞ্চ মহাযজ্ঞাদি সাধনের মধ্যেই ধর্ম্মাচরণের প্রধান অন্তরায়। তাই শাস্ত্রকার পরিণয়োন্মুখ বরের মুখ দিয়া উপদেশচ্ছলে পত্নীকে বলাইয়াছেন—"যদেদং হৃদয়ং মম তদেদং হৃদয় তব।" সস্ত্রীক আচরণ ব্যতীত গার্হস্থ্য ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় তাই শাস্ত্রকার বরের মুখে অনুরোধস্থলে কন্যাকে বলাইতেছেন—"মম ব্রতে তে হৃদয়ং দদাতু, মম চিত্তন্তে চিত্তমনুবর্ত্ততে।

বৈদিক যুগের পরে পৌরাণিক যুগে ভারতে বাল্য-বিবাহের প্রচলন আরম্ভ হয়। মনে হয়, গান্ধর্ব্ব-বিবাহ বনাম যৌবন-বিবাহে নরনারীর আত্মতৃপ্তির পূর্ণ সাফল্য হইলেও সমাজের কোন প্রকার স্বাস্থ্যোন্নতি না হওয়ায় ধীরে ধীরে বাল্য-বিবাহ প্রথার প্রচলন হইয়াছে। সামাজিক জীবনের পূর্ণ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাল্য-বিবাহের প্রচলন হয়। ভারতীয় সমাজে যৌথ-পরিবার বা Joint familyর বহুল প্রচলন অতি প্রাচীন যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। যৌথ-পরিবারে বাস করিতে হইলে বালিকাবধু নির্ব্বাচনই সব দিকে মঙ্গলকর। তাই অতি প্রাচীনকালেই সামাজিক জীবনের ভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্য ভারতবর্ষে বাল্য-বিবাহের প্রচলন হইয়াছিল। অতি প্রাচীনকালে মুষ্টিমেয় আর্য্য এই দেশ জয় করেন —অনার্য্য জনসংখ্যা তাহাদের লক্ষ গুণ ছিল সন্দেহ নাই। কালক্রমে বহু অনার্য্য আর্য্য সমাজে মিশিয়া তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিল। তখন

বহু আর্য্য পুরুষ অনার্য্য নারীকে পত্নীত্বে বরণ করিত। আর্য্য সমাজে মিশিয়া আর্য্য সভ্যতা প্রসাদে কিয়ৎ পরিমাণে সভ্য হইলেও সেই সমস্ত অনার্য্য রমণীর পক্ষে আজন্ম সঞ্চিত সংস্কার বিসর্জ্জন দেওয়া একেবারে অসম্ভব ছিল। আর্য্য অনার্য্যের এইরূপ সংমিশ্রণে সমাজে ঘোরতর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। সেই বিশৃঙ্খলার হস্ত হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য বাল্য-বিবাহ প্রথার প্রচলন হয়। কারণ কোনও অনার্য্য বালিকাকে আর্য্য পরিবারে রাখিয়া আর্য্যের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি ও ধর্ম্মাচরণ শিক্ষা দিলে তাহার জাতি ও বংশগত সংস্কার তাহার চরিত্রের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিত না।—অচিরে সে আর্য্য শিক্ষা-দীক্ষায় শিক্ষিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে আর্য্য পরিবারে আত্মগোপন করিত। বাল্য-বিবাহের প্রচলনের পরবর্ত্তী কালে প্রশ্ন উঠিল যে নারীত্ব প্রকটিত না হইলে বালিকার পতিত্বে বরণের কোন মূল্য নাই,—তাই সমাজে second marriageএর প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। বাল্য-বিবাহের সৃষ্টি সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় বলেন—"দ্রাবিড় জাতির মধ্যে যৌন-সম্পর্ক অনেকটা উচ্ছৃঙ্খল (promiscuous) ছিল। ইহারা যখন আর্য্য সভ্যতার মধ্যে আসিয়া পড়িল তখন হইতে আর্য্যদের প্রধান চেষ্টা হইয়া দাঁড়াইল, যেমন করিয়া হউক নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে হইবে। যৌন-সম্পর্ক সম্বন্ধে এই উদ্বেল ভাব হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আর্য্যজাতির মধ্যে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত হইল। ঋগ্বেদের সময়ে বাল্য-বিবাহ ছিল না, কিন্তু মনুর সময়ে বাল্য-বিবাহ সমাজে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত। ইহার অন্য কারণও থাকিতে পারে। ঋগ্বেদের আর্য্যেরা হয়তো শীত প্রধান দেশে ছিলেন ; সেখানে যৌবনোদ্গম কিছু দেরীতে হইয়া থাকে। বিবাহও একটু বয়সে হইত। গ্রীষ্ম প্রধান ভারতবর্ষে বহুকাল অবস্থানের ফলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য দেহযন্ত্রের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিবে এবং যখন যৌবনোদ্গম অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে হইতে আরম্ভ হইল তখন বিবাহের বয়সও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে।

বিভিন্ন বংশধারার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ গঠনশীল হইয়া উঠিলে প্রাচীন সমাজে আমরা নারীর সংখ্যাধিক্য দেখিতে পাই। পুরাণে দেখিতে পাই দক্ষ প্রজাপতির ত্রয়োদশ কন্যা কশ্যপের সঙ্গে বিবাহিতা হন। তাহাদের নাম যথাক্রমে অদিতি, দিতি, দনু, অরিষ্টা, সুরসা, খসা, সুরভি, বিনতা, তাম্রা, ক্রোধবশা, ইরা, কদ্রু ও মুনি বা মনু। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে প্রাচীন সমাজে সন্তান মায়ের নামে পরিচিত হইত। মুনি বা মনুর সন্তানগণ মানব বলিয়া পরিচিত। তখন নারীর আধিক্যপ্রযুক্ত এক এক পুরুষ বহু নারীর পাণিগ্রহণ করিত। বর্ত্তমান বিবাহপ্রথা বহু পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে। প্রাচীন সমাজে আত্মতৃপ্তিটাই বোধ হয় কাম্যবস্তু ছিল। তাই নরনারীর একত্র সম্মিলন কিয়দংশে সামাজিক শাসনাধীনে থাকিলেও বর্ত্তমান বিবাহের সঙ্গে তাহাদের তুলনা হয় না। সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিগণ যথেচ্ছভাবে বিচরণের চেয়ে যেন তেন প্রকারেণ নরনারীর সম্মিলনকেও তখন ভাল মনে করিতেন। তাই মনু, আসুর, রাক্ষস, পৈশাচ, গান্ধর্ব্ব প্রভৃতি অষ্টবিধ বিবাহের প্রকার ভেদ করিয়াছেন; প্রাচীন সমাজে বিধবা বিবাহেরও প্রচলন ছিল। শাস্ত্র তাহার অনুশাসন প্রচার করিয়াছেন। যথা :—

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
ইতি পঞ্চসাপৎসু নারীনাং পতিরন্যোবিধীয়তে॥"

পতি নষ্ট হইলে, মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিলে, ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইলে কিংবা পতিত হইলে নারী পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারিবে বলিয়া মনুসংহিতা প্রচার করিয়াছেন। মনুসংহিতার অপর একস্থানে উল্লেখ আছে যে, পতি ধর্ম্মার্থে প্রবাসী হইলে তাহার স্ত্রী ৮ বৎসর, বিদ্যার্জ্জন বা যশোলাভের জন্য প্রবাসী হইলে ৬ বৎসর ও কামার্থে হইলে ৩ বৎসর অপেক্ষা করিবে; পরে পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারিবে বলিয়া বিধান দেওয়া হইয়াছে।

এই যে পত্যন্তর গ্রহণ ইহা বাধ্যতামূলক ছিল বলিয়া মনে হয় না। যে সমাজে পুরুষ নারীর চেয়ে সংখ্যায় অধিক সে সমাজে বিধবা বিবাহ চলিতে পারে; কিন্তু যে সমাজে নারীর সংখ্যাধিক্য সে সমাজে নারীর পত্যন্তর গ্রহণ সর্ব্বসময়ে মঙ্গলদায়ক নহে। নারীর পত্যন্তর গ্রহণ বৈদিক যুগ হইতে পৌরাণিক যুগ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। মহাভারতে দেখিতে পাই, নল রাজার পত্নী সন্তানবতী হওয়া সত্ত্বেও পতি নিরুদ্দিষ্ট হইলে দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিবেন বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় ইহা স্বতঃই মনে হয় যে, তৎকালে নারীর পত্যন্তর গ্রহণ সামাজিক ভাবে নিন্দিত হইত না। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে নারীর পত্যন্তর গ্রহণ প্রথা ধীরে ধীরে লোপ পাইতে লাগিল। তখনও বোধহয় সন্তানহীনা তরুণীর দ্বিতীয় পতি গ্রহণের প্রথা সমাজে প্রচলিত ছিল। সন্তানবতী বিধবার পত্যন্তর গ্রহণ নিতান্ত অস্বাভাবিক ও অপরিণামদর্শীতার কার্য্য। এই অবস্থায় সন্তানবতী রমণীর দ্বিতীয় পতি যদি অন্যের ঔরসজাত সন্তানগণকে স্নেহের চক্ষে দেখিতে না পারে, তবে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ, মানুষের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক। হইতে পারে দরিদ্র সন্তানের জননী স্বীয় গর্ভজাত অপোগণ্ড শিশুগণের ভরণ পোষণের জন্য অপত্যস্নেহে উন্মাদিনী হইয়া পত্যন্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, কিন্তু সেই পরমস্নেহের পাত্র যখন তাহার দ্বিতীয় স্বামী কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত অপমানিত হয় তখন গর্ভধারিণীর স্নেহের উৎস কি রুদ্ধ আবেগে বুকের ভিতর গুমরিয়া উঠে না? মুসলমান সমাজে অনেক স্থলে আমরা সন্তানবতী রমণীর পত্যন্তর গ্রহণের বিষময় ফল দেখিতে পাই। ভারতের প্রাচীন সমাজে এই সমস্ত নানা কারণে সঙ্গতিপন্না স্নেহপরায়ণা বিধবা জননী পত্যন্তর গ্রহণ করিতেন না। তারপরে এই বিসদৃশ আচরণের কুফল হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য নরনারীর সম্মিলনের উন্নততর প্রণালী সমাজে প্রচলিত হয়। তখন দারিদ্র্যের কঠোর পেষণ হইতে বিধবা ও তৎসন্তানগণকে রক্ষা করিবার জন্য যৌথপরিবার বা joint family'র সৃষ্টি হয়। সামাজিক জীবনে যৌথপরিবার অতি মঙ্গলদায়ক সন্দেহ নাই। যৌথ পরিবার পরিচালনা করিতে হইলে পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণের সংকীর্ণচেতা হইলে চলে না। তাহাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ সমষ্টির স্বার্থের পদতলে বলি দিতে হয়। ভারতের দুর্ভাগ্য, যে পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহময় মন্ত্রে আত্মবিস্মৃত হইয়া আজ সে নিজের তৃপ্তিকেই বড় মনে করিয়া যৌথপরিবার প্রথা সমূলে বিনষ্ট করিবার উপক্রম করিয়াছে।

সমাজে শৃঙ্খলা স্থাপন কামনায় প্রথমতঃ সন্তানবতী রমণীর পত্যন্তর গ্রহণ বন্ধ করা হয়; তখনও বোধ হয় সন্তানহীনা ক্ষতা কন্যার বিবাহ সমাজে প্রচলিত ছিল। কিন্তু পৌরাণিক যুগে

ক্ষতা কন্যার বিবাহও নিষিদ্ধ হয়। ইহার কিছুদিন পরে বৃহন্নারদীয় পুরাণের "দত্তাক্ষতায়া কন্যায়া পুনর্দানং পায়স্ত চ" ইত্যাদি বচন দ্বারা অক্ষতা কন্যার বিবাহও নিষিদ্ধ বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে।" অর্থদ্বারা কন্যাকে ক্রয় করা আসুর, কন্যাকে বল-পূর্ব্বক অপহরণ করাকে রাক্ষস এবং সুপ্তা বা প্রমত্তা কন্যাতে উপগত হওয়াকে পৈশাচ-বিবাহ আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। বরকন্যার পরস্পর ইচ্ছাসংযোগে মিলনের নাম গান্ধর্ব্ব-বিবাহ। গান্ধর্ব্ব বিবাহের প্রতিবিম্ব আমরা আধুনিক courtship এর বিবাহের মধ্যে দেখিতে পাই। মনুষ্যত্বের ঈষদ্বিকাশের মধ্যে বলপূর্ব্বক অপহরণ করা বা সুপ্তা বা প্রমত্তা কন্যাতে উপগত হওয়া ঘৃণিত বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। কন্যার সংখ্যা কম হওয়ায় বাধ্য হইয়া বহু পুরুষকে অবিবাহিত থাকিতে হইত এবং বিবাহোপযোগী কন্যা নীলামে বিক্রীত হইত। আসুর বিবাহের যুগে হয়ত একই কন্যার পাণিপ্রার্থী চারি পাঁচটী পাত্র জুটিত, তখন যিনি অধিক অর্থ দিতে পারিতেন তিনিই কন্যার পতিত্বে বহাল হইতেন।

তারপরে গান্ধর্ব্ব বিবাহ— উপরোক্ত তিন প্রকার বিবাহ প্রথা হইতে অনেকটা উন্নত সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণরূপে দোষশূন্য নহে। মনু ইহাকে কামজ বিবাহ বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন। তরুণ তরুণীর হৃদয়ের বিনিময়ে যে মিলন তাহা কবি তাহার কল্পনার ঐন্দ্রজালিক রঙ্গে যতই রঙ্গীন করিয়া তুলুন না কেন—তাহার মূলে আছে কঠোর সত্যের মত আত্মতৃপ্তি এবং ইন্দ্রিয় সুখ। মানুষ যখন বুঝিতে পারিল যে ব্যক্তিগত সুখের চেয়ে সমাজের হিত বেশী মূল্যবান,—ব্যষ্টির তৃপ্তি সমষ্টির তৃপ্তির নিকট অতি হেয়,—লোকে যখন সম্যকরূপে বুঝিতে সমর্থ হইল যে "আমাদের ধন, জন, বিবাহ ইন্দ্রিয়সুখের বা নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নয়"—তখন গান্ধর্ব্ব-বিবাহ বর্জ্জন করিয়া সমাজ দ্রুতগতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইল। বস্তুতঃ ভালবাসা যদি বিবাহের মূলসূত্র বলিয়া পরিগণিত হয় তবে আত্মতৃপ্তি প্রচুর পরিমাণে হইতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু সমাজের মঙ্গল কি পরিমাণে সাধিত হইবে তাহা চিন্তার বিষয়। তাই Sir Adam Paul বলেন—"Love can not be adequate basis for marriage, because the latter is a social institution existing on the benefits of society. A young girl should not marry for love a penny-less fellow, for their children will not receive their due, seeing that education is an expensive matter. So also, an old man of fifty should not marry and thereby frustrate the legitimate hopes of their nephews and nieces."

সামাজিক জীবনের প্রয়োজন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন আর্য্যসমাজ সংস্কারকগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আত্মতৃপ্তির মধ্যে সমাজ দৃঢ়ভাবে গঠিত হইয়া উঠিতে পারে না। তাই তাঁহারা অতি প্রাচীনযুগেই মেঘ-মন্দ্র-স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে, মানবজীবন শুধু আত্মতৃপ্তিতে উন্মত্ত Gay Butterfly হইয়া ঘুরিবার জন্য নহে;—তাই প্রাচীন আচার্য্যগণ যুগে যুগে ত্যাগের মহিয়সী মন্ত্র জগতকে শুনাইয়া আসিয়াছেন। ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত ভারতীয় সমাজে গান্ধর্ব্ব-বিবাহও আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। পাশ্চাত্য সমাজে গান্ধর্ব্ব বা courtshipএর

বিবাহের পরিণাম আমরা প্রতিনিয়ত সংবাদপত্রের স্তম্ভে দেখিতে পাই। কিছুদিন হয় চিগাগো সহরের এক Justice আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—"Marriage has been proved to be a failure in this country. পাশ্চাত্য সমাজে প্রস্ফুটযৌবন নরনারী courtshipএর সময়ে নিজের অভ্যাসগত বা চরিত্রগত দোষ যথাসম্ভব গোপন রাখিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকে, তাই পরস্পরের দোষ কাহারও চোখে ধরা পড়ে না। পরিণয়ান্তে নিশ্চিন্তাবস্থায় প্রকৃতির প্রভাব চরিত্রের উপর পূর্ণমাত্রায় প্রকট হয়, তখন নানা কারণে মনোমালিন্য উপস্থিত হয়; এবং সেই মনোমালিন্য পরিশেষে বিবাহবিচ্ছেদে পর্য্যবসিত হয়। পাশ্চাত্য সমাজে বিবাহবিচ্ছেদের এত ছড়াছড়ি দেখিয়া মনে হয় যে অচিরে তদ্দেশীয় সমাজ বিবাহপ্রথার পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইবে।

"সমাজের জীবন"

ভারতীয় সমাজে আসুর, রাক্ষস, পৈশাচ, গান্ধর্ব্ব, ব্রাহ্ম প্রভৃতি অষ্টবিধ বিবাহ প্রথা ব্যতীত অন্য প্রকার বিবাহ প্রথাও প্রচলিত ছিল। তবে ঐ প্রথা ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ক্ষত্রিয়গণের অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে বীর্য্যশুল্কা কন্যা বিবাহের প্রচলন হয়। ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ কন্যা বিবাহের উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হইলে অন্যান্য রাজগণকে স্বগৃহে আমন্ত্রণ করিতেন। সমবেত রাজেন্দ্রমণ্ডলী মধ্যে কন্যা একজনকে বরণ করিতেন। রাজকন্যার সখী বা পরিচারিকা তাঁহাকে নিয়া সভাতে উপনীত হইয়া এক এক করিয়া সভাস্থ রাজগণের পরিচয় ও বংশগৌরব কীর্ত্তন করিতেন; তখন যাঁহাকে পছন্দ হইত কন্যা তাহারই গলায় পুষ্পমাল্য প্রদান করিতেন; পরে বিবাহের অন্যান্য আনুষ্ঠানিক কার্য্য সম্পন্ন হইত। এই প্রথার নাম "স্বয়ম্বর"। রাজকন্যাগণ এই ভাবে তাহাদের ইচ্ছামত পতিলাভ করিতে পারিতেন সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাকে গান্ধর্ব্ব বা বর্ত্তমান courtship বিবাহের সহিত তুলনা করা চলে না। তবে এই প্রথাতে কন্যা প্রধানতঃ রূপবান ব্যক্তিকেই স্বামীত্বে বরণ করিত। অনেক সময় আমন্ত্রিত রাজেন্দ্রমণ্ডলীকে একে একে স্বীয় স্বীয় বীর্য্যের পরীক্ষা দিতে হইত। এই ভাবে বীর্য্যপরীক্ষায় হরধনু ভঙ্গ করিয়া রামচন্দ্র সীতাকে এবং অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করেন। এই বিবাহ-প্রথার নাম "বীর্য্যশুল্কাবিবাহ"। স্বয়ম্বর সভা যোদ্ধ ক্ষত্রিয়গণের ঈর্ষার বিষে অনেক সময় রণক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। বীরত্ব গৌরবে গৌরবান্বিত ক্ষত্রিয়গণ অনেক সময় স্বয়ম্বর সভা হইতে কন্যাকে অপহরণ করিয়াছেন। এই কার্য্যে কন্যার আত্মীয় স্বজন এবং অন্যান্য রাজন্যবর্গ অনেক ক্ষেত্রে বিষম বাধা প্রদান করিয়াছেন। তখন সেই অপহরণকারী বীর বাহুবলে সমবেত ক্ষত্রিয় সমাজকে পরাজিত করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন। ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ এই বিবাহকে অত্যন্ত গৌরবের কার্য্য মনে করিতেন। যোদ্ধজাতি ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে এই প্রথা নিন্দনীয় ছিল না বটে; কিন্তু এই বিবাহে ভারতের ভাগ্যাকাশ অনেকবার আত্মকলহের তীব্রবিষে সমাচ্ছন্ন হইয়া ভারতের দুর্দ্দশারই সূচনা করিয়াছে। অতি প্রাচীন যুগ হইতে ভারতবর্ষ বিবাহ সংস্কারকে এক ধর্ম্মসংস্কার বলিয়া ধরিয়া নিয়াছে। এবং পতিপত্নীর সম্বন্ধকে জন্মান্তর বিশ্বাসী ভারতীয়গণ জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধ

বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এবং এই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সমাজ বিবাহ সংস্কারকে শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখিয়াছেন। স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধকে চিরন্তন করিবার জন্য বোধহয় সুপ্রাচীন যুগেই সহধর্ম্মিনীকে মৃতপতির সহগামিনী করিবার প্রচলন হইয়াছিল।

সহমরণ প্রথা অতি প্রাচীনকালেই ভারতীয় সমাজে আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই প্রথাটী যে কত প্রাচীন তাহার সঠিক নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কিন্তু ইহাও নিশ্চিত সত্য যে, উক্ত সহমরণ প্রথা শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। জগতের অন্যান্য প্রদেশেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল তাহা প্রাচীন ইতিহাস পাঠে সম্যক অবগত হওয়া যায়। প্রাচীন ঐতিহাসিক হেরডোটাস বলেন,—"প্রাচীন শাকদ্বীপবাসীগণের কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার পত্নীগণকে শ্বাসরোধ করিয়া হত্যাপূর্ব্বক মৃত স্বামীর সহিত সমাধিস্থ করা হইত।" প্রাচীন-কালে গ্রীসদেশেও সহমরণ প্রথা ছিল। আফ্রিকার গিনি নিগ্রোদের কোন সর্দ্দারের মৃত্যু হইলে তাহার বহুসংখ্যক পত্নীকে সহমরণের জন্য হত্যা করা হইত। আশাণ্টি ও দাহোমি রাজ্যে এই প্রথা ছিল। নিউজিলাণ্ডে সহমরণের প্রচলন ছিল। পেরুদেশের রাজার দেহান্তর ঘটিলে তাঁহার স্ত্রীগণ উদ্বন্ধনে সহমরণ করিতে বাধ্য হইত। কথিত আছে তৈমুরলঙ্গের মৃত্যু হইলে তাহার বহুসংখ্যক পত্নীকে হত্যা করিয়া সহগামিনী করা হইয়াছিল। আপস্তম্ব স্মৃতিতে বিধবার জন্য দুইটী পথ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে একটী সহমরণ এবং অপরটী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন। প্রাচীন পুস্তকাদি, রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণাদিতে মাঝে মাঝে সহমরণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে সহমরণ প্রথা ভারতে কি ভাবে প্রচলিত ছিল, তাহা নিশ্চিতরূপে বুঝা যায় না। বৈদিকমন্ত্রাদিতে এবং উহার সায়নাচার্য্যকৃত ভাষ্যে যেটুকু পাওয়া যায় তাহাতে একটা সন্দেহের ছায়াই আমাদের মনে পতিত হয়। যথা:—

"উদীর্ষ নার্য্যভি জীবলোকমিতাসুমেতমুপশেষ এহি হস্তগ্রাভস্যাদিধিষো স্তমেৎ পত্যুর্জনিত্বমভিসংবভুব॥"
(কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ৬ প্রপাঠক, ১ অনুবাদ ১৪ মন্ত্র)

সায়নভাষ্য:—"তাং প্রতিগতঃ সব্যে পানাবভি-পাদ্যোত্থাপয়তি—ইতি। হে 'নারি' তং "ইতাসুং" গতপ্রাণং "এতং" পতিং "উপশেষে" উপেত্য শয়নং করোষি "উদীর্ষ" অস্মাৎ পতিসমীপদুত্তিষ্ঠ "জীবলোকমতি" জীবন্তং প্রাণীসমূহমভিলক্ষ্য "এহি" আগচ্ছ। "ত্বং" "হস্তগ্রাভস্য" পানিগ্রাহ-বতঃ "দিধিষোঃ" পুনর্ব্বিবাহেচ্ছোঃ "পত্যুঃ" এতৎ "জনিত্বং" জায়াত্বং "অভিসংবভূব" অভিমুখেন সম্যক প্রাপ্নুহি॥" অর্থাৎ ঋত্বিক মৃতপতিপার্শ্বে চিতাশয্যায় শয়ানা নারীর বামহস্ত ধারণপূর্ব্বক বলিতেছেন—"তুমি মৃত পতির সমীপে শয়ন করিতেছ। তাহার নিকট হইতে উত্থিত হইয়া জীবিত লোকের নিকট আগমন কর। তুমি সম্যকরূপে তোমার পুনঃ পাণিগ্রহণাভিলাষী পতির ভার্য্যা হও।" উক্ত বৈদিক মন্ত্রে ইহা স্বতঃই মনে হয় যে, ঐ মন্ত্রটী সহমরণের অপেক্ষা বিধবার পুনর্ব্বিবাহের সাপক্ষেই রচিত হইয়াছে। ইহার উত্তরে জিজ্ঞাস্য হইতেছে এই যে, যদি সহমরণের প্রথা প্রচলিত নাই ছিল, তবে মৃতপতির সহিত চিতাশয্যায় শয়ন করিবার তাৎপর্য্য কি? এবং এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক স্বামীহীনা মৃতপতির পার্শ্বে শয়ানা নারীকে পত্যন্তর গ্রহণে উদ্বোধিত করার কিইবা প্রয়োজন ছিল? এই বৈদিকমন্ত্রে এবং অন্যান্য সমর্থক বৈদিকমন্ত্রে এই অনুমান বোধ হয়

অসঙ্গত হইবে না যে, বৈদিক সময়ে সহমরণ বাধ্যতামুলক ছিল না। যাহার ইচ্ছা হইত তিনি পত্যন্তর গ্রহণ করিতেন—এবং কেহ কেহ স্বইচ্ছায় পতির সহিত চিতানলে ভস্মীভূত হইতেন। * তবে স্বভাবতঃ পতিপরায়ণা স্বামী সোহাগিনী পত্নিগণ পতিবিরহ দগ্ধ জীবনভার দুর্ব্বহ মনে করিয়া জ্বলন্ত চিতায় জীবন বিসর্জ্জন দিতেন। যথা উক্তঞ্চ বিষ্ণু পুরাণে :—

"অষ্টৌ মহিষ্যঃ কথিতা রুক্মিণীপ্রমুখাস্ত যাঃ।
উপগুহ্য হরের্দেহং বিবিশুস্তা হুতাশনম্॥ ২
রেবতীচৈব রামস্য দেহমশ্লিষ্য সত্তম।
বিবেশ জ্বলিতং বহ্নি তৎসঙ্গাহ্লাদ শীতলম্॥ ৩

৩৮ অধ্যায়, ৫ম অংশ—

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসানে যদুবংশ ধ্বংসের পরে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের মৃত্যুর পরে রুক্মিণ্যাদি কৃষ্ণের প্রধানা অষ্টমহিষী এবং রামমহিষী রেবতী পতির সহিত চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। মহাভারতে আমরা দেখিতে পাই, পাণ্ডু রাজার মৃত্যু হইলে তদীয় দ্বিতীয়া পত্নী পতির সহিত সহমৃতা হইয়াছিলেন। কৃষ্ণের অন্যান্য মহিষীগণ আভীর প্রভৃতি দস্যুগণের সহিত চলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া মহাভারতেই উল্লেখ আছে। রাজা দশরথের মৃত্যু হইলে পর কৌশল্যাদি প্রধানা মহিষীগণ সহমরণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়াও কোন উল্লেখ রামায়ণে নাই; কিংবা তাহারা উক্ত বৈদিক মন্ত্রানুযায়ী পতির চিতাশয্যায় শয়ন করিয়া কোনরূপ অভিনয় করিয়াছিলেন বলিয়াও কোন কথা রামায়ণে নাই। বানররাজ বালীর মৃত্যুর পর রাণী তারা দেবরকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি মৃতপতির চিতাশয্যায় শয়ন করিয়া পুনরায় উঠিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াও কোন কথা নাই। এই সমস্ত কারণে মনে হয় বৈদিকযুগে পত্নীর ইচ্ছানুসারে বিধবা বিবাহ বা সহমরণ প্রচলিত ছিল। নতুবা শুধু শুধু মৃতপতির চিতায় শয়ন করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না।

ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের মতে ক্ষতাক্ষত যে কোন রমণী পত্যন্তর গ্রহণ করিতেন তাহাকে "পুনর্ভু" বলা হইত। যথা :—অক্ষত চ ক্ষতা চৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতঃ পুনঃ। ১৬৭—যাজ্ঞবল্ক্য।

বশিষ্ঠ বলেন :—

পাণি প্রাহিস্মৃতে বালা কেবলং মন্ত্র সংস্কৃতা।
সা চেদক্ষতযোনিঃ স্যাৎ পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥১৭অঃ

উক্ত বচনে অক্ষতাযোনি স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ সংস্কার হইতে পারে বলিয়া বিধান দেওয়া হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মানবসভ্যতার আদিযুগে বিবাহ বন্ধনাদি কোন প্রকার কার্য্য সমাজে প্রচলিত ছিল না। তখন ইচ্ছামত আহার বিহার এবং মৈথুনাদি সম্পন্ন হইত। সেই যুগে মাতৃগমন কেবল মহাপাতক বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছিল; যথা :—"ন গচ্ছেৎ জায়িকা জাতা গমনে চাতি পাতকঃ।" পরবর্ত্তী যুগে নানা সামাজিক পরিবর্ত্তনের মধ্যে আবশ্যকানুযায়ী বিধি ব্যবস্থা সমাজ রক্ষার জন্য প্রচলিত হইতে লাগিল এবং প্রয়োজনানুসারে ঐ সমস্ত বিধি ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত,পরিবর্দ্ধিত ও সংস্কৃত হইয়া নূতন বিধি ব্যবস্থা সমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। প্রাচীনযুগে দ্বিজাতির অসবর্ণা বিবাহ, স্বামীহীনার দেবরদ্বারা পুত্রোৎপাদন, মধুপর্কে পশুবধ, শ্রাদ্ধে মাংসদান, বানপ্রস্থগমন, অক্ষতা বিধবার পুনর্ব্বিবাহ, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য,

* বিক্রমপুরে আজও অনেক সহমরণ কীর্ত্তি-কলাপের চিহ্ন বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে বেজগাঁ সতী ঠাকুরাণীর মঠ। "বিক্রমপুর" দ্বিতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

নরমেধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞ, গোমেধ, মহাপ্রস্থান প্রভৃতি বিধি ব্যবস্থা সমাজে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন সমাজে আমরা ক্ষেত্রজপুত্রের বিধিও দেখিতে পাই ; কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে এই সমস্ত বিধি ব্যবস্থা নিষিদ্ধ বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। যথা :—

"সমুদ্রযাত্রাস্বীকার কমণ্ডলুবিধারণম্।
দ্বিজানামসুবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা ॥ ১৩
দেবরেণ সুতোৎপত্তি মধুপর্কে পশোর্বধঃ।
মাংসদানং তথা শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা ॥ ১৪
দত্তাক্ষতায়াঃ কন্যায়া পুনর্দানং পায়স্য চ।
দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ ॥ ১৫
মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধঞ্চ তথামথম্।
ইমানধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহুর্মনীষিণঃ ॥ ১৬

বৃহন্নারদীয় পুরাণম্, ২৩ অঃ—

অতি প্রাচীনযুগে আর্য্যগণ বিবাহাদি কার্য্য অতি সতর্কতার সহিত সম্পাদন করিতেন। তখনকার সমাজে অনুলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণ চারিবর্ণের কন্যা, ক্ষত্রিয় তিনবর্ণের কন্যা, বৈশ্য দুইবর্ণের কন্যা এবং শূদ্র কেবল শূদ্র কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিত। আর্য্যগণের ইচ্ছা ছিল না যে, কোন উচ্চবর্ণের রমণী ও নিম্নবর্ণের পুরুষের সম্মিলনে প্রজাবৃদ্ধি হয়। তৎকালে শরীরের বর্ণদ্বারা জাতি নির্ণয় হইত। এই সমস্ত বিধানের ব্যতিক্রমে বর্ণব্যত্যয় ঘটিবার আশঙ্কায় আর্য্যগণ প্রতিলোম সম্মিলনের পক্ষপাতী ছিলেন না।

অতি প্রাচীনযুগে সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে একাদশ প্রজাপতি সমস্ত ব্রহ্মাবর্ত্ত অধিকার করিয়া নিজ নিজ অধিকৃত ভূমি সীমাবদ্ধ করিয়া নিয়াছিলেন। এই সমস্ত প্রজাপতিগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। কালক্রমে প্রজাপতিগণ রাজ্যশাসনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় তসস্যার বিঘ্ন উপস্থিত হয় ; তখন একাদশ প্রজাপতি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য সম্মিলিত হন। সেই সম্মিলনীতে প্রস্তাব করা হয় যে, প্রজাপালন এবং রাজ্যশাসনাদি কার্য্য ক্ষত্রিয়ের হস্তে প্রদান করা হউক। প্রজাপতি কশ্যপ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, রাজ্যশাসনাদি ক্ষত্রিয়ের হস্তে অর্পিত হইলে তাহারা নিতান্ত গর্ব্বিত হইয়া উঠিবে এবং ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত হইবে। অন্যান্য প্রজাপতিগণ এই আপত্তিতে কর্ণপাত না করিয়া ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বেণকে প্রজাপালনের ভার অর্পণ করেন। প্রজাপতি কশ্যপ তখন সদলবলে নিজ অধিকৃত ভূমি কাশ্মীররাজ্যে চলিয়া যান এবং নিজেই তাহা শাসন করিতে থাকেন। কাশ্মীর প্রদেশে বহুকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের অধিপত্য ছিল। রাজা হইতে মেথর পর্য্যন্ত সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। বহু পরবর্ত্তী যুগেও কাশ্মীরবাসীগণের বর্ণব্যত্যয় ঘটে নাই শুভ্র শ্বেতকান্তি বর্ণসঙ্কর দোষে কলুষিত হয় নাই।

কালক্রমে বেণ রাজা ক্ষমতামদে গর্ব্বিত হইয়া ব্রাহ্মণের বিধানের উপর হস্তক্ষেপ করতঃ প্রতিলোম বিবাহ সমাজে প্রচলিত করিলেন। প্রজাপতিগণ তাদৃশ বিধান প্রত্যাহার করিতে বলিলেন। বেণ প্রজাপতিগণের আপত্তিতে কর্ণপাত করা কর্ত্তব্য বোধ করিলেন না। এই বিষমযোগের সন্তানগণ কেহ পিতার, কেহ মাতার, কেহবা উভয়ের মিশ্রিত বর্ণ পাইতে লাগিল। ভারতভূমিতে তখন ঘোর বর্ণসঙ্কর উপস্থিত হইল। শরীরের রং দেখিয়া জাতি নির্ণয় অসাধ্য হইয়া উঠিল। সেই সময় হইতেই মূল চারিজাতির সহিত আটটী সঙ্কর জাতি মিশ্রিত হইয়া বারটী জাতি হইল। অবশেষে প্রজাপতি-গণ বিরক্ত হইয়া বেণকে বলপূর্ব্বক রাজ্যচ্যুত করিয়া তৎপুত্র পৃথুকে রাজ্যভার অর্পণ করেন।

শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া পৃথু প্রতিলোম বিবাহ নিষিদ্ধ বলিয়া প্রচার করেন

ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয়গণ শৌর্য্যবীর্য্যে অতিশয় পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তাহারা রাক্ষস, অসুর গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি যে কোন জাতীয়া কন্যা বিবাহ করিত এবং তাহাদের সন্তানেরা বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইত। এই সমস্ত স্বেচ্ছাচারিতার ফলে ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে বর্ণসঙ্কর উপস্থিত হইয়া নানাবর্ণের লোক দৃষ্ট হইতে লাগিল। সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ তাঁহাদের কন্যা ব্রাহ্মণ সহ বিবাহ দিতেন। তাহাদের গর্ভজাত সন্তানগণ ব্রাহ্মণই হইতেন। চক্রবর্ত্তী মান্ধাতার অজ্ঞা নামে এক কৃষ্ণবর্ণা কন্যা ছিলেন। ভৃগুবংশজাত সানন্দ মুনির সহিত তিনি বিবাহিতা হন। তৎপুত্র ঋচীক কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন। তাহার যজ্ঞোপবীত ধারণের সময় অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ "কৃষ্ণবর্ণ কথং দ্বিজঃ" বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করেন। বহু তর্ক বিতর্কের পর মান্ধাতা, রাজপুরোহিত বশিষ্ঠ ও ভৃগুর অনুরোধে এই বিধান করা হইল যে, ব্রাহ্মণের ঔরসে যে কোন জাতীয়া কন্যার গর্ভজাত পুত্র গুণবান হইলে ব্রাহ্মণ হইবে, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণ ব্যতীত যে কোন বর্ণীয়া কন্যার গর্ভজাত পুত্র গুণবান হইলে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের ঔরসে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ব্যতীত যে কোন জাতীয়া কন্যার গর্ভজাত গুণবান পুত্র বৈশ্য হইবে। অপিচ ব্রাহ্মণের ঔরসজাত না হইলে যত কেন গুণবান হউক না সে ব্রাহ্মণ হইতে পারিবে না; কিন্তু ব্রাহ্মণীগর্ভে দেবতার ঔরসজাত পুত্র সুব্রাহ্মণ হইবে।

মনুসংহিতার যুগেও এই প্রকার বিবাহের সন্তানগণকে আর্য্য বলিয়া স্বীকার করা হইত। কিন্তু তৎকালে আর্য্যগণের ইচ্ছা ছিল না যে, কোন কৃষ্ণকায় অনার্য্য শুভ্রকান্তি আর্য্যনারীর পাণিগ্রহণ করুক। আর্য্য অনার্য্যের হৃদয়ের অন্তস্থলে বহুকালব্যাপী শত্রুভাব পোষণের ফলে আর্য্যগণ নিকৃষ্ট বলিয়া অনার্য্যগণকে ঘৃণার চক্ষেই দেখিতেন এবং আর্য্যসমাজে স্থান দিলেও বিশেষ বিশেষ অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হইয়াছিল। বেদ পাঠ অনার্য্যগণের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। অনার্য্যপুরুষের সহিত আর্য্যনারীর সম্মিলন যাহাতে না হয় আর্য্যগণ তৎপ্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখিতেন। এবং এই প্রকার সম্মিলন যাহাতে না ঘটিতে পারে তজ্জন্য ঐরূপ মিলনের ফলোৎপন্ন সন্তানগণকে অনার্য্যের গণ্ডীতে ফেলিয়া বেদপাঠাদি বিশেষ অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। কিন্তু আর্য্য পুরুষগণ তৎকালে অনার্য্যা পত্নীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিতেন এবং তাহারা আর্য্য সমাজেই গৃহীত হইত। যথা:—

"জাতো নার্য্যামনার্য্যায়ামার্য্যাদার্য্যো ভবেদ্‌গুণৈঃ;
জাতোঽপ্যনার্য্যাদার্য্যায়ামনার্য্য ইতি নিশ্চয়ঃ॥"

মনুসংহিতা, ১০ অধ্যায়, ৬৭ শ্লোক—

অর্থাৎ আর্য্য ও অনার্য্যার সংমিশ্রণের ফলে যে সন্তান হইত তাহারা গুণবান হইলে আর্য্য হইত, এবং অনার্য্য এবং আর্য্যার সংমিশ্রণে যে সন্তান হইত তাহারা অনার্য্যই হইত। এক কথায় তখন হইতে ভারতে আর্য্য অনার্য্য শোণিত মিশ্রণ আরম্ভ হইয়াছিল। আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ও কৃষ্ণাকায়া নিগ্রো রমণীর সম্মিলনে "মুলাটো" জাতির উদ্ভব হইয়াছে; কিন্তু ঐ দেশে কোনও শ্বেতাঙ্গিনী প্রকাশ্যভাবে কোন কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রোকে পতিত্বে বরণ করিতে নারাজ; কিন্তু অনেকক্ষেত্রে নাকি অনেক শ্বেতাঙ্গিনীর পাশবিক বৃত্তি চরিতার্থতার জন্য কৃষ্ণাঙ্গ গুপ্তপ্রণয়ী আছে, এবং এই সম্মিলনের ফলে উৎপন্ন সন্তানগণকে

শ্বেতাঙ্গিনীগণ লোকলজ্জাভয়ে আপন সন্তান বলিয়া স্বীকার করেন না—তাহারা "মুলাটো" জাতির পুষ্টিই সাধন করে। সেই যুগে বোধ হয় আমেরিকার শ্বেতাঙ্গিনীর মত আর্য্য শ্বেতাঙ্গিনীগণ মাঝে মাঝে পশুবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য অনার্য্য উপপতির প্রেমভিক্ষা করিতেন। সেই যুগে বর্ণের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য অনার্য্যগণকে বেদপাঠাদি এবং স্বধ্যায় বষট্‌কারাদি অধিকার হইতে বিচ্যুত করিয়া কঠোর বিধিব্যবস্থা প্রচলন করিতে আর্য্যগণ বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রাচীন যুগে আর্য্যগণ অনার্য্যগণের উপরে অকথ্য অত্যচার করিতেন বলিয়া বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী পণ্ডিতগণ প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের প্রভূত নিন্দাবাদ করেন। অনার্য্যগণের উপর কিয়ৎ পরিমাণে নির্য্যাতন যে না হইত তাহা নহে; কিন্তু কোন্ দেশ কোন্ বিজয়ীজাতি কোন্ বিজিত-দিগের উপর অত্যাচার না করিয়াছেন? পাশ্চাত্য-জাতিগণ অনেকস্থলে দেশ বিজয়ের পর অনেক মূলজাতির সমূলে উচ্ছেদ সাধন করিয়াছেন ইহার সাক্ষ্য ইতিহাস এখনও দেয়। আমেরিকার শ্বেতাঙ্গগণ নিগ্রোদের উপর কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও কি নির্য্যাতন করিয়াছেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে ইয়ুরোপীয়-গণ, আর্ম্মেনিয়াতে তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট কি ভাবে কি নির্য্যাতন করেন—তাহাও কাহারো অবিদিত নাই। সত্য বটে, শূদ্রের বেদপাঠ ও শ্রবণে রসনাচ্ছেদ ও কর্ণে উত্তপ্ত সীসা ঢালিয়া মৃত্যুর ব্যবস্থা মনুসংহিতা প্রকাশ্যভাবে প্রচার করিয়াছেন; বেদপাঠ ও স্বাধ্যায় বষট্‌কারাদি দ্বিজাতির বিশেষ অধিকার। অনুপনীত শূদ্র ও অনুপনীত স্ত্রীজাতির পক্ষে ঐ সমস্ত নিষিদ্ধ বলিয়া মনুসংহিতা প্রচার করিয়াছেন। প্রাচীন যুগে আমরা দেখিতে পাই যে আর্য্যনারীর পক্ষে বেদপাঠ নিষিদ্ধ ছিল না; এমন কি, কোন কোন আর্য্যনারী কোন কোন বৈদিক সূক্তেরও রচনা করিয়াছেন। তখনকার স্ত্রীজাতির পক্ষেতো বেদপাঠ নিষিদ্ধ ছিল না। তবে ইহার পরে নিষিদ্ধ বলিয়া কেন প্রচারিত হইল? অনু-সন্ধিৎসুক হৃদয়ে এই বিষয়ে চিন্তা করিলে বেশ বুঝা যায় যে যখন আর্য্য অনার্য্যের সংমিশ্রণ আরম্ভ হয় তখনই বেদপাঠ স্ত্রীজাতির পক্ষে নিষিদ্ধ বলিয়া প্রচারিত হয়।

বেদের সৃষ্টির সময়ে অক্ষর ও লিখন প্রণালীর উদ্ভব হয় নাই। তখন এই বেদবিদ্যা মুখেমুখেই পুরুষানুক্রমে প্রচারিত হইত। ঋগ্বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ। ঋগ্বেদের বহু অংশ রচনার পর অক্ষর ও লিখন প্রণালীর প্রচলন হয়। ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে—"মিণীহি শ্লোকমাস্যে"—অর্থাৎ তোমরা মুখে মুখে শ্লোক রচনা কর। বিষ্ণুপুরাণে উল্লেখ আছে যে, ত্রেতার প্রথমে বেদ লিখিত হয়। যথাঃ—ত্রেতায়াং প্রথমে ব্যস্তাঃ স্বয়ং বেদাঃ স্বয়ম্ভুবা"—৩ অংশ ১১। ৩ অঃ। ত্রেতাযুগের পূর্ব্ব হইতেই আর্য্যানার্য্যের সংমিশ্রণ আরম্ভ হইয়াছিল। প্রাচীন আর্য্যগণের বিশ্বাস ছিল যে বেদমন্ত্রসকল বিশুদ্ধ ভাবে উচ্চারণ না করিতে পারিলে উহারা কোন কার্য্যকরী হয় না। তজ্জন্য প্রাচীন ঋষিগণ উহার উচ্চারণের বিশুদ্ধতার জন্য সর্ব্বদা প্রখর সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন; এবং মন্ত্রসকল উচ্চারণের দোষে যাহাতে অবিকৃত না হয় তজ্জন্য বিশেষ যত্ন নিয়াছেন। এই জন্য আর্য্যবালককে কিছুদিন পর্য্যন্ত বিদ্যা-শিক্ষায় পণ্ডিত হইবার জন্য আচার্য্যের আশ্রমে বাস করিতে হইত। বেদবিদ্যা তৎকালে মুখে মুখে থাকায় আচার্য্যগৃহে অবস্থান ভিন্ন ইহা

শিক্ষা করা সম্ভবপর ছিল না। মন্ত্রের ভাষা অবিকৃত রাখার জন্য শূদ্রের নিকট হইতে ইহা যথাশক্তি গোপনে রাখা হইত। কারণ অনার্য্যগণ আর্য্যগণ হইতে এক ভিন্ন ভাষা ভাষী ছিল। স্ত্রীলোকের বহুদিন গুরুগৃহে থাকিয়া বিদ্যা অভ্যাস করা অসুবিধাজনক ছিল বলিয়াও বটে, এবং আর্য্যসমাজে বহু অনার্য্যনারীর সম্মিলনে এবং বহু আর্য্যনারীর অনার্য্যপুরুষে আসক্তিতেও বটে, পরবর্ত্তী যুগে বেদবিদ্যা স্ত্রীলোকের পক্ষে নিষিদ্ধ বলিয়া প্রচারিত হইয়া থাকিবে। আর্য্যগণ বোধহয় আশঙ্কা করিতেন যে স্ত্রীজাতি বেদ শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে অনার্য্যগণের নিকট তাহা বহুলাংশে প্রকাশ হইয়া পড়িবে এবং মন্ত্র সকল বিকৃত হইয়া পড়িবে। অনার্য্যগণের নিকট হইতে গোপন রাখার এই যে প্রাণপণ চেষ্টা তাহা কেবল বেদের ভাষার জন্য; কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য কাহারও নিকট হইতে গোপন রাখার যত্ন করা হইয়াছে বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। বেদের তাৎপর্য্য সাধারণ্যে প্রচার উদ্দেশ্যে পরবর্ত্তী যুগে শিক্ষা-কল্প-পুরাণাদি নানা সাহিত্য এবং স্মৃত্যাদি নানা শাস্ত্রের রচনা করা হইয়াছিল। আর্য্যগণ অনার্য্যগণকে বিশেষ অধিকার হইতে বিচ্যুত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু আর্য্যগণ অনার্য্যগণকে নিজেদের সমাজ হইতে নিজেদের সভ্যতা হইতে একেবারে নির্ব্বাসিত করেন নাই। বরং তাহাদের রীতিনীতি বহুলাংশে নিজেদের সমাজে প্রচলন করিয়া ভ্রাতৃত্ববন্ধনের প্রকৃষ্ট নিদর্শনই প্রদর্শন করিয়াছেন।

ফলতঃ ত্রেতাযুগের প্রারম্ভ হইতেই আর্য্য সমাজে অনুলোম বিবাহের প্রচলন আরম্ভ হইয়াছিল এবং মহাভারতীয় যুগে ঐ প্রকার বিবাহ সমাজে যে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল তাহার ইতিহাস পুরাণাদি পাঠে সম্যক অবগত হওয়া যায়। পাঞ্চালবংশীয় বৃদ্ধশ্ব রাজার কন্যা অহল্যা গৌতম ঋষির সহিত বিবাহিতা হইয়াছিলেন। চন্দ্রবংশীয় গাধির তনয়া সত্যবতী ঋচিক ঋষির সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। চন্দ্রবংশীয় রাজা শান্তনুর অনার্য্য দাসরাজের কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ, ভীমসেনের রাক্ষস-কন্যা হিরিম্বাকে বিবাহ প্রভৃতি ঘটনায় ইহা স্বতঃই মনে হয় যে, পৌরাণিক যুগে আর্য্যসমাজে অনুলোম বিবাহ পূর্ণেচ্ছামেই সংঘটিত হইত। শান্তনুর ঔরসজাত দাসরাজ-কন্যার গর্ভজাত চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য একসময়ে ভারতসম্রাটের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ব্রাহ্মণ পরাশরের ঔরসজাত অনার্য্যকন্যার গর্ভজাত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস ভারতেতিহাসে এক মহিমময় অঙ্কের অভিনয় করিয়াছিলেন। মহাভারতীয় যুগে বহুল পরিমাণে অনার্য্য সম্মিলনে আর্য্যসমাজ গঠিত হইয়া উঠিতেছিল। আর্য্যপুরুষ তখন বহু অনার্য্যনারীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং ঐ সমস্ত অনার্য্যাগর্ভজাত পুত্রগণ আর্য্য বলিয়াই পরিচিত হইত। সেই যুগে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আর্য্যগণ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন অনার্য্য সংস্পর্শে তত্তৎপ্রদেশের পারিপার্শ্বিক আচার ব্যবহার নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করায় ভারতীয় সমাজ কিয়দ্দিবস পরে প্রাদেশিক ভাবে গঠিত হইয়া উঠে। পুরাণাদি শাস্ত্র অনুসন্ধান করিলে আর্য্যানার্য্যের অনুলোম সম্মিলনের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়; কিন্তু প্রতিলোম বিবাহের কোন দৃষ্টান্ত পুরাণাদি শাস্ত্র তন্ন তন্ন করিয়া ঘাটিলেও বোধ হয় পাওয়া যাইবে না। দুই এক স্থলে ইহার ব্যতিক্রম হইলেও হইতে পারে, কিন্তু এই প্রকার মিলন আর্য্যগণ সামাজিক

ভাবে গ্রহণ ত করেনই নাই, বরং ঐ প্রকার মিলনের সন্তানগণকে আর্য্য সমাজ হইতে দূরেই রাখিয়াছিলেন; এবং এই প্রকার মিলনের ইতিহাসকে সযত্নে গোপনেই রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যে স্থলে আর্য্যগণের বহুল প্রয়াস স্বত্বেও উত্তমবর্ণের নারী এবং অধমবর্ণের পুরুষের সংযোগে সন্তান হইয়াছে আর্য্যসমাজ তাহাদিগকে শূদ্রের গণ্ডীতে ফেলিয়া বিশেষ অধিকার হইতে বিচ্যুত করিয়াছেন। যথা,—ব্যাসসংহিতা (১।৮)— "অধমাদুত্তমায়ান্তু জাতঃ শূদ্রাধমঃ স্মৃতঃ।" মহাভারত অনুশাসন প্রচার করিতেছেন যে :—

"চাণ্ডালো ব্রাত্য বৈষ্ণৌ চ ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াসু চ।
বৈশ্যায়াঞ্চৈব শূদ্রস্য লক্ষ্যন্তেঽপসদাস্ত্রয়ঃ ॥"

অনুশাসন পর্ব্ব, ৪৮।৭

অর্থাৎ শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণীতে উৎপন্ন পুত্র চণ্ডাল, ক্ষত্রিয়াতে উৎপন্ন পুত্র ব্রাত্য, বৈশ্যাতে উৎপন্ন পুত্র বৈদ্য। এই তিন জাতি অতি নিকৃষ্ট। আর্য্যসমাজ আর্য্যপুরুষগণের পক্ষে অসবর্ণ বা অনুলোম বিবাহ শাস্ত্র বিধানে স্বীকার করিয়াছেন সত্য; কিন্তু গুণহীন হইলে তাহাদিগকে মাতৃবর্ণেই ফেলিয়া রাখিয়াছেন। বিষ্ণু সংহিতা বিধান দিতেছেন যে,—"সমানবর্ণাসু পুত্রাঃ সবর্ণা ভবন্তি। অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ প্রতিলোমাস্বার্য্যবিগর্হিতাঃ ॥" (১৬।১-৩) অর্থাৎ সমানবর্ণের ফলোৎপন্ন পুত্র সমান বর্ণ, অনুলোম সম্মিলনের সন্তান মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইবে। প্রতিলোম বিবাহ আর্য্যবিগর্হিত। এইরূপ প্রতিলোম বিবাহের সন্তানগণ শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে মাতার বর্ণই প্রাপ্ত হইয়াছে। মনু বলিতেছেন :— "ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে"—১০অঃ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্য কন্যার সংযোগে অম্বষ্ঠ জাতির উৎপত্তি। এইরূপে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যানারীর মিলনে মাহিষ্য এবং ব্রাহ্মণ ও অম্বষ্ঠার সহযোগে আভীর নামক সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হয়। এইরূপ প্রতিলোম বা অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন তদানীন্তন আর্য্য সমাজে থাকিলেও এই বিবাহের স্ত্রীগণকে আর্য্য সমাজ সহধর্ম্মিণীর সম্মান দেন নাই এবং এই প্রকার দম্পতীর মিলনকে আর্য্যসমাজে সাধুভাবে প্রচলিত ব্রাহ্ম বিবাহের মূল অনুষ্ঠান পাণিগ্রহণের ব্যবস্থা দেয় নাই। যথা :—

"শরঃ ক্ষত্রিয়য়া গ্রাহ্যঃ প্রতদো বৈশ্যকন্যয়া
বসনস্য দশা গ্রাহ্যাঃ শূদ্রয়োৎকৃষ্টবেদনে ॥"

(মনুসংহিতা ৩।৪৪)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বর বাণ ধারণ করিলে ক্ষত্রিয়া তাহার একপ্রান্ত এবং বর প্রতোদ অর্থাৎ (পাঁচনিবাড়ি) গ্রহণ করিলে বৈশ্যা তাহার একপ্রান্ত গ্রহণ করিবে এবং শূদ্রা বরের উত্তরীয় বস্ত্রের দশা বা দশী ধারণ করিবে। এইরূপ অসবর্ণ বিবাহ যে ধর্ম্মসাধনোদ্দেশে না হইয়া বরং কামবাসনার কণ্ডূয়নে এবং রতিইচ্ছায় সংঘটিত হইত মনুসংহিতা এবং মহাভারত স্পষ্টাক্ষরে তাহাই প্রচার করিয়াছেন। যথা :—

"সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যু ক্রমশোঽবরাঃ ॥" —৩।১২

অর্থাৎ দ্বিজাতির সবর্ণা বিবাহই প্রশস্ত। কামপ্রবৃত্ত হইয়া অসবর্ণ ভার্য্যা গ্রহণ করা হয়।

পঞ্চমবেদ মহাভারত বলেন যে, ব্রাহ্মণের পক্ষে চারি বর্ণীয়া স্ত্রীগ্রহণই বিধি আছে, তবে সবর্ণা ব্যতিরেকে অসবর্ণা বিবাহ রতিইচ্ছায় সংঘটিত হইয়া থাকে যথা,—

"চতস্রো বিহিতা ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য পিতামহ।
ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রাচ রতিমিচ্ছতি ॥"

অনুশাসন পর্ব্ব, ৪৭ অঃ

কামেচ্ছাপ্রযুক্ত যে বিবাহ আর্য্যসমাজ তাহাকে কখনও সম্মান প্রদর্শন করে নাই; বরং নানাভাবে কটাক্ষপাতই করিয়াছে। বাস্তবিক কাম-বিবাহ কোন কালেই ভারতের সমাজে কখনও সম্মানলাভ করে নাই। আর্য্যগণ বিবাহকে শুধু নরনারীর সম্মিলনের সুবিধার জন্য প্রচলন করে নাই। জন্মান্তর বিশ্বাসী হিন্দুজাতি বংশলোপে পিণ্ডলোপের আশঙ্কায় ভীত হইয়া প্রচার করিয়াছেন,—"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"—পুত্রোৎপাদনই বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই পুত্রোৎপাদন সংযমের মধ্য দিয়া সাধিত হওয়ার জন্য আর্য্য সমাজ তদ্বিষয়ে নানাপ্রকার বিধি নিষেধ প্রচার করিয়াছেন। প্রথম পুত্র ব্যতীত অপরাপর পুত্রগণ কামজাত বলিয়া শাস্ত্র ঘোষণা করিয়াছেন এবং প্রথম পুত্রকেই কেবল শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের অধিকারী করা হইয়াছে। আর্য্যসমাজ যখন ক্রমশঃ ভোগের পথে চলিতে গিয়া ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হইয়া পড়িল এবং বহুল পরিমাণে অনার্য্য নারী এবং দ্বিজাতির মধ্যেও অসবর্ণ বিবাহ চলিতেছিল, আর্য্য-সমাজপতিগণ তখন ঐ প্রকার বিবাহকে সমাজে স্থান দিলেও বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। শাস্ত্র তাহাই প্রচার করিয়াছেন,—"বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্ব্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ। বৈশ্যস্যবর্ণে চৈকাস্মিন ষড়েতেহপসদাঃ স্মৃতাঃ।" অর্থাৎ—ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা স্ত্রীতে, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা ও শূদ্রা স্ত্রীতে, এবং বৈশ্যের শূদ্রা স্ত্রীতে উৎপন্ন, এই ছয় পুত্র নিকৃষ্ট। প্রাচীন আর্য্যগণ সমাজ মধ্যে যাহাতে সঙ্করজাতির উৎপত্তি না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের এই প্রাণপণ চেষ্টা সমাজকে বর্ণসঙ্কর হইতে মুক্ত করিতে পারে নাই। সেই যুগ হইতেই ভারতীয় আর্য্যসমাজ লোভের বশীভূত হইয়া ধীরে ধীরে সমস্ত আর্য্যসমাজে বর্ণসঙ্করের প্রবল প্রতিপত্তি উৎপাদন করিয়াছে। শত শত বৎসরের ঘাতপ্রতিঘাতে, শত শত বৎসরের পারিপার্শ্বিক জগতের ভাবধারার নব নব উদ্বোধনে, সমাজদেহে নব নব রক্ত সঞ্চালনে এবং অসংযমের প্রাবল্যে সমগ্র ভারতীয় আর্য্য-সমাজে এত সঙ্করজাতির উৎপত্তি হইয়াছে যে, বর্ত্তমান সময়ে খাঁটি খাঁটি আর্য্যশোণিত ভারতের বক্ষে আর আছে কি না সন্দেহ। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মের নিকট উপদেশ প্রার্থনা স্থলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হওয়ার কতকগুলি কারণ উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"অর্থল্লোভাদ্বা কামাদ্বা বর্ণানাঞ্চাপ্যনিশ্চয়াৎ।
অজ্ঞানাদ্বাপি বর্ণনাং জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥
তেষামেতেন বিধিনা জাতানাং বর্ণসঙ্করা।
কো ধর্ম্ম কানি কর্ম্মানি তন্মে ব্রুহি পিতামহ॥

৪৮ অধ্যায়—১।২ শ্লোঃ

বিক্রমপুর

চতুর্থ অধ্যায়

সমাজ

বর্ণসঙ্কর যে সময় ভারতীয় সমাজে আধিপত্য বিস্তার করিল, তখনই সমাজ নানা অবস্থা বিপর্য্যয়ের মধ্যে প্রাদেশিকভাবে গঠিত হইতে লাগিল। সমাজের এই প্রাদেশিক গঠনে সমাজের উপর বিভিন্ন প্রভাবেরই সাক্ষ্য দেয়। বঙ্গের সমাজে যে ব্যবস্থা প্রচলিত রাজপুতনার সমাজে হয়তো তাহা নিন্দনীয়; আবার দ্রাবিড়ে যে ব্যবস্থা সমাজপতিগণ বিধি দিয়াছেন বিহারে হয়তো সামাজিকভাবে তাহা গ্রহণ করা হয় নাই। যথা—

"ন দোষো মগধে মস্থে অন্নযোজ্যো কলিঙ্গজে।
ওড্রে ভ্রাতৃবধুভোগে দক্ষিণে মাতুলকন্যকা॥
পশ্চিমে চর্ম্মপাণীনা উত্তরে মহিষীমাংসম্।
পরাশর বিধানেন আচার দেশতো বিধি॥"

প্রাদেশিক সমাজগঠনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক ভাবে স্মৃতিশাস্ত্রও রচিত হইয়া হিন্দুসমাজের জীবনযাত্রার পথ বিধিবদ্ধ করিয়াছিল। প্রাদেশিক স্মৃতির ব্যবস্থা মনুসংহিতাকে কেন্দ্র করিয়াই বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। সমাজের উপর প্রাদেশিকতার এইরূপ প্রভাব ত্রেতাযুগেই সংঘটিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে রাজ্যপালনভার প্রাপ্ত হইয়া ক্ষত্রিয়সমাজ কিঞ্চিৎ পরিমাণে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে, এবং সেই উচ্ছৃঙ্খলতার অত্যাচারে ও অসংযমের প্রাবল্যে মাঝে মাঝে ভারতের বুকে অসন্তোষের উৎকট আন্দোলন উপস্থিত হইয়া সমাজের শান্তিপূর্ণ জীবনের ধারাবাহিক গতি ক্ষুণ্ণ হইয়া কত পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সাধিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়ান্তক ভার্গব পরশুরাম ক্ষত্রিয়ের অত্যাচারে ক্রোধান্বিত হইয়া সমসাময়িক বহু ক্ষত্রিয়ের নিধন করিয়া ও জাতিভ্রষ্ট করিয়া ধরিত্রী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। গর্ভবতী ক্ষত্রিয়পত্নীগণ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়াগণ প্রাণভয়ে ঋষিদিগের আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভৃগুরাম তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিলে মহর্ষিগণ তাঁহাকে ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে বলেন। তিনি বলেন "গর্ভিণীগণের গর্ভস্থ সন্তান বিনষ্ট না করিলে আমি প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হই। অতএব ইহাদের নিধনের পর আমি ক্রোধ পরিত্যাগ করিব।" মহর্ষিগণের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে অতঃপর ভগবান পরশুরাম গর্ভস্থ সন্তানদিগকে জাতিচ্যুত করিয়া মহর্ষিগণ সহ এই বিধান করিলেন

যে "গর্ভবতী ক্ষত্রিয়পত্নীগণের সন্তানসমূহ ক্ষাত্রধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইবে।" মাতৃকায়ে অর্থাৎ গর্ভে ছিল বলিয়া তদবধি তাহারা কায়স্থ (কায়+স্থা+ড) জাতি বলিয়া অভিহিত হইল। কায়স্থগণ বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়সন্তান তাই তাহারা শূদ্র হইতে শ্রেষ্ঠ গণ্য হইত।

পরশুরাম যখন পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিবার ভীষণ প্রতিজ্ঞা নিয়া কার্য্যে ব্রতী হইলেন, তখন সূর্য্যবংশীয় নৃপতি মুলক নারীবেশে নারীবেষ্টিত হইয়া জীবন রক্ষা করেন, তাই তিনি নারী-কবচ নামে অভিহিত হইতেন। পরবর্ত্তীকালে ব্রাহ্মণের আশ্রিতা ক্ষত্রিয়ানারীর গর্ভে পুনরায় নিখিল ক্ষত্রিয়জাতির উৎপত্তি হয়। পৌরাণিক সময়ে সুকর্ম্ম ও কুকর্ম্ম দ্বারা সময় সময় জাতিগত উত্থান পতন সম্পাদিত হইত। বহু ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য তখন সুকর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাজে গৃহীত হইয়াছেন এবং অপকর্ম্মের দ্বারা বহু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়সন্তানও শূদ্রত্বে পাতিত হইয়াছেন। বৈবস্বত মনুর পুত্র পৃষধ্র গুরুবধজনিত পাপে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রথীতর বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মিথ্যা-ভাষণের পাপে সূর্য্যবংশীয় সত্যব্রত ওরফে ত্রিশঙ্কু চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন। পুরুবংশীয় অপ্রতিরথের পুত্র কণ্ব হইতে কাণ্বায়ন ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। ক্ষত্রিয় উরুক্ষয়ের এয্যারুণ, পুষ্করিণ্য, কপিল নামক তিন পুত্রই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়-সন্তান বিশ্বামিত্র শক্তিবলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। সেই যুগে চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগ শুধু গুণ ও কর্ম্মের দ্বারা সম্পাদিত হইত। গুণবান হইলে দ্বিজাতির মধ্যে যে কেহ ব্রাহ্মণ হইতে কোন বাধা ছিল না। পুরাণাদিতে দেখিতে পাই অনেক ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয়জনোচিত কার্য্য করিয়া ব্রাহ্মণই রহিয়াছেন, পতিত হন নাই। পরশুরাম এবং তৎপিতা জমদগ্নি ব্রাহ্মণ হইয়াও ধনুর্ব্বেদে পারদর্শী মহাবীর ছিলেন এবং নিখিল ক্ষত্রিয়সমাজের একরূপ শিক্ষা-গুরু ছিলেন বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। মহর্ষি গৌতমের পৌত্র সত্যধৃতি একজন মহাযোদ্ধা ছিলেন এবং তদীয় পুত্র ব্রাহ্মণ কৃপ মহাবীর আখ্যায় বিভূষিত হইতেন। তাঁহার নিকট বহু ক্ষত্রিয় রাজকুমার অস্ত্রশিক্ষা করিতেন। তিনি তজ্জন্য আচার্য্য বলিয়াই অভিহিত হইতেন। কৃপাচার্য্যের ভগ্নী-পতি আচার্য্য দ্রোণ ও তৎপুত্র অশ্বত্থামার বীরত্বকাহিনী মহাভারতের বুকে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখা আছে। শুধু কর্ম্মের দ্বারা ইহারা কেহই পতিত হন নাই। ধনুর্ব্বেদোক্ত ব্রহ্মাস্ত্র একমাত্র ব্রাহ্মণ কিংবা সংযমী ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য কাহাকেও শিক্ষা দেওয়া হইত না। শ্রীরামের অস্ত্রগুরু বিশ্বামিত্রও তাহাকে ব্রহ্মাস্ত্র প্রদান করিতে কার্পণ্য করিয়াছেন; কিন্তু মহাভারতে দেখিতে পাই আচার্য্য দ্রোণ তদীয় প্রাণাধিক শিষ্য তৃতীয় পাণ্ডবকে ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ ও সংহার কৌশল শিক্ষা দিয়াছিলেন; কিন্তু দাম্ভিক বীর কর্ণকে ব্রহ্মাস্ত্র দিতে স্বীকার করেন নাই। মহাভারতীয় যুগেও শুধু কর্ম্মের দ্বারা জাতি বিভাগ না হইয়া গুণ ও কর্ম্ম দ্বারাই হইত। ইহার বহুপরবর্ত্তী যুগে হিন্দুসমাজ গুণের বিচার পরিত্যাগ করিয়া শুধু কর্ম্মকেই জাতিভেদের পন্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দ্বাপরযুগে ভারতীয় সমাজ মনুর অনুশাসনেই চলিত। জাতিভেদে গুণের বিচার পরিত্যক্ত হইয়া শুধু কর্ম্মবিভাগ সূচিত হওয়াতে দ্বিজাতির বাহিরে যে সমস্ত বর্ণশঙ্করের উদ্ভব হইয়াছিল,

তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়া গণ্য করা হইত। কলিযুগের প্রভাতে বর্ণসঙ্করের এতদূর প্রাবল্য উপস্থিত হয় যে, আর্য্যসমাজ বাধ্য হইয়া তখন তাহাদের অনেককে শূদ্রাখ্যা প্রদানে কর্ম্মপন্থা নির্দ্দেশপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিল। যাহাদের কোন প্রকার কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট না হইল, তাহারা জগতের নানা প্রদেশে ছড়াইয়া পড়ে এবং আর্য্য সদাচার হইতে বঞ্চিত হইয়া ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। এইরূপে তিলি, করণ, অম্বষ্ঠ, শঙ্খবণিক, নাপিত, মোদক, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, বারুই, সূত, মালাকার, সূত্রধর, রজক, আভীর, চর্ম্মকার, ধীবর, প্রভৃতি এবং আরও অনেক সঙ্করজাতি কর্ম্ম-বিভাগের কৃপায় আর্য্যসমাজে অতি প্রাচীন যুগেই স্থান পাইয়াছে।

দ্বাপরের শেষভাগে কুরুক্ষেত্রের বিশাল প্রান্তরে কুরু পাণ্ডবে এক ভীষণ সমর সংঘটিত হয়। সেই যুদ্ধে ভারতের তথাকথিত জগতের ক্ষাত্রশক্তি একরূপ সমূলে বিনষ্ট হইয়াছিল। যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী বৈজ্ঞানিক অস্ত্রাদিতে সুশিক্ষিত শত শত মহারথী সেই কুলক্ষয়কর যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, ভগদত্ত প্রভৃতির মত কত অলোকসামান্য যোদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে কত মহা অস্ত্রের প্রয়োগ-প্রণালী কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে লুপ্ত হইয়াছে তাহার ইয়ত্ত্বা কে করে? এক কথায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর হইতেই ভারতের ক্ষাত্রশৌর্য্য ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া এই বিরাট জাতিটাকে শুধু একটা জড়পিণ্ডে পরিণত করিয়াছে। কুরুক্ষেত্রের বিশ্ববিশ্রুত যুদ্ধের পর ভারতে প্রতাপ-শালী সাম্রাজ্য আর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দবংশের শেষ রাজা মহাপদ্ম নন্দের রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত ১৫০০ এক হাজার পাঁচ শত বৎসরে ভারতের ক্ষাত্রশক্তি ছিন্নভিন্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত ১৫০০ শত বৎসরের ব্যবধান বিষ্ণুপুরাণ সমর্থন করেন। যথা:—

"যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্ বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্॥"

কিন্তু অন্যান্য ঐতিহাসিক গণনা এই সময়টাকে আরও ৩।৪ শত বৎসর বাড়াইয়া দেয়। যাহা হউক, এই সময়ের মধ্যে ভারতীয় আর্য্যসমাজ খণ্ডবিখণ্ড হইয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ের মধ্যেই শক, হুন প্রভৃতির বিজয়াকাঙ্ক্ষার লোলুপ দৃষ্টি ভারতের বুকে কত অশান্তির বীজ বপন করিয়া ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে যুগান্তরের সৃষ্টি করিয়াছে। যে ভারতীয় শৌর্য্যের অমোঘ শক্তিতে জগতের বিভিন্ন রাজন্যসম্প্রদায় নতশিরে তাহাদের প্রাধান্য স্বীকার কর দিয়া নিজেদিগকে ধন্য মনে করিয়াছেন, সেই ভারতই এই সময়ের মধ্যে আর্য্য-সংস্কার বিচ্যুত ম্লেচ্ছজাতিসমূহ দ্বারা বারে বারে বিজিত হইয়া ভারতীয় ক্ষত্রিশক্তির অধঃপতনই সূচিত করিয়াছে। কিন্তু ম্লেচ্ছদ্বারা সময়ে সময়ে ভারতের কোন কোন অংশ বিজিত হইলেও ম্লেচ্ছপ্রভাব ভারতের সমাজে আধিপত্য করিতে পারে নাই; বরং ঐ সমস্ত বিজেতারাই কালক্রমে হিন্দুসমাজে মিশিয়া গিয়া এই বিরাট জাতির পুষ্টি সাধন করিয়াছে। বস্তুতঃ তখন আর্য্যসমাজের পরিপাক শক্তি কিছু প্রখর ছিল বলিতে হইবে।

ভারতবর্ষের সমাজ তখন এমন ভাবে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তদ্দ্বারা সামাজিক কল্যাণ নানাবিধ উপায়ে সাধিত হইলেও জাতীয়তার পূর্ণ বিকাশ হইতে পারিত না। আর্য্যগণ সেই যুগে রাজাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পূজা করিতেন এবং

দেবতার মতই তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। রাজা যে কেহ হউক তাহাকেই শ্রদ্ধা করিতে হইবে এই ছিল তখনকার সমাজের ধারণা। এক রাজা অপর রাজাকে নিহত করিয়া তাঁহার রাজ্য দখল করিলেন, প্রজাসাধারণ সেই আগন্তুক পরস্বাপ-হারী ব্যক্তির পদেই তাহাদের ভক্তির অর্ঘ্য ঢালিয়া দিবে,—এই ছিল সেই সময়কার অবস্থা। এইরূপ রাজপরিবর্ত্তনে এক দেশের রাজনৈতিক ঘোর পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া গেল, কিন্তু প্রজাসাধারণ হয়'তো তাহার কোন খোঁজই রাখিল না। সমাজের এই যে সর্ব্বনাশকর শিক্ষা ইহা দ্বারা সাংসারিক এবং ব্যবহারিক শান্তি যথেষ্ট পরিমাণে সাধিত হইলেও জাতীয় জীবন এই প্রকার শিক্ষাদীক্ষায় গঠিত হইতে পারে না। এই যুগে চিতোরের বাপ্পারাও, কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য প্রভৃতি দুই এক জন নৃপতি বহি-র্ভারতে দিগ্বিজয় করিলেও, ইহা নিশ্চিত সত্য যে, জাতীয় জীবনের পরিপন্থী শিক্ষাদীক্ষায় এবং আত্ম-কলহের দৌর্ব্বল্যে ভারতীয় ক্ষাত্রশক্তি ধীরে ধীরে লুপ্তই হইতেছিল। মাসিদনের অধিপতি আলেক-জাণ্ডার পারস্য, আফগানিস্থানাদি জয়ের পর ভারতের দ্বারে উপস্থিত হইলে সীমান্তবাসী দুইজন ক্ষুদ্র রাজা পূর্ব্বেই বিজয়ীবীরের পদতলে মুকুট স্থাপন করতঃ তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হন। কিন্তু বিজয়ী আলেকজাণ্ডার পঞ্চনদপ্রান্তে রাজা পুরু কর্ত্তৃক ভীম বিক্রমে বাধা প্রাপ্ত হন এবং গ্রীকবীরের দিগ্বিজয়ের পিপাসা এই স্থানেই প্রশমিত হয়। তিনি পুরুর সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়া স্বদেশা-ভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেকন্দর সাহ সেই যুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হইতে দেখিয়া বুঝিতে পারেন যে ভারতজয় সহজসাধ্য নহে। মহামতি হালহেড সাহেব "হিন্দুলা" নামক গ্রন্থে লিখিয়া-ছেন যে, সেকন্দর সাহার সহিত যুদ্ধে পুরু এক প্রকার ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করিয়া-ছিলেন, যাহা হইতে শত শত বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন অগ্নিশিখা নির্গত হইয়া শত শত ব্যক্তির প্রাণ বিনাশ করিতে পারে। এই সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র আধুনিক তোপের চেয়েও পরাক্রান্ত। ঐতি-হাসিক থেমিষ্টিয়াস বলেন—"ব্রাহ্মণগণ বহুদূর হইতে বজ্র ও বিদ্যুতের সাহায্যে যুদ্ধ করিতেন।" সেকেন্দর সাহার ভারতাক্রমণ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক Philostratus বলেন,—A people of India dwelling between the Hydaspes and the Ganges, whose country never entered, these cities he could never have taken, though he led a thousand as brave as Achilies, or three thousand as Ajax to the assault ; for they came not out to the field to fight those who attack them, but these holy men be-loved by Gods, overthrow their enemies with tempest and thunderbolts shot from their walls ;—এই সমস্ত উক্তি প্রভৃতি হইতে বেশ বুঝা যায়, যে ভারতীয় ক্ষাত্রশক্তি একসময়ে উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়াছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরেও ক্ষাত্রশক্তি সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হয় নাই। মৌর্য্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত আফগানিস্থান প্রভৃতির উপরে রাজশক্তি পরি-চালনা করিয়াছেন। ইহার কিছুদিন পরেই সিদ্ধার্থ বুদ্ধ নামে লোকসমাজে পরিচিত হইয়া তাঁহার জ্ঞানলব্ধ ধর্ম্মমত প্রচার করেন। সেই মহাপুরুষের সরল ব্যাখ্যায় দলে দলে লোক বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব্বে হিন্দুসমাজ বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের অনুশীলনে

জর্জ্জরিত ; ছাগমেধ, গোমেধ, অশ্বমেধ, নরমেধ প্রভৃতি যজ্ঞাদি ক্রিয়া সর্ব্বদাই অনুষ্ঠিত হইত। বুদ্ধ ধর্ম্মের স্রোত ঘুরাইয়া দিলেন। তিনি বেদ অভ্রান্ত বলিয়া মানিতেন না। বৌদ্ধধর্ম্মে জাতিভেদ নাই। কালক্রমে ভারতীয় রাজন্যবর্গও বৌদ্ধধর্ম্মের শীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করতঃ নানা উপায়ে জগতের বিভিন্ন দেশে নূতন ধর্ম্ম প্রচারের সাহায্যে ব্রতী হইলেন। অল্পকাল মধ্যেই বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতের State Religion হইয়া উঠে। যে সমস্ত ভারতীয় নৃপতি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার কল্পে সাহায্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে মৌর্য্যকুলতিলক সম্রাট অশোক শীর্ষস্থানীয়। তাঁহার চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম্ম অল্পকাল মধ্যেই সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, যাভা, সুমাত্রা, তিব্বত, চীন, আরব, পারস্য, তাতার, মিশর, গ্রীস, রোম, ইয়ুরোপ, সাইবিরিয়া, এমন কি সুদূর আমেরিকাতেও প্রচারিত হইয়া সদ্ধর্ম্মের গৌরবময়ী প্রভায় বিশ্বের ভাব সাম্রাজ্যে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। ভারতীয় আচার্য্যগণ রাজবৃত্তিতে জগতের বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হইয়া ওজস্বিনী ভাষায় ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব বিশ্ববাসীর কর্ণগোচর করিতে লাগিলেন। সময় সময় অন্যান্য দেশে রাজন্যগণ কর্ত্তৃক সমাদরে নিমন্ত্রিত হইয়া ভারতীয় আচার্য্যগণ সেই সমস্ত দেশে গিয়াছেন। খৃষ্টের জন্মের বহুপূর্ব্বেই চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্মপুস্তকাদি প্রচারিত হইয়াছিল। কুশানবংশীয় সম্রাট কণিষ্কের রাজত্বকালে পণ্ডিত মাতঙ্গ চীনদেশে ধর্ম্মপ্রচার জন্য চীন-সম্রাট মিংতাই কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া সেই দেশে গমন করেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্লাবনে হিন্দুসমাজ নূতনভাবে গঠিত হইয়া উঠিতে লাগিল। বৌদ্ধগণ বেদের অপৌরুষেয়তায় এবং জাতিভেদে বিশ্বাসী না হইলেও হিন্দুগণের মত জন্মান্তরবাদ মানিত এবং কর্ম্মের নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত নির্ব্বাণ লাভ হয় না বলিয়া বিশ্বাস করিত। বৌদ্ধবাদ ভারতে প্রাধান্য লাভের পূর্ব্বে হিন্দুসমাজে জাতিভেদের মজ্জায় মজ্জায় untouchabilityর বিষ স্থান পাইয়াছিল। তাই জাতিভেদবিহীন এই নূতন ধর্ম্মান্দোলনে প্রথমতঃ নিম্নস্তরের হিন্দুগণ দলে দলে সহস্রে সহস্রে দীক্ষিত হইতে লাগিল ; পরে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ এবং অনেক ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ায় অতি অল্পকাল মধ্যেই এই ধর্ম্মের গৌরব সমতট পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইতে পারিয়াছিল। বর্ণাশ্রমধর্ম্মও বৌদ্ধগণ কিয়ৎ পরিমাণে মানিত বলিয়া মনে হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রবাহের মধ্যেও হিন্দুধর্ম্ম একেবারে অস্তিত্ববিহীন হয় নাই ; বরং হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব বৌদ্ধধর্ম্মের উপর প্রাধান্যই লাভ করিয়াছিল। সন্ন্যাসী এবং ব্রাহ্মণগণ যেমন হিন্দুসমাজে শ্রেষ্ঠ আসন পান, বৌদ্ধসমাজে তেমনি ভিক্ষু এবং দেবসেবকগণ শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হন। এই যে সামাজিক পরিবর্ত্তন ইহা শুধু সম্ভব হইয়াছিল ত্যাগের মধ্য দিয়া। হিন্দুগণের চতুরাশ্রমকেও বৌদ্ধগণ কিয়ৎ পরিমাণে রূপান্তরিত করিয়া সমাজে গ্রহণ করিয়াছিল। ব্রহ্মচর্য্যের ভিত্তিতে বৌদ্ধসমাজও গঠিত হইয়াছিল। প্রৌঢ়বয়সে রাজন্যগণ এবং শ্রেষ্ঠিগণ ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করিতেন ; ইহা হিন্দুর বাণপ্রস্থেরই রূপান্তর মাত্র। সম্রাট অশোকের আমলে ভিক্ষুসঙ্ঘের উপর রাজাদেশ কার্য্যকরী ছিল। কিন্তু তৎপরবর্ত্তী কালে দেবমন্দিরাদি সাধারণ সম্পত্তিভুক্ত হইলে মন্দিরাদি-সংশ্লিষ্ট কার্য্যনিয়ন্ত্রণী ক্ষমতা রাজার হাত হইতে কাড়িয়া নেওয়া হয়। মন্দির এবং দেবসম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার তখন হইতে প্রধান পুরোহিত বা ভিক্ষুর উপর প্রদত্ত হয়। এখনও তিব্বত প্রদেশে লামা দেবতার মত পূজিত হন। তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কোন শুভানুষ্ঠান হইতে পারে না। সমাজের উপর বৌদ্ধ ধর্ম্মযাজকগণের এই যে প্রাধান্য তাহার প্রতিবিম্ব মধ্যযুগে ইউরোপেও খৃষ্টান-সমাজে Popeএর

প্রাধান্যে দেখিতে পাই। রোমের পোপ একসময়ে খৃষ্টানসমাজে সম্মানের অতি উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার আদেশে সমগ্র খৃষ্টানসমাজ এক সময়ে উঠিত বসিত। পোপের ইঙ্গিতে ইউরোপীয় জাতিসমূহ বহু বক্ষশোণিতে ইউরোপের বক্ষ সিক্ত করিয়াছে। তারপর Protestant সম্প্রদায়ের উদ্ভব হওয়ায় ক্রমে ক্রমে পোপের ক্ষমতা খর্ব্ব হইয়াছে। খৃষ্টানসমাজে ধর্ম্মযাজকের এই যে প্রাধান্য তাহা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের ভাবের আদান প্রদানের মধ্য দিয়া সফল হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষ অনুধাবন করিলে বুঝা যায় যে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব যীশুখৃষ্টের উপরও বিস্তৃত হইয়াছিল। বাইবেলে দেখা যায় খৃষ্ট জন্মিবেন এ'কথা সেই দেশে প্রথম প্রচার করেন Six Sages of the East; এবং খৃষ্ট, কৃষ্ণ ও পারস্যের ধর্ম্মগুরু জয়থুশত্রদেবের জীবনবৃত্তান্তের সামঞ্জস্য দেখিলে অবাক হইতে হয়। তিনজনই জন্মমাত্র রাজরোষের ভয়ে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন এবং উঁহাদের সকলেরই বাল্যজীবন প্রায় একভাবে অতিবাহিত হইয়াছে।

এ'কথা সত্য যে, খৃষ্টদেব যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন বৌদ্ধধর্ম্ম জগতের বক্ষে এক মহিমময় ধর্ম্মসাম্রাজ্য রচনা করিয়াছিল। দিকে দিকে তখন ভারতীয় বৌদ্ধাচার্য্যগণ বুদ্ধের অমৃতময়ী বার্ত্তা উদাত্ত গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিয়া বেড়াইতে-ছিলেন। খৃষ্ট যেখানে জন্মগ্রহণ করেন, বিশেষতঃ মিশরের Alexandria নগরে তৎসময়ে বহু বৌদ্ধশ্রমণ বাস করিতেন। এই অবস্থায় খৃষ্টদেব যে বিশ্বব্যাপী এই ধর্ম্মমতের প্রভাব হইতে মুক্ত ছিলেন—তাহা বিশ্বাস হয় না। এবং খৃষ্টের মত একজন ধর্ম্মগুরু যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান-সমুজ্জ্বল সভ্যজগতের শীর্ষস্থানীয় ভারতবর্ষে জ্ঞান-আহরণার্থ আসেন নাই তাহাও অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। খৃষ্টের জীবনের দ্বাদশবৎসর তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর নিকট অজ্ঞাত। ইহা অসম্ভব নয় যে, সেই দ্বাদশবর্ষ খৃষ্টদেব জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহায় ভারতে অতিবাহিত করিয়াছেন।

কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মে দেবদাসী প্রথার সৃষ্টি হইল। দেবদাসীগণ দেবমন্দিরবাসিনী ছিল। তাহাদের কাজ ছিল দেবমূর্ত্তির সম্মুখে নৃত্যগীতাদি করা। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিও দেবদাসী করিবার উদ্দেশ্যে কন্যাদান করিতেন। এই সমস্ত দেবদাসীগণ মন্দিরের ভিক্ষুর আদেশে এবং অধীনেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। এক কথায় এই সমস্ত দেবদাসী প্রধান ভিক্ষুর উপপত্নীরূপেই ব্যবহৃত হইত। ইউ-রোপেও দেবদাসী প্রথার মত Nunnary System প্রচলিত হইয়া মধ্যযুগে ধর্ম্মের আবরণে ব্যাভিচারের প্রবল স্রোত বহিয়াছিল।

বৌদ্ধপ্রভাব ভারতীয় সমাজকে নানাভাবে উন্নত ও পুষ্ট করিয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু মনে হয়, ভারতীয় ক্ষাত্রশক্তির পতনের মুখ্য কারণ বৌদ্ধধর্ম্মের অহিংসবাদ। এই অহিংসবাদ প্রচারিত হওয়ায় বৌদ্ধরাজন্যবর্গ স্বভাবতঃ প্রাণী-হানিকর যুদ্ধবিগ্রহাদিতে লিপ্ত হইতে ইচ্ছুক ছিলেন না; এবং বোধ হয়, সেই সময়েই আগ্নেয়-অস্ত্রাদির অনুশীলনে বিরত হইয়া ক্ষাত্র-শক্তিটাকে নির্জ্জীব করিয়া ফেলা হইয়াছিল। ভারতের সুখ ও সৌভাগ্যের দিনে অন্যান্য বিজ্ঞানের সঙ্গে যুদ্ধবিদ্যারও চরমোৎকর্ষতা সম্পাদিত হইয়াছিল। বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের কথা দূরে থাকুক বুদ্ধদেবের সময়েও যুদ্ধাদিতে আগ্নেয় অস্ত্রের ব্যবহার হইত, তাহা তৎকালীন পুস্তকাদি পাঠে এবং নিরপেক্ষ বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থাবলী হইতে বেশ বুঝা যায়। বুদ্ধদেবের তিরোধানের ৫০০/৬০০ শত বৎসর পর হইতে

আর যুদ্ধাদিতে আগ্নেয় অস্ত্রের অস্তিত্বও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই যে আগ্নেয়াস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা, ইহার কারণ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত কোমলহৃদয় রাজন্যবর্গের যুদ্ধাদিতে বিরতি হইতে উদ্ভব হইয়াছে। কলিঙ্গজয়ের পর সম্রাট অশোক'ত আর যুদ্ধাদিতে লিপ্ত হইবেন না বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন; প্রকৃত পক্ষে, তিনি আর কোন যুদ্ধাদিতে লিপ্তও হন নাই। সম্রাট অশোকের এক শতাব্দী পরবর্ত্তীকালে ভিক্ষু-জীবনের প্রভাব ভারতীয় সমাজের উপর এমন প্রবলভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছিল যে, দলে দলে ভারতের যুবক সম্প্রদায় নির্ব্বাণের মোহে ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করিয়া সঙ্ঘারামে প্রবেশ করিত। কাজেকাজেই ভারতের যৌবনশক্তির সন্ন্যাস-প্রীতিতে দেশের ক্ষাত্রশক্তি ধীরে ধীরে পঙ্গুতাপ্রাপ্ত হইয়া পড়িল। অবশ্য বৌদ্ধযুগে কনিষ্ক প্রভৃতি ভারতীয় কয়েকজন ? নৃপতি অসীম শৌর্য্যবীর্য্যে রাজ্যশাসন করিয়াছেন। তথাপি মোটামুটি সমাজে ক্ষাত্রশক্তির পতনের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছিল সন্দেহ নাই।

বুদ্ধদেব ঈশ্বর সম্বন্ধে নির্ব্বাক ছিলেন এবং শ্রমণ ও ভিক্ষু সম্প্রদায়কে ভোগবিলাস ও সন্ন্যাসের কঠোরতা উভয়ই নিষেধ করিয়া মধ্য-পন্থা অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু বুদ্ধের তিরোভাবের দু'এক শতাব্দীর মধ্যেই ভোগ-বিলাস এক পার্শ্বে, এবং ব্রহ্মচর্য্যের নীরস কঠোরতা অন্য পার্শ্বে রাখিয়া মধ্যবর্ত্তী পন্থাবলম্বন করিবার মত মানসিকশক্তি তখনকার বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীগণের ছিল না বলিয়া ভোগের আকর্ষণে তৎপ্রতিই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগের কয়েক শতাব্দী মধ্যে দিগ্বিজয়ী বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ নিরীশ্বরবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রবাহের মধ্যেও হিন্দুধর্ম্ম সমূলে বিনষ্ট হয় নাই এবং বাঙ্গালা তাহার নিজের বৈশিষ্ট্য বিসর্জ্জন দিয়া আত্মসমর্পণ করে নাই। বাঙ্গালা বলিতে সেই যুগে আধুনিক বাঙ্গালাকে বুঝাইত না। বর্ত্তমান বঙ্গদেশ বৌদ্ধযুগে পঞ্চরাজ্যে বিভক্ত ছিল। ঐ পঞ্চরাজ্য যথাক্রমে বরেন্দ্রভূমি, বঙ্গ, মিথিলা, রাঢ় এবং বকদ্বীপ বা বগ্‌দি। পৌরাণিক যুগে ঢাকার দক্ষিণ ভাগ সমতট বলিয়া অভিহিত হইত। পুরাণ মতে সমতটের পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র, দক্ষিণে পদ্মানদী, পশ্চিমে বরেন্দ্রভূমি এবং উত্তরে বিশাল অরণ্যানী অবস্থিত ছিল। পৌরাণিক যুগের পরে বৌদ্ধযুগে এবং বৌদ্ধযুগাবসানে সমতটের সীমা দক্ষিণে ফরিদপুর, খুলনা ও যশোহর জিলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। পৌরাণিক যুগে বঙ্গের ভৌগলিক মানচিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহা স্বতঃই মনে হয় যে ঢাকা জিলার দক্ষিণ ভাগ অর্থাৎ বর্ত্তমান বাক্‌লার পরগণা, পৌরাণিক বঙ্গদেশের কুক্ষিগত ছিল। ঢাকা সহরের উত্তরে বৃহদারণ্য সমাকুল ভাওয়াল পরগণা তৎকালে বঙ্গের উত্তর ভাগে অবস্থিত ছিল। বিষ্ণুপাদসম্ভূতা শঙ্করজটা-বিহারিণী সুরাসুর-বন্দিতা, গন্ধর্ব্বাস্পরো-সেবিতা, হিমালয়-বক্ষ-বিহারিণী গঙ্গা, এবং পরশুরামমুক্তি-প্রদায়ক, পর্ব্বতকন্দরভেদী ব্রহ্মপুত্র বঙ্গের বক্ষে অনাদিকাল হইতে পূতবারি সিঞ্চনে এই পুণ্যভূমির সৌন্দর্য্য ও উর্ব্বরতার সাধনে তৎপর। নদীমাতৃক বাংলার "অনিল-বিকম্পিত-শ্যামল-অঞ্চলের" শস্য-সম্ভার যুগে যুগে বিদেশীকে প্রলুব্ধ করিয়াছে। অতি প্রাচীন যুগে মঙ্গোলীয় জনপ্লাবন বাঙ্গালার বক্ষে সুখশান্তির আশায় নক্ষত্রবেগে ভারতের পূর্ব্বোত্তর পথে ছুটিয়া আসিয়াছিল। "সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা" বাঙ্গালাও তাহাদিগকে আশ্রয়দান করিতে কার্পণ্য করে নাই। পঞ্চনদপ্রদেশের শুষ্ক কঠোর অনুর্ব্বর ভূমি আর্য্যগণকে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট

রাখিতে পারে নাই। কালক্রমে তাহারা সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত ছাইয়া ফেলিয়া প্রাচীন যুগের অন্ধকারে দলে দলে বাংলার বুকে শান্তির পিপাসায় ছুটিয়া আসিয়াছিল। বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে বাংলা অতি প্রাচীন যুগ হইতেই সুখ-সৌভাগ্য-বিলাস-বিলোলা হইয়া, সুযোগ্য বরপুত্রগণের মারফতে যুগে যুগে জগৎকে মুক্তির বাণী শুনাইয়া আসিয়াছে। সে ইতিহাস কয়জনে জানে? চেষ্টা উদ্যমের শোচনীয় অভাবে,—শত শত বৎসরের পুঞ্জীকৃত অবসাদে আত্মবিস্মৃত আমরা ঘরের কোণে চুপ করিয়া বসিয়া আছি;—শত শত ইতিহাসের গলিত জীর্ণ উপকরণ মৃত্তিকালুপ্ত হইয়াছে। ইতিবৃত্তের অভাবে আজ আমরা জাতীয়তার মহামন্ত্র হারাইয়া জগতের সমক্ষে ভীরু, দুর্ব্বল, বলিবর্দ্দ-বিশিষ্ট বলিয়া উপহাসাস্পদ। বর্ত্তমান বাংলা প্রাচীন বাংলার অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট কঙ্কাল মাত্র। বাংলা এখন ম্যালেরিয়া, মহামারী ও দুর্ভিক্ষের লীলাক্ষেত্র;—"ঘোরারাবী, মহারৌদ্রী, শ্মশানালয়-বাসিনী" এখন বাংলার বুকের উপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছেন। প্রাচীন যুগে বাংলা এমন ছিল না। বাঙ্গালীর অদীনপরাক্রম, দুর্দ্দমনীয় শৌর্য্যবীর্য্য এবং অলোকসামান্য বীরত্বের পরিচয় জগৎ বহুবার পাইয়াছে। মহাভারতে আমরা দেখিতে পাই কুরুক্ষেত্রের সমরপ্রাঙ্গনে অষ্টাদশ দিবস ব্যাপী ভীষণ সমরকোলাহলের মধ্যেও আমাদের প্রাচীনতম পূর্ব্বপুরুষগণ কৌরব পক্ষে থাকিয়া অপরিসীম পরাক্রম এবং অদ্ভুত রণনৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইতিহাসের অভাবে বাঙ্গালী আজ জীবন্মৃত। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, বাংলার বাণী একসময়ে জগতের বিভিন্ন প্রদেশে ভাবের বন্যা প্রবাহিত করিয়াছিল। তাহার জীর্ণ শীর্ণ মূক কাহিনী এখনও ক্ষীণস্বরে অতীত গৌরবের বার্ত্তা অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির কানে কানে কহিয়া যাইতেছে।

বঙ্গের আদিম অধিবাসী বাগ্‌দি, পোঁদ, গারো, কুকি, কৈবর্ত্ত, রাজবংশী চণ্ডালগণকে পরাজিত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া আর্য্যগণ এ'দেশে প্রবেশ করেন। পরে দীর্ঘকাল একত্রাবস্থানের ফলে এবং একই ভাষার প্রচলনে জাতি ও ধর্ম্মগত পার্থক্য সত্ত্বেও একটি সাধারণ নাম বাঙ্গালী হইয়াছে। বাঙ্গালী সভ্যতার যে বিশেষত্ব এবং ধর্ম্মবিশ্বাসের যে অতুলনীয় মাহাত্ম্য তাহা ধীরে ধীরে দিনের পর দিনে পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল প্রাচীন যুগের সেই সমতট ভূমিতে—তথাকথিত বাংলার জ্ঞানের কেন্দ্র বর্ত্তমান বিক্রমপুরে। এই বিক্রমপুর বা প্রাচীন বঙ্গ হইতে বাংলার সমাজ প্রাদেশিকতার ছাপ নিয়া অভিনব গৌরবে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। এবং বহুবর্ষ পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত বিক্রমপুরের অনুশাসনে তথাকথিত গৌড়ীয় পঞ্চ রাজ্যের শিক্ষাদীক্ষা, সভ্যতা ও সমাজগঠনে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। অবশ্য পৌরাণিক যুগের অবসানে বৌদ্ধযুগে বরেন্দ্রভূমি এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালরাজগণের অধীনে যশোবিমণ্ডিতশিরে উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল; কিন্তু বঙ্গভূমির রাষ্ট্রীয়শক্তি-গৌরব তৎকালে কিঞ্চিৎ ম্লান দৃষ্ট হইলেও আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া ইহার গৌরব বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইতেছিল। বৌদ্ধ-প্লাবনে তৎ-কালীন বঙ্গভূমিও বাদ যায় নাই। এখনও বিক্রম-পুরের নানাস্থানে তাহার বহু চিহ্ন প্রায়শঃই আবিষ্কৃত হইতেছে। ফলতঃ জগতের অন্যান্য প্রদেশের মত বৌদ্ধমতের প্রবল স্রোত সমতটের উপর দিয়া তীব্রবেগেই প্রবাহিত হইয়াছিল; এবং জাতিভেদের কড়াকড়ি না থাকায় তথাকথিত নিম্ন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক মহা সমাদরেই গৃহীত হইয়াছিল। বঙ্গীয় পালরাজগণ প্রথমতঃ ভারতের তদানীন্তন

একচ্ছত্র অধিপতি মগধরাজের অধীনে করদ-রাজারূপে গৌড়নগরে রাজত্ব করিতেন। কালক্রমে কেন্দ্রীয় শক্তির অন্তর্নিহিত দৌর্ব্বল্যের সুযোগে মগধের অধীনতা পাশ ছেদন করিতেও তাঁহারা সমর্থ হইয়াছিলেন। পাল-রাজগণের বাহুবল একদিন বারাণসীর তোরণদ্বার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। গৌড়ের পাল-রাজ্য ব্যতীত দিনাজপুর অঞ্চলে এবং বরেন্দ্রভূমির পূর্ব্বপ্রান্তে অর্থাৎ বঙ্গভূমিতে পৃথক্ পাল-রাজ্য থাকার ইতিহাসও পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে গৌড়ের পালরাজ্যই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তীর্ণ ছিল। পাল-রাজত্ব সময়ে বৌদ্ধসমাজ মগধ এবং গৌড়ের নির্দ্দেশানুসারে চলিত। বঙ্গের সমাজ বঙ্গীয় পাল-রাজগণের অনুশাসন মানিয়াই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত।

বৌদ্ধযুগে ভারতীয় সমাজে ক্ষাত্রশক্তির অভাব পরিলক্ষিত হইলেও বৈশ্যবৃত্তির অধিকতর অনুশীলন হওয়ায় ভারতবর্ষ ধনরত্নৈশ্বর্য্যে বিভূষিতা হইয়া সুখ-সম্পদ বিলাসভোগের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। বৌদ্ধযুগে বঙ্গভূমির উপর দিয়া যে কত কত নবধর্ম্মে দীক্ষিত পূর্ব্ব-প্রান্তবাসী মহাপুরুষগণ ভগবান তথাগতের জন্মভূমি দর্শনার্থ গমনাগমন করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা কে করে? বাঙ্গালী বণিকগণ সামুদ্রিক অভিযানে অতি প্রাচীন যুগেই অতিশয় শিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিদেশীয় সদাগরগণ বাঙ্গালী চালিত পোতে আরোহণ করিয়া ব্রহ্ম, সিংহল, আন্দামান, যাভা, সুমাত্রা, চীন, জাপান প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য করিতেন। তাহার কিছু কিছু আভাষ পদ্ম-পুরাণ, ভাসানগান প্রভৃতি তৎকালীন সাহিত্যের মধ্যে আমরা পাই। সামুদ্রিক বাণিজ্যে প্রচুর অর্থ সম্পদ লাভ হয়, এই কারণে ভারতীয় জনসাধারণ বহুল পরিমাণে বৈশ্য-বৃত্তিতে ঝুঁকিয়া পড়ে। বাণিজ্যের প্রসাদে ভারতীয় সভ্যতাও উপনিবেশ জগতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সেই যুগে ভারতবাসীগণ দলে দলে বাণিজ্যব্যপদেশে সুদূর বিদেশে ক্রমান্বয়ে দীর্ঘকাল অবস্থানের ফলে বিদেশীয় আচার ব্যবহারে দীক্ষিত হইয়া ঐ সমস্ত দেশের সমাজে মিশিয়া গিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করা আর প্রয়োজন বোধ করিত না। এইভাবে দিনের পর দিনে বহুলোক পৃথিবীর নানাপ্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া রহিয়া গিয়াছে। এই কার্য্যের দ্বারা বিদেশে ভারতীয় সভ্যতা প্রাচীনযুগে প্রসার লাভ করিয়াছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু এইভাবে ভারতীয় লোকবল ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া যাইবার উপক্রম হইলে পরবর্ত্তী হিন্দুর প্রাধান্য সময়ে সমুদ্র-যাত্রা নিষিদ্ধ বলিয়া প্রচারিত হয়।

বৌদ্ধধর্ম্মের গৌরবের যুগে বিক্রমপুরও নবধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিতে কার্পণ্য করে নাই। সেই যুগে বিক্রমপুর নিবাসী বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণসন্তান অতীশ শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর বিশ্ব-বিশ্রুত নালন্দার বিদ্যাপীঠে প্রধান আচার্য্যের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক 'হুয়েন সাং' নালন্দা বিদ্যাপীঠে বাঙ্গালী বৌদ্ধ আচার্য্য ও নালন্দা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শীলভদ্রের পদপ্রান্তে বসিয়া ভগবান তথাগতের অমৃতময়ী উপদেশাবলীর মধুর ব্যাখ্যা শ্রবণে চিত্তজ্বালা নিবারণ করিয়াছিলেন। মহাজ্ঞানী আচার্য্য দীপঙ্কর তিব্বতরাজের পুনঃ পুনঃ সাদরামন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া অতি বৃদ্ধকালে দুরারোহ পার্ব্বত্যপথ অতিক্রমের অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া তিব্বতরাজ্যে গমন করেন এবং তদ্দেশবাসীদিগকে স্বীয় চরিত্রমাধুর্য্যে মুগ্ধ করিয়া নবধর্ম্মের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান করতঃ বহু বহু ভক্ত শিষ্যকে আধ্যাত্মিক উন্নতি

বিধানে কৃতার্থ করতঃ ভগ্নস্বাস্থ্যে দেশে প্রত্যাগমন করেন। তিব্বতের ইতিহাসে অতীশ শ্রীজ্ঞান দীপঙ্করের নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে শোভা পাইবে।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রবাহের মধ্যেও হিন্দুধর্ম্ম একেবারে লুপ্ত হয় নাই। রাজশক্তির পোষকতায় বৌদ্ধধর্ম্ম নবীন গৌরবে দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া উঠিয়াছিল বটে; কিন্তু হিন্দুধর্ম্মকে একেবারে অস্তিত্ববিহীন করিতে পারে নাই। বরং তৎকালে এই উভয় ধর্ম্মই পাশাপাশি বিরাজ করিতেছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের এই অভ্যুত্থানের সময় হিন্দুগণের উপর অত্যাচার করিতে বৌদ্ধগণ সময় সময় ক্রটী করে নাই। কিন্তু অহিংসা মতাবলম্বী উদারহৃদয় বহু বৌদ্ধরাজন্য হিন্দুধর্ম্মকে সমচক্ষেই দেখিয়াছেন। মগধের সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন পাটলিপুত্রের মাসব্যাপী উৎসবের পরে দানকালে বৌদ্ধভিক্ষু বা হিন্দু উদাসীনগণের তারতম্য বিচার করেন নাই; ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয়। বিশেষ অনুধাবন করিলে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বৌদ্ধধর্ম্মের এই আকস্মিক উন্নতির মধ্যেই তাহার ধ্বংসের বীজ লুকায়িত ছিল। ভগবান তথাগত ঈশ্বর সম্বন্ধে নির্ব্বাক ছিলেন বলিয়া পরবর্ত্তী কোন কোন বৌদ্ধাচার্য্য পরমেশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করেন নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারতীয় সমাজে বিলাসব্যসনের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া আত্মহারা হইয়া ধনৈশ্বর্য্য লাভের জন্য উদ্ভ্রান্তভাবে ছুটিয়াছিল। ঐশ্বর্য্য করায়ত্ত হওয়ায় ভোগের নব নব পন্থানুসন্ধানে জনসমাজ তখন উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। সেই যুগে কামভোগের কণ্ডূয়নে সমাজ অস্থির হইয়া উঠে। বাৎসায়নের "কামসূক্ত" সেই যুগেরই সৃষ্টি। কামসূক্তের চৌষট্টি কামকলার ধাঁধাঁয় ভারতীয় সমাজবন্ধন তখন শিথিল হইয়া পড়িতেছিল বৌদ্ধরাজন্য এবং শ্রেষ্ঠিগণ ভগবান তথাগতের সেই মহিমাময় ত্যাগের মহিয়সী কাহিনী বিস্মৃত হইয়া ভোগ লালসার পঙ্কিলপঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সমগ্র দেশ তখন বৌদ্ধধর্ম্মের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইলেও বাঙ্গালী বৌদ্ধাচার্য্যগণ তাহাদের সহজাত সংস্কার বিসর্জ্জন দিতে পারেন নাই। সেই যুগেই তান্ত্রিক প্রভাবান্বিত বিক্রমপুর নিবাসী বাঙ্গালী বৌদ্ধ ক্ষেমেন্দ্র বৌদ্ধধর্ম্মে তান্ত্রিক প্রভাব প্রবেশ করাইয়া দিয়া মহাযান পন্থার প্রবর্ত্তন করেন। তৎকালে বৌদ্ধমতে হীনযান ও মহাযান নামে দুইটী পন্থা প্রবর্ত্তিত হয়। এই দুইটী মতবাদের প্রচলনে বৌদ্ধধর্ম্মে সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ লাভ করে। বৌদ্ধধর্ম্মের বিপুল গ্লানিতে আত্মহারা সমাজ যখন বিষপানে অস্থির, অবনতির গাঢ়তম কলঙ্করেখা ললাটে ধারণ করিয়া সমাজ শক্তিহীন, তখন ভগবান শঙ্করাচার্য্য ধর্ম্মের গ্লানি নাশ করিতে আবির্ভূত হন,—নভঃস্পর্দ্ধী পাণ্ডিত্য সম্মান এবং অতুল আত্মবল নিয়া তদীয় অনবদ্য, সুললিত ও ওজস্বিনী তর্ক-স্রোতের মুখে বৌদ্ধদের নিরীশ্বরবাদ তৃণের মত ভাসিয়া যাইতে লাগিল। একদিকে বৌদ্ধ-পণ্ডিতগণ যেমন নিরীশ্বরবাদ প্রচার করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি মহাযান-পন্থী বৌদ্ধসাধারণগণ ধর্ম্মের মূলসূত্র হারাইয়া কামনা-সিদ্ধি মানসে কলুষিত মন নিয়া ভূত প্রেতের পূজায় রত ছিলেন। সেই ঘোরতর অনাচারের মধ্যে শঙ্করের অদ্বৈতবাদ নূতন মহিমায় উদ্ভাসিত হইয়া উদ্ভ্রান্ত মানব সম্প্রদায়কে আলোকের পথের সন্ধান দিয়াছিল। বৌদ্ধগণের কূটতর্কস্রোতঃ শঙ্করের তীক্ষ্ণ উদ্ভাবনী শক্তির সম্মুখে রুদ্ধ হইয়া গেল; পণ্ডিতগণ দলে দলে

তর্কযুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিলেন। *

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার এম, এ ভাগবতরত্ন বলেন,—খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালী তাহার শিক্ষা ও সমাজের সকল সমস্যার সমাধান নিজেই করিত। দেশে জ্ঞান প্রচার করিবার জন্য বা সমাজ হইতে দুর্নীতি বিদূরিত করিবার জন্য বাঙ্গালী তখন আবেদন নিবেদনের ঝুড়ি লইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইত না। বাঙ্গালা ছিল তখন স্বাধীন। এই স্বাধীন যুগে বাঙ্গালী কেমন করিয়া সমাজকে পরিচালনা করিত, সে সমাজের সংগঠনই বা কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার উপায় বড় কম। তথাপি মন চায় দেশের সেই অতীতের কথা আলোচনা করিয়া বর্ত্তমানের জটিল সমস্যাগুলির কিছু মীমাংসা করা যায় কিনা তাহাই বিবেচনা করিতে। সেইজন্য বহুস্থান হইতে সংবাদের টুকরা সংগ্রহ করিয়া অতীত বাঙ্গালার শিক্ষা ও সমাজের একটী চিত্র আঁকিতে প্রয়াসী হইয়াছি।

অতীতের ঘন যবনিকা ভেদ করিয়া বাঙ্গালা যখন তাহার রূপ আমাদের সম্মুখে প্রকাশ করেন, তখনও এস্থানে আর্য্যগণ বসবাস আরম্ভ করেন নাই। ঐতরেয় আরণ্যক (২।১।১) হইতে বাঙ্গালার প্রাচীনতম সমাজের কথা একটু জানা যায়। বেদের ঋষিরা অনার্য্যদের আচার ব্যবহারকে ভাল চোখে দেখিতেন না। তাই বাঙ্গালার সেকালের অধিবাসীদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তাহারা কদর্য্য খাদ্য ভক্ষণ করে। আর সেকালের বাঙ্গালীরা বোধ হয় কামপ্রবণ ছিলেন—তাই বেদের ঋষি তাহাদিগকে কাক ও চটক সদৃশ বলিয়াছেন।

তারপর বহু যুগ অতীত হইয়া গেল। আর্য্যগণ বাঙ্গালাদেশের সহিত অল্পে অল্পে পরিচিত হইতে লাগিলেন। বাঙ্গলাদেশেও যে তীর্থ থাকিতে পারে একথা তাঁহারা স্বীকার করিয়া লইলেন। সেই তীর্থ পরিদর্শনের জন্য যাঁহারা বাঙ্গালা দেশে আসিতেন, তাঁহাদের কোন দোষ হইত না। কিন্তু যাঁহারা কেবলমাত্র বেড়াইবার জন্য বাঙ্গালায় আসিতেন, আর্য্যগণ তাহাদিগকে জাতিচ্যুত করিতেন। ইহা হইতে আমরা এই বুঝি যে, সভ্যতার সেই প্রথম প্রত্যুষেও বাঙ্গালার সুজলা সুফলা ভূমির এমনই একটা আকর্ষণ ছিল, যে অনেক আর্য্য বংশধর সামাজিক বাধাকে অবহেলা করিয়াও এদেশে ভ্রমণ করিতে আসিতেন। ব্যাপারটা এইরূপ না হইলে মনুসংহিতাকার ঐরূপ নিয়ম করার প্রয়োজন বুঝিতেন না। বৌধায়ন নামে আর একজন সূত্রকার বলিয়াছেন যে, যদি কেহ বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরীর দেশে আগমন করেন, তবে তাঁহাকে একটী যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া নিজেকে শুদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। (১।১।২)

এই সময়ের মধ্যে আর্য্যগণ যে বাঙ্গালা দেশের সহিত অনেকটা পরিচিত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার সাক্ষ্য আমরা পাই জৈনদিগের প্রাচীনতম ধর্ম্মগ্রন্থ আচারাঙ্গ সূত্র হইতে। খৃষ্ট জন্মিবার প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে মহাবীর বা বর্দ্ধমান স্বামী আবির্ভূত হ'ন। তিনি আমাদের বাঙ্গালা দেশে আসিয়াছিলেন বলিয়া ঐ গ্রন্থ হইতে জানা যায়। তিনি "রাঢ়দেশে", "বজ্জভূমি" ও "সুভ্ভভূমির" মধ্যে অতিকষ্টে বার বৎসর কাটাইয়াছিলেন রাঢ়দেশ হইতেছে রাঢ় আর বজ্জভূমি বোধ হয় বীরভূমির নামান্তর। যাহা হউক জৈন গ্রন্থকার বলেন যে, বজ্জভূমিতে সে সময়ে কুকুরের বড় উৎপাত ছিল। অনেক সন্ন্যাসী কুকুর তাড়াইবার জন্য দণ্ড হাতে করিয়া বেড়াইতেন। ইহা দ্বারা এই প্রমাণ হয় যে বাঙ্গালা তখনও ভাল করিয়া আর্য্যভূমিতে পরিণত হয় নাই। তবে জৈনদিগের চতুর্থ উপাঙ্গ প্রজ্ঞাপনাসূত্রে আর্য্য বা পুণ্যভূমির মধ্যে কোটিবর্ষ ও রাঢ়দেশের উল্লেখ আছে।

যাহা হউক খৃষ্ট জন্মিবার চারিশত বৎসর পূর্ব্বে যে বাঙ্গালাদেশ আর্য্যভূমিরূপে পরিণত হইয়াছিল, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। কেননা মৌর্য্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী কৌটীল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে বঙ্গদেশকে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত আর্য্যদেশ বলিয়াই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালাদেশে কোনদিনই আদিম অধিবাসীদিগকে

* শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তীর পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত

একেবারে নির্ম্মূল করা হয় নাই। আর্য্য ও অনার্য্য পাশাপাশি ভাইয়ের মতন বাস করিয়াছে। বোধহয় উভয় জাতির মধ্যে বিবাহাদি কার্য্যও চলিয়াছে। আর্য্যগণ অনার্য্যদিগকে একদিকে যেমন শিক্ষা ও আচার দিয়া সভ্য করিয়া তুলিতেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি অনার্য্যের সহিত রক্তমিশ্রনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অনেক আচার ব্যবহার দেবদেবীকেও স্বীকার করিয়া লইতেছিলেন। ব্যাপারটা এরূপ না হইলে বর্ত্তমান বাঙ্গালীর চেহারার মধ্যে এতখানি বৈচিত্র্য দেখা যাইত না। আর আমাদের আধুনিক সমাজের আচার ব্যবহারও বৈদিক ও পৌরাণিক আচার ব্যবহারের সহিত এতটা তফাৎ হইত না। সকলেই জানেন, বাঙ্গালার অনেক আচার তাহার নিজস্ব—ভারতের কোথাও আর তাহা নাই। এ নিজস্বত্ব বাঙ্গালী পাইল কোথা হইতে? আমার মনে হয়, এ সকল জিনিষ বাঙ্গালী তাহার অনার্য্য পূর্ব্বপুরুষের নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছে।

বাঙ্গালীর রক্তের মধ্যে যে অনার্য্য রক্তের সংমিশ্রণ আছে, ইহা যদি নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণায় স্থির হইয়াই যায়, তাহা হইলেও বাঙ্গালীর অপমান বোধ করিবার কিছু নাই। বাঙ্গালার culture বা শিক্ষা—সভ্যতার চৌদ্দ আনা বোধ হয় আর্য্য। এ কথার প্রমাণ আমরা বাঙ্গালার পরের যুগের সমাজের কথা আলোচনা করিলেই পাইব।

সাধারণের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, বাঙ্গালাদেশে বৈদিক শাস্ত্রের আলোচনা ছিল না। আদিশূর নামে একজন রাজা সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালাদেশে পাঁচজন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন বিশুদ্ধ কায়স্থ আনিয়া বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদন করেন ও বঙ্গদেশে বৈদিক আলোচনার প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু এই আদিশূর রাজা কে তাহা ঐতিহাসিক ভাবে আজও আমরা জানিতে পারি নাই। আদিশূর উপাধি বাঙ্গালার অনেক ছোট বড় রাজা গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা বলিতেন যে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আদিশূর রাজত্ব করিতেন তাঁহাদের মত সম্প্রতি খণ্ডিত হইয়াছে। তবে আটবৎসর পূর্ব্বে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত দামোদরপুর নামক গ্রামে যে, পাঁচখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা স্পষ্টরূপে জানিতে পারি যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীরও দুইশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন ও তাঁহারা যাগযজ্ঞ সম্পাদন করিবার জন্য রাজ সরকার হইতে অনুগ্রহ পাইতেন। এই পাঁচখানি তাম্রশাসন আবিষ্কার করিয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসে এক অভিনব আলোক সম্পাত করিয়াছেন। এই তাম্রশাসন পাঠ করিলে আর কাহারও বলিবার উপায় থাকিবে না যে, বাঙ্গালাদেশে অনার্য্যসভ্যতা ছিল; বহুপরে এদেশে আর্য্যসভ্যতা বিস্তারলাভ করিয়াছিল।

গুপ্তসাম্রাজ্যের শেষ যুগে এই তাম্রশাসনগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহার একখানি ৪৮৮ খৃষ্টাব্দের। তাহাতে উল্লিখিত আছে যে একজন ব্রাহ্মণ "পঞ্চহোত্র যাগীয়" অর্থাৎ বৈদিক যজ্ঞাদি করিবার জন্য কয়েকখানি গ্রাম গুপ্তসম্রাটদের নিকট হইতে গ্রহণ করিতেছেন। ব্রাহ্মণ পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির কোটিবর্দ্ধন—বিষয়ের অধিবাসী। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বাঙ্গালাদেশে আর্য্যসমাজানুমোদিত চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের সৃষ্টি হইয়াছে। কেননা দামোদরপুরের তাম্রশাসনে কায়স্থ, বণিক প্রভৃতিরও উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐ সকল জাতির আবার নিজেদের মধ্যে সঙ্ঘ বা সভা ছিল। তাহা হইতে একজন প্রধান নির্ব্বাচিত হইয়া রাজকার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য মহকুমায় প্রেরিত হইতেন।

প্রাচীন বাঙ্গালার সমাজের সহিত রাষ্ট্রের যে সম্বন্ধ ছিল, তাহার ইহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বাঙ্গালার জাতিসমূহ তখন ছত্রভঙ্গ ছিল না। রাজা তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতেন। তাই উক্ত তাম্রশাসনে লিখিত হইয়াছে যে রাজকর্ম্মচারী কায়স্থ, বণিক প্রভৃতির প্রতিনিধিদের পরামর্শ লইয়া কার্য্যাদি করিবেন।

বাঙ্গালার সমাজ একাগ্রভাবে ব্রাহ্মণ্য আদর্শের উপাসনা বহুদিন করে নাই। বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাব আসিয়া বাঙ্গালার সমাজে বিপ্লব ঘটাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। পাল সম্রাটগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। সুতরাং দেশের অনেক লোক বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্ম জাতি ধর্ম্ম বা চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিল

একথা বলিলে ইতিহাসকে ঠিক বুঝা হইবে না। আমরা পালরাজাদিগের প্রশস্তি, দানপত্র প্রভৃতি আলোচনা করিয়া দেখিতে পাই যে তাঁহারা আইন করিয়া কোনদিন জাতিবিভাগ উঠাইয়া দেন নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিলেই জাতিত্যাগ করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই—অনেক বৌদ্ধ জাতি রাখিয়াই ধর্ম্মগ্রহণ করিতেন ইহা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন। পালবংশের গৌরবের প্রতিষ্ঠাতা ধর্ম্ম-পালদের "বর্ণান্ স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠাতা" অর্থাৎ যে যে জাতির লোক, তাহাকে সেই সেই জাতিতেই স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার বংশধর ঘোষণা করিয়াছেন। পালরাজাদের যে মন্ত্রীবংশ তিনপুরুষ ধরিয়া মন্ত্রীত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিশুদ্ধ বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহারা কেবল রাজনীতির চর্চ্চা লইয়াই থাকিতেন না—আর্য্যশাস্ত্র সমূহে তাঁহারা অশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে বৌদ্ধধর্ম্ম বাঙ্গলাকে একেবারে জাতিচ্যুত করে নাই।

তবে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে বাঙ্গলার তথাকথিত অনুন্নত জাতিদের সামাজিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কৈবর্ত্তজাতির আজকাল বাঙ্গলাদেশে তেমন প্রভাব প্রতিপত্তি নাই। কিন্তু খৃষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে ইঁহাদের প্রতাপে প্রবল পরাক্রান্ত পালসম্রাটগণ একেবারে সন্ত্রস্ত থাকিতেন। একবার তো তাঁহারা পালরাজাদিগকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন। যে পালসাম্রাজ্য একদিন কনোজকে পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিল, সেই পালসাম্রাজ্য কৈবর্ত্তশক্তির প্রতাপে কিছুকালের জন্য ধ্বংস হইয়া গেল। "কলিকালের বাল্মিকী" সান্ধ্যকর নন্দী তাঁহার "রামচরিত" নামক ঐতিহাসিক কাব্যে কৈবর্ত্তশক্তির হস্তে রামপালের দুর্দ্দশা বর্ণনা করিয়াছেন।

হাড়ী, ডোম প্রভৃতি জাতিও বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্পর্শে আসিয়া ধর্ম্ম জগতের অনেকখানি অধিকার লাভ করিল। বাঙ্গলাদেশে আজ ও অনেক স্থানে ধর্ম্ম ঠাকুরের পূজা হয়। এ পূজার পুরোহিত ব্রাহ্মণ নহে—ডোম। তাহারাই এ ধর্ম্মের সর্ব্বেসর্ব্বা। এই অধিকার তাহারা পালযুগেই লাভ করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। এই সকল আধুনিক অনুন্নত জাতির মধ্যে সে যুগে অনেক বিদ্বান লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রচিত পদ ও গাথা আজও নেপালে গীত হইয়া থাকে।

পালরাজাদের সময়ে বাঙ্গলাদেশের সমাজে আর একটী বৈশিষ্ট লক্ষ্য করিবার বিষয়। পালরাজারা বাঙ্গলার বাহিরে বিবাহ করিতেন। কয়েকজন পালসাম্রাজ্ঞী রাষ্ট্রকুটবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কুলজীগ্রন্থে আস্থাস্থাপন করিলে বলিতে হয় যে পালরাজাদের সময়ে সুবর্ণবণিকেরা বাঙ্গলাদেশ আক্রমণ করেন। তাঁহাদের হাতে প্রচুর ঐশ্বর্য্য ছিল। বর্ত্তমাণ সময়ের ন্যায় সেকালেও তাঁহারা বাঙ্গালীদের মধ্যে বড় capitalist বা ধনশালী ব্যক্তি ছিলেন।

পালরাজাদের পর সেনরাজগণের অভ্যুদয় হয়। নেপলিয়ন যে জন্য গণতন্ত্রমূলক ফরাসী সমাজে আবার আভিজাত্য সৃষ্টি করেন, সেনরাজগণও বোধ হয় সেই কারণেই কৌলীন্য স্থাপন করিয়া বাঙ্গলার সমাজে এক নবনীতি প্রবর্ত্তন করেন। বাঙ্গলাদেশের বুদ্ধিমান জাতিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠবংশগুলির সাহায্য রাজনৈতিক কার্য্যের জন্য হয়তো দরকার হইয়াছিল। সেই জন্যই বল্লাল কৌলীন্য প্রথার সৃষ্টি করেন। তবে এ জায়গায় একটু গলদ আছে। সেনরাজাদের প্রায় শতাধিক লিপি আবিস্কৃত হইয়াছে কিন্তু ইহাদের মধ্যে একখানিতেও তাঁহারা আভিজাত্য সৃষ্টি করিয়াছেন একথার কোন উল্লেখ করেন নাই। তবে আমাদের দেশে শত শত কুলগ্রন্থ বল্লালী কৌলীন্যের উল্লেখ করিয়াছে। এক্ষেত্রে আমরা সেগুলিকে একেবারে উড়াইয়া দিতে পারি না।

ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্যজাতির মধ্যে সেনরাজগণ কিরূপে কৌলীন্য প্রথা স্থাপন করিয়াছিলেন, সেকথা সকলেই জানেন। কিন্তু তাঁহারা কেবলমাত্র উচ্চ জাতিগুলির মধ্যে নূতন নিয়ম করিয়া সন্তুষ্ট হয়েন নাই। আজ যে আমরা কথায় কথায় নবশাখ জাতির উল্লেখ করি, এ নবশাখজাতি বল্লালী সৃষ্টি বলিয়াই কুলগ্রন্থগুলি উল্লেখ করিয়াছেন। নবশাখের শুদ্ধ নাম নবশায়ক—সেইগুলি এই—

গোপো মালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদক বারুজী।
কুমারঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ।

অর্থাৎ—তিলী মালী তাম্বুলী, গোপ নাপিত গোছালী
কামার কুমার পুঁটুলী, এই নব শাখাবলী॥

ইংরাজরাজগণ যেমন মধ্যযুগের Capitalist য়িহুদীদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিতেন, তেমনি বল্লালসেন সুবর্ণবণিকদিগের উপর যারপরনাই অবিচার করিয়া গিয়াছেন। সুবর্ণবণিকেরাই বৈশ্য ছিলেন কিন্তু বল্লালকে একবার অনেক টাকা ধার দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তিনি তাঁহাদিগকে একেবারে জল অচল শ্রেণীতে নামাইয়া দেন। আমাদের দেশের সমাজের সুদৃঢ় বন্ধন যে ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতেছিল তাহা স্বেচ্ছাতন্ত্র প্রণোদিত রাজার এইরূপ ব্যবহার হইতেই জানিতে পারি। গুপ্ত সাম্রাজ্যের যুগের ন্যায় সমাজ যদি এ যুগেও প্রবল থাকিত, তাহা হইলে রাজা এরূপ করিতে কখনই সাহসী হইতেন না। বৌদ্ধধর্ম্ম জাতিধর্ম্ম উঠাইয়া না দিলেও, সমাজের শক্তির অনেক হ্রাস করিয়াছিল, তাই সমাজের মেরুদণ্ড এমন করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে দেখিতে পাই।

বাঙ্গলাদেশের প্রজারা রাজার হাতে একেবারে খেলার পুতুল ছিল না। তাহারা উপযুক্ত রাজাকে প্রাণ দিয়া সেবা করিত, আবার অনুপযুক্ত রাজাকে সিংহাসন হইতে অপসারিত করিতে পারিত। গুপ্তযুগে কেমন করিয়া রাজ সরকার কায়স্থ বণিক প্রভৃতির প্রতিনিধিদের মত লইয়া কাজ করিতেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তারপর বাঙ্গলাদেশ যখন ক্রমাগত কামরূপী, কাশ্মিরী, গুর্জ্জর প্রতিহারদিগের আক্রমণে বিধ্বস্ত হইতেছিল, তখন প্রজারা সকলেই তাহাদের বিরোধ ভুলিয়া সমবেত হইয়া বপ্যটের পুত্র গোপালদেবকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছিল। গোপালের অধীনে বাঙ্গলার প্রজাশক্তি সাগর পর্য্যন্ত বাঙ্গলাদেশের সীমা বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বাঙ্গলার জনশক্তি বঙ্গদেশকে "বৃহদ্ বঙ্গে" পরিণত করিয়াছিল। আবার কৈবর্ত্ত আক্রমণে পালসাম্রাজ্যের ধ্বংস হইলে, বাঙ্গলার প্রজার সাহায্য ও সহানুভূতি লইয়াই রামপাল হৃত পিতৃসিংহাসন পুনরায় পাইয়াছিলেন

প্রাচীন সমাজে বাঙ্গলার নারী সম্বন্ধে এইবার কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। একজন ফরাসী মহিলা পৃথিবীর প্রাচীন বীরাঙ্গনাদের নাম ও বিবরণী প্রকাশ করিয়া নারীর অধিকার স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন। আপনারা শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন যে তাহার মধ্যে আমাদের দেশের ময়নামতীর বীরত্ব কাহিনীর উল্লেখ আছে এই ময়নামতীর কথা আমাদের দেশের কয়জন লোক জানে? অথচ বিদেশের নারী তাঁহাকে লইয়া গৌরব করিয়াছেন। ময়নামতীর কথা গোবিন্দচন্দ্রের গীতে সবিশেষ বর্ণিত আছে। কাঠ পাথরের সাক্ষ্য তাঁহার সম্বন্ধে না পাওয়া গেলেও তিনি যে সত্যই বীর মহিলা ছিলেন, তাহা রঙ্গপুরে তাঁহার নামের সহিত জড়িত অনেকগুলি স্থান সাক্ষ্য দিতেছে। যে সমাজে ময়নামতীর ন্যায় বীরমহিলার উদ্ভব হইয়াছিল, যে সমাজে ময়নামতী সমস্ত রাজ্যপরিচালনা করিবার ক্ষমতা পাইয়াছিলেন, সে সমাজে নারীকে কেবলমাত্র উপভোগের জন্য দাসী করিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহা কেমন করিয়া বলিব?

বাৎস্যায়ন তাঁহার কামসূত্রে বাঙ্গলার মেয়েদের অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন বাঙ্গলার মেয়েরা নিজের দোষ ঢাকিতে বড় পটু—পরের সামান্য একটু ত্রুটী দেখিলে হাসিয়া লুটপাট হয়—তাহারা সর্ব্বংসহা অর্থাৎ কোন দুঃখেই তাহারা বিচলিত হয়েন না। তবে বাৎস্যায়ন ও কোটীল্যের অর্থশাস্ত্র পড়িলে অনুমান হয় যে নারীকে তখনও অবরোধের মধ্যে বাস করিতে হইত। অবরোধ মুসলমান যুগের নূতন আমদানী নহে। কিন্তু এ অবরোধ মুসলমানদের জেনানার ন্যায় কঠোর নহে। বাঙ্গলার স্বাধীনতার শেষ যুগের কবি ধোয়ী তাঁহার "পবনদূতে" বাঙ্গলার নারীর প্রেম-প্রবণ হৃদয়ের বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে সেকালে বাঙ্গলার মেয়েরা তালপত্রের গহনা কর্ণে দুলের মতন করিয়া পরিতেন।

স্বাধীন বাঙ্গলার সমাজে আমোদ প্রমোদের অভাব ছিল না। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রাচীন বঙ্গের গৌরবের মধ্যে থিয়েটারের

উল্লেখ করিয়াছেন। থিয়েটারকে আমাদের দেশে প্রেক্ষাগৃহ বলিত। ভরত তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে "নাটকের চারিপ্রকার ভেদ করিয়াছেন—আবন্তী, দাক্ষিণাত্যা, পাঞ্চালী ও ওড্র-মাগধী। এই শেষোক্ত প্রকারের নাটক পূর্ব্বদেশে প্রচলিত ছিল। কিন্তু ওড্র-মাগধী প্রণালীর নাটক বঙ্গদেশেই বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। ভরত-মুনি বলেন যে বঙ্গদেশ হইতে মলচ, মল্ল, বর্ষক, ব্রহ্মোত্তর, ভার্গব, মার্গব, প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুলিন্দ, বৈদেহ, তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি দেশ নাটকের প্রবৃত্তি গ্রহণ করিত। "এই নাটকের প্রবৃত্তি এই যে ইহারা প্রহসন ভালবাসিত, ছোট ছোট নাটক ভালবাসিত, পূর্ব্ববঙ্গে আশীর্ব্বাদ ও মঙ্গলধ্বনি ভালবাসিত, আর সংস্কৃত পাঠ ভালবাসিত; স্ত্রীর অভিনয় তাহাদের আদৌ ভাল লাগিত না, পুরুষের অভিনয়ই তাহাদের পছন্দ ছিল। তাহারা নাটকে গান, বাজনা, নাচ—এসব ভালবাসিত না পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষায় বলিতে গেলে "খৃষ্টের দুইশত বৎসর পূর্ব্বেও যদি বাঙ্গলায় নাটকের একটা স্বতন্ত্র রীতি চলিয়া থাকে, তবে তাহা বাঙ্গালীর কম গৌরবের কথা নহে।"

খৃষ্টের দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ভরতমুনি বলিয়াছেন যে বাঙ্গালী নাটকের মধ্যে নাচগান ভালবাসিত না। কিন্তু খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে যে বাঙ্গালী নৃত্যকলায় সবিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহার পরিচয় আমরা "রাজতরঙ্গিনী" হইতে পাই। ঐ গ্রন্থে লিখিত আছে যে কাশ্মীরের রাজকুমার জয়ন্ত ছদ্মবেশে বঙ্গদেশে আসিয়া কমলা নাম্নী নর্ত্তকীর অভিনব নৃত্যভঙ্গী দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। সেকালে নর্ত্তকীরা ভদ্র ব্যবহারে ও সামাজিক আদব কায়দায় সকলের মনোহরণ করিত। রাজকুমার জয়ন্ত কমলার সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাহার বাড়ীতে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন।

কিন্তু খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে সেন রাজাদের সময়ে বাঙ্গালী বোধহয় একটু অতিরিক্ত মাত্রায় আমোদ প্রমোদে গা ভাসাইয়া দিয়াছিল। ধোয়ী কবি তাঁহার "পবনদূতে" বলিয়াছেন যে বিজয়পুরের অর্থাৎ সেন রাজাদের তদানীন্তন রাজধানীতে প্রকাশ্য রাজপথে তরুণী নর্ত্তকীরা মদিরাপানে বিহ্বল হইয়া নূপুর নিক্কণে রাজপথ মুখরিত করিত। সুরসিক নাগরিকবৃন্দ তাহাদের সেই নৃত্যের সহিত যোগ দিত।

কিন্তু সেন রাজাদের যুগে বাঙ্গলার শিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। বাঙ্গলাদেশ চিরদিনই ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ও ভারতের বাহিরে জ্ঞান প্রচারের জন্য শিক্ষাগুরু প্রেরণ করিয়াছে। হুয়েনসাং যখন আমাদের দেশ পরিদর্শন করিতে আসেন তখন ভারতের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন বাঙ্গালী অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করিতেছিলেন। তাঁহার নাম শীলভদ্র। তিনি সমতটে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হুয়েনসাং স্বয়ং প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধীয় কতকগুলি প্রশ্নের মীমাংসা করিতে না পারিয়া তিনি বহু পণ্ডিতের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু কেহ তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা মিটাইতে পারেন নাই। নলেন্দায় যাইয়া শীলভদ্রকে জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি সেগুলি সুন্দরভাবে হুয়েনসাংকে বুঝাইয়া দেন। হুয়েনসাং মুগ্ধ হইয়া এই বাঙ্গালী পণ্ডিতের পদতলে বসিয়া পাঁচ বৎসর কাল শিক্ষালাভ করেন।

শীলভদ্রের পরে শান্তরক্ষিত অতীশ দীপাঙ্কর প্রভৃতি বহু বাঙ্গালী পণ্ডিত সমগ্র ভারতের মধ্যে জ্ঞানের খ্যাতি লাভ করিয়া সুদূর তিব্বতে আহূত হইয়াছিলেন তাঁহারা তিব্বতে যাইয়া বাঙ্গলার শিক্ষা ও সভ্যতা তথায় প্রচার করেন। ইঁহাদের পরে লুই সিদ্ধাচার্য্য, বিভূতিচন্দ্র প্রভৃতি নেপালে বিশেষ সম্মান পাইয়াছিলেন।

বাঙ্গলার রাজা নয়পাল বিক্রমশীলা মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সেখানে বাঙ্গালী দীপাঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বাঙ্গলাদেশের মধ্যেই একটী বিশ্ববিদ্যালয় পাল রাজাগণ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার নাম জগদ্দল মহা-বিহার। "রামচরিত" হইতে জানা যায় যে এটী গঙ্গা ও করতোয়ার সঙ্গমের উপরে অবস্থিত ছিল। এখানে বাঙ্গালার একটী শিক্ষাকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। অনেক বড় বড় পণ্ডিত এখানে বাস করিতেন। বিভূতিচন্দ্র ও দানশীল নামক জগদ্দল বিহারের ভিক্ষুদ্বয়ের অনেক

গ্রন্থ তিব্বতীয়গণ আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্লাবনে বাঙ্গলার বৈদিক আলোচনা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পাল রাজাদের মন্ত্রীরা বেদ-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন একথা তাঁহাদের লিপি হইতেই জানা যায়।

বৈদিক শিক্ষা সেন রাজাদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়। বাঙ্গলায় বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের যেটুকু ক্ষতি করিয়াছিল, তাহা সারিবার জন্য সেন রাজাদের যুগে স্মৃতিশাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল। মনুসংহিতার টীকাকার গোবিন্দরাজ "স্মৃতিমঞ্জরী" নামে একখানি সুবৃহৎ স্মৃতির নিবন্ধ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তিনি ও জীমূতবাহন, তাঁহাদের অদ্ভুত শক্তি ও প্রতিভাবলে দায়ভাগে বাঙ্গলার একটা নিজস্ব মত স্থাপন করেন। .সম্পত্তি বাঙ্গলাদেশে ও ভারতের বংশগত ছিল। কিন্তু ইঁহারা সম্পত্তিকে ব্যক্তিগত করিলেন। বাঙ্গলা চিরদিনই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। তাই বাঙ্গলার স্মৃতিশাস্ত্রে এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

সেনরাজাদের যুগে বাঙ্গলাদেশে কাব্য শাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। রাজারা অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহারা নিজে গ্রন্থরচনা করিতেন। তাঁহাদের রাজসভায় বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ কবিগণ পূজার্ঘ্য পাইতেন। জয়দেব, তাঁহার "গীত গোবিন্দে ধোয়ী, উমাপতিধর, প্রভৃতি অনেকগুলি পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ধোয়ী কবির পবনদূত কিছুদিন পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

স্বাধীন বাঙ্গলার শিক্ষা ও সমাজ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে গেলেই প্রথমেই মনে হয় যে এ একটা জীবন্ত সমাজ। যেটুকু পরিচয় আমরা স্বাধীন বাঙ্গলার পাই, তাহাতেই ইহার শক্তি ও সুদৃঢ়বন্ধনের কথা জানিতে পারি। বাঙ্গলার সমাজ যতদিন সজীব স্বাধীন ছিল, দেশও ততদিন স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের বীজ আচার্য্য ক্ষেমেন্দ্র প্রবর্ত্তিত মহাযান পন্থার মধ্যেই লুক্কায়িত ছিল। তান্ত্রিক প্রভাবের উগ্রতায় বৌদ্ধসমাজ যখন একপ্রকার শক্তিহীন;—তখন দাক্ষিণাত্যের শৈব সন্ন্যাসী আচার্য্য শঙ্কর ভীমবেগে বৌদ্ধগণের দৌর্ব্বল্যের সুযোগে তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। অনেকে মনে করেন যে বৌদ্ধধর্ম্মের পতনে তান্ত্রিকধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে। এই অনুমান মোটেই সত্য নহে। অথর্ব্ববেদোক্ত ক্রিয়াকলাপ এবং যাগযজ্ঞাদি হইতে পরবর্ত্তীকালে তন্ত্রোক্ত ক্রিয়া কলাপের সৃষ্টি হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে প্রচীন সমাজে অথর্ব্বান অর্থে মন্ত্রবিদ পুরোহিত যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া মন্ত্রশক্তিতে ইন্দ্রাদি দেবগণকে আকর্ষণ করতঃ যজমানকে জয়দান করাইতেন। এই সমস্ত আকর্ষণ, মারণ, প্রভৃতি কর্ম্মই পরবর্ত্তীকালে তন্ত্রনামের ছদ্মবেশে পূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তন্ত্রোক্ত ষট্‌কর্ম্মের আকর্ষণ, মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ ইত্যাদি কার্য্য অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্রবিদ্ পুরোহিতগণের কার্য্যাবলীর পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছে।

যাহা হউক মহাযান পন্থা প্রবর্ত্তিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম তান্ত্রিক প্রভাবান্বিত হইয়া উঠে এবং খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হইত না। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে আবার ক্ষাত্রশক্তির উদ্বোধন আরম্ভ হইয়াছিল মাত্র। সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন পরিলক্ষিত হয়। ভারতের তদানীন্তন সম্রাট মৌর্য্যবংশের শেষ রাজা বৃহদ্রথকে নিধন করিয়া পুষ্পমিত্র মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং মহাউৎসাহে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেণ। সুঙ্গ এবং কাম্বায়ন বংশীয় নৃপতিগণ হিন্দু ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে সমুদ্রগুপ্তের শাসন সময়ে হিন্দুধর্ম্ম আবার নবীন গৌরবে দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া উঠিয়াছিল। সেই সময় গৌড়ের সম্রাট বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালবংশীয়গণের শেষ মদনপাল স্বীয় রাণীকর্ত্তৃক বিষপ্রয়োগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তদবধি গৌড়ের সিংহাসনে হিন্দু শূর-বংশীয়গণের অধিকার আবদ্ধ হয়। শূরবংশের প্রথম রাজা শূরসেন বা আদিশূর,—ইনি সম্রাট মদন পালের সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বঙ্গের সিংহাসনেও তখন হিন্দু

রাজগণের আধিপত্য ছিল। বঙ্গের অধিপতি রামপাল শৈব ছিলেন। বর্ত্তমান মুন্সীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী রামপাল নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। এইভাবে তৎকালে ভারতের নানাস্থানেই হিন্দুগণ প্রবল হইয়া উঠিতেছিলেন। মুসলমানগণ যখন ভারতের উপর শ্যেণদৃষ্টিতে লক্ষ্য রাখিতেছিল ;—তখন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রসাদে নিশ্চেষ্টতার জড়তা, অবসাদের হস্ত হইতে সমাজ আবার মুক্ত হইতেছিল,—ক্ষাত্রশক্তির স্পন্দন আবার সমাজের বুকের ভিতর অনুভূত হইতেছিল ;—কিন্তু তখনও ভারতের অধিকাংশ লোক জড়তার অবসাদ হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই ;—এক কথায়, এই শক্তির উপাসনা সীমাবদ্ধ ছিল মাত্র মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে। বৈশ্য এবং বৈশ্যেতর সম্প্রদায় তখনও বৌদ্ধধর্ম্মের মেষবৎ নিরীহভাব পরিত্যাগ করিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। বিজাতীয় আক্রমণ হইতে ধর্ম্ম এবং দেশরক্ষার্থ বুকের রক্তে যুদ্ধক্ষেত্র বা মন্দিরপ্রাঙ্গণ সিক্ত করিয়াছিল স্বাধীনতাকামী জনকয়েক ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ। মহম্মদ বিন কাসিম যখন সিন্ধুপ্রদেশ আক্রমণ করেন, তখন তাহাকে বাধা দিতে বৌদ্ধগণ তো হিন্দুগণের সঙ্গে যোগদান করেনই নাই ;—পরন্তু তাহারা প্রাণভয়ে আরব পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। যে ধর্ম্মে এমন কাপুরুষতা শিক্ষা দেয় সেই ধর্ম্মের পতন অবশ্যম্ভাবী।

আরবের মরুবক্ষের তপ্তবালুকণা তদ্দেশীয় মুসলমানগণকে বেশীদিন তৃপ্ত রাখিতে পারে নাই, অচিরাৎ তাহারা উন্মুক্ত করবাল হস্তে দিকে দিকে নবধর্ম্মের বার্ত্তা নিয়া যোদ্ধবেশে বহির্গত হয়। সেই সময় পারস্য হইতে কতকগুলি লোক ধর্ম্মলোপের ভয়ে ভারতবর্ষে পলাইয়া আসে। ভারতবর্ষও তাহাদিগকে আশ্রয় দিতে কার্পণ্য করে নাই। উক্ত পারস্যাগত সম্প্রদায় বোম্বাই, গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশে পারসীক নামে এখনও পরিচিত।

সেইযুগে একদিকে ব্রাহ্মণগণ যেমন বৌদ্ধধর্ম্মের চিতাভস্মের উপর অভ্রভেদী মন্দির নির্ম্মাণে ব্যস্ত ছিলেন ;—অন্যদিকে তেম্‌নি ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ বিজাতীয় আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছিলেন। কিন্তু মেষবৎ নিরীহ জনসাধারণ ক্ষাত্রশক্তির অনুশীলন হইতে সযত্নে এবং সভয়ে দূরেই সড়িয়া থাকিত। তাই অতি সহজে মুসলমান বিজেতাগণ তক্ষশীলা, তদন্তাপুরী, বিক্রমশীলার সংঘারাম, বিহার প্রভৃতি অতি অল্পায়াসে চূর্ণ করিয়া ভারতের প্রাচীন সভ্যতার ধারাবাহিক গতি ব্যাহত করিতে পারিয়াছিল ; তাই সুলতান মামুদের সোমনাথ মন্দির আক্রমণের ইতিহাসে ভারতের ক্ষাত্রশক্তির গৌরব এমন করিয়া লাঞ্ছিত হইয়াছিল। হিন্দুর পুনরুত্থানের যুগে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে জীবনীশক্তি লাভ করিলেও গৌড়ীয় পঞ্চরাজ্যে উহা একেবারেই লুপ্ত হইয়াছিল। তাই গৌড়ের তদানীন্তন শূরবংশীয় সম্রাট আদিশূর বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানে পারদর্শী ব্রাহ্মনের জন্য কান্যকুব্জরাজের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। গৌড়ের সম্রাট আদিশূরসেনের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে কান্যকুব্জ রাজ বীরসিংহ বেদশাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত পঞ্চজন ব্রাহ্মণ প্রেরণ করেন। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে রাঢ়ীমতে শাণ্ডিল্য গোত্র ভট্টনারায়ণ, ভরদ্বাজ গোত্র শ্রীহর্ষ, সাবর্ণগোত্র বেদগর্ভ, বাৎস্যগোত্র ছান্দড়, কাশ্যপগোত্র দক্ষ ;—কিন্তু বারেন্দ্রকুল শাস্ত্রমতে উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণের নাম যথাক্রমে নারায়ণ, সুষেণ, পরাশর, ধরাধর ও গৌতম। এই যে নামের পার্থক্য ইহার কারণ এই যে ব্রাহ্মণের একটী প্রকাশ্য ও একটী সঙ্কল্পের নাম থাকা রীতি। তাই রাঢ়ী বারেন্দ্র কুলশাস্ত্রে এই নামের পার্থক্য সূচিত হইয়াছে। ইতিহাসের দিক দিয়া এই পঞ্চব্রাহ্মণের আগমনের মূল্যে অধিক না হইলেও সামাজিক জীবনের ইতিবৃত্তে এই ঘটনা অমূল্য সম্পত্তি। কারণ পরবর্ত্তী বঙ্গীয় সমাজে এই পঞ্চব্রাহ্মণের উত্তরাধিকারীগণ এক অসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। উক্ত পঞ্চব্রাহ্মণের সহিত পাঁচজন কায়স্থও কাণ্যকুব্জ হইতে এই দেশে আসেন। তন্মধ্যে মকরন্দ ঘোষ ভট্টনারায়ণ সমভিব্যাহারে, কালিদাস মিত্র শ্রীহর্ষের সহিত, দশরথ গুহ বেদগর্ভের সঙ্গে, দাশরথী বসু ছান্দরের সহ এবং পুরুষোত্তম দত্ত দক্ষ সমভিব্যাহারে এই দেশে আগমন করেন। এই সমস্ত কায়স্থ সন্তান ঐ পঞ্চ মহর্ষির ভৃত্যরূপে বা শরীররক্ষী স্বরূপেই ঐদেশে আগমন করেন। শ্রোত্রিয়গণ যজ্ঞাদি সমাপনান্তর স্বদেশে প্রস্থান করেন ; কিন্তু গৌড়ে আগমন হেতু পতিত বিবেচনায়

তদ্দেশীয় সমাজ তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে নারাজ হওয়ায় তাঁহারা পুনরায় ৯৪৪ শকে বা ১০২২ সালে রাজা আদিশূরের নিকটে উপস্থিত হইয়া রাজপ্রদত্ত ব্রহ্মত্তরাদি প্রাপ্ত হইয়া এই দেশে বাস করিতে লাগিলেন। শ্রোত্রিয়গণ কালক্রমে ১৫৬ ঘরে বিভক্ত হন। তন্মধ্যে একশত ঘর বরেন্দ্রভূমিতে অবস্থান করেন এবং বাকী ৫৬ ঘর রাঢ়দেশে ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হইয়া তদ্দেশে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। এই প্রাদেশিকতা হইতেই ব্রাহ্মণসমাজ প্রধাণতঃ রাঢ়ী বারেন্দ্র নামে বিভক্ত হন।

আদিশূর বা শূরসেনের ৯ম পুরুষে প্রায় তিনশত বৎসর পরবর্ত্তীকালে দৌহিত্রবংশে বল্লালসেনের জন্ম। বল্লাল সেনের মাতামহ চন্দ্রসেন অপুত্রক হওয়ায় বল্লালসেন উত্তরাধিকার সূত্রে গৌড়ের সম্রাট পদ প্রাপ্ত হন। বল্লালের পিতা বিজয়সেন বঙ্গের অধীশ্বর রামপাল রায়ের রাজ্য দানসূত্রে পাইয়াছিলেন। রামপাল রায় শৈব ধর্ম্মাবলম্বী। বিক্রমপুরে রামপাল নামক গ্রামে তাঁহার রাজধানী ছিল। পৈত্রিক উত্তরাধিকারে বঙ্গ রাজ্য এবং মাতামহের উত্তরাধিকারে গৌড় রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া অচিরে বল্লালসেন গৌড়ীয় পঞ্চরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট হন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে বল্লাল সমাজ বন্ধনের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি সকলকে রাজধানীতে আহ্বান করেন। সেই সভায় শ্রোত্রিয় সন্তানগণের ৫৬ গাঁঞীয়ের ৫৬ জন উপস্থিত হন। তন্মধ্যে নবগুণ বিশিষ্ট যথা : —

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠাতীর্থদর্শনং
নিষ্ঠা শান্তি স্তপো দানং নবধা কুললক্ষনং॥

অর্থাৎ আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, শান্তি তপ দান প্রভৃতি নবগুনযুক্ত শ্রোত্রিয়কে কুলীন আখ্যায় ভূষিত করেন। কায়স্থগণের মধ্যেও ঘোষ, বসু, গুহ, ও মিত্র উপাধিধারী ব্যক্তিগণ সবিনয়ে ব্রাহ্মনের দাস বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে তাঁহাদের নম্রতায় সন্তুষ্ট হইয়া সম্রাট তাহাদিগকে কৌলীন্য মর্য্যদা প্রদান করেন, কিন্তু বিনয়ের অভাবহেতু দত্ত উপাধীধারী অকুলীন রহিলেন। বল্লাল অন্যান্য জাতির প্রধানগণকেও সমাজিকভাবে সম্মানিত করিয়াছিলেন ;—কিন্তু কৌলীন্য আখ্যা তাহাদিগকে প্রদান করেন নাই। বল্লালী আমলে বঙ্গীয় বৈশ্য সমাজ সুবর্ণবণিক, স্বর্ণকার, গন্ধ ও শঙ্খবণিক প্রভৃতি চারিভাগে বিভক্ত ছিল তন্মধ্যে সুবর্ণবণিকেরা অর্থসম্পদের গৌরবে সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিল। তৎকালে বণিক সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন বল্লভানন্দ শেঠ। মণিদত্ত নামক বল্লভানন্দের এক ভাগিনেয় কুন্দন আচার্য্য নামক জনৈক ব্রহ্মণের স্বর্ণগাভী প্রতারণা করিয়া আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করায় রাজদ্বারে অভিযুক্ত হয়। বল্লভানন্দ প্রভৃতি সমাজের অন্যান্য নেতাগণ মিথ্যার সমর্থন করায় সম্রাট বল্লাল সেন তাহাদিগকে সমাজে পাতিত করেন এবং বকদ্বীপের দক্ষিণাংশে নির্ব্বাসিত করেন। পিতৃ অপমানে রোষান্বিতা বল্লভের কন্যা পদ্মিনী উপযাচিকা হইয়া গোনমতে স্বীয় রূপলাবণ্যে সম্রাট বল্লালকে মুগ্ধ করে। রূপমুগ্ধ বল্লাল তাহাকে উপ পত্নীরূপে রাখেন রূপসীর চরনতলে যখন সম্রাট মানসম্মান লোকলজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া পরমলম্পটে পরিণত হন, তখন পদ্মিনী নীজকে হড্ডিকা বলিয়া পরিচিত করিতে লাগিলেন। হড্ডিকা সংশ্লিষ্ট রাজসভায় থাকিলে জাতিচ্যুতির সম্ভাবনায় শ্রোত্রীয়গণ অনেকে নবদ্বীপ, শান্তিপুর প্রভৃতি রাঢ় ও বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে প্রস্থান করেন।

ব্রাহ্মণদের মত বৈদ্য ও কায়স্থদের মধ্যেও রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগ আছে। পরবর্ত্তী কালে কায়স্থ সমাজ রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বঙ্গজ প্রভৃতি তিনটি বিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। সাহা সম্প্রদায়ও বল্লাল সেন কর্ত্তৃক সমাজে পতিত হয়। বল্লালের সময় হইতেই সুবর্ণবণিক ও সাহা সম্প্রদায় জল অনাচরনীয় পংক্তিতে স্থানলাভ করিয়াছে।

সম্রাট বল্লাল যে সমস্ত সামাজিক বিধান করিয়া গিয়াছেন তাহা দ্বারা বঙ্গের সমাজের জীবন এখনও প্রভাবান্বিত। কৌলীন্য প্রথার স্রষ্টা এই বিধান করিয়াছিলেন যে প্রত্যেক ত্রিশ বৎসর অন্তর একবার বাছনী করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে কুলীন উপাধিতে ভূষিত করা হইবে তাঁহার জীবদ্দশায় একবার মাত্র এই বাছনী করিতে পারিয়াছিলেন।

গৌড়ের সেনান্ত নামধারী বংশকে কেহ কেহ ব্রাহ্মণ আবার কেহ কেহ বৈদ্য জাতিয় বলেন, প্রকৃত পক্ষে সেনরাজগণ ব্রাত্যক্ষত্রিয় ছিলেন। সেনরাজগণ

নিজেদিগকে শাসন পত্রাদিতে এবং বল্লালসেন স্বরাচিত দানসাগর গ্রন্থে নিজকে চন্দ্রবংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন;—ব্রাহ্মণ বা বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দেন নাই বল্লাল চরিতে উল্লিখিত আছে যে কুন্তী গর্ভসম্ভুত অঙ্গাধিপতি কর্ণের পৌত্র বৃষসেন, তৎপুত্র পৃথুসেন তদ্বংশে সামন্তসেন, তৎপুত্র হেমন্তসেন, তৎপুত্র বিজয়সেন তৎপুত্র বল্লালসেন। বল্লালকৃত দানসাগর গ্রন্থেও ইহা উল্লিখিত আছে। কুন্তীগর্ভজাত কর্ণ বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় হইলেও সূত জাতীয় কন্যা বিবাহকরায় তাহার বংশ বর্ণসঙ্কর দোষে দূষিত হইয়াছিল। সুতরাং তথা কথিত সেনবংশ ক্ষত্রিয়ত্বও দাবী করিতে পারেন না;—পরন্ত তাঁহারা পতিত বা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়। আমাদের মনে হয় এই সেন শব্দটী তাহাদের জাতি বোধক নহে;—নামের অংশবিশেষ। সুতরাং এই বংশকে সেনবংশ না বলিয়া শূরবংশ বলাই সমিচীন। স্বরচিত দানসাগর গ্রন্থে বল্লাল স্বীয়বংশকে চন্দ্রবংশোৎপন্ন এবং ক্ষত্রিয়াচারী বলিয়াছেন;—কিন্তু ব্রাহ্মণ বা বৈশ্য বলেন নাই। যথা :—"ইন্দোর্বিশ্বৈকবন্ধোঃ শ্রুতিনিয়মগুরুঃ ক্ষত্রিয়চারিত্র-চর্য্যা-মর্য্যাদাগোত্রশৈলঃ ... ... নিরগমদবণেভূষণং সেনবংশঃ।" বল্লাল নিজবংশকে প্রকৃত ক্ষত্রিয় বলিতেও সাহসী হন নাই—শুধু ক্ষত্রিয় আচারী বলিয়া উল্লেখ করিরাছেন। পরবর্ত্তীকালে ঘটক কারিকাবলীতে সেন বংশকে বৈশ্যজাতীয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; কিন্তু উক্ত ঘটক কারিকাবলী বল্লালের তিরোধানের বহুপরে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল; কাজেই ইহার প্রামাণ্য সম্বন্ধে একটা ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হয়। বল্লাল বৈশ্যজাতীয় হইলে কৌলীন্য প্রথা বৈশ্যদিগের মধ্যেও প্রচলিত করিতেন; কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। অবশ্য কুলজীগ্রন্থে বৈশ্যদিগের মধ্যেও কৌলীন্য সংস্থাপনের উল্লেখ আছে এবং যথাক্রমে সেন, দাস ও গুপ্তকে উত্তম মধ্যম ও অধম কুলীন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বৈশ্যজাতির মধ্যে বল্লাল কর্ত্তৃক এই কৌলিন্য স্থাপনের উক্তি মানিতে গেলে বল্লালের ব্রাহ্মণত্বের দাবী টিকিতে পারেনা। বৈশ্যজাতি যদি ব্রাহ্মণই হইয়া থাকে তাহা হইলে পৃথকভাবে তাহাদের কৌলিন্য স্থাপনের কোন যুক্তি কোনমতেই খাটেনা। কুলজীগ্রন্থের ঐ উক্তি হয়তো পরবর্ত্তী কালে অর্থলোভে কোন ঘটক মহাশয়ের লেখনী নিসৃত হইয়া থাকিবে।

দানসাগর গ্রন্থে, "শ্রুতিনিয়ম গুরু" শব্দ থাকায় অনেকে সেনবংশের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে যত্নবান। শ্রুতি শব্দের অর্থ বেদ, শ্রুতি নিয়ম অর্থাৎ বেদবিহিত নিয়ম যিনি প্রচার করেন তিনি ব্রহ্মাণ ব্যতীত আর কি? শাস্ত্রবিধানে হিন্দু নৃপতি মাত্রেই শ্রুতি নিয়ম গুরুত্ব এবং চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের উপর নেতৃত্ব করিয়াছেন। মহাভারত শান্তি পর্ব্বে ২৫ অধ্যায় ৩৬ শ্লোকে তাহারই সনর্থন করেন। যথা :—

"সম্যগ্ বেদান্ প্রাপ্য শাস্ত্রাণ্যধীত্য সম্যগ্ রাজ্যং পালয়িত্বা চ রাজা। চাতুর্ব্বর্ণ্যং স্থাপয়িত্বা স্বধর্ম্মে পূতাত্মা বৈ মোদতে দেবলোকে।" অর্থাৎ রাজা সম্পূর্ণরূপে বেদ বিদ্যালাভ ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করতঃ সম্যকরূপে প্রকৃতিপালন ও চাতুর্ব্বর্ণকে স্বধর্ম্মে স্থাপন পূর্ব্বক পবিত্র হইয়া সুখে সুরলোকে বাস করেন। বঙ্গের সেনান্ত নামধারী রাজবংশ যদি ব্রাহ্মণ হইতেন তবে ব্রাহ্মণের নিকট এত নম্রতা, এ সবিনয় ব্যবহার করিতেন না। দানসাগর গ্রন্থের প্রারম্ভে বল্লাল ব্রাহ্মাণগণকে প্রনাম করিয়াছেন :—

"যে সাক্ষাদবণীতলামৃতভুজো বর্ণাশ্রমজ্যায়সাং
যেষাং পাণিষু নিক্ষিপন্তি কৃতিনঃ পাথেয়মামুষ্মিম্।
যদবক্ত্রোপনতাঃ পুনন্তি জগতীং পুণ্যাস্ত্রিবেদীগির—
স্তেভ্যো নির্ভরভক্তিসম্ভ্রমনমন্মৌলি দ্বিজেভ্যো নমঃ॥"

অর্থাৎ পৃথিবীতে যাঁহারা প্রত্যক্ষ দেবতা বর্ণাশ্রমের শীর্ষস্থানীয় পূণ্যবান লোকেরা যাঁহাদের হস্তে পরলোকের পাথেয় গচ্ছিত রাখেন। যাঁহাদিগের মুখহইতে পবিত্র বেদধ্বনি ত্রিভুবন কে পবিত্র করিতেছে, সেই ব্রাহ্মণগণকে সাতিশয় ভক্তি ও সম্মানের সহিত মস্তকাবণতঃ পূর্ব্বক প্রনাম করিতেছি।" দানসাগর গ্রন্থের মুখবন্ধে বল্লাল ব্রহ্মণের সম্বন্ধে সম্মানজনক এমন অনেক উক্তি করিয়াছেন। বল্লাল যদি প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্মণ হইতেন তবে তিনি দানসাগর গ্রন্থের মুখবন্ধে দেবতাকেই প্রনাম করিতেন,—ব্রাহ্মণকে করিতেন না।

প্রকৃতপক্ষে সেনান্ত নামধারী রাজবংশ ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছিলেন না তাঁহারা ব্রাত্য ক্ষত্রিয় ছিলেন। অধুনা অনেকে উক্ত রাজবংশকে বৈদ্য জাতীয় বলিতেছেন এবং শ্রুতি-নিয়ম গুরুত্ব বিশিষ্ট বলিয়া শূরবংশকে ব্রাহ্মণ বংশীয় বলিয়া সগর্ব্বে ঘোষণা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণত্বের দাবী করেন। (মহাভারত অনুপর্ব্ব ৪৮।৭)

* লক্ষ্মণসেনের সময়ে কৌলীন্য প্রথা বংশানুক্রমিক সম্মানে পরিণত হয়। কৌলীন্য প্রথার এই নূতন বিধানে বঙ্গের হিন্দু সমাজের মধ্যে যে কি পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বিক্রমপুরের সমাজ এখন পর্য্যন্ত সেই অবিমৃষ্যকারিতার দুষ্টাবিষের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। বিক্রমপুরের প্রভাব এখনও সমস্ত বঙ্গদেশের বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া আছে। তারপরে ঐ দেশে মুসলমান গণের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন সভ্যতা হিন্দু সামাজিক জীবনের উপর দ্রুত প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। কিন্তু তখনও বিক্রমপুর তাহার নিজের বৈশিষ্ট বিসর্জ্জন দিয়া নূতন সভ্যতাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহন করিতে পারে নাই। পাঠান এবং মোগল আমলে গৌড়ীয় পঞ্চরাজ্য স্থানীয় জমিদার কর্ত্তৃক শাসিত। মোগল আমলে ইহাদিগকে ভূঞা উপাধি দেওয়া হইয়াছিল। পাঠান আমলের মধ্যভাগে নবদ্বীপ একসময়ে শিক্ষার কেন্দ্র রূপে বিরাজমান হইয়াছিল; কিন্তু নবদ্বীপ কখনও জ্ঞানে গৌরবে বিক্রমপুরকে পশ্চাৎপদ করিতে পারে নাই। মুসলমান বিজয়ের পরে নবদ্বীপের সমৃদ্ধি বেশীদিন ছিলনা;—বহুকাল পরবর্ত্তী সময় পর্য্যন্ত বিক্রমপুর স্বাধীন সেনরাজ এবং মোগল আমলে কেদার রায় প্রভৃতি ভূস্বামীগণ কর্ত্তৃক শাসিত হওয়ায় বিক্রমপুরের স্থান বঙ্গের সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইয়া রহিয়াছে।

এখনও ইংরেজী সভ্যতার মধ্যেও বিক্রমপুর সমগ্র বঙ্গদেশের অগ্রগন্য, একথা অস্বিকার করিবার উপায় নাই। বর্ত্তমান বঙ্গের সমাজ যদিও নবদ্বীপবাসী রঘুনন্দনের বিধান মাথা পাতিয়া নিয়াছে;—তথাপি বিক্রমপুরের শিক্ষা সভ্যতা এবং জ্ঞান গৌরব যুগে যুগে বঙ্গের সামাজিক জীবনকে যে নূতন জীবন দান করিয়াছিল সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

বিক্রমপুর

পঞ্চম অধ্যায়

পাল-রাজ বংশ

রাজসূয় যজ্ঞে সার্ব্বভৌম রাজা ব্যতীত অন্যের অধিকার নাই*। তদনুষ্ঠান জন্য পাণ্ডবকৃত ভারত বিজয় ব্যাপারে মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন পূর্ব্ব দিক্ জয় করেন। তখন আর্য্যাবর্ত্তে হস্তিনার পূর্ব্বে গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্ত্তী বর্ত্তমান দোয়াব ভুক্ত ভূভাগের নাম ছিল চেদী রাজ্য। তাহার পূর্ব্বে প্রাচীন কোশল রাজ্যের দক্ষিণাংশ অথবা উত্তর কালের কান্যকুব্জ অবস্থিত ছিল, এবং তৎপূর্ব্বে অনুগাঙ্গ-প্রদেশে ছিল কাশী, মগধ ও মিথিলা রাজ্য। মিথিলার পূর্ব্ব সীমানা গঙ্গার শাখা মহানন্দা নদীর পর পার হইতে ব্রহ্মপুত্রের শাখা করতোয়া পর্য্যন্ত ছিল মৎস্য দেশ ; পরে তাহার নাম হয় ইন্দ্র রাজ্য। মহাভারতের সময় পদ্মার উত্তর হইতে দক্ষিণে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত মৎস্যরাজ্য বিস্তৃত ছিল। এই দেশেই বিরাটের আশ্রয়ে পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাস করেন। বর্ত্তমান মালদহের নিকট উত্তর গোগৃহের এবং মেদিনীপুরের নিকট দক্ষিণ গোগৃহের যুদ্ধ ঘটে। উক্ত উভয় স্থানে উক্ত উভয় ঘটনা সংক্রান্ত বহুতর ঐতিহ্য কথা উপলক্ষ করিয়া তত্তৎস্থানবাসীগণ বিরাটের রাজ্য সম্বন্ধীয় বহুতর প্রমাণ দেখাইয়া থাকেন। উত্তরকালে ইন্দ্ররাজ্যের নাম হয় বরেন্দ্রভূমি, এবং এইক্ষণ উত্তর বঙ্গের মালদহ, রাজসাহী, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, পাবনা প্রভৃতি জেলা ভুক্ত রাজসাহী ও কুচবিহার বিভাগ। ইন্দ্ররাজ্যের পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত ভূভাগের নাম ছিল প্রাগ্‌জ্যোতিষ। তাহাই বর্ত্তমান আসাম ত্রিপুরা ভুক্ত। বর্ত্তমান কামরূপের সন্নিকটে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর রাজধানীতে মহারাজ দুর্য্যোধনের শ্বশুর মহাবল ভগদত্ত রাজা ছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন তাহার পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ মহিষী রুক্মিণী দেবীর পিতা ভীষ্মক রাজার বিদর্ভ রাজ্য অবস্থিত ছিল।

ভারতবর্ষের এইক্ষণ যে মূর্ত্তি মানচিত্রে দেখা যায়, তখন এ দেশের সে মূর্ত্তি ছিল না। ভারতের যেখানে যেখানে কাবেরী, গোদাবরী, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্রের ন্যায় বিশাল নদ নদী সাগর প্রবেশ করিয়াছে, সেই সেই বদ্বীপ তখন পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় নাই। বঙ্গীয় বদ্বীপ তখন গঠিত হয় নাই। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র বিধৌত বালুকা-কণা ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইয়া নিম্নবঙ্গ অর্থাৎ বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, চব্বিশ পরগনা, যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর,

* বঙ্গীয় সমাজ :—সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত ১৮ পৃঃ প্রথম অধ্যায়।

বাখরগঞ্জ প্রভৃতি জেলাভুক্ত প্রেসিডেন্সী বিভাগ নামক বর্ত্তমান বঙ্গাংশ ক্রমে সংগঠিত হইয়াছে। এই ভূভাগ সংগঠনে ভারত মহাসাগরোত্থিত একটি স্রোত ভারতের পূর্ব্ব উপকূলের পার্শ্বে উত্তর-মুখে প্রবাহিত হইয়া যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। এই স্রোত বঙ্গের দক্ষিণ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া চন্দ্রনাথ বা বর্ত্তমান চট্টগ্রামের পার্শ্ব দিয়া পরিবর্ত্তিত হওয়ায় বঙ্গোপসাগরের উত্তরাংশে জলের আবর্ত্তন বা "আয়ড়" থাকা প্রযুক্ত, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত বালুকারাশি বিস্তৃত সমুদ্র গর্ভে সঞ্চারিত না হইয়া ঐ আওড়ের নিম্নে ক্রমাগত সঞ্চিত হইয়া ক্রমে বর্ত্তমান নিম্নবঙ্গ প্রকাশিত হইয়াছে। তখন পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র এক্ষণকার ন্যায় সংযুক্ত হয় নাই। বঙ্গোপসাগরের শিরোদেশে এক পার্শ্বে পদ্মা ও অপর পার্শ্বে ব্রহ্মপুত্র সঙ্গম অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমান রাজ-মহল পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত-বিন্ধ্যাচলাশ্রিত রাঢ়ভূমি এবং গারো ও খাসিয়া পর্ব্বতাশ্রিত ত্রিপুরা অঞ্চল ব্যতীত পদ্মার দক্ষিণস্থ ভূভাগ এই উপায়ে উদ্ভুত হইয়াছে। এই প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের ফলে কোথাও সমুদ্র শুষ্ক হইয়া বালুকাময় মরু, কোথাও সমুদ্রগর্ভে পলি পড়িয়া বা প্রবাল পুঞ্জের একত্র সমাবেশ হেতু প্রথমে চর, পরে ডাঙ্গা এবং অবশেষে লোকালয় হইয়াছে। সাহারা ও গোবী প্রান্তর সমুদ্রের মরু রূপের সাক্ষী, আর নদী মাত্রের বদ্বীপ এবং ভারত মহাসাগরের প্রবাল দ্বীপমালা সমুদ্রোত্থিত ভূভাগ। এই সকল প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য-ভূগোল প্রচারিত এশিয়া আদি চারি খণ্ডে বিভক্ত পৃথিবী যে সাত খণ্ডে বা সপ্ত দ্বীপে বিভক্ত ছিল না, তাহা কে বলিতে পারে? সুতরাং সপ্তদ্বীপ পৃথিবী ভুল বলা যায় না।

এই প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন সহকারে বঙ্গীয় বদ্বীপ গঠনে যে কাল অতিবাহিত হয়, তন্মধ্যে ভারতের বহুতর রাজ্য, সমাজ ও ধর্ম্মবিপ্লব সাধিত হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ে জরাসন্ধ-পুত্র সহদেব মগধের রাজা ছিলেন। সহদেবের উত্তর পুরুষেরা মহাবল পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের আমলে হস্তিনা, ইন্দ্রপ্রস্থের পরিবর্ত্তে মগধ ভারতের অধিকাংশের উপর আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সহদেবের উত্তর পুরুষ মহারাজ অজাতশত্রুর সময়ে বর্ত্তমান গোরক্ষপুর জেলার প্রাচীন রাজধানী কপিলাবস্তুর মহারাজ শুদ্ধোধনের ঔরসে মায়াদেবীর গর্ভে বিষ্ণুর নবম অবতার "বুদ্ধদেব আবির্ভূত হইয়া" অহিংসা পরমোধর্ম্ম প্রচার সহকারে তন্ত্রোক্ত নিষ্ঠুরতার নিরাকরণে প্রবৃত্ত হন। খৃষ্টের জন্মের ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধ প্রতিপত্তির শৈশবকালে উজ্জয়িনী হিন্দুসমাজ ও হিন্দুশাস্ত্র চর্চ্চার কেন্দ্রস্থান হইয়াছিল এবং উজ্জয়িনীপতি মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য নবরত্ন সভা প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক সমগ্র ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছিলেন। তখনও ভারতবাসী হিন্দুর পালনীয় আচার পরিভ্রষ্ট হয় নাই। কিন্তু বুদ্ধদেবের ও তাঁহার পরবর্ত্তী বৌদ্ধ শ্রমণগণের শিক্ষার ফলে ভারতবাসী যখন প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন, তখন মগধেশ্বর প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতেশ্বর হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের পূর্ণ-প্রতিপত্তি কালে মগধের বৌদ্ধ রাজা অশোক বর্দ্ধন সমগ্র ভারতের মহারাজাধিরাজ হইয়াছিলেন, এবং তাদৃশ প্রতাপশালী সম্রাটের শাসনাধীনে ভারতবাসী হিন্দুর আচার ব্যবহার পরিভ্রষ্ট হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতের রাজধর্ম্ম হইয়াছিল।

প্রণবের পরিবর্ত্তে ভারতবাসী "মণিপদ্মে হুং" জপ আরম্ভ করিয়াছিলেন। অন্তরে বৌদ্ধ না

হইলেও রাজশাসন ভয়ে এবং স্বীয় উন্নতি সাধনোদ্দেশে প্রায় অধিকাংশকে বৌদ্ধাচারী হইতে হইয়াছিল। ক্রমে নিষ্ঠাবান হিন্দুর কর্ত্তব্য পালনে লোক শিথিল প্রযত্ন হইয়াছিল। বৈদিক ক্রিয়া কলাপ ত ইতিপূর্ব্বেই রূপান্তরিত হইয়াছিল। তত্রাচ পৌরাণিক আমলে এবং তন্ত্রের শাসনেও হিন্দুর যে টুকু নিষ্ঠাবর্ত্তা ছিল, বৌদ্ধপ্রতাপে ক্রমে তাহাও লোপ পাইয়াছিল। হিন্দুর তীর্থ স্থান সকল হিন্দুর অবহেলায় হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে অরণ্যময় হইয়াছিল। পুণ্যধাম বারাণসী ও বৃন্দাবন প্রভৃতি নিবিড় অরণ্যে আচ্ছন্ন হওয়ায় ভারতবাসী তীর্থ-গমন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ফলতঃ বৌদ্ধ প্রাধান্যে হিন্দুর যে দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছিল ও ভারতের যে অপকার হইয়াছিল, হিন্দুর ধূমকেতু মুসলমানের আমলেও ততদূর হয় নাই। মুসলমান প্রতাপে হিন্দুর হিন্দুত্ব সম্পূর্ণরূপে যায় নাই। কিন্তু বৌদ্ধের শাসনে হিন্দুধর্ম্মের যে আঘাত পড়িয়াছিল, তাহা আর যাইবার নহে। বৌদ্ধ আঘাতের ফলে বহুতর অহিন্দু আচার হিন্দুর আচরণীয় হইয়াছে ও হিন্দু বুদ্ধকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের শাখা বলিয়া বৌদ্ধশিক্ষা হিন্দুশাস্ত্রের শিক্ষা অবলম্বনে প্রচারিত বলিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের শাসন হিন্দুর উপর অবাধে পূর্ণ প্রসার পাইয়াছিল। কিন্তু মুসলমান ধর্ম্ম বিজাতীয় ধর্ম্ম হিন্দুর এই জ্ঞান বদ্ধমূল থাকা প্রযুক্ত তাহা ততদূর আধিপত্য করিতে পারে নাই। বলপূর্ব্বক ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া ও ধীরে ধীরে আপনাপনি রীতিনীতি পরিবর্ত্তিত হওয়া বিভিন্ন ফলপ্রদ। একের শাসন ক্ষীণ হইলেও কালে কার্য্যকরী, অপরের শাসন প্রবল হইলেও ক্ষণস্থায়ী। একটি গ্রহণ করিতে লোকে কষ্ট বোধ করে না, অপরটি দূর হইতে পরিহার করিবার জন্য চেষ্টা পায়। হিন্দুর আচার ব্যবহার ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হইয়া বৌদ্ধ ভাবে পরিণত হইলে ভারতের অধিকাংশ ক্ষত্রিয় রাজাগণ প্রজাবর্গ সহ বৌদ্ধাচারী হওয়ায় ভারতে হিন্দুধর্ম্ম কিছু কালের জন্য স্তম্ভিত হইয়াছিল এবং দেশে নিষ্ঠাবান হিন্দুর সংখ্যা অতি অল্প হইয়াছিল। মুসলমান শাসনে ভারত এতটা অহিন্দু হয় নাই। কিন্তু বৌদ্ধের প্রতাপ স্থায়ী হয় নাই। যে ধর্ম্মের মূল শিক্ষা কর্ম্মত্যাগ, তাহা কর্ম্ম-জগতে স্ফুর্ত্তি পাইবে কেন? বৌদ্ধের শাসন ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। ভারতবাসী হিন্দুর আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বৌদ্ধযোগী হইতে পারেন নাই। বৌদ্ধ শ্রমণগণের শিক্ষা ব্যর্থ হইয়াছিল। ভারতবাসী হিন্দু ভাব পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে ধর্ম্মহীন হইলে দেশ অশান্তিময় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ধর্ম্ম সংরক্ষণের জন্য ভগবান জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন।

সুতরাং মূর্ত্তিমান ব্রহ্মণ্যদেব শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া বৌদ্ধশ্রমণগণের কুশিক্ষার নিরাকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের সহস্র বৎসর পর ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য দাক্ষিণাত্যে বিপ্রকূলে জন্মগ্রহণ করেন। অশেষ শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া তিনি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণপূর্ব্বক চোলরাজাদিগের উদ্যোগে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্মের প্রচারার্থ দেশ ভ্রমণে বহির্গত হন। তাঁহার যুক্তিবলে বৌদ্ধশ্রমণগণ ক্রমশঃ পরাস্ত হওয়ায় ভারতবাসী বৌদ্ধধর্ম্মের কুফল অনুভব করিয়াছিলেন। তখন ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তে যবন আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু ভারতের অন্যত্র বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল ছিল। আর্য্যাবর্ত্ত অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধ-শাসন তত প্রসার প্রাপ্ত

হয় নাই। শঙ্করাচার্য্য প্রথমে দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম শিক্ষার সূচনা করিয়া উত্তরাভিমুখে আর্য্যাবর্ত্তের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আর্য্যাবর্ত্ত হইতে বৌদ্ধ প্রতাপ দূরীভূত করিয়া তিনি বহুদিন হইতে লুপ্ত কাশীধাম জনসমাজে পুনঃ প্রকাশিত করেন। এইক্ষণ যে কাশী বর্ত্তমান তাহা শঙ্করাচার্য্যের প্রকাশিত। এইরূপে শঙ্করাচার্য্যের শিক্ষার ফলে দেশে হিন্দুধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপিত হইলেও প্রকৃত হিন্দুভাব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে বহুকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। কাশীধাম আবিষ্কৃত হইলেও কাশীর বর্ত্তমান জ্ঞানবত্তা ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নেতৃত্ব স্থাপিত হইতে বহুদিন গত হইয়াছিল। তখন জ্ঞানবত্তায় কান্যকুব্জ বা দক্ষিণ কোশল ভারতের শীর্ষস্থানীয় ছিল। উত্তরকালে কাশী যেরূপ হিন্দুধর্ম্মের কেন্দ্র স্থলে পরিণত হইয়াছিল, শঙ্করাচার্য্যের অব্যবহিত পরে কান্যকুব্জ তাহাই ছিল; তবে বৌদ্ধ প্রতাপের অবসানের পরেই নবীন হিন্দুসমাজের যতটুকু প্রাধান্য সম্ভব তাহার অধিকার হয় নাই। স্থির প্রাধান্য কাল সাপেক্ষ। উত্তরকালে ভারতে কাশী যে সম্মান লাভ করিয়াছিল, নবোদিত কান্যকুব্জ তাহা পায় নাই। কিন্তু তাহা না হইলেও সে সময়ে কান্যকুব্জ ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভারতের শিক্ষক ও বিধান কর্ত্তার পদবী গ্রহণ করিয়াছিল। তাই কান্যকুব্জের আদর্শে ভারতের সর্ব্বত্র হিন্দু সমাজ গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ-বিপ্লবের পর বঙ্গে যে হিন্দুসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা কান্যকুব্জের ছাঁচে গঠিত এবং কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ তাহার প্রবর্ত্তক। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় বঙ্গের যে অংশ বিদ্যমান ছিল তাহা বর্ত্তমান পদ্মানদীর উত্তরে অবস্থিত ছিল ও ভারতের সেই অংশের নাম ছিল ইন্দ্র বা বঙ্গরাজ্য। দক্ষিণ বা নিম্নবঙ্গ।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইতে শঙ্করাচার্য্যের তিরোভাব পর্য্যন্ত যে কাল অতিবাহিত হইয়াছে তন্মধ্যে ধীরে ধীরে এই অংশ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রবিধৌত বালুকা-কণার দ্বারা বঙ্গোপসাগরের শিরোভাগে সমুত্থিত হইয়াছে। এই অংশ পর্ব্বতশূন্যা শস্যশ্যামলা সমতল ভূমি বলিয়া প্রাচীনকালে ইহার নাম ছিল **"সমতট"**। মগধের মৌর্য্যবংশীয় বৌদ্ধরাজগণের প্রতাপের অবসান হইলে, বঙ্গের অর্থাৎ প্রাচীন ইন্দ্র বা বঙ্গ রাজ্যের অধীশ্বরগণ মহাপ্রতাপশালী হইয়া সমগ্র ভারতের "মহারাজাধিরাজপদ" গ্রহণ করেন। ফলতঃ বঙ্গের পালবংশীয় বৌদ্ধনৃপতিগণের আমলে বঙ্গেশ্বর ভারতেশ্বর হইয়াছিলেন। এই বংশীয় দেবপালদেব, মহীপালদেব, ভূপালদেব প্রভৃতি ভূপালগণের কীর্ত্তিকলাপ অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। হিন্দুর নিত্য ব্যবহার্য্য পঞ্জিকায় ইঁহাদিগের নাম অদ্যাপি উল্লিখিত হইতেছে। শঙ্করাচার্য্য সংস্থাপিত হিন্দুধর্ম্মের শৈশবকালে, বঙ্গে বৌদ্ধ আচার ব্যবহার পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত ছিল। সুতরাং ভারতের অন্যান্য স্থানে হিন্দুধর্ম্ম পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইবার বহুদিন পর পর্য্যন্ত বঙ্গবাসীগণ বৌদ্ধাচারী ছিলেন ও বঙ্গের অহিন্দুভাব বহুদিন পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। পাল ভূপালগণের শাসনকালে প্রাচীণ ইন্দ্র রাজ্যের নাম হইয়াছিল পৌণ্ড্রবর্দ্ধণ বা গৌড়রাজ্য এবং তাঁহারা ত্রিহুত বা দ্বারবঙ্গ হইতে আসাম পর্য্যন্ত এবং মানভুম ও মেদিনীপুর হইতে শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত অর্থাৎ গণ্ডক ও শোণভদ্র নদ হইতে সদীয়া নদী ও ব্রহ্মদেশের সীমা পর্য্যন্ত ভূভাগের অধীশ্বর ছিলেন। যে হিন্দুরাজবংশ কর্ত্তৃক বঙ্গে বৌদ্ধপ্রতাপ খর্ব্বীকৃত হইয়া হিন্দুধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপিত হয় তাঁহারা দক্ষিণাপথ হইতে বঙ্গে আগমন পূর্ব্বক সমতটে রাজ্য স্থাপন করেন।

হিমাচল বিন্ধ্যাচলাশ্রিত সিন্ধু ও গঙ্গা প্রবাহিত আর্য্যাবর্ত্ত প্রাচীন আর্য্য হিন্দুর লীলাক্ষেত্র। আর্য্যাবর্ত্তই হিন্দুর বাসস্থান, আর্য্যাবর্ত্তই হিন্দুর পুরাণ দর্শনের জন্মস্থান, আর্য্যাবর্ত্তেই হিন্দু-ধর্ম্মোদ্ভূত বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি। অরণ্য মধ্যস্থ তরুকোটর নিক্ষিপ্ত, ক্ষুদ্র বীজ যেমন কালে বিশাল বটবৃক্ষে পরিণত হইয়া মাতৃদ্রুম সংহার পূর্ব্বক বিস্তীর্ণ বনস্থলী অধিকার করে, হিন্দু দর্শনের মূলোদ্ভূত ক্ষুদ্রাঙ্কুর বৌদ্ধধর্ম্মও সেইরূপ কালে মাতৃরূপী হিন্দুধর্ম্মের বিনাশ সাধনপূর্ব্বক সমগ্র ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধ প্রতাপ আর্য্যাবর্ত্তে যতদূর প্রবল হইয়াছিল, দক্ষিণাপথে তেমন হয় নাই। দাক্ষিণাত্যে হিন্দুধর্ম্ম বিস্তৃত হইতে বহুকাল গত হইয়াছিল। ভারতের আদিমবাসী অসভ্যগণ আর্য্যভুজবলে পরাজিত হইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যের দিগন্তব্যাপী অরণ্য মধ্যে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। ত্রেতায় রামচন্দ্রের সময় দাক্ষিণাত্যবাসী অসভ্যগণ প্রথম আর্য্যধর্ম্মের ও আর্য্যসভ্যতার রসাস্বাদন করে। দ্বাপরে, হিন্দুর চরমোন্নতির সময়, পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে দাক্ষিণাত্যগণ হিন্দুধর্ম্মের শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে, সমগ্র ভারত হিন্দু ভাবাপন্ন হইয়াছিল; এবং ক্ষত্রিয় রাজাগণ দাক্ষিণাত্যে বাস গ্রহণপূর্ব্বক একাধিক রাজ্য স্থাপন করেন। দাক্ষিণাত্যে হিন্দুধর্ম্ম ধীরে ধীরে বিলম্বে প্রবল হইয়াছিল বলিয়া, বৌদ্ধ প্রতাপে দাক্ষিণাত্যের হিন্দুত্ব লোপ পায় নাই। তাই দাক্ষিণাত্যের চোলনৃপতিগণের সহায়তায় দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য্য ও তচ্ছিষ্য-প্রভাবে আর্য্যাবর্ত্তে নানাস্থানে হিন্দুনৃপতিকুল আবির্ভূত হইলেও বহু রাজ্য বৌদ্ধশাসনাধীন ছিল।

পালবংশীয় ভূপালগণ সেই সকল বৌদ্ধ রাজাদিগের অগ্রণী ছিলেন। সমতটে যে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, বিক্রমপুর তাহার রাজধানী ছিল, এবং তাহা চোলরাজাগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। দক্ষিণাপথের চোলরাজ কুলতুঙ্গার গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করেন।

চোলরাজারা শৈব ছিলেন। বৈদ্যনাথের মন্দির তাঁহাদের নির্ম্মিত। এইরূপে হিন্দুরাজ্য সংস্থাপিত এবং বৌদ্ধরাজাগণ বিতাড়িত হইলেও, বৌদ্ধ আচার ব্যবহার দেশে এতদূর বদ্ধমূল হইয়াছিল যে তাহা আর পরিত্যাগ করিবার উপায় ছিল না। এজন্য উত্তরকালের হিন্দুগণ অন্তর্বিগ্রহ পরিহার মানসে সেই সকল আচার ব্যবহার হিন্দুসমাজের অন্তর্গত করিয়া লইয়াছিলেন।

পালরাজগণ কোন্ সময় বিক্রমপুরে আগমন করেন, এবং কোন্ জাতীয় ছিলেন তাহা নির্ণয় করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। প্রাচীন বঙ্গের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। শ্রদ্ধেয় মার্শম্যান সাহেব বঙ্গের ইতিহাস লিখিতে গিয়া কোন এক জায়গায় দুঃখিত হইয়া লিখিয়াছেন—"The early history of Bengal is very obscure." প্রাচীন বঙ্গের ইতিহাস গাঢ় তমসাচ্ছন্ন।

স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর* বলেন পাল শব্দ পালরাজাদিগের জাতিনাম নহে। যেমন মহানন্দ ও সুনন্দ প্রভৃতি নন্দবংশীয় রাজাদিগের নামের শেষে নন্দ শব্দ, এবং বুধগুপ্ত, ভানুগুপ্ত ও কৃষ্ণগুপ্ত প্রভৃতি গুপ্তবংশীয়দিগের নামের শেষে গুপ্ত শব্দ, পাল শব্দও সেইরূপ পালবংশীয়দিগের প্রকৃত নামের এক অংশ মাত্র। পালবংশের প্রথম রাজার নাম গোপাল, দ্বিতীয় রাজার নাম ধর্ম্মপাল। যদি পাল শব্দ নামের অংশ না হইয়া জাতির নাম

* ভক্তির জয় নবদ্বীপে "বঙ্গের রাজধানী"।

হয়, তাহা হইলে প্রকৃত নাম হয় শুধু গো অথবা ধর্ম্ম। সেনরাজাদিগের নামনিবিষ্ট সেন শব্দও ঐরূপ নামের অংশ; কায়স্থ, বৈদ্য অথবা অন্য কোনরূপ জাতির পরিচায়ক নহে। কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র নামক নাটকে মিত্র ও সেন এই দুইটি বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকের নায়ক রাজা অগ্নিমিত্র। পুরাণে, ইতিহাসে এবং পুরাতন বৌদ্ধগ্রন্থেও তাঁহার পরিচয় আছে। অগ্নিমিত্রের পিতার নাম পুষ্পমিত্র, পুত্রের নাম বসুমিত্র; অথচ তিনি যাঁহাদিগের সহিত বিবাহ জনিত সম্পর্কের সূত্রে বিশিষ্টরূপে সম্বন্ধ, তাঁহারা সকলেই সেন। রাজমহিষী ধারিণীর এক ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহার নাম বীরসেন, রাজার শেষ পরিণীতা প্রণয়াগৃহীতা মালবিকার এক ভ্রাতার নাম মাধব সেন, আর এক ভ্রাতার নাম যজ্ঞসেন। যাঁহারা গৌড়াধিপতি পাল ও সেনদিগকে কায়স্থ অথবা বৈদ্য বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য নানাবিধ আধুনিক ও অপ্রামাণিক নগণ্য গ্রন্থের নাম লইয়া বৃথা শ্রম করেন, তাঁহারা পূর্ব্বোল্লিখিত মিত্র ও সেনদিগকে কোন জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন?

পালবংশ সম্বন্ধে প্রাচীন ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার মহাশয় তাঁহার হিন্দু ইতিহাসে লিখিয়াছেন—*

Dharmapala (795—830 A. D.) :—

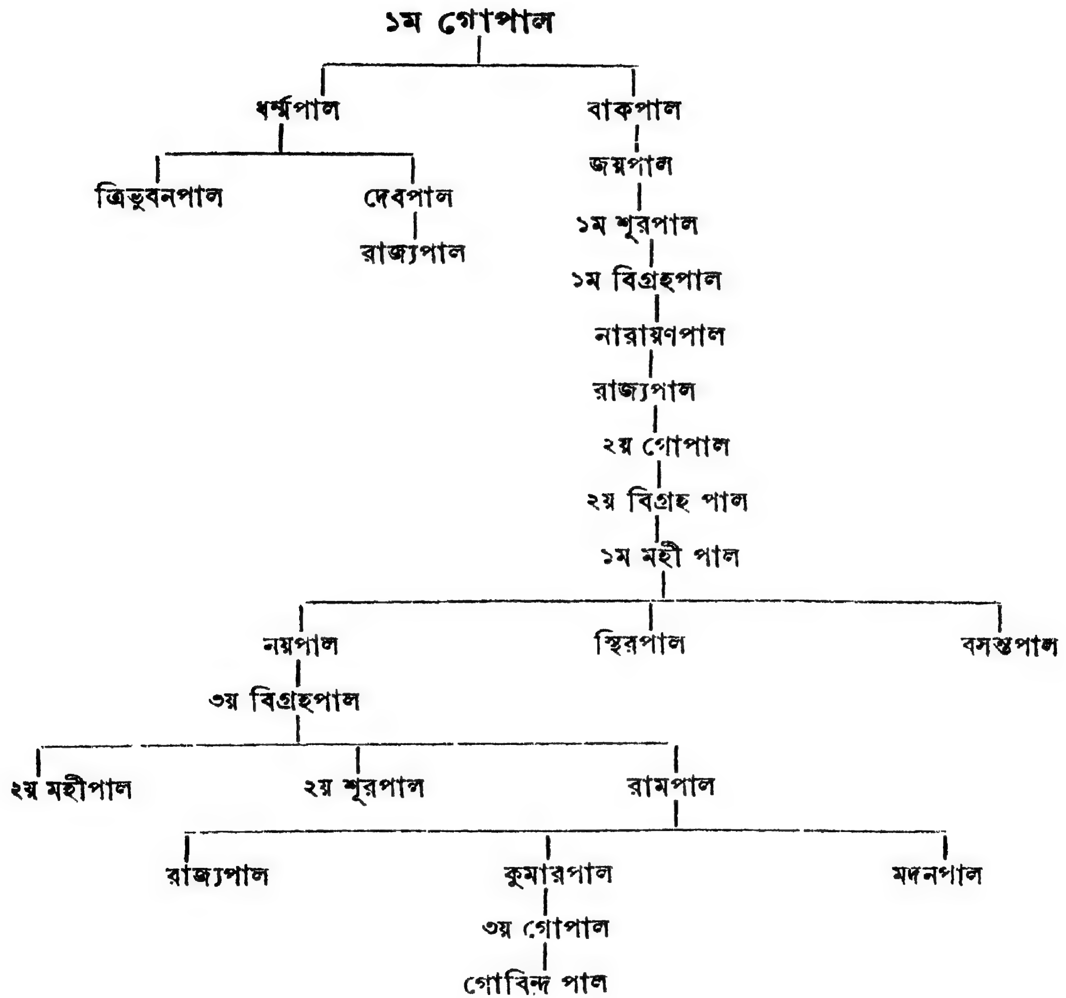
Dharmapala born of queen Dadda Devi, succeeded Gopala about 795 A. D. Very powerful from his youth and he was able to establish his supremacy over a greater part of North India.

The Buddhist Scholar Hari-Bhadra, annotator of Ashta-Sahasrika Prajna-Paramita, flourished in his time. He calls Dharmapala a descendant of Raja bhatta, (Introduction to Rama Charita by S, Nandi).· From this, some thinks him to be a descendant of the Khadga Dynasty of Samatata, mentioned in the Asrafpur Inscription. By Raja-bhatta Prof. Sastri means "the descendant of a military officer of some king" (Introd. to Rama Charita P. 6.). The Rajputs all over India were staunch Hindus but the Palas were Buddhists, the Khadga Kings were Buddhists. Samatata was a home of Buddhism. So, it is probable that the Palas were scions of the Khadga line. From the 15th century B. C. to 14th century A. D. Vikrampur in Samatata had been the seat of powerful dynasties. A descendant of the Khadga House may have seized Gour at some opportune moment.

In their inscriptions, the Pala Kings style them as "Gouresvara or Gouradhipa' i. e. Lord of Gour. In the Sagartal Inscription of Bhoja of the Pratihar Clan, Dharmapala is called Banga-pati and his soldiers are called Bangas i.e. Bengalis. Therefore, Banga was a part of the Pala Empire and most of his soldiers were good Bengails. The Garwda Pillar Inscription, Sloka 2, states "I have made Dharmapala the lord of eastern quarters, now master of all quarters": Taranath says, the Palas first conquered Banga Eastern Bengal and then Magadh. The Pala Kings were Bengalis. According to Taranath Dharmapala first ruled Banga; then his power spread to Gour and elsewhere. These lead us to surmise that Dharmapala was at first Governor of Banga under his father.

* The Hindu History, Chapter XI. The Pala Dynasty, by Mazumder.

পাল-রাজবংশ


১ম গোপাল
ধর্ম্মপাল
বাকপাল
ত্রিভুবনপাল
দেবপাল
রাজ্যপাল
জয়পাল
১ম শূরপাল
১ম বিগ্রহপাল
নারায়ণপাল
রাজ্যপাল
২য় গোপাল
২য় বিগ্রহ পাল
১ম মহী পাল
নয়পাল
স্থিরপাল
বসন্তপাল
৩য় বিগ্রহপাল
২য় মহীপাল
২য় শূরপাল
রামপাল
রাজ্যপাল
কুমারপাল
মদনপাল
৩য় গোপাল
গোবিন্দ পাল

রামপালের রাজত্ব সময়ে বিক্রমপুরের সীমানা।

"বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস" প্রণেতা দুর্গাচরণ সান্যাল মহাশয় প্রথম অধ্যায়ে সীমা নির্দ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন,—"ইহার পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র, দক্ষিণে পদ্মা, পশ্চিমে বরেন্দ্রভূমি এবং উত্তরে জঙ্গল। ইহার কতকাংশে বঙ্গের রাজ্য ছিল বলিয়া ইহা বঙ্গদেশ বলিয়া অভিহিত হয়। ভগবান পরশুরাম ব্রহ্মার মানস-সরোবর হইতে খাল কাটিয়া এই দেশে ব্রহ্মপুত্রনদ আনয়ন পূর্ব্বক জলদানের পুণ্যে মাতৃহত্যা জনিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। যে স্থানে স্নান করিয়া তাঁহার পাপান্ত হইয়াছিল, সেই স্থান পরশুরাম-ক্ষেত্র ও পৌষনারায়ণী নামে খ্যাত। এই দেশের কতকগুলি ক্ষত্রিয় প্রাণভয়ে পরশুরামের নিকট আপনাদিগকে ধীবর বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। তাহাদের সন্তানেরাই রাজবংশী। এইদেশও মগধ রাজ্যের অধীন এবং ক্ষত্রিয়শূন্য হইয়াছিল। তখন এই দেশ মগধের বৌদ্ধ সম্রাটদিগের অধীন পাল উপাধিধারী করদ-রাজগণ দ্বারা শাসিত হইত। পাষণ্ডদলনের পর সেই পালগণ স্বাধীন হইয়া ক্রমে ক্রমে শৈব হিন্দু হইয়াছিলেন। পাল বংশের ধর্ম্মপাল প্রথম সনাতন ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তৎপুত্র দেবপাল বা দেপাল গৌড়নগর হইতে কয়েকজন কায়স্থ আনিয়া বঙ্গদেশে স্থাপিত করেন এবং তাহাদের সহিত বৈবাহিক আদান প্রদান করিয়া সেই সমাজে মিলিত হইয়াছিলেন। তৎপুত্র রামপাল এই বংশের শেষ রাজা। রামপালের পত্নী ও পুত্রবধূ কায়স্থ কন্যা। তদীয় রাজ্যের প্রধান কার্য্যকারক সমস্তই কায়স্থ ছিল। রামপালের একমাত্র পুত্র যক্ষপাল জনৈক প্রজার পত্নীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করায় নিরপেক্ষ রাজা তাহার প্রাণ দণ্ড করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী ও পুত্রবধূ শোকে বিমূঢ়া হইয়া ব্রহ্মপুত্রনদে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। রামপাল নিজে গঙ্গাতীরে যাইয়া শিবভক্ত বিজয়সেনকে নিজ রাজ্য প্রদান করতঃ অনশনে প্রাণত্যাগ করিলেন। এই সময় হইতেই বঙ্গদেশে বৈদ্যরাজত্বের সূত্রপাত হয়।"

বিক্রমপুরের রামপাল নামক স্থানটীর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে গ্রন্থসমূহে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। পালবংশের শেষ রাজারামপালই রামপাল নামক স্থান স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। আদিশূরের রাজত্বের পূর্ব্বে রামপাল যে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে সান্যাল মহাশয়ের পুস্তকে যথেষ্ট প্রমাণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার প্রাচীন নাম প্রাঠ্য দেশ, বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের সময় সেই শব্দ অপভ্রষ্ট হইয়া রাঠ বা রাঢ় নামে পরিণত হয়। এইদেশ বহুকাল মগধদেশের অধীন ছিল। জরাসন্ধের প্রসিদ্ধ রাজধানী পঞ্চকুট এই দেশের অন্তর্গত। মগধের শূদ্র রাজাদের অধীনে এইদেশও ক্ষত্রিয়শূন্য হইয়াছিল। বৌদ্ধরাজত্বের সময় পাল উপাধিধারী করদ-রাজগণ মগধ সম্রাটের অধীন থাকিয়া এইদেশ শাসন করিতেন। পাষণ্ড দলনের পর এদেশের উত্তর ভাগ গৌড়াধিপতির অধীনে উত্তররাঢ় নামে খ্যাত হয়। দক্ষিণ-রাঢ় স্বাধীন হইয়াছিল। আদিশূর ও তৎপরবর্ত্তী সেন রাজগণ ক্রমশঃ সমস্ত রাঢ় দেশ অধিকার করিয়া এইদেশ স্বরাজ্য ভুক্ত করিয়াছিলেন।

৯৪৪ শকাব্দে বঙ্গাধিপতি আদিশূর কর্ত্তৃক বিক্রমপুরে প্রথম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

তাহার এক শত বৎসর পূর্ব্বে রাজা রামপাল বিক্রমপুরে রাজত্ব করেন। অদ্যাবধি বিক্রমপুরে রামপাল নামক স্থানে রামপালের অক্ষয় কীর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ইতিহাসের সত্য নির্ণয় যথাসাধ্য চেষ্টায় সন্নিবেশিত হয়, কিন্তু কিম্বদন্তীর উপর কতকটা নির্ভর না করিয়া চলাও সুকঠিন। রামপালের দীঘি অদ্যাপিও আছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে—"তাঁহার পত্নী ও পুত্রবধু শোকে বিমূঢ় হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন।" অনেকেই অনুমান করেন যে, রামপালের দীঘিতেই তাঁহার পত্নী ও পুত্রবধূ আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। সে সময়ে হিন্দুরাজগণের ধর্ম্মপ্রাণ বিধায় যে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া বিক্রমভূমির অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবে তাহা কিংবদন্তী বলিয়া ইতিহাসে অনাদৃত রাখা সুকঠিন।

*অধ্যাপক শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত রামপাল সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, রামপাল বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী। "রামপাল" এই শব্দটী উচ্চারণ করিলেই বিক্রমপুরবাসীর হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। স্বাধীনতার পুণ্য নিকেতন, বীরত্বের কেন্দ্রস্থল, পাণ্ডিত্যের গৌরব দর্পিত রামপালের পবিত্র স্মৃতি আমাদিগকে ক্ষোভে ও বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলে। যে স্থান একদিন রাজপ্রাসাদে শোভা পাইত, হস্তীর বৃংহতি ধ্বনিতে, অশ্বের হ্রেষারবে ও সৈন্যগণের কোলাহলে যে স্থান প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইত, তাহা এখন নীরব ও নির্জ্জন। যেখানে রাজপ্রাসাদ ছিল, এখন সেখানে কৃষক হল চালনা করিতে করিতে চিরজয়ী কালের বিজয় গৌরব ঘোষণা করিতেছে। গভীর জল পরিপূর্ণ, প্রাসাদ-বেষ্টিত পরিখাগুলি এখন সবুজ সুন্দর ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়া জাগতিক বস্তুর নশ্বরতা প্রকাশ করিতেছে। বৃহৎ ও সুন্দর যাহা কিছু দর্শনীয় ও উপভোগ্য ছিল সময়ের পরিবর্ত্তনের সহিত সে সমুদয় অন্তর্হিত হইয়াছে। বিক্রমপুর এক মহাশ্মশান—সে শ্মশানের শ্মশান রামপাল। অতীতের গৌরব বৈভবময়, জ্ঞানধর্ম্মবিমণ্ডিত সভ্যতা ও শ্রেষ্ঠতার সঙ্গে ধনৈশ্বর্য্যের ও বীরত্বের যে মহিমোজ্জ্বল মিলন সংগঠিত হইয়াছিল, বর্ত্তমান যুগে শ্মশানের এই পুঞ্জীভূত ভস্মরাশির নিম্ন হইতে তাহার ছায়াচিত্র গ্রহণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। এ সংসারে সকলই যায়—থাকে কেবল স্মৃতি। অমারজনীর তিমিরাবৃত গগনে জলদনিচয়ের মধ্য হইতে বিদ্যুত ঝলসিত হইলে, পথহারা পান্থ যেমন ক্ষণিক উল্লসিত হইয়া উঠে, আমরাও তেমনি অন্ধ তমসাচ্ছন্ন প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার করিতে যাইয়া স্মৃতির আলোকে পথ ধরিয়া চলিয়াছি। রায়-ভূঞা প্রণেতা আনন্দ বাবু বলেন—রামপাল নামক স্থানে প্রায় দুই মাইল দীর্ঘ এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার খাত বর্ত্তমান আছে। কেহ কেহ বলেন যে, রামপাল নামে কোনও এক রাজা কর্ত্তৃক এই জলাশয় খনিত হওয়ায়, তাহার নামানুসারে স্থানের নাম রামপাল হইয়াছে। এই স্থানে কতকগুলি ইষ্টক স্তূপ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। কতকগুলি দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তিও মৃত্তিকা গর্ভে পাওয়া গিয়াছে। এই সকল কারণে প্রতীতি হয়, পূর্ব্বকালে এই স্থানে একজন পরাক্রমশালী রাজার রাজধানী ছিল।

* বিক্রমপুরের ইতিহাস চতুর্থ অধ্যায়।

রামপালের রাজধানীর বিবরণ।

বিক্রমপুরের পূর্ব্বোত্তর প্রান্তে মেঘনাদ (মেঘনা) নদের পশ্চিম তটে বর্ত্তমান ঢাকা নগরীর বার মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব ও মুন্সীগঞ্জ মহকুমার দুই ক্রোশ পশ্চিমে রামপাল অবস্থিত। অক্ষা ২৩° ৩৮´ উঃ এবং দ্রাঘি ৯০° ৩২´ ১০" পূঃ। রামপাল এবং ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম ইত্যাদি অভিনিবেশ সহকারে পরিদর্শন করিলে প্রাচীন কালে যে ইহা কতদূর বিস্তৃত ও সমৃদ্ধিশালী ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। প্রাচীন কালে ইহার বিস্তৃতি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় দশ বার মাইল পর্য্যন্ত ছিল। কারণ রামপালের সমীপবর্ত্তী দশবার মাইলের মধ্যে এমন স্থান নাই যেখানে অদ্যাপি কোন না কোন প্রাচীন চিহ্ন বিদ্যমান না আছে। যে সমুদয় বৈদেশিক এবং দেশীয় পর্য্যটক অভিনিবেশ সহকারে রামপাল ও তৎসমীপবর্ত্তী গ্রামসমূহ পরিদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টকস্তূপ, রাজপথাদির ভগ্নাংশ, ইত্যাদি দেখিয়া আমাদের উক্তির যথার্থতা স্বীকার করিবেন। এখনও আবদুল্লাপুর, রিকাবি বাজার, পঞ্চসার, সোনারঙ্গ, পাইকপাড়া, বজ্রযোগিনী, চূড়াইন ইত্যাদি স্থানে রাস্তা ও অট্টালিকাদি ভগ্নাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। হায়! কে জানিত যে একদিন মহাসমৃদ্ধ রাজনগর দরিদ্র কৃষক বসতিতে পরিণত হইবে? কত প্রাচীন মহামহীরুহ আজিও উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, কিন্তু হায়! সে নয়নমনমোহকর স্বাধীনতার প্রদীপ্ত গৌরবস্থল, সুমহান রাজপ্রাসাদ কোথায়? সুদীর্ঘ সরোবর অদ্যাপি বিশুষ্ক দেহে পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাহার পাষাণ সোপানসমূহ কোথায়? যাহা ছিল তাহা মাতা বসুন্ধরা নিজ উদরে গ্রহণ করিয়াছেন। ধ্বংসাবশিষ্ট পুরাতন দৃশ্যাবলীর মধ্যে দণ্ডায়মান হইলে হৃদয়ে আপনা হইতেই একটা শ্মশান বৈরাগ্যের ভাব জাগিয়া উঠে, মনে হয় কবি সত্যই গাহিয়াছেন :—

> "বীরত্বের গর্ব্ব আর প্রভুত্ব বিভব
> সম্পদ সংসার সব যাহা করে দান
> অলঙ্ঘ্য মৃত্যুর হায়! মুখাপেক্ষী সব
> গৌরবের পথ মাত্র মৃত্যুর সোপান।"

রামপালের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে নানা প্রকার জনপ্রবাদ প্রচলিত। কেহ কেহ বলেন পাল বংশীয় সপ্তদশ নরপতি রামপালের নামানুসারে "রামপাল" এই নামোৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু লঘুভারতকার বলেন যে,—

> "রাম নামৈকো বৈদ্যরাজ মহাধনী
> তৎপালিতা সা নগরী রামপালেতি সংজ্ঞিতা।"

অর্থাৎ রাম নামক জনৈক বৈদ্যবংশোদ্ভব মহাধনী নরপতির রাজধানী ছিল বলিয়াই ইহার নাম রামপাল হইয়াছে। বিখ্যাত সাহিত্য-সংস্কারক স্বর্গীয় রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর C. I. E. বলেন "বল্লাল প্রতিষ্ঠিত রাজবাড়ীর মুদীর নাম ছিল রামানন্দ পাল, লোকে তাহাকে সাধারণতঃ রামপাল বলিত। রাজবাড়ীর তণ্ডুলাদি যোগাইয়া, রামপাল কালে সমৃদ্ধিশালী হইল এবং বল্লালের রাজধানী হইতে খানিকটা দূরে বাড়ী করিয়া দেশীয় বণিক সমাজে সম্মানের আসন লাভ করিল। বল্লাল যখন দীঘি খনন করেন, তখন তাঁহার দীঘি সংবর্দ্ধিত হইয়া রামপালের বাড়ীর নিকট গিয়া পঁহুছে এবং রামপালের শুভাদৃষ্ট ক্রমে রামপাল দীঘি নামে পরিচিত হয়। উপরোক্ত ঘোষ

RAMPAL
(1859-1860)
(With its surroundings)

River Lakhya
Mouth of old Brahmaputra R.
D U L L A S E R Y
ICHHAMATI
Barnee
Moktarpur
Mirashura
Killa Ferakpur
Rekabi Bazar
Kapal Duar
Bhagawan rayer dighee
Panchasar
Bisheshvar dighee
Bareé Ballal Sen
Iecluidee
Mirkadeem
OLD BED OF RIVER RO
Abdullapur
Manikesvar
Basu Para
Dewan dighee
Rampal
Dighee
Chapatali
Bockhur
Namakandi
Munshiganj
Shaoopara
Kishipara
Magadighee
Chairpara
Sagar dighee
Joradul
Sobhashpur
Raghurampur
Ramsingh
Kewar
Deul
Paekpara
Panhatta
Dakhinbelka
Atpara
Sankar bandha
Nahapara
Mohakali
Bagheshvar
Byrajogini
Natesvar
Kheelpara
Suapara
Dhumdeha
Godar dighee
Shaner dighee
Neerpukur
Chapra
Ghasipukuree
Sonarang
Baralia
Mamasar
Churain
Neer Pukurpar
Pookur dighee
Tangibrihaut
Dighee
Dhamaran
Amtali
Mariail
Aldi
MAKUHATI CANAL
Makuhati
MIRKADIM ROAD
KACHA ROAD
BRAHMAPUTRA
RIVER BRAHMAPUTRA
Scale
Furlongs
Mile

রামপালের মানচিত্র।

বাহাদুরের রামপালের ইতিহাস যাহা বর্ণিত হইয়াছে আমার মতে এই সব একটা অনুমান ভ্রান্তিমূলক বোধ হয়—তাহার উদাহরণ ক্রমে দ্রষ্টব্য :—

দুর্গাচরণ সান্যাল মহাশয় সামাজিক ইতিহাসে রামপালের শেষ রাজত্বের বিষয় বিশেষভাবে লিখিয়া গিয়াছেন। রামপাল একজন শৈব রাজা ছিলেন, নচেৎ শিবভক্ত বিজয়সেনকে স্বীয় রাজ্য প্রদান করতঃ অনশনে প্রাণত্যাগ করিতেন না। এই সময় হইতেই বাংলায় বৈদ্যরাজত্বের সূত্রপাত হয় ; তৎপর আদিশূর প্রভৃতি বৈদ্যরাজগণ ক্রমশঃ রাজত্ব বিস্তার করতঃ রামপাল নামক স্থানে রাজ্য স্থাপন করেন। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর কালী প্রসন্নের রামপালের সম্বন্ধে ও দুর্গাচরণ সান্যাল মহাশয়ের সামাজিক ইতিহাসের সমালোচনা করিলে সান্যাল মহাশয়ের রামপালের সম্বন্ধে বিশেষ ভ্রম দৃষ্ট হয়। তাহার পরিচয়, রামপাল বলিলে কাহারও নিকট অপরিচিত স্থান বলিয়া মনে হয় না। যদি রামপাল সামান্য রাজবাড়ীর মুদী হইতেন তবে তাঁহার যশঃ মান খ্যাতি আজ পর্য্যন্ত বিক্রমপুরের বালকবৃদ্ধবনিতা সকলেই ভুলিয়া যাইতেন। অসামান্য প্রতিভাশালী ব্যক্তি যে তিনি ছিলেন তাহার পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

রামপালের রাজত্বের পর বিজয়সেন রাজত্ব করেন এবং তৎপর সমস্ত রাঢ়দেশ অধিকার করিয়া রামপাল নামক স্থানে রাজ্য স্থাপন করেন। তৎপূর্ব্ব হইতেই রাজার নাম অনুসারে রাজ্যের নাম রামপাল বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছে। শূরবংশীয় রাজগণ যখন বিক্রমপুরে রাজত্ব করেন তখনও রামপাল বলিয়া এই স্থানের নাম সুপরিচিত ছিল।

বিক্রমপুরে বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয় ও ধর্ম্মপ্রচার।

সামাজিক ইতিহাস লেখক বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহার একটুকু আভাস দেওয়া গেল।

বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সময়ে মগধ দেশে শূদ্র সাম্রাজ্য ছিল। সেই শূদ্র-সম্রাটগণ দেখিলেন যে, বৌদ্ধধর্ম্মে জাতি-ভেদ নাই, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত হইলে জাতি-ভেদ উঠিয়া যাইবে। জাতি-ভেদ উঠিয়া গেলে শূদ্র-সম্রাট বৈষয়িক শ্রেষ্ঠতা হেতু জনসমাজে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইতে পারিবেন, এই আশায় মগধরাজগণ যথাসাধ্য বৌদ্ধধর্ম্মের পোষকতা করিতে লাগিলেন। নিম্নশ্রেণীর লোক দলে দলে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিতে লাগিল। রাজানুগ্রহ লাভের প্রত্যাশায় অল্পসংখ্যক উচ্চজাতীয় লোকও বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিল, অতঃপর সম্রাট অশোক স্বয়ং প্রকাশ্যরূপে নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া দিক্‌দেশে সেই ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য প্রচারক প্রেরণ করিলেন।

এতকাল রাজকার্য্য ও ধর্ম্মকার্য্য প্রভৃতি যাবতীয় উচ্চকার্য্য সংস্কৃত ভাষায় পরিচালিত হইত। প্রাকৃতভাষা কেবল সামান্য কার্য্যে ও কথাবার্ত্তায় প্রযুক্ত হইত মাত্র। মগধের বৌদ্ধগণ অধিকাংশই নীচজাতীয় লোক। তাহারা সংস্কৃতভাষা জানিত না। এই জন্য সম্রাট্ অশোক নিজ রাজকার্য্যে ও ধর্ম্মকার্য্যে মগধদেশীয় প্রাকৃতভাষা ব্যবহারের আদেশ দিলেন। মাগধীভাষা পাটলিপুত্র নগরের ভাষা, এইজন্য “পাটলী” শব্দের অপভ্রংশে সেই ভাষার নাম পালিতভাষা হইল। পালিভাষা রাজভাষা এবং ধর্ম্ম-ভাষা রূপে প্রবর্ত্তিত হওয়ায় ক্রমশঃ ইহার উন্নতি হইতে লাগিল। কালের আবর্ত্তনে

ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধরাজত্ব লোপ পাইয়াছে বটে, কিন্তু সংস্কৃত-ভাষা আর পূর্ব্ববৎ প্রচলিত হয় নাই। পরবর্ত্তী হিন্দুরাজগণের অধিকাংশ রাজকার্য্য স্থানীয় প্রাকৃত-ভাষাতেই লিখিত ও পঠিত হইয়া আসিতেছে। কান্যকুব্জ ও তৎ পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে যে প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত হইয়া ছিল, তাহার নাম ব্রজ-ভাষা। সেই ব্রজ-ভাষা হইতেই বর্ত্তমান হিন্দী ও বাঙ্গালা-ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে।

মগধদেশে চন্দ্র নামে শূদ্রজাতীয় এক মহাবল পরাক্রান্ত সম্রাট ছিলেন। কাশীধাম হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তিনি ক্ষত্রিয়দিগের সহিত বৈবাহিক আদান প্রদান করিয়া ক্ষত্রিয়দলে মিলিতে উৎসুক ছিলেন। ক্ষত্রিয়েরা তৎসহ এরূপ আদান প্রদানে ঘৃণা প্রকাশ করায় তিনি দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় ক্ষত্রিয় বিনাশে ব্রতী হইয়াছিলেন। বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয় তৎ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল, কতক বা দেশান্তরে পলায়ন করিয়াছিল। অবশিষ্ট যাহারা তাঁহার বাধ্য হইয়াছিল, তাহারা ক্ষত্রসমাজ হইতে বিচ্যুত হইয়া শূদ্র মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল, এইজন্য মগধসাম্রাজ্যে কোন বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ছিল না। বৌদ্ধ-বিনাশ ও মগধ-সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর ক্ষত্রিয়েরা কাশী, মগধ এবং মিথিলার অধিকাংশ স্থান পুনরায় দখল করিয়াছিল; সেইজন্য ঐ সকল স্থানে পুনরায় ক্ষত্রিয়ের আবাস হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে ক্ষত্রিয় আধিপত্য পুনঃ বিস্তৃত না হওয়ায় তথায় আর ক্ষত্রিয়দের বসতি হয় নাই।

আধুনিক সম্রাটগণ তাঁহাদের বিশাল সাম্রাজ্যের দূরবর্ত্তী প্রদেশ শাসনার্থ বেতনভোগী অস্থায়ী-শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া থাকেন। প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্রাটদের সময়ে এরূপ রীতি ছিল না। তাঁহারা দূরবর্ত্তী প্রদেশ শাসনের জন্য করদরাজা নিযুক্ত করিতেন। তৎকালে প্রজার বার্ষিক লভ্যের $\frac{১}{৬}$ ষষ্ঠাংশ রাজস্ব রূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। করদরাজ্যের মধ্যে সেই হারে যে রাজস্ব আদায় হইত, করদরাজগণ তাহার চতুর্থাংশ নিজ বেতন এবং দশমাংশ আদায়ের ব্যয় স্বরূপ প্রাপ্ত হইতেন। হিন্দী ভাষায় ইহাকেই চৌথ ও ষড়দশমুখী বলে। অবশিষ্ট $\frac{১৩}{২০}$ ভাগ করদ রাজাগণ নিজ প্রভুর নিকট প্রেরণ করিতেন করদরাজাগণ পুরুষানুক্রমিক ভূম্যধিকারী ছিলেন। তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে কেহ কার্য্য-নির্ব্বাহের অযোগ্য হইলে, সম্রাট তাহার কার্য্য চালাইবার জন্য অপর কোন ব্যক্তিকে অস্থায়ীভাবে বেতনভোগী কার্য্য-নির্ব্বাহক নিযুক্ত করিতেন। সেই কর্ম্মচারীকে সর্ব্বাধিকারী, সরবরাহকার বা ভিঠা বলিত। ভিঠা ব্যতীত প্রাচীন রাজগণের স্বতন্ত্র বেতনভোগী শাসনকর্ত্তা ছিল না। এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকার করদরাজা ছিলেন, তাঁহাদিগকে সম্রাটগণ স্বয়ং নিযুক্ত করিতেন না। কোন দুর্ব্বল রাজা প্রবল পরাক্রান্ত রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক বার্ষিক কর দিতেন। কিংবা তদনুরূপ অল্পশক্তিশালী রাজা কোন প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার উদ্দেশ্যে সাহায্য পাইবার আশায় অন্য কোন প্রবল পরাক্রান্ত রাজার আশ্রয় লইয়া তাঁহাকে কর প্রদান করিতেন। এইরূপ করদরাজগণ বশী-রাজা বলিয়া অভিহিত হইতেন। বশী-রাজগণ নিজ প্রভুকে যত টাকা কর দিতেন এবং যে যে সর্ত্তের অধীন হইতেন তাহা সন্ধিপত্র দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইত। বশীদিগের প্রদত্ত করকে অমুকর বা নাগবন্দী

বলে। অনুকরের পরিমাণ প্রায় সমগ্র রাজস্বের ২/৩ ভাগ অপেক্ষা কম হইত।

জনসমাজের হিতসাধন করাই সকল ধর্ম্মের উদ্দেশ্য এবং মূলমন্ত্র। কিন্তু চিরকালই প্রবল পক্ষ স্বধর্ম্ম বিরুদ্ধবাদীদের উপর ঘোর অত্যাচার করিয়া থাকে; বরং ধর্ম্মবিদ্বেষ বশতঃ লোকে যত অত্যাচার ও অধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকে, অন্য কোন কারণে ততদূর করে না। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম অবস্থায় হিন্দুরা বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার করিত; কিন্তু যখন বৌদ্ধধর্ম্ম সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া প্রবল হইয়া উঠিল, তখন বৌদ্ধেরা হিন্দুদের উপর উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল।

কান্যকুব্জবাসী ব্রাহ্মণেরা সেই অত্যাচার নিবারণের জন্য যজ্ঞাগ্নি হইতে কতকগুলি যোদ্ধা উৎপাদন করিয়াছিলেন। সেই যোদ্ধাদিগকে অগ্নিকূল বা অগ্নি-সম্ভূত ক্ষত্রিয় বলে। ১। প্রমার, ২। পরিহর, ৩। চালুক্য ও ৪। চালুমান এই চারিজন সেই অগ্নিকূলের নেতা ছিলেন। সেই অগ্নিকূলের সাহায্যে ব্রাহ্মণেরা সমগ্র ভারতবর্ষে বৌদ্ধদিগের বিনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার ফলে, কতক বিনষ্ট হইল, কতক দেশ হইতে বিতাড়িত হইল, অবশিষ্ট বশ্যতা স্বীকার করিল। ইহার নাম পাষণ্ডদলন। এই পাষণ্ড দলন দ্বারা কনৌজ ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল এবং কান্যকুব্জ নগর আর্য্যবিদ্যার আদর্শ স্থান হইল। কান্যকুব্জব্রাহ্মণদিগকে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ বলা হইত। তাঁহারাই সকল ব্রাহ্মণের আদর্শরূপে পূজিত হইতেন। এইজন্য গৌড়াধিপতি কান্যকুব্জ হইতে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ আনিয়া নিজ রাজ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন। অগ্নিকূল দ্বারা মগধ সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে তথাকার এক রাজকুমার ব্রহ্মদেশে গিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। সেই রাজবংশ আড়াই হাজার বৎসর ব্রহ্মদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশীয় লোকদিগকে যে "মগ" বলে, তাহা মগধ শব্দের অপভ্রংশ। মগধ হইতে মগহ, তাহা হইতে মঘ বা মগ। বিক্রমপুরে বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সময় বজ্রযোগিনী গ্রামে প্রাতঃস্মরণীয় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জন্ম হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বৌদ্ধযুগে দীপঙ্করের জীবনী* সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন;—

"মহারাজা গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্ব সময়ে (৯৮০ খ্রীঃ অঃ) বিক্রমপুরস্থ বজ্রযোগিনী গ্রামে বৌদ্ধ মহাতান্ত্রিক ও পরমজ্ঞানী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ জন্মগ্রহণ করেন, ইনি একজন বিখ্যাত বৌদ্ধযতি। ইহার পূর্ব্বনাম আদিনাথ চন্দ্রগর্ভ ছিল। অবধূত জেতারি নামক জনৈক খ্যাতনামা পণ্ডিতের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া পরিশেষে ইনি ত্রিপিটক, বৈশেষিক দর্শন ও যোগাচার সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধদিগের ন্যায়দর্শন ইত্যাদি পাঠ করিয়া বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকেও পরাস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বিক্রমপুরের গৌরব, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে বিক্রমপুরবাসী অনেকে তাহার নাম পর্য্যন্ত জানেন না।

নানা শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করতঃ অবশেষে তিনি সর্ব্বপ্রকার পার্থিব সুখভোগে জলাঞ্জলী দিয়া, বৌদ্ধদিগের ত্রিশিক্ষা নামক তত্ত্বগ্রন্থে জ্ঞানলাভার্থ কৃষ্ণগিরির বিহারস্থ রাহুল গুপ্তের নিকট গমন করেন। এস্থানে তিনি বৌদ্ধদিগের গুহ্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গুহ্যজ্ঞান বজ্র নামে অভিহিত হন,

* বিক্রমপুরের ইতিহাস দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৎপরে প্রায় উনবিংশ বর্ষ বয়সে দণ্ডপুরীর মহা সজ্জিকাচার্য্য শীলরক্ষিতের নিকট পবিত্র বৌদ্ধ মন্ত্রে দীক্ষিত হন এবং উক্ত মহাত্মার নিকটই তিনি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান উপাধি লাভ করেন। দীপঙ্কর তৎকালীন সমুদয় বৌদ্ধ পণ্ডিতদের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া সুবর্ণদ্বীপস্থ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান আচার্য্য চন্দ্রগিরির নিকট গমন করিয়া সেস্থানে দ্বাদশ বৎসর কাল অবস্থান করেন। তিব্বতের রাজধানী লাসা নগরের নিকট অদ্যাপি তাঁহার সমাধি বিদ্যমান আছে। রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর C. I. E. মহোদয়ের নিকট শুনিয়াছি যে তিব্বতে স্বয়ং বুদ্ধদেব হইতেও দীপঙ্করের প্রতি তদ্দেশবাসী বৌদ্ধ লামাগণ অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন. দীপঙ্করের নামোচ্চারণ করিলেই তাঁহারা করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার মহান্ আত্মার উদ্দেশ্যে হৃদয়-জাত ভক্তি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। দীপঙ্কর ১০৮ খানা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন দাক্ষিণাত্যপতি দিগ্বিজয়ী রাজেন্দ্র চোল কর্ত্তৃক আনুমানিক ১০১১ কি ১০১২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি (গোবিন্দচন্দ্র) পরাজিত হন। বৌদ্ধধর্ম্ম বিক্রমপুর হইতে পালবংশীয় নৃপতিগণের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গেই লয় প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। এক সময়ে যে ইহা বিক্রমপুরের চতুর্দ্দিকে বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল বর্ত্তমান সময়ে তাহা অনুমান করাও সুকঠিন।

"As a state religion, Buddhism perished with the state with the passing of the Pal Dynasty it disappeared as completely from Vikrampur as if had never been. Romance of an Eastern Capital by Bradley Birt."

পাল-রাজগণ যে বিক্রমপুরে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তারের জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহা বিক্রমপুরের প্রায় প্রতি গ্রাম হইতে প্রাপ্ত এবং পুকুর ও দীর্ঘিকা ইত্যাদি খননে উত্তোলিত নানা প্রকারের প্রস্তর গঠিত বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিসমূহ হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

পদ্মাসনোপবিষ্ট ধ্যানস্থ বৌদ্ধের সৌম্য-মূর্ত্তিগুলি প্রকৃতপক্ষেই শিল্পীর অদ্ভুত শিল্প-কৌশলের পরিচায়ক। দুঃখের বিষয় যে অধিকাংশ মূর্ত্তিই ছিন্ন নাসিকা, সেজন্য এসকল মূর্ত্তিকে বিক্রমপুর-বাসীগণ নাককাটা বাসুদেব মূর্ত্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। জনপ্রবাদ এইরূপ যে, উড়িষ্যা প্রদেশের পাঠান-রাজগণের দুর্দ্দান্ত হিন্দু বিদ্বেষী সেনাপতি কালাপাহাড় কর্ত্তৃক হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধমূর্ত্তিগুলিরও এইরূপ অঙ্গহীন হইতে হইয়াছিল। বিক্রমপুরে এমন পল্লী অতি বিরল যেখানে ঈদৃশ মূর্ত্তি দুই একটী বিদ্যমান নাই

বিক্রমপুর বেজগাঁ গ্রামে বৌদ্ধমন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে; কেবল যে বৌদ্ধমন্দির প্রতিষ্ঠিত এমন নহে, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী লোকও আছে "বৌদ্ধদের বহু মঠ ও সংঘারাম ছিল। সংঘারাম শব্দটি সংস্কৃত সংগ্রহম্ শব্দের অপভ্রংশ। ইহাতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা একত্র বাস করিতেন। বল্লাল সেই মঠ ও সংঘারামগুলি দেবালয়রূপে পরিণত করিয়াছিলেন।" সামাজিক ইতিহাসে উল্লিখিত কতকগুলি মঘাতেলি বেজগাঁ গ্রামে বসবাস করিয়া আসিতেছে। এই গ্রামের আশেপাশে কতকগুলি ছোট ছোট গ্রামে তাহাদের বংশধর আছে। মৎ গাঁ, পাল গাঁ, ভোগদীয়া, সুন্দিসার ইত্যাদি গ্রামে অনেক মঘাতেলি আছে। জনপ্রবাদ, তাহাদের বাড়ীর উপর দিয়া মঘ চলিয়া যাওয়ায়

তাহারা পতিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে তেলি-জাতির সঙ্গে তাহারা বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে। তাহাদের জল চল নাই। তাহারা প্রকাশ করে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পূর্ব্বে তেলি ছিল, মঘ বাড়ীর উপর দিয়া চলিয়া যাওয়ার অপরাধে তাহারা সমাজপতির হাত হইতে রক্ষা না পাইয়া পতিত হইয়া গিয়াছেন। আধুনিক কোন কোন ব্যক্তি অনুমান করেন সত্য, কিন্তু ঐতিহাসিক ব্যক্তিমাত্রেই এই সব অনুমানের পোষক, কোনও যুক্তি বা প্রমাণ নাই। বরং যুক্তি প্রমাণাদি যাহা পাওয়া যায়, তাহ সমস্তই উক্ত প্রকার অনুমানের বিরুদ্ধ।

বৌদ্ধধর্ম্মমতাবলম্বী সন্ন্যাসীগণ বেজগাঁ সজ্ঘারামে থাকিতেন, তাহার প্রমাণ বেশ পাওয়া যায়। বেজগাঁ গ্রামের তেলিজাতি বৌদ্ধধর্ম্মামতাবলম্বী ছিল। নচেৎ তাহারা মঘাতেলি নামে পরিচিত কেন? ইহাই তাহাদের বংশের অকাট্য প্রমাণ। দ্বিতীয়তঃ বৌদ্ধধর্ম্মের "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" এই নীতি বাক্য অবলম্বন করিয়া তাহারা মৎস্য-মাংস ত্যাগ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে তাহারা হিন্দুদের সঙ্গে মিশামিশি করিয়া মৎস্য ভোজন করিতে শিখিয়াছেন।

বেজগাঁ গ্রামে বর্ত্তমানে মহোৎসব ব্যাপারে মঘাতেলিদিগকে যোগদান করিতে দেখা যায়। তাঁহারা হিন্দুদের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে আচার ব্যবহার তীর্থদর্শন সকলই হিন্দুদের অনুকরণ করিতে শিখিয়াছে। কালের পরিবর্ত্তনে বৌদ্ধদের প্রভাব অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধসজ্ঘরামটীর প্রভাবও নাই; তাহা এখন ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অনেকে সজ্ঘারামটীর কোন খোঁজ রাখেন কিনা সন্দেহ? দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বিক্রমপুরের গৌরব—দীপঙ্কর বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া স্বীয় জন্মস্থান বজ্রযোগিনী গ্রামে সজ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, অবশেষে গুহ্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বেজগাঁ গ্রামে ত্রিশিক্ষা নামক তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ৯৯৯ খ্রীঃ অব্দে বেজগাঁ গ্রামেই এই সজ্ঘারাম নির্ম্মিত হইয়াছিল। সন্ন্যাসীরা মঠের আশেপাশে ঘরবাড়ী প্রস্তুত করিয়া বসবাস করিতেছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের পুনঃ উত্থান হওয়ায় তাঁহারা হিন্দু হইয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্ম-কুলাচার্য্যগণের মতে বেজগাঁর তেলিগণই সেই সকল বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

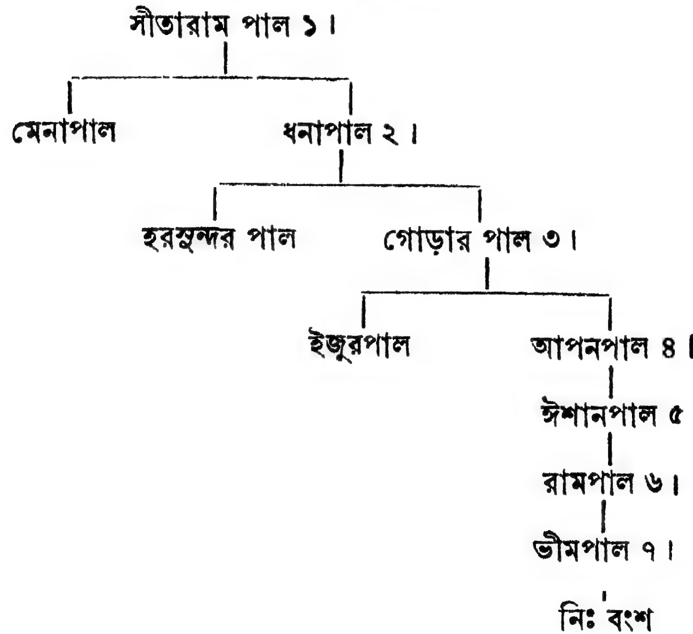
সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, বাংলার সাহা ও পাল শ্রেণীর পূর্ব্বপুরুষগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; কারণ তাঁহাদের আচার ব্যবহার দেখিয়া সতত হৃদয়ে অনুভব করিতে পারা যায় যে, তাহারা "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" জ্ঞানে অপূর্ব্ব শান্তি ও প্রীতি বোধ করিয়া থাকেন। আজ যদিও বিক্রমপুর হইতে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম মুছিয়া গিয়াছে, কিন্তু আচার ব্যবহার দেখিলে সততই মনে হয় ইহারা বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংশ্লিষ্ট ছিলেন ইহাতে সন্দেহ নাই। তৎপর চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত হইয়া ধর্ম্মের অঙ্গ হইতে কিছুদূরে সরিয়া পড়িয়াছেন বটে কিন্তু ইতিহাসের চোখ হইতে মুছিয়া যাইবে কিভাবে? শ্রীশঙ্করের অভ্যুদয়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব নিষ্প্রভ হইয়াছিল কিন্তু বিক্রমপুরের প্রতিভার এবং ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বেজগাঁ বৌদ্ধ মন্দিরটী ভীমপালের বাড়ী বলিয়া কিংবদন্তী আছে, এখন সেই স্থানটী বাহার বাড়ী বলিয়া জনপ্রবাদ। মন্দিরের ভগ্নাংশ অদ্যাপি কঙ্কাল দেহে বিরাজমান থাকিয়া বিদেশী ও পাঠকের হৃদয়ে প্রাচীন যুগ ও স্মৃতি জাগরিত করিয়া দিতেছে।

*ভীমপালের বংশের বহু কীর্ত্তি বিদ্যমান ছিল। ৺কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিকট হইতে যাহা সংগ্রহ হইয়াছিল তাহা নিম্নে দেওয়া গেল :—

সামাজিক ঐতিহাসিক সান্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন "যত্ন করিয়াও ঠিক সত্য ইতিহাস সংগ্রহ করা যায় না।" আমার মতে কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কথার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া যে লেখনী ধারণ করিলাম, তাহার বিরুদ্ধে লিখিতে অনেকে বাধ্য হইবেন।

বিক্রমপুর রামপাল নামক স্থানে দিল্লী চিত্রশালার অধ্যক্ষ রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে বিক্রমপুরের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের জন্য যে সব স্থানগুলি দেখাইয়াছিলেন সে সব স্থানসমূহের ইতিহাস রচনার বিশ্বাসযোগ্য উপাদান আবিস্কৃত হয় নাই; তাই বাধ্য হইয়া স্বর্গীয় সান্যাল মহাশয়ের সংগৃহীত উপাদানে, এবং আমার পরম হিতৈষী শ্রদ্ধেয় রাখাল দাস বাবুর আবিস্কৃত শিলালিপি, তাম্রশাসন, প্রাচীন

ভীমপালের বংশাবলী।



মুদ্রা যাহা তিনি তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রথম ভাগে পালবংশে যোজিত করিয়াছিলেন তাহা হইতে আমি বিক্রমপুরের পালবংশ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। পালবংশের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পূর্ব্বে আর কেহই প্রকাশ করেন নাই, রাখালদাস বাবুই প্রথম লেখনী

* ভীমপাল সম্বন্ধে বেজগাঁর "গ্রাম অধ্যায়ে" দ্রষ্টব্য। মন্দিরের গায়ে অনেকগুলি ভাষা লিখিত ছিল, এখন আর সেগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না।

বিক্রমপুর ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় ২০ পৃষ্ঠায় ফুটনোট করিয়া গিয়াছেন :—

যুয়ণচঙের সমতটের বর্ণনা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বিক্রমপুরস্থ রায়পুরা, বজ্রযোগিণী, রামপাল, বেজিণীসার, শ্রীনগর, কুমরপুর, কুমারভোগ, তেলিরবাগ প্রভৃতি গ্রামে বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ছিল।

ধারণে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি দশ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া পাল-বংশের কাহিনী উত্তমরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। রামপাল, রামপালের দীঘি, হরিশ চন্দ্রের দীঘি, রামপালের রাজধানীর পরিখা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ইহার বিশ্বাস যোগ্য উপাদান আবিস্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐতিহাসিকের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা ধৃষ্টতা মাত্র। বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস প্রণেতা দুর্গাচরণ সান্ন্যাল মহাশয় যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার কোনই প্রমাণ নাই, অথচ পাল রাজগণের তথ্য সংগ্রহ করিয়া ঐতিহাসিক সত্যরূপে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, রামপালের অধঃপতনের বিবরণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় অধাপক শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কেদার রায়ের "গ্রন্থকারের নিবেদন" লিখিতে গিয়া লিখিয়াছিলেন 'আমাদের ইতিহাস নাই' এ দুর্ণাম ঘুচাইবার জন্য বর্ত্তমান যুগে বহু কৃতী পুরুষ সাহিত্য-ক্ষেত্রে মহারথীর ন্যায় অগ্রসর হইয়াছেন, কিন্তু এতবড় বাঙ্গালা দেশের পক্ষে তাঁহারা কত মুষ্টিমেয় ; দু'একটী সমিতি, পরিষদ বা সাহিত্য-সমাজ দ্বারা বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস শীঘ্র উদ্ধার হওয়া অসম্ভব। তারপর যাঁহারা ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানে বা প্রত্নতত্ত্বানুশীলনে প্রবৃত্ত আছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই "অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ,' দাসত্ব করিয়া জীবন যাপন করেন, ঐতিহাসিক তথ্যানুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে হইলে একাগ্র সাধনা, অধ্যয়ন, গবেষণা ও শারীরিক এবং মানসিক শ্রমের প্রয়োজন ; দশদিকে মন নিবেশ করিয়া তাহা সুসম্পন্ন হইতে পারেনা। উদরান্নের চিন্তায় দিবা রাত্রি বিব্রত থাকিয়া সামান্য অবসরে কোনও দুরূহ কার্য্য নিষ্পন্ন করা সম্ভব পর নহে। কাজেই আমাদের ন্যায় অন্নচিন্তা-বিব্রত পল্লব-গ্রাহী সাহিত্য সেবীর পক্ষে কোনও গভীর গবেষণা মূলক গ্রন্থ রচনার চেষ্টা দুরাশা ব্যতীত আর কিছুই নহে।"

বস্তুতঃ বিক্রমপুরের পাল রাজগণের ইতিহাস লেখা আমার পক্ষে দুরাশা মাত্র। দ্বিতীয়তঃ কিংবদন্তী উপর নির্ভর করিয়া ইতিহাস লেখা চলে না। ভূবিদ্যাবিদ্ রাখালদাস বাবু প্রথম পাল বংশের তাম্র-শাসন দ্বারা বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় গৌড়রাজবংশের উপক্রমণিকা লিখিয়াছেন। "ইতিহাসের উপাদান সঙ্কলিত না হইলে, ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারেনা ; তাহা বহু ব্যয়সাধ্য, বহু শ্রমসাধ্য, বহু লোকসাধ্য ; এসকল কথা বঙ্গসাহিত্যে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাকেই একমাত্র অন্তরায় বলিয়া নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই। কিরূপ বিচার পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়েও সংকীর্ণতার অভাব নাই"। পালরাজ বংশের ইতিহাস "গৌড়রাজ মালায়" লিখা হইয়াছে। *

তিব্বতীয় ভাষায় রচিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের (অতীশের) জীবনচরিতে, নয়পালের আমলে, "কর্ণ্য"-রাজ্যের রাজা কর্ত্তৃক মগধ-আক্রমণের বিবরণ পাওয়া যায়। † নয়পাল দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে বিক্রমশীলা-বিহারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রথম যুদ্ধে গৌড়সেনা "কর্ণ্য"-রাজের সেনা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল, এবং শত্রুগণ রাজধানী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু পরে নয়পালই জয়লাভ করিয়াছিলেন। অবশেষে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের যত্নে, উভয় পক্ষে মৈত্রী স্থাপিত হইয়াছিল। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জীবন-চরিতকার

* গৌড় রাজমালা শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ প্রণীত ৪৫ পৃঃ হইতে ৫৬ পৃঃ।
† **Journal of the Bnddhist Society, Vol. 1, 1903. pp. 9-10.**

বুস্তন তাঁহার নিজের শিষ্য ছিলেন। সুতরাং বুস্তনের প্রদত্ত মগধ-আক্রমণ-বিবরণ অবিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু কোন্ রাজ্যকে যে বুস্তন "কর্ণ্য" নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহার নিরূপণ করা কঠিন। "কর্ণ্য"-শব্দ যদি রাজ্যের নামরূপে গ্রহণ না করিয়া, রাজার নাম বলিয়া মনে করা যায়, তবে এই সমস্যা পূরণ করা যাইতে পারে। চেদির কলচুরী-রাজ গাঙ্গেয়দেবের পুত্র কর্ণ নয়পালের জীবদ্দশায়, [১০৩৭ হইতে ১০৪২ খৃষ্টাব্দ মধ্যে,] * পিতৃ-সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। কর্ণের পৌত্রবধূ অহ্লনাদেবীর [ভেরঘাটে প্রাপ্ত] শিলালিপিতে উক্ত হইয়াছে, কর্ণের ভয়ে "কলিঙ্গের সহিত বঙ্গ কম্পমান ছিল।"† অহ্লনাদেবীর পুত্র জয়সিংহদেবের [কর্ণবলে প্রাপ্ত] শিলালিপিতে সূচিত হইয়াছে—গৌড়াধিপ গর্ব্ব ত্যাগ করিয়া কর্ণের আজ্ঞাবহন করিতেন। ‡ কর্ণ চিরজীবন প্রতিবেশী রাজন্যবর্গের সহিত বিরোধে রত ছিলেন। সুতরাং নয়পালের সময়ে মগধ-আক্রমণ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে; এবং সেই আক্রমণের পরিণাম সম্বন্ধে বুস্তন যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই হয়ত ঠিক।

বহিঃশত্রুর আক্রমণ সত্বেও, গৌড়াধিপ নয়পাল গৌড়-রাষ্ট্রের মান মর্য্যাদা-রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। রাজত্বের পঞ্চদশ বর্ষে উৎকীর্ণ, গয়ার কৃষ্ণ-দ্বারকা-মন্দিরের শিলালিপিতে, তিনি "সমস্ত-ভূমণ্ডল-রাজ্য-ভার"-বহনকারী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

নয়পালের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী তৃতীয় বিগ্রহপাল, তাঁহার রাজত্বের দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ বৎসরে উৎকীর্ণ [আমগাছিতে প্রাপ্ত] তাম্রশাসনে, "শত্রুকুল-কালরুদ্র" এবং "বিষ্ণু অপেক্ষাও অধিক সংগ্রাম-চতুর" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। § সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিতে" তৃতীয় বিগ্রহ পালের সংগ্রাম-চতুরতার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। সন্ধ্যাকর নন্দী লিখিয়াছেন (১৷৯) :—"বিগ্রহপাল দাহলাধিপতি [কলচুরি] কর্ণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে উন্মূলিত করিয়াছিলেন না; তাঁহার দুহিতা যৌবনশ্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।" বিবাদপ্রিয় কর্ণই, সম্ভবতঃ নয়পালের মৃত্যুর পর, আবার গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিয়া, পরাভূত হইয়া কন্যাদান করিয়া, গৌড়াধিপের প্রীতি অর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

কিন্তু তৃতীয় বিগ্রহপালের আমলেই, আর এক বহিঃশত্রু আসিয়া, পাল-বংশের অধঃপতনের বীজ বপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই অভিনব শত্রু, কল্যাণের ¶ চালুক্যরাজ আহবমল্ল প্রথম সোমেশ্বরের (রাজত্ব ১০৪০-১০৭১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে) দ্বিতীয় পুত্র, বিক্রমাদিত্য। কুমার বিক্রমাদিত্য, পিতার আদেশক্রমে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, গৌড় এবং কামরূপ আক্রমণ করিয়াছিলেন। বিহ্লন "বিক্রমাঙ্কদেব চরিতে" (৩৷৭৪) এই দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে লিখিয়া গিয়াছেন।

"গায়ন্তি স্ম গৃহীত-গৌড়-বিজয়-স্তম্বেরমস্যাহবে
তস্যোন্ম লিত-কামরূপ-নৃপতি-প্রাজ্য-প্রতাপশ্রিয়ঃ।
ভানু-স্যন্দন-চক্রঘোষ-মুষিত-প্রত্যূষ নিদ্রারসাঃ
পূর্বাদ্রেঃ কটকেষু সিদ্ধবনিতাঃ প্রালেয়শুদ্ধং যশঃ॥"

"সূর্য্যের রথচক্রের শব্দে প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে সিদ্ধ-বনিতাগণ পূর্ব্বাদ্রির কটিদেশে, যুদ্ধে

* Journal of tht Buddhist Text Socity, Vol. 1, 1903, pp. 9-10.
† Epigraphia Indica. Vol. VIII, App. 1.
‡ Ibid, Vol. 11, p. 11.
§ Indian Antiquary, Vol. XVIII, p. 217.
¶ নিজমা-রাজ্যের অন্তর্গত বর্ত্তমান কল্যানি।

গৌড়ের বিজয়-হস্তী-গ্রহণকারী এবং কামরূপাধিপতির বিপুল-প্রতাপ-উন্মূলনকারী কুমার বিক্রমাদিত্যের তুষারশুভ্র যশ গান করিয়াছিল।”

কুমার বিক্রমাদিত্য, উত্তরকালে যখন “ত্রিভুবনমল্ল পর্ম্মাড়িদেব” উপাধি গ্রহণ করিয়া, কল্যাণের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, (১০৭৭-১১২৫ খৃষ্টাব্দ) তখন বিহ্লন কাশ্মীর হইতে আসিয়া, তাঁহার সভার “বিদ্যাপতির” বা প্রধান পণ্ডিতের পদলাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি বিহ্লনের এই গৌড়-কামরূপ বিজয়-কাহিনী অক্ষরে অক্ষরে সত্য না হইলেও, একেবারে অমুলক নহে। বিহ্লন “বিক্রমাঙ্কদেব চরিতে” (১৮।১০২) স্বীয় প্রভুকে “কর্ণাটেন্দু” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; এবং কহ্লন “রাজতরঙ্গিনীতে” (৭।৯৩৬) বিহ্লনের যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে “পর্ম্মাড়িভূপতি” বা বিক্রমাদিত্যকে “কর্ণাট” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ‡ সুতরাং কর্ণাট বলিতে তৎকালে যে কল্যাণের চালুক্যগণের রাজ্য বুঝাইত, এ বিষয়ে আর সংশয় নাই। গৌড়ের সেনরাজগণের শিলালিপিতে এবং তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়,—এক সময়ে গৌড়-রাজ্যের একাংশের [রাঢ়ের] সহিত কর্ণাট রাজ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। সেনবংশের প্রথম নরপতি বিজয়সেনের দেবপাড়া-প্রশস্তিতে উক্ত হইয়াছে, বিজয়সেনের পিতামহ সামন্তসেন “একাঙ্গ (এক প্রকার) সেনা লইয়া, অরিকুলাকীর্ণ-কর্ণাটলক্ষ্মী-লুণ্ঠনকারী দুর্ব্বৃত্তগণকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন” (৮ শ্লোক); এবং শেষ বয়সে, গঙ্গাতীরবর্ত্তী পুণ্যাশ্রমনিচয়ে বিচরণ করিয়াছিলেন (৯ শ্লোক)। আবার বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেনের [কাটোয়ায় প্রাপ্ত] তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে,—“চন্দ্রবংশে অনেক রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন;... তাঁহারা সদাচারপালন খ্যাতিগর্ব্বে রাঢ়দেশকে অননুভূতপূর্ব্ব প্রভাবে বিভূষিত করিয়াছিলেন (৩ শ্লোক)।” এই রাজপুত্রগণের বংশে “শত্রু-সেনা সাগরের প্রলয়-তপন সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (৪ শ্লোক)।” এই উভয় বিবরণে আপাতত বিরোধ দেখা যায়। প্রথম লিপি অনুসারে মনে হয়, সমান্তসেন শেষ বয়সে কর্ণাট ত্যাগ করিয়া, তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে, বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন দ্বিতীয় লিপিতে দেখা যায়, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা রাঢ় নিবাসী ছিলেন। অথচ এই দুইটি লিপি প্রায় একই সময়ে রচিত। এইরূপ তুল্যকালীন লিপিতে এত বিরোধকল্পনা অসম্ভব। কিন্তু যদি অনুমান করা যায়, রাঢ়দেশ কর্ণাট রাজের পদানত ছিল, এবং কর্ণাট-রাজ কর্ত্তৃক রাঢ়শাসনার্থ নিয়োজিত, [লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর-তাম্রশাশনে কথিত] “কর্ণাট ক্ষত্রিয়”—বংশজাত রাজপুত্রগণের বংশে সামান্তসেন জন্মগ্রহণ করিয়া, রাঢ়দেশেই কর্ণাট রাজের শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে রত ছিলেন, তাহা হইলে এই বিরোধের ভঞ্জন হয়। বিহ্লন-বিবৃত চালুক্য-রাজকুমার বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক গৌড়াধিপের এবং [হয়ত গৌড়াধিপের সাহায্যার্থ আগত] কামরূপাধিপের পরাজয়-বৃত্তান্ত এই অনুমানের অনুকুল প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। চন্দেল্ল—রাজ কীর্ত্তিবর্ম্মার (রাজত্ব ১০৪৯-১১০০ খৃষ্টাব্দ) আশ্রিত “প্রবোধ-চন্দ্রোদয়”-রচয়িতা কৃষ্ণমিশ্র যাহাকে “গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়া” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কুমার বিক্রমাদিত্য গৌড়াধিপকে পরাজিত করিয়া, সেই রাঢ়দেশ গৌড়-রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। নবজিত রাঢ়-শাসনার্থ কর্ণাটরাজ যে রাজপুত বা ক্ষত্রিয় সেনা-নায়ককে নিয়োগ করিয়াছিলেন, সামন্তসেন তাঁহারই বংশধর। সামন্তসেন একাদশ

শতাব্দির চতুর্থপাদে বিদ্যমান ছিলেন, একথা স্বীকার করিলেই, এই অনুমানকে প্রমাণরূপে গ্রহণের আর আপত্তি থাকে না। সামন্তসেন যে একাদশ শতাব্দের শেষপাদেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা সেন-রাজগণের কালনির্ণয়-প্রসঙ্গে প্রদর্শিত হইবে।

মহীপাল, শূরপাল, এবং রামপাল, এই তিন পুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া, তৃতীয় বিগ্রহপাল পরলোক গমন করিয়াছিলেন। "রামচরিত"-কাব্যে তৃতীয় বিগ্রহপালের পুত্রের এবং পৌত্রগণের রাজত্বের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে।* "রামচরিত"-রচয়িতা সন্ধ্যাকর নন্দী বরেন্দ্রী-মণ্ডলে "শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর-প্রতিবদ্ধ" ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা প্রজাপতি নন্দী পাল-নরপালের "সান্ধি [বিগ্রহিক] বা সন্ধি এবং যুদ্ধ বিষয়ের উপদেষ্টা ছিলেন। সন্ধ্যাকর "রাম চরিতের" উপসংহারে (৪।৪৮) প্রার্থনা করিয়াছেন, [রাম পালের দ্বিতীয় পুত্র] রাজা মদন [পাল] "চিরায় রাজ্যং কুরুতাং।" সুতরাং "রামচরিত" তুল্য-কালীন কবির রচিত ঐতিহাসিক কাব্য। সন্ধ্যাকর নন্দী "কবি-প্রশস্তিতে" এই কাব্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"অবদানম্ রঘুপরিবৃঢ়-গৌড়াধিপ-রামদেবয়োরেতৎ।
কলিযুগ-রামায়ণ মিহ কবি রপি কলিকাল-বাল্মীকিঃ॥

"রঘুপতি রামের এবং গৌড়াধিপ রাম [পালের] এই চরিত কলিযুগের রামায়ণ এবং [এই কাব্যের] কবিও কলিকালের বাল্মীকি।"

"রামচরিতের" প্রথম পরিচ্ছেদের সমস্ত শ্লোকের (১-৫০) এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১-৩৫ শ্লোকের টীকা আছে; কিন্তু অবশিষ্ট অংশের টীকা পাওয়া যায় নাই। কবি মূল শ্লোকে ঐতিহাসিক ঘটনার এরূপ সামান্য আভাস দিয়াছেন যে, টীকা ব্যতীত তাহা বুঝা কঠিন। "রামচরিত" হইতে ইতিহাসের উপাদান আহরণে টীকাই আমাদের প্রধান আশ্রয়। সুতরাং যে অংশের টীকা নাই, সেই অংশের ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য-গ্রহণ দুঃসাধ্য।

"রামচরিতে" বর্ণিত হইয়াছে—(তৃতীয়) বিগ্রহ-পাল পরলোক গমন করিলে, (দ্বিতীয়) মহীপাল সিংহাসন লাভ করিয়া, দুষ্কার্য্যরত [অনীতিকার-স্তরত] হইয়াছিলেন, এবং কনিষ্ঠ শূরপালকে এবং রামপালকে লৌহ-নিগড়ে নিবদ্ধ করিয়া, কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তখন কৈবর্ত্তজাতীয় দিব্য বা দিব্বোক, যুদ্ধে মহীপালকে নিহত করিয়া, "জনকভু" বা পাল-রাজগণের জন্মভূমি বরেন্দ্র অধিকার করিয়াছিলেন (১.২৯, ৩১-৩৯), এবং দিব্বোকের অনুজ রুদোকের পুত্র ভীম বরেন্দ্রীর রাজপদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন (১।৪০)। বরেন্দ্রী ত্যাগ করিয়া, গৌড়-রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশের সামন্ত-গণকে একত্রিত করিবার জন্য, রাপপাল রাঢ়-অঙ্গ মগধাদি প্রদেশ-পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; এবং বরেন্দ্রীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য, মহা প্রতীহার শিবরাজকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ক্রমে সামন্ত-চক্র রামপালের সহিত মিলিত হইয়াছিল। মগধের অন্তর্গত পীঠিররাজা দেবরক্ষিতের পরাভবকারী [রামপালের মাতুল] রাষ্ট্রকূট-বংশীয় মথন বা মহন সামন্তগণের অগ্রণী ছিলেন। মহনের পুত্র কাহ্নুরদেব এবং সুবর্ণদেব, এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শিবরাজ, তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিলেন (২।৮)। "রামপাল চরিতের" টীকাকার সামন্তগণের মধ্যে এই সকলের নামোল্লেখ করিয়াছেন; (২।৫)—কান্যকুব্জ-রাজের সেনা-

* **Ramacharita** by Sandhyakara Nandi. Edited by Mahamahopadhyaya Harap rasad Sastri M.A. (Memoirs of the A. S. B, Vol. III No. 1).

পরাভবকারী পীঠিপতি (মগধাধিপ) ভীমযশা, দক্ষিণ দেশের রাজা বীরগুণ, উৎকলেশ কর্ণ কেশরীর সেনাধ্বংসকারী দণ্ডভুক্তি-ভূপতি জয়সিংহ, দেবগ্রামপতি বিক্রমরাজ, অপর-মন্দারপতি সমস্ত-আরণ্য-সামন্তচক্র-চূড়ামণি লক্ষ্মীশূর, শূরপাল, তৈলকম্প-পতি রুদ্রশেখর, উচ্ছাল-পতি ময়গল-সিংহ, ডেকরীয়-রাজ প্রতাপসিংহ, কযঙ্গলপতি নরসিংহার্জ্জুন, সঙ্কটগ্রামীয় চণ্ডার্জ্জুন, নিদ্রাবলীর বিজয়রাজ, কৌশাম্বীপতি দ্বোরপবর্দ্ধন এবং পদুবম্বা-পতি সোম।

এই মহাবাহিনী লইয়া, রামপাল নৌকায় গঙ্গাপার হইয়াছিলেন। পাল-রাজের সেনার সহিত কৈবর্ত্ত-রাজের সেনার ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। অবশেষে করিপৃষ্ঠে অবস্থিত ভীম বন্দী হইয়াছিলেন (২।১২-২০)। এই উপলক্ষে সন্ধ্যাকর এক পক্ষে সাগর এবং অপর পক্ষে ভীমের চরিত্রের বর্ণনা করিয়াছেন। শ্লেষের অনুরোধেই হউক, আর সত্যের অনুরোধেই হউক, ভীমের চিত্র উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে। সাগরের ন্যায় ভীমও "লক্ষ্মী এবং সরস্বতী উভয়ের আবাস" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ভীমকে নৃপতি রূপে প্রাপ্ত হইয়া, "বিশ্ব অতিশয় সম্পৎ লাভ করিয়াছিল," এবং "সজ্জনগণ অযাচিত দান লাভ করিয়াছিল।" ভবানীর সহিত ভবানীপতি অধর্ম্মত্যাগী রাজা ভীমের উপাস্য দেবতা ছিলেন (২ ২১-২৭)।

সন্ধ্যাকর নন্দী বর্ণিত এই প্রজা-বিদ্রোহের কিছু কিছু আভাস তৎকালের তাম্রশাসনে এবং শিলালিপিতেও পাওয়া যায়। কামরূপের রাজা বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে রামপাল সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে (৪ শ্লোক) :—

"যুদ্ধ-সাগর লঙ্ঘন করিয়া, ভীমরূপ রাবণ বধ করিয়া, জনকভূ উদ্ধার করিয়া, রামপাল ত্রিজগতে দাশরথি রামের ন্যায় যশ বিস্তার করিয়াছিলেন।"

"রামপাল চরিতের" টীকাকারের মতানুসারে, "জনকভূ" বরেন্দ্রী-অর্থে গ্রহণ করিলে, এই শ্লোকেও কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহের প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯০৮ সালের মার্চ্চ মাসে সারনাথের ভগ্নস্তূপের একাংশ খননকালে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপিতে * "রামপাল চরিতে" উল্লিখিত কয়েকজন পাত্রের এবং কোন কোন ঘটনার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কান্যকুব্জের গহড়বাল-রাজ গোবিন্দচন্দ্রের অন্যতমা মহিষী কুমরদেবী কর্ত্তৃক একটি বৌদ্ধবিহার-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এই শিলালিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে,—"পীঠিকা"র বা "পীঠি"র দেবরক্ষিত নামক একজন রাজা ছিলেন।

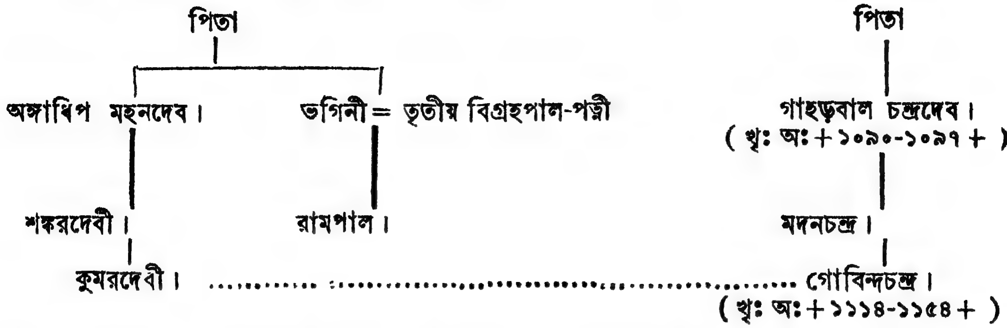
> "গৌড়েদ্বৈতভটঃ সকান্ত-পঠিকঃ ক্ষত্রৈক-চূড়ামণিঃ
> প্রখ্যাতো মহনাঙ্গপঃ ক্ষিতিভুজাম্মান্যো ভবন্মাতুলঃ
> তং জিত্বা যুধি দেবরক্ষিত মধাৎ শ্রীরাম পালস্য যো।
> লক্ষ্মীং নির্জ্জিত বৈরি-রোধনতয়া দেদীপ্যমানোদয়াম্॥"

"গৌড়ে অদ্বিতীয় যোদ্ধা, ধনুর্দ্ধর (?), ক্ষত্র-কুলের একমাত্র চূড়ামণি, নরপালগণের সম্মানার্হ মাতুল, মহন নামক অঙ্গপতি ছিলেন। তিনি দেবরক্ষিতকে পরাজিত করিয়া, শত্রুর বাধা বিদূরিত হওয়ায়, অধিকতর উজ্জ্বল শ্রীরামপালের রাজলক্ষ্মী অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।"

"রামপালচরিতে" [২।৮ শ্লোকের টীকায়] রামপালের মাতুল মহন কর্ত্তৃক পীঠীপতি দেব-রক্ষিতের পরাজয় উল্লিখিত হইয়াছে। কুমরদেবীর এই শিলালিপির সাহায্যে রামপালের রাজত্বের সময় নিরূপণ করা যাইতে পারে। এই লিপিতে উক্ত হইয়াছে,—মহনদেব শঙ্করদেবী নাম্নী

* **Epigraphia Indica,** Vol. IX, pp. 323-326.

দুহিতাকে পীঠীপতির করে অর্পণ করিয়াছিলেন। কুমরদেবী এই শঙ্করদেবীর কন্যা, এবং গোবিন্দ-চন্দ্রের মহিষী। কুমরদেবী এবং গোবিন্দচন্দ্রের বংশাবলী পাশাপাশি রাখিলে দেখা যায়,—



অর্থাৎ মহনদেব গাহড়বাল-রাজ চন্দ্রদেবের সমকালবর্ত্তী ছিলেন। মহনদেব এবং রামপাল, সম্পর্কে মামা-ভাগিনেয় হইলেও, উভয়ে সম্ভবত সমবয়সী ছিলেন। "রামপালচরিতে" উক্ত হইয়াছে (৪।৮-১০ শ্লোক), মহনদেব (মথন) পরলোক গমন করিয়াছেন শুনিয়া, "মুদ্গিগিরিতে" (মুঙ্গেরে) অবস্থিত রামপাল গঙ্গাগর্ভে প্রবেশ করত তনুত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং রামপাল কান্যকুব্জ-রাজ চন্দ্রদেবের সমসাময়িক, এবং একাদশ শতাব্দের শেষ পাদ পর্য্যন্ত গৌড়-রাজ্যের রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

"রামপালচরিতের" যে অংশে ভীমের বন্ধনের পরবর্ত্তী ঘটনা সকল বর্ণিত হইয়াছে, তাহার টীকা নাই। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতানুসারে, ভীম ধৃত হইলে, তদীয় সুহৃৎ হরি, ছত্রভঙ্গ বিদ্রোহী সেনা পুনঃ সম্মিলিত করিয়া, যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন। ভীষণ যুদ্ধের পর, হরি ধৃত এবং নিহত হইয়াছিলেন। ভীমও সম্ভবত নিহত হইয়াছিলেন। এইরূপে বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত হইলে, পালবংশের জন্মভূমি [জনকভু] আবার পাল-নরপালের হস্তগত হইয়াছিল।

বিদ্রোহ দমন করিয়া, রামপাল "রামাবতী" নামক এক নূতন নগর নির্ম্মাণ করিয়া, বরেন্দ্রভূমির শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। তিনি একদিকে যেমন অভিনব নগর-নির্ম্মাণে রত ছিলেন, আর এক দিকে তেমনি নষ্টপ্রায় গৌড়-রাজশক্তির পুনরুজ্জীবন-সাধনে যত্নবান হইয়াছিলেন। সন্ধ্যাকর লিখিয়াছেন—পূর্ব্বদিকের এক জন নরপতি, পরিত্রাণ পাইবার জন্য, রামপালকে বর-বারণ, নিজের রথ এবং বর্ম্ম উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। যথা—

> স্বপরিত্রাণ-নিমিত্তং পত্যা যঃ প্রাগ্দিশীয়েন।
> বর-বারণেন চ নিজ স্যন্দন-দানেন বর্ম্মণারাধে॥"

বরেন্দ্রবাসী সন্ধ্যাকর যাঁহাকে "প্রাগ্দিশীয়" বলিয়াছেন, তিনি সম্ভবত বাঙ্গালার পূর্ব্ব সীমান্তের কোন পার্ব্বত্য-প্রদেশের নৃপতি। রামপাল কামরূপ জয় করিয়া, গৌররাষ্ট্রভুক্ত করিরাছিলেন ["বিগ্রহনির্জ্জিতকামরূপভূৎ"]। এই কামরূপ-জয় যে সন্ধ্যাকর নন্দীর কল্পনা-প্রসূত নহে, কুমারপালের প্রসঙ্গে আমরা তাহা দেখিতে পাইব। রামপাল উৎকলে এবং কলিঙ্গেও স্বীয় প্রাধান্য-স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকর নন্দী লিখিয়াছেন—

"ভবভূষণ-সন্ততিভুব মনুজগ্রাহ জিত মুৎকলত্রং যঃ।
জগদবতিস্ম সমস্তং, কলিঙ্গত স্তান্ নিশাচরান্ নিঘ্নন্॥"

"ভবভূষণ (চন্দ্রের) সন্ততির রাজ্য উৎকল জয় করিয়া, তৎপ্রতি যিনি অনুগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং চৌরগণকে নিহত করিয়া, কলিঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত জগৎ প্রতিপালন করিয়াছিলেন।"

রামপাল যখন গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তখন গঙ্গ-বংশীয় অনন্তবর্ম্মা-চোড়গঙ্গ [রাজত্ব ১০৭৮-১১৪২ খৃষ্টাব্দ] কলিঙ্গের রাজা ছিলেন, এবং তিনিই উৎকল অধিকার করিয়াছিলেন। গঙ্গ-বংশীয় নৃপতিগণ চন্দ্রবংশোদ্ভব বলিয়া পরিচিত ছিলেন। * সুতরাং এ স্থলে সন্ধ্যাকর নন্দী চোড়-গঙ্গকে স্মরণ করিয়াই, উৎকলকে "ভবভূষণ-সন্ততিভূ" বলিয়াছেন। † কিন্তু রামপাল কর্ত্তৃক চোর-গঙ্গের এই পরাজয়-কাহিনী কতদূর সত্য, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। গঙ্গ বংশীয় নৃপতিগণের মধ্যে চোড়-গঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত ছিলেন। গঙ্গ-বংশীয় নৃপতিগণের তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে, —চোর-গঙ্গ গঙ্গার তীর পর্য্যন্ত স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, এবং গঙ্গাতীরবর্ত্তী যুদ্ধক্ষেত্রে "মন্দারাধিপতিকে" পরাজিত এবং আহত করিয়াছিলেন। এই সুত্রেই হয়ত কলিঙ্গ-পতির সহিত গৌড়-পতির সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং কলিঙ্গ-পতিকে প্রতিদ্বন্দীর অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল। চোড়-গঙ্গের অতি দীর্ঘকাল-ব্যাপী রাজত্বের প্রথম ভাগে, তাঁহাকে রামপালের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। সেই সময়, গৌড়াধিপের নিকট মস্তক অবনত করা অসম্ভব নহে; এবং রামপালের মৃত্যুর পর, হয়ত চোড়-গঙ্গ প্রবলতর হইয়াছিলেন। সন্ধ্যাকর নন্দী যে সত্যের অপলাপ করেন নাই, কুমরদেবীর সারনাথের শিলালিপি এবং বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে। সুতরাং তাঁহার বর্ণিত রামপালের কলিঙ্গ-জয়-কাহিনী অমূলক বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে না। রাঢ়ও অবশ্য রামপাল কর্ণাট-রাজের কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। দেবপাড়ার শিলালিপি-অনুসারে, সামন্তসেন যে সকল কর্ণাটলক্ষ্মী-লুণ্ঠনকারী দুর্ব্বৃত্তগণকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তাহারা গৌড়াধিপেরই সেনা। সামন্তসেন এই সকল "দুর্ব্বৃত্তগণকে" বিনাশ করিয়াও, রাঢ়ে কর্ণাট-রাজের আধিপত্য অটুট রাখিতে না পারিয়া, হয়ত শেষ বয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

* "অজনি রজনিজানি-বংশচূড়ামণি রগিমাদি-গুণেন চোরগঙ্গঃ॥
Inscription of Svapnesvara, Verse 7, **Epigraphia Indica**, Vol. VI, p. 200.

† "রামচরিতের" ভূমিকায় শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,—"He (Ramapala) conquered Utkala and restored it to the Nagvamsis" ইহা দ্বারা বুঝা যায়, শাস্ত্রী মহাশয় "ভবভূষণ-সন্ততি" পদ "নাগবংশী" অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। নাগ ভবের (শিবের) ভূষণ হইলেও, নাগবংশীয় কোন রাজা উড়িষ্যায় কখনও রাজত্ব করিয়াছেন বলিয়া এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। পক্ষান্তরে "রামচরিতের" (২।৫) টীকা হইতে জানা যায়, রামপালের রাজ্য লাভের অব্যবহিত পূর্ব্বে, উৎকলে "কেশরী" উপাধিধারী একজন নৃপতি ছিলেন। ভীমের সহিত যুদ্ধোদ্যত রামপালের সহিত যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে "উৎকলেশ কর্ণকেশীর" পরাভবকারী দণ্ডভুক্তি-ভূপতি জয়সিংহের নাম দৃষ্ট হয়।

J. A. S. B. Vol. LXV, Part. p. 241.

বরেন্দ্রভূমির বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ করিয়া, এবং কামরূপ ও কলিঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিয়া, রামপাল যে গৌড়রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেই অভিনব গৌড়রাষ্ট্রের সহিত রামপালের পূর্ব্বপুরুষগণের শাসিত গৌড়রাষ্ট্রের অনেক প্রভেদ ছিল। প্রজাসাধারণের নির্ব্বাচিত গৌড়াধিপ গোপালের গৌড়রাষ্ট্র, প্রজার প্রীতির এবং প্রজাশক্তির সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু হতভাগ্য দ্বিতীয় মহীপালের "অনীতিকারম্ভের" ফলে, এবং দিব্বোক-নিয়ন্ত্রিত বিদ্রোহানলে, সেই ভিত্তি ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল। রামপালের পক্ষে, গৌড়রাজ্যের বিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুনরায় একত্রিত করিয়া, উহার পুনর্গঠন সম্ভব হইলেও, সেই দেহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা,—সেই ভগ্ন অট্টালিকার বহিরঙ্গের সংস্কার সম্ভব হইলেও,—উহার নষ্টভিত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা, অসম্ভব হইয়াছিল। সুতরাং রামপালের মৃত্যুর পরই, আবার রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে, বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। কিন্তু রামপালের জ্যেষ্ঠ পুত্র "গৌড়েশ্বর" কুমারপালের, এবং তাঁহার প্রধান সচিব এবং সেনাপতি, বৈদ্যদেবের বাহুবলে, গৌড়রাষ্ট্রের পতন আরও কিছু কালের জন্য স্থগিত রহিল। বৈদ্যদেবের [কমৌলিতে প্রাপ্ত] তাম্রশাসনে বৈদ্যদেব কর্ত্তৃক [অনুত্তর বঙ্গে] দক্ষিণবঙ্গে, নৌ-যুদ্ধে জয়লাভ-প্রসঙ্গে, পুনরায় বিদ্রোহ সূচিত হইয়াছে (১১ শ্লোক)। এই সময়ে কামরূপের সামন্ত-নরপতিও বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিলেন। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে—

"পূর্ব্বদিগ্বিভাগে বহুমান-প্রাপ্ত তিম্‌গ্যদেব-নৃপতির-বিদ্রোহ-বিকার শ্রবণ করিয়া, গৌড়েশ্বর তাঁহার রাজ্যে এইরূপ [গুণগ্রাম-সমন্বিত] বিপুল কীর্ত্তিসম্পন্ন বৈদ্যদেবকে নরেশ্বর-পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সাক্ষাৎ মার্ত্তণ্ড-বিক্রম বিজয়শীল সেই বৈদ্যদেব [আপন] তেজস্বী প্রভুর আজ্ঞাকে মাল্যদামের ন্যায় মস্তকে ধারণ করিয়া, কতিপয় দিবসের দ্রুত-রণযাত্রার [অবসানে] নিজ ভুজবলে সেই অবনিপতিকে যুদ্ধে পরাভূত করিবার পর, [তদীয় রাজ্যে] মহীপতি হইয়াছিলেন (১৩—১৪ শ্লোক)

কুমারপালের মৃত্যুর পর, তদীয় পুত্র [তৃতীয়] গোপাল গৌড়সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। মদনপালের তাম্রশাসন (১৭ শ্লোক) পাঠে অনুমান হয়,—তৃতীয় গোপাল যখন রাজ্যভার প্রাপ্ত হন, তখনও তিনি শৈশবের সীমা অতিক্রম করেন নাই। সন্ধ্যাকর নন্দী লিখিয়াছেন—

"অপি শত্রুঘ্নোপায়াদ্গোপালঃ স্ব র্জগাম তৎসূনুঃ।"

"তাঁহার [কুমারপালের] পুত্র গোপাল শত্রুঘ্নোপায়-হেতু স্বর্গ গমন করিয়াছিলেন।" "শত্রুঘ্নোপায়ের" [শত্রুহননকারীর উপায়ের] উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, তৃতীয় গোপাল, যুদ্ধে বা ঘাতুকের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, রামপালের [মদনদেবীর গর্ভজাত] পুত্র মদনপাল সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। মদনপালের রাজ্যের অষ্টম বৎসরে সম্পাদিত [মনহলিতে প্রাপ্ত] তাম্রশাসনে, প্রশস্তিকার (১৮ শ্লোক) তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্যের কোন পরিচয় দেন নাই। ইহাতে অনুমান হয়, মদনপাল তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুমারপালের বা পিতা রামপালের ন্যায় সমর-কুশল ছিলেন না। রাজা দুর্ব্বল হইলে, পতনোন্মুখ রাজ্যের যে অবস্থা হয়, মদনপালের সময় গৌড়রাষ্ট্রেরও তাহাই ঘটিয়াছিল। গৌড়ারাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশ গৌড়পতির হস্তচ্যুত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কমৌলীতে প্রাপ্ত

তাম্রশাসনে বৈদ্যদেবকে "মহারাজাধিরাজ-পরমেশ্বর পরমভট্টারক" উপাধিতে ভূষিত দেখিয়া মনে হয়, বৈদ্যদেব কামরূপে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিলেন।

বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনের একটি শ্লোকের সাহায্যে কুমারপালের এবং মদনপালের কাল নিরূপিত হইতে পারে। এই তাম্রশাসনের ২৮ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,—"মহারাজ বৈদ্যদেব বৈশাখে বিষুবৎ-সংক্রান্তিতে একাদশী তিথিতে" ভূমিদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুত আর্থার ভিনিস্ দেখাইয়াছেন, [১০৬০ হইতে ১১৬১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে] ১০৭৭, ১০৯৬, ১১২৩, ১১৪২ এবং ১১৬১ খৃষ্টাব্দে একাদশী তিথিতে, এবং ১১১৫ এবং ১১৩৪ খৃষ্টাব্দে দ্বাদশী তিথিতে মেষ-সংক্রান্তি হইয়াছিল।* এই সকল সালের মধ্যে, কোনও সালে বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন উৎকীর্ণ হইয়াছিল। যে যুক্তি-পরম্পরা অবলম্বন করিয়া, ভিনিস্ সাল (১১৪২ খৃঃ-অঃ) নির্ব্বাচন করিয়াছেন, তাহা আর এখন গ্রাহ্য হইতে পারে না। কারণ, কুমরদেবীর সারনাথের শিলালিপি প্রতিপাদন করিতেছে—রামপাল খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষপাদে গৌড়-সিংহাসনে আসীন ছিলেন। সুতরাং, রামপালের উত্তরাধিকারী কুমারপালের রাজত্ব দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে স্থাপন করিতে হইবে। কুমারপাল যে দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন, বা দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, এরূপ বোধহয় না, কারণ তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার উত্তরাধিকারী তৃতীয় গোপাল শৈশবের সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন না। সুতরাং ১১১৫ খৃষ্টাব্দে বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন সম্পাদিত হইয়াছিল, এরূপ মনে করাই সঙ্গত। এই তাম্রশাসন "সং ৪" বা বৈদ্যদেবের কামরূপে রাজত্বের চতুর্থ বৎসরে সম্পাদিক হইয়াছিল। কুমারপাল বৈদ্যদেবকে হয়ত ১১১২ খৃষ্টাব্দে কামরূপের রাজপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং কুমারপালের মৃত্যুর এবং তৃতীয় গোপালের হত্যার পরে, [আনুমানিক ১১১৪ খৃষ্টাব্দে] মদনপাল সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। কুমারপালের পরই বৈদ্যদেব স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া থাকিবেন।

বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন ১১৪২ খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত বলিয়া মনে করিবার আরও একটি কারণ ভিনিস্ কর্ত্তৃক সূচিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন,—এই লিপির "অক্ষরের সহিত বিজয়সেনের দেবপাড়া-লিপির অক্ষরের সাদৃশ্য আছে; কিন্তু (বিজয়সেনের লিপির অক্ষরের অপেক্ষা এই লিপির অক্ষরের) বর্ত্তমান বঙ্গাক্ষরের সহিত সাদৃশ্য আরও অধিক।', বিজয়সেনের লিপির অক্ষরের সহিত বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনের অক্ষর মিলাইলে, কথাটা ঠিক বলিয়া মনে হয় না।"† দেবপাড়ার শিলালিপির ত, ন, ম, র এবং স বর্ত্তমান বঙ্গাক্ষরের অনুরূপ; কিন্তু বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনের ত, ন, ম, র এবং স পুরাতন ঢঙ্গের। সুতরাং অক্ষরের হিসাবে, বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনকে দেবপাড়ার শিলালিপির কিছুকাল পূর্ব্বে স্থাপন না করিয়া উপায় নাই। খৃষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দে, বর্ত্তমান বঙ্গাক্ষরের উদ্ভবকালে, যে লিপিতে আধুনিক বঙ্গাক্ষরের সংখ্যা যত বেশী লক্ষিত হয়, সে লিপিকে তত আধুনিক মনে করাই সঙ্গত।

লক্ষীসরাইয়ের নিকটবর্ত্তী জয়নগর গ্রামে প্রাপ্ত একখানি শিলাখণ্ডে „যে ধর্ম্মা" ইত্যাদি বৌদ্ধমন্ত্র এবং "শ্রীমন্ মদনপালদেব-রাজ্যে সম্বৎ

* Epigraphia Indica, Vol. 11, p. 349.
† Cunningham's **Archæological Survey Report,** Vol. III, p. 125.

১৯ আশ্বিন ৩০ "উৎকীর্ণ রহিয়াছে। * মদনপালের রাজ্যের ১৯ সম্বতের বা ১১৩১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই, সম্ভবতঃ বর্ম্মণ-বংশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিল, এবং সামন্তসেনের পৌত্র বিজয়সেন গৌড়রাষ্ট্রের কেন্দ্র বরেন্দ্রমণ্ডলে সেনরাজ্যের ভিত্তিস্থাপনের উদ্যোগ করিতেছিলেন।

মগধে আবিষ্কৃত শিলালিপিতে মহেন্দ্রপাল এবং গোবিন্দপাল নামক আরও দুই জন পাল-নরপালের পরিচয় পাওয়া যায়। শিলালিপিতে এবং তাম্রশাসনে প্রত্যেক পাল-নরপালের নামের অন্তে, 'দেব' শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যে দুইখানি শিলালিপিতে মহেন্দ্রপালের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার কোন খানিতেই মহেন্দ্রপালকে „মহেন্দ্রপালদেব" বলা হয় নাই।† ইহাতে মনে হয়, মহেন্দ্রপাল পাল-নরপালগণের বংশ-সম্ভূত এবং তাঁহাদের স্থলবর্ত্তী নাও হইতে পারেন। কিন্তু গোবিন্দপালের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইতে অনুমান হয়, তিনি পাল-রাজগণের বংশোদ্ভব এবং পালবংশের শেষ নৃপতি। নেপাল হইতে সংগৃহীত এবং লণ্ডনের রয়াল এসিয়াটিক্ সোসাইটীর পুস্তকালয়ে রক্ষিত একখানি হস্তলিখিত „অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞা-পারমিতা" গ্রন্থের সমাপ্তি-বাক্যের পরে লিখিত আছে,— "পরমেশ্বর-পরমভট্টারক-পরম-সৌগত-মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্গোবিন্দপালবিজয় রাজ্য সম্বৎ ৪॥" এই পুস্তকের লেখায় ব্যবহৃত অক্ষরের মধ্যে ত, ন, ম এবং র দেবপাড়ার শিলালিপির ত, ন, ম এবং রএর মত বর্ত্তমান বঙ্গাক্ষরের ঢঙ্গের।‡ গয়ার একখানি শিলালিপি হইতে গোবিন্দপালের রাজ্যের অবসানকাল নিরূপণ করা যায়। এই শিলালিপির সম্পাদন-কাল সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে—"সম্বৎ ১২৩২ বিকারি-সম্বৎসরে শ্রীগোবিন্দপালদেব গতরাজ্যে চতুর্দ্দশ-সম্বৎসরে গয়ায়াং॥"§ ১২৩২ বিক্রম সম্বৎ বা ১১৭৫ খৃষ্টাব্দের চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১১৬১ খৃষ্টাব্দে, গোবিন্দপালের রাজত্বের অবসান হইয়াছিল। গোবিন্দপাল বা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নৃপতি হয়ত বিজয়সেন কর্ত্তৃক বরেন্দ্র হইতে তাড়িত হইয়া, মগধে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১২০২ বিক্রম-সম্বতে [১১৪৬ খৃষ্টাব্দে] কান্যকুব্জেশ্বর গোবিন্দচন্দ্র মগধ আক্রমণ করিয়াছিলেন। কারণ, গোবিন্দচন্দ্রের এই সালের একখানি তাম্রশাসনে ¶ উল্লিখিত হইয়াছে, উহা মুদ্গগিরি বা মুঙ্গেরে সম্পাদিত হইয়াছিল। নেপাল হইতে সংগৃহীত এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকালয়ে রক্ষিত একখানি হস্ত-লিখিত পুস্তকের উপসংহারে লিখিত আছে, ∴ —

* Cunningham's **Archæological Report,** Vol. III, pp- 123-124.

† Cf. **Epigraphia Indica,** Vol. I, plate 19, and the same Vol. 11, plates 29—33.

‡ **The Journal of the Royal Asiatic Society**, New Series, Vol. VIII (1876) p. 3 and plate 2 [Cowell and Eggelling's **Catalogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts** in the possession of R. A. S.]

§ Cunningham's **Archæological Survey Report,** Vol. III, p. 125 বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই শিলালিপির একটি ছাপ তুলিয়া অনুসন্ধান-সমিতিকে প্রদান করিয়াছেন।

¶ **Epigraphia Indica,** Vol VII, p. 99.

∴ Bendall's **Catalogue of Buddhist Sanskrit Mss. Cambridge,** p iii.

"পরমেশ্বরেত্যাদি রাজাবলী পূর্ব্ববৎ শ্রীমদ্গোবিন্দ-পালদেবানাং বিনষ্টরাজ্যে অষ্টত্রিংশৎ সম্বৎ-সরেভিলিখ্যমানো।" এ স্থলে বিনষ্ট-রাজ্যের উল্লেখ দেখিয়া অনুমান হয়, কোনও শত্রুকর্ত্তৃক গোবিন্দপাল রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। গোবিন্দ-পালের রাজ্যনষ্টকারী সম্ভবতঃ বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন। গোবিন্দপালের রাজ্যনাশের ১৪ এবং ৩৮ বৎসর পরেও, তাঁহার বিনষ্ট বা গতরাজ্যের হিসাবে, সাল-গণনার প্রচলন দেখিয়া মনে হয়, যিনি গোবিন্দপালের রাজ্য নষ্ট করিয়াছিলেন, তিনি সেই স্থলে স্বীয় আধিপত্য সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন না। তিনি ভাঙ্গিতে পারিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নূতন করিয়া গড়িবার অবসর পাইয়াছিলেন না। এই জন্যই বিজেতার বিজয়-রাজ্যের সম্বৎসর প্রচলিত হইয়াছিল না; বিজিত গোবিন্দপালের বিনষ্ট রাজ্যের সম্বৎসরই প্রচলিত ছিল।

যে দুইটি স্বতন্ত্র রাজবংশ অভ্যুদিত হইয়া, পাল-রাজবংশ উন্মূলিত করিয়াছিল, তন্মধ্যে বঙ্গের বর্ম্মা-বংশ পূর্ব্বতন এবং প্রথম উল্লেখযোগ্য। বর্ম্মা-বংশের ইতিবৃত্ত-সঙ্কলনকারির প্রধান অবলম্বন হরিবর্ম্মার তাম্রশাসন, এবং হরিবর্ম্মার ও তাঁহার পুত্রের মন্ত্রী ভট্ট-ভবদেব-বালবলভীভুজঙ্গের ভুবনেশ্বরের প্রশস্তি। হরিবর্ম্মার তাম্রশাসনের পশ্চাদ্ভাগের অস্পষ্ট প্রতিকৃতি এবং তাহার একটি আনুমানিক পাঠ মাত্রই প্রকাশিত হইয়াছে।* এই অংশ হইতে জানিতে পারা যায়—"বিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবার হইতে মহারাজাধি-রাজ-জ্যোতিবর্ম্ম পাদানুধ্যাত-পরমবৈষ্ণব-পরমেশ্বর-পরমভট্টারক-মহারাজাধিরাজ-শ্রীহরিবর্ম্মদেব" ভূমি-দান করিতেছেন। ভট্ট-ভবদেব-বালবলভী-ভুজঙ্গের প্রশস্তিতে উক্ত হইয়াছে,—সাবর্ণমুনির বংশধর

---

* শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস", দ্বিতীয় ভাগ, ২১৫ পৃষ্ঠা ও চিত্র দ্রষ্টব্য। বসু মহাশয় বলেন,—সুলতান মামুদ কর্তৃক কান্যকুব্জ আক্রমণ সময়ে (১০১৮ খৃষ্টাব্দে) যিনি কান্যকুব্জের রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম জয়পাল (কুল-গ্রন্থোক্ত জয়চন্দ্র)। "অধিক সম্ভব, পরম ধার্ম্মিক মহারাজ হরিবর্ম্মদেব কনোজপতি জয়পাল বা জয়চন্দ্রের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।" আবার "প্রায় আড়াইশত বর্ষ পূর্ব্বে" আবির্ভূত রাঘবেন্দ্র কবিশেখর "প্রাচীন লোকদিগের মুখে শুনিয়া এবং প্রাচীন কুলগ্রন্থ সকল দেখিয়া" যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, হরিবর্ম্মদেব যখন "গৌড়োদ্ভবঙ্গাধিপ" তখন কান্যকুব্জে "যবনাগমন" ও "রাজ্যনাশ" দেখিয়া, গঙ্গাপতি প্রভৃতি বহু ব্রাহ্মণ বঙ্গে আসিয়াছিলেন। অতএব হরিবর্ম্মা সুলতান মামুদ ও জয়চন্দ্রের বা জয়পালের সমসাময়িক। সুলতান মামুদের আক্রমণ-সময়ে যিনি কান্যকুব্জের অধীশ্বর এবং মুসলমান লেখকগণ যাঁহাকে "রায় জয়পাল, এ কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কুলগ্রন্থ এই রাজ্যপালের কোন খবর দিতে পারে কিনা জানি না। সুতরাং এই হিসাবে হরি বর্ম্মার সময় নিরূপণের জন্য বসুমহাশয় যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অমূলক। হরিবর্ম্মার আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে প্রধান সাক্ষী হরিবর্ম্মার তাম্রশাসনের এবং ভট্টভবদেবের ভুবনেশ্বর-প্রশস্তির অক্ষর। বসু মহাশয় প্রকাশিত উক্ত তাম্রশাসনের অস্পষ্ট প্রতিকৃতির যে কয়টি অক্ষর বুঝা যায়, তাহা বিজয়সেনের দেবপাড়া প্রশস্তির অনুরূপ। দৃষ্টান্তস্থলে আমরা ত, ম, এবং সএর উল্লেখ করিব। ভট্ট-ভবদেবের ভুবনেশ্বর-প্রশস্তি সম্বন্ধে কিলহর্ণ লিখিয়াছেন—"On palæographical grounds I do not hesitate to assign this record, like the preceding one, to about A. D. 1200 (**Epigraphia Indica,** Vol. VI. p. 205)' কিলহর্ণ "preceding one. বলিয়া যে লিপির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ত্রিকলিঙ্গপতি প্রথম অনিয়ঙ্কভীমের সময়ের স্বপ্নেশ্বরদেবের প্রশস্তি। প্রথম অনিয়ঙ্কভীম ১১৯২ খৃষ্টাব্দে কলিঙ্গের সিংহসন আরোহণ করিয়া দশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং স্বপ্নেশ্বরদেবের শিলালিপির সময় সম্বন্ধে আর কোন সংশয় হইতে পারে না। ভট্টভবদেবের প্রশস্তির অক্ষর স্বপ্নেশ্বরের লিপির ঠিক কিলহর্ণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। কিলহর্ণ-কথিত ঠিকঠাক ১২০০ খৃষ্টাব্দ ভট্ট-ভবদেবের প্রশস্তির কাল না অনুরূপ বলিয়া হইলেও, অক্ষরের হিসাবে, হরিবর্ম্মার তাম্রশাসন এবং ভবদেবের প্রশস্তি দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ঠেলিয়া লওয়া যায় না।

শ্রোত্রিয়গণ যে সকল গ্রামে বাস করিতেন, তন্মধ্যে রাঢ়া বা রাঢ়দেশের অলঙ্কার সিদ্ধলগ্রাম' সর্ব্বাগ্রগণ্য। এই গ্রামের একটি সমুন্নত বংশে (প্রথম) ভবদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি গৌড়-নৃপ হইতে হস্তিনীভিট্ট নামক গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ভবদেবের পুত্র রথাঙ্গ। রথাঙ্গের পুত্র অত্যঙ্গ। অত্যঙ্গের পুত্র স্ফুরিত-বুধ। স্ফুরিত বুধের পুত্র আদিদেব। আদিদেব বঙ্গরাজের মহামন্ত্রী-মহামাত্র-সন্ধিবিগ্রহী ছিলেন। আদিদেবের বঙ্গরাজের মহামন্ত্রী-মহাপাত্র-সন্ধিবিগ্রহী ছিলেন। আদিদেবের পুত্র গোবর্দ্ধন। গোবর্দ্ধন জনৈক বন্দ্যঘটীয় ব্রাহ্মণের দুহিতার [সাঙ্গোকার] পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। গোবর্দ্ধন এবং সাঙ্গোকার পুত্র ভবদেব-বালবলভীভূজঙ্গ দীর্ঘকাল হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রী ছিলেন, এবং পরে হরিবর্ম্মদেবের পুত্রেরও মন্ত্রিপদারূঢ় ছিলেন। এই দ্বিতীয় ভবদেব রাঢ়দেশে একটি জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন, এবং ভুবনেশ্বরে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া, সেই মন্দিরে নারায়ণ, অনন্ত এবং নৃসিংহমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন।

এই প্রশস্তি যে কেবল বর্ম্ম-রাজবংশের এবং দ্বাদশ শতাব্দীর রাঢ়-বঙ্গের একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশের ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে আলোক দান করে এমন নহে, ইহা বাঙ্গালার ইতিহাসের আরও একটি গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসার সহায়তা করে। এই গুরুতর প্রশ্ন,—আদিশূর ঐতিহাসিক ব্যক্তি কি না? আদিশূর নামক যে প্রকৃত একজন রাজা ছিলেন, এ বিষয়ে কেহ কখনও সন্দেহ করেন নাই। আদিশূর কখন্ কোন্ স্থানে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, এই কথা লইয়াই বহুদিন বাদানুবাদ চলিতেছে। কিন্তু ভট্ট ভবদেবের ভুবনেশ্বরের প্রশস্তি পাঠ করিলে, আদিশূরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ উপস্থিত হয়।

দিল্লীর চিত্রশালার প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বিভাগের অধ্যক্ষ স্বর্গগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "বাঙ্গালার ইতিহাস" প্রথমভাগে, পাল বংশের রাজত্ব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন।

বারবার পরাক্রান্ত বিদেশীয় রাজগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া গৌড়-বঙ্গ-মগধের অধিবাসিগণ একজন রাজা নির্ব্বাচন করিয়াছিল। তিব্বতদেশীয় লামা তারানাথ তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, তৎকলে উড়িষ্যায়, বঙ্গে এবং পূর্ব্বদেশের অন্য পাঁচটি প্রদেশে প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্য নিজ নিজ অধিকারে রাজা হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সমগ্র দেশে কোন রাজা ছিলেন না।[১] দেশের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন প্রজাপুঞ্জ প্রবলের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া অরাজকতা দূর করিবার জন্য রাজনির্ব্বাচন করিরাছিল। প্রজাবৃন্দ যাঁহাকে গৌড়-বঙ্গ-মগধের সিংহাসন স্বেচ্ছায় প্রদান করিধাছিল, তাঁহার নাম গোপালদেব। তাঁহার পিতা যুদ্ধ-বিদ্যা-বিশারদ ছিলেন,[২] এবং তাঁহার পিতামহ দয়িতবিষ্ণু সর্ব্ববিদ্যাবিৎ ছিলেন[৩]। দয়িতবিষ্ণুর পিতৃ-পিতামহের কোন সন্ধান অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

(১) In Odivisa, in ;Bengal and the other five provinces of the East, each Kshatriya, Brahman and merchant, constituted himself a king of his surroundings, but there was no king ruling the country,—Indian Antiqnairy, Vol. IV. pp. 365.6,

(২) আসীদাসাগরাদুর্ব্বীং গুর্ব্বীভিকীর্ত্তিভিকৃতী।
মণ্ডয়ন্ খণ্ডিতারাতিঃ শ্লাঘ্যঃ শ্রীবপ্যটস্ততঃ ॥
—ধর্ম্মপালদেবের খালিমপুরের তাম্রশাসন; গৌড়লেখমালা পৃঃ ১১-১২।

(৩) শ্রিয়ঃ ইব সুভগায়া সম্ভবো বারিরাশিশ্ শশধর ইব ভাসো বিশ্বমাহ্লাদয়ন্ত্যা।
প্রকৃতিরবনিপানাং সন্ততেরুত্তমায়া অজনি দয়িতবিষ্ণুঃ সর্ব্ববিদ্যাবদাতাঃ ॥
—ধর্ম্মপালদেবের খালিমপুরের তাম্রশাসন; গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১১।

পালরাজবংশের যতগুলি শিলালিপি বা তাম্রশাসন অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে মাত্র খালিমপুরে আবিষ্কৃত ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসনে বপ্যট ও দয়িতবিষ্ণুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। দয়িতবিষ্ণুর বংশপরিচয় অদ্যাবধি কোন তাম্রশাসনে বা শিলালিপিতে আবিষ্কৃত হয় নাই। তাঁহার বংশধরগণ অন্যূন সার্দ্ধ চারি শত বৎসর গৌড়-মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বহু তাম্রশাসন ও শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে; কিন্তু পাল-রাজবংশের কোন খোদিত-লিপিতেই তাঁহাদিগের বংশ-পরিচয় প্রদত্ত হয় নাই। সন্ধ্যাকরনন্দী বিরচিত "রামচরিতে" এবং ঘনরামের "ধর্ম্মমঙ্গলে" পালরাজগণের বংশ-পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কুমারপালের সেনাপতি কামরূপরাজ বৈদ্যদেবের কমৌলী তাম্রশাসনে পালরাজগণের বংশ-পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। "রামচরিত" খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে লিখিত হইয়াছিল এবং বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনও ঐ সময়ে অথবা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে প্রদত্ত হইয়াছিল। ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল ইঁহার বহু পরে রচিত হইয়াছিল। গোপালদেবের পুত্র ধর্ম্মপালদেবের রাজত্বকালে হরিভদ্র 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার' টীকায় বলিয়া গিয়াছেন যে, ধর্ম্মপাল "রাজভটাদিবংশপতিত[৪]।" হরিভদ্র ধর্ম্মপালদেবের সমসাময়িক ব্যক্তি; সুতরাং তাঁহার উক্তি সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিত, ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল ও বৈদ্যদেবের কমৌলী তাম্রশাসনাপেক্ষা অধিকতর প্রামাণিক হওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর মতানুসারে ধর্ম্মপাল বঙ্গের খড়্গবংশীয় রাজা দেবখড়্গের পুত্র রাজরাজভট্টের বংশজাত। বসুজ মহাশয় বলিয়াছেন,—"এই কয়টি প্রমাণ দ্বারা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, গোপাল ও ধর্ম্মপাল প্রথমতঃ গৌড়বাসী ছিলেন না, মূলতঃ বঙ্গবাসী ছিলেন এবং বঙ্গের রাজভটের বংশে উদ্ভূত হইয়াছিলেন[৫]। চীনদেশীয় পরিব্রাজক সেঙ্গ-চি ৬৫০ হইতে ৬৫৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে রাজভটকে সমতট বা বঙ্গের সিংহাসনে দেখিয়াছিলেন। চীন-পরিব্রাজক ই-চিং ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে তাম্রলিপ্তি নগরে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, তৎপূর্ব্বে সেঙ্গ-চি নামক তাঁহার একজন স্বদেশবাসী জলপথে সমতটে আগমন করিয়াছিলেন[৬]। বসুজ মহাশয় স্থির করিয়াছেন যে,

(৪) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস; রাজন্যকাণ্ড, পৃঃ ১৪৭। হরি-ভদ্রের 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা টীকায়" ধর্ম্মপালদেব সম্বন্ধে 'রাজভটবংশপতিত শব্দটি আছে, এই সংবাদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নিকট পাইয়াছিলেন। নেপালে কাঠমুণ্ড নগরে 'বীর লাইব্রেরী. নামক গ্রন্থাগারে হরিভদ্র- বিরচিত 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা-টীকার একখানি প্রাচীন পুথি আছে, পুথিখানি তালপত্রে লিখিত এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতানুসারে পুথিখানির বয়স সাত আটশত বৎসর হইবে। এই গ্রন্থের দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের শেষে নিম্নলিখিত শ্লোকটি লিখিত আছে,—

রাজ্যে রাজভটাদিবংশপতিত শ্রীধর্ম্মপালস্য বৈ
তত্ত্বালোকবিধায়িনী বিরচিতা সৎপঞ্জিকেয়ং ময়া ॥

এই গ্রন্থের পুষ্পিকা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, টীকাটি হরিভদ্র- বিরচিত,—

অভিসময়ালঙ্কারাবলোকেত্যষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা ব্যাখ্যা সমাপ্তা। কৃতিরিয়ং আচার্য্যহরিভদ্রপাদানাং।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অনুমান করেন যে, 'রাজভটাদিবংশপতিত" শব্দে রাজভট প্রভৃতির সহিত পালবংশের অতি দূর-সম্পর্কে সূচিত হয়। কিন্তু ইহার অর্থে গোপাল বা ধর্ম্ম- পালকে রাজভটের বংশধর বলা যাইতে পারে না। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রামচরিত সম্পাদনকালে বলিয়াছেন যে, পালরাজগণ সম্ভবতঃ রাজভটের কোন সেনাপতির বংশজাত; Dharmapala is described by Haribhadra as belonging to the family of a military officer of the same king,—Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III, p. 6.

(৫) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, পৃঃ ১৪৭।

(৬) Jyan Takakusu's I-tsing, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস", রাজন্যকাণ্ড, ৭৬ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত; বসুজ মহাশয় পাদটীকায় পত্রাঙ্ক প্রদান করেন নাই।

খড়্গাবংশীয় দেবখড়্গের পুত্র রাজরাজভট্ট এবং চীন-পরিব্রাজক-বর্ণিত সমতটরাজ রাজভট একইব্যক্তি। এই প্রসঙ্গে বসুজ মহাশয় বলিয়াছেন, "কেহ কেহ এই রাজভটের পিতার তাম্রশাসনলিপির আলোচনা করিয়া তাঁহাকে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর লোক বলিতে চান। কিন্তু অক্ষর দেখিয়া ইহার কাল-নির্ণয় সমীচীন হয় নাই [৭]।" দেবখড়্গের কাল-নির্ণয়-প্রসঙ্গে যথাস্থানে অক্ষর-তত্ত্বের প্রমাণের মূল্য আলোচিত হইবে। এইস্থানে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, অক্ষর-তত্ত্বের প্রমাণানুসারে দেবখড়্গ ধর্ম্মপালদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন, সুতরাং দেবখড়্গের পুত্র রাজভট বা রাজরাজভট্ট কখনই ধর্ম্মপালদেবের পিতা গোপালদেবের পূর্ব্বপুরুষ হইতে পারেন না। দেবখড়্গের পুত্র রাজরাজভট্ট কখনই খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর ব্যক্তি হইতে পারেন না, সুতরাং সেঙ্গ-চি-বর্ণিত রাজভট্ট স্বতন্ত্র ব্যক্তি। হরিভদ্রের অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতার টীকায় 'রাজভটাদিবংশপতিত' শব্দের যে 'রাজভটের বংশপ্রসূত' অর্থ হইবে, ইহার কিছুই নিশ্চয়তা নাই; 'রাজভটবংশপতিত' শব্দে রাজভৃত্যবংশোদ্ভব বুঝাইলেও বুঝাইতে পারে। গোপালদেব যদি সমতট বা বঙ্গের বিখ্যাত রাজবংশপ্রসূত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার পুত্রের এবং বংশধরগণের প্রশস্তি-রচয়িতৃগণ উচ্চকণ্ঠে বহু শব্দাড়ম্বরের সহিত পালবংশের পূর্ব্ব-গৌরব কীর্ত্তন করিতেন। ভারতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বাতাপীপুরের চালুক্যবংশের সাম্রাজ্য ৬৫৩ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূটরাজ দন্তিদুর্গ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল [৮]। দন্তিদুর্গ হইতে দ্বিতীয় কর্কের রাজ্যকাল পর্য্যন্ত চালুক্য রাজগণ সামান্য সামন্তে পরিণত হইয়াছিলেন, কিন্তু কল্যাণের চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় তৈল পিতৃরাজ্যোদ্ধার করিয়াছিলেন [৯]। কৌঠেম গ্রামে আবিষ্কৃত তাঁহার বংশধর পঞ্চম বিক্রমাদিত্য ত্রিভুবনমল্লের তাম্রশাসনে প্রাচীন চালুক্য-বংশের সুদীর্ঘ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে [১০]। ধর্ম্মপাল, দেবপাল প্রভৃতি পালবংশীয় সম্রাটগণের তাম্রশাসনসমূহে দেবখড়্গাদির উল্লেখের অভাব দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, খড়্গাবংশের সহিত পালবংশের কোনই সম্পর্ক ছিল না॥ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে, 'শ্রিয় ইব সুভগায়াঃ সম্ভবো বারিরাশিঃ" [১১] এবং "শ্লাঘা পতিব্রতাসৌ মুক্তারত্নঃ সমুদ্রশুক্তিরিব" [১২] প্রভৃতি শ্লোকে পালবংশের সিন্ধু হইতে উৎপত্তির ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। পালরাজ-বংশের তাম্রশাসনসমূহ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রের কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়াছে; মৈত্রেয় মহাশয়-কৃত পূর্ব্বোক্ত শ্লোকদ্বয়ের অনুবাদে পালবংশের সমুদ্র হইতে উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। প্রথম শ্লোকাংশটি খালিমপুরে আবিষ্কৃত ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসনের দ্বিতীয় শ্লোকের অংশ। ইহার বঙ্গানুবাদে দেখিতে পাওয়া যায় যে, চন্দ্র ও লক্ষ্মীর উৎপত্তিস্থান সমুদ্রের সহিত পাল-বংশের বীজি পুরুষ দয়িতবিষ্ণুর তুলনা করা হইয়াছে। [১৩] দ্বিতীয় শ্লোকাংশটি মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত দেবপালদেবের তাম্রশাসনের একাদশ শ্লোক। মৈত্রেয় মহাশয়ের অনুবাদে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেবপালদেবের মাতা রণ্ণা দেবীর সহিত মুক্তাপ্রসবকারী সমুদ্র-জাত শুক্তির তুলনা করা হইয়াছে [১৪]; সুতরাং এইস্থানে অর্থাৎ গোপাল ও ধর্ম্মপালের ঘটনার পরে পালবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন কথাই থাকিতে পারে না।

(৭) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, পৃঃ ১৪৭, পাদটীকা ৭।

(৮) Bhandarkar's Early History of the Dekkan, p. 69,

(৯) Ibid, p, 79,

(১০) কৌঠেম গ্রামে আবিষ্কৃত চালুক্যরাজ পঞ্চম বিক্রমাদিত্য ত্রিভুবনমল্লের তাম্রশাসন।—Indian Antiquary, Vol, XVI, 21,

(১১) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১১।

(১২) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৩৭।

(১৩) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৮।

(১৪) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৪৬।

সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিতে সিন্ধু বা সমুদ্র হইতে ধর্ম্মপালের উৎপত্তির উল্লেখ আছে। রামচরিতের শ্লোকগুলি দ্ব্যর্থবাচক, এইজন্য রামচরিতের যে অংশের টীকা আছে, তাহাতে রামপক্ষে এবং অপর পক্ষে উভয় প্রকারের ব্যাখ্যাই প্রদত্ত হইয়াছে,—

শ্রিয়মুন্মুদ্রিতলক্ষ্মীযুগলং কমলানামিনঃ স বস্তমুতাং।
কৃত্বালোকাহরণং মহাক্ষয়ে যং বিধুর্বিশতি॥

—রাম-চরিত, প্রথম পরিচ্ছেদ, ৩য় শ্লোক।

টীকাকার সমুদ্র পক্ষে ইহার নিম্নলিখিত ব্যাখা করিয়াছেন;—

"সমুদ্রপক্ষে। কমলানামিনঃ পতিঃ সমুদ্রঃ শ্রিয়ং বঃ তমুতাং ইত এব লক্ষ্মীপ্রাদুর্ভাবাৎ উন্মুদ্রিতলক্ষ্মীকঃ। মহাক্ষয়ে মহাপ্রলয়ে লোকহরণং কৃত্বা লোকান্ কুক্ষৌ নিক্ষিপ্য যং সমুদং বিধু র্বাসুদেবো বিশতি [১৫] ॥৩॥"

ইহার পরের শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই সমুদ্রের বংশে রাজা ধর্ম্মপাল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন;—

"তৎকুলদীপো নৃপতিরভূ [ৎ] ধর্ম্মো ধামবানিবেক্ষ্বাকুঃ।
যস্মাব্ধিং তীর্ণাপ্রবনৌ ররাজাপি কীর্ত্তিরবদাতা॥

—রামচরিত, প্রথম পরিচ্ছেদ, ৪র্থ শ্লোক।

অন্যত্র সমুদ্রকুলদীপো ধর্ম্মঃ ধর্ম্মনামা ধর্ম্মপাল ইতি যাবৎ। নৃপতিরভুৎ। একদেশেন সমুদায়ঃ, যথা ভীমো ভীমসেন ইতি। ধামবান্ তেজস্বী ইব যথা ইক্ষ্বাকুকং কটুতুম্বী উৎপ্লবতে, যথা যস্ত গ্রাবনৌঃ শিলানৌকা, অব্ধিং তীর্ণা সমুদ্রপ্রসাদাদন্তরীক্ষমিব তীর্ণবতী ররাজ, অপি শব্দাৎ কীর্ত্তিরপি সমুদ্রং তীর্ণা ॥৪॥"

ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে সমুদ্র হইতে পালরাজবংশের উৎপত্তির কিঞ্চিৎ আভাষ দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মপালদেবের পুত্র দেবপালদেবের মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধর্ম্মপালের পত্নীর নাম রন্নাদেবী [১৬]; কিন্তু ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলানুসারে তাঁহার পত্নীর নাম বল্লভা [১৭]। ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলানুসারে ধর্ম্মপাল অপুত্রক। নির্ব্বাসিতা বল্লভার গর্ভে সমুদ্রের ঔরসে এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, ঘনরাম গ্রন্থমধ্যে তাঁহার নাম উল্লেখ করেন নাই [১৮]। ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলের এই কাহিনী সম্পূর্ণ সত্য নহে, কারণ পালরাজগণের তাম্রশাসন সমুহে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেবপাল ধর্ম্মপালের পুত্র। এতদ্ব্যতীত ত্রিভুবনপাল নামক ধর্ম্মপালের আর এক পুত্র ছিল [১৯]।

ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে সমুদ্রের ঔরসে ধর্ম্মপালের পত্নী বল্লভাদেবীর গর্ভে অজ্ঞাতনামা পুত্রের উৎপত্তি কাহিনী দেখিয়া বোধ হয় যে, ঘনরাম কর্ত্তৃক ধর্ম্মমঙ্গল-রচনাকালে সমুদ্রকুলে পালরাজগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিকৃত জনশ্রুতি বা প্রবাদ প্রচলিত ছিল। সন্ধ্যাকরনন্দী-বিরচিত রামচরিতে সমুদ্রকুলে ধর্ম্মপালের উৎপত্তি কথা স্পষ্টভাবে

(১৫) Memoirs of the Asiatic Sciety of Bengal, Vol III, p. 20.

(১৬) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৪৩।

(১৭) ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল, পৃঃ ১৫০।

(১৮) ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল 'কাঙুর যাত্রা পালা'—

ধার্ম্মিক ধরণীতলে ধর্ম্মপাল রাজা।
প্রিয়পুত্র প্রায় পালে পৃথিবীর প্রজা॥
অপুত্রক মহারাজ অখিলে প্রকাশ।
বিশেষ ব্রাহ্মণ বিষ্ণু বৈষ্ণবের দাস॥
পুর্ব্বাপর পাটে রাজা ঐ গৌড় পুরী।
ধর্ম্মশীল রাণী তার ভ (ব) ল্লভা সুন্দরী॥
বনবাসে তখন আছিল সেই সতী।
তার সঙ্গে সমুদ্র সম্ভোগ কৈল রতি॥
গৌড়পতি তোমায় জনম নিলা হায়।

(১৯) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ২৬।

উল্লিখিত না থাকিলে কেবল ঘনরামের উপরে বিশ্বাস করিয়া পালবংশের উৎপত্তি-বর্ণনা বিজ্ঞান-সম্মত হইত না; কিন্তু খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রচিত গ্রন্থে এবং অন্যূন সপ্তদশ বর্ষের পুরাতন পুথিতে যখন এই কথার উল্লেখ পাওয়া যায়, তখন সমুদ্রকুলে পালরাজগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, রামপালদেবের পুত্র কুমারপালদেশের মন্ত্রী ও সেনাপতি কামরূপরাজ বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে সূর্য্যবংশে পালরাজগণের উৎপত্তি-কথা দেখিতে পাওয়া যায় [২০]। বৈদ্যদেবের প্রশস্তিকার বোধ হয় পালরাজগণের পূর্ব্বপরিচয় সম্যকরূপে অবগত ছিলেন না, এবং হয়ত পালরাজগণের সমুদ্রকুলে উৎপত্তির কথা কখনও তাঁহার শ্রুতিগোচর হয় নাই। সন্ধ্যাকরনন্দী গৌড়বাসী এবং পালরাজগণের বেতনভোগী কর্ম্মচারীর পুত্র, সুতরাং পালরাজবংশের প্রকৃত পরিচয় তাঁহারই জানা সম্ভব। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে পালরাজগণের সূর্য্যবংশে উৎপত্তির বিবরণ নিঃসন্দেহ বৈদ্যদেবের প্রশস্তিরচয়িতা মনোরথের অজ্ঞতার ফল। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন ও সন্ধ্যাকরনন্দীর "রামচরিত" প্রায় তুল্য কালের রচনা। সমসাময়িক রচনায় এইরূপ মতদ্বৈধ নিশ্চয়ই একজন রচয়িতার অজ্ঞতা অথবা ভ্রমের ফল। এইস্থানে সন্ধ্যাকরনন্দীর সহিত মনোরথের তুলনা করিয়া সন্ধ্যাকরনন্দীকে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, কারণ তিনি পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরের অধিবাসী ছিলেন এবং তাঁহার পিতৃপুরুষগণ পালসাম্রাজ্যে উচ্চ রাজপদের অধিকারী ছিলেন। আকবরের সুহৃদ ইতিহাসবেত্তা আবুল-ফজলের উক্তির উপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কেহ কেহ গৌড়-বঙ্গ-মগধের পালরাজগণকে কায়স্থ অনুমান করিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন [২১]। আবুল-ফজলের উক্তি, বিশেষতঃ প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে, অতি সাবধানে গ্রহণ করা উচিত। তিনি আকবরের সমসাময়িক ব্যক্তি, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আকবরের সম্বন্ধে তাঁহার সমস্ত উক্তিগুলি প্রকৃত ইতিহাসরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য নহে। তিনি পালবংশীয় দশজন রাজার নাম করিয়াছেন, কিন্তু তন্মধ্যে দেবপাল ও রাজ্যপাল ব্যতীত অপর কাহারও নাম পালরাজগণের খোদিতলিপি-মালায় দেখিতে পাওয়া যায় না [২২]।

দয়িতবিষ্ণুর পৌত্র, রণনীতিকুশল বপ্যটের পুত্র গোপাল, প্রজাবৃন্দ-কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া গৌড়-মগধের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। ইনি ইতিহাসে প্রথম গোপালদের নামে বিখ্যাত। গোপালদেবের পুত্র ধর্ম্মপালদেবের খালিমপুরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, "মাৎস্যন্যায় দূর করিবার অভিপ্রায়ে, প্রকৃতিপুঞ্জ যাঁহাকে রাজলক্ষ্মীর করগ্রহণ করাইয়াছিল, পূর্ণিমা রজনীর জ্যোৎস্নারাশির অতিমাত্র ধবলতাই যাঁহার স্থায়ী যশোরাশির অনুকরণ করিতে পারিত, নরপালকুলচূড়ামণি গোপাল নামক সেই প্রসিদ্ধ রাজা বপ্যট হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন [২৩]।" 'মাৎস্যন্যায়' বলিতে

(২০) এতস্য দক্ষিণদৃশো বংশে মিহিরস্য জাতবান্ পূর্ব্বং।
বিগ্রহপালো নৃপতিঃ সর্ব্বাকারর্দ্ধি সংসিদ্ধঃ ॥
—বৈদ্যদেবের কমৌলি তাম্রশাসন, ২য় শ্লোক,—গৌড়লেখমালা পৃঃ ১২৮।

(২১) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ, বসু মহাশয় তাঁহার "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস", রাজন্যকাণ্ডে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন,—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, পৃঃ ১৫১।

(২২) Col, H, S, Jarrett's Translation of the Ain-i-Akbari, (Bibliotheca India), Vol, II, p, 145,

(২৩) মাৎস্যন্যায়মপোহিতুং প্রকৃতিভির্লক্ষ্ম্যাঃ করং গ্রাহিতঃ
শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতীশ-শিরসাং চূড়ামণিস্তৎসুতঃ
যস্যানুক্রিয়তে সনাতন-যশোরাশির্দিশামাশয়ে
শ্বেতিম্না যদি পৌর্ণমাস-রজনী জ্যোৎস্নাতিভারশ্রিয়া ॥ ৪॥
—ধর্ম্মপালের খালিমপুরের তাম্রশাসন,—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১২।

অরাজকতা বুঝায়। মৌর্য্যবংশীয় প্রথম সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী কৌটিল্য বা চাণক্য তাঁহার "অর্থশাস্ত্র" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে মাৎস্যন্যায়ের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন :—

"অপ্রণীতো হি মাৎস্যন্যায়মুদ্ভাবয়তি বলীয়ানবলং হি গ্রসতে দণ্ডধরাভবে, তেন গুপ্তঃ প্রভবতীতি [২৪]।"

"যখন দণ্ড (রাজশক্তি) অপ্রণীত থাকে তখন মাৎস্যন্যায়ের প্রভাব হয়, উপযুক্ত দণ্ডধরের অভাবে প্রবল দুর্ব্বলকে গ্রাস করিয়া থাকে। সেই কারণেই গুপ্তগণের প্রভাবের উৎপত্তি হইয়াছে।" গুপ্ত শব্দের অর্থ লইয়া মতভেদ আছে ; কেহ বলেন গুপ্ত অর্থে প্রচ্ছন্ন, কাহারও মতে ইহার অর্থ রক্ষিত অর্থাৎ সহায়-সম্পন্ন, কেহ কেহ বলেন গুপ্ত শব্দে চন্দ্রগুপ্তের নাম করা হইয়াছে। অর্থাশাস্ত্রের প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছেন, "মাৎস্যন্যায়মপোহিতুং" শব্দের অর্থ অন্য রাজ্যভুক্ত হইবার আশঙ্কা দূর করিবার জন্য, অথবা মৎস্যের ন্যায় (অপর মৎস্যের) উদরগ্রস্ত হইবার ভয় দূর করিবার জন্য [২৫]।" পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল অনুমান করেন যে, মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে 'মাৎস্যন্যায়ের' প্রচ্ছন্ন উল্লেখ আছে [২৬]। উদাসীন রঘুনাথ বর্ম্ম-বিরচিত 'লৌকিক ন্যায় সংগ্রহ" নামক গ্রন্থে 'মাৎস্যন্যায়ের' পূর্ব্ববৎ ব্যাখ্যাই প্রদত্ত হইয়াছে [২৭]। স্বর্গগত অধ্যাপক বোঠলিঙ্ক, 'মাৎস্যন্যায়' সম্বন্ধে তাঁহার "ভারতবর্ষীয় ভাষা" নামক গ্রন্থে একটি শ্লোক উল্লেখ করিয়াছিলেন [২৮]।

মগধের গুপ্তরাজবংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের মৃত্যুর পরে, গৌড়-মগধ-বঙ্গে যে 'মাৎস্যন্যায়' বা অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কান্যকুব্জরাজ যশোবর্ম্মা কামরূপপতি হর্ষদেব গুর্জ্জরেশ্বর বৎসরাজ ও রাষ্ট্রকূট-বংশীয় সম্রাট ধ্রুবধারাবর্ষ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া গৌড়ীয় প্রজাবৃন্দ অবশেষে একজন রাজা নির্ব্বাচন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ইতিহাসকার লামা তারানাথ গোপালদেবের রাজ্যলাভের অব্যবহিত পূর্ব্বে গৌড়বঙ্গের অবস্থা সম্বন্ধে একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ; "প্রতিদিন এক একজন রাজা নির্ব্বাচিত হইতেন, কিন্তু ভূতপূর্ব্ব রাজার পত্নী রাত্রিতে তাঁহাদিগকে সংহার করিতেন। কিছুদিন পরে গোপালদেব রাজপদ লাভ করিয়া, রাজ্ঞীর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া, আমরণ সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। [২৯] তারানাথের ইতিহাস বিশ্বাসযোগ্য নহে, কিন্তু ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসনে যখন গোপালদেবের নির্ব্বাচনের কথা আছে, তখন তাঁহার উক্তির এই অংশমাত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, গোপালদেবের পূর্ব্বে ভূতপূর্ব্ব রাজপত্নীর অত্যাচারে দেশে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। তারানাথ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে,

(২৪) কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র—১।৪, শ্যামশাস্ত্রীর সংস্করণ, পৃঃ ৯।

(২৫) Memoirs of the Asiatic Society of the Bengal Vol, III, p, 3,

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বিদ্রূপ করিয়া লিখিয়াছেন, 'মাৎস্যন্যায়ের" ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, "রামচরিতের" ভূমিকার মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্ এ, লিখিয়াছেন—"to escape from being absorbed into another kingdom or to avoid being swallowed up like a fish"—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৯, পাদটীকা।

(২৬) যদি ন প্রণয়েদ্রাজা দণ্ডং দণ্ড্যেষ্বতন্দ্রিতঃ।
শূলে মৎস্যানিবাপক্ষ্যন দুর্ব্বলান বলবত্তরাঃ॥
—মনুসংহিতা, সপ্তম অধ্যায়, ২০ শ্লোক।

(২৭) "প্রবল-নির্ব্বল-বিরোধে সবলেন নির্ব্বল-বাধবিবক্ষায়াং তু মাৎস্যন্যায়াবতারঃ।
অয়ং প্রাঃ ইতিহাস-পুরণদিষু দৃশ্যতে, যথাহি বাশিষ্ঠে প্রহ্লাদাখ্যানে তৎসমাধিং প্রস্তুত্যোবক্তম্—
এতাবতাথ কালেন তদ্রসাতল-মণ্ডলং।
বভূবারাজকং তীক্ষ্ণং মাৎস্যন্যায়-কদর্থিতম্॥
যথা—প্রবলা মৎস্যা নির্ব্বলাং স্তান্নাশয়ন্তিস্মে ন্যায়ার্থঃ।
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৯, পাদটীকা।

(২৮) "পরস্পরামিষতয়া জগতো ভিন্নবর্ত্তনঃ।
দণ্ডাভাবে পরিধ্বংসী মাৎস্যো ন্যায়ঃ প্রবর্ত্ততে।
—Bohtlingk,s Indische Spruche, second part.

(২৯) Indian Antiquary Vol. IV, p. 366.

গোপালদেব প্রথমে বঙ্গদেশের রাজ্য এবং পরে মগধরাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিতে এবং বৈদ্যদেবের কমৌলী তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে রামপাল ভীমনামক কৈবর্ত্তরাজকে পরাজিত ও নিহত করিয়া পিতৃভুমি বরেন্দ্রী উদ্ধার করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিতে দুইস্থানে রামপালের পিতৃভুমির কথা আছে :—

১। মাংসভুজোচ্চৈর্দ্দশকেন জনকভূর্দস্যুনোপধিব্রতিনা।
দিব্যাহ্বয়ে সীতা বাসালংকৃতির (রা) হারি কান্তান্ত ॥৩০

২। ইতি কৃত্বাজ্ঞামাগত্য চিতাং (তাতা) ভুমি স জানকীং নিজভর্ত্তে
অঙ্কান্তকরঃ প্রথিতাভিজ্ঞোঽহচকথন্মিথস্তথাভূতাং দশাং॥

প্রথম শ্লোকে রামপালপক্ষে টীকায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই পিতৃভুমি বরেন্দ্রী বা বরেন্দ্রভুমি ৩১। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনেও কথিত হইয়াছে যে, রামচন্দ্র যেমন অর্ণব লঙ্ঘন করিয়া বারণবধান্তে জনকনন্দিনী লাভ করিয়াছিলেন, রামপালদেবও [যথাবৎ] সেইরূপ যুদ্ধার্ণব সমুত্তীর্ণ হইয়া ভীম নামক ক্ষৌণীনায়কের বধসাধন করিয়া জনকভুমি [বরেন্দ্রী] লাভে, ত্রিজগতে [শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায়] আত্মযশঃ বিস্তৃত করিয়াছিলেন”৩২। শ্লোকদ্বয় ও রামচরিতের টীকার উপরে নির্ভর করিয়া গোপালদেবের পূর্ব্বনিবাস সম্বন্ধে তারানাথের উক্তি গ্রহণ করা যাইতে পারে।

গোপালদেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে বোধ হয় আত্মরক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন। বারংবার বিদেশীয় রাজগণকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া গৌড়-মগধ-বঙ্গ নিশ্চয়ই অত্যন্ত হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। কিছুদিন প্রজাবৃন্দকে অরাজকতা ও বিদেশীয় আক্রমণ হইতে রক্ষা করাই বোধ হয় প্রথমে গোপালদেবের রাজ্যকালের প্রধান কর্ত্তব্য হইয়াছিল। গোপালদেবের রাজ্যকালের কোন ঘটনার বিবরণই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই;

এখন পর্য্যন্তও তাঁহার কোন শিলালিপি, তাম্রশাসন অথবা প্রাচীন মুদ্রা ভারতবর্ষের কোন স্থানেই আবিষ্কৃত হয় নাই। তাঁহার পৌত্র দেবপালদেবের মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, “তাঁহার অসংখ্য সেনাদল যুদ্ধার্থ প্রচালিত হইলে, সেনাপদাঘাতোত্থিত ধূলিপটলে পরিব্যাপ্ত হইয়া, গগনমণ্ডল দীর্ঘকালের জন্য বিহঙ্গমগণের বিচরণোপযোগী পদপ্রচারক্ষম অবস্থা প্রাপ্ত হইত বলিয়া প্রতিভাত হইত। তিনি সমুদ্র পর্য্যন্ত ধরণীমণ্ডল জয় করিবার পর আর যুদ্ধোদ্যমের প্রয়োজন নাই বলিয়া, মদমত্ত রণকুঞ্জরগণকে বন্ধন হইতে মুক্তিদান করিলে, তাহারা স্বাধীনভাবে বনগমন করিয়া আনন্দাশ্রুপূর্ণলোচনে বন্ধুগণকে পুনরায় দর্শন করিয়াছিল ৩৩,” ‘সমুদ্র পর্য্যন্ত জয়ের’ অর্থ বোধ হয় যে, তিনি দক্ষিণ রাঢ় এবং ‘ব’ দ্বীপের শেষে সীমা পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপালদেবের খালিমপুরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, গোপালদেবের পত্নীর নাম “দেদ্দদেবী” ৩৪। স্বর্গীয় অধ্যাপক কিলহর্ণের মতানুসারে ‘দেদ্দদেবীকে ভদ্র নামক রাজার কন্যা;

(৩০) রামচরিত ১ম পরিচ্ছেদ, ৩৮ শ্লোক—Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III, p. 31. দ্বিতীয় শ্লোকটি রামচরিতের প্রথম

(৩১) Idid.

(৩২) তস্যোর্জ্জস্বল-পৌরুষস্য নৃপতেঃ শ্রীরামপালোঽভবৎ পুত্রঃ পালকুলাব্ধি শীতকিরণঃ সাম্রাজ্য বিখ্যাতিভাক।
তেন যেন জগত্রয়ে জনকভু-লাভাদ্ যথাবদ্যশঃ ক্ষৌণীনায়ক-ভীম-রাবণ-বধাদ্যুদ্ধার্ণবোল ঘনাৎ॥
—বৈদ্যদেবের কমৌলী তাম্রশাসন, ৪র্থ শ্লোক—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১২৯, ১৩৮।

(৩৩) বিজিত্য যেনাজলধের্বসুন্ধরাং বিমোচিতামোঘ-পরিগ্রহা ইতি।
সবাষ্পমুদ্বাষ্প-বিলোচনান্ পুনর্ব্বনেষু বন্ধূ ন্ দদৃ [শু] র্মতঙ্গজাঃ॥
চলৎস্বনন্তেষু বলেষু যস্য বিশ্বম্ভরায়া নিচিতং রজোভিঃ।
পাদপ্রচার-ক্ষমমন্তরীক্ষং বিহঙ্গমানাং সুচিরং বভুব॥
—দেবপালদেবের মুঙ্গের তাম্রশাসন, ৩য় ও ৪র্থ শ্লোক ; গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৩৫-৩৬, ৪১ ৪২।

(৩৪) শীতাংশোরিব রোহিণী হুতভুজ স্বাহেব তেজোনিধেঃ
সর্ব্বাণীব শিবস্য গুহ্যকপতে র্ভদ্রে ভদ্রাত্মজা।
পৌলোমীব পুরন্দরস্য দয়িতা শ্রীদেদ্দদেবীত্যভূৎ
দেবী তস্য বিনোদভূর্ম্মুররিপোর্ল্লক্ষ্মীরিব ক্ষ্মাপতেঃ॥
—ধর্ম্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসন, ৫ম শ্লোক · গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১২।

কিন্তু শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বলিয়াছেন, "অধ্যাপক কিলহর্ণ 'দেদ্দদেবীকে' ভদ্র নামক এক রাজার কন্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তিনি তাহার কোনরূপ প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই। এক্ষণে কোন ঐতিহাসিক তথ্য প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না, এখানে কেবল পৌরাণিক আখ্যায়িকাই সূচিত হইয়াছে [৩৫]।" গোপালদেবের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র নারায়ণপালদেবের এবং তাঁহার বংশধরগণের তাম্রশাশন গোপালদেবের নিম্নলিখিত পরিচয় পাওয়া যায়:—যিনি কারুণ্যরত্ন-মুদিতহৃদয়ে মৈত্রীকে প্রিয়তমারূপে ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি তত্ত্বজ্ঞান-তরঙ্গিণীর সুবিমল সলিলধারায় অজ্ঞান-পঙ্ক প্রক্ষালিত করিয়াছিলেন, যিনি কামক-অরির পরাক্রমসঞ্জাত আক্রমণ পরাভূত করিয়া, শাশ্বতী শান্তিলাভ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমান্ দশবল লোকনাথের জয় হউক, এবং যিনি করুণারত্নোদ্ভাসিত বক্ষে প্রজাবর্গের মিত্রতা ধারণ করিয়া সম্যক-সম্বোধ-প্রদায়িনী জ্ঞানতরঙ্গিণীর সুবিমল সলিলধারায় লোক-সমাজের অজ্ঞান-পঙ্ক প্রক্ষালিত করিয়া, দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচারপরায়ণ স্বেচ্ছাচারী কামকারিগণের আক্রমণ পরাভূত করিয়া রাজ্যমধ্যে চিরশান্তি সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমান গোপালদেব নামক অপর রাজাধিরাজ লোকনাথেরও জয় হউক [৩৬]।" গোপাল-দেবের একমাত্র পুত্রের নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইনি ইতিহাস-বিশ্রুত ধর্ম্মপালদেব। গোপালদেবের মৃত্যুকাল অথবা রাজ্যকাল-নির্ণয়ের কোন উপায়ই অদ্যাবধি আবিষ্কার হয় নাই। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ৺ভিন্সেণ্ট স্মিথ অনুমান করেন যে, গোপালদেব ৭৩০ হইতে ৭৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং ৮০০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দেহাবসান হইয়াছিল [৩৭]। যে সময়ে গৌড়মগধবাসী রাষ্ট্রকূট, গুর্জ্জর প্রভৃতি পরাক্রান্ত রাজগণের আক্রমণে দীর্ণ, সে সময়ে গোপালদেব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। গোপালদেব পালবংশের প্রথম রাজা। গুর্জ্জরেশ্বর দ্বিতীয় নাগভট্ট ও রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব ধারাবর্ষের ভীষণ আক্রমণ সহ্য করিতে হইলে নব-প্রতিষ্ঠিত পালবংশের অধিকার বোধ হয় গোপাল-দেবের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইত। তাহা হইলে গোপাল-দেবের পুত্র ধর্ম্মপাল কখনই সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত জয় করিয়া চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসন প্রদান করিতে পারিতেন না। শত্রুদীর্ণ নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যের অধীশ্বরগণ কখনই এক পুরুষের মধ্যে মহারাজ রাজচক্রবর্ত্তী পদলাভ করিতে পারিতেন না। এই কারণে অনুমান হয় যে, বিদেশীয় রাজগণের আক্রমণ শেষ হইলে গোপালদেব গৌড়-মগধ-বঙ্গের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন [৩৮]; গুর্জ্জররাজ বৎসরাজ ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন বটে, কিন্তু তখন বোধ হয় তিনি ধ্রুব ধারাবর্ষ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া মরুভূমিতে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছেন। তারানাথ বলিয়াছেন যে গোপালদেব পঁয়তাল্লিশ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন [৩৯] এবং ভিন্সেণ্ট স্মিথ এই উক্তি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন [৪০]। রণনীতিকুশল না হইলে

(৩৫) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ২০, পাদটীকা।

(৩৬) মৈত্রীংকারুণ্যরত্ন-প্রমুদিতহৃদয়ঃ প্রেয়সীং সন্দধানঃ
সম্যক্-সম্বোধিবিদ্যাসরিদমলজলক্ষালিতাজ্ঞানপঙ্কঃ।
জিত্বা যঃ কামকারি-প্রভবমভিভবং শাশ্বতীং প্রাপ শান্তিং
স শ্রীমান্ লোকনাথো জয়তী দশবলোহন্যশ্চ গোপালদেবঃ॥
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৫৬, ৯৫, ১২৩, ১৪৮।

(৩৭) V. A. Smith, Early History of India, 3rd, edition, pp, 397-98.

(৩৮) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V. p. 47.

(৩৯) Indian Antiquary, Vol. p. 366.

(৪০) V. A. Smith, Early History of India 3rd. p. 378.

ভিন্সেণ্ট স্মিথ অনুমান করেন যে, গোপালদেবের নিকট হইতেই গুর্জ্জরেশ্বর বৎসরাজ গৌড়বঙ্গের শ্বেত রাজছত্রদ্বয় অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ইহা সত্য হইলে ধর্ম্মপাল কখনই উত্তরাপথ বিজয় করিয়া চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসন প্রদান করিতে পারিতেন না।

অত্যাচার পীড়িত গৌড়ীয় প্রজাবৃন্দ কখনই গোপালদেবকে নরপতি পদে বরণ করিত না। এই কারণে অনুমাণ হয় যে গোপালদেব প্রৌঢ় বয়সে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন এবং অতি অল্পকাল রাজ্য শাসন করিয়া পরলোকগমন করিয়াছিলেন। গোপালদেব ৭৯০—৭৯৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন

গোপালদেবের মৃত্যুর পরে দেদ্দদেবীর গর্ভজাত তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপালদেব গৌড়-বঙ্গের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। পালরাজগণের মধ্যে ধর্ম্মপালের আবির্ভাবকালই সর্ব্বপ্রথমে নির্ণীত হইয়াছিল এবং ধর্ম্মপালদেবই উত্তরাপথে পালব শের অধিকারের প্রথম স্থাপয়িতা। খৃষ্টীয় অষ্টম শতব্দীর শেষভাগে এবং নবম শতাব্দীর প্রথমভাগে গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালদেবই উত্তরাপথের ইতিহাসে প্রধান নায়ক। গোপালদেবের সময়ে গৌড়-মগধের প্রজাবৃন্দ বোধ হয় কিয়ৎকাল শান্তিভোগ করিয়াছিল; সেইজন্যই ধর্ম্মপাল রাজ্যাভিষেকের অব্যবহিত পরে উত্তরাপথ-জয়ের আশা মনে স্থান দিতে পারিয়াছিলেন। ধর্ম্মপালের কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে অতি অল্পদিন পূর্ব্বেও বহু ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত ছিল। প্রত্নতত্ত্ব স্থির করিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মপাল ৮৩১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন [৪১]। কাম্বে নগরে আবিষ্কৃত, রাষ্ট্রকূটবংশীয় তৃতীয় গোবিন্দের তাম্রশাসন প্রকাশকালে শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর স্থির করিয়াছিলেন যে ধর্ম্মপালদেব খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন [৪২]। ধর্ম্মপালের কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলাল, কর্ণিংহাম, হর্ণলি, ভাণ্ডারকর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতগণের মত এখন অসার প্রতিপন্ন হইয়াছে। কতকগুলি নূতন খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হইয়া গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালদেবের প্রকৃত কাল-নির্ণয় সম্ভব হইয়াছে। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ স্বীকার করিয়াছেন যে, ধর্ম্মপালদেব খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন [৪৩]। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে ধর্ম্মপাল, গুর্জ্জর-প্রতীহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট ও রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন [৪৪]।

স্বর্গীয় ডাক্তার কীলহর্ণ ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে, ভাগলপুরে আবিষ্কৃত নারায়ণপালদেবের তাম্রশাসনের একটী শ্লোক সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন। সেই শ্লোক হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ধর্ম্মপাল ইন্দ্ররাজ প্রভৃতি রাজগণকে জয় করিয়া কান্যকুব্জের রাজলক্ষ্মী লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহা চক্রায়ুধকে প্রদান করিয়াছিলেন [৪৫]। তৎকালে ডাঃ কীলহর্ণ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "এই চক্রায়ুধ কে [৪৬]?" বহুকাল এই প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই জৈন হরিবংশ পুরাণে একটি শ্লোকে ইন্দ্রায়ুধ নামক উত্তর দিকের অধিপতির নাম পাওয়া গিয়াছিল [৪৭]। পণ্ডিতগণ অনুমান করিতেন যে, ভাগলপুর তাম্রশাসনের 'ইন্দ্ররাজ' ও 'ইন্দ্রায়ুধ' একই

(৪১) Sir Alexander Cunningham's Archaeological Vol. XV, p. 150.

(৪২) Epigraphia Indica, Vol. VII. p. 33.

(৪৩) Early History of India, 3rd edition, p. 398.

(৪৪) Epigraphia Indica, Vol. IX. p. 26. Note 4.

(৪৫) জিত্বেন্দ্ররাজ-প্রভৃতীনরাতীনুপার্জ্জিতা যেন মহোদয়শ্রীঃ।
দত্তা পুনঃ সা বলিনার্থয়িত্রে চক্রায়ুধায়ানতি বামনায় ॥
—ভাগলপুরে আবিষ্কৃত নারায়ণপালের তাম্রশাসন, ৩য় শ্লোক, গৌড়লেখমালা, পঃ ৫৭।

স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই শ্লোকের চতুর্থপাদে বলিনার্থয়িত্রে স্থানে বলিনাথপিত্রে পাঠ করিয়াছিলেন। তদনুসারে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু অদ্যাবধি চক্রায়ুধকে ইন্দ্রায়ুধের পিতা বলিয়া লিপিবদ্ধ করিতেছেন। (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড পৃঃ ১৫৩)।

(৪৬) Indian Antiquary, Vol. XX. pp. 187-88.

(৪৭) শাকেষ্বব্দশতেষু সপ্তসু দিশং পঞ্চোত্তরেষূত্তরাং।
পাতীন্দ্রায়ুধনাম্নি কৃষ্ণনৃপজে শ্রীবল্লভে দক্ষিণাং।
পূর্ব্বাং শ্রীমদবন্তিভূভৃতি নৃপে বৎসাধিরাজেপরাং
সৌর্যাণামধিমণ্ডলং জয়যুতে বীরে বরাহেবতি ॥
—Journal of the Royal Asiatic Society, 2909, p. 253.

ব্যক্তি। অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে একখানি শিলালিপি ও একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়া ধর্ম্মপাল ও চক্রায়ুধের সম্বন্ধ এবং কালনির্ণয়ের পথ প্রশস্ত করিয়াছে। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে গোয়ালিয়র নগরের প্রান্তে সাগরতাল নামক স্থানে কতকগুলি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ-খননকালে একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ১০০৩ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরানন্দ শাস্ত্রী প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক গোয়ালিয়র নগরের চিত্রশালায় রক্ষিত কতকগুলি শিলালিপি পরীক্ষা করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি গোয়ালিয়রের চিত্র-শালায় এই শিলালিপি দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই শিলালিপির একখানি প্রতিলিপি ডাঃ হর্ণলি ডাঃ কীলহর্ণকে প্রদান করিয়াছিলেন। ডাঃ হর্ণলি প্রদত্ত অস্পষ্ট প্রতিলিপি হইতে ডাঃ কীলহর্ণ গোয়ালিয়র শিলালিপির আংশিক পাঠোদ্ধার করিয়া, প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ইহাতে গুর্জ্জরপ্রতীহার বংশীয় বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট কর্ত্তৃক চক্রায়ুধ নামক এক রাজা পরাজিত হইয়াছিলেন[৪৮]। এই সময়ে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরানন্দ শাস্ত্রী এই শিলালিপির সম্পূর্ণ উদ্ধৃত পাঠ ও প্রতিলিপি প্রকাশ করিয়াছিলেন। সাগরতালের শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, প্রতীহার বংশে নাগভট নামক এক রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; কক্কুক এবং দেবরাজ নামক তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় তাহার পরে সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। দেবরাজের পুত্র বৎসরাজ প্রতীহার-রাজ্যের অধিকার লাভ করিয়া ভণ্ডির বংশের সাম্রাজ্য লোপ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় নাগভট অন্ধ্র, সিন্ধু, বিদর্ভ ও কলিঙ্গদেশের রাজগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। অপরের আশ্রয় গ্রহণের জন্য যাঁহার নীচভাব প্রকাশ হইয়াছিল, দ্বিতীয় নাগভট সেই চক্রায়ুধকে এবং বহু হস্ত্যশ্বরথের অধিপতি বঙ্গপতিকেও পরাজিত করিয়াছিলেন। তিনি আনর্ত্ত, মালব, কিরাত, তুরুষ্ক, বৎস এবং মৎস্যদেশের রাজগণের গিরিদুর্গ-সমূহ অধিকার করিয়াছিলেন[৪৯]। গোয়ালিয়র শিলালিপির চক্রায়ুধ যে ভাগলপুর তাম্রশাসনের চক্রায়ুধ, সে বিষয়ে পণ্ডিতগণের কোন সন্দেহই রহিল না। ইতিমধ্যে আর একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ায় ভাগলপুর তাম্রশাসনের চক্রায়ুধ ও গোয়ালিয়র শিলালিপি চক্রায়ুধের একত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস অধিকতর দৃঢ় হইল। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর, বরদা রাজ্যের চিত্রশালায় রক্ষিত রাষ্ট্রকূটবংশীয় তৃতীয় ইন্দ্রের দুইখানি তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধারকালে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অধ্যাপক ৺শ্রীধর রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরের নিকটে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের পুত্র, প্রথম অমোঘবর্ষের একখানি অপ্রকাশিত তাম্রশাসন রক্ষিত আছে। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তৃতীয় গোবিন্দ যখন দিগ্বিজয় উপলক্ষে হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন, তখন ধর্ম্ম ও চক্রায়ুধ নামক রাজদ্বয় তাহার নিকটে গিয়াছিলেন[৫০]। অধ্যাপক ৺শ্রীধর রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর এই তাম্রশাসনের কিয়দংশের পাঠোদ্ধার করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তৃতীয় গোবিন্দ নাগভট নামক একজন রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মপাল ও চক্রায়ুধ স্বয়ং আসিয়া তাঁহার নিকটে নতশির হইয়াছিলেন[৫১]। ভাগলপুরে আবিষ্কৃত নারায়ণপালের তাম্রশাসন, সাগর-তালের শিলালিপি ও প্রথম অমোঘবর্ষের তাম্রশাসন হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপাল, কান্যকুব্জপতি চক্রায়ুধ, গুর্জ্জর-প্রতীহার বংশের দ্বিতীয় নাগভট ও দাক্ষিণাত্যরাজ তৃতীয় গোবিন্দ সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। দ্বিতীয় নাগভটের একখানি শিলালিপি যোধপুর-রাজ্যের 'বিলাড়া' জিলায় 'বুচকলা' গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে

(48) Nachrichten von der Koniglichen Oesellechaft der Wissenschaften xu Gottingen, Philologische historirche Klasse, 1905,p, 301,

(49) Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1903-4 pp, 280-80,

(50) Epigradhia Indica, Vol, IX, p, 26, Note 4.

(51) Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Vol, XXII, p 110,

ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ৮৭২ বিক্রমাব্দের চৈত্র মাসের শুক্লাপঞ্চমীতে মহারাজাধিরাজ পরম ভট্টারক পরমেশ্বর শ্রীনাগভটদেবের রাজ্যে 'রাজ্যঘঙ্গক' গ্রামে রাজ্ঞী জয়াবলী কর্ত্তৃক একটি দেবগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল[৫২]। এই নাগভট যে দ্বিতীয় নাগভট সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই, কারণ বুচকলা লিপিতে উক্ত হইয়াছে যে, নাগভট মহারাজাধিরাজ বৎসরাজদেবের উত্তরাধিকারী[৫৩]। রাষ্ট্রকূট তৃতীয় গোবিন্দ ধ্রব ধারাবর্ষের পুত্র। তিনি ৭১৬ শতাব্দের (৭৯৪ খৃষ্টাব্দের) পূর্ব্বে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, কারণ উক্ত বর্ষে তিনি দাক্ষিণাত্যস্থিত প্রতিষ্ঠান নগরী হইতে গোদাবরী নদীতে স্নান করিয়া বৈশাখ মাসের অমাবস্যা তিথিতে সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে কয়েক জন ব্রাহ্মণকে একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন[৫৪]। ইহার দশ বৎসর পরে গোবিন্দ কাঞ্চীরাজ পল্লব-বংশীয় দন্তিগকে পরাজিত করিয়া রাজস্ব সংগ্রহের জন্য তুঙ্গভদ্রাতীরে রামেশ্বরতীর্থে গমন করিয়াছিলেন এবং সেই সময় শিবধারী নামক একজন "গোরব" বা পুরোহিতকে একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন[৫৫]। ৭৩০ শকাব্দে (৮০৮ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দ নাসিক প্রদেশের একখানি গ্রাম বৈশাখ মাসে চন্দ্রগ্রহণোপলক্ষে এক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারা যায় যে, গঙ্গবংশীয় কোন রাজা তৃতীয় গোবিন্দ কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। কারামুক্ত হইয়া তিনি পুনরায় বিদ্রোহী হইয়াছিলেন এবং গোবিন্দ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। তিনি বিন্ধ্যপর্ব্বতে কটকনিবেশ করিয়াছেন শুনিয়া মারশর্ব্ব নামক জনৈক রাজা তাঁহার শরণাগত হইয়াছিলেন। ইহার পরে গোবিন্দ তুঙ্গভদ্রা-তীরে গমন করিয়া পল্লবগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন[৫৬]। উক্ত বৎসরে শ্রাবণ মাসে অমাবস্যায় সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে গোবিন্দ ময়ূরখণ্ডী নামক স্থান হইতে জনৈক ব্রাহ্মণকে একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, গুর্জ্জররাজ, গোবিন্দকে ধনুর্ব্বাণ-হস্তে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, ভয়ে রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন এবং বেঙ্গীরাজ দূতমুখে গোবিন্দের তুঙ্গভদ্রাতীরে আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহার জন্য উচ্চ বাহালী-পরিবেষ্টিত শিবির রচনা করিয়াছিলেন[৫৭]। ৭৩৫ শকাব্দে তৃতীয় গোবিন্দের সামন্ত গঙ্গবংশীয় চাকিরাজ, অর্ককীর্ত্তি নামক জনৈক জৈনমুনিকে একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন[৫৮]। উক্ত বর্ষের পৌষ মাসের শুক্লা সপ্তমী পর্য্যন্ত তৃতীয় গোবিন্দ জীবিত ছিলেন, কারণ পূর্ব্বোক্ত দিবসে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সৌরাষ্ট্রের সামন্ত গোবিন্দরাজের সেনানায়ক, মহাসামন্ত বুদ্ধবরস একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন।

৭৩৬ শকাব্দে তৃতীয় গোবিন্দের দেহান্ত হইয়াছিল; কারণ, ৭৩৬ শকাব্দে (৮১৫ খৃষ্টাব্দ) তৃতীয় গোবিন্দের পুত্র প্রথম অমোঘবর্ষের রাজ্যের প্রথম বৎসর। বোম্বাই প্রদেশের ধারবাড় জেলায় সিরুর গ্রামে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ৭৮৮ শকাব্দ অমোঘবর্ষের রাজ্যের দ্বিপঞ্চাশত্তম বর্ষ গণিত হইত[৫৯]। সুতরাং ইহা প্রমাণ হইতেছে যে, ৭৯৪ হইতে ৮১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তৃতীয় গোবিন্দ জীবিত ছিলেন। অতএব ধর্ম্মপাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষপাদে জীবিত ছিলেন এবং ৮১৪ খৃষ্টাব্দের বহু পূর্ব্বে ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত পরাজিত করিয়া চক্রায়ুধকে মহোদয় বা কান্যকুব্জের সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন এবং গুর্জ্জরবংশীয় দ্বিতীয় নাগভট কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া দিগ্বিজয়ী তৃতীয় গোবিন্দের

(52) Epigraphia Indica, Vol.IX, pp, 199-200,
(53) Ibid, p, 200,
(54) Ibid, Vol III, p, 105i
(55) Indian Antiquary, Vol, XI, p, 129,
(56) Ibid, pp 85-62
(57) Epigraphia Indica, Vol VI, pp 150-57
(58) Ibid, Vol. IV, p. 323
(৫৯) Ibid, Vol. VII, pp. 104-5.

আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা সত্ত্বেও কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন যে, ধর্ম্মপাল ৮১৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বলিয়াছেন,—"অনেকে মনে করেন যে, ৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২৩ বৎসর পূর্ব্বে, তৃতীয় গোবিন্দ পরলোকগমন করিয়াছিলেন এবং অমোঘবর্ষ পিতৃরাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহার রাজত্ব সুদীর্ঘ ৬১ বৎসরকাল স্থায়ী হওয়ার বিশিষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে, তাঁহার রাজ্যাভিষেক কাল আরও পিছাইয়া ধরিয়া, ৬১ বৎসরেরও অধিক কালব্যাপী রাজত্ব কল্পনা অসঙ্গত [৬০]। যিনি বলিয়াছিলেন, যে, প্রথম অমোঘবর্ষ ৮১৭ হইতে ৮৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, তিনি প্রত্নবিদ্যাবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ; তাঁহার নাম ডাঃ ফ্রাঞ্জ কীলহর্ণ (Dr. Franz Kielhorn)। তিনি কখনও উপযুক্ত বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ না পাইলে কোন কথা লিপিবদ্ধ করিতেন না। সিরুর ও নীলগুণ্ড[৬১] এই দুইটি স্থানের দুইখানি শিলালিপি হইতে অব গত হওয়া যায় যে, ৭৮৮ শকাব্দে (৮৬৬ খৃঃ অঃ) প্রথম অমোঘবর্ষের ৫২ রাজ্যাঙ্ক পতিত হইয়াছিল। অতএব ইহা নিশ্চয় যে, ৭৩৬ শকাব্দে (৮১৪-১৫ খৃঃ অঃ) প্রথম অমোঘবর্ষ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন ডাঃ কীলহর্ণ শকাব্দের অতীতবর্ষ ও প্রচলিত বর্ষ গণনা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, ৮১৭ খৃষ্টাব্দের পরে প্রথম অমোঘবর্ষের প্রথম রাজ্যাঙ্ক পতিত হইতে পারে না; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে দুই বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ৮১৫ অথবা ৮১৬ খৃষ্টাব্দে পতিত হইতে পারে [৬২]। সুতরাং তাঁহার অনুমান বা তারিখ-নির্দ্ধারণ অসঙ্গত বলা ন্যায়সঙ্গত কার্য্য হয় নাই। তোরখেড়ে গ্রামে আবিষ্কৃত তৃতীয় গোবিন্দের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি ৮১৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জীবিত ছিলেন [৬৩]। সিরুর ও নীলগুণ্ডের শিলালিপিদ্বয় হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তৃতীয় গোবিন্দের পুত্র প্রথম অমোঘবর্ষ ৮১৫ হইতে ৮১৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন; ইহা সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ অনুমান করিয়াছেন যে, ধর্ম্মপালদেব ৮১৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন [৬৪]। সুতরাং গৌড়রাজমালায় ধর্ম্মপালদেবের সিংহাসনারোহণকাল সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইরাছে, তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

তৃতীয় গোবিন্দের তাম্রশাসনসমূহ পরীক্ষা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, ৭৩০ শকাব্দের শ্রাবণ মাসের অমাবস্যার পূর্ব্বে তৎকর্ত্তৃক গুর্জ্জর-প্রতীহার-বংশীয় দ্বিতীয় নাগভট পরাজিত হইয়াছিলেন। রাধনপুরে আবিষ্কৃত তৃতীয় গোবিন্দের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ৭৩০ শকাব্দের শ্রাবণের অমাবস্যার (২৭শে জুলাই, ৮০৮ খৃষ্টাব্দ) পূর্ব্বে তৎকর্ত্তৃক গুর্জ্জর-বংশীয় কোন রাজা পরাজিত হইয়াছিলেন [৬৫]। অধ্যাপক ৺শ্রীধর রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরের নিকটে প্রথম অমোঘবর্ষের যে তৃতীয় গোবিন্দ কর্ত্তৃক পরাজিত গুর্জ্জর-রাজের নাম 'নাগগট' [৬৬]। অতএব ইহা স্থির যে, গুর্জ্জর-প্রতীহার-

(৬০) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ২৩।
(৬১) Epigraphia Indica, Vol. IV. p 210.
(৬২) Ibid, Vol. Appendix II., p, 3.
(৬৩) Ibid, Vol III., p. 54; Vol. Appendix, p 12, No 67
(৬৪) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ২৪।
(৬৫) সংধায়াশু শিলীমুখাং স্বসময়াং বাণাসনস্যোপরি
প্রাপ্তং বর্দ্ধিতবংধুজীববিভবং পদ্মাভিবৃদ্ধ্যাম্বিতং।
সন্নক্ষত্রমুদীক্ষ্য যং শরদৃতুং পর্জ্জন্যস্থবদ্‌গুর্জ্জরো
নষ্ট কাপি ভয়াত্তথা ন সমরং স্বপ্নেপি পশ্যেত্তথা ॥ ১৫ ॥
—Epigraphia Indica, Vol VI, p 244
(৬৬) স নাগভটচন্দ্রগুপ্তনৃপয়োর্যশোর্যং (?) রণে
স্বহার্য্যমপহার্য্য ধৈর্য্যবিকলানথোন্মূলয়ন্।
যশোর্জ্জনপরো নৃপান্ স্বভুবি শালিসস্থানিব
পুনঃ পুনরতিষ্ঠিপৎ স্বপদ এব চান্যানপি ॥ ২২ ॥
—Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Vol XXII, part LXI, p, 118

বংশীয় দ্বিতীয় নাগভট ৮০৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোন সময়ে তৃতীয় গোবিন্দ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। প্রথম অমোঘবর্ষের এই অপ্রকাশিত তাম্রশাসন হইতে আরও অবগত হওয়া যায় যে, তৃতীয় গোবিন্দ যখন দিগ্বিজয় উপলক্ষে হিমালয় গমন করিয়াছিলেন, তখন ধর্ম্ম ও চক্রায়ুধ নামক নরপতিদ্বয় স্বেচ্ছায় তাঁহার নিকট আসিয়া নতশীর্ষ হইয়াছিলেন ৬৭। ভাগলপুরে আবিষ্কৃত নারায়ণপালের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ধর্ম্মপালদেব ইন্দ্রায়ুধ নামক কোন রাজার নিকট হইতে কান্যকুব্জ গ্রহণ করিয়া, চক্রায়ুধ নামক অপর একজন রাজাকে প্রদান করিয়াছিলেন ৬৮। অতএব প্রথম অমোঘবর্ষের অপ্রকাশিত তাম্রশাসনের ধর্ম্ম ও চক্রায়ুধ, গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালদেব ও কান্যকুব্জরাজ চক্রায়ুধ অভিন্ন। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, অমোঘবর্ষের অপ্রকাশিত তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তৎকর্ত্তৃক গুর্জ্জর প্রতীহার-বংশীয় জনৈক রাজা পরাজিত হইয়াছিলেন এবং সেই রাজাই দ্বিতীয় নাগভট। সাগরতালে আবিষ্কৃত দ্বিতীয় নাগভটের পুত্র প্রথম ভোজদেবের শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, নাগভটের 'পরাশ্রয়কৃত স্ফুটনীচভাব' চক্রায়ুধ নামক একজন রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং বঙ্গদেশের নরপতিকেও পরাস্ত করিয়াছিলেন ৬৯। তৃতীয় গোবিন্দ যখন দিগ্বিজয় উপলক্ষে হিমালয়ে আসিয়াছিলেন, তখন ধর্ম্মপাল ও চক্রায়ুধ কি কারণে স্বেচ্ছায় তাঁহার সমীপে গমন করিয়া নতশীর্ষ হইয়াছিলেন, তাহা বিবেচ্য। প্রথম অমোঘবর্ষের অপ্রকাশিত তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, তৃতীয় গোবিন্দ কর্ত্তৃক দ্বিতীয় নাগভট পরাজিত হইলে, ধর্ম্ম ও চক্রায়ুধ গোবিন্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, দ্বিতীয় নাগভট কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া, উপায়ান্তর না দেখিয়া, গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপাল ও কান্যকুব্জরাজ চক্রায়ুধ, গুর্জ্জর-বিজয়ী তৃতীয় গোবিন্দের শরণাগত হইয়াছিলেন। তৃতীয় গোবিন্দের পিতা ধ্রুব ধারাবর্ষ ইতিপূর্ব্বে দ্বিতীয় নাগভটের পিতা বৎসরাজকে পরাজিত করিয়া গৌড়রাষ্ট্র গুর্জ্জর-কবলমুক্ত করিয়াছিলেন এবং বৎসরাজকে মরুভূমিতে তাড়িত করিয়াছিলেন। অনুমান হয় যে, দ্বিতীয় নাগভট কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ধর্ম্মপাল ও চক্রায়ুধ দক্ষিণাপথেশ্বর তৃতীয় গোবিন্দের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদেরই আহ্বানে গোবিন্দ উত্তরাপথ আক্রমণ করিয়া নাগভটকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপাল ইন্দ্ররাজের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক কান্যকুব্জ গ্রহণ করিয়া তাহা চক্রায়ুধকে প্রদান করিয়াছিলেন, এইজন্যই প্রথম ভোজদেবের সাগরতাল শিলালিপিতে চক্রায়ুধকে 'পরাশ্রয়কৃত-স্ফুটনীচভাব' বিশেষণে অভিহিত করা হইয়াছে। সুতরাং নাগভট কর্ত্তৃক পরাজিত হইবার পূর্ব্বে, চক্রায়ুধ ধর্ম্মপালের সাহায্যে কান্যকুব্জ-সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রায়ুধের সিংহাসন চক্রায়ুধকে প্রদান করিবার পূর্ব্বে ধর্ম্মপাল গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ৮০৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তৃতীয় গোবিন্দ, দ্বিতীয় নাগভটকে পরাজিত করিয়াছিলেন; তৎপূর্ব্বে দ্বিতীয় নাগভট চক্রায়ুধকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তৎপূর্ব্বে ধর্ম্মপাল ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করিয়া চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাহারও পূর্ব্বে ধর্ম্মপাল গৌড়ের সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন; সুতরাং ৭৯০ হইতে ৭৯৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ধর্ম্মপালের অভিষেক-কালনির্ণয় অন্যায় হয় নাই।

(৬৭) হিমবৎপর্ব্বতনির্ঝরাম্বু-তুরগৈঃ পীতঞ্চ গাঢ়ঙ্গজৈ
ৰ্ধ্বনিতং মজ্জন্ তূর্যকৈর্দ্বি গুণিতং ভূয়োপি তৎকন্দরে।
স্বয়মেবোপনতৌ চ যস্য মহতস্তৌ ধর্ম্মচক্রায়ুধৌ
হিমবান্ কীর্ত্তিস্বরূপতামুপগতস্তৎ কীর্ত্তিনারায়ণঃ ॥২৩॥

—Ibid

(৬৮) জিত্বেন্দ্ররাজপ্রভৃতীনরাতীমুপার্জ্জিতা যেন মহোদয়শ্রীঃ।
দত্তা পুনঃ সা বলিনার্থয়িত্রে চক্রায়ুধায়ানতি-বামনায় ॥৩॥

—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৫৭।

(৬৯) ত্রয্যাস্পদস্য সুকৃতস্য সমৃদ্ধিমিচ্ছু যঃ ক্ষত্রধাম-বিধিবদ্ধ-বলি-প্রবন্ধঃ।
জিত্বা পরাশ্রয়কৃত-স্ফুটনীচভাবং চক্রায়ুধং বিনয়নম্র-বপুর্ব্যরাজৎ ॥ ৯ ॥
Annual Report, Archæological Survey, 1903- 4 p 281

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ আর একটি উপায়ে ধর্ম্মপাল-দেবের অভিষেককাল নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দ্বিতীয় নাগভটের পৌত্র ভোজদেবের পুত্র মহেন্দ্রপাল বা মহেন্দ্রায়ুধের রাজ্যকালে বলবর্ম্মা এবং তাঁহার পুত্র অবনীবর্ম্মা, দুইখানি তাম্রশাসন দ্বারা দুইখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসনদ্বয় বোম্বাই প্রদেশের কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত উনানগরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। প্রথম তাম্রশাসনখানি বলবর্ম্মার; ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বলবর্ম্মা ৫৭৪ বলভী-সম্বৎসরে অর্থাৎ গৌপ্তাব্দে (৮৯৩ খৃষ্টাব্দে) জীবিত ছিলেন। দ্বিতীয় তাম্রশাসনখানি বলবর্ম্মার পুত্র দ্বিতীয় অবনীবর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহা ৯৫৬ বিক্রম-সম্বৎসরে (৮৯৯ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই তাম্রশাসনে বলবর্ম্মার পিতামহ বাহুকধবল সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে, তিনি ধর্ম্ম নামক জনৈক নরপতিকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন[১০], বহু রাজাধিরাজ পরমেশ্বরকে জয় করিয়াছিলেন এবং কর্ণাট দেশীয় সেনাসমূহ ছত্রভঙ্গ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে স্বর্গীয় ডাক্তার কীলহর্ণ অনুমান করিয়াছিলেন যে, বলবর্ম্মা যখন ৮৯৩ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন, তখন তাঁহার পিতামহ বাহুকধবল নিশ্চয়ই খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্য-ভাগে বিদ্যমান ছিলেন[১১]। তখনও পাশ্চাত্য বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকট ধর্ম্মপালের কাল-নির্ণয়ের সংবাদ প্রচারিত হয় নাই, সেই জন্যই স্বর্গগত ডাক্তার কীলহর্ণ বলবর্ম্মার পিতামহ বাহুকধবলকে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক বলিয়াছিলেন। ডাক্তার কীলহর্ণের উক্তি অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ অনুমান করিয়াছেন যে, ধর্ম্মপাল প্রথমে ভোজদেব ও বাহুকধবলের সমসাময়িক ব্যক্তি[১২]। বলবর্ম্মা মহেন্দ্রপালের রাজত্বের প্রারম্ভে জীবিত ছিলেন, কিন্তু মহেন্দ্র পালের রাজ্যাভিষেকের অব্যবহিত পরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল; কারণ, ৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় অবনীবর্ম্মা পিতৃ-সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। সুতরাং বলবর্ম্মা মহেন্দ্রপালের রাজ্যাভিষেককালে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, ইহা অনুমান করা ন্যায়সঙ্গত। অতএব বলবর্ম্মাকে ভোজ-দেবের সমসাময়িক ব্যক্তি বলা উচিত এবং তদনুসারে বলবর্ম্মার পিতামহ বাহুকধবলকে প্রথম ভোজদেবের পিতামহ দ্বিতীয় নাগভটের সমসাময়িক ব্যক্তি বলা উচিত।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ধর্ম্মপালদেব সর্ব্বপ্রথমে কান্যকুব্জ আক্রমণ করিয়া উহা অধিকার করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্ররাজ বা ইন্দ্রায়ুধের পরিবর্ত্তে চক্রায়ুধকে কান্য-কুব্জের সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার খালিমপুরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, "তিনি মনোহর ভ্রূভঙ্গি-বিকাশে (ইঙ্গিত মাত্রে) ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু যবন, অবন্তি, গন্ধার এবং কীর প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদের নরপালগণকে প্রণতি-পরায়ণ-চঞ্চলাবনত মস্তকে সাধু সাধু বলিয়া কীর্ত্তন করাইতে করাইতে, হৃষ্টচিত্ত পাঞ্চালবৃদ্ধ কর্ত্তৃক মস্তকোপরি আত্মাভিষেকের স্বর্ণকলস উদ্ধৃত করাইয়া কান্যকুব্জকে রাজশ্রী প্রদান করিয়াছিলেন[১৩]।" কান্যকুব্জ নগর পাঞ্চালদেশে অবস্থিত[১৪]। পূর্ব্বোক্ত শ্লোক হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, ভোজ, মৎস্য, কুরু, যদু, যবনাদি দেশ সমূহের রাজগণ কান্যকুব্জ রাজের অভিষেক কালে বাধ্য হইয়া সাধুবাদ করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহারা ধর্ম্ম-

(১০) অজনি ততোঽপি শ্রীমাং বাহুকধবলো মহানুভাবো যঃ।
ধর্ম্মমবন্নপি নিত্যং রণোদ্যতো নিনশাদ্ ধর্ম্মং ॥৯॥
Epigraphia Indica, Vol. IX, p. 7,

(১১) Ibid, p. 3.

(১২) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ২৭।

(১৩) ভোজৈর্ম্মৎস্যৈঃ সমদ্রৈঃ কুরু-যদু-যবনাবন্তি-গন্ধার-কীরৈ-
র্ভূপৈর্ব্যালোলমৌলি-প্রণতি-পরিণতৈঃ সাধু-সঙ্গীর্য্যমাণঃ।
হৃষ্যৎ-পঞ্চালবৃদ্ধোদ্ধৃত-কনকময়-স্বাভিষেকোদকুম্ভো
দত্তঃ শ্রীকন্যকুব্জস্সললিত-চলিত-ভ্রূলতা-লক্ষ্ম যেন ॥১২॥
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৪।

১৪) Epigraphia Indica, Vol. IV. p. 246,

পালদেব কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ইন্দ্ররাজের পরিবর্ত্তে চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের অধিপতি বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভোজদেশ ও মৎস্যদেশ বর্ত্তমান রাজপুতনার অংশ বিশেষের নাম। কুরু ও যদু বর্ত্তমান পঞ্জাবের প্রাচীন নাম। গান্ধার ও যবন সিন্ধু নদের উভয় পারস্থিত প্রদেশদ্বয়ের নাম। কীর বর্ত্তমান কাঙ্গড়া বা জ্বালামুখী প্রদেশের নাম[৭৫] এবং অবন্তি বা উজ্জয়িনী মালবদেশের রাজধানী। সুতরাং চক্রায়ুধকে ইন্দ্রায়ুধের সিংহাসনে স্থাপন করিবার জন্য ধর্ম্মপালদেবকে যে পঞ্চনদ, রাজপুতনা ও মালবের রাজগণকে পরাজিত করিতে হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পরে উত্তরাপথে গুর্জ্জরগণের যেরূপ বিস্তৃত প্রভাবের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে অনুমান হয় যে, ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক পরাজিত কুরু, যদু, যবনাদি দেশের রাজগণ গুর্জ্জর জাতীয় ছিলেন। এই সময়ে ভিল্লমালের অধিপতিগণ গুর্জ্জর রাজচক্রের মণ্ডলেশ্বর ছিলেন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুর্জ্জর-রাজ্যের সহিত গৌড়েশ্বরের বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় বোধ হয়, তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপাল গুর্জ্জররাজ দ্বিতীয় নাগভট কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন[৭৬] সাগরতালের শিলালিপিতে প্রথমে চক্রায়ুধেরও পরে বঙ্গেশ্বরের পরাজয়ের উল্লেখ আছে। অনুমান হয়, চক্রায়ুধ নাগভট কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে ধর্ম্মপাল তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও পরাজিত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মপাল ও চক্রায়ুধ বোধ হয়, বারবার নাগভট কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া অবশেষে রাষ্ট্রকুটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের সাহায্য ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নাগভটের পিতা বৎসরাজ যখন পঞ্চনদ হইতে গৌড় পর্য্যন্ত সমস্ত উত্তরাপথ অধিকার করিয়াছিলেন, তখন তৃতীয় গোবিন্দের পিতা ধ্রুব ধারাবর্ষই তাঁহাকে মরুভূমিতে তাড়িত করিয়া উত্তরাপথ রাজগণের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। সেইজন্যই বোধ হয়, ধর্ম্মপাল ও চক্রায়ুধ গুর্জ্জরগণের বিরুদ্ধে ধ্রুবের পুত্র তৃতীয় গোবিন্দের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় নাগভট তৃতীয় গোবিন্দের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। গোবিন্দ যখন সমস্ত উত্তরাপথ বিজয় করিয়া হিমালয় পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন কৃতজ্ঞ গৌড়েশ্বর ও কান্যকুব্জরাজ নতশীর্ষে তাঁহার সমীপে আগমন করিয়াছিলেন। ইহার পরে বোধ হয়, কোন কারণে গোবিন্দের সহিত ধর্ম্মপালের বিবাদ হইয়াছিল। কারণ, গোবিন্দের পুত্র প্রথম অমোঘবর্ষের সিরুর ও নীলগুণ্ডের শিলালিপিদ্বয় হইতে অবগত হওয়া যায় যে, গোবিন্দ গৌড়গণকে পরাজিত করিয়াছিলেন[৭৭]। নাগভট গোবিন্দ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া তাঁহার পিতা বৎসরাজের ন্যায় মরুভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুর্জ্জরগণকে বারবার উত্তরাপথ-আক্রমণে উদ্যত দেখিয়া তৃতীয় গোবিন্দ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কক্ককে গুর্জ্জর-রাজ্যের রুদ্ধ দ্বারের অর্গল স্বরূপ গুজরাটের সামন্ত পদে স্থাপন করিয়াছিলেন[৭৮]। তৃতীয় গোবিন্দ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া গুর্জ্জর-রাজগণ কিছুকাল শান্তভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নাগভট আর কখনও উত্তরাপথে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না এবং তাঁহার পুত্র রামভদ্র কখনও আর্য্যাবর্ত্ত-অধিকারের উদ্যম করেন নাই।

---

(৭৫) Baijnath Inscription of Lakshmanachandra of Kiragrama, Indica, 1, p. 104.

(৭৬) দুর্ব্বারবৈরিবরবারণ বাজিবারয়াণৌঘসংঘটনঘোরঘনান্ধকারং।
নির্জ্জিত্য বঙ্গপতিমাবিরভূদ্বিবস্বানুদ্যন্নিব ত্রিজপদেকবিকাশকোষঃ
—Annual Report, Archaeological Suavey of India, 1903-4, p. 281.

(৭৭) কেরল-মালব-গৌড়ান্ সগুর্জ্জরাংশ্চিত্রকূটগিরিদুর্গস্থান্।
বদ্ধা কাঞ্চীশানথ স কীর্ত্তিনারায়ণো জাতঃ ॥
—Epigraphia Indica, Vol. VI, pp. 102-3.

(৭৮) "গৌড়েন্দ্র-বঙ্গপতি-নির্জ্জয়-দুবিদগ্ধ-সদ্গুর্জ্জরেশ্বরদিগর্গলতাং চ যস্য
নীত্বা ভুজং বিহতমালবরক্ষণার্থং স্বামী তথান্যমপি রাজ্যফলানি ভুঙ্‌ক্তে ॥"
—Indian Antiquary, Vol. XII, p, 160, 11, 39-40.

তৃতীয় গোবিন্দ দক্ষিণাপথে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে চক্রায়ুধ বোধ হয়, ধর্ম্মপালের সামন্তরূপে কান্যকুব্জ-রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মপাল আজীবন সমগ্র উত্তরাপথের মণ্ডলেশ্বর- পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত দেবপালদেবের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, "দিগ্বিজয়প্রবৃত্ত সে নরপতির (ধর্ম্মপালের) ভৃত্যবর্গ কেদারতীর্থে যথাবিধি জলক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং গঙ্গাসাগরসঙ্গমে, তথা গোকর্ণ প্রভৃতি তীর্থেও ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন[৭৯]।" কেদার হিমালয়-পর্ব্বতমালার পশ্চিম ভাগে অবস্থিত এবং গোকর্ণ বোম্বাই প্রদেশে অবস্থিত[৮০]; সুতরাং এতদ্দ্বারা ধর্ম্মপালদেবের দিগ্বিজয়ের উত্তর ও দক্ষিণ সীমা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। ধর্ম্মপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাক্‌পাল "জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শাসনে অবস্থিত থাকিয়া, একচ্ছত্র শাসন-সংস্থিত দশদিক্ শত্রু-পতাকিনীশূন্য করিয়াছিলেন[৮১]।" ধর্ম্মপালদেব রাষ্ট্রকূটবংশীয় পরবলের কন্যা রণ্ণাদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন[৮২]। মধ্যভারতে পথারি নামক স্থানে পরবলের একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, পরবলের পিতার নাম কক্করাজ এবং তাঁহার পিতামহের নাম জেজ্জ। জেজ্জের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সহস্র সহস্র কর্ণাট-সৈন্যকে পরাজিত করিয়া লাট বা গুজরাট দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। কক্করাজ নাগাবলোক নামক জনৈক রাজাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিলেন। এই খোদিতলিপি পরবলের রাজ্যকালে, ৯১৭ বিক্রমাব্দে (৮৬১ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ হইয়াছিল[৮৩]। ধর্ম্মপাল খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর তৃতীয় পাদেও জীবিত ছিলেন। ইহা দেখিয়া শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ অনুমান করিয়াছেন যে, ধর্ম্মপাল "সম্ভবতঃ প্রৌঢ়াবস্থায় রণ্ণাদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন[৮৪]। ৮১৩ বিক্রমাব্দে (৭৫৬ খৃষ্টাব্দে) নাগাবলোক জীবিত ছিলেন। কারণ, উক্ত বর্ষে চাহমান-(চৌহান) বংশীয় জনৈক মহাসামন্তাধিপতিকর্ত্তৃক শ্রীনাগাবলোকের প্রবর্দ্ধমান বিজয়রাজ্যে সম্পাদিত একখানি তাম্রশাসন, আজমীর চিত্রশালার অধ্যক্ষ রায় বাহাদুর পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা কর্ত্তৃক কিয়ৎকাল পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে[৮৫]। স্বর্গীয় ডাক্তার কীলহর্ণ অনুমান করেন যে, এই নাগাবলোকই পরবলের পিতা কক্করাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। সুতরাং ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, কক্করাজ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে জীবিত ছিলেন। কক্করাজের পুত্র পরবল যখন নবম শতাব্দীর তৃতীয় পাদে জীবিত ছিলেন, তখন ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, কক্করাজ ও পরবল দীর্ঘায়ু পুরুষ ছিলেন। সুতরাং ধর্ম্মপালদেবের যৌবনে পরবল-দুহিতা রণ্ণাদেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হওয়াই অধিক সম্ভব। পরবল যখন অতিবৃদ্ধ এবং ধর্ম্মপালদেব যখন বহু পূর্ব্বে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, তখনই বোধ হয়, পথারির শিলাস্তম্ভলিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। পরবল-দুহিতা রণ্ণাদেবীর সহিত ধর্ম্মপালদেবের বিবাহ-সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু এক

(৭৯) কেদারে বিধিনোপযুক্তপয়সাং গঙ্গাসমেতাম্বুধৌ
গোকর্ণাদিষু চাপ্যানুষ্ঠিত বতাং তীর্থেষু ধর্ম্ম্যাঃ ক্রিয়াঃ।
ভৃত্যানাং সুখমেব যস্য সকলানুদ্ধৃত্য দুষ্টানিমান্
লোকান্ সাধয়তোনুষঙ্গজনিতা সিদ্ধিঃ পরত্রাপভুৎ ॥৭॥
—গৌড়রাজমালা পৃঃ ৩৬।

(৮০) Indian Antiquary, Vol, XXI, p. 25.

(৮১) রামস্যেব গৃহীত-সত্যতপসস্তস্যানুরূপো গুণৈঃ
সৌমিত্রেরূদপাদি তুল্য-মহিমা বাক্‌পালনামানুজঃ
যঃ শ্রীমান্নয়-বিক্রমৈক-বসতির্ভ্রাতুঃ স্থিতঃ শাসনে
শূন্যাঃ শত্রু-পতাকিনীভিরকরোদেকাতপত্রা দিশঃ ॥৪॥
—ভাগলপুরে আবিষ্কৃত নারায়ণপালের তাম্রশাসন ; গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৫৭।

(৮২) গৌড়লেখমালা; পৃঃ ৩৬।

(৮৩) Epigraphia Indica, Vol. IX p. 256.

(৮৪) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ২৪।

(৮৫) Epigraphia Indica. Vol. IX, p. 241.

অদ্ভুত মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, "রাষ্ট্রকূট-সম্রাট ৩য় গোবিন্দ অনুজ ইন্দ্ররাজকে লাটের আধিপত্য প্রদান করেন। কক্করাজ সেই ইন্দ্ররাজের পুত্র, সুতরাং রণ্ণাদেবী হইতেছেন রাষ্ট্রকূট-সম্রাট্ ৩য় গোবিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্রের পৌত্রী, অর্থাৎ—রাষ্ট্রকূট-সম্রাটের ৪র্থ পুরুষ অধস্তন। এদিকে ধর্ম্মপাল ৩য় গোবিন্দের সমসাময়িক। এরূপ স্থলে তাঁহার সহিত কক্করাজের পৌত্রী, বিবাহ কখনই সম্ভবপর নহে। ডাক্তার ফ্লিট্ পরবল ৩য় গোবিন্দেরই একটি নামান্তর পাইয়াছেন। তাঁহার মতে এই তৃতীয় গোবিন্দই রণ্ণাদেবীর পিতা, সুতরাং ধর্ম্মপালের শ্বশুর[৮৬]।" এই মতই সমীচীন। তৃতীয় গোবিন্দ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইন্দ্ররাজকে লাটের আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরবলের পিতা কক্করাজ গোবিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র নহে। ইন্দ্ররাজের পুত্র কক্করাজ ও পরবলের পিতা কক্করাজকে অভিন্ন মনে করিয়া প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। প্রথমতঃ পথারি-শিলাস্তম্ভ-লিপি অনুসারে পরবলের পিতামহের নাম জেজ্জ; কিন্তু গোবিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র কক্কের পিতার নাম ইন্দ্ররাজ; দ্বিতীয়তঃ ইন্দ্ররাজের পুত্র কক্ক ৭৩৪ হইতে ৭৪৩ শকাব্দ (৮১২-৮২১ খৃঃ অঃ) পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। কিন্তু পরবলের পিতা কক্করাজ নাগাবলোকের সমসাময়িক এবং নাগাবলোক খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন। পরবল যদি ধ্রুব ধারাবর্ষের কনিষ্ঠ পুত্র ইন্দ্ররাজের বংশজাত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার পথারি-লিপিতে নিশ্চয়ই কৃষ্ণরাজ ধ্রুব প্রভৃতি রাষ্ট্রকূটবংশীয় সম্রাট্‌গণের গুণকীর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যাইত। বসুজ মহাশয় বলিয়াছেন যে, "ডাক্তার ফ্লিট্ পরবল ৩য় গোবিন্দেরই একটি বিরুদ পাইয়াছেন।" অদ্যাবধি কোন স্থানে পরবল নামটি তৃতীয় গোবিন্দের বিরুদরূপে ব্যবহৃত হয় নাই। পথারি-শিলস্তম্ভ-লিপির পাঠোদ্ধার হইবার পূর্ব্বে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করিতেন যে, "পরবল" রাষ্ট্রকূট-বংশীয় তৃতীয় গোবিন্দ অথবা প্রথম অমোঘবর্ষের নামান্তর মাত্র[৮৭]।

ধর্ম্মপালদেবের দুই পুত্রের নাম অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার ৩২শ রাজ্যাঙ্কে একখানি তাম্রশাসন সম্পাদিত হইয়াছিল, ইহা গৌড়ের নিকটে খালিমপুর গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ত্রিভুবনপাল[৮৮]। যুবরাজ ত্রিভুবনপালদেব ধর্ম্মপালের রজ্যেকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। কারণ, কনিষ্ঠ দেবপালদেব পিতার মৃত্যুর পরে গৌড়-বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। এইজন্যই খালিমপুরের তাম্রশাসন ব্যতীত পাল-রাজবংশের অন্য কোন তাম্রশাসনে ত্রিভুবনপালের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ধর্ম্মপালদেবের ২৬শ রাজ্যাঙ্কে ভাস্কর উজ্জ্বলের পুত্র, কেশব নামক একব্যক্তি মহাবোধিতে তিন সহস্র (৩০০০) দ্রম্ম অর্থাৎ রৌপ্য মুদ্রা ব্যয় করিয়া একটি পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন এবং একটি চতুর্ম্মুখ মহাদেব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন[৮৯]। তাঁহার ৩২শ রাজ্যাঙ্কে ধর্ম্মপালদেব ব্যাঘ্রতটীমণ্ডলে, মহন্তাপ্রকাশবিষয়ে অবস্থিত ক্রৌঞ্চশ্বভ্র, মাঢাসাম্মলী ও পালিতক নামক গ্রামত্রয় এবং আম্রষণ্ডিকামণ্ডলে স্থালীকটবিষয়ে গোপিপ্পলীগ্রাম মহাসামন্তাধিপতি নারায়ণবর্ম্মার প্রার্থনাক্রমে, নারায়ণবর্ম্মা কর্তৃক শুভস্থলীতে নির্ম্মিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ভগবান নরনারায়ণের এবং তাঁহার সেবক লাটদেশীয় ব্রাহ্মণগণের ব্যবহারার্থ দান করিয়াছিলেন। স্বয়ং যুবরাজ ত্রিভুবনপালদেব এই তাম্রশাসনের দূতক[৯০]। এই তাম্রশাসনখানি মালদহের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট ৺উমেশচন্দ্র বটব্যাল ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার

(৮৬) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড পৃঃ ১৫৫, পাদটীকা, ৩১।

(৮৭) As the name Parabala could not be traced in any subseqent inscription, scholars coujectured that it was a biruda of one of the Rashtrakutas of Malkhed, perhaps of Govindarajs III. or Amoghavarsa I., according to the notions which they had formed regarding the time of Dharmapal.

—Epigraphia Indica, Vol. IX, p. 251.

(৮৮) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৬।

(৮৯) গৌড়লেখমালা পৃঃ ৩১-৩২।

(৯০) গৌড়লেখমালা পৃঃ ১৭।

মৈত্রেয় মহাশয় বলিয়াছেন যে, ইহা কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক রক্ষিত হইতেছে[২১]। কিন্তু ইহা এসিয়াটিক সোসাইটিতে বা অপর কোন চিত্রশালায় রক্ষিত নাই। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, ইহা রাজশাহীতে বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। খালিমপুরের তাম্রশাসন ধর্ম্মপালদেবের ৩২শ রাজ্যাঙ্কে সম্পাদিত হইয়াছিল। তিব্বতদেশীয় ইতিহাসকার লামা তারানাথ বলেন যে, ধর্ম্মপাল চৌষট্টি (৬৪) বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন[২২]। তারানাথ পালবংশের প্রথম নরপতিত্রয়েরই সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারেন নাই, সুতরাং তাঁহার জনশ্রুতি-অবলম্বনে লিখিত ইতিহাসের কথা, সমর্থক অপর প্রমাণ আবিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না। অনুমান হয়, ধর্ম্মপালদেব পঞ্চত্রিংশদ্বর্ষকাল গৌড়ের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। ধর্ম্মপালদেবের রাজ্যকালে স্বর্ণরেখ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে বরেন্দ্রভূমির করঞ্জ নামক একখানি গ্রাম শাসনস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্বর্ণরেখের উত্তর পুরুষ চতুর্ভুজ হরিচরিত নামক একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী হরিচরিত কাব্যের একখানি পুথি নেপালে নেপাল-রাজের গ্রন্থাগারে আবিষ্কার করিয়াছেন, এই গ্রন্থের পুষ্পিকায় স্বর্ণরেখের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে[২৩]।

ধর্ম্মপালদেব স্বর্গারোহণ করিলে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র দেবপালদেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া গুর্জ্জরগণ বহুদিন উত্তরাপথ আক্রমণ আক্রমণ করিতে ভরসা করে নাই। বিন্ধ্যপর্ব্বতের কোন স্থানে বোধ হয় দেবপালদেবের সহিত রাষ্ট্রকূট অথবা গুর্জ্জর রাজগণের যুদ্ধ হইয়াছিল। কারণ, মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত দেবপালের তাম্রশাসনে এবং ভট্টগুরবমিশ্রের শিলাস্তম্ভ-লিপিতে তাঁহার বিন্ধ্যপর্ব্বতে গমনের উল্লেখ আছে। মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত দেবপালদেবের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যে, "অপর নৃপতিবৃন্দের গর্ব্বখর্ব্বকারক সেন রাজার দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে রণকুঞ্জরগণ ভ্রমণ করিতে করিতে বিন্ধ্যগিরিতে উপনীত হইয়া, আনন্দাশ্রু-প্রবাহপ্লাবিত বন্ধুগণকে পুনরায় দর্শন করিয়াছিল এবং যুবক অশ্বগণও কাম্বোজ দেশে উপনীত হইয়া দীর্ঘ কালের পর স্বকীয় হর্ষসম্ভূত হ্রেষারব-মিশ্রিত হ্রেষারব-কারী প্রিয়তমাবৃন্দের দর্শন লাভ করিয়াছিল[১]। দিনাজপুরে ভট্টগুরবমিশ্রের স্তম্ভলিপি হইতে অবগত হওয়া যায়, "সেই দর্ভপাণির নীতিকৌশলে শ্রীদেবপাল নৃপতি মতঙ্গজমদাভিসিক্তশিলাসংহতিপূর্ণ রেবা নদীর জনক হইতে মহেশললাটশোভী ইন্দুকিরণশ্বেতায়মান গৌরী-জনক পর্ব্বত পর্য্যন্ত, সূর্য্যোদায়াস্তকালে অরুণরাগরঞ্জিত জলরাশির আধার পূর্ব্বসমুদ্র এবং পশ্চিমসমুদ্র (মধ্যবর্ত্তী)

(২১) গৌড়লেখমালা পৃঃ ১১।

(২২) Pag-samjon Zang, p. III.

(২৩) "গ্রামোত্তমোঽস্ত্যসলমঞ্জুগুণৈকপুঞ্জঃ শ্রীমান্ করঞ্জ ইতি বন্দ্যতমো বরেন্দ্র্যাম্।
যত্র শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পদ-প্রবীণাঃ সচ্ছাস্ত্রকাব্যনিপুণা স্ম বসন্তি বিপ্রাঃ ॥
কীর্ণঃ প্রজাপতিগুণৈঃ পরিপূর্ণৈঃ শ্রীস্বর্ণরেখ ইতি বিপ্রবরোঽবতীর্ণঃ।
তং গ্রামমগ্রগণনীয়গুণং সমগ্রং জাগ্রহ শাসনবরং নৃপধর্ম্মপালাৎ।"

—Catalogue of Palmleaf & selected paper MSS., Durbar Library Nepal by Mahamahopadhyaya Haraprasad Shastri, p. 134.

(১) ভ্রাম্যদ্ভির্বিজয়ক্রমেণ করিভি [ঃ স্বা] মেব বিন্ধ্যাটবী-
মুদ্দামপ্লবমানবাষ্পয়সো দৃষ্টাঃ পুনর্বান্ধবাঃ।
কাম্বোজেষু চ যস্য রাজি যুবভির্ধ্বস্তান্যরাজৌজসো
হ্রেষামিশ্রিতহারিহেষিতরবাঃ কান্তাশ্চিরং বীক্ষিতাং ॥
—মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত দেবপালদেবের তাম্রশাসন ; গৌড়লেখমালা পৃঃ ৩৭।

সমগ্র ভূভাগ করপ্রদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন[২]। গুরবমিশ্রের স্তম্ভলিপি হইতে আরও অবগত হওয়া যায় যে, দেবপাল তাঁহার মন্ত্রী কেদারমিশ্রের বুদ্ধিবলের উপাসনা করিয়া উৎকলকুল উৎকীলিত করিয়া করিয়া হূণগর্ব্ব খর্ব্বীকৃত করিয়া এবং দ্রবিড়েশ্বর ও গুর্জ্জরনাথের দর্প চূর্ণীকৃত করিয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সমুদ্রমেখলাভরণা বসুন্ধরা উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন[৩]। মুঙ্গেরের তাম্রশাসন এবং বাদালের শিলাস্তম্ভলিপি এই উভয় খোদিতলিপিতেই দেবপালদেবের বিন্ধ্যপর্ব্বতে বাদালের স্তম্ভলিপিতে দেবপালকর্তৃক গুর্জ্জরনাথ ও দ্রবিড়েশ্বরের দর্পচুর্ণের উল্লেখ আছে। বিন্ধ্যপর্ব্বত গুর্জ্জর-রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব্বসীমায় ও দ্রবিড় বা রাষ্ট্রকূট-রাজ্যের উত্তর-পূর্ব্ব সীমায় অবস্থিত, সুতরাং সম্ভবতঃ বিন্ধ্যপর্ব্বতেরই কোন উপত্যকায় দ্রবিড়নাথ ও গুর্জ্জরেশ্বর পরাজিত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের পুত্র শর্ব্ব বা প্রথম অমোঘবর্ষ ষষ্ঠি বর্ষের অধিককাল মান্যখেতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সুতরাং ইহাই সম্ভব যে, তিনি দেবপালদেবের সমসাময়িক এবং তৎকর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। অমোঘবর্ষের দুইখানি শিলালিপিতে তাঁহার সহিত গৌড়েশ্বরের যুদ্ধের উল্লেখ আছে। সিরুর ও নীলগুণ্ডে আবিষ্কৃত শিলালিপি-দ্বয় হইতে অবগত হওয়া যায় যে, অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, মালব ও বেঙ্গীর অধিপতিগণ প্রথম আমোঘবর্ষের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন[৪]। অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধ তখন স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল না এবং বঙ্গে স্বতন্ত্র রাজ্য থাকিলেও অঙ্গ ও মগধ পালরাজবংশের অধিকারকালে কখনই স্বাতন্ত্র্য লাভ করে নাই; সুতরাং "বঙ্গাঙ্গমগধ" পদদ্বারা গৌড়রাজ্যই বুঝাইতেছে।

এই সমস্ত খোদিতলিপি হইতে দেবপালদেবের রাজ্য-কালের নিম্নলিখিত ইতিহাস অবগত হওয়া যায়। দেবপালদেব যুদ্ধাভিযানের সময়ে বিন্ধ্যপর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এইস্থানে তাঁহার সহিত দক্ষিণা-পথেশ্বর প্রথম অমোঘবর্ষের যুদ্ধ হইয়াছিল, এই যুদ্ধে উভয় পক্ষই জয় ঘোষণা করিয়াছিলেন[৫]। যুদ্ধাভিযানকালে দেবপাল সসৈন্য হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন এবং কাম্বোজ জাতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন। দেবপালের মুঙ্গেরের ও নালন্দার তাম্রশাসনের ১৩শ শ্লোকের প্রথম চরণে বিন্ধ্যপর্ব্বতের নাম' তৃতীয় চরণে কাম্বোজ জাতির নাম আছে; কিন্তু ভট্টগুরবমিশ্রের স্তম্ভলিপিতে পঞ্চম শ্লোকের প্রথম চরণে বিন্ধ্যপর্ব্বতের নাম ও দ্বিতীয় চরণে হিমালয় পর্ব্বতের নাম আছে। এই শ্লোকদ্বয় দেবপাল-দেবের বিজয়-যাত্রার উত্তর ও দক্ষিণসীমা-নির্দ্দেশক।

(২) আরেবাজনকান্মতঙ্গজমদস্তি ল্যচ্ছিলাসংহতে-
রাগৌরীপিতুরীশ্বরেন্দুকিরণৈঃ পুষ্যৎসিতিম্নো গিরেঃ।
মার্ত্তণ্ডাস্তময়োদয়ারুণজলাদাবারিরাশিদ্বয়াৎ।
নীত্যা যস্য ভুবং চকার করদাং শ্রীদেবপালো নৃপঃ।
—ভট্টগুরবমিশ্রের স্তম্ভলিপি; গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৭২।

(৩) উৎকীলিতোৎকলকুলং হৃত-হূণগর্ব্বং খর্ব্বীকৃতদ্রবিড়গুর্জ্জর দীনাথদর্পং।
ভূপীঠমব্ধিরশনাভরণম্বুভোজ গৌড়েশ্বরশ্চিরমুপাস্যধিয়ং যদীয়াং।
—ভট্টগুরবমিশ্রের স্তম্ভলিপি; গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৭৪।

(৪) অরিনৃপতিমকুটঘটিতচরণস্ সকলভুবনবন্দিতশৌর্য্যঃ।
বঙ্গাঙ্গমগধ-মালব-বেঙ্গীশৈরর্চ্চিতোঽতিশয়ধবলঃ।
—নীলগুণ্ড ও সিরুরের শিলালিপি; Epigraphic Indica, Vol. VI, p, 103; Indiad Hntiquary, Vol. XII, p, 218,

(৫) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন,—"১ম অমোঘবর্ষের নীলগুণ্ডলিপির ১১শ শ্লোকে এরূপ পরিচয় (বঙ্গাঙ্গ মগধ মালব বেঙ্গী রাজগণ কর্তৃক অতিশয়ধবল বা ১ম অমোঘবর্ষের অর্চ্চনা) থাকায় কেহ কেহ মনে করেন, অমোঘবর্ষের নিকট দেবপাল পরাজয় স্বীকার করেন। কিন্তু উপরে লিখিয়াছি, প্রথম অমোঘবর্ষ দেবপালের মাতুল ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ভাগিনেয় কর্তৃক মাতুলের অর্চ্চনা স্বাভাবিক, ইহা খর্ব্বতাপ্রকাশক নহে।"
—(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, পৃঃ ২৫৮, পাদটীকা ৪৭)।

বলা বাহুল্য, ১ম অমোঘবর্ষের সহিত দেবপালদেবের সম্বন্ধজ্ঞাপক কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। পূর্ব্বে দেবপালের মাতুল-বংশের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম অমোঘবর্ষ দেবপালের মাতুল ছিলেন, এই কথা বসুজ মহাশয়ের কল্পনাপ্রসূত, প্রমণাভাবে ইহা ঐতিহাসিক সত্যরূপে গৃহীত হইল না।

সুতরাং ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে দেবপাল উত্তরে হিমালয় পর্ব্বতে কাম্বোজ জাতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ভট্টগুরবমিশ্রের স্তম্ভলিপির ১৩শ শ্লোক হইতে অবগত হওয়া যায় যে, দেবপালদেব উৎকলগণকে, হূণগণকে এবং দ্রবিড়েশ্বর ও গুর্জ্জরনাথকে পরাজিত করিয়াছিলেন। দ্রবিড়েশ্বর বলিতে দক্ষিণাপথেশ্বর রাষ্ট্রকূটবংশীয় প্রথম অমোঘবর্ষকে বুঝাইতেছে। গুর্জ্জরনাথ শব্দে দ্বিতীয় নাগভটের পুত্র রামভদ্রদেবকে বুঝাইতেছে। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, দ্বিতীয় নাগভট ধর্ম্মপালদেবের সমসাময়িক; সুতরাং ধর্ম্মপালের পুত্র দ্বিতীয় নাগভটের পুত্রের সমসাময়িক হওয়াই সম্ভব। দ্বিতীয় নাগভটের পুত্র রামভদ্র বোধ হয়, দেবপালদেব কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন; কারণ, তাঁহার পুত্র প্রথম ভোজদেবের সাগরতাল-শিলালিপিতে তৎকর্ত্তৃক গৌড় বা অপর কোন দেশের রাজার পরাজয়ের উল্লেখ নাই[৬]। দেবপালের রাজ্যকালে তাঁহার খুল্লতাত-পুত্র জয়পাল উৎকলরাজকে স্বীয় রাজধানী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন[৭]। ভাগলপুরে আবিষ্কৃত নারায়ণপালের তাম্রশাসনের এই উক্তির দ্বারা গুরবমিশ্রের স্তম্ভলিপির উক্তি সমর্থিত হইতেছে। নারায়ণপালের তাম্রশাসন হইতে আরও অবগত হওয়া যায় যে জয়পাল প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধীশ্বরকে পরাজিত করিয়াছিলেন[৮]। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ অনুমান করেন, "ভগদত্তবংশীয় প্রলম্বের প্রপৌত্র জয়মাল বীরবাহু সম্ভবতঃ এই সময়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন[৯]।" খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে গৌড় দেশ কাম্বোজ জাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল, দিনাজপুরে বাণগড় নামক স্থানে কাম্বোজ-বংশজাত জনৈক গৌড়পতির উল্লেখ আছে[১০]। দেবপালদেবের রাজ্যকালে কাম্বোজগণ বোধ হয়, হিমালয় হইতে অবতরণ করিয়া গৌড়দেশ অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং সেই সময়ে দেবপাল বোধ হয়, তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেবপাল "একদিকে হিমালয়, অপর দিকে শ্রীরামচন্দ্রের কীর্ত্তিচিহ্ন সেতুবন্ধ, একদিকে বরুণ-নিকেতন, অপর দিকে লক্ষ্মীর জন্মনিকেতন [ক্ষীরোদ সমুদ্র,]—এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন সমগ্র ভূমণ্ডল নিঃসপত্নভাবে উপভোগ করিয়াছেন[১১]।" অদ্যাবধি দেবপালের রাজত্বকালের

(৬) তজ্জন্মা রামনামা প্রবরহরিবলন্যস্তভূভৃৎপ্রবন্ধৈ-
রাবধ্নন্বাহিনীনাং প্রসভমধিপতীনুদ্ধতক্রূরসত্ত্বান্।
পাপাচারান্তরায়প্রমথনরুচিরঃ সঙ্গতঃ কীর্ত্তিদারৈ-
স্ত্রাতা ধর্ম্মস্য তৈস্তৈস্সসমুচিতরিতৈঃ পূর্ব্ববন্নির্ব্বভাসে। ১২
অনন্যসাধনাধীনপ্রতাপাক্রান্তদিঙ্মুখঃ।
উপায়ৈস্সম্পদাং স্বামী যঃ সব্রীড়মুপাস্যত। ১৩
অর্থিভির্ব্বিনিযুক্তানাং সম্পদাং জন্ম কেবলং।
যস্যাভূৎ কৃতিণঃ প্রীত্যৈ নাত্মেচ্ছাবিনিয়োগতঃ। ১৪
—সাগরতালের শিলালিপি, Annual Report of the Archæological Survey of India, 1903-4, p, 281

(৭) তস্মাদুপেন্দ্রচরিতৈর্জ্জগতীং পুনানঃ
পুত্রো বভূব বিজয়ী জয়পালনামা।
ধর্ম্মদ্বিষাং শময়িতা যুধি দেবপালে
যঃ পূর্ব্বজে ভুবনরাজ্য-সুখান্যনৈষীৎ ॥৫
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৫৭।

(৮) যস্মিন্ ভ্রাতুর্নিদেশাদ্বলবতি পরিতঃ প্রস্থিতে জেতুমাশাঃ
সীদন্নাম্নৈব দূরান্নিজপুরমজহাদুৎকলানামধীশঃ।
আসাঞ্চক্রে চিরায় প্রণয়ি-পরিবৃতো বিভ্রদুচ্চেন মূর্দ্ধা
রাজা প্রাগ্‌জ্যোতিষাণামুপশমিতসমিৎসংকথাং যস্য চাজ্ঞাং ॥৬
—গৌড়লেখমালা, ৫৮।

(৯) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ২৯।

(১০) Journal & Proceedings of the Aaiatic Society of Bengal, New Seriesf Vol VII, p 619

(১১) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৪৪। এই শ্লোক নবাবিষ্কৃত নালন্দার তাম্রশাসনেও আছে।

একখানিশিলালিপি ও দুইখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম তাম্রশাসনখানি মুদ্গগিরি অর্থাৎ মুঙ্গের হইতে দেবপালের ৩৩ রাজ্যাঙ্কে সম্পাদিত হইয়াছিল। এতদ্বারা শ্রীনগরভুক্তির (অর্থাৎ পাটলিপুত্রের) ক্রিমিলা বিষয়ান্তঃপাতী মেবিকা গ্রাম ভট্টবিশ্বরাতের পৌত্র ভট্ট বরাহরাতের পুত্র ভট্টপ্রবর শ্রীবীহেকরাত মিশ্রকে প্রদত্ত হইয়াছিল। দেবপালের একমাত্র পুত্র রাজ্যপাল এই তাম্রশাসনের দূতক[১২]। দ্বিতীয় তাম্রশাসনখানি পাটনা জিলায় অবস্থিত বড়গাঁও গ্রামে নালন্দ বা নালন্দার ধ্বংসাবশেষ-খননকালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের মধ্যচক্রের অধ্যক্ষ বন্ধুবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরানন্দ শাস্ত্রী ইহার পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন। এই তাম্রশাসনখানিও মুদ্গগিরি-সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। এবং ইহা দেবপালদেবের ৩৮ রাজ্যাঙ্কে সম্পাদিত হইয়াছিল। এতদ্বারা দেবপালদেব শ্রীনগরভুক্তির (অর্থাৎ পাটলীপুত্রভুক্তির বা Division-এর) রাজগৃহবিষয়ের (বর্ত্তমান রাজগির বিষয়ের) অন্তঃপাতী অজপুরনয়প্রতিবদ্ধ নন্দিবনাক ও মনিবায়ক গ্রাম, পিলিপ্পিঙ্কানয়প্রতিবদ্ধ নয়িকাগ্রাম, অচলায়তনপ্রতিবদ্ধ হস্তি গ্রাম এবং গয়াবিষয়ের অন্তঃপাতি কুমুদসূত্রবীথী-প্রতিবদ্ধ পালামবগ্রামে, সুবর্ণদ্বীপ বা যবদ্বীপের রাজা শ্রীবালপুত্রদেব কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তন্নির্ম্মিত নালন্দাবস্থিত বিহারে প্রতিষ্ঠিত ভগবান যুদ্ধ ভট্টারকের সেবার জন্য এবং আর্য্য ভিক্ষু-সঙ্ঘের বলি, চরু, সত্র, চীবর, পিণ্ড, শয়ন, আসন ঔষধার্থে; ধম্মরত্নের (ধম্মগ্রন্থের) লেখনের জন্য ও বিহার ভগ্ন হইলে তাহার সংস্কারের জন্য প্রদান করিয়াছিলেন। ব্যাঘ্রতটী মণ্ডলাধিপতি শ্রীবলবর্ম্মা এই তাম্রশাসনের দূতক এবং ইহা দেবপালদেবের রাজ্যের আটত্রিশ বর্ষের কার্ত্তিক মাসের একবিংশ দিবসে সম্পাদিত হইয়াছিল। তাম্রশাসনের শেষে সুবর্ণদ্বীপ বা যবদ্বীপের অধিপতি শ্রীবালপুত্রদেবের বংশ-পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ইনি শৈলেন্দ্র-বংশসম্ভূত যবভূমি বা যবদ্বীপের অধিপতি শ্রীবীর নাম রাজার বংশসম্ভূত। বালপুত্রদেব নালন্দা নামক বৌদ্ধতীর্থের খ্যাতি শ্রবণ করিয়া তথায় বৌদ্ধবিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন এবং নালন্দা পালবংশীয় সম্রাট দেবপালদেবের রাজ্যভুক্ত থাকায় দূত প্রেরণ করিয়া দেবপালদেবকে বুদ্ধমূর্ত্তির পূজা ও বিহারে সমাগত বৌদ্ধ-ভিক্ষুসঙ্ঘের অশন-বসন ও চিকিৎসার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য পূর্ব্বোক্ত গ্রামপঞ্চ দান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। যবদ্বীপের বা সুবর্ণদ্বীপের রাজা বালপুত্রদেবের অনুরোধে দেবপালদেব কর্ত্তৃক এই গ্রামপঞ্চ দেবত্র স্বরূপ বৌদ্ধবিহারে :প্রদত্ত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই পঞ্চগ্রামের মূল্য বালপুত্রদেব কর্ত্তৃক গৌড়রাজ দেবপালদেবকে প্রদত্ত হইয়াছিল, কারণ দানধর্ম্মানুসারে মূল্য প্রদত্ত না হইলে বালপুত্রদেবের মন্দির-প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হয় না[১৩]। দেবপালদেবের খুল্লতাত-পুত্র জয়পাল সম্ভবতঃ তাঁহার পিতা বাকপালদেবের শ্রাদ্ধকালে শ্রাদ্ধের মহাদান উমাপতি নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। উমাপতির উত্তরপুরুষ নারায়ণ তদ্‌রচিত ছন্দোগপরিশিষ্ট প্রকাশ নামক গ্রন্থে এই কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন[১৪]

(১২) গৌড়লেখমালা. পৃঃ ৩৮-৪০।

(১৩) প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষ (Director-General of Archæology in India) স্যার জন মার্শেলের (Sir John Marshall) অনুমতি অনুসারে আমার অনুরোধ বন্ধুবর পণ্ডিত শ্রীযুত হীরানন্দ শাস্ত্রী এই তাম্রশাসনের উদ্ধৃত পাঠ ক্যাম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগ (Cambridge History of India, Voll· I) সঙ্কলনের জন্য আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনের পাঠ অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই। পণ্ডিত হীরানন্দ শাস্ত্রী ইহার পাঠ Epigraphia Indica, পত্রে প্রকাশ করিবেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের সৌজন্যে এই নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনের সারাংশ এই গ্রন্থের জন্য সঙ্কলিত হইল। এতদ্ব্যতীত দেবপালদেবের রাজ্যকালে প্রতিষ্ঠিত একটি মূর্ত্তি নালন্দায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু খোদিত লিপির পাঠ অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই।—Annual Report of the Archæological Survey of India, Central Circle, 1920- 21, pp 37-38,

(১৪) তস্মাদ্‌ভূষিতসাব্ধিভূমিবলয়ঃ শিষ্যোপশিষ্যব্রজৈ-
র্বিদ্বন্মৌলিরভূদুমাপতিরিতি প্রভাকরগ্রামণীঃ।
স্মাপালাজ্জয়পালতঃ স হি মহাশ্রাদ্ধং প্রভূতং মহা
দানং চার্থিগণার্হণার্দ্রহৃদয়ঃ প্রত্যগ্রহীৎ পুণ্যবান্‌ ॥

—ছান্দোগ্যপরিশিষ্ট প্রকাশ; Eggeling,s Catalogue of Sanskrit manuscripts in the India Office Libray, White Hall, London, part I pp, 92, 93

দেবপালদেবের একটিমাত্র পুত্রের নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহার নাম রাজ্যপাল এবং ইনি পিতার রাজ্যকালে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন[১৫]। রাজ্যপাল বোধ হয়, দেবপালের জীবনকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। কারণ, দেবপালের পরে জয়পালের পুত্র প্রথম বিগ্রহপাল বা প্রথম শূরপাল গৌড়-বঙ্গ-মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। দেবপালদেবের রাজ্যকালে নগরহার নগরের (বর্ত্তমান নাম নিংরাহার, ইহা আফগানিস্তানের আমীরের রাজ্যে খাইবার গিরিসঙ্কটের অনতিদূরে অবস্থিত) অধিবাসী ইন্দ্রগুপ্তের পুত্র বীরদেব মগধে আসিয়া যশোবর্ম্মপুরে দুইটি চৈত্য ও একটি বজ্রাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বীরদেব যে বজ্রাসন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহার একখণ্ড প্রস্তর পাটনা জেলার অন্তর্গত ঘোষরাঁবা গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া, বৌদ্ধ-মতের অনুরাগী হইয়া অধ্যয়নার্থ কণিষ্কবিহারে গমন করিয়াছিলেন[১৬]। কণিষ্কবিহার প্রাচীন পুরুষপুর (বর্ত্তমান পেশাবর) নগরে অবস্থিত ছিল[১৭]। বীরদেব কণিষ্কবিহারে সর্ব্বজ্ঞশান্তি নামক জনৈক বৌদ্ধাচার্য্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তীর্থযাত্রা উপলক্ষে মগধে আসিয়াছিলেন[১৮]। তিনি মহাবোধি দর্শন করিয়া যশোবর্ম্মপুর (বর্ত্তমান নাম ঘোষরাঁবা) বিহারে আগমন করিলে দেবপালদেব তাঁহাকে পূজা করিয়াছিলেন[১৯]। দেবপাল তাঁহাকে নালন্দা মহাবিহারের সঙ্ঘস্থবির নিযুক্ত করিয়াছিলেন[২০]। নালন্দায় অবস্থান কালে বীরদেব ইন্দ্রশিলা পর্ব্বতে[২১] দুইটি চৈত্য নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন[২২]। বীরদেবের শিলালিপিখানি এখন কলিকাতার চিত্রশালায় রক্ষিত আছে, কিন্তু মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত দেবপালের তাম্রশাসনের এখন আর কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না[২৩]। নালন্দার তাম্রশাসন দেবপালদেবের ৩৮শ রাজ্যাঙ্কে সম্পাদিত হইয়াছিল, সুতরাং দেবপালদেব প্রায় চত্বারিংশৎ বর্ষকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপালদেবের রাজ্যকালে শাণ্ডিল্যবংশীয় গর্গদেব তাঁহার প্রধান অমাত্য ছিলেন। ধর্ম্মপালদেবের রাজত্বের শেষভাগে গর্গদেবের পুত্র দর্ভপাণি গৌড়েশ্বরের প্রধান অমাত্য হইয়াছিলেন। দর্ভপাণির প্রপৌত্র গুরবমিশ্রের স্তম্ভলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, দেবপাল দর্ভপাণিকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। কথিত আছে যে, "দর্ভপাণির নীতিকৌশলে শ্রীদেবপাল [নামক] নৃপতি মতঙ্গজ-মদাভিষিক্ত-শিলাসংহতিপূর্ণ রেবা [নর্ম্মদা] নদীর জনক [উৎপত্তিস্থান বিন্ধ্যপর্ব্বত] হইতে [আরম্ভ করিয়া] মহেশ ললাট-শোভি-ইন্দু কিরণ-শ্বেতায়মান গৌরীজনক

(১৫) শ্রেয়োবিধাবুভয়[ব]ংশ-বিশুদ্ধিভাজং
রাজাকরোদধিগতাত্মগুণ গুণজ্ঞঃ।
আত্মানুরূপচরিতং স্থিরযৌবরাজ্যং
শ্রীরাজ্যপালমিহ দূতকমাত্মপুত্রং॥
—গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৪০।

(১৬) বেদানধীত্য সকলান্ কৃতশাস্ত্রচিন্তঃ
শ্রীমৎকণিষ্কমুপগম্য মহাবিহারম্।
আচার্য্যবর্য্যমথ স প্রশম-প্রশস্তং
সর্ব্বজ্ঞশান্তিমণুগম্য তপশ্চচার ॥৬
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৪৮।

(১৭) পরিব্রাজক ইউয়ান-চোয়াং পুরুষপুর নগরের উপকণ্ঠে কণিষ্কের মহাবিহার দর্শন করিয়াছিলে—Watters's On—Yuan Chwang, Vol 1, p 208

(১৮) বজ্রাসনং বন্দিতুমেকদাঽথ
শ্রীমন্মহাবোধিমুপাগতোঽসৌ।
দ্রষ্টুংততোঽগাৎ সহ দেশি-ভিক্ষূন্
শ্রীমৎযশোবর্ম্মপুরং বিহারম্ ॥ ৮
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৪৮।

(১৯) তিষ্ঠন্নথেহ সুচিরং প্রতিপত্তিসারঃ
শ্রীদেবপাল-ভুবনাধিরলব্ধ পূজঃ।
প্রাপ্ত-প্রভঃ প্রতিদিনোদয়-পূরিতাশঃ
পূষেব দারিততমঃপ্রসরো ররাজ ॥৯
—গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৪৮

(২০) ভিক্ষোরাত্মসমঃ সুহৃদ্ভুজ ইব শ্রীসত্যবোধের্নিজো
নালন্দাপরিপালনায় নিয়তঃ সংঘস্থিতের্য স্থিতঃ।
যেনৈতৌ স্ফুটমিন্দ্রশৈলমুকুট-শ্রীচৈত্য-চূড়ামণী
শ্রামণ্যব্রত-সম্বতেন জগতঃ শ্রেয়োঽর্থমুত্থাপিতৌ ॥১০
গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৪৮-৪৯।

(২১) ইন্দ্রশিলা পর্ব্বতের বর্ত্তমান নাম গিরিয়েক। ইহা পাটনা জিলায়, বিহার মহকুমায় প্রাচীন রাজগৃহ হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

(২২) গিরিয়েক পর্ব্বতশীর্ষে দুইটি বৃহৎ ইষ্টক নির্ম্মিত চৈত্যের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, সম্ভবতঃ এই দুইটি চৈত্যই বীরদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

(২৩) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৩৩।

[হিমালয়] পর্ব্বত পর্য্যন্ত, সূর্য্যোদয়াস্তকালে অরুণরাগ-রঞ্জিত [উভয়] জলরাশির আধার পূর্ব্ব সমুদ্র এবং পশ্চিম-সমুদ্র [মধ্যবর্ত্তী] সমগ্র ভূভাগ কর-প্রদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"

"নানা-মদমত্ত-মতঙ্গজ-মদবারি-নিষিক্ত-ধরণীতল-বিসর্পি ধূলিপটলে দিগন্তরাল সমাচ্ছন্ন করিয়া, দিক্‌চক্রাগত-ভূপালবৃন্দের চিরসঞ্চরমাণ সেনাসমূহ যাঁহাকে নিরন্তর দুর্ব্বিলোক করিয়া রাখিত, সেই দেবপাল [নামক] নরপাল [উপদেশ গ্রহণের জন্য] দর্ভপাণির অবসরের অপেক্ষায়, তাঁহার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিতেন।"

"সুররাজকল্প [দেবপাল] নরপতি [সেই মন্ত্রিবরকে] অগ্রে চন্দ্রবিম্বানুকারী [মহার্হ] আসন প্রদান করিয়া, নানা-নরেন্দ্র-মুকুটাঙ্কিত-পাদপাংশু হইয়াও, স্বয়ং সচকিত-ভাবেই সিংহাসনে উপবেশন করিতেন"[২৪]। দর্ভপাণির পুত্রের নাম সোমেশ্বর; তিনি বোধ হয় দেবপালের সেনাপতি ছিলেন; কারণ, তাঁহাকে ধনঞ্জয়ের সহিত তুলনা করা হইয়াছে[২৫]। সোমেশ্বরের পুত্র কেদারমিশ্র তাঁহার পিতামহ দর্ভপাণির পরে গৌড়েশ্বরের প্রধান অমাত্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, কেদার-মিশ্রের "বুদ্ধি-বলের উপাসনা করিয়া, গৌড়েশ্বর [দেবপাল-দেব] উৎকলকুল উৎকীলিত করিয়া, হূণগর্ব্ব খর্ব্বীকৃত করিয়া এবং দ্রবিড়-গুর্জ্জর-নাথ-দর্প চূর্ণীকৃত করিয়া, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সমুদ্র মেখলাভরণা বসুন্ধরা উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন[২৬]। দর্ভপাণি, সোমেশ্বর এবং কেদারমিশ্র, এই তিন পুরুষ যখন দেবপালদেবের সম-সাময়িক ছিলেন, তখন ইহা অবশ্যস্বীকার্য্য যে, দেবপালদেব দীর্ঘকাল গৌড়-বঙ্গ-মগধের সিংহাসনে আসীন ছিলেন।

দেবপালের প্রথম মন্ত্রী দর্ভপাণি ধর্ম্মপালের রাজ্যের শেষাংশে তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন এবং দেবপালের দ্বিতীয় মন্ত্রী তাঁহার উত্তরাধিকারী প্রথম বিগ্রহপাল বা প্রথম শূরপালের অমাত্য ছিলেন। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ধর্ম্মপালকে গুর্জ্জর-প্রতীহার-বংশীয় প্রথম ভোজদেবের সমসাময়িক ধরিয়া লইয়া দেবপালকে প্রথম অমোঘবর্ষের পুত্র দ্বিতীয় কৃষ্ণের সমসাময়িক ব্যক্তি স্থির করিয়াছেন[২৭]। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে দর্শিত হইয়াছে যে, ধর্ম্মপাল দ্বিতীয় নাগভটের ও তৃতীয় গোবিন্দের সমসাময়িক ব্যক্তি; সুতরাং ধর্ম্মপালের পুত্র কখনই দ্বিতীয় নাগভটের পৌত্র অথবা বৃদ্ধ প্রপৌত্র (প্রথম ভোজ পৌত্র এবং দ্বিতীয় ভোজ বৃদ্ধ প্রপৌত্র) এবং তৃতীয় গোবিন্দের পুত্রের সম-সাময়িক ব্যক্তি বলা যাইতে পারে না। চন্দ মহাশয় কর্ণের তাম্রশাসন ও বিলহরির তাম্রশাসন হইতে যে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা প্রথম ভোজদেবের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না[২৮]। দেবপালদেবের পত্নীর নাম অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। অনুমান হয়, দেবপালদেব ৮২০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার রাজ্যের শেষভাগে প্রতীহার-রাজ রামভদ্রের পুত্র প্রথম ভোজ, মহোদয় বা কান্যকুব্জ অধিকার করিয়াছিলেন। যোধপুর রাজ্যে দৌলতপুরায় আবিষ্কৃত ৯০০ বিক্রমাব্দে সম্পাদিত একখানি তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, উক্ত তাম্রশাসন মহোদয় বা কান্যকুব্জ হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল[২৯]। সুতরাং ৯০০ বিক্রমাব্দের (৮৪৩ খৃষ্টাব্দে) পূর্ব্বে কান্যকুব্জ প্রথম ভোজ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। দেবপালদেবের মৃত্যুর পরে ধর্ম্মপালের বংশে কেহ উত্তরাধিকারী না থাকায়

(২৪) গরুড়স্তম্ভলিপি, ৫—৭ শ্লোক; গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৭৮।৭৯

(২৫) ন ভ্রান্তং বিকটং ধনঞ্জয়তুলামারুহ্য বিক্রামতা
বিত্তান্যর্থিষু বর্ষতা স্তুতি গিরো নোদগর্ব্বমাকর্ণিতাঃ।
নৈবোক্তা মধুরং বহু প্রণয়িনঃ সম্বল্‌গিতাশ্চ শ্রিয়া
যেনৈবং স্বগুণৈর্জ্জগদ্বিসদৃশৈশ্চক্রে সতাং বিস্ময়ঃ ॥ ৯
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৭৩।

(২৬) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৮১।

(২৭) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৩০।

(২৮) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৩০-৩১।

(২৯) Epigraphia Indica, Vol, V, p, 211,

প্রথম গোপালদেবের দ্বিতীয় পুত্র বাক্‌পালের পৌত্র প্রথম বিগ্রহপাল বা প্রথম শূরপাল গৌড়-বঙ্গ মগধের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন।

দেবপালের সহিত বিগ্রহপালের সম্বন্ধ-নির্ণয় লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। স্বর্গীয় ডাং কীলহর্ণের মতানুসারে বিগ্রহপাল বা শূরপাল প্রথম গোপালদেবের দ্বিতীয় পুত্র বাক্‌পালের পৌত্র এবং জয়পালের পুত্র[৩০]। ডাঃ হর্ণলি ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বলিয়াছিলেন,—"তৃতীয় বিগ্রহ-পালের তাম্রশাসন দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, বিগ্রহপাল দেবপালের ভ্রাতুষ্পুত্র নহেন, তাঁহার পুত্র[৩১]।" শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এই মত সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন,—"রচনারীতির প্রতি লক্ষ্য করিলে প্রথম বিগ্রহপালদেবকে দেবপালদেবের পুত্র বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। দেবপালদেবও অপুত্রক ছিলেন না। তাঁহার [মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসন [৫১—৫২ পংক্তিতে] রাজ্যপাল নামক তদীয় পুত্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত থাকিবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি যে পিতার জীবিতকালেই পরলোকগমন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণাভাব। গরুড়স্তম্ভ-লিপিতে [১৬ শ্লোকে] দেবপালের পরবর্ত্তী নরপাল শূরপাল নামে উল্লিখিত। সকলেই তাঁহাকে প্রথম বিগ্রহপাল বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম বিগ্রহপালের একাধিক নামের এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, যুবরাজ রাজ্যপালকে, শূরপালকে এবং প্রথম বিগ্রহপালকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয়। এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইলে, পালবংশীয় নরপালগণের প্রচলিত বংশাবলীর ভ্রম সংশোধন করিতে হইবে[৩২]।" মৈত্রেয় মহাশয়ের যুক্তি সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না; কারণ, খালিমপুরে আবিষ্কৃত ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনে যুবরাজ ত্রিভুবনপালের নাম দেখিতে পাওয়া যায়[৩৩]। কিন্তু প্রশস্তিমধ্যে অথবা অপর কোনও খোদিতলিপিতে ধর্ম্মপালের জীবিতকালে ত্রিভুবনপালের মৃত্যুর কথা উল্লিখিত নাই। ইহা হইতে কি প্রমাণ হইবে যে, ত্রিভুবনপাল ও দেবপাল অভিন্ন ব্যক্তি? রামপালচরিতে প্রথম পরিচ্ছেদে ২৩শে শ্লোকের টিকায় রামপালের পুত্র রাজ্যপালের উল্লেখ আছে[৩৪]; কিন্তু মনহলিতে আবিষ্কৃত মদনপালদেবের তাম্রশাসনে রাজ্যপালের নাম নাই[৩৫]। ইহা হইতে কি প্রমাণ হইবে যে, রাজ্যপাল, কুমার পাল বা মদনপালের নামান্তর? প্রথম বিগ্রহপাল এবং প্রথম শূরপালের একত্বের প্রমাণ অদ্যবিধ। নারায়ণপাল, প্রথম মহীপাল, তৃতীয় বিগ্রহপাল ও মদনপালের তাম্রশাসনে নারায়ণপালের পিতার নাম বিগ্রহপাল[৩৬], কিন্তু ভট্টগুরবমিশ্রের গরুড়-স্তম্ভলিপিতে দেবপালদেবের পরে ও নারায়ণপালদেবের পূর্ব্বে শূরপালের নাম উল্লিখিত আছে[৩৭]। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, শূরপাল প্রথম বিগ্রহপালের নামান্তর। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রথম বিগ্রহপালকে ডাঃ কীলহর্ণের মতানুসারে বাক্‌পালের পৌত্র ও জয়পালের পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া, শূরপালকে দেবপালের দ্বিতীয় পুত্র ঠিক করিয়াছেন[৩৮]। ইহা কখনই সম্ভব নহে। কারণ, গুরবমিশ্র নারায়ণপালের প্রধান অমাত্য, তিনি যে নারায়ণপালের পিতার নাম উল্লেখ না করিয়া, নারায়ণপালের পূর্ব্বে দেবপালের পুত্রের নামোল্লেখ

(৩০) Epigraphia Indica, Vol. VIII, Appendix I. p. 17.

(৩১) "It seems clear from this grant that Vigrahapala was not a nephew, but a son of Devapala; for the pronoun "his son" (tat-sunuh) must refer to the nearest preceding noun, which is Devapala. In the Bhagalpur grant this reference is obscured through the interpolation of an intermediate verse in praise of Jayapala, which makes to appear as if Vigrahapala were a son of Jayapala.—Centenary Review of the Asiatic Society of Bengal, Appendix II. p, 206.

(৩২) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৩৭, পাদটীকা।

(৩৩) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৬।

(৩৪) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III, p. 26.

(৩৫) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৫২।

(৩৬) গৌড়লেখমালা; পৃঃ ৫৮, ৯৩—৯৪, ১২৪, ১৪৯

(৩৭) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৭৪—৭৫।

(৩৮) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড) পৃঃ ২১৬

করিবেন, ইহা কখনই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের মতানুসারে জয়পাল ধর্ম্মপালের পুত্র[৩৯]; কারণ, নারায়ণপালের তাম্রশাসনে দেবপালকে জয়পালের 'পূর্ব্বজ' বলা হইয়াছে। নারায়ণপালের তাম্রশাসনের "রচনারীতি" লক্ষ্য করিলে জয়পালকে বাক্‌পালের পুত্র বলিয়াই বোধ হয়। কারণ, উক্ত তাম্রশাসনের চতুর্থ শ্লোকে ধর্ম্মপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাক্‌পালের গুণকীর্ত্তন করা হইয়াছে এবং তাহার পরের শ্লোকেই জয়পালের গুণকীর্ত্তন আছে। এই স্থানে কেবল 'পূর্ব্বজ' শব্দের উপরে নির্ভর করিয়া জয়পালকে ধর্ম্মপালের পুত্র বলা বিজ্ঞানসম্মতপ্রণালীঅনুমোদিত নহে। ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনে বাক্‌পাল বা জয়পালের নাম নাই প্রথম বিগ্রহপাল এবং তদ্বংশীয় নরপতিগণের তাম্রশাসনসমূহে বাক্‌পাল ও জয়পালের উল্লেখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রশস্তিকারগণ নারায়ণপাল, দেবপালের বংশসম্ভূত নহেন বলিয়াই, নারায়ণপালের পিতা প্রথম বিগ্রহপালের পিতৃপিতামহের নামোল্লেখ করিয়াছেন। এই মত সমীচীন বলিয়া স্বীকার না করিলে নারায়ণপাল এবং তদ্বংশজাত নরপতিগণের তাম্রশাসনসমূহে বাক্‌পাল ও জয়পালের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। প্রথম বিগ্রহপাল যে জয়পালের পুত্র, বাক্‌পালের পৌত্র এবং তাঁহার নামান্তর যে শূরপাল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

প্রথম বিগ্রহপালদেব যে সময়ে গৌড়-বঙ্গ-মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, সে সময়ে গুর্জ্জরজাতি প্রথম ভোজদেবের অধীনে উত্তরাপথ-জয়ে ব্যাপৃত। ভোজদেব মিহির, আদিবরাহ, প্রভাস প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রাচীন খোদিত-লিপিমালায় পরিচিত। তিনি পঞ্চাশৎবর্ষের অধিক কাল কান্যকুব্জের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। ৮৪৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই কান্যকুব্জ তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল। কারণ, উক্ত বর্ষে তিনি একখানি তাম্রশাসন দ্বারা 'গুর্জ্জরত্রাভূমিতে' একখানি গ্রাম জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন[৪০]। ৯৩২ বিক্রমাব্দে (৮৭৫ খৃঃ অঃ) ভোজদেব কর্ত্তৃক নিযুক্ত গোপাদ্রির (Gwalior) শাসনকর্ত্তা অল্ল একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন[৪১]। ২৭৬ শ্রীহর্ষাব্দে (৮৯২ খৃঃ অঃ) পঞ্চনদ প্রদেশের প্রাচীন পৃথূদক (বর্ত্তমান পোহোবা) নগরও ভোজদেবের রাজ্যভুক্ত ছিল[৪২] প্রাচীন সৌরাষ্ট্রদেশ ভোজদেবের পুত্র মহেন্দ্রপালের রাজ্যভুক্ত ছিল[৪৩]। ইহা হইতে ভিন্সেণ্ট স্মিথ অনুমান করেন যে, সৌরাষ্ট্র দেশ ভোজদেব কর্ত্তৃকই বিজিত হইয়াছিল[৪৪]। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইন্দ্রের প্রপৌত্র ধ্রুবরাজদেব (দ্বিতীয় ধ্রুব) ৭৮৯ শকাব্দে (৮৬৭ খৃঃ অঃ) মিহির বা ভোজদেবকে পরাজিত করিয়াছিলেন[৪৫]। ভোজদেব যে সময়ে সৌরাষ্ট্র আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে দক্ষিণাপথেশ্বর প্রথম অমোঘবর্ষের আদেশে দ্বিতীয় ধ্রুব বা ধ্রুবরাজদেব তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিয়াছেলেন। এই সময়ে গুর্জ্জরগণের প্রতাপে ভীত হইয়া রাষ্ট্রকূটরাজগণ সিন্ধুদেশের মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণের সহিত সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। কান্যকুব্জ বিজিত হইলে ভোজদেব পাল-সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমা আক্রমণ করিয়াছিলেন। দেবপালদেবের রাজ্যের শেষভাগ বোধ হয়, প্রথম ভোজদেবের সহিত যুদ্ধে ব্যয় হইয়াছিল। প্রথম বিগ্রহপাল ও নারায়ণপাল ভোজদেবের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন এবং নারারণপালের রাজ্যকালে

(৩৯) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৬৫, পাদটীকা।
(৪০) Epigraphia Indica, Vol. V, p. 211.
(৪১) Ibid. Vol. I. p. 156.
(৪২) Ibid p 186.
(৪৩) Ibid. Vol. IX. p. 3
(৪৪) V. A. Smith's Early History of India (3rd edition) p. 379.
(৪৫) ধারাবর্ষসমুন্নতিং গুরুতরামালোক্য লক্ষ্ম্যা যুতো ধামব্যাপ্তদিগন্তরোপি মিহিরঃ সদশ্ববাহান্বিতঃ
যাতঃ সোপি শমং পরাভবতমোব্যাপ্তাননঃ কিং যুনর্যেতীবমলতেজসা বিরহিতা হীনাশ্চ দীনা ভুবি ॥৪১
—Indian Antiquary Vol. XII, p. 184.

পাল-রাজগণ মগধ ও তীরভুক্তির অধিকাংশ ভোজদেবকে প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রথম বিগ্রহপালের রাজত্বকালে ধর্ম্মপালের সাম্রাজ্যের কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা অবগত হইবার কোন উপায়ই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। বিগ্রহপাল হৈহয় (অর্থাৎ চেদী বা কলচুরি) রাজবংশের কন্যা লজ্জাদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভট্টগুরবমিশ্রের পিতা কেদারমিশ্র শূরপালের মন্ত্রী ছিলেন। গুরবমিশ্রের গরুড়স্তম্ভলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, "সেই বৃহস্পতি-প্রতিকৃত (কেদারমিশ্রের) যজ্ঞস্থলে সাক্ষাৎ ইন্দ্রতুল্য শত্রুসংহারকারী নানা সাগর-মেখলাভরণা বসুন্ধরার চিরকল্যাণকামী শ্রীশূরপাল (নামক) নরপাল স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, অনেকবার শ্রদ্ধাসলিলাপ্লুতহৃদয়ে, নতশিরে, পবিত্র (শান্তি)-বারি গ্রহণ করিয়াছিলেন[৪৬]।" প্রথম বিগ্রহপাল বা প্রথম শূরপালদেবের পুত্র নারায়ণপালদেবের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে জয়পালের "অজাতশত্রুর ন্যায় শ্রীমান্ বিগ্রহপাল নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার (বিমল জলধারার ন্যায়) বিমল অসিধারায় শত্রু বনিতাবর্গের (সধবাজনোচিত) অঙ্গরাগ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তিনি শত্রুবর্গকে গুরুতর বিপদভোগের পাত্র এবং সুহৃদবর্গকে যাবজ্জীবন সম্পৎসম্ভোগের পাত্র করিয়াছিলেন[৪৭]।" প্রথম বিগ্রহপাল বা প্রথম শূরপালদেবের দুইখানি মাত্র শিলালিপি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই লিপিদ্বয় দুইটি বুদ্ধমূর্ত্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ আছে। এই মূর্ত্তিদ্বয় সম্ভবতঃ পাটনা জিলার বিহার নগরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল; কারণ, উভয় খোদিতলিপিতেই উদ্দণ্ডপুরের উল্লেখ আছে। বিহার নগরের প্রাচীন নাম। এই খোদিতলিপিদ্বয়ে প্রথম বিগ্রহপাল শূরপাল নামে উল্লিখিত হইয়াছেন এবং এইগুলি তাঁহার তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে হইয়াছিল। পূর্ণদাস নামক সিন্ধুদেশীয় জনৈক বৌদ্ধ-প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষু এই মূর্ত্তিদ্বয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন[৪৮]। প্রথম বিগ্রহপালদেব বোধ হয়, অতি অল্পকাল রাজ্য ভোগ করিয়া পরলোকগত হইয়াছিলেন।

প্রথম বিগ্রহপালের পরে হৈহয়বংশীয়া-রাজকুমারী লজ্জাদেবীর গর্ভজাত নারায়ণপালদেব গৌড়-বঙ্গ-মগধের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। নারায়ণপাল অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল গৌড়ের সিংহাসনে আসীন ছিলেন এবং তাঁহার সময়েই পালরাজবংশের অধিকার পরহস্তগত হইয়াছিল। নারায়ণপাল ভোজদেবের অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী রাজত্বকালের শেষার্দ্ধের সময়ে, তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। গুর্জ্জর-রাজ প্রথম ভোজদেব বারাণসী অধিকার করিয়া মগধ আক্রমণ করিয়াছিলেন। ভোজদেব সাগরতলে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে ভোজদেব তাঁহার প্রবল শত্রু বঙ্গদিগকে তাঁহার কোপ-বহ্নিতে দগ্ধ করিয়াছিলেন[৪৯]। ভাগলপুরে আবিষ্কৃত নারায়ণপালের তাম্রশাসনে কিন্তু এমন কোন কথা নাই, যদ্দ্বারা তৎকর্ত্তৃক গুর্জ্জর-রাজের পরাজয় সূচিত হইতে পারে। সুতরাং এতদ্দ্বারা

(৪৬ যস্যেজ্যাসু বৃহস্পতিপ্রতিকৃতেঃ শ্রীশূরপালো নৃপঃ
সাক্ষাদিন্দ্র ইব ক্ষতাপ্রিয়বলো গত্বৈব ভূয়ঃ স্বয়ং।
নানাম্ভোনিধিমেখলস্য জগতঃ কল্যাণসঙ্গী (?) চিরং
শ্রদ্ধাম্ভঃপ্লুতমানসো নতশিরা জাগ্রত পূতম্পয়ঃ ॥১৫
—গৌড়লেখমালা পৃঃ ৭৪।

(৪৭) শ্রীমান্ বিগ্রহপালস্তৎসূনুরজাত শত্রুরিব জাতঃ
শত্রুবনিতাপ্রসাধন-বিলোপিবিমলাসি-জলধারঃ ॥
রিপবো যেন গুর্বীণাং বিপদামাস্পদীকৃতাঃ।
পুরুষায়ুষ দীর্ঘানাং সুহৃদঃ সম্পদামপি ॥ ৮
গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৫৮।

(৪৮) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৫ শঃ ভাগ, পৃঃ ১২।

(৪৯) যস্য বৈরিবৃহদ্বঙ্গান্ দহতঃ কোপবহ্নিনা।
প্রতাপাদর্ণসাং রাশীন্ পাতুর্বৈতৃষ্ণমাবভৌ ॥" ২১
—Annual Report of the Archacological Survey of India, 1903-4 pp. 282-84.

স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে নারায়ণপালই গুর্জ্জর-রাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। ভোজদেব যে সামন্ত-রাজগণের সহিত গৌড়-রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে দুইজনের বংশধরগণের খোদিতলিপিতে গৌড়াভিযানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন মাণ্ডব্যপুরের (বর্ত্তমান মাণ্ডোর, যোধপুর-রাজ্য প্রতীহার-বংশীয় অধিপতি কক্ক গৌড়-যুদ্ধে মুদ্গগিরিতে, অর্থাৎ মুঙ্গেরে, যশোলাভ করিয়াছিলেন [৫০]। কক্কের পুত্র বাউকের একখানি শিলালিপি যোধপুরে আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহাতে এই ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যোধপুরের শিলালিপি ডাঃ বুলারের মতানুসারে বাউকের চতুর্থ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হইয়াছিল [৫১]। কিন্তু পণ্ডিত দেবীপ্রসাদের মতানুসারে উহা ৯৪০ বিক্রমাব্দে (৮৮৩ খৃঃ অঃ) উৎকীর্ণ হইয়াছিল [৫২]। কক্কের অপর পুত্র কক্কুকের একখানি শিলালিপি যোধপুর-রাজ্যের ঘটিয়ালা গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে; কিন্তু ইহাতে কক্কের গৌড়-যুদ্ধের কোনই উল্লেখ নাই। এই শিলালিপি ৯১৮ বিক্রমাব্দে (৮৬১ খৃঃ অঃ) উৎকীর্ণ হইয়াছিল [৫৩]। সুতরাং ইহা স্থির যে, ৯১৮ হইতে ৯৪০ বিক্রমাব্দের মধ্যে কোন সময়ে কক্ক মুদ্গগিরিতে গৌড়েশ্বরের সহিত যুদ্ধে যশোলাভ করিয়াছিলেন। প্রথম শঙ্করগণের পুত্র প্রথম গুণাম্ভোধিদেব ভোজদেবের সহিত মিলিত হইয়া অথবা তাঁহার সামন্তরূপে গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। প্রথম গুণাম্ভোধিদেবের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ সোঢ়দেব ১১৩৪ বিক্রমাব্দে (১০৭৭ খৃঃ অঃ) সরযূ-পারের অধিপতি ছিলেন। গোরখপুর জেলায় কহ্লা গ্রামে আবিষ্কৃত তাঁহার তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, প্রথম গুণাম্ভোধিদেব গৌড়রাজ-লক্ষ্মী হরণ করিয়াছিলেন [৫৪]।

নারায়ণপালদেবের রাজ্যের প্রথমাংশে সমগ্র মগধ তাঁহার অধীন ছিল। কারণ, তাঁহার সপ্তম রাজ্যাঙ্কে ভাণ্ডদেব নামক জনৈক ব্যক্তি গয়া নগরে একটি আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। গয়ায় বিষ্ণুপদমন্দিরের প্রাঙ্গণে ভাণ্ডদেবের শিলালিপি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে [৫৫]। নারায়ণপালের নবম রাজ্যাঙ্কে অঙ্গ বিষয়ের অধিবাসী ধর্ম্মমিত্র নামক জনৈক ভিক্ষু মগধের কোন স্থানে (সম্ভবতঃ উদ্দণ্ডপুর নগরে) একটী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন [৫৬]। এই শিলালিপি এখন কলিকাতার চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। নারায়ণপালদেবের সপ্তদশ রাজ্যাঙ্কে তিনি মুদ্গগিরিসমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে তীরভুক্তি (তীরহুত) কক্ষবিষয়ে অবস্থিত মকুতিকা গ্রাম কলশপোতে স্বনির্ম্মিত সহস্র মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মহাদেবের এবং পাশুপত আচার্য্যপরিষদের ব্যবহারার্থ প্রদান করিয়াছিলেন [৫৭]। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে,

(৫০) ততোঽপি শ্রীযুতঃ কক্কঃ পুত্রো জাতো মহামতিঃ।
যশো মুদ্গগিরৌ লব্ধং যেন গৌড়ৈ[ঃ]সমং রণে ॥
—Journal of the the Royal Asiatic Society, 1894, p. 7.

(৫১) Ibid—p. 3.

(৫২) Ibid, 1295, p. 514.

(৫৩) Ibid, p. 518.

(৫৪ তৎসূনুর্দ্ধাম ধাম্নাং নিধিরধিকধিয়াং ভোজদেবাপ্তভূমিঃ
প্রত্যাবৃত্যপ্রকারঃ প্রথিতপৃথুযশাঃ শ্রীগুণাম্ভোধিদেবঃ।
যেনোদ্দামৈকদর্পদ্বিপঘটিতঘটাঘাতসংসক্তমুক্তা-
সোপানোদ্দন্তরাসিপ্রকটপৃথুপতেনাহিতা গৌড়লক্ষ্মীঃ ॥৯
—Epigraphia Indica, Vol. VII, p. 89.

(৫৫) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V, pp. 60—61.

(৫৬) Ibid, p. 62; বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৫শ ভাগ, পৃঃ ১৩।

৫৭) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৬০—৬১।

নারায়ণপালের সপ্তদশ রাজ্যাঙ্ক পর্য্যন্ত মুদ্গগিরি বা মুঙ্গের এবং তীরভুক্তি বা তীরহুত তাঁহার অধিন ছিল। অনুমান হয় ইহার পরেই মগধ, তীরভুক্তি ও অঙ্গ ভোজদেব কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিল। নারায়ণপাল-দেবের ৫৪ রাজ্যাঙ্কে উদ্দণ্ডপুরে জনৈক বণিক একটী পিত্তলময়ী পার্ব্বতী-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই মূর্ত্তিটি শ্রীযুক্ত চিরসুখ সান্যাল মহাশয়ের নিকট ছিল এবং ইহা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় প্রদত্ত হইয়াছে[৫৭]। কেদারমিশ্র ও তাঁহার পুত্র গুরবমিশ্র নারায়ণপালের মন্ত্রী ছিলেন[৫৮]। ভাগলপুরে আবিষ্কৃত নারায়ণপালের তাম্রশাসনে গুরবমিশ্রই দূতরূপে উল্লিখিত হইয়াছিলেন। নারায়ণপালেব একমাত্র পুত্রের নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে[৫৯]। তাঁহার নাম রাজ্যপাল। নারায়ণ-পাল সম্ভবতঃ পঞ্চান্ন বৎসর রাজত্ব করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

নারায়ণপালের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র রাজ্যপাল গৌড়-বঙ্গের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত বাণগড়ে আবিষ্কৃত প্রথম মহীপালদেবের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, রাজ্যপাল বহু গভীর জলাশয় এবং উচ্চদেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া কীর্ত্তিলাভ করিয়াছিলেন[৬০]। রাজ্যপাল রাষ্ট্রকূটবংশীয় তুঙ্গ নামক জনৈক নরপতির কন্যা ভাগ্যদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া-ছিলেন[৬১]। নালন্দার ধ্বংসাবশেষ মধ্যে রাজ্যপালের ২৪ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ খোদিতলিপিযুক্ত একটি স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই স্তম্ভটি বড়গাঁও গ্রামে একটি আধুনিক জৈন-মন্দিরে রক্ষিত আছে[৬২]। তাঁহার এক-মাত্র পুত্রের নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইনিই দ্বিতীয় গোপালদেব। রাজ্যপালের শ্বশুরের প্রকৃত পরিচয় অদ্যাপি স্থির হয় নাই। স্বর্গীয় ডাঃ কিল্‌হর্ণ অনুমান করিয়াছিলেন যে, রাষ্ট্রকূট-রাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণের পুত্র জগত্তুঙ্গই রাজ্য-পালের শ্বশুর[৬৩]। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু অনুমান করেন যে, শুভতুঙ্গ উপাধিধারী দ্বিতীয় কৃষ্ণই রাজ্যপালদেবের শ্বশুর[৬৪]। তুঙ্গধর্ম্মাবলোক নামক জনৈক বাজার এক-খানি শিলালিপি বহুকাল পূর্ব্বে বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত

---

(৫৭)।. এই খোদিতলিপি একটি পিত্তলমূর্ত্তির পশ্চাদ্ভাগে উৎকীর্ণ আছে।

"ওঁ দেয় [ধর্ম্মো]য়ং শ্রীনারায়ণপাল দেবরাজ্যে সম্বৎ ৫৪, শ্রীউদণ্ডপুর [র] বাস্তব্য রাণক উছপুত্র ঠারুকস্য।"

পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় আমাকে এই মূর্ত্তির চিত্র ও খোদিতলিপি ব্যবহার করিবার অনুমতি দিয়া বাধিত করিয়াছেন। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এই খোদিতলিপির অধিকাংশের পাঠোদ্ধার করিয়াছেন।

(৫৮) কুশলো গুণবান্ বিবেক্তুং বিজিগীষু র্যন্ন পশ্চ বহুমেনে।
শ্রীনারায়ণপালঃ প্রশস্তিরপরাস্তকা তস্য ॥১৯
—গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৭৫।

(৫৯) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৯৪।

(৬০) তোয়া [শ] য়ৈ র্জ্জলধি [মুল] গভীরগর্ভৈ-
র্দ্দেবালয়ৈশ্চ[্]কুলভুধরতুল্য-কক্ষৈঃ ॥
বিখ্যাতকীর্ত্তির[ভব]ত্তনয়শ্চ তস্য
শ্রীরাজ্যপাল ইতি মধ্যমলোক-পালঃ ॥৭
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৯৪।

(৬১) তস্মাৎ পূর্ব্বক্ষিতিধ্রান্নিধিরিব মহসাং[রাষ্ট্র]কূঠা [ন্ব] য়েন্দো
স্তুঙ্গস্যোত্তুঙ্গমৌলের্দ্দুহিতর তনয়ো ভাগ্যদেব্যাং প্রসূতঃ।
শ্রীমান্ গোপালদেবশ্চিরত্তরম [বনেরেক] পত্ন্যা ইবৈকো
ভর্ত্তভুর্নৈক-[রত্নদ্যু]তি-খচিত-চতুঃসিন্ধুচিত্রাংশুকায়াঃ ॥৮
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৯৪।

(৬২) Indian Antiquary, 1917, Vol. XLVII, p. 111.

(৬৩) Journal of the Asiatic Society of Bengal 1892. pt. I, p 80.

(৬৪) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড) পৃঃ ১২৮।

হইয়াছিল। স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই শিলা-লিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন[৬৬]। সম্ভবতঃ ইনিই রাজ্যপালদেবের শ্বশুর।

প্রথম ভোজদেবের পুত্র, মহেন্দ্রপাল, পিতার মৃত্যুর পরে প্রতীহারবংশের বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহেন্দ্রপালদেবের রাজ্যকালে তীরভুক্তি মগধ পাল-রাজগণের হস্তচ্যুত হইয়া প্রতীহার-সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। এই প্রদেশদ্বয়ে মহেন্দ্রপালদেবের অধিকার-সূচক একখানি তাম্রশাসন ও কয়েকখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহেন্দ্রপালদেবের অষ্টম রাজ্যাঙ্কে গয়ার নিকটে ফল্গু নদীর অপর পারে রামগয়ায় সহদেব নামক এক ব্যক্তি বিষ্ণুর দশাবতারের একটি প্রস্তর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন[৬৭]। ৯৫৫ বিক্রমাব্দে (৮৯৮ খৃঃ অঃ) মহেন্দ্রপালদেব শ্রাবস্তিভুক্তির অন্তর্গত শ্রাবস্তিবিষয়ে একখানি গ্রাম জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন[৬৮]। গয়া জেলায় গুণেরীয়া গ্রামে মহেন্দ্রপালের নবম রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রস্তরমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে[৬৮]। তাঁহার নবম রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত একটি মূর্ত্তির খোদিতলিপি চিত্র হইতে তাহার পাঠোদ্ধার সম্পন্ন হইয়াছে। অপর মূর্ত্তিটি স্বর্গীয় কাপ্তেন কিটো (kittoe) দর্শন করিয়াছিলেন[৬৯]। কিন্তু ইহার খোদিতলিপির কোন চিত্র বা প্রতিলিপি প্রকাশিত হয় নাই। সম্প্রতি হাজারিবাগ জেলায় ইটা-খোরী গ্রামে মহেন্দ্রপালের রাজ্যকালে প্রতিষ্ঠিত আর একটি প্রস্তর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে[৭০]। মহেন্দ্রপালদেব বোধ হয় বৃদ্ধাবস্থায় কান্যকুব্জের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং অধিক দিন রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই[৭১]। তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রথমা মহিষী দেহনাগাদেবীর গর্ভজাত পুত্র দ্বিতীয় ভোজদেব কান্যকুব্জের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন[৭২]। দ্বিতীয় ভোজদেব বোধ হয় নির্ব্বিবাদে কান্যকুব্জের সিংহাসন প্রাপ্ত হন নাই। চেদী বংশীয় প্রথম কোকল্লদেব তাঁহাকে সাহায্য করিয়া পিতৃসিংহাসনে উপবেশন করাইয়াছিলেন। বিলহরিতে আবিষ্কৃত চেদিবংশীয় রাজগণের শিলালিপিতে অবগত হওয়া যায় যে, প্রথম কোকল্ল পৃথিবীতে দুইটি অপূর্ব্ব কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন; উত্তরে প্রথম কীর্ত্তিস্তম্ভ ভোজদেব ও দক্ষিণে দ্বিতীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ দ্বিতীয় কৃষ্ণ বা অকালবর্ষ[৭৩]। কোকল্লদেবের উত্তরপুরুষ প্রসিদ্ধ বীর, সম্রাট্ কর্ণদেবের বারাণসীতে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কোকল্লদেব ভোজ, বল্লভরাজ, চিত্রকূট-ভূপাল এবং শঙ্করগণকে অভয় প্রদান করিয়া-

(৬৫) Buddha-Gaya. p. 195. pl XL

(৬৬) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V, p. 64.

(৬৭) Indian Antiquary, Vol. XV, pp. 306—7.

(৬৮) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V, p, 64

(৬৯) One mentions the fact of the party having apostatized, and again returntd to the worship of the Sakya, in the 19th year of the reign of Sir Mahendrapaladeva, Journal of the Asiatic Soeiety of Bengal, Vol, XVII, 1848, p. 234, মগধে আবিষ্কৃত মহেন্দ্রপালের রাজ্যকালে প্রতিষ্ঠিত দুইটি মূর্ত্তী লণ্ডনের ব্রিটিস মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।—Nachrichten von der Koniglichen Gesselschaft der Wissenschaften zu Gottingen, Philologische-historische klasse, 1904, p, 210—11,

(৭০) Annual Report of the Patna Museum, 1920-21, p, 44,

(৭১) Journal of the Royal Asiatic Society, 1909, p, 265,

(৭২) Indian Antiquary, Volf XV, p, 140,

(৭৩) জিত্বা কৃৎস্নাং যেন পৃথ্বীমপূর্ব্বকীর্ত্তিস্তম্ভ-দ্বন্দ্বমারোপ্যতে স্ম।
কৌম্ভোদ্ভবাদ্দিশ্যসৌ কৃষ্ণরাজঃ কৌবেরীঞ্চ শ্রীনিধির্ভোজদেবঃ॥ ১৭
—Epigraphia Indica, Vol, I, p 256,

ছিলেন[৭৪]। বল্লভরাজ অর্থে দ্বিতীয় কৃষ্ণ এবং চিত্রকূট-ভূপাল বলিতে চন্দেল্লরাজ হর্ষদেবকে বুঝায়[৭৫]। হর্ষ ও দ্বিতীয়কৃষ্ণ যাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তি তিনি কখনই প্রথম ভোজদেবের সমকালীন হইতে পারেন না। সুতরাং কর্ণদেবের তাম্রশাসনে উল্লিখিত 'ভোজ', গুর্জ্জরবংশীয় দ্বিতীয় ভোজদেব। দ্বিতীয় কৃষ্ণ কোকল্লদেবের এক কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন[৭৬]। তিনি কোন এক গুর্জ্জর-রাজকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া গৌড়বঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন; তাঁহার উত্তরপুরুষগণের তাম্রশাসনে তাঁহাকে 'গৌড়ানাং বিনয়ব্রতার্পণগুরু' উপাধিতে ভূষিত দেখিতে পাওয়া যায়[৭৭]। দ্বিতীয় কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরাজিত গুর্জ্জর-রাজ বোধ হয়, দ্বিতীয় ভোজদেব অথবা তাঁহার ভ্রাতা মহীপালদেব এবং রাজ্যপালই বোধ হয়, তাঁহার আক্রমণের সময়ে গৌড়ের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। গুর্জ্জরবংশীয় দ্বিতীয় ভোজদেব অতি অল্পকাল রাজত্ব করিয়া পরলোকগত তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহীপালদেব গুর্জ্জর-সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন[৭৮]। মহীপালের সময় হইতে প্রতীহার-গুর্জ্জর-সাম্রাজ্যের ধ্বংস আরম্ভ হয়। তাঁহার অভিষেকের অতি অল্পকাল পরে দ্বিতীয় কৃষ্ণের পৌত্র তৃতীয় ইন্দ্র উত্তরাপথ আক্রমণ করিয়া গুর্জ্জর-রাজধানী কান্যকুব্জ ধ্বংস করিয়াছিলেন[৭৯]। তৃতীয় ইন্দ্রের নরসিংহ নামধেয় জনৈক সামন্ত যমুনা পার হইয়া পলায়নপর মহীপালের অনুসরণ করিতে সাগর-সঙ্গমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে তাঁহার অশ্বকে স্নান করাইয়াছিলেন[৮০]।

রাজ্যপালদেবের মৃত্যুর পরে, তৎপুত্র দ্বিতীয় গোপাল গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় গোপালদেব যখন গৌড়েশ্বর, তখন মহীপালদেব গুর্জ্জর-সাম্রাজ্যের অধিপতি। রাষ্ট্রকূট-বংশীয় তৃতীয় ইন্দ্র যখন উত্তরাপথ আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে বোধ হয়, গোপালদেব অপহৃত পিতৃরাজ্যের কিয়দংশ উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; কারণ মগধে তাঁহার রাজ্যকালে

---

(৭৪) ভোজ বল্লভরাজে শ্রীহর্ষে চিত্রকূট-ভূপালে।
শঙ্করগণে চ রাজনি যস্যাসীদভয়দঃ পাণিঃ ॥ ৭
—Epigraphia Indica, Vol, II, p. 306,

(৭৫) সহস্রার্জ্জুনবংশস্য ভূষণং কোক্কলাত্মজা।
তস্যাভবন্মহাদেবী জগত্তুঙ্গস্ততোজনি ॥ ১৪
—কম্বায় নগরে আবিষ্কৃত চতুর্থ গোবিন্দের তাম্রশাসন।
Epigraphia Indica, Vol, VII, p, 38.

(৭৭) তস্যোত্তর্জ্জিতগুর্জ্জরো হৃতহটল্লাটোদ্ভটশ্রীমদো
গৌড়ানাং বিনয়ব্রতার্পণগুরুসামুদ্রনিদ্রাহরঃ।
দ্বারস্থাঙ্গকলিঙ্গমগধৈরভ্যর্চ্চিতাজ্ঞশ্চিরং
সূনুঃসনৃতবাগভুবঃ পরিবৃঢ় শ্রীকৃষ্ণরাজোভবৎ ॥১৩
—দেউলীতে আবিষ্কৃত ৩য় কৃষ্ণের তাম্রশাসন—Epigraphia Indica Vol V, p 193

(৭৮) Journal of the Royal Asiatic Society, 1909, p 269

(৭৯) যন্মাত্মদদ্বিপদন্তঘাতবিষমং কালপ্রিয়প্রাঙ্গণং
তীর্ণা যত্তুরগৈরগাধযমুনা সিন্ধুপ্রতিস্পর্দ্ধিনী।
যেনেদং হি মহোদয়ারিনগরং নির্ম্মূলমুন্মূলিতং
নাম্নাদ্যাপি জনৈঃ কুশস্থলমিতি খ্যাতিং পরাং নীয়তে ॥১৯
কম্বায় নগরে আবিষ্কৃত চতুর্থ গোবিন্দের তাম্রশাসন।
Epigraphia Indica, Vol, VII, p 38

(৮০) কাণাড়া ভাষায় পম্পরাজ-রচিত 'কর্ণাটকশব্দানুশাস' (Edited by Lewis Rice) পৃঃ ২৬।

প্রতিষ্ঠিত দুইটি মূর্ত্তি ও তাঁহার রাজ্যকালে মগধে লিখিত লিখিত একখানি বৌদ্ধগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় গোপালদেবের প্রথম রাজ্যাঙ্কে নালন্দ নগরে একটি বাগেশ্বরী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল[৮১]। তাঁহার রাজ্যকালে কোন সময়ে শক্রসেন নামক এক ব্যক্তি বুদ্ধগয়ায় একটি বুদ্ধ-প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই মূর্ত্তির পাদপীঠমাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে[৮২]। তাঁহার পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কে মগধে বিক্রমশিলা-বিহারে একখানি 'অষ্ট-সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা লিখিত হইয়াছিল[৮৩]। দ্বিতীয় গোপালদেবের মৃত্যুর পরে তৎপুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপাল গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় গোপালদেবের রাজ্যের শেষভাগে অথবা দ্বিতীয় বিগ্রহ-পালের রাজ্যকালে চন্দেল্লবংশীয় যশোবর্ম্মা গৌড়দেশ গৌড়দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন খজুরাহো গ্রামে আবিষ্কৃত যশোধর্ম্মদেবের শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি ১০১১ বিক্রমাব্দের (৯৫৪ খৃঃ অঃ) পূর্ব্বে গৌড়, কোশল, কাশ্মীর, মিথিলা মালব, চেদী, কুরু ও গুর্জ্জর-রাজগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন[৮৪]। অনুমান হয় দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকালেই পালবংশীয় রাজগণ গৌড়দেশের অধিকারচ্যুত হইয়াছিলেন। কারণ, ৮৮৮ শকাব্দে (অর্থাৎ ৯৬৬ খৃঃ অঃ) কাম্বোজবংশীয় জনৈক নরপতি কতৃক একটি শিবমমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল[৮৫] ইতিপূর্ব্বে দেবপালের রাজ্যকালে গৌড়রাজ্য একবার কাম্বোজ জাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল[৮৬]। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ অনুমান করেন যে, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে হিমালয় পর্ব্বতবাসী কাম্বোজ জাতি উত্তর-বঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিল এবং উত্তরবঙ্গের বর্ত্তমান অধিবাসী কোচ, মেচ ও পলিয়া জাতি সেই জাতি সেই কাম্বোজগণের বংশধর[৮৭]। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কাম্বোজাতীয় গৌড়রাজগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনাকালে বলিয়াছেন যে, কাম্বোজজাতীয় রাজবংশ বোম্বাই প্রদেশের কম্বায় বা খম্বায়ৎ অধিবাসী[৮৮]। কাম্বোজবংশীয় গৌড়রাজগণ যে বিদেশীয় ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় বিগ্রহপাল গৌড়দেশ হারাইয়া বোধ হয় রাঢ়ে অথবা বঙ্গদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ২৬শ রাজ্যাঙ্কে লিখিত একখানি 'পঞ্চরক্ষা' গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে[৮৯]। এতদ্ব্যতীত দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকালের কোন নিদর্শন অদ্যাবধি

---

(৮১) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৮৭।

(৮২) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৮৯।

(৮৩) পরমেশ্বরপরমভট্টারকপরমসৌগত মহারাধিরাজশ্রীমদ্গোপালদেব প্রবর্দ্ধমানকল্যাণবিজয়রাজ্যেত্যাদি সম্বৎ ১৫ অশ্বিনে দিনে ৪ শ্রীমদ্বিক্রমশীলদেববিহারে লিখিতেয়ং ভগবতী।

—Journal of the Royal Asiatic Society, 1910, pp, 150-51,

(৮৪) গৌড়ক্রীড়ালতাসিস্তুলিতখসবলঃ কোশলঃ কোশলানাং
নশ্যৎকাশ্মীরবীরঃ শিথিলিতমিথিলঃ কালবনমালল্লানাং।
সীদৎসাবদ্যচেদিঃ কুরুতরুষু মরুৎসংজ্বরো গূর্জ্জরাণাং
তস্মাত্তস্মাৎ স যজ্ঞে নৃপকুলতিলকঃ শ্রীযশোবর্ম্মরাজঃ ॥২৩

—খজুরাহো গ্রামে লক্ষ্মণজি মন্দিরের শিলালিপি,—Epigraphia Indica Vol, I, p, 126,

(৮৫) Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series Vol, VII, p, 690

(৮৬) ২০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৮৭) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৩৭।

(৮৮) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড) পৃঃ ১৭২।

(৮৯) পরমেশ্বরপরভট্টারকপরমসৌগত মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্বিগ্রহপালদেবস্য প্রবর্দ্ধমান বিজয়রাজ্যে.........সম্বৎ ২৬ আষাঢ় দিন ২৪।

—Bendall, Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the British Museum, p, 232 ; Journal of the Royal Asiatic Society 1910, p. 151,

আবিষ্কার হয় নাই। গুর্জ্জর-রাজ মহীপাল বোধ হয় এই সময়ে চন্দেল্লবংশীয় যশোবর্ম্মদেবের সাহায্যে মগধ ও অঙ্গ পুনরধিকার করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মপাল ও দেবপালদেবের রাজ্যকালে গৌড়-মগধ-বঙ্গে শিল্পের চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। মগধ ও গৌড় প্রস্তর-শিল্পের জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধ, বহুবিধ ধাতু প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তি এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নারায়ণপালের পরে পালরাজবংশের অবনতির সহিত গৌড়ীয় শিল্পেরও অবনতি আরব্ধ হইয়াছিল। পাল-রাজবংশের অবনতির সময়ে বঙ্গে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। অনুমান হয় যে, দেবপালের রাজ্যের শেষভাগে খড়্গোদ্যম এই রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। খড়্গোদ্যমের পরে তাঁহার পুত্র জাতখড়্গ ও পৌত্র দেবখড়্গ বঙ্গের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। দেবখড়্গের ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ দুইখানি তাম্রশাসন হইতে এই রাজবংশের বিবরণ অবগত হওয়া যায়[৯০]। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু দেবখড়্গকে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক বলিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন[৯১]। দেবখড়্গের তাম্রশাসনদ্বয়ের অক্ষর দেখিয়া তাঁহাকে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর পূর্ব্বের লোক বলিতে ভরসা হয় না।

খড়্গবংশের অধঃপতনের পরে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী চন্দ্র-বংশীয় রাজগণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। এই বংশের আদিপুরুষ রোহিতগিরি বা রোহিতাশ্ব (রোহ্‌তাস্ গড়) পর্ব্বতের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার নাম পূর্ণচন্দ্র। পূর্ণ-চন্দ্রের পুত্র সুবর্ণচন্দ্রও রাজা বলিয়া উল্লিখিত হন নাই। সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে (হরিকেল চন্দ্রদ্বীপে) রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্রদেবের অন্ততঃ তিনখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীচন্দ্রদেবের মাতার নাম কাঞ্চনা এবং বিক্রমপুরে তাঁহার রাজধানী ছিল। প্রথম তাম্রশাসন দ্বারা শ্রীচন্দ্রদেব পৌণ্ড্রভুক্তিতে নান্য-মণ্ডলে নেহকষ্ঠিগ্রামে এক পাটক ভূমি শাণ্ডিল্যগোত্রীয়, মক্করগুপ্তের প্রপৌত্র, বরাহগুপ্তের পৌত্র, সুমঙ্গলগুপ্তের পুত্র কোটিহোমিক শান্তিবারিকপীতগুপ্তশর্ম্মাকে ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশে দান করিয়াছিলেন[৯২]। এই তাম্রশাসন-খানি ঢাকা জেলার অন্তর্গত রামপাল গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। দ্বিতীয় তাম্রশাসনখানি স্বর্গীয় গঙ্গামোহন লস্কর কর্ত্তৃক ফরিদপুর জেলার ইদিলপুর পরগণার কোন গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং ঢাকা রিভিউ পত্রে ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত র‍্যাঙ্কিন (J. T. Rankin, I. C. S.) এই তাম্রশাসন সম্বন্ধে ৺গঙ্গামোহন লস্কর লিখিত একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন[৯৩]। তদনুসারে শ্রীচন্দ্রদেব সতটপদ্মাবাটী বিষয়ে কমার তালকমণ্ডলে লেলিয়াগ্রামে কিঞ্চিৎ ভূমি দান করিয়াছিলেন। তৃতীয় তাম্রশাসনখানি ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর মহকুমায় কেদারপুর গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা প্রদত্ত হয় নাই, রাজকার্য্যালয়ে ভূমিদান সম্বন্ধে রাজাদেশে প্রদত্তভূমির আদেশ লিপিবদ্ধ করিবার জন্যই প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল সেই জন্যই ইহাতে কেবল বংশ-পরিচয়মাত্র উৎকীর্ণ আছে[৯৪]। এই শ্রীচন্দ্রের বংশধরগণ পরে পাল রাজগণের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং গোবিন্দচন্দ্র নামক একজন পরবর্ত্তী রাজা প্রথম রাজেন্দ্র চোল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। এই গোবিন্দচন্দ্র প্রথম মহীপালদেবের সমসাময়িক।

(৯০) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, vol, I, pp 85-91,

(৯১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড) পৃঃ ১৪৭ পাদটীকা ৭।

(৯২) Epigraphia Indica, Vol, XII, pp, 136—42,

(৯৩) Dacca Review, October, 1912,

(৯৪) বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম, এ এই তাম্রশাসনের উদ্ধৃত পাঠ Epigraphia Indica পত্রে প্রকাশ করিতেছেন। তিনি তাঁহার প্রবন্ধ মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গালার ইতিহাস ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়াছেন।

দ্বিতীয় পাল-সাম্রাজ্য।

দ্বিতীয় বিগ্রহপালদেবের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র প্রথম মহীপালদেব পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। দিনাজপুর জেলায় বাণগড়ে আবিষ্কৃত মহীপালদেবের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, "শ্রীমহীপালদেব রণক্ষেত্রে বাহুদর্প প্রকাশে সকল বিপক্ষ-পক্ষ নিহত করিয়া 'অনধিকৃত বিলুপ্ত পিতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধন করিয়া রাজগণের মস্তকে চরণপদ্ম সংস্থাপিত করিয়া অবনীপাল হইয়াছিলেন।" "অনধিকৃত বিলুপ্ত" শব্দে অনধিকারী কর্ত্তৃক লুপ্ত, অর্থাৎ শত্রু হস্তগত পিতৃরাজ্যই বুঝায়। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় অধ্যাপক কিলহর্ণ[২] ও ১৩১৯ বঙ্গাব্দে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়[৩] এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই তাম্রশাসন ব্যাখ্যাকালে উক্ত পদের বিশ্লেষণ করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন[৪], অন্তর্নিহিত ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের চেষ্টা করেন নাই। বাণগড়ের তাম্রশাসনে প্রথম মহীপালদেবের পরিচয় জ্ঞাপক দুইটি শ্লোক আছে। "সূর্য্যদেব হইতে যেমন কিরণকোটিবর্ষী চন্দ্রদেব উৎপন্ন হইয়াছেন, তাহা হইতেও সেইরূপ রত্নকোটিবর্ষী বিগ্রহপালদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নয়নানন্দদায়ক সুবিমল কলাময় সেই রাজকুমারের উদয়ে ত্রিভুবনে সন্তাপ বিদূরিত হইয়া গিয়াছিল। তদীয় অভ্রতুল্য সেনা-গজেন্দ্রগণ (প্রথমে) জল প্রচুর পূর্ব্বাঞ্চলে স্বচ্ছ সলিল পান করিয়া, তাহার পর (তদনু) মলয়োপত্যকার চন্দন-বনে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া, ঘনীভূত-শীতল শীকরোৎক্ষেপে তরু সমূহের জড়তা সম্পাদন করিয়া হিমালয়ের কটকদেশ উপভোগ করিয়াছিল[৫]।" এই শ্লোকদ্বয় ব্যাখ্যাকালে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলিয়াছেন, "মহীপালদেবের পিতার কোনরূপ বীরকীর্ত্তির উল্লেখ নাই। তাঁহার সূর্য্য হইতে 'চন্দ্ররূপে' উদ্ভূত বলিয়া এবং তজ্জন্য তাঁহাতে 'কলাময়ত্বের আরোপ করিবার সুযোগ পাইয়া কবি ইঙ্গিতে তাঁহার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের আভাস প্রদান করিয়া থাকিবেন। তাঁহার সেনা-গজেন্দ্রগণের (আশ্রয় স্থানাভাবে) নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া, শিশির সংক্ষুব্ধ হিমাচলের অধিত্যকায় আশ্রয় লাভের কথায় এবং মহীপালদেবের 'অনধিকৃত-বিলুপ্ত' পিতৃরাজ্য পুনঃ প্রাপ্তির কথায়, দ্বিতীয় বিগ্রহপালদেবের শাসন সময়েই পাল সাম্রাজ্যের প্রথম ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে[৬]।" মৈত্রেয় মহাশয়ের উক্তি সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানসম্মত।

প্রথম মহীপালদেব পাল-রাজবংশের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। পূর্ব্ব অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, মহীপালের পিতা দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকালে বরেন্দ্রী বা উত্তর বঙ্গ কাম্বোজ জাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল, এবং সম্ভবতঃ চন্দেল্লবংশীয় যশোবর্ম্মার সাহায্যে গুর্জ্জর-রাজ মহীপাল মগধ পুনরধিকার করিয়াছিলেন। সুতরাং মহীপালদেব, পিতার মৃত্যুর পরে, রাঢ় ও বঙ্গদেশের কিয়দংশের অধিকার মাত্র, উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহীপাল স্বয়ং বরেন্দ্রী, মগধ ও তীরভুক্তি, এমন কি, বারাণসী পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। মহীপালদেবের রাজত্বের

১। হতসকলবিপক্ষঃ সঙ্গরে বাহুদর্পাদনধিকৃতবিলুপ্তং রাজ্যমাসাদ্য পিত্র্যং।
নিহিতচরণপদ্মো ভূভৃতাং মূর্দ্ধ্নি তস্মাদভবদবনিপালঃ শ্রীমহীপালদেবঃ ॥১২
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৯৫।

২। Journal of the Asiatic Society of Bengal, pt I, p, 81

৩। গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১০০, পাদটীকা।

৪। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫ম ভাগ, পৃঃ ১৩৯ ও বিশ্বকোষ "মহীপাল" শব্দ।

৫। তস্মাদ্বভূব সবিতুর্ব্বসুকোটিবর্ষী কালেন চন্দ্র ইব বিগ্রহপালদেবঃ।
নেত্রপ্রিয়েণ বিমলেন কলাময়েন যেনোদিতেন দলিতো ভুবনস্য তাপঃ ॥১০
দেশে প্রাচি প্রচুর-পয়সি স্বচ্ছমাপীয় তোয়ং স্বৈরং ভ্রান্ত্বা তদনুমলয়োপত্যকাচন্দনেষু।
কৃত্বা সান্দ্রৈস্তরুষু জরিতাং শীকরৈরভ্রতুল্যাঃ প্রালেয়াদ্রেঃ কটকমভজন্ যস্য সেনা-গজেন্দ্রাঃ ॥১১
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৯৫।

৬। গৌড়লেখমালা ১০০, পাদটীকা।

তৃতীয় বর্ষের পূর্ব্বে বঙ্গ বা সমতট অধিকৃত হইয়াছিল[৭]। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, গৌড় হইতে তাড়িত হইয়া পালরাজগণ সমতটে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন[৮]। মহীপালদেবের ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্কের পূর্ব্বে মগধ অধিকৃত হইয়াছিল; কারণ উক্ত বর্ষে নালান্দায় লিখিত একখানি প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে[৯]। তাঁহার ৪৮শ রাজ্যাঙ্কের পূর্ব্বে তীরভুক্তি বা মিথিলা অধিকৃত হইয়াছিল; কারণ, উক্ত বর্ষে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি পিত্তল-মূর্ত্তি বর্ত্তমান তীরহুতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল[১০]। সারনাথে আবিষ্কৃত একটি বুদ্ধমূর্ত্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপির রচনা-রীতি দেখিয়া অনুমান হয় যে, এক সময়ে বারাণসীও মহীপালদেব কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল[১১]।

খৃষ্টিয় দশম শতাব্দীর শেষার্দ্ধের প্রারম্ভে মহীপালদেব রাঢ় অথবা বঙ্গের কোন নিভৃত কোণে পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে উত্তরাপথের রাজ্য সমূহেরও রাজন্যবর্গের পরিবর্ত্তন হইতেছিল। প্রথম ভোজদেব ও মহেন্দ্রপালদেবের সমুদ্র হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল সাম্রাজ্য কান্যকুব্জ নগরের দুর্গ-প্রকারে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। সমগ্র ভারতবর্ষ-বিজেতা রাষ্ট্রকূট বংশীয় ধ্রুব ধারাবর্ষ ও তৃতীয় গোবিন্দের বংশধরগণ ধীরে ধীরে স্বীয় অধিকার চ্যুত হইতেছিলেন। উত্তরাপথের রঙ্গমঞ্চে কাল পরিবর্ত্তনের সহিত রাষ্ট্রীয় নাট্যে নব নব সূত্রধারের আবির্ভাব হইতেছিল। তখন আর গৌড়-রাজলক্ষ্মী হেলায় গুর্জ্জররাজের অঙ্কশায়িনী হইতেন না, গুর্জ্জর-রাজ প্রাচীন কান্যকুব্জ নগরে চন্দেল্ল-বংশজাত বর্ব্বর গণ্ডের পদাঘাত নীরবে সহ্য করিয়া[১২] মহোদয়শ্রী রক্ষায় অসমর্থ হইয়া মুসলমানের পদানত হইয়াছিলেন[১৩]। ভোজদেবের বংশধর রাজ্যপাল আত্মরক্ষার জন্য একবার ধঙ্গের পুত্র গণ্ডের ও তাহার পরে গজনীর দিগ্বিজয়ী বীর মহমুদের শরণাগত হইয়াছিলেন। দক্ষিণাপথে প্রাচীন চালুক্য-বংশের পুনরুত্থান আরদ্ধ হইয়াছিল; মহীপাল যখন গৌড়েশ্বর, তখনই দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূট-রাজ্যের লোপ হইয়াছিল[১৪]। গৌড়ের পাল-রাজবংশের দুরবস্থার কথা পূর্ব্ব অধ্যায়েই বিবৃত হইয়াছে। এই সময়ে উত্তরাপথে কোকল্লের বংশধর গাঙ্গেয়দেব সহসা পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন। গাঙ্গেয়দেবের পুত্র জগদ্বিজয়ী কর্ণদেব সপ্ততি বর্ষব্যাপী সুদীর্ঘ রাজ্যকালে সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার শতবর্ষব্যাপী জীবন, পশ্চিমে হূণ-রাজ্য হইতে পূর্ব্বে বঙ্গরাজ্য পর্য্যন্ত এবং উত্তরে কান্যকুব্জ হইতে দক্ষিণে পাণ্ড্য ও কেরল দেশ পর্য্যন্ত সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য-রাজগণের সহিত বিবাদে অতিবাহিত হইয়াছিল। গাঙ্গেয়দেব ও কর্ণদেবকে লইয়া দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ শেষ পর্য্যন্ত, শত বর্ষের ইতিহাস রচিত হইয়া থাকে। এই সময়ে গাঙ্গেয় ও কর্ণ ব্যতীত চোলবংশীয় রাজেন্দ্র চোল, কল্যাণের চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় জয়সিংহ প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য-রাজগণ উত্তরাপথ আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই রাষ্ট্র-বিপ্লবের যুগ মহীপালদেব পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়া উত্তরাপথে যে নূতন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহাই তাহার অসামান্য প্রতিভার অদ্বিতীয় পরিচয়।

১০৫৯ বিক্রমাব্দে (১০০২ খৃষ্টাব্দ) যশোবর্ম্মদেবের পুত্র ধঙ্গদেব রাঢ় ও অঙ্গ বিজয় করিয়াছিলেন[১৫]।

৭। Dacca Review, May, 1914, p, 5

৮। শ্রীযুক্ত ষ্টেপলটন একটি অপ্রকাশিত প্রবন্ধের প্রুফ আমাকে অনুগ্রহ করিয়া দেখিতে দিয়াছিলেন। তাহা প্রকাশিত হইয়াছে কি না জানিতে পারি নাই।

৯। Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1899, p 69.

১০। Indica, Antiquary, Vol, XIV. p, 165, note 17,

১১। গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১০৭-৮।

১২ V, A, Smith Early History of India, 3rb' Edition, p, 383,

১৩ Journal of the Royal Asiatic Society, 1909, p, 278,

১৪ R, G, Bhandarkar's Early History of Dekkan, p, 79,

১৫ কা ত্বং কাংচীনৃপতিবনিতা কা ত্বমন্ধ্রাধিপ-স্ত্রী
কা ত্বং রাঢ়া-পরিবৃঢ়বধূ কা ত্বমঙ্গেন্দ্র-পত্নী।

খজুরাহো গ্রামে বিশ্বনাথ-মন্দিরে আবিষ্কৃত ধঙ্গদেবের শিলালিপি হইতে এই কথা অবগত হওয়া যায় এই শিলালিপি ১১৭৩ বিক্রমাব্দে (১১১৬ খৃষ্টাব্দে) জয়ধর্ম্ম-দেবের আদেশে পুনরুৎকীর্ণ হইয়াছিল[১৬]। দ্বিতীয় বিগ্রহ-পালের রাজ্যের শেষভাগে অথবা প্রথম মহীপালের রাজ্যারম্ভকালে রাঢ় ও অঙ্গ ধঙ্গদেব কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। ধঙ্গদেব মহোবায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে বোধ হয় মহীপালদেব পিতৃরাজ্য উদ্ধার-সাধনে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, মহীপালদেবের রাজ্যারম্ভের পূর্ব্বে বরেন্দ্রী বা উত্তর-বঙ্গ কাম্বোজ জাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। গৌড়ে কাম্বোজাধিকারের একটিমাত্র নিদর্শন অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে। দিনাজপুর জেলায় বাণগড় নামক স্থানে বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ মধ্যে একটি বৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ শিলা নির্ম্মিত সুচারু-কারুকার্য্য-শোভিত স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। দিনাজপুরের স্বর্গীয় মহারাজা স্যার গিরিজা নাথ রায়ের কোন পূর্ব্বপুরুষ ইহা বাণগড় হইতে আনয়ন করিয়া স্বীয় প্রাসাদে স্থাপন করিয়াছিলেন। তদবধি ইহা দিনাজপুর-রাজবাটীর প্রাঙ্গনে স্থাপিত আছে। এই স্তম্ভের মূলদেশে তিনছত্র একটি শিলালিপি আছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুর এই শিলা-লিপির অনুবাদ করিয়াছিলেন, দিনাজপুরের তৎকালীন কালেক্টর ওয়েষ্টমেকট এই অনুবাদ অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন প্রবন্ধ অনুবাদ ও স্যার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের প্রতিবাদ একত্র প্রকাশিত হইয়াছিল[১৭]। মিত্রজ মহাশয় প্রতিবাদের উত্তর দিয়াছিলেন[১৮], এবং শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকর উত্তরের প্রত্যুত্তর প্রকাশ করিয়াছিলেন[১৯]। তাহার পরে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এই শিলালিপির কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। স্বর্গীয় ডাঃ কিলহর্ণ বিরচিত উত্তরাপথের খোদিত লিপিমালার এই শিলালিপির উল্লেখ নাই[২০]। স্বর্গীয় ডাক্তার ব্লক্ এই শিলালিপিতে "গৌড়পতি" স্থানে "সীদ্রপতি" পাঠ করায় ব্যাখ্যা-বিভ্রাট হইয়াছিল[২১]। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ এই শিলালিপির প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন[২২]। শিলালিপির শেষ পঙ্‌ক্তির "কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ" শব্দের অর্থ লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু[২৩] "কুঞ্জর ঘটাবর্ষেণ" শব্দের, ৮৮৮ অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু স্যার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী[২৪] এই অর্থ স্বীকার করেন না। নূতন আবিষ্কার না হইলে এই বিরোধের মীমাংসা হওয়া অসম্ভব। "কুঞ্জর ঘটাবর্ষেণ" শব্দের অর্থ যদি ৮৮৮ হয় তাহা হইলে ইহা শকাব্দের তারিখ এবং কাম্বোজবংশজাত গৌড়েশ্বরের শিবমন্দির, ৮৮৮ শকাব্দে, অর্থাৎ—৯৬৬ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। "কুঞ্জর ঘটাবর্ষেণ" শব্দে যদি

১৬। ইত্যালাপাঃ সমরজয়িনো যস্য বৈরি-প্রিয়াণাং
কারাগারে সজলনয়নেন্দিবরণাং বভূবুঃ ॥৪৬
—Epigraphia Indica, Vol, I, p 145,

১৭। Idid, Vol, I, p 147,

১৭। Indian Antiquary, Vol, I, pp, 127-28,

১৮। Idid, p, 195,

১৯। I bid, p, 227,

২০। Epigraphia Indica. Vol. V, app, 1—96,

২১। Annual Report Archaeological Survey, Bengal Circle, 1900-01, p, vii,

২২। Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New series, Vol, VII, p, 619,

২৩। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড) পৃঃ ১৭৭।

২৪। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন যে, 'কুঞ্জরঘটা' শব্দের অর্থ অন্যরূপ।

৮৮৮ না বুঝায়, তাহা হইলেও এই শিলালিপির ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয়ের কোন বাধা দেখিতে পাওয়া যায় না। নারায়ণপালের রাজ্যকালে উৎকীর্ণ গরুড়স্তম্ভলিপি ও কুমিল্লা জেলায় বাঘাউরা গ্রামে আবিষ্কৃত বিষ্ণু মূর্ত্তির পাদ পীঠস্থ খোদিতলিপির[২৫] অক্ষরগুলির সহিত বাণগড়ের স্তম্ভলিপির অক্ষরগুলির তুলনা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, বাণগড়-লিপি গরুড় স্তম্ভলিপির পরে এবং বাঘাউরা লিপির পূর্ব্বে উৎকীর্ণ হইয়াছিন। অক্ষরতত্ত্ব হইতে বাঙ্গালার ইতিহাসে কাম্বোজজাতির আক্রমণের কাল স্থির নির্দ্দেশ করা যায়। যাঁহারা অক্ষরতত্ত্বের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান, তাঁহাদিগের সহিত বিশুদ্ধ প্রত্নবিদ্যামূলক ইতিহাসের মতদ্বৈধ বিচিত্র নহে। বাণগড় স্তম্ভলিপিতে কাম্বোজজাতীয় গৌড়েশ্বরের নামোল্লেখ নাই। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, বিদেশীয় ও বিজাতীয় গৌড়েশ্বর শিবোপাসক হইলেও গৌড়রাজ্যে তাঁহার নাম সুপরিচিত হয় নাই। কাম্বোজবংশীয় কয়জন গৌড়েশ্বর গৌড়-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। এইমাত্র নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, বাণগড়ের শিব মন্দির নির্ম্মাতা কাম্বোজজাতীয় গৌড়েশ্বর প্রথম মহীপালদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী; সুতরাং তিনিই মহীপালের পিতৃরাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং কাম্বোজবংশীয় গৌড়-রাজগণের নিকট হইতেই মহীপাল পিতৃভূমি বরেন্দ্রী অধিকার করিয়াছিলেন। মহীপালদেবের সুদীর্ঘ রাজ্য-কালের প্রথমভাগে সমতট তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল, কারণ, তাঁহার তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে লোকদত্ত নামক বৈষ্ণব-মতাবলম্বী জনৈক বণিক সমতটে একটি নারায়ণ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে এই মূর্ত্তিটি ত্রিপুরা জেলায় আবিষ্কৃত হইয়াছে[২৬]। মহীপালদেবের পঞ্চম রাজ্যাঙ্কে একখানি অষ্ট সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। ইহা এখন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। এই গ্রন্থের পুষ্পিকায় লিখিত আছে:—

"পরমেশ্বরপরমভট্টারকপরমসৌগতশ্রীমন্মহীপালদেব-প্রবর্দ্ধমান বিজয়রাজ্যে সম্বৎ ৫ অশ্বিনি কৃষ্ণে[২৭]।"

মহীপালদেবের ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্কে তাড়িবাড়ি মহাবিহার-বাসী শাক্যাচার্য্য স্থবির সাধুগুপ্তের ব্যয়ে নালন্দবাসী কল্যাণমিত্র চিন্তামণি একখানি অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নেপালে এই গ্রন্থখানি আবিষ্কার করিয়া কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটীতে আনয়ন করিয়াছেন। ইহার পুষ্পিকায় লিখিত আছে;—

"দেয়ধর্ম্মোয়ং প্রবরমহাযানযায়িনঃ তাড়িবাড়িমহা-বিহারীয় আবস্থিতেন শাক্যাচার্য্যস্থবির সাধুগুপ্তস্য যদত্র পুণ্যন্তদ্ভবত্যাচার্য্যোপাধ্যায়মাতাপিতৃপুরঙ্গমং কৃত্বা সকলসত্ত্বরাশেরনুত্তরজ্ঞানফলাবাপ্তয় ইতি। পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজপরমেশ্বরপরমসৌগত শ্রীমদ্বিপালদেব-পাদানুধ্যাত পরমভট্টারকমহারাজাধিরাজপরমেশ্বরপরম-সৌগত শ্রীমন্মীহীপালদেবপ্রবর্দ্ধমানকল্যাণবিজয়রাজ্যে ষষ্ঠ সম্বৎসরে অভিলিখ্যমানে যত্রাঙ্কে সম্বৎ ৬ কার্ত্তিক-কৃষ্ণত্রয়োদশ্যাস্তিথৌ মঙ্গলবারেণ ভট্টারিকা নিষ্পাদিত-মিতি॥ শ্রীনালন্দাবস্থিতকল্যাণমিত্রচিন্তামণিকস্য লিখিত ইতি[২৮]।"

বুদ্ধগয়ায় মহাবোধিমন্দির প্রাঙ্গণে একটি আধুনিক মন্দিরে কয়েকটি বৌদ্ধমূর্ত্তি পঞ্চপাণ্ডবের মূর্ত্তিরূপে পূজিত হইতেছে। ইহার মধ্যে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি মহীপালদেবের একাদশ রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। স্যর আলেক-জাণ্ডার কনিংহাম্ এই মূর্ত্তির পাদপীঠের খোদিতলিপির তারিখের প্রথম অক্ষর দুইটি পাঠ করিতে না পারিয়া ইহাকে মহীপালের দশম রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তি বলিয়া গিয়াছেন[২৯]। এই মূর্ত্তির পাদপীঠস্থ খোদিতলিপি হইতে

২৫। Dacca Keview, 1914, p, 55 and pl,

২৬। ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন, ১৯১৪, পৃঃ ৫৫।

২৭। Bendal's Catalogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts in the University Library, Cambridge, p, 101,

২৮। Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1899, p, 69,

২৯। Cunningham's Archaeological Survey Repoits Vol, III, p, 122, no, 9,

অবগত হওয়া যায় যে, মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর-পরমভট্টারক শ্রীমন্মহীপালদেবের প্রবর্দ্ধমান বিজয়রাজ্যের একাদশ সম্বৎসরে গন্ধকুটীদ্বয়ের সহিত এই বুদ্ধমূর্ত্তিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল[৩০]। মহীপালদেবের একাদশ রাজ্যাঙ্কে তৈলাঢকবাসী বাল্যদিত্য নামক জনৈক ব্যক্তি নালন্দ মহাবিহারের জীর্ণ সংস্কার করিয়াছিলেন। নালন্দ মহাবিহারের প্রস্তরনির্ম্মিত দ্বারে উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, মহাবিহার অগ্নিদাহে ধ্বংস হইলে কৌশাম্বীবিনির্গত হরদত্তের নপ্তা, গুরুদত্তের পুত্র, তৈলাঢকনিবাসী জ্যাবিষ বালাদিত্য কর্ত্তৃক পুনঃ সংস্কৃত হইয়াছিল[৩১]। মহীপালদেবের নবম রাজ্যাঙ্কে পৌণ্ড্র-বর্দ্ধনভুক্তির অন্তঃপাতী কোটিবর্ষবিষয়ে গোকলিকামণ্ডলে চুটপল্লিকাবর্জ্জিত কুরটপল্লিকা গ্রাম মহাবিষুব সংক্রান্তিতে বুদ্ধ ভট্টারকের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণাদিত্যদেবশর্ম্মাকে প্রদত্ত হইয়াছিল[৩২]।

প্রথম মহীপালদেবের রাজ্যকালে গৌড়রাজ্য বারত্রয় বহিঃশত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। প্রথমে চোল-রাজ প্রথম রাজেন্দ্রচোল, কল্যাণের চালুক্য-রাজ দ্বিতীয় জয়সিংহ ও পরে দেচি, কলচুরি বা হৈহয়বংশীয় গাঙ্গেয়দেব পাল-সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। চোলরাজ রাজেন্দ্রচোল ১০১২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নবম রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ মেলপাডি-শিলালিপিতে তাঁহার উত্তরাপথ-বিজয়ের বর্ণনা নাই[৩৩], কিন্তু তাঁহার ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ তিরুমলৈশিলালিপিতে রাজেন্দ্রচোলদেবের উত্তরাপথাভিযানের নিম্নলিখিত দেখিতে পাওয়া যায়[৩৪] :—

"পরকেশরীবর্ম্মা বা শ্রীরাজেন্দ্রচোলদেবের (রাজত্বের) ত্রয়োদশ বৎসর—যিনি......তাঁহার মহান্ সমরপটু সেনাদ্বারা (নিম্নোক্ত দেশসকল) অধিকার করিয়াছেন—দুর্গম ওড্‌ড-বিষয়, (যাহা তিনি) প্রবল যুদ্ধে (পদানত করিয়াছিলেন); মনোরম কোশলনাডু, যেখানে ব্রাহ্মণগণ মিলিত হইয়াছিল। মধুকর-নিকর-পরিপূর্ণ-উদ্যান-বিশিষ্ট তন্দবুত্তি, ভীষণ যুদ্ধে ধর্ম্মপালকে নিহত করিয়া তিনি যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন; সকল দিকে প্রসিদ্ধ তক্কণলাড়ম্, সবেগে রণশূরকে আক্রমণ করিয়া তিনি যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন; বাঙ্গালাদেশ, যেখানে ঝড় বৃষ্টির কখনও বিরাম নাই, এবং গজ-পৃষ্ঠ হইতে নামিয়া যেখান হইতে গোবিন্দচন্দ্র পলায়ন করিয়াছিলেন; কর্ণভূষণ, চর্ম্মপাদুকা এবং বলয়বিভূষিত মহীপালকে ভীষণ সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়া যিনি তাঁহার অদ্ভূত বলশালী করিসমূহ এবং রত্নোপমা রমণীগণকে হস্তগত করিয়াছিলেন; সাগরের ন্যায় রত্নসম্পন্ন উত্তিরলাড়ম্; বালুকাময় তীর্থ-ধৌতকারিণী গঙ্গা[৩৫]।" তিরুমলৈ-শিলালিপি অনুসারে রাজেন্দ্রচোল তাঁহার দ্বাদশ রাজ্যাঙ্কের পূর্ব্বে এই সকল দেশ হস্তগত করিয়াছিলেন। 'ওড্‌ড-বিষয়' বর্ত্তমান উড়িষ্যা, বহু তাম্রশাসনে ইহা 'ওড্র-বিষয়' নামে উল্লিখিত হইয়াছে। 'কোশলৈনাডু' কলিঙ্গের নিকটে অবস্থিত দক্ষিণ-কোশল বা মহাকোশল, বর্ত্তমান বিলাসপুর প্রভৃতি উড়িষ্যার পশ্চিমস্থিত প্রদেশগুলির প্রাচীন নাম। তন্দবুত্তি বা দণ্ডভুক্তি বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশের নাম। সম্ভবতঃ বর্ত্তমান দাঁতন গ্রামই প্রাচীন দণ্ডভুক্তি। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, দণ্ডভুক্তির বর্ত্তমান নাম বিহার[৩৬]। কারণ, তিব্বতীয় ইতিহাসে 'বিহার' ওতন্তপুর বা ওতন্তপুরী নামে উল্লিখিত হইয়াছে[৩৭]। ওতন্তপুর সংস্কৃত উদ্দণ্ডপুরের অপভ্রংশ এবং উদ্দণ্ডপুর, বিহার

৩০। Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol, V, p, 75,

৩১। গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১০২।

৩২। গৌড়লেখমালা; পৃঃ ৯৭।

৩৩। South Indian Inscriptions, Vol, III, p, 27, No, 18,

৩৪। Epigraphia Indica, Vol, IX, pp, 232—233,

৩৫। গৌড়রাজমালা পৃঃ ৩৯।

৩৬। Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol, III, p, 10,

৩৭। Ibid, Vol. V, p, 71

নগরের প্রাচীন নাম,—বিহারের আবিষ্কৃত বহু খোদিতলিপি হইতে ইহা প্রমাণ হইয়াছে। সুতরাং বিহার কখনই দণ্ডভুক্তি হইতে পারে না। দণ্ডভুক্তি কোশল দেশের পরে ও দক্ষিণ-রাঢ়ের পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে; সুতরাং ইহা মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত কোনও স্থান হওয়াই সম্ভব। দণ্ডভুক্তির সহিত দাঁতনের সম্পর্ক আমি, ১৯১১ খৃষ্টাব্দে লিখিত "Palas of Bengal" প্রবন্ধে নির্ণয় করিয়াছিলাম। আমার প্রবন্ধ পাঠের পরে ইহা বসুজ মহাশয়ের গ্রন্থমধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে[৩৮]। রাজেন্দ্রচোল ভীষণ যুদ্ধে ধর্ম্মপালকে ধ্বংস করিয়া দক্ষিণ-রাঢ়ে আসিয়াছিলেন। দণ্ডভুক্তির অধিপতি ধর্ম্মপাল কে, তাহা অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই। তাঁহার সহিত পাল-রাজবংশের সম্পর্কজ্ঞাপক কোন প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু এই ধর্ম্মপালকে মহীপালের 'কোন আত্মীয়' রূপে বর্ণনা করিয়াছেন[৩৯]; কিন্তু দণ্ডভুক্তি-রাজ ধর্ম্মপালের সহিত গৌড়েশ্বর মহীপালের সম্পর্কসূচক কোন প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। বসুজ মহাশয় তাঁহার গ্রন্থের স্থানে স্থানে 'দণ্ডভুক্তি' স্থানে 'দন্তভুক্তি' লিখিয়াছেন[৪০]। কিন্তু এই স্থানের প্রকৃত নাম 'দণ্ডভুক্তি'; কারণ, সন্ধ্যাকরনন্দী প্রণীত 'রামচরিতে' দণ্ডভুক্তির অধিপতি জয়সিংহের নাম আছে[৪১]। রামচরিতের টীকায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, জয়সিংহ উৎকল-রাজ কর্ণকেশরীকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ইহা দণ্ডভুক্তির অবস্থান-নির্ণয়ের আর একটি প্রমাণ; কারণ, উৎকল-রাজের সহিত দক্ষিণ-মগধের অধিপতি অপেক্ষা উৎকল-রাজ্যের উত্তর সীমায় অবস্থিত প্রদেশাধিপতির যুদ্ধ হওয়াই অধিকতর সম্ভব। বসুজ মহাশয় বলিয়াছেন যে ধর্ম্মপাল প্রথমে রঙ্গপুর জেলায় রাজত্ব করিতেন, কিন্তু পরে মধ্য-রাঢ়ে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন[৪২]। অদ্যাবধি এমত কোন প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই, যদ্দ্বারা এই উক্তি সমর্থিত হইতে পারে। রাজেন্দ্রচোল যখন দক্ষিণ-রাঢ় আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন রণশূর দক্ষিণ-রাঢ়ের অধিপতি। শূরবংশীয় নরপতিগণের মধ্যে রণশূরের নামই সর্ব্বপ্রথমে খোদিতলিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়। রাজেন্দ্রচোল রণশূরকে পরাজিত করিয়া বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের অধিপতি গোবিন্দচন্দ্র হস্তিপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রচোল বঙ্গদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া উত্তর-রাঢ়ের মহীপালকে পরাজিত করিয়াছিলেন। দক্ষিণ-রাঢ় ও উত্তর-রাঢ় তিরুমলৈ-শিলালিপিতে 'তক্কণলাডং' ও 'উত্তিরলাডং' রূপে উল্লিখিন হইয়াছে। স্বর্গীয় ডাঃ কিলহর্ণ এই নামদ্বয় 'উত্তর-লটে', অর্থাৎ-উত্তর-গুজরাট এবং 'দক্ষিণ-লাট', অর্থাৎ—দক্ষিণ-গুজরাট মনে করিয়াছিলেন[৪৩]। তিরুমলৈ-শিলালিপি পুনঃ সম্পাদন কালে ডাক্তার হুলজ্ ও স্বর্গগত পণ্ডিত বেঙ্কয় স্থির করিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বোক্তশব্দদ্বয়দ্বারা উত্তর-বিরাট ও দক্ষিণ-বিরাট সূচিত হইতেছে[৪৪]। স্বর্গগত পণ্ডিত বেঙ্কয় বলিয়াছিলেন যে, "ইলাড" শব্দদ্বারা সংস্কৃত "বিরাট" বুঝাইতে পারে, "লাট" বুঝায় না[৪৫]। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ[৪৬] ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন[৪৭], "তক্কণলাডম্" ও "উত্তিরলাডম্" শব্দদ্বয়দ্বারা দক্ষিণ-রাঢ় ও উত্তর-রাঢ় সূচিত হইতেছে, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই এই প্রদেশদ্বয়ের অবস্থান

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ১৭৩, পাদটীকা ৯০।
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ১৭৯।
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ১৮০।
Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol, III, p, 36,
সিংহ ইতি দণ্ডভুক্তিভূপতিরদ্ভুতপ্রভাবাকরকরকমলমুকুলতুলিতোৎকলেশকর্ণকেশরীসরিদ্বল্লভঃ কুম্ভসম্ভবো।—রামচরিত ২।৫ টীকা।
৪২ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ১৮০।
৪৩ Epigraphia Indica, Vol, VII, App, p, 20, no, 733,
৪৪ Ibid. Vol, IX, p, 231,
৪৫ Annual Report on Epigraphy, Madras, 1906-7, p, 87,
৪৬ গৌড়রাজমালা পৃঃ ৪০
৪৭। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড) পৃঃ ১৭৩, পাদটীকা ৯০।

নির্ণয়ের কারণ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক মনে করেন নাই। কোশল বা দণ্ডভুক্তি জয় করিয়া দক্ষিণ-লাট বা দক্ষিণ-বিরাটে যুদ্ধযাত্রা করা, দক্ষিণ-লাট বা দক্ষিণ-বিরাট হইতে যুদ্ধার্থ বঙ্গদেশে আগমন, বঙ্গদেশ হইতে উত্তর-লাট বা উত্তর-বিরাট জয়ার্থ গমন এবং উত্তর-লাট বা উত্তর-বিরাট হইতে গঙ্গাতীরে প্রত্যাবর্ত্তন অসম্ভব; সুতরাং শব্দগত সাদৃশ্য অনুসরণে "দক্ষিণ-লাডম্" "দক্ষিণ-রাঢ়" এবং "উত্তিরলাডম্" "উত্তর-রাঢ়" রূপে গ্রহণ করাই সুসঙ্গত। রাজেন্দ্রচোল গঙ্গাতীর হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত দিগ্বিজয়ের জন্য স্বদেশে "গঙ্গেগোণ্ডা", অর্থাৎ—"গঙ্গাবিজয়ী" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

প্রথম মহীপালদেবের রাজত্বকোলে কোন সময়ে কর্ণাটদেশীয় কোন রাজা গৌররাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। আর্য্য ক্ষেমীশ্বর-বিরচিত "চণ্ডকৌশিক" নামক একখানি নাটকে এই ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল হইতে চণ্ডকৌশিকের একখানি পুথি আনয়ন করিয়াছিলেন[৪৮]। ইহাতে প্রথম মহীপাল চন্দ্রগুপ্তের সহিত এবং কর্ণাটগণ নবনন্দের সহিত তুলিত হইয়াছেন[৪৯]। এই নাটকখানি মহীপালদেবের বিজয়োৎসব উপলক্ষে রচিত ও অভিনীত হইয়াছিল। এই সমসাময়িক গ্রন্থ হইতে কর্ণাটগণের আক্রমণ ও পরাভবের কথা অবগত হওয়া যয়। মহীপালদেব কর্ত্তৃক পরাজিত কর্ণাটগণ কোন্ দেশের অধিবাসী? শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ অনুমান করেন যে, কর্ণাট বলিতে কল্যাণ প্রদেশ বুঝায়, সুতরাং এই সময়ের কর্ণাট-রাজগণ চালুক্য-রাজবংশ-সম্ভূত[৫০]। মহীপালদেরের রাজ্যকালে চাল্ক্য-রাজবংশীয় দ্বিতীয় তৈল, প্রথম সত্যাশ্রয়, পঞ্চম বিক্রমাদিত্য ও দ্বিতীয় জয়সিংহ কল্যাণের সিংহাসনে আসীন ছিলেন[৫১]। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে কাহারও খোদিতলিপিতে গৌড়-যুদ্ধের উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ কর্ণাট-রাজগণ পরাজিত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রশস্তি-কারগণ গৌড়-যুদ্ধের উল্লেখ করেন নাই। দিগ্বিজয়ী বীর প্রথম রাজেন্দ্রচোল উত্তর-রাঢ়ে মহীপালদেবকে পরাজিত করিয়া গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি উত্তরবঙ্গ আক্রমণ করেন নাই। হয়ত গঙ্গাতীরে প্রথম রাজেন্দ্রচোল, মহীপাল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং চণ্ডকৌশিক নাটকে চোলরাজই কর্ণাট-রাজরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন[৫২]।

মহীপালদেবের রাজ্যকালে কোন সময়ে কলচুরি বা চেদিবংশীয় গাঙ্গেয়দেব গৌড়-রাজ্য আক্রমণ করিয়া মিথিলা অধিকার করিয়াছিলেন। গাঙ্গেয়দেবের অধিকার-কালে তীরভুক্তিতে লিখিত একখানি রামায়ণ গ্রন্থ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক নেপালে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থের পুষ্পিকা হইতে অবগত হওয়া হায় যে, "গৌড়ধ্বজ" উপাধিধারী গাঙ্গেয়দেব ১০৭৬ বিক্রমাব্দে তীরভুক্তির অধিপতি ছিলেন[৫৩]। এই গাঙ্গেয়-দেব যে কলচুরিবংশীয় প্রসিদ্ধ বীর কর্ণদেবের পিতা, সে

৪৮। Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. LXII, 1893, pt. I, p. 250.

৪৯। যঃ সংশ্রিত্য প্রকৃতিগহনামার্য্যচাণক্যনীতিং
জিত্বা নন্দান্ কুসুমনগরং চন্দ্রগুপ্তো জিগায়।
কর্ণাটত্বং ধ্রুবমুপগতানদ্য তামেব হন্তুং
দোর্দ্দর্পাঢ্যঃ স পুনরভবৎ শ্রীমহীপালদেবঃ ॥

—Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1892, pt I. p. 251.

৫০। গৌড়রাজমালা, পৃঃ ॥৶০।

৫১। Epigraphia Indica, Vol. VIII, App, II. p. 7.

৫২। Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V, p. 73.

৫৩। সংবৎ ১০৭৬ আষাঢ় বদি ৪ মহারাজাধিরাজ পুণ্যাবলোক সোমবংশোদ্ভব গৌড়ধ্বজ শ্রীমদ্গাঙ্গেয়দেবভুজ্যমানতীরভুক্তৌ কল্যাণবিজয়রাজ্যে।

—Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. LXXII, 1903, pt. I, p. 18.

বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ এই বিষয়ে অযথা আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন[৫৪]। কর্ণদেবের পিতা গাঙ্গেয়দেব ৭৮৯ কলচুরি অব্দে (১০৩৭ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন[৫৫]। সুতরাং তাঁহার সহিত ১০১৯ খৃষ্টাব্দে গৌড়েশ্বরের সহিত যুদ্ধ অসম্ভব নহে। প্রথম মহীপালের রাজ্যকালে বারাণসীতে বহু মন্দির চৈত্যাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। স্থিরপাল ও বসন্তপাল নামক ব্যক্তিদ্বয় গৌড়েশ্বরের আদেশে বারাণসীতে "ধর্ম্মরাজিকা" ও "সাঙ্গধর্ম্মচক্রের" জীর্ণসংস্কার এবং "অষ্টমহাস্থানশৈল-বিনির্ম্মিত-গন্ধকূটী" নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[৫৬]। অনুমান হয় যে, স্থিরপাল ও বসন্তপাল রাজবংশসম্ভূত ছিলেন।

মহীপালদেব যখন গৌড়েশ্বর, তখন আর্য্যাবর্ত্তের ইতিহাসের একটি নূতন অধ্যায় আরব্ধ হইতেছিল। হূণ-প্লাবনের পঞ্চশত বর্ষ পরে আর্য্যাবর্ত্ত পুনরায় বহিঃশত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। হূণ-যুদ্ধের পর হইতে পঞ্চশতাব্দী কাল যাবৎ আর্য্যাবর্ত্তে নরনাথগণ গৃহ-বিবাদে বলক্ষয় করিয়া আর্য্যাবর্ত্তের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিতেছিলেন। পারস্যে আর্দাশিরবাবেকানের বংশজাত শেষ রাজা যখন নূতন ধর্ম্মাবলম্বী আরবগণের নিকটে পরাজিত হইয়া নিহত হইয়াছিলেন, তখনও আর্য্যাবর্ত্ত-রাজগণ জগতে নূতন রাষ্ট্রীয় শক্তি উন্মেষের সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে মুসলমান বীরগণ যখন সিন্ধুদেশ আক্রমণ করিয়া উহা অধিকার করিয়াছিলেন, তখনও আর্য্যাবর্ত্ত-রাজগণের চৈতন্য উদয় হয় নাই। তখনও প্রাচীন পারসীক-সাম্রাজ্যের ধ্বংসের সংবাদ অবগত হইয়াও, আর্য্যাবর্ত্ত-রাজগণ গৃহ-বিবাদে ব্যাপৃত ছিলেন; তখনও গুর্জ্জরপ্রতীহার-রাজগণের ভয়ে রাষ্ট্রকূট-রাজগণ গুর্জ্জরের বিরুদ্ধে তাজিক নামে পরিচিত সিন্ধুদেশবাসী মুসলমানগণের সহিত সন্ধি-বন্ধনে আবদ্ধ হইতেন। প্রাচীন পারসীকসাম্রাজ্য ধ্বংসের পরে প্রাচীন পারসীক জাতিকে নবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া মুসলমানগণ যখন বাহ্লীক (বলখ্) কপিশা (কাবুল) ও গান্ধারের দিকে অগ্রসর হইলেন, আর্য্যাবর্ত্ত তখনও সুষুপ্তিমগ্ন। বাহ্লীক ও কপিশা অধিকৃত হইল, আফগানিস্থানের পার্ব্বত্য উপত্যকাসমূহে মহারাজাধিরাজ কণিষ্কের বংশধরগণের অধিকার লুপ্ত হইল। শত শত বৌদ্ধকীর্ত্তিসুশোভিত শস্যশ্যামল গান্ধার ও কপিশা মরুভূমিতে পরিণত হইল, কিন্তু তখনও বৎসরাজ গৌড়বিজয়ে উন্মত্ত, ধ্রুব ধারাবর্ষ ও তৃতীয় গোবিন্দ গুর্জ্জরদলনে ব্যাপৃত। প্রাচীন ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহাই ধ্বংসোন্মুখ জাতির লক্ষণ। খৃষ্টীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে কুষাণবংশীয় শেষ রাজার মন্ত্রী প্রভুকে পদচ্যুত করিয়া কপিশার সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন[৫৭]। লল্লীয়, বাহ্লীক বিজিত হইলে কপিশায় অবস্থান অসম্ভব দেখিয়া দেখিয়া সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরবর্ত্তী ইদভাণ্ডপুরে (বর্ত্তমান উণ্ড্) স্বীয় রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। ২৫৬ হিজিরাব্দে সিজিস্থানের অধিপতি ইয়াকুব লাইস্, গজনীপ্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন[৫৮]। তুর্কিস্থানের সামানীবংশীয় রাজা ইসমাইল, গজনী সামানী-রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর তৃতীয় পাদে সামানী-রাজ-সেনানায়ক আলপ্তিগীন্ প্রভুর ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া গজনীতে একটি স্বতন্ত্র রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। আলপ্তিগীনের মৃত্যুর পরে তাঁহার তুরস্কজাতীয় ক্রীতদাস সবুক্তগীন্ গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সবুক্তিগীন্ তাঁহার দশম রাজ্যাঙ্কে, ৯২৭ খৃষ্টাব্দে উত্তরাপথের সিংহদ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন যাহি জয়পাল উদভাণ্ডপুরের সিংহাসনে আসীন। সবুক্তিগীন্ ০৯৯ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র মহমুদ্ বারম্বার আক্রমণ করিয়া প্রাচীন যাহি-রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিলেন। মহমুদের গতি রোধ করিবার জন্য

৫৪। গৌড়রাজমালা পৃঃ ৪১, পাদটীকা।

৫৫। Cunningham's Archæological Survey Report, Vol. XXXI, p. 113, pt XXVII.

৫৬। গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১০৭-৮।

৫৭। Sachau's Al-Beruni, Vol. II, p. 13.

৫৮। Tabaqat-i-Nasiri (Raverty's Trans.) pp. 21-22.

কাশ্মীর, কান্যকুব্জ ও কলঞ্জরের অধিপতিগণ প্রাণপণে জয়পালকে সাহায্য করিয়াছিবেন। জয়পাল, তৎপুত্র অনঙ্গপাল ও তৎপুত্র ত্রিলোচন পাল আর্য্যাবর্ত্ত রক্ষার জন্য প্রাণবিসর্জ্জন করিলে ষাহিরাজ্য মহ্‌মুদের অধীন হইয়াছিল। শেষ মুহূর্ত্তে আর্য্যাবর্ত্ত রাজগণের চৈতন্য হইলে প্রতীহার, চন্দের ও লোহরবংশীয় রাজগণ, যখন ষাহিগণকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন, তখনও গৌড়েশ্বর আর্য্যাবর্ত্ত রক্ষার জন্য স্বদেশীয় রাজবৃন্দের সহিত এই মহাযুদ্ধে যোগদান করেন নাই। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ যুদ্ধার্থে সমবেত আর্য্যাবর্ত্ত-রাজগণের মধ্যে গৌড়েশ্বরের নাম করেন নাই, সুতরাং ইহা স্থির যে, গৌড়েশ্বর ষাহি-রাজগণের সাহায্যার্থ অগ্রসর হন নাই। মগধে গোবিন্দপাল ও বঙ্গে লক্ষ্মণসেনের পুত্রগণ দ্বিশতবর্ষ পরে মহীপালের কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ অনুমান করেন, "কলিঙ্গ জয়ের পর, মৌর্য্য অশোকের ন্যায়, কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতির কবল হইতে বরেন্দ্র উদ্ধার করিয়া, মহীপালেরও বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল এবং অশোকের ন্যায় মহীপালও যুদ্ধ-বিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া, পরহিতকর এবং পারত্রিক কল্যাণকর কর্ম্মানুষ্ঠানে জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন[৫৯]" চন্দ মহাশয়ের উক্তি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলিয়াছেন, "বাস্তবিক তখন মহীপালের বৈরাগ্যের উপযুক্ত কাল উপস্থিত হয় নাই। যে কলঞ্জরপতি তাঁহার পিতামাতাকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত মিত্রতা ও একতা স্থাপন করিয়া বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ হইতে উত্তরাপথ রক্ষা করিতে যাওয়া কখনই উপযুক্ত মনে করেন নাই[৬০]। চন্দজ মহাশয় বৈরাগ্যের যুক্তি দেখাইয়া মহীপালের কাপুরুষতা ও সঙ্কীর্ণচিত্ততা গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বস্তুতঃ মহীপালের ঔদাসীন্যের কোনই উপযুক্ত কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না, ধর্ম্মবিদ্বেষ ও ঈর্ষ্যাই যে মহীপালের ধর্ম্মযুদ্ধের প্রতি ঔদাসীন্যের প্রধান কারণ, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

প্রাচীন ষাহি-রাজ্য ধ্বংস করিয়া সুলতান মহ্‌মুদ যখন উত্তরাপথের প্রসিদ্ধ নগরসমূহ ধ্বংস করিতেছিলেন, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ অনুমান করেন যে গৌড়েশ্বর তখন "বারানসীধামকে কীর্ত্তিরত্নে সজ্জিত করিতে গিয়া…তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন[৬১]। স্থাণ্বীশ্বর, মথুরা, কান্যকুব্জ, গোপাদ্রি, কলঞ্জর, সোমনাথ প্রভৃতি নগর, দুর্গ ও পবিত্র তীর্থসমূহ যখন ধ্বংস হইতেছিল, তখন উত্তরাপথের পূর্ব্বার্দ্ধের অধীশ্বর পরম নিশ্চিন্তমনে "কর্ম্মানুষ্ঠান" করিতেছিলেন। দুর্জ্জেয় গোপাদ্রিদুর্গ অধিকৃত হইল; প্রাচীন কান্যকুব্জ নগরে বৎসরাজ, নাগভট ও ভোজদেবের বংশধর রাজ্যপালদেব আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া মহমুদের শরণাগত হইলেন। মহ্‌মুদ তাহাকে আশ্রয় দিয়া রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলে চন্দেল্ল-রাজগণ্ডের পুত্র বিদ্যাধরের আদেশে কচ্ছপঘাতকবংশীয় অর্জ্জুন রাজ্যপালের মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিলেন[৬২]। তখনও কি গৌড়েশ্বর বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন?

মজঃফরপুর জেলায় ইমাদপুর গ্রামে আবিষ্কৃত কতকগুলি পিত্তলমূর্ত্তি মহীপালদেবের ৪৮শ রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল[৬৩]। তিব্বতীয় ইতিহাসকার লামা তারানাথ

৫৯। গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৪১।

৬০। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ১০৬।

৬১। গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৪৩।

৬২। শ্রীবিদ্যাধরদেবকার্য্যনিরতঃ শ্রীরাজ্যপালং হঠাৎ
কণ্ঠাস্থিচ্ছিদনেকবাণনিবহৈর্হত্বা মহত্যাহবে
ডিংডীরাবলিচংদ্রমংডলমিলন্মুক্তাকলাপোজ্জলৈ-
স্ত্রৈলোক্যং সকলং যশোভিরচলৈর্যোজভ্রমা পূরয়ৎ ॥
—দুবকুণ্ডে আবিষ্কৃত বিক্রমসিংহের শিলালিপি।
—Epigraphia Indica, Vol. II, p. 237.

৬৩। Indian Antiquary, Vol. XIV, p. 165, note, 17.

বলেন যে, মহীপালদেব বায়ান্ন বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন[৬৪]। ইমাদপুরের মূর্ত্তিগুলির খোদিতলিপির উপরে নির্ভর করিয়া তারানাথের উক্তি, ঐতিহাসিক সত্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রথম মহীপলদেবের মৃত্যুর পরে তৎপুত্র নরপালদেব গৌড়-মগধ-বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন[৬৫]। বাণগড়ে আবিষ্কৃত মহীপালদেবের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বামনভট্ট মহীপালদেবের মন্ত্রী ছিলেন। এই বামনভট্টই বাণগড় তাম্রশাসনের দূতক[৬৬]।

স্থিরপাল ও বসন্তপালের সারনাথলিপি যে সময়ে উৎকীর্ণ হইয়াছিল, সে সময়ে প্রথম মহীপালদেবের মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়; কারণ, প্রথমতঃ সরনার্থলিপিতে, 'প্রবর্দ্ধমানবিজয়রাজ্যে' অথবা 'কল্যাণ-বিজয়রাজ্যে' ইত্যাদি কোন পদ ব্যবহৃত হয় নাই। সারনাথলিপিতে 'অকারয়ৎ' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা হইতে অনুমান হয় যে মুর্ত্তি প্রতিষ্ঠাকালে মহীপালদেবের দেহাবসান হইয়াছিল। সারনাথ-লিপি পদ্যে লিখিত, সুতরাং নিশ্চয় করিয়া কোন কথা বলিতে পারা যায় না। অনুমান হয় যে, সারনাথ-লিপির তারিখের এক বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১০২৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম মহীপালদেবের মৃত্যু হইয়াছিল এবং নয়পাল্পদেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। নয়নপালদেবের রাজ্যকালে জগদ্বিজয়ী বীর কর্ণদেব গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, মহীপালদেবের রাজ্যকালে গাঙ্গেয়দেব তীরভুক্তি অধিকার করিয়াছিলেন, সুতরাং তৎপূর্ব্বে অবশ্যই বারাণসী অধিকৃত হইয়াছিল। কর্ণদেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সমস্ত উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথ বিজয় করিয়াছিলেন। নাগপুরে আবিষ্কৃত পরমার উদয়াদিগত্যের শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, যে কর্ণদেব কর্ণাটদিগের সহিত মিলিত হইয়া সমগ্র পৃথিবী অধিকার করিয়াছিলেম, উদয়াদিত্য তাঁহাকে পরাজিত করিয়া রাজ্যোদ্ধার করিয়াছিলেন[৬৭]। কর্ণের পৌত্র গয়কর্ণদেবের পত্নী অহ্লণদেবীর ভেড়াঘাটে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কর্ণদেবের বিক্রম দর্শনে পাণ্ড্যরাজ চণ্ডতা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, মুরল (কেরল)-রাজ গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কুঙ্গরাজ সৎপথে আগমন করিয়াছিলেন, বঙ্গ-রাজ কলিঙ্গ-রাজের সহিত ভয়ে কম্পিত হইয়াছিলেন, কীর-রাজ পিঞ্জরাবদ্ধ শুকপক্ষীর ন্যায় অবস্থান করিতেছিলেন এবং হূণ-রাজ হর্ষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন[৬৮]। করণবেলে আবিষ্কৃত কর্ণদেবের প্রপৌত্র জয়সিংহদেবের শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, চোল, কুঙ্গ, হূণ, গৌড়, গুর্জ্জর এবং কীর দেশের অধিপতিগণ, কর্ণদেব

৬৪। Ibid, Vol, IV, p. 366.

৬৫।
ত্যজন্ দোষাসঙ্গং শিরসি কৃতপাদঃ ক্ষিতিভৃতাং
বিতন্বন্ সর্ব্বাশাঃ প্রসভমুদয়াদ্রেরিব রবিঃ।
হতধ্বান্ত-স্নিগ্ধপ্রকৃতিরনুরাগৈকবসতি
স্ততো ধন্যঃ পুণ্যৈরজনি রয়পালো নরপতিঃ ॥ ১২

—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১২৫

৬৬। গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৯৯।

৬৭।
তস্মিন্বাসববন্ধুতামুপগতে রাজ্যে চ কুল্যাকুলে
মগ্নস্বামিনি তস্যবন্ধুরুদয়াদিত্যোভবদ্ভূপতিঃ।
যেনোদ্ধৃত্য মহার্ণবোপমমিলৎকর্ণাটকর্ণপ্রভু
মুর্ব্বীপালকদর্থিতাং ভবমিমাংশ্রীমদ্বরাহায়িতং ॥ ৩২

—নাগপুরের শিলালিপি—Epigraphia Indica, Vol. II, p. 185,

৬৮।
পাণ্ড্যশ্চণ্ডিমতামুমোচ মুরলস্তত্যাজ গর্ব্বগ্রহং
কুঙ্গঃ সদ্গতিমাজগাম চকপে বঙ্গঃ কলিঙ্গৈঃ সহ।
কীরঃ কীরবদাস পঞ্জরগৃহে হূণঃ প্রহর্ষং জহৌ
যস্মিন্ রাজনি শৌর্য্যবিভ্রমভরং বিভ্রত্যভূর্ব্বপ্রভে ॥ ১২

—ভেড়া ঘাটের শিলালিপি; Ibid, p. II.

কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন ৬৯। ১৩১৭ বিক্রমাব্দে উৎকীর্ণ চন্দেল্লবংশীয় বীরবর্ম্মার শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, অগস্ত্য যেমন সমুদ্র পান করিয়াছিলেন; কীর্ত্তিবর্ম্মাও সেইরূপ পয়োধিরূপ কর্ণকে পান করিয়াছিলেন ৭০। মহোবায় আবিষ্কৃত চন্দেল্লবংশের একখানি শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বিষ্ণু যেমন মন্দরপর্ব্বতদ্বারা বহুপর্ব্বতগ্রাসী সমুদ্রকে মন্থন করিয়া অমৃতের উৎপত্তি করাইয়াছিলেন, তেমনই কীর্ত্তিবর্ম্মা বহুরাজ্যগ্রাসী কর্ণের সেনাদলকে পরাজিত করিয়া যশঃ ও হস্তী লাভ করিয়াছিলেন ৭১। কৃষ্ণমিশ্র-প্রণীত প্রবোধচন্দ্রোদয়ে"র সূচনা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, গোপাল নামক কীর্ত্তিবর্ম্মার জনৈক ব্রাহ্মণজাতীয় সেনাপতি চেদি-রাজ কর্ণদেবকে পরাজিত করিয়া কীর্ত্তিবর্ম্মাকে সিংহাসনে পুনঃ স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রবোধচন্দ্রোদয়ে"র সূচনায় তিন স্থানে গোপাল কর্ত্তৃক কর্ণদেবের পরাজয়ের উল্লেখ আছে। এক স্থানে কথিত আছে যে, গোপাল কর্ণদেব কর্ত্তৃক উন্মূলিত সাম্রাজ্যে কীর্ত্তিবর্ম্মাকে পুনঃ স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ৭২। আর এক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গোপাল বলবান্ কর্ণদেবকে পরাজিত করিয়া কীর্ত্তিবর্ম্মার উন্নতির কারণ হইয়াছিলেন ৭৩। তৃতীয় স্থানে কর্ণদেবকে মধুমথনকারী বিষ্ণুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে ৭৪। জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র সূরি-যুদ্ধে কর্ণকে পরাজিত করণের জন্য অনহিলপাটকের প্রথম ভীমদেবকে প্রশংসা করিয়াছিলেন ৭৫। বিহ্লন-রচিত "বিক্রমাঙ্ক-চরিত" হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কর্ণদেব কলঞ্জরপর্ব্বতাধিপতির (অর্থাৎ চন্দেল্লরাজের) যমস্বরূপ ছিলেন ৭৬। জয়সিংহদেবকে ও অহ্লণদেবীর শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, গৌড়ীয়গণ কর্ণদেব কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল। তিব্বতীয় সাহিত্যে কর্ণদেবের সহিত গৌড়েশ্বরের যুদ্ধ-বিগ্রহের উল্লেখ আছে।

৬৯। নীচৈঃ সঞ্চর চোড়-কুঙ্গ-কিমিদং কক্ষ্ত্ত্বয়া বল্গ্যতে
হুণৈবং রণিতুং ন যুক্তমিহ তে ত্বং গৌড় গর্ব্বং ত্যজ।
মৈবং গুর্জ্জর গর্জ্জ কীর নিভৃতো বর্ত্তস্ব সেবাগতান্
ইত্থং যস্য মিথোবিরোধিনৃপতীন্ দ্বাঃস্থো বিনিন্তে জনাঃ॥
—করণবেলের শিলালিপি ; Indian Antiquary, Vol, XVII, p. 217.

৭০। কুম্ভোদ্ভবঃ কর্ণপয়োধিপানে প্রজেশ্বরো নূতনরাজ্যসৃষ্টৌ
তত্রাস বিদ্যাধরগীতকীর্ত্তিঃ শ্রীকীর্ত্তিবর্ম্মক্ষিতিপো জগত্যাং॥৩
—অজয়গড়ের শিলালিপি ; Epigraphia Indica, Vol. I, p. 327.

৭১। তস্মাদ্বভূব ভরতস্য গুণৈঃ সমগ্রৈঃ শ্রীকীর্ত্তি বর্ম্ম...প্রস্তানেক
ক্ষমাভৃতমুচ্চকৈর্ব্বলহরিভির্লক্ষ্মীকর্ণং মহার্ণবমুন্মথ্য
অচলমহসা দোর্দ্দণ্ডেন প্রমথ্য যশঃসুধাং
য ইহ করিভির্লক্ষ্মীং লেভেপরঃ পুরুষোত্তমঃ॥২৩
মহোবার শিলালিপি ; Epigraphia Indica, Vol, I, p. 222.

৭২। সকলভূপালকুল প্রলয়কালাগ্নিরুদ্রেণ চেদিপতিনা সমুন্মূলিতং
চন্দ্রান্বয়পার্থিবানাং পৃথিব্যামাধিপত্যং স্থিরীকর্ত্তুমরমস্য সংরম্ভঃ।
—প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক, পৃঃ ১২।

৭৩। যেন চ বিবেকেনেব নির্জ্জিত্য কর্ণং মোহবিবর্জ্জিতং।
শ্রীকীর্ত্তিবর্ম্মনৃপতের্বোধস্যেবোদয়ঃ কৃতঃ।—প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক, পৃঃ ১৪।

৭৪। যেন কর্ণ সৈন্যসাগরং নির্ম্মথ্য মধুমথনেনেব ক্ষীরসমুদ্রং
সমাসাদিতা সমরবিজয়লক্ষ্মীঃ। —প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক পৃঃ ১১।

৭৫। Ueber das Leben der Jaina mouchs Hemchandra, by Geor Buhler, p. 69.

৭৬। বিক্রমাঙ্কদেবচরিত, ১৷১০২—৩ ; ১৮৷৯৩।

রায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাস বাহাদুর-সম্পাদিত বুদ্ধিষ্ট টেক্সট্ সোসাইটীর পত্রিকায় গৌড়েশ্বরের সহিত কর্ণদেবের যুদ্ধের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। "দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান যখন বজ্রাসনে, অর্থাৎ—মহাবোধিতে বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে মগধরাজ নয়পালের সহিত তীর্থিকধর্ম্মাবলম্বী কর্ণ-রাজ মগধ আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নগর অধিকার করিতে না পারিয়া কতকগুলি বৌদ্ধ বিহার মন্দিরাদি ধ্বংস করিয়াছিলেন। পরে নয়পালের সেনা জয়লাভ করিলে কর্ণ-রাজের সেনাগণ যখন নিহত হইতেছিল যখন শ্রীজ্ঞান তাহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় যুদ্ধ স্থগিত হইয়া সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল[৭৭]। তিব্বতীয় সাহিত্যের কর্ণ-রাজ যে চেদিরাজ কর্ণ, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী সর্ব্বপ্রথমে এই মত প্রকাশ করিয়া ছিলেন[৭৮]। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ তাহা সমর্থন করিয়াছেন[৭৯]; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুও এই মতাবলম্বী[৮০]। নয়পালের সহিত কর্ণের সন্ধি স্থাপিত হইলে নয়পালের পুত্র বিগ্রহপালের সহিত কর্ণের কন্যা যৌবনশ্রীর বিবাহ হইয়াছিল।

নয়পালদেবের রাজ্যের দুইখানি শিলালিপি ও এক খানি প্রাচীন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। গয়ানগরে কৃষ্ণ-দ্বারিকা মন্দিরে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, পরিতোষের পৌত্র, শূদ্রকের পুত্র, বিশ্বাদিত্য, নয়পালদেবের পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কে জনার্দ্দনের একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[৮১]। এই বিশ্বাদিত্য বা বিশ্বরূপ উক্ত বর্ষে গদাধরের জন্য আর একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান গদাধর-মন্দিরের প্রাঙ্গণে অবস্থিত নরসিংহদেবের মন্দিরমধ্যে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে এই কথা অবগত হওয়া যায়[৮২]। নয়পালদেবের চতুর্দ্দশ রাজ্যাঙ্কে রাজ্ঞী উদ্দাকার ব্যয়ে লিখিত একখানি "পঞ্চরক্ষা" গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা এক্ষণে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে। ইহার পুষ্পিকায় লিখিত আছে;—"দেয়ধর্ম্মোয়ং প্রবরমহাযানযায়িন্যা পরমোপাসিকারাজ্ঞীউদ্দাকায়া যদত্র-পুণ্যন্তদ্ভবত্বাচার্য্যোপাধ্যায়মাতাপিতৃপূর্ব্বংগমং কৃত্বা সকল সত্ত্বারাশেরনুত্তরজ্ঞানাবাপ্তয়ইতি॥ পরমসৌগতমহারাজাধি-রাজপরমেশ্বরশ্রীমন্নয়পালদেব-প্রবর্দ্ধমানবিজয়রাজ্যে সম্বৎ ১৪ চৈত্রদিনে ২৭ লিখিতেয়ং ভট্টারিকা। ইতি[৮৩]। অনুমান হয় যে, নয়পালদেব বিংশতিবর্ষকাল গৌড়-সিংহাসনে আসীন ছিলেন এবং ১০৪৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। নয়পালদেবের রাজ্যকালে বৈদ্যজাতির প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল; বৈদ্য-গ্রন্থকার চক্রপাণিদত্তের পিতা নারায়ণ, নয়পালদেবের রন্ধনশালার অধ্যক্ষ ছিলেন[৮৪]। জনার্দ্দন-মন্দিরের প্রশস্তি বাজীবৈদ্যসহদেব[৮৫] কর্ত্তৃক এবং গদাধর-মন্দিরের প্রশস্তি বৈদ্যবজ্রপাণি[৮৬] কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। এই খোদিতলিপিদ্বয়ে শিল্পীর অনবধানতাপ্রযুক্ত বহু ভ্রম সত্ত্বেও রচয়িতৃগণের বিদ্যার ও রচনাকৌশলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। নয়পাল-

৭৭। Journal of the Buddhist Text Society, Vol, I p, 9.

৭৮। Journal of the Asiatic Soceiety of Bengal, 1900, pt...I, 192.

৭৯। গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৪৫।

৮০। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ১২৫, পাদটীকা, ১৯।

৮১। গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১১১—১৫।

৮২। Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V. p, 78

৮৩। Bendall's Catalogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts in the University Library, Cambridge, p, 175. No. Add 1688

৮৪। চক্রদত্ত, ১৩০২ সাল, পৃঃ ৪০৭।

৮৫। গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১২০।

৮৬ Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol V, p 78

দেবের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল গৌড়-মগধ-বঙ্গের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন[৮৭]। নয়পাল দেবের রাজ্যকালে বিক্রমপুরবাসী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নালন্দে মহাবিহারের সঙ্ঘস্থবির নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিব্বত-রাজের অনুরোধে শ্রীজ্ঞান তথায় গমন করিয়াছিলেন[৮৮]।

তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের রাজ্যকাল হইতে পাল-সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছিল। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষপাদে উত্তরাপথে রাজ-শক্তির একান্ত অভাব হইয়াছিল। আর্য্যাবর্ত্তের এই ঘোর দুর্দ্দিনে মুসলমান সেনাপতি আহমদ্ নিয়াল্-তিগীন্ অনায়াসে বিস্তৃত মধ্যদেশ অতিক্রম করিয়া পবিত্র বারানসী নগরী লুণ্ঠন করিয়াছিলেন[৮৯]। বিশাল আর্য্যাবর্ত্তের অসংখ্য রাজন্যগণের মধ্যে কেহই তাঁহাকে বাধা দিতে অগ্রসর হন নাই। গুর্জ্জরেশ্বর প্রয়াগে প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র দুর্গে আত্মরক্ষার চিন্তায় ব্যাপৃত ছিলেন। অন্তর্ব্বিদ্রোহ দমন ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষা-কার্য্যে তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। চেদিবংশীয় কর্ণদেব ও কল্যাণের চালুক্যবংশীয় আহবমল্লের পুত্র বিক্রমাদিত্য[৯০] তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকালে গৌড়-রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। কর্ণদেব পরাজিত হইয়া তাঁহার যৌবনশ্রী নাম্নী কন্যার সহিত বিগ্রহপাল-দেবের বিবাহ দিয়াছিলেন[৯১]। চালুক্য-রাজ আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বার্দ্ধ বিজয় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। এই সময়ে উত্তরবঙ্গে কৈবর্ত্ত জাতি বিদ্রোহী হইয়াছিল এবং তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের রাজত্বের শেষভাগ বিদ্রোহ-দমনে অতিবাহিত হইয়াছিল। তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের একখানি তাম্রশাসন ও একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাম্রশাসনখানি বিগ্রহপালদেবের দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কে সম্পাদিত হইয়াছিল এবং এতদ্বারা বিগ্রহপালদেব পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির কোটিবর্ষ-বিষয়ে অবস্থিত ব্রাহ্মণী গ্রামে খোদ্দোতদেবশর্ম্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়াছিলেন[৯২]। শিলালিপিখানি গয়ায় অক্ষয়-বটের পাদমূলে সংলগ্ন আছে ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বিগ্রহপালদেবের পঞ্চম রাজ্যাঙ্কে বিশ্বাদিত্য গয়া নগরে বটেশ ও প্রপিতামহেশ্বর নামক শিবলিঙ্গদ্বয় স্থাপন করিয়া দুইটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[৯৩]।

৮৭। পীতঃ সজ্জন-লোচনৈঃ স্মররিপোঃ পূজা [নুরক্তঃ সদা।]
সংগ্রামে [চতুরো] ঽধিক [*] হরিতঃ কালঃ কুলে বিদ্বিষাং।
চাতুর্ব্বর্ণ্য-সমাশ্রয়ঃ সিতযশ [ঃ পুঞ্জৈ] র্জ্জগদ্রঞ্জয়ন
শ্রীমদ্বিগ্রহপালদেব—নৃপতি-[র্জ্জে-ভতো ধামভ্যা ?] ॥ ১৩
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১২৫।

৮৮। Indian Pandits in the land of Snow, by Rai Sarat Chandra Das Bahadur, C I E, pp 51 71

৮৯। Farikh-i-Bait aki (Bibliotheca Indica), p 497

৯০। গায়ন্তিস্ম গৃহীত-গৌড়-বিজয়-স্তম্বেরমস্যাহবে
তস্যোন্মূলিত-কামরূপ-নৃপতি-প্রাজ্য-প্রতাপশ্রিয়ঃ।
ভানুস্যন্দন-চক্র-ঘোষমুষিতপ্রত্যুষনিদ্রারসাঃ
পুর্ব্বোদ্রেঃ কটকেষু সিদ্ধবনিতাঃ প্রালেয়শুভ্রং যশঃ ॥
—বিক্রমাঙ্কদেবচরিত, ৩-৭৪।

৯১। যো বিগ্রহপালো যৌবনশ্রিয়া কর্ণস্য রাজ্ঞঃ সুতয়া সহ ক্ষৌণীমূঢ়বান্। সহসা বলেনাবিষ্টো রক্ষিতো রণজিতঃ সংগ্রামজিতঃ কর্ণো দাহলাধিপতির্যেন। রণজিৎ এব পরন্তু রক্ষিতো ন উন্মূলিত।
—রামচরিত; ১।৯ টীকা ; ৯২। Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol III p 22

৯২। গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১২২ ; Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol V p 80 Epigraphia Indica Vol XV pp 293-301

৯৩। Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol V pp 81-82

বিগ্রহপালদেবের ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কে সুবর্ণকার সাহের পুত্র দেহেক একটি বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন[৯৪]। এই মূর্ত্তিটি বিহার নগরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং ইহা এক্ষণে কলিকাতার চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। কর্ণের কন্যা যৌবনশ্রী ব্যতীত তৃতীয় বিগ্রহপাল এক রাষ্টকূট-বংশীয়া মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইঁহার নাম অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নংই। বিগ্রহপালদেবের তিন পুত্রের নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে ;—মহীপাল, শূরপাল ও রামপাল। রামপাল রাষ্ট্রকূটবংশীয়া মহিষীর গর্ভজাত। ইঁহারা সকলেই একে একে গৌড়-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। বিগ্রহপালদেবের মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় মহীপালদেব গৌড়-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

বীরভূম জেলায় পাইকোর গ্রামে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় চেদী-রাজ শ্রীকর্ণদেবের শিলালিপি-যুক্ত একটি পাষাণস্তম্ভ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই খোদিতলিপিতে শ্রীকর্ণদেবের নাম ও তাঁহার বংশপরিচয় স্পষ্ট পাঠ করা যায় কিন্তু খোদিতলিপি ক্ষয় হইয়া যাওয়ায় উক্ত স্তম্ভ কি জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। বঙ্গদেশের কেন্দ্রস্থলে রাঢ় ভূভাগের মধ্যদেশে অবস্থিত পাইকোর গ্রামে এই স্তম্ভ আবিষ্কৃত হওয়ায় অনুমান হইতেছে, কর্ণদেব স্বয়ং এই পাইকোর গ্রামে আসিয়া একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, অথবা একটি জয়স্তম্ভ স্থাপন করাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যে স্তম্ভটি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা হয় কর্ণদেবের জয়স্তম্ভ, না হয় কর্ণদেব নির্ম্মিত মন্দিরের মণ্ডপ বা অর্দ্ধমণ্ডপের স্তম্ভ[৯৫] কর্ণদেব নির্ম্মিত মন্দির রেবারাজ্যে অমর কণ্টকনামক তীর্থে আবিষ্কৃত হইয়াছে পাইকোরের ধ্বংসাবশেষ খনন করিলে নূতন তথ্য আবিষ্কার হইতে পারে। কর্ণদেব হয়ত যুদ্ধযাত্রায় গৌড়দেশে আসিয়া দ্বিতীয় অভিযানে গৌড়াধিপ তৃতীয় বিগ্রহপালকে পরাজিত করিয়া এই জয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন, অথবা তাঁহার কন্যা যৌবনশ্রীর সহিত তৃতীয় বিগ্রহপালের বিবাহ দিয়া পাইকোর গ্রামে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

তৃতীয় বিগ্রহপালদেবই বোধ হয় বহু রজত মুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন। এই জাতীয় মুদ্রা পাটনা জেলায় ঘোষরাবা গ্রামে, বীরদেব নির্ম্মিত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছিল[৯৬]।

পাল-বংশের অধঃপতন

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে যখন গৌড় বঙ্গ-মগধ বারংবার বহিঃশত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতেছিল, তখন বঙ্গে একটি নূতন রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল বিগত বিশ বৎসরের মধ্যে একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়া এই নব-প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের কথা জন-সমাজে সুপরিচিত করিয়াছে। নূতন রাজবংশ বর্ম্মবংশ নামে পরিচিত হইয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিম সীমায় পঞ্চনদ প্রদেশের সিংহপুর নগর প্রাচীন যাদব জাতির পুরাতন রাজধানী। চীনদেশীয় শ্রমণ ইউয়ান্ চোয়াং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে সিংহপুর রাজ্য দর্শন করিয়াছিলেন[১]। হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশে লক্ষামণ্ডল নামক স্থানে প্রাপ্ত একখানি শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বর্ম্মবংশীয় দ্বাদশ জন রাজা খৃষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন[২]। মহারাজাধিরাজ ধর্ম্ম-পালদেব চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করণোদ্দেশ্যে বোধ হয়, এই সিংহপুরের যাদব-রাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রচোল, দ্বিতীয় জয়সিংহ, অথবা গাঙ্গেয়দেবের সহিত এই যাদব-বংশজাত বজ্রবর্ম্মা

৯৪। Ibid, p 112

৯৫। পাইকোরের স্তম্ভলিপির বিবরণ শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক "বীরভূম বিবরণ নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে (পৃঃ ৯)। প্রত্নতত্ত্ববিভাগের পূর্ব্বচক্রের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত আমাকে এই খোদিত লিপির প্রতিলিপি, উদ্ধৃত পাঠ ও স্তম্ভের চিত্র প্রদান করিয়া বাধিত করিয়াছেন।

৯৬। Catalogue of Coins in the Indian Muaeum, Vol I, p 233, 239

১। Watters' On Yuan Chwang, Vol I p 248

২। Epigraphia Indica, Vol I, pp 12—14

নামক জনৈক সেনাপতি উত্তরাপথের পশ্চিমার্দ্ধ হইতে পূর্ব্বার্দ্ধে আসিয়া একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ঢাকা জেলায় বেলাব গ্রামে আবিষ্কৃত বজ্রবর্ম্মার প্রপৌত্র ভোজবর্ম্মদেবের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, যাদব-সেনার সমর-বিজয় যাত্রাকালে বজ্রবর্ম্মা মঙ্গলস্বরূপ গণ্য হইতেন[৩]। কোন্ সময়ে কিরূপে বঙ্গের পালবংশের অধিকার লুপ্ত হইয়াছিল, তাহা অবগত হইবার কোন উপায় অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

বজ্রবর্ম্মা বোধ হয়, কেবল হরিকেল বা চন্দ্রদ্বীপ অধিকার করিয়া নূতন রাজ্য স্থাপন কবিয়াছিলেন, তৎপুত্র জাতবর্ম্মা কর্ণদেব ও তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের সমসাময়িক ব্যক্তি। তিনি কর্ণের কন্যা বীরশ্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভোজবর্ম্মদেবের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, জাতবর্ম্মা দিব্য ও গোবর্দ্ধন নামক নরপতিদ্বয়কে পরাজিত, অঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ এবং কামরূপরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন[৪]। দিব্য, বারেন্দ্রের কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহের অধিনায়ক; ইনি রামচরিতে দিব্বোক নামে অভিহিত হইয়াছেন[৫]। দিব্বোক বোধ হয়, গৌড় অধিকার করিরা বঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে জাতবর্ম্মা তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। জাতবর্ম্মা বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, কর্ণ অথবা চালুক্যবংশীয় কুমার বিক্রমাদিত্যের সহিত তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের যুদ্ধকালে বঙ্গেশ্বর গৌড়েশ্বরের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। রামচরিতে "ঘোরপবর্দ্ধন" নামক জনৈক কৌশাম্বী অধিপতির নাম আছে[৬]। অনুমান হয়, লিপিকর-প্রমাদে শ্রীগোবর্দ্ধন স্থানে ঘোরপবর্দ্ধন লিখিত হইয়াছে এই গোবর্দ্ধনই জাতবর্ম্মা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। জাতবর্ম্মা কর্ত্তৃক পরাজিত কামরূপাধিপতির নাম অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের জীবিতকালে অথবা তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে উত্তরবঙ্গে কৈবর্ত্তগণ বিদ্রোহী হইয়াছিল। সন্ধ্যাকরনন্দী-বিরচিত 'রামচরিত' কাব্যে কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহ এবং বিদ্রোহ দমনার্থ রামপালের যুদ্ধাভিযান বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল পাল-সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন[৭]। মহীপাল রাজ্যাধিকার পাইয়া মন্ত্রিগণের পরামর্শের বিরুদ্ধে অনীতিক আচরণ আরম্ভ করিয়াছিলেন

৩। অভবদথ কদাচিদ্‌যাদবীনাং চমূনাং
সমরবিজয়যাত্রামঙ্গলং বজ্রবর্ম্মা।
শমন ইব রিপূণাং সোমবদ্বান্ধবানাং
কবিরপি চ কবীনাং পণ্ডিতঃ পণ্ডিতানাং ॥

—বেলাব গ্রামে আবিষ্কৃত ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসন; সাহিত্য, ১৩১৯, পৃঃ ৩৮২

Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Vol X, p 126; Epigraphia indica, Vol XII, pp 39—41

৪। গৃহ্নন্ বৈণ্যপৃথুশ্রিয়ং পরিণয়ন্ কর্ণস্য বীরশ্রিয়ং
যোঙ্গেষু প্রথয়ন্নিয়ং পরিভবংস্তাং কামরূপশ্রিয়ম্।
নিন্দন্দিব্যভুজশ্রিয়ং বিকলয়ন্ গোবর্দ্ধনস্য শ্রিয়ং
কুর্বন্ শোত্রিয়সাচ্ছিয়ং বিততবান্ যাং সার্বভৌম শ্রয়ম্ ॥

—Journal of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol X, p 127

৫। "...দিব্যাহ্বয়েন দিব্যনাম্না দিব্বোকেন ...।"—রামচরিত, ১।৩৮, টীকা।

৬। "...বর্দ্ধন ইতি কৌশাম্বীপতির্দ্বোরপবর্দ্ধনঃ... ।"—রামচরিত, ২।৬ টীকা।

৭। তন্নন্দনশ্চন্দন-বারি-হারি
কীর্ত্তিপ্রভানন্দিত-বিশ্বগীতঃ।
শ্রীমান্ মহীপাল ইতি দ্বিতীয়ো
দ্বিজেশমৌলিঃ শিববন্নভুব ॥১৩

—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৫১।

এবং রামপালকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন[৮]। রামপালের দ্বিতীয় ভ্রাতা শূরপালও রামপালের সহিত কারাগারে আবদ্ধ হইয়াছিলেন[৯]। মহীপাল ভ্রাতৃদ্বয় কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইবার ভয়ে তাঁহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন[১০]। খলস্বভাব ব্যক্তিগণ মহীপালকে কহিয়াছিল যে, রামপাল কৃতী এবং ক্ষমতাশালী, সুতরাং তিনি বলপূর্ব্বক তাঁহার রাজ্য গ্রহণ করিবেন অথবা তাঁহাকে হত্যা করিবেন[১১]। এই জন্য মহীপাল রামপালকে শাঠ্যপ্রয়োগে বধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং অবশেষে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। রামপালদেব যে সময়ে কারারুদ্ধ সেই সময়ে মহীপাল সামান্য সেনা লইয়া বিদ্রোহিগণের সম্মিলিত সেনাসমূহের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নিহত হইয়াছিলেন[১২]। তৃতীয় মহীপালদেবের পরে দ্বিতীয় শূরপালদেবের পরে দ্বিতীয় শূরপালদেব পাল-সাম্রাজ্যের অধীশ্বররূপে ঘোষিত হইয়াছিলেন। তখন রাজ্যচ্যুত, রাজধানী হইতে তাড়িত ভ্রাতৃগণ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পলায়নপর বলিয়া বোধ হয় সন্ধ্যাকরনন্দী শূরপালের রাজ্যপ্রাপ্তির বিশেষ উল্লেখ করেন নাই। মনহলিতে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে দ্বিতীয় শূরপালদেব সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে, "মহেন্দ্রতুল্য" 'মহিমান্বিত' স্কন্দতুল্য প্রতাপসমন্বিত, সাহসসারথী, নীতিগুণসম্পন্ন শ্রীশূরপাল নামক নরপাল তাঁহার (দ্বিতীয় মহীপালের) এক অনুজ ছিলেন[১৩]।" শূরপাল অন্ততঃ কয়েক দিনের জন্যও গৌড়েশ্বররূপে ঘোষিত না হইলে মদনপালের প্রশস্তিকার কখনই তাঁহাকে নরপতি বলিয়া উল্লেখ করিতেন না) শূরপালদেব রাজ্যাভিষিক্ত না হইলে মদনপালের প্রশস্তিরচয়িতা কখনই তাঁহার নাম করিতেন না। 'রামচরিতে' রামপালের পুত্র রাজ্যপালের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু রাজ্যপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই বলিয়া মদনপালের প্রশস্তিকার রামপালের

৮। প্রথমমিত্যাদি। প্রথমং পূর্ব্বং পিতরি বিগ্রহপাল উপরতে সতি মহীপালে ভ্রাতরি ক্ষমাভারং ভুভারং বিভ্রতি সতি অনীতিকারম্ভরতে অনীতিকে নীতিবিরুদ্ধে আরম্ভে উদ্যমে রতে মহীপালঃ যাডগুণ্যশল্যস্য মন্ত্রিণো গুণিতমবগুণয়ন্ উপষ্টম্ভার ভটীমাত্রাদীষৎগ্রহণেন...।

—রামচরিত ১।৩১, টীকা।

৯। অন্যত্র। অপরেণ ভ্রাত্রা সুরপালেন সহ কষ্টাগারং কারাগৃহং মহদবনং রক্ষণং যত্র দুর্দ্দৈবাধীনে নবা সুতনায়সী লোহসম্বন্ধিনী কুম্ভী নিগড়রূপা সা লতেব জঙ্ঘাতরু বিদূরবেষ্টনাৎ তয়া ভেদিনী বিদীর্ণে অকুচে অংসকোটনী জানুনী অষ্ঠীবতী যস্য।

—রামচরিত, ১।৩৩ টীকা।

১০। অন্যত্র। বিজনে স্থানমবস্থানং তেন ব্যহো বিগত উহো যস্য তস্মিন্ রামপালে ভুতং সত্যং নারো নীতং তয়োররক্ষণে যুক্ত প্রসক্তো দায়াদো মহীপালো যস্য মায়া লক্ষ্মীং গ্রহীষ্যতীতি মুগ্ধতয়া অন্তরিতে তিরোহিতে ভুমীগৃহাদিগুপ্তক্ষিপ্তে রামপালে সতি।

—রামচরিত, ১৩৬, টীকা।

১১। অন্যত্র। মায়িনাং খলানাং ধ্বনিনা অয়ং রামপালঃ ক্ষমোঽধিকারী সর্ব্ব সম্মতঃ ততশ্চ দেবস্য রাজ্যং গ্রহীষ্যতীতি সূচনয়া শঙ্কিতবিপদঃ মামসৌ হনিষ্যতীতি শঙ্কিতাবিপচ্চেন তস্য ভুবোর্ভর্ত্তুর্ম্মহীপালস্য প্রভুতায়া বহুতরায়া নিরাকৃতিপ্রযুক্তিতঃ শাঠ্যপ্রয়োগাৎ উপায়বধচেষ্টয়া তথা ত্বনাকারেনাপন্নে দুর্গতে কনিষ্ঠে ভ্রাতরি রামপালে রক্ষিতরি ভাবার্থে।

—রামচরিত, ১।৩৭, টীকা।

১২। ....মিলিতানন্তসামন্তচক্রতুরচতুরঙ্গবলবলয়িতবহলমদকলকরিতুরগতরণিচরণচারুভটচমূসম্ভারসংরনির্ভরভয়ভীতরিক্ত-মুক্ত কুন্তলপলায়নানবিকলসকল সৈন্যেন স্বতঃ ক্ষয়াতিশরমাসেদুষা সহ সহসৈব বলদ্বিপর্য্যয়কোটিকষ্টতরসমরমারভ্য নিরমজ্জত। রামাধিকারিতাং রামপালস্য তস্মিন্ সময়ে নিগড়বদ্ধস্য আধির্ম্মানসী ব্যথা তৎকরণশীলতাং দধতি এতদগ্রেস্ফুটয়িষ্যতি।

—রামচরিত, ১।৩১, টীকা; রামচরিত, ১।২৯ টীকা।

১৩। তস্যাভুদনুজো মহেন্দ্রমহিমা ক (স্ক) ন্দঃ প্রতাপশ্রিয়া-
মেকঃ সাহস-সারথির্গুণনরঃ শ্রীশূরপালো নৃপঃ [।]
যঃ স্বচ্ছন্দ-নিসর্গ-বিভ্রমভরা-[ন্] বিভ্রৎ-[স্ব] সর্ব্বায়ুধ
প্রাগল্‌ভ্যেন মনঃসু বিস্ময়-ভয়ং সন্যস্তবান দ্বিষাং ॥১৪

—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১১১।

পুত্রগণের মধ্যে কেবল কুমারপাল ও মদনপালের নাম করিয়াছেন।

দ্বিতীয় শূরপালদেব কোন সময়ে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, কত দিন রাজ্য করিয়াছিলেন এবং কিরূপে তাঁহার রাজ্যের অবসান হইয়াছিল, তাহা জানিবার কোন উপায়ই নাই। সন্ধ্যাকরনন্দী এই বিষয়ে নীরব। 'রামচরিতে' শূরপালের সিংহাসন-লাভের, তাঁহার রাজ্যকালীন ঘটনার এবং তাঁহার মৃত্যুর বিবরণের অভাব দেখিয়া অনুমান হয় যে, রামপাল কোনও উপায়ে শূরপালকে সংহার করিয়া পৈত্রিক রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। শূরপালের পরে রামপাল গৌড় রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রামপালের অভিষেককালে পাল-রাজগণের অধিকার বোধ হয় ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যস্থিত 'ব' দ্বীপে সীমাবদ্ধ হইয়াছিল; কারণ রামপালকে দিব্বোকের রাজ্য উত্তর বঙ্গ অধিকার জন্য ভাগীরথীর উপরে নৌকামেলক বা নৌ-সেতু বন্ধন করিতে হইয়াছিল[১৪]। রামপাল শূরপালের মৃত্যুর পরে যখন গৌড়-সিংহাসনের অধিকার লাভ করিলেন, তখন দিব্বোকের ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম গৌড়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। দিব্বোকের পরে বোধ হয়, তাঁহার ভ্রাতা রুদোক গৌড়-রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রুদোকের পুত্র উত্তরাধিকারসূত্রে উত্তরবঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন[১৫]। সেই সময়ে রামপাল অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন[১৬]। তাঁহার পুত্র রাজ্যপাল ও অমাত্যগণ সর্ব্বদা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন[১৭]। তদনন্তর রামপাল সাম্রাজ্যের প্রধান সামন্তগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কিয়দ্দিন পর্য্যটন করিয়াছিলেন এবং আটবিক অর্থাৎ—বনময় প্রদেশসমূহের সামন্তগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন[১৮]। পর্য্যটনান্তে রামপাল বুঝিতে পারিলেন যে, সামন্তগণ তাঁহার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়াছেন[১৯]। তদনন্তর তিনি পদাতিক, অশ্ব ও গজারোহী সেনা সংগ্রহ করিলেন।

১৪। Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol III, p 14

১৫। অন্যত্র সা ভূমিঃ অভিখ্যয়া নাম্না বরেন্দ্রী তস্যা অস্য দিব্বোকস্য যো অনুজো রুদোকঃ তদীয়তনয়স্য ভীমনামঃ রক্ষ্যপ্রহারিণঃ ক্রিয়াক্ষমস্য অলংকর্ম্মীণস্য যথোক্তক্রমেণ রক্ষণীয়াভূৎ। স তত্র ভূপতিঃ বর্ত্তমানঃ॥

—রামচরিত, ১।৩৯।

কৈবর্ত্তনায়ক দিব্বোক সম্ভবতঃ প্রথমে পাল-রাজগণের ভৃত্য ছিলেন। "অতএব কান্তা কামনীয়া দিব্যনাম্না দিব্বোকেন মাংসভুজা লক্ষ্যা অংশং ভুঞ্জানেন ভৃত্যেনোচ্চৈর্দশকেন উচ্চৈর্মহতী দশা অবস্থা যস্য অত্যুচ্ছ্রিতেনেত্যর্থঃ দস্যুনা শত্রুণা তদ্ভাবাপন্নত্বাৎ অবশ্যকর্ত্তব্যতয়া কর্ম্ম ব্রতং ছদ্মনি ব্রতী।

—রামচরিত, ১।৩৮ টীকা।

১৬। অতিশয়েন বিনাশী বিনাশিতমঃ অরির্যাভ্যাং যয়োর্বা তৌ চ সমুচ্চয়ে ভুজৌ বিপক্ষাক্ষিপ্তভুজ্যমানভূমিত্বাৎ বিফলৌ দধৎ। উপগতা ইষ্টতমা মিত্রাণি মাতৃবন্ধবো যস্য সন্ততঃ ধাম শৌর্য্যং স্বং শূন্যং মিথ্যা কলিতবান্॥

—রামচরিত, ১।৪০ টীকা।

১৭। অন্যত্র। সখ্যা অমাত্যেন সূনুনা সুতেন চ সহ কৃতৌ পরমৌ মহান্তৌ উহাপোহৌ ইদং কর্ত্তব্যম ইদং ন কর্ত্তব্যং ইত্যাদিকৌ যেন স্থিরতত স্থিরসম্বিতং কৃতনিশ্চয়ঃ ৮থানং উদ্যমং লব্ধবান্॥

—রামচরিত ১।৪২ টীকা।

১৮। রামপালের সামন্তচক্রং প্রণিনীযুণা পৃথী পর্য্যটিতা। অত্র ব্যালা অগ্রহারিকা বৈষয়িকা আটবিকা অটবীয়সামন্তাঃ উর্ব্বীভূদ্রাজা। ইষ্টার্থোঽভিলষিতার্থঃ।

রামচরিত, ১।৪৩ টীকা।

১৯। অন্যত্র সহ সম্বন্ধার্থং সামন্তব্রজং বক্ষ্যমাণনায়কং অম্বয়স্য ভূদয়স্য ভবনং অবিতনয়ং গূঢ়ানীতিঃ মিত্রকোটিপ্রবিষ্টং স রামপালোঽনুমোনে॥

—রামচরিত, ১।৪৪ টীকা।

এই সময়ে তাঁহাকে নদীতীরস্থ বহু ভূমি ও বিপুল অর্থ দান করিতে হইয়াছিল[২০]।

ত্রিবিধ সেনা সংগৃহীত হইলে রামপালদেবের মাতুল-রাষ্ট্রকূট-বংশীয় শিবরাজদেব সেনা লইয়া রামপালের আদেশে গঙ্গা পার হইয়াছিলেন[২১]। মহাপ্রতীহার শিব-রাজদেব কৈবর্ত্তরাজ্যে অবস্থিত বিষয় ও গ্রামগুলি ভীমবেগে আক্রমণ করায় ভীমের প্রজাগণ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। দেব-ব্রাহ্মণাদির ভূমি রক্ষা করিবার জন্য শিবরাজ "ইহা কোন্ বিষয়, ইহা কোন্ গ্রাম" ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন[২২]। শিবরাজ বরেন্দ্রী হইতে ভীম কর্ত্তৃক নিযুক্ত রক্ষকগণকে দূর করিয়া দিয়াছিলেন এবং রাজসমীপে প্রত্যাগমন করিয়া রামপালকে জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার পিতৃভূমি শত্রুমুক্ত হইয়াছে[২৩]। শিবরাজ কর্ত্তৃক বরেন্দ্রী অধিকার বোধ হয় দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই; কারণ, ইহার অব্যবহিত পরেই রামপালকে বহু সেনা সমভিব্যাহারে পুনরায় বরেন্দ্রী আক্রমণ করিতে হইয়াছিল। বারেন্দ্র-অভিযানে নিম্নলিখিত সামন্তগণ রামপালের অধীনে যুদ্ধার্থে গমন করিয়াছিলেন;—মগধ এবং পীঠীর অধিপতি ভীমযশঃ, কোটাটবীর বীরগুণ, দণ্ডভুক্তি-রাজা জয়সিংহ, দেবগ্রামপ্রতিবদ্ধ বালবলভীর বিক্রমরাজ, অপরমন্দারের অধিপতি এবং আটবিক সামন্তচক্রের প্রধান লক্ষ্মীশূর কুজবটীর শূরপাল, তৈলকম্পের রুদ্রশিখর, উচ্ছালের অধিপতি ময়গলসিংহ, ঢেক্করীয়-রাজ প্রতাপসিংহ, কয়ঙ্গলমণ্ডলের অধিপতি নরসিংহার্জ্জুন, নিদ্রাবলের বিজয়রাজ, কৌশাম্বীপতি দ্বোরপবর্দ্ধন, পদুবন্বার সোম। এতদ্ব্যতীত রাজ্যপালাদি রামপালের পুত্রগণ পিতার সহিত যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন[২৪]। রামপালের মাতুল রাষ্ট্রকূটবংশীয় মথনদেব বা মহনদেব, মহামাণ্ডলিক কাহ্নুরদেব ও সুবর্ণদেব নামক পুত্রদ্বয় এবং ভ্রাতুষ্পুত্র মহাপ্রতীহার শিবরাজদেবের সহিত রামপালের যুদ্ধাভিযানে যোগদান করিয়াছিলেন[২৫]।

মগধ ও পীঠীর অধিপতি ভীমযশঃ 'রাম চরিতে'র টীকায় "কান্যকুব্জরাজবাজিনীগণ্ঠনভুজঙ্গ" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন[২৬]। সম্ভবতঃ কান্যকুব্জ-রাজ তৎকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে কোন্ বংশের কোন্ রাজা কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। প্রতীহারবংশীয় ত্রিলোচন পালের পরে চেদিবংশীয় কর্ণদেব বোধ হয়,

২০। দেবেনভুবো বিপুলদ্রবিণস্য চ দানতঃ সুখাচক্রে।
অমুনা হরিনাগপদাতিলব্ধবহলপ্রভাবোঽসৌ॥

অন্যত্র। অমুনা দেবেন রাজাঽসৌ সামন্তব্রজঃ হরয়োঽশ্বা নাগা হস্তিনঃ পদাতয়ঃ এভির্লব্ধো বহলঃ প্রভাবো যেন স তাটকভুবো ভূমের্বিপুলস্য ধনস্য চ দানতস্ত্যাগাৎ অনুকূলিতঃ॥ —রামচরিত, ১।৪৫ টীকা।

২১। অন্যত্র তরসাবলেন-শিবরাজেন শিবরাজনাম্না মহাপ্রতীহারেণ রাষ্ট্রকূটমাণিক্যেন অস্য রামপালস্য ভর্ত্তুরাজ্ঞয়া হিতৈষিণা আশুগজেন বলবতা সৈন্যবতা তুরঙ্গপুঙ্গবৈঃ খ্যাতং শৌর্য্যং যস। খরগুঃ তীক্ষ্ণরশ্মিস্তস্যেব রুগ্ দীপ্তির্যস্য সূর্য্যবত্তজস্বিনেত্যর্থঃ॥ রণো যুদ্ধঃ তত্রত্যবিক্রমেণ দীর্ণঃ ভীতঃ ইন্দ্রো যস্মাৎ কেশরি-কিশোরসদৃশেন শোম্বীতেন পঙ্কাঙ্কপ্রসাদালঙ্কারেণ মতাতটিনী গঙ্গা লংঘিতা।
—রামচরিত, ১।৪৭ টীকা।

২২। রামচরিত, ১।৪৮ টীকা।

২৩। রামচরিত, ১।৪৯।৫০।

২৪। অন্যত্র চণ্ডধামভিরুগ্রপ্রতাপৈর্ন্দনৈ রাজ্যপালাদিভিবিরচিতো হরীণামশ্বানাং কুঞ্জবাণাং ব্যূহো যস্য চতুরঙ্গং করিতুরগতরণিপদাতিমরং অরীন্ জয়ৎ বলং কলয়ন্। —রামচরিত, ২।৭ টিকা।

২৫। .... তদীয়নন্দনমহামাণ্ডলিককাহ্নুরদেবসুবর্ণদেবভ্রাতৃজমহাপ্রতীহারশিবরাজদেবপ্রভৃতিমভয়ভুজদণ্ডমুৎকৃষ্টরাষ্ট্রকূটসুভটং...
রামচরিত, ২।৮ টিকা।

২৬। রামচরিত ২।৫ টিকা।

কিয়ৎকাল কান্যকুব্জ অধিকার করিয়াছিলেন; কারণ, গাহডবালবংশীয় গোবিন্দচন্দ্রদেবের একখানি তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, ভোজদেব ও কর্ণদেবের পরে চন্দ্রদেব পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন[২৭]। গাহডবালবংশীয় চন্দ্রদেব খৃষ্টিয় একাদশ শতাব্দীর শেষপাদে আবির্ভূত হইয়াছিলেন[২৮]। তৎপূর্ব্বে বোধ হয়, কর্ণদেবের পুত্র যশঃকর্ণদেব কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন; কারণ, যশঃকর্ণদেবের পুত্রবধূ অহ্লণ দেবীর ভেড়াঘাটের শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, যশঃকর্ণ চম্পারণ্য বিদারণ করিয়াছিলেন[২৯]। চম্পারণ্য মিথিলার পশ্চিমে অবস্থিত, ইহার বর্ত্তমান নাম চম্পারণ[৩০]। সম্ভবতঃ যশঃকর্ণ ভীমযশঃ কর্ত্তৃক চম্পারণ্যের যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন এবং সে সময়ে তিনি কান্যকুব্জের অধিপতি ছিলেন। পীঠী দক্ষিণ মগধের প্রাচীন নাম। মথনদেবের দৌহিত্রী কান্যকুব্জ-রাজ গোবিন্দচন্দ্রের পত্নী কুমরদেবীর শিলালিপির পাঠোদ্ধারকালে ডাক্তার কোনো (Sten Konow) অনুমান করিয়াছিলেন যে, পীঠী মান্দ্রাজ প্রদেশে অবস্থিত পিট্টপুরমের প্রাচীন নাম[৩১]। কিন্তু খৃষ্টিয় একাদশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদে একই ব্যক্তির মগধ ও দাক্ষিণাত্যের নগরবিশেষের অধিপতি হওয়া অসম্ভব। 'রাম-চরিতে'র আর এক স্থানে পীঠীর উল্লেখ আছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অষ্টম টীকায় উল্লিখিত আছে যে মথনদেব বিন্ধ্যমাণিক্য নামক হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পীঠী ও মগধের অধিপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন[৩২] এবং বরাহ অবতারে নারায়ণ যেমন মেদিনীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেইরূপ রামপালের রাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। মথনদেবের দৌহিত্র কুমারদেবীর সারনাথে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতেও অবগত হওয়া যায় যে, মথনদেব কর্ত্তৃক পরাজিত পীঠীপতির নাম দেবরক্ষিত[৩৩]। গৌড়েশ্বরের মাতুল মহন পীঠীপতি দেবরক্ষিতকে পরাজিত করিয়া রামপালের সিংহাসন সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপন করিয়াছিলেন। সারনাথের শিলালিপিতে মথনদেব "রাজগণের মাতুল" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন, ইহা হইতে অনুমান হয় যে, সম্ভবতঃ দ্বিতীয় মহীপাল এবং দ্বিতীয় শূরপাল ও মথনদেবের ভাগিনেয় ছিলেন। সারনাথের শিলালিপিতে মথন কর্ত্তৃক দেবরক্ষিতের পরাজয়ের উল্লেখ দেখিয়া অনুমান হয় যে, সম্ভবতঃ কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহকালে অথবা তাহার পূর্ব্বে পীঠীপতি রামপালের, বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। মথনদেব জন্য স্বীয় কন্যা শঙ্করদেবীর সহিত দেবরক্ষিতের বিবাহ দিয়াছিলেন। রামপালের বারেন্দ্র অভিযানের; কারণ, বারেন্দ্র অভিযানকালে ভীমযশঃ মগধ ও পীঠির উল্লিখিত হইয়াছে। পীঠী বর্ত্তমান

২৭। Indian Antiquary, Vol. XIV, p, 103.

২৮। Epigraphia Indica, Vol. IX. p. 304.

২৯। চম্পারণ্যবিদারণোদ্গতহশঃশুভ্রাংশুনা ভাসয়ন্নাশাচক্রমবক্রতাবহৃদয়ঃ ক্ষ্মাপালচূড়ামণিঃ। ১৪

—ভেড়াঘাটের শিলালিপি; Epigraphia Indica, Vol. II, p. 11.

৩০। V, A. Smith—Catalogue of Coins in the Indian Museum. Vol. I, pp. 282, 293.

৩১। Epigraphia Indica, Vol. IX, p. 322.

(৩২) প্রস্তুত্র এতেষু সমন্তাসামন্তেষু তথাবিধেষু বিবিধেষু বিস্তানেষু চ রামপালঃ হুঙ্কাসিন্ধুরাজমথনগোত্রপ্রভবং হুঙ্কো নির্হুঙ্কো গালিত-গর্ব্বত্বাৎ গৃহীতবহুতরকরিতুরগ্রধিণপত্বাচ্চ সিন্ধুরাজঃ পীঠীপতির্দেববরক্ষিতো যাম যেন তেন মথনেন মথনাম্না মহনইতি প্রসিদ্ধাভিধানেন রাষ্ট্রকূটকুলতিলকেন...তথাহি মহনেন বিন্ধ্যমাণিক্যং করেণুরাজমারুহ্য সমরসীমন্যুল্লাসিতশল্যশতকোটিতোত্তটসুভটং শঙ্কটভরট্টমন্দোৎককি ঘটাঘোটকপটল স পীঠীপতির্মগাধিপপো নির্দ্দুহে।

৩৩। গৌড়েদ্বৈতভটঃ সকাণ্ডপটিকঃ ক্ষত্রৈকচূড়ামণিঃ
প্রখ্যাতো মহণাঙ্গপঃ ক্ষিতিভূজাম্মাম্ভোভবন্মাতুলঃ।
তং জিত্বা যুধি দেবরক্ষিতাখ্যাৎ শ্রীরামপালস্য যো
লক্ষ্মীং নিজ্জিত-বৈরি-রোধনতয়া দেদীপ্যমানোদরাম্ ॥৭
—Epigraphia, Indica, Vol. IX, p, 234,

পিট্ঠপুরমের প্রাচীন নাম হওয়া অসম্ভব; কারণ, তৃতীয় বিগ্রহপাল অথবা নয়পালের পরে পালরাজবংশের কোন রাজার দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ যাত্রা করিবার অথবা দাক্ষিণাত্যের কোন স্থানে অধিকার রক্ষা করিবার ক্ষমতা ছিল না। পীঠি দক্ষিণ মগধের অংশের অর্থাৎ বর্ত্তমান গয়া জেলার প্রাচীন নাম। দেশাবলী নামক গ্রন্থে পীঠঘট্টা নামক একটি স্থানের উল্লেখ আছে[৩৪]। ঘট্টা শব্দদ্বারা এই স্থান গঙ্গা বা অপর কোন নদীর উপরে অবস্থিত ছিল, ইহাই সূচিত হইতেছে। কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রায় 'পঠ' উৎকীর্ণ আছে দেখিতে পাওয়া যায়[৩৫]। ইহা প্রাচীন পীঠীর মুদ্রা হইলেও হইতে পারে। কিন্তু এই সকল মুদ্রার প্রাপ্তিস্থান নির্ণয় করিবার কোনই উপায় নাই এবং অদ্যাপি ইহাদিগের মুদ্রণকাল নির্ণীত হয় নাই। সামন্তচক্রের নামমালায় সর্ব্বাগ্রে পীঠীপতি মগধাধিপের নাম প্রদত্ত হইয়াছে এবং মূল শ্লোকে তিনি 'বন্দ্য' উপাধিতে অভিহিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ ভীমযশঃ গৌড়েশ্বরের সামন্তচক্রের মধ্যে প্রধান ছিলেন। ভীমযশের কোটের পার্ব্বত্যপ্রদেশের অধিপতি বীরগুণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। বীরগুণ 'রামচরিতে' "নানারত্নকূটকুট্টিমবিকটকোটাটবীকণ্ঠীরবো দক্ষিণ সিংহাসনচক্রবর্ত্তী" উপাধিতে অভিহিত হইয়াছেন[৩৬]। ডাক্তার-কিলহর্ণ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত দক্ষিণাপথের খোদিতলিপিমালায় বীরগুণনামধেয় কোন রাজার নাম দেখিতে পাওয়া যায় না[৩৭]। "কোট" অথবা "কোটাটবী" নামক কোন প্রাচীন লিপিতে আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন,—ইহা বিশাল অরণ্যানী-বেষ্টিত উড়িষ্যার গড়জাত প্রদেশ। আইন-ই-আকবরীতে এই স্থান কটক সরকারের অন্তর্গত 'কোটদেশ' বলিয়াই অভিহিত হইয়াছে[৩৮]। ইহা কোটাটবী হইলেও হইতে পারে। দণ্ডভুক্তি-রাজ জয়সিংহ "দণ্ডভুক্তিভূপতিরদ্ভুতপ্রভাবাকরকরকমলমুকুলতুলিতোৎকলেশকর্ণকেশরীসরিদ্বল্লভকুম্ভসম্ভবঃ"[৩৯] উপাধিতে অভিহিত হইয়াছেন। পূর্ব্বে প্রথম রাজেন্দ্রচোলের দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে দণ্ডভুক্তির বর্ত্তমান অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহ বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত ছিল। জয়সিংহ উড়িষ্যার রাজা কর্ণকেশরীকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কর্ণকেশরী নাম অদ্যাবধি কোন খোদিতলিপিতে আবিষ্কৃত হয় নাই। কর্ণকেশরী ব্যতীত উড়িষ্যার কেশরিবংশের আর একজন মাত্র রাজার নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইঁহার নাম উদ্যোতকেশরী[৪০]। জয়সিংহের পর দেবগ্রামপ্রতিবদ্ধ বালবলভীর অধীশ্বর বিক্রমরাজ্যের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। বালবলভীর অবস্থান অদ্যাবধি অজ্ঞাত রহিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতানুসারে 'বালবলভী' বর্ত্তমান 'বাগড়ী'র প্রাচীন নাম[৪১]। কিন্তু এই উক্তির সমর্থক কোন প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। 'রামচরিতে' বালবলভীর বিবরণ দেখিয়া বোধ হয় যে, উক্ত দেশ নদীবহুল ছিল[৪২]। উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরে আবিষ্কৃত হরিবর্ম্মদেবের পাওয়া যায়[৪৩]। ভুবনেশ্বর-প্রশস্তি এবং রামচরিত' ব্যতীত ভবদেবভট্ট-বিরচিত

৩৪। Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1904, pt. I, p, 178 Note 1.

৩৫। Catalogue of Coins in the Indian Museum, Vol, I, p, 163,

৩৬। রামচরিত, ১।৫ টিকা।

৩৭। Epigraphia Indica, Vol, VII, pp. 1-170,

৩৮। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ২৯১।

৩৯। রামচরিত ২।৫ টিকা।

৪০। Epigraphia Indica, Vol, V, App, p, 90, No, 668,

৪১। Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol, p, 14,

৪২। "দেবগ্রামপ্রতিবদ্ধবসুধাচক্রবালবালবলভীতরঙ্গবহলগলহস্তপ্রশস্তহস্তবিক্রমো...।

৪৩। Epigraphia Indica, Vol, VI, p, 207,

'প্রায়শ্চিত্তনিরূপণ' ও 'তন্ত্রবার্ত্তিটীকা' নামক গ্রন্থদ্বয়ে তাঁহার বালবলভীভুজঙ্গ উপাধিতে, বালবলভীর নাম দেখিতে পাওয়া যায়[৪৪]। বঙ্গদেশে বর্ত্তমান সময়ে দেবগ্রাম নামে বহু গ্রাম আছে, সুতরাং দেবগ্রাম বা বালবলভী যে নদীয়া জেলায় অবস্থিত ছিল এ কথা নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে না[৪৫]। বিক্রমরাজের পরে শূরবংশীয় অপরমন্দারের অধিপতি লক্ষ্মীশূরের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি 'রামচরিত, অপরমন্দারমধুসূদনঃ সমস্তাটবিকসামন্তচক্রচূড়ামণিঃ" উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছেন। লক্ষ্মীশূরের বংশপরিচয় অথবা তাঁহার নাম অন্য কোন প্রাচীন গ্রন্থ বা শিলালিপিতে আবিষ্কৃত হয় নাই। অপরমন্দারের অবস্থান নির্ণয় করিবার কোন উপায় আবিষ্কৃত হয় নাই। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে, অপর মন্দারের বর্ত্তমান নাম মন্দারণ[৪৬], কিন্তু এই সম্বন্ধে সমর্থক প্রমাণের অভাব আছে। ইহার পর কুজবটীর অধীশ্বর শূরপালের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। কুজবটীর অবস্থান ও শূরপালের বংশপরিচয় সম্বন্ধে কোন প্রমাণই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রথম রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলৈ শিলালিপিতে দণ্ডভুক্তি-রাজ ধর্ম্মপালের নাম পাওয়া গিয়াছে[৪৭]। দণ্ডভুক্তি-রাজ ধর্ম্মপাল এবং কুজবটী-রাজ শূরপাল হয়ত পাল-রাজবংশ সম্ভূত ছিলেন। শূরপালের পরে তৈলকম্পের অধিপতি রুদ্রশিখরের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তৈলকম্পের বর্ত্তমান নাম তেলকুপি[৪৮], ইহা মানভুম জেলায় অবস্থিত। রুদ্রশিখরের পরে উচ্ছালের অধিপতি ময়গল সিংহের নাম প্রদত্ত হইয়াছে। উচ্ছালের অবস্থান ও ময়মনসিংহের পরিচয় সম্বন্ধে কোন প্রমাণই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই, তথাপি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে, উচ্ছাল বর্ত্তমান বীরভূম জেলার কিয়দংশের প্রাচীন নাম। তিনি বলেন,—"শাল নদীর উত্তরবর্ত্তী 'জৈন উঝিয়াল পরগণা' প্রাচীন উচ্ছাল নাম রক্ষা করিতেছে[৪৯]। বসুজ মহাশয় বোধ হয় অবগত নহেন যে, বঙ্গদেশের নানা স্থানে উজিয়াল উপাধিযুক্ত পরগণা আছে। সরকার উদনের উজিয়ালঘাটী এবং সুলতানপুর উজিয়াল, সরকার মহ্‌মুদাবাদে উজিয়ালপুর তারা উজিয়াল, হুসেন উজিয়াল, সরকার বাজুহার শাহ উজিয়াল বাজু, জাফর উজিয়াল, নসরৎ উজিয়াল ও মোবারক উজিয়াল, সরকার শরিফাবাদে হুসেন উজিয়াল[৫০] প্রভৃতি নাম উদাহরণ স্বরূপ উল্লিখিত হইল। বসুজ মহাশয়ের রীতি অবলম্বন করিলে বঙ্গদেশের প্রতি বিভাগে এক একটি উচ্ছাল রাজ্য ছিল স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। উচ্ছাল রাজের পরে ঢেক্করীয়-রাজ প্রতাপসিংহের নাম লিখিত আছে। ঢেক্করীয় নগর উত্তর-রাঢ়ে অবস্থিত ছিল এবং অদ্যাবধি ইহা ঢেকুরি নামে সুপরিচিত। এতদ্ব্যতীত কয়ঙ্গল মণ্ডলের নরসিংহার্জ্জুন, সঙ্কট গ্রামের চণ্ডার্জ্জুন, নিদ্রাবলের বিজয়রাজ, কৌশাম্বীর দ্বোরপ বর্দ্ধন এবং পদুবন্বার সোম, রামপালের সামন্তচক্রের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছেন। তন্মধ্যে দ্বোরপ বর্দ্ধন বোধ হয়, ভোজবর্ম্মদেবের তাম্রশাসনে উল্লিখিত এবং জাতবর্ম্মার সমসাময়িক গোবর্দ্ধন[৫১]। কৌশাম্বীর বর্ত্তমান নাম কুশুম্বা, ইহা রাজসাহী জেলায় অবস্থিত। এই স্থানে হুসেন শাহের পুত্র নসরত শাহের রাজত্বকালে

৪৪। Ibid, pp, 204-05,

৪৫। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।
—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ১৯৮।

৪৬। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড) পৃঃ ১৯৯।

৪৭। Epigraphia Indica, Vol, IX, p, 232,

৪৮। Cunningham's Archaeological Survey Report, Vol, VII, p, 169,

৪৯। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (রাজন্যকাণ্ড) পৃঃ ১৯৯।

৫০। Ain-i-Akbari, Vol, II, (Jarret's Trans,) ph. 129-140,

৫১। Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Vol, X, 127,

নির্ম্মিত একটি প্রাচীন মসজিদ আছে। বসুজ মহাশয় বলেন যে, নিদ্রাবলের বিজয়রাজই সেনবংশীয় বিজয়সেন[৫২] কিন্তু এই উক্তির সমর্থক বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রমাণ আবিষ্কার হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

রামপাল ও তাঁহার সামন্তগণ নৌকামেলক নৌ-সেতু দ্বারা ভাগীরথী পার হইয়াছিলেন[৫৩]। রামচরিতের টীকা হইতে কোন্ স্থানে রামপালের সহিত কৈবর্ত্ত-রাজের যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না; তবে ইহা স্থির যে, বরেন্দ্রভূমির দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে কোনও স্থানে এই যুদ্ধ হইয়াছিল। কৈবর্ত্ত-রাজ ভীম, যুদ্ধকালে জীবিতাবস্থায় ধৃত হইয়াছিলেন[৫৪]। অন্য একস্থানে লিখিত আছে যে, ভীম হস্তিপৃষ্ঠে ধৃত হইয়াছিলেন[৫৫]। কৈবর্ত্ত-রাজ ধৃত হইয়াছেন শুনিয়া রামপালের সেনাগণ উৎসাহ পাইয়াছিল। ভীম ধৃত হইলে কৈবর্ত্ত-সেনা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল। রামপাল যুদ্ধান্তে ভীমের রাজধানী ডমর নগর ধ্বংস করিয়াছিলেন[৫৬]। সন্ধ্যাকরনন্দী ডমরকে শত্রুপক্ষের রাজধানী বলিয়া উপপুর আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। যুদ্ধান্তে ভীম বিত্তপাল নামক জনৈক কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন[৫৭]। পরাজিত কৈবর্ত্ত-সেনা হরি নামধেয় জনৈক নায়ক কর্ত্তৃক একত্র হইয়াছিল[৫৮]। হরির সহিত যুদ্ধে রামপালের পুত্র (সম্ভবতঃ রাজ্যপাল) বীরত্ব প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন[৫৯]। যুদ্ধান্তে হরি ধৃত হইয়া ভীমের সহিত নিহত হইয়াছিলেন। ইহার পরেই বোধ হয়, সমগ্র বরেন্দ্রভূমি রামপাল কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। রামপাল ভীমের সেনাগণকে স্বীয় সেনাদলে নিযুক্ত করিয়াছিলেন[৬০]। বিদ্রোহ দমনান্তে রামপালদেব গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যে রামাবতী নাম্নী একটি নূতন নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন[৬১]। শ্রীহেতুর চণ্ডেশ্বর ও ক্ষেমেশ্বর এই নূতন নগরের উপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন[৬২]। রামপালদেব এই নগরে

৫২। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (রাজন্যকাণ্ড) পৃঃ ১৪৫।

৫৩। অন্যত্র মহাবাহিন্যাং গঙ্গায়াং তরণিসম্ভবেন নৌকামেলকেন গুপ্তায়াং চ্ছন্নায়াং সম্যগুত্তরণং মুখরিতদিক্কোলাহলো যস্মিন্ ॥
—রামচরিত, ২।১০ টিকা।

৫৪। রামচরিত, ২।১৭ টীকা।

৫৫। রামচরিত, ২।২০ টীকা।

৫৬। অন্যত্র। অপি সমুচ্চয়ে। স রামপালো ভবস্য সংসারস্যাপদম্ বিপদম ডমরমুপপুরং শক্রকৃতমলাবীৎ।......ডমরপক্ষে দ্রবিণং ধনং, অবিতা রক্ষিতা প্রজা যেন করপল্লবলীলয়া আয়ুধচেষ্টয়া অবধুতনিখিলনৃপং যথা ভবতি।—রামচরিত, ১।২৭ টিকা।

৫৭। অথ বহুতরসা দৃত্যা যুক্তো;রামেণ বিত্তপালস্য।
সূনোরোভ্যাসে সহসা সৌরেশিতনয়ঃ প্রৈষি ॥
—রামচরিত, ২।৩৬।

৫৮। Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III, p, 14,

৫৯। Ibid.

৬০। অথ ভীমানীকং তেন মহাতরসাশনৈরমেয়বলম্।
সমচীয়ত হরিসুহৃদা সুবিহিতপরমণ্ডলাবরোধেন ॥
—রামচরিত, ২।৩৮।

৬১। অপ্যভিতো গঙ্গাকরতোয়ানর্ঘপ্রবাহপুণ্যতমাম্।
অপুনর্ভবাহ্বয়মহাতীর্থবিকলুষোজ্জ্বলামস্তঃ ॥
—রামচরিত, ৩।১০।

৬২। কুর্ব্বদ্ভিঃ শংদেবেন শ্রীহেত্বীশ্বরেণ দেবেন।
চণ্ডেশ্বরাভিধানেন কিল ক্ষেমেশ্বরেণ চ সনাথৈঃ ॥
—রামচরিত, ৩।২।

জগদ্দলমহাবিহার নামে একটি বিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[৬৩]। রামাবতী পাল-রাজবংশের শেষ রাজধানী এবং রামপালের কনিষ্ঠ পুত্র মদনপালের রাজ্যকালেও রামাবতী গৌড়-রাজ্যের রাজধানী ছিল[৬৪]। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতেও রামাবতী নগরী বিদ্যমান ছিল; কারণ, আবুল ফজল প্রণীত আইন-ই-আকবরীতে রমৌতি নগরের উল্লেখ আছে[৬৫]। লক্ষ্মণাবতী হইতে যেমন লক্ষ্ণৌতি হইয়াছে, সেইরূপ রামাবতী পারস্ত ভাষায় রমৌতি রূপ ধারণ করিয়াছে। ভ্রমক্রমে রমৌতি স্থানে রমরৌতি লিখিত হইয়াছে[৬৬]।

রামাবতী স্থাপনের পরে রামপালদেব উৎকল ও কলিঙ্গ বিজয় করিয়াছিলেন এবং উৎকল-রাজ্য নাগবংশীয় রাজগণকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন[৬৭]। রামপালের জনৈক সামন্ত কামরূপ বিজয় করিয়াছিলেন[৬৮]। কামরূপ রাজগণ বোধ হয়, এই সময়ে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিলেন, কারণ, গৌড়েশ্বরগণ বারম্বার কামরূপ-রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। রামপালের এবং কুমারপালের রাজত্বকালে কামরূপ-রাজ্য অধিকৃত হইয়াছিল এতদ্ব্যতীত সেনবংশীয় বিজয়সেন ও লক্ষ্মণসেন এক একবার কামরূপ অধিকার করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় শূরপালের রাজ্যকালে বর্ম্মবংশীয় শ্যামলবর্ম্মদেব বঙ্গদেশের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র ভোজদেবের তাম্রশাসনে তাঁহার রাজ্যকালের কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিবরণ নাই। শ্যামলবর্ম্মা জগদ্বি-

৬৩। Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III, p, 14,

৬৪। মদনপালদেবের তাম্রশাসন এই "রামাবতীনগর পরিসরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধবার" হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল।—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৫৩।

৬৫। Journal of the Royal Asiatic Society, 1896, p. 113,

৬৬। Ain-i-Akbari (Jarrett's Trans,) Vol, II. p, 131,

৬৭। ভবভূষণসন্ততিভুবমনুজগ্রাহজিতমুৎকলত্রং যঃ।
জগদবতিস্ম সমস্তং কলিঙ্গতস্তান্ নিশাচরান্ নিঘ্নন্ ॥
—রামচরিত, ৩।৪৫।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বলিয়াছেন যে, এই শ্লোকে "ভবভূষণ" অর্থে চন্দ্র বুঝায় এবং ভবভূষণসন্ততি" অর্থে সোমবংশীয় রাজা বুঝায়।" 'রামচরিতে'র ভূমিকায় শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,—"He (Rampala) conquered Utkala and restored it to the Nagavamsis," ইহা দ্বারা বুঝা যায়, শাস্ত্রী মহাশয় 'ভবভূষণসন্ততি' পদ 'নাগবংশীয়' অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। নাগ ভবের (শিবের) ভূষণ হইলেও নাগবংশীয় কোন রাজা উড়িষ্যায় কখনও রাজত্ব করিয়াছেন বলিয়া এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। উড়িষ্যার পার্ব্বত্যপ্রদেশে নাগবংশীয় রাজগণের বিস্তৃত অধিকার ছিল। সুহৃদ্বর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত হীরালাল 'গৌড়রাজমালা' প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে অন্ততঃ পাঁচখানি খোদিতলিপি ও একখানি তাম্রশাসনের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। (Epigraphia Indica, Vol, IX, pp, 161-164, 176 etc.) পক্ষান্তরে 'রামচরিতের' (২।৫) টীকা হইতে জানা যায়, রামপালের রাজ্য লাভের অব্যবহিত পূর্ব্বে উৎকলে 'কেশরী' উপাধিধারী একজন নৃপতি ছিলেন। ভীমের সহিত যুদ্ধোদ্যত রামপালের সহিত যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 'উৎকলেশ-কর্ণকেশরীর' পরাভবকারী দণ্ডভুক্তি-ভূপতি জয়সিংহের নাম দৃষ্ট হয়।" খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষপাদে একই প্রদেশে গঙ্গাবংশীয় অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গ ও কেশরীবংশীয় কর্ণকেশরীর অধিকার ছিল, তখন সেই প্রদেশে নাগবংশীয় রাজগণের অধিকার কেন থাকিতে পারে না, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সে সময়ে উড়িষ্যায় সোমবংশীয় নরপতিগণের অধিকার ছিল কিনা, তাহা অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই।

৬৮। তস্যাজিতকামরূপাদিবিষয়বিনিবৃত্তঃ মানসম্পাদ্যঃ।
মহিমানমায়নন্নৃপো যতমানস্য প্রজাভিরক্ষার্থম্ ॥
—রামচরিত, ৩।৪৭।

জয়মল্লের কন্যা মালব্যদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন[৬৯]। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর মতানুসারে জগদ্বিজয়মল্ল এবং জগদেকমল্ল একই ব্যক্তি[৭০], কিন্তু এই উক্তির পক্ষে কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্যামলবর্ম্মার পুত্র ভোজবর্ম্মা পিতার মৃত্যুর পরে বঙ্গদেশের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। ভোজবর্ম্মা, তাঁহার পঞ্চম রাজ্যাঙ্কে পৌণ্ড্রভুক্তির অন্তঃপাতী অধঃপত্তনমণ্ডলে কৌশাম্বী অষ্ট-গচ্ছ মণ্ডলসংবদ্ধ উপ্যলিকা বা উপ্পলিকা গ্রাম, মধ্যদেশ বিনির্গত উত্তর রাঢ়ের সিদ্ধল গ্রামবাসী পীতাম্বর দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র, জগন্নাথ দেবশর্ম্মার পৌত্র, বিশ্বরূপ দেবশর্ম্মার পুত্র, শান্ত্যাগারাধিকৃত রাম দেবশর্ম্মাকে প্রদান করিয়াছিলেন[৭১]। ভোজবর্ম্মা অথবা তাঁহার পুত্র রামপালের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'রামচরিত' হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বর্ম্মবংশীয় পূর্ব্বদেশের জনৈক রাজা নিজের পরিত্রাণের জন্য, নিজের হস্তী ও রথ প্রভৃতি রামপালকে উপহার দিয়া তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন[৭২]। বর্ম্ম-বংশীয় নরপতি কর্ত্তৃক রামপালের আশ্রয় গ্রহণের দুইটি কারণ অনুমান করা যাইতে পারে; প্রথম রামপাল কর্ত্তৃক বঙ্গ আক্রমণ এবং দ্বিতীয় সেনবংশীয় সামন্তসেন কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ অধিকার। বৃদ্ধ বয়সে রামপালদেব জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যপালদেবের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া রামাবতীতে বাস করিয়াছিলেন[৭৩]। মুদ্গগিরি বা মুঙ্গের অবস্থানকালে রামপালদেব তাঁহার মাতুল মথনদেবের মৃত্যু সংবাদ পাইয়াছিলেন[৭৪]। মথনদেবের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া রামপালদেব ব্রাহ্মণগণকে বহু ধন দান করিয়া গঙ্গা-সলিলে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন[৭৫]। তিনি বোধ হয়, পঞ্চচত্বারিংশদ্বর্ষকাল গৌড়-সিংহাসনে আসীন ছিলেন; কারণ, তাঁহার ৪২শ রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত একটি মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

তিব্বতদেশীয় ইতিহাসকার লামা তারানাথ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, রামপালদেব ষট্‌চত্বারিংশ বৎসরকাল গৌড়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন[৭৬]। ইহা অসম্ভব নহে;

৬৯। তস্য মালব্যদেব্যাসীৎ কন্যা ত্রৈলোক্যসুন্দরী।
জগদ্বিজয়মল্লস্য বৈজয়ন্তী মনোভবঃ॥
—Journal of the Asiatic Socicty of Bengal, New Series, Vol, X, p, 170,

৭০। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ২৮৬।

৭১। Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. X, pp, 128-129,

৭২। স্বপরিত্রাণনিমিত্তং পত্যা যঃ প্রাগ্দিশীয়েন।
বর-বারণেন চ নিজ-স্যন্দন-দানেন বর্ম্মণারাধে॥
—রামচরিত, ৩।৪৪।

৭৩। তত্র স রাজা নিবসন্নানাবিষয়সন্নি বশে
সূনুসমর্পিতরাজ্যো রামঃ কান্তা সথশ্চিরং রেমে॥
—রামচরিত, ৪।১।

৭৪। প্রাপ্তে কালে সবিতি দুর্ব্বাসসাদিত্যাশ্রবসে।
বৃষজিন্মথনোঽস্তুতনুর্নিঃ শ্রেণিকয়াত্রিস্থতপুরান্তরয়া॥
ইত্যধিমুদ্গিরি কলয়ন্ ব্রহ্মভুবঃ স্বং বহুপ্রদাতাঽসৌ।
কৃতনিশ্চয়ঃ কৃতার্থঃ প্রাস্থিত পৃথী পতির্মহাসরিতং॥
রামচরিত, ৪।৮-৯।

৭৫। জনজাতে রুদতি শুচা সারবসগ্রাহ্য তজ্জলং পুণ্যং।
বিরহসহপরিজনৈর্দুর্ব্বিষহং রামো জ গামস স্বভুবং॥
— রামচরিত, ৪।১০।

৭৬। Indian Antiquary, Vol, IV, p, 366,

কারণ, তাঁহার ৪২শ রাজ্যাঙ্কের খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। গৌড়ে মুসলমান অধিকারকালে লিখিত "শেখ শুভোদয়া" নামক সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, রামপাল "শাকে যুগ্মবেণুরন্ধ্র গতে" ভাগীরথী গর্ভে অনশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন[৭৭]। অদ্যাবধি রামপালদেবের তিন পুত্রের নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যপাল বোধ হয়, পিতার জীবিতকালেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন; কারণ, মনহলিতে আবিষ্কৃত মদনপালদেবের তাম্রশাসনে রাজ্যপালের নাম নাই। রামপালের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র, কুমারপাল ও মদনপাল যথাক্রমে গৌড়-সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। রামপালের মাতুল মথনদেব এবং তাঁহার ভ্রাতা সুবর্ণদেব, তাঁহাদিগের পুত্র কাহ্নুরদেব এবং শিবরাজদেবের নাম পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। 'রামচরিত' রচয়িতা সন্ধ্যাকরনন্দীর পিতা প্রজাপতিনন্দী রামপালের মহাসান্ধি বিগ্রহিক ছিলেন[৭৮] এবং তৃতীয় বিগ্রহপালের প্রধান মন্ত্রী যোগদেবের পুত্র বোধিদেব তাঁহার প্রধান অমাত্য ছিলেন[৭৯]।

রামপালদেবের দ্বিতীয় রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত একটি তারামূর্ত্তি প্রাচীন উদ্দণ্ডপুর দুর্গ মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই মূর্ত্তিটি এক্ষণে কলিকাতার চিত্রশালায় রক্ষিত আছে[৮০]। রামপালদেবের পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কে মগধবিষয়ে নালন্দায় গ্রহণকুণ্ড নামক জনৈক লেখক কর্ত্তৃক একখানি অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল:—

"মহারাজাধিরাজপরমেশ্বরপরমভট্টারকপরমসৌগত শ্রীমদ্রামপালদেবপ্রবর্দ্ধমানবিজয়রাজ্যে পঞ্চদশমে সম্বৎসরে অভিলিখ্যমানে যত্রাঙ্কেনাপি সম্বৎ ১৫ বৈশাক্ষ দিনে কৃষ্ণ সপ্তম্যাং ৭ অস্তি মগধবিষয়ে শ্রীনালন্দাবস্থিত লেখক গ্রহণকুণ্ডেন ভট্টারিকা প্রজ্ঞাপারমিতা লিখিতা ইতি"[৮১]; রামপালদেবের ৪২শ রাজ্যাঙ্কে রাজগৃহবিনির্গত এত্রহাগ্রামবাসী বণিক্ সাধু সহরণ একটি বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন[৮২]। এই মূর্ত্তিটি পাটনা জেলার গিরিয়েক পর্ব্বতের নিকটে চণ্ডীমৌ গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল[৮৩] এবং ইহা এক্ষণে কলিকাতার চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। সন্ধ্যাকরনন্দীবিরচিত রামচরিত আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে রামপালদেবের রাজত্বকালের কোন ঘটনাই বিদিত ছিল না। ডাক্তার ভিনিস্ (Dr. A. Venis) রামপালের মধ্যম পুত্র কুমারপালের মন্ত্রী, কামরূপ-রাজ বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন সম্পাদনকালে রামপালের রাজত্বকালের ঘটনাসমূহের বিবরণের অভাব অনুভব করিয়াছিলেন[৮৪]। রামচরিত আবিষ্কৃত হইয়া প্রকাশিত হইবার পরে

৭৭। শাকে যুগ্মবেণুরন্ধ্রগতে (?) কন্যাং গতে ভাস্করে
কৃষ্ণে বাক্‌পতি-বাসরে যমতিথৌ যামদ্বয়ে বাসরে।
জাহ্নব্যাং জলমধ্যতস্ত্বনশনৈর্ধ্যাত্বা পদংচক্রিণো
হা পালান্বয়-মৌলি-মণ্ডনমণিঃ শ্রীরামপালো মৃতঃ ॥
—গৌড়রাজমালা, পৃঃ ॥/০।

৭৮। তস্য তনয়ো মতনয়ঃ করণ্যানামগ্রণীনর্ব্বগুণঃ।
সান্ধিশ্রীপদাসম্ভাবিতাভিধানতঃ প্রজাপতির্জাতঃ ॥
—রামচরিত; কাবপ্রশস্তি, ৩ ॥

৭৯। যস্য শুদ্ধসচিবঃ পুরা ভবদ্বোধিদেব ইতি তত্ত্ববোধভুঃ।
বিশ্বগেববিদিতোঽদ্ভুতৈস্তু গৈরূজ্‌ঝিতাত্মসদৃশঃ ক্ষিতাবয়ং ॥ ৫
—কমৌলির তাম্রশাসন, গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১২৯।

৮০। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৫শ ভাগ, পৃঃ ১৩।

৮১। Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Bodleian Library, Cambridge, Vol, II, p, 250, no 1428.

৮২। Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V, pp. 93-94.

৮৩। Cunningham's Archaeological Survey Report, Vol, XI, p. 169,

৮৪। Epigraphia Indica, Vol. II. pp. 348-49,

রামপালদেবের রাজত্বকাল নির্ণয় এবং সেই সময়ের ঘটনাবলীর বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে।

'রামচরিত' মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে নেপালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে শাস্ত্রী মহাশয় এসিয়াটীক সোসাইটীর কার্য্য-বিবরণীতে 'রামচরিতে'র সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন[৮৫]। শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে সম্পূর্ণ মূলগ্রন্থ এবং প্রায় অর্দ্ধগ্রন্থের টীকা এসিয়াটীক সোসাইটীর জন্য আনয়ন করিয়াছেন। এই গ্রন্থ এখন কলিকাতার এসিয়াটীক সোসাইটীর পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে। ইহার দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চত্রিংশৎ শ্লোক পর্য্যন্ত টীকা আছে! ইহা 'রাঘব পাণ্ডবীয়ের' ন্যায় দ্ব্যর্থবাচক কাব্য। প্রত্যেক শ্লোকের দুইটি টীকা আছে, একটি রামপক্ষে ও অপরটি রামপাল পক্ষে। যে অংশের টীকা পাওয়া যায় নাই, সেই অংশ হইতে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা অতীব দুরূহ। 'রামচরিত' মূল ও টীকা তালপত্রে খৃষ্টীয় দ্বাদশ অথবা ত্রয়োদশ শতাব্দীর অক্ষরে লিখিত। মূল গ্রন্থ অপেক্ষা টীকার অক্ষর প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। 'রামচরিতে'র টীকা ঐতিহাসিকের নিকটে 'রামচরিত' অপেক্ষা মূল্যবান গ্রন্থ। টীকা আবিষ্কৃত না হইলে ঐতিহাসিকগণ 'রামচরিতে'র এত আদর করিতেন কি না সন্দেহ। এই টীকাতেই রামপালের রাজত্বকালের প্রধান প্রধান ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 'রামচরিতে'র প্রথম তিন অধ্যায়ে রামপালের রাজ্যকালের ঘটনা এবং চতুর্থ অধ্যায়ে কুমারপাল, তৃতীয় গোপাল এবং মদনপালদেবের রাজ্যকালের ঘটনাসমূহ বিবৃত হইয়াছে। রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডের ন্যায় 'রামচরিতে'র চতুর্থ অধ্যায় "রামোত্তরচরিত" নামে পরিচিত। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রামপালকে রামের সহিত তুলনা করা কবিগণের মধ্যে সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছিল। বৈদ্যদেবের প্রশস্তি রচয়িতা মনোরথও এই উপমা ব্যবহার করিয়াছেন। "সেই প্রবলপরাক্রমশালী নরপালের রামপাল নামক এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পাল-কুলসমুদ্রোত্থিত শীতকিরণ চন্দ্ররূপে প্রতিভাত এবং সাম্রাজ্যলাভে খ্যাতিভাজন হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র যেমন অর্ণব লঙ্ঘন করিয়া, রাবণবধান্তে জনক-নন্দিনী লাভ করিয়াছিলেন, রামপালদেবও সেইরূপ যুদ্ধার্ণব সমুত্তীর্ণ হইয়া ভীম নামক ক্ষৌণীনায়কের বধসাধন করিয়া জনকভূমি বরেন্দ্রীলাভে ত্রিজগতে আত্মযশঃ বিস্তৃত করিয়াছিলেন[৮৬]। সম্ভবতঃ সন্ধ্যাকরনন্দী স্বয়ং 'রামচরিতের' টীকা রচনা করিয়াছিলেন; কারণ, অপরের পক্ষে এই টীকা রচনা অসম্ভব শ্লোক মধ্যে একটি শব্দ দ্বারা যে সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা গ্রন্থকার ব্যতীত অপরের নিকটে দুর্ব্বোধ্য। সন্ধ্যাকরনন্দী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরের অধিবাসী ছিলেন[৮৭]। তাঁহার পিতা প্রজাপতিনন্দী রামপালের মহাসান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন[৮৮]; সুতরাং সন্ধ্যাকরনন্দী রামপালের রাজ্যকালের ঘটনাসমূহ যতদূর পর্য্যন্ত অবগত ছিলেন, তাহা অপরের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

রামপালের রাজধানী রামাবতী নগরীর ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় শব্দগত সাদৃশ্যের উপর নির্ভর

৮৫। Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1900, p, 70,

৮৬। তেনে যেন জগত্রয়ে জনকভূলাভাদ্‌যথাবচ্ছশঃ
ক্ষৌণীনায়কভীমরাবণবধাদ্ব্যুদ্ধার্ণবোল্লংঘনাৎ ॥ ৪
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১২৯।

৮৭। বসুধাশিরোবরেন্দ্রীমণ্ডলচূড়ামণিঃ কুলস্থানং।
শ্রীপৌণ্ড বর্দ্ধনপুরপ্রতিবদ্ধঃ পুণ্যভূঃ বৃহদ্বটুঃ ॥
—রামচরিত, কবিপ্রশস্তি,

৮৮। রামচরিত, কবি প্রশস্তি ১৩।

করিয়া ঢাকা জেলার অন্তর্গত রামপালকে রামাবতী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন[৮৯]। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বগুড়া জেলায় মহাস্থানগড়ের নিকট রামপুরা নামক স্থানে রামাবতীর অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন[৯০]। প্রাচীন রামাবতী, সরকার জন্নতাবাদ বা গৌড়ের সীমামধ্যে অবস্থিত ছিল এবং তাহার ধ্বংসাবশেষ কখনই ঢাকা অথবা বগুড়া জেলায় আবিষ্কৃত হইতে পারে না[৯১]। বগুড়া, সরকার ঘোড়াঘাটে[৯২] এবং সরকারবাজুহায়[৯৩] অবস্থিত এবং রামপাল, সরকার সোণারগাঁওয়ে[৯৪] অবস্থিত।

তিব্বতদেশীয় ইতিহাসকার লামা তারানাথের মতানুসারে যক্ষপাল নামক একজন রাজা রামপালের সিংহাসনের সমাধিকারী ছিলেন[৯৫]। গয়ায় যক্ষপাল নামক একজন নরপতির একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, শূদ্রকের পৌত্র, বিশ্বাদিত্যের পুত্র, যক্ষপাল সূর্য্যদেবের জন্য একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[৯৬]। যক্ষপালের পিতা বিশ্বাদিত্য নয়পালদেবের পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কে জনার্দ্দন ও গদাধরের মন্দির এবং তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের পঞ্চম রাজ্যাঙ্কে বটেশ ও প্রপিতামহেশ্বর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তারানাথ যক্ষপালকে রামপালের পুত্ররূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। অনুমান হয়, যক্ষপাল তৃতীয় বিগ্রহপালের মৃত্যুর পরে কিয়ৎকাল স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই তিনি গয়ার শিলালিপিতে নরেন্দ্র উপাধিতে অভিহিত হইয়াছেন।

গয়া জেলার দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশের যে বনময় প্রদেশ এখন হাজারীবাগ নামে পরিচিত সেই প্রদেশে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে মানবংশীয় নরপতিগণ রাজ্য করিতেন। এই মানবংশের প্রথম পুরুষ উদয়মান। তিনি খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে—এই রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। উদয়মান ও তাঁহার দুই ভ্রাতা শ্রীধৌতমান এবং অজিতমান বণিক ছিলেন এবং মগধ-রাজ আদিসিংহের রাজ্যকালে অযোধ্যা হইতে তাম্রলিপ্তি বন্দরে আসিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্ত্তন কালে উদয়মান মগধ-রাজ আদিসিংহকে সাহায্য করায় তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। এই সময়ে উদয়মান আদিসিংহের অনুমতি অনুসারে ভ্রমরশাল্মলি গ্রামের অধিপতি হইয়াছিলেন[৯৭]। পাল-রাজগণের অভ্যুদয় কালে নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের অধীনতা স্বীকার করিতেন। ১০৫৯ শকাব্দে মগব্রাহ্মণ গঙ্গাধর একটি পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন। এই পুষ্করিণীর শিলালেখে উল্লিখিত আছে যে, এই সময়ে (১১৩৭ খৃষ্টাব্দে) রুদ্রমান নামক মানবংশীয় একজন নরপতি মগধের অধিপতি ছিলেন[৯৮]। গঙ্গাধরের কুল প্রশস্তিতে বর্ণ-

৮৯। Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III. p. 14.

৯০। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ২০৯।

৯১। Ain-i-Akbari (Jarrett's Trans,) vol, II, p. 131.

৯২। Ibid, p. 135.

৯৩। Ibid, pp. 337-38.

৯৪। Ibid, pp. 138-39.

৯৫। Indian Antiquary, Vol. IV, p. 366.

৯৬। Ibid, Vol. XVI. p. 64.

৯৭। Epigraphia Indica, Vol. II, pp. 345-47.

৯৮। তদন্তরে মাননরেন্দ্র চন্দ্রমাঃ
স রুদ্র মানোজনি যেন ভূভুজা।
স্বমেদিনীমণ্ডলমাদিকোলবৎ
বলাদমিত্রাম্বুনিধেঃ সমুদ্ধৃতং ॥২৪
—Ibid, p. 336.

গান নামক-মানবংশীয় রুদ্রমানের পূর্ব্ববর্ত্তী জনৈক মগধেশ্বরের উল্লেখ আছে[৯৯]। বর্ণমান এবং রুদ্রমান সম্ভবতঃ উদয়-মানের বংশজাত। মদনপাল গৌড়নগর হইতে বিজয়সেন কর্ত্তৃক তাড়িত হইলে মানবংশীয় নরপতিগণ সম্ভবতঃ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই সময়ে গয়ার শাসন-কর্ত্তা বিশ্বাদিত্যের পুত্র যক্ষপালের শীতলা মন্দিরের শিলালিপি-তেও কোন পালবংশীয় রাজার নাম নাই। গোবিন্দপুরে আবিষ্কৃত গঙ্গাধরের কুলপ্রশস্তিতে এবং গয়ার শীতলা দেবী মন্দিরে আবিষ্কৃত যক্ষপালের শিলালিপিতে রুদ্রমান এবং যক্ষপাল[১০০] নরেন্দ্র আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। কোন্ সময়ে মানবংশীয় রাজগণের বা যক্ষপালের বংশধরগণের অধিকার লুপ্ত হইয়াছিল তাহা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

ভোজবর্ম্মদেবের বেলাব তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, যদুবংশে বীরশ্রী এবং হরি বহুবার প্রত্যক্ষবৎ দৃষ্ট হইয়াছিলেন[১০১]। এই স্থানে প্রশস্তিকার ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন যে, যাদব-বর্ম্মবংশে হরিবর্ম্ম নামে একজন রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হরিবর্ম্ম নামক একজন রাজার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। একখানি শিলালিপি, একখানি তাম্রশাসন এবং দুইখানি হস্তলিখিত গ্রন্থ হইতে হরিবর্ম্মদেবের অস্তিত্বের কথা অবগত হওয়া যায়। শিলালিপিখানি উড়িষ্যা প্রদেশের পুরী জেলায় ভুবনেশ্বর গ্রামে অনন্ত-বাসুদেব-মন্দির-প্রাঙ্গণে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ইহা এক্ষণে অনন্তবাসুদেব-মন্দিরের প্রাচীর গাত্রে সংলগ্ন আছে। ইহা হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রী ভবদেবভট্টের কুলপ্রশস্তি। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, সাবর্ণগোত্রীয় রাঢ়প্রদেশের সিদ্ধল গ্রামবাসী শ্রোত্রীয়বংশে প্রথম ভবদেবভট্ট জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে হস্তিনীভিট্ট গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভবদেবের বৃদ্ধ প্রপৌত্র আদিদেব বঙ্গরাজের মহামন্ত্রী-মহাপাত্র-মহাসান্ধি-বিগ্রহিক ছিলেন। আদিদেবের পৌত্র 'বালবলভীভুজঙ্গ' উপাধিধারী ভবদেবভট্ট দীর্ঘকাল হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রী ছিলেন এবং তাহার পরে তাঁহার পুত্রেরও উপদেশদাতা ছিলেন। দ্বিতীয় ভবদেবভট্ট রাঢ় দেশে একটি জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন এবং ভুবনেশ্বরে নারায়ণ, অনন্ত ও নরসিংহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন[১০২]। এই শিলা-লিপি সম্পাদনকালে স্বর্গীয় ডাক্তার কিলহর্ণ বলিয়াছিলেন যে, অক্ষরের আকার দেখিয়া ইহাকে ১২০০ খৃষ্টাব্দের শিলালিপি বলিয়া বোধ হয়[১০৩]। এই উক্তির উপরে নির্ভর করিয়া শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বলিয়াছেন, "কিলহর্ণ-কথিত ঠিকঠাক ১২০০ খৃষ্টাব্দ ভট্টভবদেবের প্রশস্তির কাল না হইলেও, অক্ষরের হিসাবে হরিবর্ম্মার তাম্রশাসন এবং ভবদেবের প্রশস্তি দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ঠেলিয়া লওয়া যায় না[১০৪]।" বিগত চতুর্দ্দশবর্ষের মধ্যে আর্য্যাবর্ত্তের উত্তর-পূর্ব্বার্দ্ধে বহু নূতন খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, বহু রাজ-বংশের কাল নির্ণীত হইয়াছে এবং ইতিহাসের বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় অক্ষর-তত্ত্বের আলোচনাকালে এখন আর বুলার

৯৯। আশীতৌ নিজরাজ্যমুজ্জলয়িতুম যত্নাৎ প্রতীতাত্মনা
সংবাসায় নরেশ্বরেণ শিবিরোং শ্রীবপ্ল মানেন তৌ।
তস্যাক্ষামবলম্ব্যাত ৎকুলমিদং তাভ্যামপি প্রাপিতং
কাঞ্চিৎ কোটিমনুগুরাং গুণভুব কীর্ত্তির্নীভুত্তেরপি ॥ ১০
Ibid, pp. 334,

১০০। Indian Antiqnary, Vol. XVI, 1887, p. 65, V. 10.

১০১। সোপি প্রাপ যদুং ততঃ ক্ষিতি (ভু) জাং বংশোয়মুজ্জ্বস্ততে।
বীরশ্রীশ্চহরিশ্চ যত্র বস্ত (হু) শঃ প্রত্যক্ষমেবৈক্ষ্যত ॥
—Journal of the Asiatic Society of Bengal, New Series Vol. X, pp. 126—7.

১০২। Epigraphia Indica Vol. V, pp. 205—7.

১০৩। Ibid, p, 205.

১০৪। গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৫৬; পাদটীকা।

অথবা কিলহর্ণের নাম গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের অতি প্রাচীন সিদ্ধান্তগুলি প্রমাণরূপে গ্রহণ করিলে চলিবে না। শিলালিপির সহিত শিলালিপি এবং তাম্রশাসনের সহিত তাম্রশাসনের তুলনা করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, বিহারে আবিষ্কৃত রামপালের দ্বিতীয় এবং দ্বিচত্বারিংশ রাজ্যাঙ্কের শিলালিপি অপেক্ষা ভট্টভবদেবের প্রশস্তি প্রাচীন এবং কমৌলিতে আবিষ্কৃত বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন অপেক্ষা হরিবর্ম্মদেবের তাম্রশাসনের অক্ষর প্রাচীন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ডের দ্বিতীয়ভাগে হরিবর্ম্মদেবের তাম্রশাসনের একটি প্রতিলিপি ও উদ্ধৃত পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, বসুজ মহাশয়ের পাঠোদ্ধার সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য ; উদ্ধৃত পাঠ আনুমানিক[১০৫]। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় অধ্যাপক হরিনাথ দে এই তাম্রশাসন খানি আমাকে কয়েক দিনের জন্য প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে আমি বসুজ মহাশয়ের উদ্ধৃত পাঠ পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর যত্নে নেপালে হরিবর্ম্মদেবের রাজত্বকালে লিখিত দুইখানি হস্তলিখিত গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথমখানি অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা, ইহা হরিবর্ম্মদেবের উনবিংশ রাজ্যাঙ্কে লিখিত হইয়াছিল। দ্বিতীয়খানি কালচক্রযানটীকা, ইহার নাম বিমলপ্রভা, ইহা হরিবর্ম্ম-দেবের ৩৯শ রাজ্যাঙ্কে লিখিত হইয়াছিল। নূতন আবিষ্কার না হইলে হরিবর্ম্মদেবের রাজত্বকাল নির্ণীত হইতে পারে না। তবে ইহা স্থির যে, হরিবর্ম্মদেব শ্যামলবর্ম্মা অথবা ভোজবর্ম্মার পরবর্ত্তী কালে আবির্ভূত হন নাই এবং বজ্রবর্ম্মা বা জাতবর্ম্মার পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক ও শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালীর[১০৬] মতে হরিবর্ম্মা ভোজবর্ম্মার পরবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে তিনি বজ্রবর্ম্মারও পূর্ব্ববর্ত্তী[১০৭]।

১০৫। গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৫৫।

১০৬। The Dacca Review, 1912, July, p. 138.

১০৭। প্রবাসী, ১৩২০, পৃঃ ৪৫৭।

বিক্রমপুর

ষষ্ঠ অধ্যায়

বর্ম্ম-বংশ

পালবংশীয়গণের রাজত্ব কালের শেষভাগে তাঁহাদিগের অধীন যে সকল রাজবংশ সামন্তরাজ স্বরূপ বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন, তন্মধ্যে বর্ম্ম-বংশ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। রাজেন্দ্র চোল কর্তৃক পূর্ব্ববঙ্গে পালবংশীয় গোবিন্দচন্দ্র পরাজিত হইলে, বঙ্গদেশে গোলযোগ উপস্থিত হয়। সেই সুযোগে বর্ম্ম-বংশীয় ভূপালগণ বিক্রমপুর অধিকার করেন। বর্ম্ম-বংশ শূর-বংশের এক শাখা। ইহারা পূর্ব্বে স্বর্ণরেখা নদীর তীরবর্ত্তী কাশীপুরীর রাজা ছিলেন। ঐস্থান সুহ্মের অন্তর্গত ছিল। ইহার বর্ত্তমান নাম কাশীয়াড়ি। বর্ম্ম-বংশীয় রাজগণ যখন বিক্রমপুর অধিকার করেন; তখন বিক্রমপুরের এক পার্শ্ব দিয়া পদ্মা প্রবাহিত ছিল। এখন উহার মধ্য দিয়া পদ্মা প্রবাহিত হওয়ায় বিক্রমপুর দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে।

এই বংশে হরিবর্ম্মা, জ্যোতির্ব্বর্ম্মা ও শ্যামল-বর্ম্মার নাম পাওয়া যায়। ইঁহারা পাল ও সেন বংশের করদ রূপে বিক্রমপুর শাসন করিতেন* দ্বিতীয় ভবদেব ভট্ট, হরি বর্ম্ম-দেবের সচিব ছিলেন ভবদেব ভট্টের নামান্তর বাল ভট্ট বা বাল বলভী ভুজঙ্গ, ইহার পিতার নাম গোবর্দ্ধন। ইনি খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সাবর্ণ গোত্রীয় সিদ্ধল গ্রামীণ ছিলেন। কুলাচার্য্য বাচস্পতি মিশ্র, ভবদেবের বন্ধু ছিলেন। ভবদেব দক্ষিণ রাঢ়ে আগমন পূর্ব্বক, সম্ভবতঃ রণশূর কর্তৃক সমাদৃত হইয়া, তথায় কিয়ৎকাল বাস করেন। রাজেন্দ্র চোল কর্তৃক রণশূর রাজ্যভ্রষ্ট হইলে, ভবদেব তীর্থ বাসের জন্য উৎকলে যাত্রা করেন। হরিবর্ম্মদেব তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে প্রধান মন্ত্রীত্ব প্রদান করেন। ভবদেব ভট্ট পথ, পুষ্করিণী ও পান্থনিবাস প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পিতামহ গৌড়াধিপতির মন্ত্রী ছিলেন। ভবদেবের সিদ্ধল গ্রাম একটি রাজ্যের মত ছিল। শত সংখ্যক গ্রাম ঐ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

দ্বিতীয় ভবদেব ভট্টের উর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ প্রথম ভবদেব ভট্ট গৌড়াধিপের নিকট হস্তিনী নামক গ্রাম লাভ করেন। কুলচন্দ্র ঘটক বলেন, ইনি ধর্ম্মপালের মহামাত্য ছিলেন। রাজার

গৌড়ের ইতিহাস ষষ্ঠ অধ্যায় - Page No 143.

* জ্যোতির্ব্বর্ম্মা হরিবর্ম্মার পিতা ছিলেন। তাঁহার বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না

নিকট হইতে বহু মণি রত্ন লাভ করিয়া, শেষ বয়সে কাশীপুরীতে গমন করেন। দ্বিতীয় ভবদেব ভট্ট ভুবনেশ্বরে অনন্ত বাসুদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

তদুপলক্ষে বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার কুল-প্রশস্তি রচনা করেন।

রাজা হরিবর্ম্মদেবের ৪২ বর্ষাঙ্কিত একখানি তাম্রশাসন অসম্পূর্ণাবস্থায় ফরিদপুর জেলার সামন্তসার গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে জানা যায়ঃ—

(ক) হরিবর্ম্মার পিতা জ্যোতির্ব্বর্ম্মা।

(খ) বালবল্লভী ভুজঙ্গ ভবদেব ভট্টের পিতা। গোবর্দ্ধন ইহার সভাপণ্ডিত ছিলেন।

(গ) হরিবর্ম্মা বিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয় স্কন্ধাবার হইতে এই তাম্রশাসন প্রদান করেন।

(ঘ) পরম বৈষ্ণব পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ বিশেষণে হরিবর্ম্মা বিশেষিত হইয়াছেন।

(ঙ) প্রদত্ত ভূমি পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃপাতী পঞ্চকুসুম্ব শৈল উপরি নিচক্র বিষয়ের বড় পর্ব্বত গ্রামে ছিল।

(চ) স্বশ্রী ত্রিষষ্ট্যধিকষড়্দ্রোন্যুপেতহলভুমৌ শব্দে বোধ হয় প্রদত্ত ভূমির পরিমান প্রকাশিত হইয়াছে।

(ছ) বাৎস্য গোত্রীয় ভার্গব-চ্যবন আপ্নুবৎ ঔর্ব্ব জামদগ্ন্য প্রবর ঋগ্বেদ আশ্বলায়ন শাখাধ্যায়ী ভট্টপুত্র জয়বাচি শ্রীদেবের প্রপৌত্র, ভট্টপুত্র বেদগর্ভ শর্ম্মার পৌত্র ভট্টপুত্র পদ্মনাভের পুত্র ভট্টপুত্র বেদার্থবাচিক শ্রীকৃষ্ণধর মিশ্রকে তাম্রশাসন লিখিত ভুমি প্রদত্ত হইয়াছিল।

(জ) হরিবর্ম্মদেব নিজ রাজত্বের ৪২ বৎসরে এই তাম্রশাসন প্রদান করেন।

রাণক, রাজপুত্র, রাজামাত্য, মহাব্যূহপতি, মণ্ডলপতি, মহাসান্ধি বিগ্রহিক, মহাসেনাপতি, মহাকূট, পাশিক, মহাপ্রতীহার, কোট্টপাল, দোঃসাধসাধনিক, চৌরোদ্ধরণিক, নৌবলহস্ত্যশ্ব-গোমহিষজাবিকাধক্ষা, গৌল্মিক, দণ্ডপাশিক, দণ্ডনায়ক, বিষয়কার এই সকল পদস্থ ব্যক্তিকে জানাইয়া ভূমি দান করা হইয়াছে।

(ঝ) এই তাম্রশাসনেও চট্ট ভট্ট জাতির উল্লেখ আছে।

রাঘবেন্দ্র কবিশেখর রচিত ভবভূমিবার্ত্তা পাঠে জানা যায়ঃ—

(ক) হরিবর্ম্মা দাক্ষিণাত্য নরপতি ছিলেন, পরে বিক্রমপুরে রাজ্য স্থাপন করেন।

(খ) বালভট্ট, গর্গ ভট্টাচার্য্য, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত সাতজন পণ্ডিত হরিবর্ম্মার সভা সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

(গ) হরিবর্ম্মা একাম্র কাননে অর্থাৎ ভুবনেশ্বরে হরিহর, ব্রহ্মা, সীতা, রাম, লক্ষ্মণ হনুমান প্রভৃতি অষ্টোত্তর শত বিগ্রহ, বহুসংখ্যক মন্দির ও সরোবর প্রতিষ্ঠা করেন।

(ঘ) অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশে হরিবর্ম্মার ধর্ম্ম কাহিণী বিস্তারিত হইয়াছিল।

সে সময়ে গজনীপতি সুলতান মামুদ কর্ত্তৃক পশ্চিম ভারত আক্রান্ত হইয়াছিল। সুলতান মামুদ কনোজ রাজ্য আক্রমণ করিলে, সেখানকার অনেক ব্রাহ্মণ পলায়ন করিয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন। হরিবর্ম্মদেব তাহাদিগকে আশ্রয় দান করেন। এই সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে গঙ্গাগতি বৈষ্ণবমিশ্র একজন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। ইনি কান্য কুব্জের কর্ণাবতী সমাজে বাস করিতেন, নানাস্থান ভ্রমণ

করিয়া কোটালিপাড়া নামক স্থানে আপন বাসস্থান মনোনীত করেন (৯৪০ শাক)।

কনোজ রাজ্য হইতে সমাগত ব্রাহ্মণেরা পাশ্চাত্য বৈদিক নামে খ্যাত। হরিবর্ম্মা হিন্দু-ধর্ম্মের উৎসাহদাতা এবং জৈন ও বৌদ্ধদিগের "শর্ম্মসংমর্দ্দনকারী" ছিলেন।

ভবভূমি বার্ত্তায় লিখিত আছে যে, হরিবর্ম্মা নাগেন্দ্র পত্তনাদি জয় করিয়াছিলেন, এবং জননীর বারাণসী গমন পূর্ব্বক বিশ্বেশ্বর পাদপদ্ম দর্শনেচ্ছা শ্রবণ করিয়া, তাঁহার স্বচ্ছন্দ গমনের জন্য একটি সুপ্রশস্ত বর্ত্ম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কোথা হইতে কতদূর পর্য্যন্ত এই বর্ত্ম নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার কোন উল্লেখ নাই। হরিবর্ম্মদেব ১০৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

হরিবর্ম্মদেব অসাধারণ পরাক্রমশালী ছিলেন। দক্ষিণাপথাধীশ্বর দিগ্‌বিজয়ী জৈন রাজা রাজেন্দ্র চোল গৌড়-বঙ্গ-রাঢ় ও দন্ত ভুক্তিকা জয় করিতে এই সময়ে আক্রমণ করেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গে গোবিন্দ চন্দ্রকে পরাজিত করিলেও, হরিবর্ম্মদেবকে পরাজিত করিতে পারে নাই।

বিক্রমপুরে শ্যামলবর্ম্মা নামে অন্য এক রাজার নাম পাওয়া যায়। তাঁহার সময়েও বহু ব্রাহ্মণ কনোজ ত্যাগ করিয়া বঙ্গে আগমন করেন (১০০১ শকাব্দ)। তাঁহারা পূর্ব্বাগত ব্রাহ্মণগণের আত্মীয় স্বজন ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে যশোধর মিশ্র প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। কথিত আছে, রাজপ্রাসাদ উপরি এক গৃধ্র পতিত হয়। গৃধ্র-পতন দোষের শান্তির জন্য যশোধর মিশ্র শ্যামল বর্ম্মা কর্ত্তৃক বিক্রমপুরে আহূত হন। শ্যামল বর্ম্মার পিতামহের নাম ত্রিবিক্রম, পিতার নাম বিজয় সেন, মাতার নাম মালতী, ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম মল্লবর্ম্মা। রাজা ত্রিবিক্রম স্বর্ণরেখা নদীর তীরবর্ত্তী কাশীপুরীর রাজা ছিলেন। বিজয় সেনের মৃত্যুর পর মল্লবর্ম্মা কাশীপুরীর রাজা হন। শ্যামল বর্ম্মা পিতৃরাজ্য পান নাই। তিনি বিক্রমপুরে আসিয়া অতি উদ্ধত শূরবংশীয়দিগকে পরাজিত করিয়া ৯৯৪ শাকে রাজা হন। যথা :—

> বেদগ্রহ গ্রহমিতে স বভূব রাজা
> গৌড়ে স্বয়ং নিজ বলৈঃ পরিভূয় শত্রূন্।
> শূরান্বয়ানতিমদান্ বিজিতান্তরাত্মা
> শাকে পুনঃ শুভতিথৌ বিজয়স্ত সূনুঃ
>
> (বিক্রমপুরের বৈদিক কুল পঞ্জিকা)

শ্যামল বর্ম্মা বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের আনয়ন কর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। প্রকৃত পক্ষে পাশ্চাত্য বৈদিকেরা হরিবর্ম্মার সময় হইতে বঙ্গে আসিয়াছিলেন।

শ্যামল বর্ম্মা কাশীরাজ্যের অন্তর্গত সীয় দোনীর রাজা হরিহরের পুত্র নীলকণ্ঠের দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। কোন কোন কুলগ্রন্থমতে তিনি কাশীরাজ জয়চন্দ্রের দুহিতা সুশীলাকে বিবাহ করেন। শ্যামল বর্ম্মার তাম্র-শাসনের কিয়দংশ পাওয়া গিয়াছে। এই তাম্র-শাসন হইতে নিম্নলিখিত বিবরণগুলি অব-গত হওয়া যায় :—

(ক) বিক্রমপুর নিবাসী অর্থপতি-শ্রীশ্রীপালের জয়ন্তকাকার হইতে এই তাম্র-শাসন প্রাপ্ত হইয়াছে।

(খ) শ্যামল বর্ম্মা সোমবংশের অন্তর্গত বর্ম্মবংশজাত ছিলেন।

(গ) শ্যামল বর্ম্মার বৃষভশঙ্কর গৌড়েশ্বর উপাধি ছিল।

(ঘ) রাজ্ঞী=মালব রাজকন্যা মালব্যদেবী সহ ধার্ম্মিক মহামাণ্ডলিক ত্রিপাঠিক-গৌরপতিক-মন্ত্রনায়ক

বিষয়ী প্রভৃতিকে জানাইয়া তাম্রশাসন প্রদত্ত হইয়াছে।

(ঙ) অশ্বপতি গজপতি নরপতি রাজ্য-ত্রয়াধিপতি বর্ম্মবংশকুল কমল প্রকাশ ভাস্কর সোমবংশ প্রদীপ প্রতিপন্ন কর্ণ গাঙ্গেয় শরণাগত বজ্রপঞ্জর পরমেশ্বর পরম ভট্টারক পরম সৌর মহারাজাধিরাজ-অরিরাজ বৃষভশঙ্কর প্রভৃতি বিশেষণে শ্যামল বর্ম্মা বিশেষিত হইয়াছেন।

(চ) চট্টভট্ট জাতীয় ক্ষেত্রকরদিগকেও ভূমি দানের বিষয় জানান হইয়াছে। ইহাতে বোধ হইতেছে, তৎকালে চট্টভট্ট জাতীয়েরা লুণ্ঠন বৃত্তি ত্যাগ করিয়া কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিতে-ছিল।

(ছ) প্রদত্ত ভূমি বঙ্গ বিষয় পাঠে বিক্রমপুর ভুক্ত্যন্তঃপাতী ছিল।

(জ) পূর্ব্বে নাগরকুণ্ডা, দক্ষিণে ধূলীপুর, পশ্চিমে লঙ্কাচুয়া, উত্তরে কুলকুণ্ঠি প্রদত্ত ভূমির এই চতুঃসীমা ছিল।

(ঝ) পাঠকত্রয়া ভূমি বোধ হয় কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বিশিষ্ট ভূমি।

(ঞ) ঋগ্বেদীয় আশ্বলায়ন শাখৈকদেশাধ্যায়ী শ্রীযশোধর দেবশর্ম্মাকে প্রাসাদোপরি শকুন প্রপতিত যজ্ঞবিধিতে এই ভূমি প্রদত্ত হইয়াছিল।

রামদেবের বৈদিক কুলমঞ্জরীতে লিখিত আছে, শ্যামল বর্ম্মা পদ্মা নদীর দক্ষিণ দিকস্থ সমস্ত প্রদেশ অধিকার করেন এবং গৌড়ের অন্তর্গত বিক্রমপুরের উপান্তে রাজধানী নির্ম্মাণ করেন, যথা :—

"গৌড়ান্তর্গত বিক্রমপুরোপান্তে পুরীং নির্ম্মমে।"

সামন্তসারের বৈদিক কুলার্ণব মতে শ্যামল বর্ম্মা ভাগীরথীর পূর্ব্বে মেঘনার পশ্চিমে সমুদ্রের উত্তর ও বরেন্দ্রের দক্ষিণ প্রদেশে সেন-বংশীয় নৃপতির করদরূপে শাসন করিতেন। যথা :—

গঙ্গায়াঃ পৃষ্ঠ ভাগঞ্চ মেঘনদ্যাশ্চ পশ্চিমম্।
উত্তরাল্লবণাব্ধেশ্চ বারেন্দ্রাচ্চৈব দক্ষিণম্।
করদং রাজ্যমাসাদ্য শ্যামলাখ্যোপ্যশাসয়ৎ।
সেনবংশীয় ভূপানামাশ্রয়েণ স্বধর্ম্মভাক্॥

বায়ু পুরাণীয় রাজগৃহ-মাহাত্ম্যে লিখিত আছে, বসুরাজ নামক এক ব্রাহ্মণ রাজগৃহ বনে এক অশ্বমেধযজ্ঞ করেন। তিনি দক্ষিণাপথ হইতে বৎস, উপমন্যু, কৌণ্ডিল্য, গর্গ, হারিত, গৌতম, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, কৌশিক, কাশ্যপ, বশিষ্ঠ, বাৎস্য, সাবর্ণি ও পরাশর এই চৌদ্দ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন ও তাঁহাদিগকে নানাস্থান দান করেন। পরবর্ত্তী কালে তাঁহাদিগের বংশীয়-গণ বঙ্গদেশে নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া পরেন।

এই বৈদিক ব্রাহ্মণেরা দাক্ষিণাত্য বৈদিক নামে প্রখ্যাত হন।

রাজা আদিশূর যেমন রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্ব পুরুষকে কান্যকুব্জ হইতে বিক্রমপুরে আনয়ন করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছেন, রাজা হরি বর্ম্মা ও শ্যামল বর্ম্মাও সেইরূপ বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের প্রতিপালক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তৎকালে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-দিগের মধ্যে কেহ সাগ্নিক ছিলেন না, বেদচর্চ্চাও তাঁহাদিগের মধ্য হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল। পশ্চিমাঞ্চলে তখনও বেদচর্চ্চা ছিল। যে সকল ব্রাহ্মণ পশ্চিমাঞ্চল হইতে এদেশে আগমন করিতেছিলেন, তাঁহারাই বৈদিক নামে পরিচিত হইতে লাগিলেন।



গজারী বৃক্ষ—রামপাল

KING HALF-TONE PRESS, CALCUTTA.

বিক্রমপুর

সপ্তম অধ্যায়

সেন-রাজবংশ

আদিশূর

যে কৃতী সিংহরাশি পুরুষের নাম বিক্রমপুরের কেন বাঙ্গলার ইতিহাসে স্বর্ণ অক্ষরে লিখিত আছে তাহারই ইতিহাস এই গ্রন্থে প্রথম স্থান পাইবে না কেন ? প্রতিভা ও বীরত্বে বাঙ্গালার ইতিহাস এখন অতীতের গর্ভে নিদ্রিত আছে—"তাহার সাক্ষী স্বরূপ গজারী বৃক্ষ মাথা তুলিয়া অতীতের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও পুণ্য কাহিনী বলিয়া দিতেছে" দীঘি সরোবর এখন সকলি আছে—নাই কেবল দর্শকগণের চক্ষুর তৃপ্তি। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহারাজ আদিশূরই না প্রথম বৃহৎ-যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য বিক্রমপুরে পঞ্চ-ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন। বিক্রমপুরা-অন্তর্গত রামপাল নামক রাজধানীতে না সেই যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইয়াছিল এবং যজ্ঞ সমাপনান্তে মহারাজ আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণকে বসবাস করিবার মানসে পাঁচগাও ও পঞ্চসার প্রদান করিয়া—আজও বিক্রমপুরের ইতিহাসে সেই অতীতের গৌরব হিন্দু রাজত্বে বিক্রমপুরের অতীতের সাক্ষী স্বরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে।

বিক্রমপুরের প্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভ কীর্ত্তিনাশার গর্ভেমিশিয়া যাউক—কিন্তু ইতিহাস যতদিন থাকিবে বিক্রমপুরের স্মরণাতীত অতীত কীর্ত্তি অটুট থাকিবে।

* সভ্য জগতে ভারতবর্ষ চিরকালই শীর্ষস্থানীয় ছিল। ভারতের বেদ, বেদান্ত, দর্শন, জ্যোতিষ, কাব্য আজও জগতে অতুলনীয়। কিন্তু ভারতের প্রাচীন ধারাবাহিক কোন ইতিহাস নাই। যে আর্য্য জাতির গভীর জ্ঞানের, অলৌকিক পাণ্ডিত্যের এবং ভূয়সী গবেষণার শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় অভ্রভেদী হিমাচল শির উত্থিত হইয়াছিল, সেই আর্য্যজাতি যে ইতিহাস লিখনে অজ্ঞাত ছিলেন, একথা সহসা বিশ্বাস হয় না। বোধ হয়, বহু পূর্ব্ব হইতেই আর্য্যদিগের ইতিহাস লিখন প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু বৌদ্ধযুগের প্রাদুর্ভাবে, বৌদ্ধ-দিগের অত্যাচারে যাবতীয় প্রাচীন গ্রন্থসমূহ বিনষ্ট হয়। কেবল বেদাদি ধর্ম্ম, দর্শন, জ্যোতিষ ও বৈদ্যশাস্ত্র প্রভৃতি যাহা সর্ব্বসাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় ছিল, এবং যে সমস্ত গ্রন্থ তৎকালীন পণ্ডিতগণের কণ্ঠস্থ ছিল, সেই সকল গ্রন্থাদি কোনরূপে রক্ষা পাইয়াছিল। কারণ, এতদ্ সংক্রান্ত গ্রন্থাদি ব্যতীত বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বের প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থাদি বড় একটা দেখা যায় না।

* সামাজিক ইতিহাস-দুর্গাচন্দ্র সান্যাল প্রণীত।

পূর্ব্ব কালের কথা কেবল প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থাদি হইতে কিয়ৎ পরিমাণে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য হয় না।

সমতট বা বিক্রমপুরের হিন্দু রাজবংশীয় কায়স্থ* মহারাজ আদিশূর মহা প্রতাপশালী নরপতি ছিলেন। মিথিলা হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত সমগ্র পঞ্চ গৌড় বা বর্ত্তমান বঙ্গদেশ তাঁহার শাসনাধীন ছিল। তাঁহার সময়ে হিন্দুধর্ম্ম পুনরায় বঙ্গের রাজধর্ম্মে পরিণত হইলেও, বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণ ও তদিতর জাতীয়গণ হিন্দুর আচার বিশিষ্ট ছিলেন না। দেশে বহুদিন হইতে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও শাস্ত্রচর্চ্চা না থাকায় যজ্ঞ কার্য্যের প্রণালী বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ অবগত ছিলেন না; সুতরাং পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিতে অভিলাষী হইয়া মহারাজ আদিশূর বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদিগকে তজ্জন্য উদ্যোগ করিতে বলায়, কেহই তাহার ভার গ্রহণ করিতে সাহস করেন নাই। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণের সাহায্যে যজ্ঞ সম্পাদন অসাধ্য বুঝিয়া; রাজা, যজ্ঞে আচার্য্য, হোতা, উদ্‌গাথা, অধ্বর্য্যু ও সদস্য (২) হইবার উপযুক্ত পঞ্চজন ব্রাহ্মণকে তাঁহার রাজ্যে পাঠাইবার জন্য কান্যকুব্জেশ্বরের নিকট অনুরোধ করিয়া পাঠান। কেহ কেহ বলেন কান্যকুব্জপতি মহারাজ বীরসিংহ আদিশূরের শ্বশুর ছিলেন। আদিশূর মহিষী যজ্ঞ কার্য্য সম্পাদনার্থ পিতার নিকট পঞ্চজন বেদপারগ ব্রাহ্মণ যাচ্ঞা করেন। কান্যকুব্জেশ্বর কন্যা জামাতার অনুরোধেই হউক আর হিন্দুর আচার প্রচারার্থই হউক মহাজ্ঞানী বেদপারগ, নিষ্ঠাবান্ ঋষিসঙ্কাশ পঞ্চজন উগ্রতপা সাগ্নিক ব্রাহ্মণকে বঙ্গে বা সমতটে প্রেরণ করেন এবং তাঁহাদের শরীর ও যজ্ঞের হবি পরিরক্ষণার্থ পঞ্চজন বিক্রমশালী কায়স্থ ভৃত্যকে তৎসহ বঙ্গ গমনে আদেশ করেন। মহারাজ আদিশূরের মূল রাজধানী ছিল বিক্রমপুর। বৌদ্ধ পরাভবের পর পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বা ধ্বংস প্রাপ্ত উত্তর বঙ্গের পাণ্ডুয়া নগরেও তিনি অনেক সময়ে সপরিবারে উপস্থিত থাকিয়া রাজকার্য্য করিতেন। বিক্রমপুর নগর পদ্মা নদীর সন্নিকটে সমতট রাজ্য মধ্যে অবস্থিত ছিল। এইক্ষণ ধ্বংসাবশিষ্ট বিক্রমপুর বর্ত্তমান ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত।

এই ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পঞ্চক বঙ্গের কোন নগরে আগমন করেন, মহারাজ আদিশূর কোন জাতি ছিলেন, এবং কোন সময়ে বঙ্গদেশ তাঁহার শাসনাধীন ছিল, তাহা নির্ণয় করা বর দুরূহ ব্যাপার। প্রাচীন বঙ্গের কিছুমাত্র ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। তাই খৃষ্টীয় মিশনারী পুঙ্গব মহামতি মার্শমান হতাশ ভাবে বলিয়াছেন, The early history of Bengal is very obscure” অর্থাৎ প্রাচীন বঙ্গের ইতিহাস গাঢ় তমসাচ্ছন্ন। প্রাচীন বঙ্গের যাহা কিছু ইতিহাস আছে তাহা ব্রাহ্মণ কায়স্থের বংশ লিপিমাত্র; তাহাতেই ধ্রুবানন্দ মিশ্র, হরি মিশ্র, এড়ু মিশ্র প্রভৃতি প্রাচীন বঙ্গীয় কুলাচার্য্যগণ যাহা কিছু লিখিয়া রাখিয়াছেন তদ্ভিন্ন আর বড় কিছু নাই। তাহাও আবার যবনবিপ্লবে ছিন্নসূত্র হইয়াছে। তদবলম্বনে বহুতর হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান ঐতিহাসিকগণ আদিশূর ও তদ্বংশীয় সেনরাজদিগের সম্বন্ধে নানামত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

* বঙ্গীয় সমাজ ২২ পৃষ্ঠায় আদিশূর-বঙ্গে ব্রাহ্মণ কায়স্থ

(২) শাস্ত্র মতে হোতার কার্য্যে ঋগ্বেদীর, উদ্গাথার কার্য্যে সামবেদীর এবং অ... প্রশস্ত অধিকার।

আদিশূর ও সেন বংশীয় বঙ্গেশ্বরগণ সম্বন্ধে সময় নির্ণয় করিবার তিনটিমাত্র প্রামাণিক উপকরণ পাওয়া যায়।

প্রথম, আদিশূর সম্বন্ধে প্রাচীন মিশ্র কারিকায় পাওয়া যায়:—

"আদিশূরো নব নবত্যধিক নবশতীশতাব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণানানয়ামাস।"

দ্বিতীয়, মহারাজ বল্লাল সেন কৃত "দান সাগর" গ্রন্থের রচনা কাল,

"নিখিল নৃপতি চক্র তিলক শ্রীমদ্বল্লাল সেন দেবেন।
পূর্ণে নবশশি দশমিতে শকাব্দে দান সাগরো রচিতঃ॥"

তৃতীয়, মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেবের অব্দ প্রচলন। উক্ত বচনোল্লিখিত অঙ্গ শকাব্দাসূচক ধরিলে আদিশূর ৯৯৯ শকে অর্থাৎ ১০৭৭ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মণ পঞ্চককে আমন্ত্রণ করেন এবং বল্লালসেন ১০১৯ শকে অর্থাৎ ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে "দান সাগর" রচনা করেন। তাহা হইলে, আদিশূর বল্লালের সভায় যখন কৌলীন্য প্রথা স্থাপিত হয়, তখন কুলাচার্য্যগণের বংশমালানুসারে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ পঞ্চকের নবম হইতে চতুর্দ্দশ পর্য্যন্ত, দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থের পঞ্চম হইতে অষ্টম পর্যন্ত এবং বঙ্গজ কায়স্থের পৌত্র পর্য্যন্ত উত্তর পুরুষগণ উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত বচন নিষ্পন্ন সংক্ষিপ্ত কাল মধ্যে প্রথমাগত ব্রাহ্মণের নবম বা চতুর্দ্দশ পুরুষ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। প্রতি শত বৎসরে তিন পুরুষের হিসাবে ধরিলে নয় পুরুষে তিন শত বৎসর হয়। সুতরাং বল্লাল আদিশূরের অন্ততঃ তিনশত বর্ষ পরে আবিভূর্ত হইয়াছিলেন স্থির করিতে হয়। প্রত্নতত্ত্ব বিশারদ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'ক্ষিতীশ বংশাবলী', 'আইন-ই-আকবরী' প্রভৃতি গ্রন্থের সহিত ঐক্য করিয়া স্থির করিয়াছেন বল্লালসেন খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গে শাসন দণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন!

মিত্র মহাশয়ের মতানুসারে বল্লালের এবং মিশ্র কারিকার মতে আদিশূরের সময় নির্দ্ধারিত করিলে আদিশূরের সমকালীন ব্যক্তির নবম হইতে চতুর্দ্দশ উত্তর পুরুষের বল্লালের সভায় উপস্থিত থাকার সামঞ্জস্য হয় না। সম্বন্ধ নির্ণয়-কার লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন যে মিত্র কারিকার লিখিত অঙ্কদ্বারা শকাব্দ না বুঝিয়া অনুমান বুঝাই কর্ত্তব্য। তাহা হইলে, আদিশূরের পুত্রেষ্টিযাগের কাল হয় ৯৯৯ সংবৎ অর্থাৎ ৯৪২ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং বল্লাল তাহার ১৫৫ বৎসর পরে ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে দান সাগর গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। কিন্তু এই ১৫৫ বর্ষ মধ্যে ও বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণগণের নবম হইতে চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত বাস সম্ভবপর নহে। লক্ষ্মণসেন বল্লালের পুত্র, মিথিলা অঞ্চলে "সেনং" নামক যে অব্দ প্রচলিত আছে তাহা লক্ষ্মণসেনের রাজ্যারোহণের বৎসর মাঘ মাসে প্রচলিত হইয়াছে বিবেচনা করাই কর্ত্তব্য। সুধীবর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক এসিয়াটিক জার্ণা-লের ১৮৯৬ সালের মার্চ্চমাসের সংখ্যায় লিখিত Chronology of the Sen kings of Bengal অর্থাৎ বঙ্গের সেন রাজাদিগের সময় নিরূপণ প্রবন্ধে পাওয়া যায় যে বল্লাল সেন কর্ত্তৃক মিথিলা অধিকার কালে বিক্রমপুর হইতে তৎ পুত্র লক্ষ্মণসেনের জন্ম সংবাদ আসায় মহারাজ বল্লাল, পুত্রের নামের অমরত্ব সাধনোদ্দেশ্যে মিথিলা অঞ্চলে সেনং অব্দ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রমাণ স্বরূপ লঘু ভারতের দ্বিতীয় খণ্ডের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে:—

"প্রবাদঃ শ্রূয়তে চাত্র পারম্পরী ণ বার্ত্তয়া।
মিথিলে যুদ্ধ যাত্রায়াং বল্লা লোহভুন্ন তধ্বনিঃ।
তদানীং বিক্রমপুরে লক্ষণোজাতবানসৌ॥"

বোধ হয়, নগেন্দ্র বাবু তদাদর্শে সেনং অব্দ প্রবর্ত্তন, লক্ষ্মণসেনের জন্মকাল হইতে গণনা করা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহার মত গ্রহণ করিলে বল্লালের রাজত্বকাল নির্দ্ধারণ আরও জটিল হইয়া উঠে। সুতরাং মহারাজ লক্ষ্মণের রাজ্যারোহণ হইতে সেনং অব্দ প্রবর্ত্তন ধারাই সঙ্গত বোধ হয়। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ৭৯১ সেনং চলিতেছে। তাহা হইলে ৭৯১ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১১০৮ খৃষ্টাব্দে বল্লালসেনের রাজত্ব কালের অবসান হয়। আইন-ই-আকবরীর সঙ্কলয়িতা আবুলফজল বলেন যে বল্লাল ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন।

বল্লালের নিজের এজাহারে প্রকাশ যে তিনি ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে দান সাগর রচনা করেন। সুতরাং ১০৬৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বল্লালসেনের রাজত্ব অবধারিত করা অসঙ্গত হয় না।

গৌড়ে ব্রাহ্মণাগমন সম্বন্ধে লঘু ভারতে তৃতীয় খণ্ডে আর একটি বচন আছে,

"বেদ বাণাঙ্ক শাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।"

অর্থাৎ ৯৫৪ শকে বা ১০৩২ খৃষ্টাব্দে বিপ্রগণ গৌড়ে আগমন করেন। তাহা হইলে আদিশূরের যজ্ঞ কালের ৬৫ বৎসর পরে ১০৩২ খৃষ্টাব্দে বল্লালসেন দান সাগর সমাপ্ত করেন। কৌলীণ্য সংস্থাপনের কালনির্ণয় হয় না। কিন্তু বংশ পরম্পরার প্রমাণে আদিশূর বল্লালের ব্যবধান কাল হয় তিন শত বর্ষ।

সুতরাং মিত্র কারিকার অথবা লঘু ভারতের উল্লিখিত কালের সহিত বংশমালা ঘটিত কালের সামঞ্জস্য হয় না।

লঘু ভারতোক্ত ১০৩১ খৃষ্টাব্দ ও বর্ত্তমান কালের ৮৬৬ অর্থাৎ প্রায় নয়শত বর্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী। তাহা হইলে লঘু ভারত নির্দ্দিষ্ট কালে ব্রাহ্মণ কায়স্থ-গণ বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন স্থির করাই সঙ্গত। সুতরাং স্থির করিতে হয়, মহারাজ আদিশূর ১০৩২ খৃষ্টাব্দে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ বর্ত্তমান কালের প্রায় নয় শত বৎসর পূর্ব্বে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে একাদশ শতাব্দীর প্রথম পর্য্যন্ত আদিশূর বঙ্গসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পূর্ব্বে স্থির হইয়াছে বল্লাল খৃষ্টিয় একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন। তাহা হইলে আদিশূর বল্লালের প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তি হইতেছেন।

নগেন্দ্র বাবু স্থির করিয়াছেন বল্লাল ১১১৯ হইতে ১১৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন এবং তৎপুত্র লক্ষ্মণ সেনের আমলেই বঙ্গে যবন বিপ্লব ঘটে। কাশ্মীরের আদিত্য বংশীয় কায়স্থ রাজা মহারাজ জয়াপীড়ের দিগ্বিজয় উপলক্ষ করিয়া, তিনি বঙ্গেশ্বর জয়ন্তকে আদিশূর স্থির করিয়াছেন। জয়ন্ত বা আদিশূরকে জয়াপীড়ের সমসাময়িক অবধারিত করিয়া স্থির করিয়াছেন যে আদিশূর বল্লালের ৩৪৩ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ৭৪৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৭৭৬ খৃষ্টাব্দ মধ্যে বঙ্গ সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেছিলেন। পূর্ব্বোল্লিখিত এসিয়াটিক জর্নালের প্রবন্ধে তিনি স্থির করিয়াছেন যে আদিশূর বল্লালের মধ্যবর্ত্তী কালে প্রবল প্রতাপ পাল-বংশীয় বৌদ্ধভূপালগণ পুনরায় বঙ্গদেশ অধিকার করেন। এইমত গ্রহণ করিলে শঙ্করাচার্য্য, কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি মহর্ষিগণের ধর্ম্মপ্রচার এবং আদিশূরকৃত বৌদ্ধবিপ্লবান্তে বঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্থাপনের কথা বৃথা হইয়া যায়। লক্ষ্মণাব্দে স্পষ্ট প্রকাশ

১১০৮ খৃষ্টাব্দে বল্লালের রাজ্যাবসান হয়। বসু মহাশয় বলেন, লক্ষ্মণসেন অতিশয় দীর্ঘজীবী ছিলেন এবং তাঁহার সময়েই যবন বিপ্লব হয়।

মুসলমান ঐতিহাসিক মিনহাজ বলেন, যবন বিপ্লব ১২০৩ খৃষ্টাব্দে হয় নবদ্বীপে, কিন্তু লক্ষ্মণসেন যতই দীর্ঘজীবী হউন ১১০৮ হইতে ১২০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। যবন বিপ্লব পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে কি নবদ্বীপে হইয়াছিল, বসু মহাশয় তাহা স্পষ্ট বলেন না। মাত্র আছে, লক্ষণ যবন ভয়ে পূর্ব্ববঙ্গে সমতটে পলায়ন করেন এবং পশ্চাৎ তাঁহার পুত্র কেশবসেন নবদ্বীপ হইতে বঙ্গভূমে আগমন পূর্ব্বক ভ্রাতা বিশ্বরূপের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু লিখিত আছে যে লক্ষ্মণসেন বারাণসী, প্রয়াগ এবং শ্রীক্ষেত্রে বিজয়স্তম্ভ সংস্থাপন করেন। উক্ত বিজয়স্তম্ভ লক্ষ্মণের রাজ্য সীমার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। যে রাজা বারাণসী, প্রয়াগ, শ্রীক্ষেত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী ভারতাংশ বাহুবলে করতলগত করিয়া বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন, তিনি যে যবন ভয়ে সমতটে পলায়ন করিবেন তাহা সম্ভবপর নহে। প্রত্নতত্ত্ববিদ সুপ্রবীণ রাজা রাজেন্দ্রলাল প্রভৃত গবেষণার পর তাঁহার Indo-Aryan গ্রন্থে স্থির করিয়াছেন যে, আদিশূর ও দাক্ষিণাত্যাগত সমতটে হিন্দু-রাজ্য সংস্থাপক বৌদ্ধ শান্তা বীরসেন একই ব্যক্তি অর্থাৎ আদিশূরই সেনবংশের আদি পুরুষ এবং বল্লালসেন, বীরসেন বা অদিশূরেরই বৃদ্ধ প্রপৌত্র; শতবর্ষ মধ্যে চারি পুরুষ হওয়া অসম্ভব নহে। সুতরাং আদিশূর ও বল্লালের মধ্যবর্ত্তী কালে বঙ্গে পুনরায় বৌদ্ধাধিকার ঘটিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। বঙ্গ হইতে বৌদ্ধ প্রতাপ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইতে কিছুকাল অতিবাহিত হইয়াছিল, এইমাত্র অনুমান হয়।

রাজ তরঙ্গিণী গ্রন্থোক্ত যে উপাখ্যান অবলম্বনে নগেন্দ্রবাবু বিশ্বাস করিয়াছেন যে, আদিশূর ৭৪৫ হইতে ৭৭৬ খৃষ্টাব্দ মধ্যে বঙ্গদেশ শাসন করিতেছিলেন, তাহা এই স্থলে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। গল্পটি এই ঃ—আদিত্যবংশীয় কাশ্মীরের রাজগণ কায়স্থ। এই বংশীয় মহাবীর জয়াপীর বা জয়াদিত্য দিগ্বিজয় উপলক্ষে পূর্ব্বাভিমুখে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত আসিয়া সৈন্যগণকে তথা হইতে বিদায় দিয়া পঞ্চ গৌড় রাজ্যে ছদ্মবেশে একাকী প্রবেশ করেন এবং পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অথবা বর্ত্তমান রাজসাহী জেলাস্থিত ধ্বংশ প্রাপ্ত পাণ্ডুয়া নগরে উপস্থিত হইয়া "কার্ত্তিকের দেবমন্দিরে" নৃত্য দর্শন মানসে প্রবেশ করেন। তথায় কমলানাম্নী দেব-নর্ত্তকীর নৃত্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার সহিত তাহার গৃহে গমন করেন। * সেই সময়ে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে সিংহের উৎপাত হয়। জয়াপীড় স্বীয় ভুজবল প্রভাবে সেই সিংহকে বিনাশ করেন। সিংহ মারিতে গিয়া ঘটনা ক্রমে তাঁহার নামাঙ্কিত কেয়ূর পড়িয়া যায়। কোন ব্যক্তি তাহা পাইয়া গৌড়রাজ জয়ন্তের নিকট উপস্থিত করে। জয়াপীড়ের নামে সকলেই ভীত হইলেন। জয়ন্ত জানিতেন যে জয়াপীর কল্পিত "কপ্লট" নাম গ্রহণ পূর্ব্বক দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। তিনি অনুসন্ধানে জয়াপীড়ের অবস্থিতি স্থান জানিতে পারিয়া তাঁহাকে তথা হইতে মহাসমারোহে রাজপুরীতে আনয়ন পূর্ব্বক কন্যা কল্যাণদেবীকে সম্প্রদান করেন। জামাতার সাহায্যে জয়ন্ত সমগ্র পঞ্চ

* বিশ্বকোষ কায়স্থ প্রবন্ধ

গৌড় অর্থাৎ মিথিলা, রাঢ়, বরেন্দ্র, বাগড়ী ও বঙ্গ এই পঞ্চ রাজ্যের অধীশ্বর হন। বসু মহাশয় আরও বলেন যে, আদিশূর কান্যকুব্জে শ্বরের নিকট ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করায় কান্যকুব্জপতি পতিত (পাণ্ডববর্জ্জিত ?) গৌড়দেশে ব্রাহ্মণ পাঠাইতে সম্মত হন নাই। কাজেই গৌড়েশ্বর জয়ন্ত যুদ্ধার্থে কান্যকুব্জে সৈন্য প্রেরণ করেন এবং মহাবীর জয়াপীড় এই সেনার সৈনাপত্য গ্রহণ করেন। গৌড়ীয়সেনা প্রথমে পরাস্ত হয়, কিন্তু অবশেষে কৌশল অবলম্বনে জয় লাভ করে। গৌড়ীয় সাতশত ব্যক্তিকে উপবীত দিয়া গোযানে স্থাপন পূর্ব্বক যুদ্ধস্থলে প্রেরণ করায়, পরম হিন্দু কান্যকুব্জেশ্বর গো-ব্রাহ্মণ বধের আশঙ্কায় যুদ্ধে বিরত হইয়া আদিশূরের বা জয়ন্তের সহিত সন্ধি করেন এবং বঙ্গে ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিতে সম্মত হন। কেহ কেহ অনুমান করেন এই সাতশত উপবীতধারী ব্যক্তি হইতেই সাতশতী ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। কিন্তু পরম হিন্দু মহারাজ আদিশূর যে এইরূপ অহিন্দু ভাবের শঠতা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং আর্য্যাবর্ত্তে হিন্দুধর্ম্মের পুনঃসংস্থাপক কনোজ সমাজের সমাজপতি কান্যকুব্জেশ্বর যে ধর্ম্ম প্রচারে সাহায্যপ্রার্থীর সহিত বিরোধ করিয়াছিলেন তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

"সেন রাজাগণ" প্রণেতা কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলেন, বিজয়সেন চোলরাজা কুলতুঙ্গার সেনাপতি ছিলেন। তিনিই বঙ্গেশ্বর মহীপালদেবকে পরাজিত করিয়া সমতটে হিন্দু-রাজ্য সংস্থাপন করেন। বিজয়সেন মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক প্রদ্যুম্নেশ্বর শিব স্থাপন করেন। বিজয়সেনের সমকালে আদিশূর বংশীয় কোন নৃপতি বঙ্গ বা সমতটে রাজা ছিলেন। বিজয় সমতটের রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন ও বল্লালসেন সেই কন্যারই গর্ভজাত। কুলাচার্য্যেরাও তাহাই বলেন। লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় 'সম্বন্ধ নির্ণয়' গ্রন্থে ভূশূর নামে আদিশূর বংশীয় এক প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি মিত্র মহাশয়ের নিকট স্বীকার করিয়াছিলেন* যে, তৎসম্বন্ধে তাঁহার প্রমাণ মুর্শীদাবাদের এক কুলাচার্য্যের বাক্য মাত্র। এজন্য মিত্র মহাশয় তাহা বিশিষ্ট প্রমাণ নহে বলিয়া ত্যাগ করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলেন, আদিশূরের প্রপৌত্র ধরাশূর সর্ব্বপ্রথমে রাঢ়ী ব্রাহ্মণদিগের কুল-মর্য্যাদা স্থাপন করেন। ইহাও বোধ হয়, কুলাচার্য্য ঠাকুরদিগের কল্পনার ফল। বোধ হয়, কোন কুলাচার্য্য ধরাশূরের আখ্যায়িকা যোজনা করিয়াছেন। মিত্র মহাশয় মীমাংসা করিয়াছেন, বল্লাল আদিশূরের বৃদ্ধ প্রপৌত্র ; তাহাই সমীচীন বোধ হয়। বীরসেন চোলরাজাই হউন আর চোলসেনাপতিই হউন, মিত্র মহাশয়ের অভিপ্রায় মতে ক্ষত্রিয়ই হউন আর বসু মহাশয়ের মতে কায়স্থই হউন, তিনিই সেনবংশের আদি পুরুষ, তিনিই আদিশূর বা আদিবীর। সিংহ মহাশয় বিজয় সেনকে আদিশূর বংশের জামাতা স্থির করিয়াছেন। কিন্তু মিত্র মহাশয়ের তালিকায় পাওয়া যায় বীরসেনের পুত্র সামন্তসেন, তৎপুত্র হেমন্তসেন, তৎপুত্র অর্থাৎ বীরসেন বা আদিশূরের প্রপৌত্র বিজয়সেন। বিজয়সেন বোধ হয় মহাবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাসে আর

* Indo-Aryan.

একবিজয়ের উল্লেখ আছে। "কাশীক্ষেত্র দীপিকা-" কার সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, দেবের সমকালীন মগধের রাজা অজাতশত্রুর সমকালে বঙ্গে সিংহবাহু রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র বিজয়সিংহ পিতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া নৌযোগে সিংহলে গমন পূর্ব্বক তথায় রাজ্য স্থাপন করেন এবং স্বনামানুসারে সেই দ্বীপের নাম রাখেন "সিংহল"; কিন্তু সিংহ মহাশয়ের বিজয়সেন, বীরসেন বা আদিশূরের প্রপৌত্র ভিন্ন অপর বিবেচনা হয় না।

* **আদিশূর—বিক্রমপুরে ব্রাহ্মণ কায়স্থ—**

ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পঞ্চকের আগমন স্থাপন নির্ণয় ব্যাপার অনুমান করিতে হয়, সমতটের অন্তর্গত বিক্রমপুর নগর মহারাজ আদিশূরের অত্যন্ত প্রিয় রাজধানী ছিল। যদিও তিনি মিথিলা, বরেন্দ্র, রাঢ় ও বাগড়ী প্রভৃতি অর্থাৎ বর্ত্তমান পাটনা, রাজসাহী, কুচবিহার, বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগ শাসনাধীন করিয়া ক্রমে পঞ্চ-গৌড়েশ্বর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তথাপি বঙ্গ ভূমের প্রতিই তাঁহার অধিকতর প্রীতি ছিল। বৌদ্ধ বিজয়ের পূর্ব্বে তিনি বিক্রমপুরেরই রাজা ছিলেন। এজন্য তৎপরে তিনি বিক্রমপুর হইতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে রাজধানী পরিবর্ত্তন করেন নাই, তবে অনেক সময় সপরিবারে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে অবস্থিতি পূর্ব্বক মিথিলা ও বরেন্দ্রভূমের শাসন-কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। আদিশূরের উত্তর পুরুষেরা পরে ভাগীরথীতীরে নবদ্বীপের মনোহর মূর্ত্তি সন্দর্শনে তথায় তৃতীয় রাজধানী স্থাপন করেন। রাঢ়ভূম সুশাসিত রাখিবার জন্যই বোধ হয় নবদ্বীপে তৃতীয় রাজধানীর সৃষ্টি। তখন বিক্রমপুর হইতে নবদ্বীপ গমনের সুন্দর সুযোগ ছিল। এক্ষণে বঙ্গের বহুতর নদী মজিয়া সে সকল পথ রোধ হইয়াছে। বিক্রমপুর হইতে নবদ্বীপে সহজে গমনাগমন চলিত বলিয়া বল্লাল পর্য্যন্ত সেনরাজারা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অপেক্ষা এই দুই নগরে অধিকাংশ কাল অতিবাহিত করিতেন। এইরূপে বঙ্গ ও রাঢ়ের সহিত ঘনিষ্টতা থাকা হেতুই বোধ হয়, রাঢ়ী ব্রাহ্মণ এবং বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থের কৌলীন্যের নিয়মাবলী কিছু বেশী বাঁধাবাঁধি, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের তত নহে। এতদ্ভিন্ন বিক্রমপুরে আদিশূরের এবং উভয় নগরে বল্লালের "বল্লাল বাড়ী", "রামপাল," "বল্লাল ঢিবি" প্রভৃতি বহুতর স্মৃতি চিহ্ন আছে, সেগুলির সঙ্গে সঙ্গে যে ঐতিহ্য প্রমাণ বা Tradition নিহিত আছে, তাহা কিছুতেই ত্যাগ করা যায় না। সুতরাং বাল্যাবধি যে বিশ্বাস আছে যে, মহারাজ আদিশূরের আমন্ত্রণে বঙ্গভূমে বিক্রমপুর নগরে পাঁচটি "জ্বলন্নিব ব্রহ্মময়েন তেজসা" উগ্রতপা মহাজ্ঞানী সাগ্নিক ব্রাহ্মণ এবং তৎসঙ্গে পাঁচটি কায়স্থবীর আসিয়াছিলেন, তাহা বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতিত সর্ব্বতোভাবে অত্যাজ্য।

বিদ্যানিধি মহাশয় লিখিয়াছেন "কান্যকুব্জাগত পঞ্চব্রাহ্মণ বিক্রমপুর রাজধানীতে যে বেশে আসিয়াছিলেন, দৌবারিকমুখে সেই বেশ ও চরণে চর্ম্ম-পাদুকা ধারণ পূর্ব্বক তাম্বুল চর্ব্বণের কথা শ্রবণ করিয়া মহারাজাধিরাজ আদিশূর অত্যন্ত বিষণ্ণ ও দুঃখিত হইলেন"......এবং বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদিগকে অশ্রদ্ধা করিয়া কন্যকুব্জ হইতে যে ব্রাহ্মণদিগকে আনাইলেন তাঁহাদিগকে সদাচার বিশিষ্ট বোধ না হওয়ায় নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইলেন। এইরূপ অনুমান করিয়া রাজা অশ্রদ্ধা সহকারে অবসর মতে সাক্ষাৎ জন্য ব্রাহ্মণদিগকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া পাঠাইলেন। মহর্ষি পঞ্চক বিবেচনা

* "বঙ্গীয় সমাজ" সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত

করিলেন, "রাজা যখন তাঁহাদিগের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াও, অভ্যুদ্গমন অথবা তৎক্ষণাৎ সম্বর্দ্ধনা করিলেন না, বরঞ্চ অবসর পাইলে আসিবেন বলিয়া উপেক্ষার লক্ষণ প্রকাশ করিলেন, তখন আর এরূপে প্রতীক্ষা করা উচিত নহে, প্রভাব দেখান কর্ত্তব্য।" অগ্নিতুল্য ঋষি পঞ্চক কুপিত হইলে, হয়ত আদিশূর রাজা তৎক্ষণাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু পরম কারুণিক মহাপুরুষগণ রাজার প্রতি কিছুমাত্র কোপ করিলেন না। তাঁহারা বুঝিলেন যে বঙ্গের ব্রাহ্মণ্যহীনতা জন্য রাজা ব্রাহ্মণের প্রতি তাদৃশ শ্রদ্ধাবান্ নহেন; সুতরাং প্রভাব দেখানই কর্ত্তব্য। এই মনে করিয়া "রাজশুভানুষ্ঠান জন্য গৃহীত অর্ঘবারি সম্মুখস্থ মল্লকাষ্ঠে নিক্ষেপ করিলেন" তৎপ্রভাবে "চিরশুষ্ক মল্লকাষ্ঠ সরস হইয়া তৎক্ষণাৎ পল্লবিত ও ফলপুষ্পে সুশোভিত হইল।" সাধারণের বিশ্বাস এই যে, এই মল্লকাষ্ঠই কালে এক বৃহৎ গজারী বৃক্ষে পরিণত হয়। অদ্যাপি বিক্রমপুর নগরের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে লোকে একটী বৃক্ষ দেখাইয়া বলে যে এই সেই গজারী বৃক্ষ।

"এই অসামান্য অদ্ভুত ব্যাপার যখন অন্তঃপুরে ভূপতির কর্ণগোচর হইল, তখন তিনি ভক্তিভাবে গদগদ হইয়া গললগ্নীকৃতবাসে ও কৃতাঞ্জলিপুটে বহির্ভবনে উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পুরঃসর তাহাদিগের চরণ ধারণ পূর্ব্বক নিজকৃত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। উদার প্রকৃতি বিপ্রগণ ভূপতির স্তবে অনায়াসে পরিতুষ্ট হইয়া "মহারাজের স্বস্তি হউক" বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ ও নিরুদ্বেগ করিলেন। যাঁহারা সস্ত্রীক সভৃত্য অশ্বারোহণে ও সর্ব্বাঙ্গে সূচীস্যূত বস্ত্রধারণ পূর্ব্বক চরণে চর্ম্মপাদুকা ধারণ সহকারে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগেরই জন্য রাজা এক্ষণে যৎপরোনাস্তি ব্যস্ত ও ভক্তিমান হইলেন।"

পরে রাজা নির্দ্ধারিত শুভদিবসে সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ দ্বারা পুত্রেষ্টি যাগ সুসম্পন্ন করাইলেন। তাঁহাদিগের যজ্ঞ প্রভাবে অচিরকালমধ্যে রাজ-মহিষী গর্ভবতী ও কালক্রমে পুত্রবতী হইলেন। ইহা দেখিয়া মহারাজ পরম শ্রদ্ধাসহকারে দ্বিজ পঞ্চককে এবং কায়স্থ পঞ্চককে "বিক্রমপুরে বাস করাইবার জন্য অধ্যবসায়ারূঢ় হইলেন। তাহারাও রাজার ভক্তি ও নির্ব্বন্ধাতিশয় অতিক্রম * করিতে অসমর্থ হইয়া এইদেশে বাস গ্রহণ করিলেন।

শ্রদ্ধেয় ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের অভিপ্রায় যে, সেনরাজারা ক্ষত্রিয় ছিলেন, কিন্তু নগেন্দ্রবাবু তাঁহাদিগকে কায়স্থ প্রতিপন্ন করিবার জন্য কাশ্মীরের কায়স্থরাজা জয়াপীড়ের সহিত জয়ন্ত বা আদিশূরের কন্যার বিবাহ ঘটাইয়াছেন। এই সূত্রে সেনরাজাদিগকে "সেনদেব" উল্লেখে, কায়স্থ সাব্যস্ত করিয়াছেন, এবং বিক্রমপুর যবন হস্তে পতিত হওয়ার পরে, সেনবংশীয় বিক্রমপুরের শেষ রাজা মহারাজ দনুজমর্দ্দন দেব বা মুসলমান ঐতিহাসিকের উল্লিখিত দনোজা মাধব কর্ত্তৃক চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য স্থাপন অবধারিত করিয়া অবশেষে এই দেববংশীয় শেষ রাজা জয়দেবের দৌহিত্র বঙ্গজ কায়স্থশ্রেণীভুক্ত বসু বংশীয় রাজা পরমানন্দ রায়কে চন্দ্র দ্বীপের প্রথম বসুবংশীয় রাজা স্থির করিয়াছেন। "চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস" লেখক ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ও ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ব্রজবাবু বলেন,—"বাকলা সমাজের সমাজপতি মাধবপাশার বর্ত্তমান মিত্রবংশীয় রাজারা উল্লিখিত বসু বংশের দৌহিত্র বংশ সম্ভূত।

* সম্বন্ধ নির্ণয়।

কিন্তু ঘটককারিকায় মহারাজ দনুজমর্দ্দন দেবের পূর্ব্ব পুরুষ কোন কায়স্থ রাজবংশের উল্লেখ নাই। কিন্তু তাহা না থাকিলেও, যখন আইন-ই-আকবরী এবং মুসলমান ঐতিহাসিক মিনহাজ প্রভৃতি স্থির করিয়াছেন যে, চন্দ্রদ্বীপরাজ্য সংস্থাপক দনুজমর্দ্দন বিক্রমপুরের সেনবংশীয় শেষ রাজা, তখন দনুজের পূর্ব্বপুরুষ রাজাধিরাজ বল্লাল কায়স্থ ছিলেন না বলা যায় না। মহারাজ আদিশূর কখন বিক্রমপুরে, কখন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে এবং এতদ্ভিন্ন তাঁহার বংশধরেরাও সময়ে সময়ে নবদ্বীপেও রাজত্ব করিতেন, সুতরাং বঙ্গ, রাঢ় ও বরেন্দ্রভূমে সর্ব্বত্রই বহুতর বিত্তশালী ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাস হইয়াছিল। বঙ্গগত ব্রাহ্মণ কায়স্থেরা পরমসুখে আছে এবং তথায় তাহারা মহাসম্মানিত হইয়াছে, কান্যকুব্জাঞ্চলে এইরূপ একটা জনশ্রুতি হওয়ায় বোধ হয়, রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এবং বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ ব্যতীত অন্যান্য ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ বিত্তলালসায় উত্তরকালে ক্রমে ক্রমে বঙ্গদেশে বাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তন্মধ্যে বৈদিক ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ যে বল্লালের পূর্ব্বে এদেশে আসিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় না, কারণ বল্লালের কৌলীন্য সংস্থাপন ব্যাপারে তাঁহাদের উল্লেখ নাই। বৈদিক ব্রাহ্মণগণও বল্লালের সমাজের অন্তর্গত ছিলেন না। কিন্তু তাহার কারণ আছে।

বৌদ্ধ প্রভাবে বঙ্গদেশ যেরূপ ব্রাহ্মণ্যহীন হইয়াছিল তাহাতে বঙ্গীয় আদিম ব্রাহ্মণগণ প্রায় শূদ্রভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণমণ্ডলী মধ্যে পাঁচটি অথবা ছাপ্পান্নটি ব্রাহ্মণ বাসগ্রহণ করাতেই তাঁহাদের আদর্শে যে সমগ্র সমাজ সংস্কৃত হইয়াছিল তাহা সম্ভবপর নহে। সম্ভবতঃ অল্প-সংখ্যককে অচিরে বহু-সংখ্যকে মিলিত হইতে হইয়াছিল। হইয়াছিলও তাহাই। কান্য-কুব্জাগত ব্রাহ্মণ পঞ্চকের আগমন কালে বঙ্গে যে সাতশত ঘর ব্রাহ্মণের বাস ছিল ও যাঁহারা কালে "সাতশতী নামে অভিহিত হইয়াছেন, তন্মধ্যে যাঁহারা ভাল নিষ্ঠাবান ও ক্রিয়াশীল হইয়াছিলেন, বোধ হয় তাঁহারা ক্রমে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ বংশে বৈবাহিক সূত্রে মিলিত হইয়া "শ্রোত্রিয়' শাখাভুক্ত হইয়াছেন। সাতশতীর বহু ঘর বর্ণের ব্রাহ্মণ, অগ্রদানী, আচার্য্য ও ভাট শাখাভুক্ত হইয়া আছেন।* বিশুদ্ধ সাতশতী ব্রাহ্মণ বিক্রমপুরে অতি অল্পই আছেন।

বিক্রমপুরের পুরাণকথা—"বীণা" চৈত্র-বৈশাখ (১৩৩৪-১৩৩৫)।

আদিশূরের আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানগণ ও বাংলার প্রাচীনতম ব্রাহ্মণগণের বংশ লইয়া বাঙ্গালার ব্রাহ্মণসমাজ।

প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ আদিশূরের রাজত্বসময়ে বাংলা দেশে সদাচার বাক্‌সিদ্ধ সাগ্নিক বেদপারগ ব্রাহ্মণদ্বারা দেশের যথেষ্ট উপকার সাধিত হইয়াছিল।

৯৪২ খৃষ্টাব্দে বাংলায় পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করা হয়। কিম্বদন্তী, রামপালের নিকটস্থ যে পঞ্চসার গ্রাম বিদ্যমান আছে তাহাই নাকি পঞ্চ গ্রামের নামান্তর।

পঞ্চ ব্রাহ্মণ রাজপ্রদত্ত পাঁচখানা গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে যাগযজ্ঞ সাগ্নিক ক্রিয়াদ্বারা মহারাজের অভিপ্রেয় পুত্রেষ্টি যাগ আরম্ভ করেন। এমন সময় মহারাজ আদিশূর মানবলীলা সংবরণ করেন। ১০১০ খৃষ্টাব্দে তদীয় কন্যা রাজকুমারী লক্ষ্মীদেবী বাংলার রাজ্যভার প্রাপ্ত হইলেন। বিপ্রগণ রাজকুমারীর সেবাশুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হইয়া পুনঃ যাগ আরম্ভ করিলেন, কিছুদিন পরে রাজকুমারী লক্ষ্মীদেবী গর্ভবতী হইলেন। সেই গর্ভেই মহারাজাধিরাজ বল্লালসেনের জন্ম হয়। কিশোর অবস্থায় লক্ষ্মীদেবী স্বীয় পুত্রকে কয়েক বৎসরের জন্য বিপ্রগণের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়নে নিয়োগ

করেন, তৎপর সাবালকত্ব প্রাপ্তে আদিশূরের ওয়ারিশ সূত্রে দৌহিত্র বল্লালসেন রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের বিষয় অবগত হন্। তিনি আরো বিশেষরূপে জানিতে পারিলেন যে পঞ্চ ব্রাহ্মণের ৫৯টী সন্তান জন্মিয়াছে, এবং তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার সীমা বিভাগ নাই। সে সময় সারা বাঙ্গালায় বৌদ্ধবিপ্লব প্রভাবে বাঙ্গালার আদি ব্রাহ্মণগণ বৈদিক ক্রিয়াকলাপে শিথিল হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বৈদিক, রাঢ়ী ও বারেন্দ্র নামে সে সময় কোন সমাজের নাম শুনা যায় নাই। তাহাদের সামাজিকতাও ছিল কিনা সন্দেহ? সে সময় তাহারা নিজ নিজ সংসার ও ভোগবিলাসে রত ছিলেন। মহারাজ একদিন বিপ্রগণকে আনিয়া বংশ বিস্তার এবং তদীয় মাতামহের যশঃমান গৌরব রক্ষার জন্য বিশেষ বিবেচনা করিয়া ৫৯ জন সন্তানের প্রত্যেককে সুখে বসবাস করিবার জন্য রাঢ়দেশে একখানা করিয়া গ্রাম নির্দ্দিষ্ট করিয়া ৫৯ খানা গ্রাম দেওয়া হয়। মোটের উপর পঞ্চ ব্রাহ্মণকেই এদেশবাসী বর্ত্তমান "রাঢ়ী ও বারেন্দ্র উভয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের আদি পুরুষ" বলা যায়।

Mr. Vincent Smith, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির 'ফুট নোট' দেখিয়া যতদূর খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে তাহাই লেখা গেল।

অশোকের সময় হইতে আদিশূরের রাজত্বের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব প্রবল ছিল। এমন কি এই দেশ হইতে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি এক প্রকার লোপ পাইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছিল। মহারাজ আদিশূর প্রথমতঃ কনোজপতি হিন্দুরাজ বীরসিংহের নিকট পাঁচজন সুব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠান।

কান্যকুব্জ হইতে সুব্রাহ্মণ তীর্থযাত্রা ব্যতীত বাঙ্গালা দেশে আসিতে চাহিলেন না। কারণ অন্য কোন কারণে বাঙ্গালাদেশে আসিলে সে সময়ে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত।

এই সম্বন্ধে মনু বিশেষভাবে লিখিয়া গিয়াছেন—

"অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র মগধেষু চ।
তীর্থ যাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কার মর্হতি॥"

ঢাকার ইতিহাসপ্রণেতা লিখিয়াছেন—

সমুদয় কুলজ্ঞগণের মতেই আদিশূর যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার জন্যই ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে অধ্বর্য্যু, হোম এবং উদ্গান এই তিনটি ক্রিয়ার প্রয়োজন। তন্মধ্যে অধ্বর্য্যু-সম্বন্ধীয় কার্য্য যজুঃ দ্বারা, হোম-ক্রিয়া ঋক্ দ্বারা, উদ্গান সাম দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার জন্য বাঙ্গলা দেশে ব্রাহ্মণ আনয়নের প্রয়োজন হইলে, শুধু সামবেদী ব্রাহ্মণ দ্বারা ঐ কার্য্য কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে?"

৺লালমোহন মুখোপাধ্যায় বন্দ্যবংশে লিখিয়া গিয়াছেন, "কনোজজাত মহর্ষি দক্ষের কাশ্যপগোত্রের বংশধরগণ যখন যজুর্ব্বেদীরূপে অধ্বর্য্যুর কার্য্য করিয়াছেন, তখন তিনিও প্রধানতঃ যজুর্ব্বেদী ছিলেন এবং আদিশূরের যজ্ঞে অধ্বর্য্যুর কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় আরও বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন, "দক্ষঋষি যজুর্ব্বেদী ছিলেন।"

আদিশূরের রাজধানী যে রামপাল নগরের অনতিদূরে পঞ্চ গ্রাম—এ বিষয়ে মতভেদ আছে।

ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় আদিশূরের ইতিহাস সম্বন্ধে তত্ত্ববোধিনীতে লিখিয়াছেন—যাঁহারা বলেন, আদিশূর ঐতিহাসিক ব্যক্তি নহেন, তাঁহাদের কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। তাঁহাদের এ ধারণা সম্পূর্ণই ভ্রমাত্মক। আদিশূর নিশ্চয়ই একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। বাঙ্গালার ইতিহাসের অনেকগুলি পৃষ্ঠা আদিশূরের কথায় পূর্ণ থাকিবার বিষয় আছে। তিনি একজন ক্ষুদ্র রাজা ত ছিলেন না। অথচ এই রাঢ় ও গৌড় বিজয়ী আদিশূরের সত্তা কেন যে ঐতিহাসিকগণ খুঁজিয়া পাইতেছেন না তাহা বুঝা যায় না!

আদিশূর এই বাঙ্গালা দেশের একজন মহাপরাক্রমশালী স্বাধীন হিন্দু নরপতি ছিলেন। সে সময় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্লাবনে সমগ্র ভারতই ভাসিয়া চলিয়াছিল, এই বঙ্গেশ্বর আদিশূর সে সময়কার সেই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্লাবনে

ভাসমান বাঙ্গালাকে ফিরাইয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কূলে তুলিয়া দিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণ্যের প্রদীপ্ত আলোক শিখা তাঁহারই প্রভাবে ও প্রচেষ্টায় আবার নবভাবে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গালার সে সময়ে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের ও ব্রাহ্মণ সমাজের অধোগতি দেখিয়া তিনি যে কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুসমাজের সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন, তাহা ত সকলেই জানেন। আজ এই সকল কথা কেমন করিয়া অস্বীকার করা চলবে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। বাঙ্গালার বর্ত্তমান রাঢ়ী ব্রাহ্মণগণ সকলেই সেই আদিশূরের আনীত সেই কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণেরই বংশসম্ভুত।

তাহা ছাড়া সেই—পঞ্চব্রাহ্মণের সহিত যে পাঁচজন কায়স্থ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন যে, বাঙ্গালার বর্ত্তমান উচ্চ বংশীয় কায়স্থগণও সকলেই, আজ আদিশূরের ঐতিহাসিকতা অস্বীকার করিলে বাঙ্গালার বর্ত্তমান সমাজ, সামাজিকতা, বর্ণাশ্রম, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম সবই যে অস্বীকার করিতে হয়—সমস্তই যে ওলটপালট হইয়া যায়। বাঙ্গালার ইতিহাসটাকে যে তাহা হইলে সম্পূর্ণ নূতনভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে হয়! কিন্তু তাহাই কি বাঙ্গালার যথার্থ ইতিহাস হইবে?

আদিশূর বাস্তবিকই একজন চিরস্মরণীয় ঐতিহাসিক ব্যক্তি। আদিশূরের ঐতিহাসিকতা বাঙ্গালার ইতিহাসের একটা দিকের ভিত্তি। সে ভিত্তি উড়াইয়া দিয়া বাঙ্গালার ইতিহাস খাড়া করিতে গেলে সে ইতিহাস অসম্পূর্ণই থাকিয়া যাইবে। বাঙ্গালার বর্ত্তমান সামাজিকতার পূর্ব্ব ইতিহাসটী তাহা হইলে সত্য হইবে না। বাঙ্গালার বর্ত্তমানে সমাজ গঠন ও সামাজিক পদ্ধতি, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্য প্রভৃতি যে গুলি এখনও বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে, আদিশূরের ঐতিহাসিকতা না মানিলে, এগুলির মধ্যে সত্যতা ও সারত্ব থাকিবে না। তবে কেমন করিয়া বলিব, তাহা বাঙ্গালার যথার্থ ইতিহাস?

আদিশূরের ইতিহাসের সঙ্গে বাঙ্গালার বর্ত্তমান রাঢ়ী ব্রাহ্মণগণের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। সে যুগের সেই হিন্দু নরপতি আদিশূরের প্রবর্ত্তিত নীতির উপরই এখনও বাঙ্গালার বর্ত্তমান বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

Vincent Smith বলেন,—পালরাজগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে গৌড়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে আদিশূর নামক একজন ক্ষুদ্র রাজা থাকিতেও পারেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, "দক্ষিণ রাঢ়ের বর্দ্ধমান বিভাগবাসী রণশূর বাঙ্গলার শূরবংশের একজন রাজা ছিলেন। তিনি পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। ইহাদের রাজ্য পালরাজগণ কাড়িয়া লইয়াছিলেন। কাঞ্চীরাজ রাজেন্দ্র চোলকে বাঙ্গালা দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টায় এই রণশূর রাজা মহীপালকে ১০২৩ খৃষ্টাব্দে অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন।"

ইহা হইতে আমরা দুইজন আদিশূরের সন্ধান পাইতেছি। একজনের রাজধানী গৌড়ে, অপর জনের রাজধানী রাঢ়ে। অথচ রাঢ় ও বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ বলেন,—আমরা সেই এক পঞ্চ ব্রাহ্মণেরই বংশধর, অথচ রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের উপাধি বর্ত্তমানে ভিন্ন ভিন্ন দেখিতে পাই এবং বেদও উভয়ের এক নহে। যাহা হউক, ইহা লইয়া বহু বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। সে সকল কথার উল্লেখ এস্থলে আবশ্যক নাই। রাঢ়ভূমে যে একজন আদিশূর ছিলেন, সেই আদিশূরই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

Vincent Smith যে ভাবে গৌড়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে একজন আদিশূরের পরিচয় দিতেছেন, তাহাতে ঐস্থানে কোনও আদিশূরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

ঘটকদের কুলগ্রন্থেও উল্লিখিত আছে যে আদিশূরের সৈনিকগণ সপ্তশতী ব্রাহ্মণ ছিলেন। এইসকল কথার সহিত স্থানীয় জনপ্রবাদাদি মিলাইয়া এখন আমরা আদিশূরের ঐতিহাসিকতা কতদূর নির্ণয় করিতে পারি তাহাই দেখিব।

দক্ষিণ রাঢ়ের বর্দ্ধমান জেলায় আদিশূরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা যে সকল প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাই প্রকাশ করিতেছি।

ইতিপূর্ব্বে এই সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধাদি বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, এস্থলে আর সেই সব কথা না বলিয়া বর্ত্তমানে আরও কিছু নূতন কথা প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করিয়া আমরা আদিশূরের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব। আমাদের অনুসন্ধানের ফলে যে সকল প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে, নিম্নে তাহারই কয়েকটী প্রসঙ্গ উথাপন করিলাম।

১। আদিশূরের সৈনিকগণ সপ্তশতী ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং এই সপ্তশতী ব্রাহ্মণপ্রধান স্থান হইতে তাঁহার অন্যান্য সৈনিকগণ নিয়োজিত হইত এখনও আমরা দেখিতে পাইতেছি, বর্দ্ধমান জেলায় অনেক স্থানেই, বিশেষতঃ যে অংশে আদিশূরের রাজধানী ছিল, সেই অংশ সপ্তশতী বা সাতশহরা পরগণার অন্তর্গত।

এখন ইংরাজ আমলে সাতশইয়া পরগণার আয়তন ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে। নতুবা পূর্ব্বে এই সাতশইয়া পরগণা বোলপুর হইতে পূর্ব্বদিকে ভাগীরথী তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রবাদ এইরূপ যে, তাহারও অনেক পূর্ব্বে সমগ্র রাঢ় দেশই ছিল এই সাতশইয়া পরগণা।

তাহা অসম্ভব নহে। কারণ মুসলমান আমলে বাঙ্গালা দেশ নব নব পরগণায় বিভক্ত হইলেও সাতশইয়া পরগণা ইহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই ছিল। এ পরগণা হিন্দু আমলের। হিন্দুযুগ হইতেই মুসলমান রাজত্বে এবং তাহা হইতে ইংরাজ আমলে আসিয়া বাঙ্গালাদেশের আয়তনও যেমন কমিয়া গিয়াছে, সাতশইয়া পরগণারও আয়তন ক্রমশঃ সেইরূপ হ্রাস হইয়া গিয়াছে।

বর্দ্ধমানের উগ্র-ক্ষত্রিয়—২। বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে বর্ত্তমানে আমরা যে "উগ্রক্ষত্রিয়" নামক একটি বিশেষ প্রভাবশালী সম্প্রদায় দেখিতে পাইতেছি, মনে হয় তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সে যুগে আদিশূরের সৈনিক বিভাগে নিয়োজিত হইতেন এইরূপ প্রবাদও আছে এবং বর্দ্ধমান জেলায় এই উগ্রক্ষত্রিয় সমাজের প্রভাব প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা দেখিয়া স্বতঃই মনে হয় যে, ইহারা পূর্ব্বে একটা কিছু ছিলেন। এখনও সমগ্র বাঙ্গালার মধ্যে শতকরা ৭৭·৫ জন কি তাহারও বেশী উগ্রক্ষত্রিয় এক বর্দ্ধমান জেলায় বাস করে। এ জেলার এই সুপ্রতিষ্ঠ সম্প্রদায়টি সমগ্র বাঙ্গালার মধ্যে বর্দ্ধমান জেলায় যে একটি স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

মুসলমানের হিন্দু নাম—৩। সাতশইয়া পরগণার জমিদারগণ পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন। নবাবী আমল হইতে তাঁহারা মুসলমান হইয়াছেন। ইহাঁদের বাসস্থান সমুদ্রগড়; ইহাঁদিগকে এখনও সমুদ্রগড়ের রাজা বলে। সমুদ্রগড়ের ঠাকুর নামেও ইহাঁরা অভিহিত হইয়া থাকেন। এখনও ইহাঁরা একটি করিয়া ব্রাহ্মণ নাম ধারণ করেন। ঐ বংশের সকলেরই নাকি একটী হিন্দু এবং একটী মুসলমানী নাম থাকে। বর্ত্তমান জমিদারের হিন্দু নাম কেশব লাল ঠাকুর ও মুসলমানী নাম ইয়াসিন খাঁ।

আদিশূরের প্রাসাদ—৪। বর্ত্তমান সুটরা গ্রামে অন্ততঃ ২০০০ গজ লম্বা এবং ৬০০ গজ চওড়া। আদিশূরের যে ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার ইটগুলি পুরু, চৌকা টালির ন্যায় এবং ঠিক যেন পাথরের মত কঠিন। ইটগুলি আকারেও খুব বৃহৎ। এইরূপ ইট সচরাচর অন্যত্র কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তবে মুর্শিদাবাদ জেলার রাজা শশাঙ্কের কাণ-সোণার ধ্বংসাবশেষের ইটগুলির সহিত এই ইটের মিল হয়। কিন্তু এই ধরণের ইট বাঙ্গালা দেশের আর কোথাও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। অথচ ঐ ইট বর্ত্তমানে কাইশ গ্রামে অবস্থিত আদিশূরের প্রতিষ্ঠিত বরাহগোপাল দেবের মন্দিরে এবং তৎসংলগ্ন প্রাচীরাদিতেই দেখা যাইত। এখন আবার অনুসন্ধানের ফলে কাইগ্রামের অনেক স্থানেই মৃত্তিকার ভিতর হইতে এই ধরণের ইষ্টকময় ভিত্তি বাহির হইয়া পড়িতেছে।

নূতন নদী—৫। যে গ্রামে আদিশূরের দুর্গের ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই গ্রামটির বর্ত্তমান নাম মুটরা। কিন্তু কিছুদিন আগেও সকলে বলিত—শূউরো। এখনও অনেকে বিশেষতঃ প্রাচীন লোক মাত্রেই তাহাই বলিয়া থাকেন তৎপূর্ব্বে ছিল শূরো। প্রাচীন দলিলাদিতে কুত্রাপি মুটরা নাম নাই। শুরা বা শূরো এইরূপ নামই পাওয়া যায়।

এই ধ্বংসাবশিষ্ট দুর্গের সন্নিকটেই যে প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার চিহ্ন এখনও রহিয়াছে, সেটি আদিশূরের দীঘি বলিয়া এখনও প্রবাদ। এই দীঘির অনতিদূরে এবং বর্ত্তমান মুটরা গ্রামের নিম্ন দিয়া যে খড়্গেশ্বরী বা খড়ী নদী প্রবাহিত হইতেছে, সে নদীর অস্তিত্ব যে পূর্ব্বে ছিল না, সে কথা স্থানান্তরে প্রকাশিত প্রবন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

এ কথার আরও একটি প্রমাণ পাইয়াছি। কিছুদিন আগে মুটরা গ্রামের খুব একখানি প্রাচীন নক্সা জনৈক গৃহস্থের কুটীরে পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে এই নদীর কোনও পরিচয় বা চিহ্ন মাত্র ছিল না।

আদিশূরের মুদ্রা—৬। আদিশূরের দুর্গের ভগ্নাবশেষ অনুসন্ধানের ফলে এখানে কয়েকটী রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া যায় এবং তৎসহ যে একটী ভগ্ন প্রস্তর মূর্ত্তি এবং একটী স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায়, তাহারই কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বর্ণ মুদ্রাটীর আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, একটী গুট্কে পয়সার মত। অনেকটা পুরু। খাঁটী সোণায় নির্ম্মিত। মুদ্রাটির একদিকে একটি বীর পুরুষ অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া বিভঙ্গ ঠামে দণ্ডায়মান, মস্তকে শিরস্ত্রাণ। কতকাল পূর্ব্বে খোদিত এই মূর্ত্তি, তবু সে মূর্ত্তির মুখখানি এখনও কত উজ্জ্বল, কত যেন দীপ্ত হইয়া রহিয়াছে!

মুদ্রার অপর পৃষ্ঠে দুর্গা প্রতিমার চালচিত্র অঙ্কিত। এই বহুদিনের পুরাতন মুদ্রার চাকচিক্য এখনও নষ্ট হয় নাই। অনেকে অনুমান করেন, এই শিল্পনৈপুণ্য গুপ্ত-যুগের শিল্প ধারার অনুরূপ। এই গ্রামের একটি নিষ্ঠাবান্ সদ্ ব্রাহ্মণের গৃহে এই মুদ্রা দৃষ্ট হইয়াছে। এই ব্রাহ্মণ পরিবারে মুদ্রাটি দেবতারূপে সম্পূজিত হইয়া থাকেন। এই মুদ্রাটি কিছুদিন পূর্ব্বে একজন দরিদ্র ব্যক্তি আদিশূরদুর্গের সীমার মধ্যেই হউক বা সীমার বাহিরেই হউক, এইরূপ কোন এক স্থানে পাইয়া বিক্রয় করিতে চাহিলে এই পরিবারস্থ একান্ত স্বধর্ম্মানুরাগী ও পরম ভক্তিমান পুরুষ স্বর্গীয় হরিদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাহার নিকট ক্রয় করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহারই নির্দ্দেশ মত তদবধি এইভাবে মুদ্রাটীর পূজা হইয়া আসিতেছে।

মূর্ত্তির-সাদৃশ্য ৭।—আদিশূরের প্রতিষ্ঠিত বরাহগোপালদেবের মন্দিরে—"অনন্ত বাসুদেব"—নামক আর একটী দেববিগ্রহ স্থাপিত রহিয়াছে। বরাহগোপালদেবের সহিত সেটীরও নিত্য পূজা হইয়া থাকে। আমরা বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিয়াছি—সেই অনন্ত বাসুদেবের—একাংশে খোদিত অপর একটী প্রতিমূর্ত্তি এবং মুট্রা হইতে সংগৃহীত ভগ্ন প্রস্তর মূর্ত্তি, এই দুটিই একরূপ এবং এই দুটি মূর্ত্তির সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত ঐ স্বর্ণমুদ্রায় খোদিত মূর্ত্তিটীর সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রহিয়াছে।

এই সকল বিষয় এবং আরও অনেক বিষয় দেখিয়া শুনিয়া এই স্থানই যে আদিশূরের রাজধানীর অন্তর্ভূত তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আরও একটী কথা এইখানে বলিয়া রাখি। কয়েকদিন পূর্ব্বে মুট্রা গ্রামে মৃত্তিকা খনন কালে ভূগর্ভ হইতে একখানি পাথরের চৌকী পাওয়া গিয়াছে। প্রস্তরটি লাল রং এবং খুবই দীপ্তিময়। আদিশূরের দুর্গের পার্শ্বেই ইহা পাওয়া গিয়াছে। কয়েকটি রৌপ্যমুদ্রাও এই সঙ্গে বাহির হইয়াছে।

প্রাচীনের তিমির গর্ভে প্রবেশ করিলে অনেক রত্নের অনুসন্ধান পাওয়া যায়। বৃহৎপুরাণ তন্ত্রে স্বর্গীয় রাজমোহন চট্টোপাধ্যায় লিখিয়া গিয়াছেন—

"বঙ্গদেশে যৎকালে আদিশূর নামে বৈদ্য জাতীয় রাজা ছিলেন, তাঁহার অধিকারে অনাবৃষ্টি প্রযুক্ত যজ্ঞ করিবার আবশ্যক হয়, কিন্তু বঙ্গদেশে সে সময়ে তদ্রূপ সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তদ্ধেতু কস্যচিন্মতে গৌতমের প্রাদুর্ভাব কালে তৎশিষ্য পাল উপাধির রাজাদিগের শাসন সময়ে বঙ্গে বেদশাস্ত্র প্রায় লোপ হইয়াছিল। যাহা হউক একমত হইবেক এজন্যে আদিশূর কান্যকুব্জের রাজা বীরসিংহদেবকে নিবেদন করিয়া পাঠাইলেন যে তিনি কতিপয় বেদশাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ প্রেরণ করেন। অতএব উক্ত রাজা পঞ্চজনকে বঙ্গদেশে পাঠাইয়াছিলেন তাঁহাদের নাম, ১। ভট্টনারায়ণ, তাঁহার আদিপুরুষ শাণ্ডিল্য মুনি প্রযুক্ত শাণ্ডিল্য গোত্র। ২। শ্রীহর্ষ, ভরদ্বাজ বংশ্য হেতু

ভরদ্বাজ গোত্র। ৩। বেদগর্ভা, সাবর্ণ মুনি সন্তান জন্য সাবর্ণ গোত্র ৪। ছান্দড়, বাৎস্য বংশীয় হেতুক বাৎস্য গোত্র ৫। দক্ষ, কাশ্যপ ঋষি সন্তান প্রযুক্ত কাশ্যপ গোত্র। ভট্টনারায়ণ সমভিব্যাহারে যে ভৃত্য আইসেন তাঁহার নাম ১। মকরন্দ ঘোষ, শ্রীহর্ষ সঙ্গে ২। কালিদাস মিত্র, বেদগর্ভ সহিত ৩। দশরথ গুহ, ছান্দড় সঙ্গে ৪। দশরথী বসু, দক্ষ সমভিব্যাহারে ৫। পুরুষোত্তম দত্ত, এইরূপে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আর পঞ্চ কায়স্থ রাজা আদিশূর কর্তৃক বঙ্গদেশে আনীত হইয়া ক্রমশঃ দেশময় বিস্তার হয়, তাহার তদন্ত বিস্তাররূপে ফুলাচার্য্য মিশ্র প্রভৃতির গ্রন্থে প্রচার আছে। ব্রাহ্মণের ৫৬ ছাপ্পান্ন গাঞী হওনের হেতু উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তান ক্রমশঃ মহারাজ বল্লালসেনের শাসনকালে ৫৬ ছাপ্পান্ন জন উপস্থিত থাকাতে তাঁহাদিগের প্রত্যেককে এক এক খানি গ্রাম ব্রহ্মোত্তর দিয়া বাস করাইয়াছিলেন এবং এই ৫৬ ছাপ্পান্ন জনের মধ্যে আচারের তারতম্য হেতুক উচ্চনীচ শ্রেণী বিভক্ত করিয়াছিলেন, তাহার মুখ্য অর্থাৎ নবগুণ বিশিষ্ট আটজন, আর গৌণ অর্থাৎ গুণের কিঞ্চিৎ ন্যূনতা বিশিষ্ট চতুর্দ্দশ এই দ্বাবিংশতি জন কুলীন, অবশিষ্ট ৩৪ চতুস্ত্রিংশৎ গুণের অনেক লাঘবত্ব হেতু শ্রোত্রিয় নামে খ্যাত হন। আর এই বঙ্গদেশস্থিত পূর্ব্বতন যাঁহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁহাদিগের গণনায় ৭০০ সপ্তশত ঘর হইলে তাহাদিগের পৃথক সাতশতী থাক নির্দ্দিষ্ট করেন এবং উক্ত সাতশতী ব্রাহ্মণদিগের সহিত অভিনব আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানদিগের আদান প্রদান হয় না।

		কলের্গতাব্দাঃ
		৩৯৮৩৷৬
বল্লালসেন—ইনি ধীসেনের পুত্র এবং তাঁহার শাসনকাল		১৮৷৫
লক্ষ্মণসেন—ইনি বল্লালসেনের পুত্র	ঐ	১০৷৫
কেশবসেন—ইনি লক্ষ্মণের ভ্রাতা	ঐ	১৫৷৮
মাধবসেন—ইনি কেশবের পুত্র	ঐ	১১৷৪
শূরসেন—ইনি মাধবের পুত্র	ঐ	৮৷২
ভীমসেন—ইনি শূরসেনের পুত্র	ঐ	৫৷২
কার্ত্তিকসেন—ইনি ভীমসেনের পুত্র	ঐ	৪৷১
হরিসেন—ইনি কার্ত্তিকসেনের পুত্র	ঐ	১২৷২
শত্রুঘ্নসেন—ইনি হরিসেনের পুত্র	ঐ	৮৷১১
নারায়ণসেন—ইনি শত্রুঘ্নের পুত্র	ঐ	২৷৩
লক্ষ্মণসেন—ইনি নারায়ণের পুত্র	ঐ	২৬৷১১
		৪১০৭৷০

* "জাতীয় জীবন সংশোধনের প্রধান উপায় দেশের ইতিহাস" যেস্থান বহু পণ্ডিতমণ্ডলী ও বিবুধজন সেবিত হইয়া একদিন ভারতের বু-মধ্য (O'meridian) বলিয়া গণ্য হইত, যে স্থানের প্রতি ধূলিকণার সহিত অসংখ্য হিন্দু মুসলমান সাধক, পীর ও মহাপুরুষের প্রাচীন স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে, যে স্থান সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বঙ্গের রাজধানী বলিয়া পরিগণিত ছিল ....তথাকার বিস্তৃত বিবরণ জানিবার জন্য কাহার না ইচ্ছা হয় ?"

রাজমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত বৃহৎ পুরাণ তন্ত্রে আদিশূরের বংশাবলী একেবারে উপহসনীয় বা উপেক্ষার বিষয় নয়। সুধু কিম্বদন্তী ও প্রবচনের উপরে ইতিহাসের ভিত্তি-গ্রথিত করিতে যাওয়া নিতান্ত উপহসনীয় হইলেও উহাকে

* "ঢাকা জিলার ইতিহাস" শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত।

একেবারে উপেক্ষা করাও চলে না। তিমির জলদাবৃত অমানিশার সূচীভেদ্য অন্ধকারে পথহারা বিপন্ন পথিক যেমন তড়িৎ রেখার ক্ষণিক আলোকে স্বীয় গন্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ প্রবাদের ক্ষীণ বর্ত্তিকা হস্তে অতি সন্তর্পণে আমাদিগকে অন্ধতমসাচ্ছন্ন প্রাচীন ঐতিহ্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া দেশের বিলুপ্তপ্রায় কীর্ত্তিকাহিনী সযত্নে রক্ষা করিতে হইবে *"।

* পঞ্চ ব্রাহ্মণের আনয়ন সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিভিন্ন মত জানিতে পারা যায়; "ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতে" লিখিত আছে যে, একবার মহারাজার ছাদের উপর গৃধ্র বসে, গৃধ্র বসা নিতান্ত অমঙ্গলের কারণ, মহারাজ সভাসদ্-গণকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু তৎকালে বিক্রমপুরে ও সমগ্র বঙ্গদেশে কেহ শাস্ত্রজ্ঞ না থাকায় কেহই মহারাজার কথার উত্তর দিতে পারিলেন না, কিন্তু মহারাজার সভাসদবৃন্দের মধ্যে জনৈক ব্রাহ্মণ তীর্থযাত্রা উপলক্ষে কান্যকুব্জে গিয়াছিলেন, সেখানকার রাজার ছাদের উপর এইরূপ গৃধ্র বসায় তথাকার ব্রাহ্মণগণ মন্ত্র দ্বারা সেই পক্ষী ধরিয়া তাহার মাংসে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের প্রমুখাৎ এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মহারাজ তাঁহাকে পঞ্চ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ আনিবার জন্য কনৌজে পাঠাইয়া দিলেন। 'দুর্গামঙ্গল' কাব্য প্রণেতা ভবানীপ্রসাদ বলেন যে আদিশূর বাজপেয় যজ্ঞ করিবার জন্য পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, উক্ত গ্রন্থে আরও লিখিত আছে যে, সে সময়ে অতি বৃষ্টির জন্য প্রজাদের অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল তাই মহারাজ যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন।

'সম্বন্ধ নির্ণয়কার' পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি বলেন, মহারাজাধিরাজ অশোকের সময় হইতে আদিশূরের রাজত্বকালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব ছিল। সেই প্রভাবেই এদেশ হইতে এককালে ব্রাহ্মণ্য রহিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আদিশূরের প্রভাবে যখন পুনর্ব্বার বঙ্গদেশে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান হয় তখনও সমস্ত বঙ্গদেশ মধ্যে সাত শত ঘরের অতিরিক্ত ব্রাহ্মণ ছিল না এবং ঐ সকল ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধদিগের প্রভাবে এমন নিস্তেজ হইয়াছিলেন যে, মহারাজ আদিশূর পুত্রেষ্টি যাগের প্রশ্ন করিলে তাঁহারা তদ্বিষয়ে অজ্ঞ ও অক্ষম বলিয়া রাজার নিকট পরিচয় দিলেন। ইহাদিগের মূর্খতা নিবন্ধন রাজাকে ক্ষুব্ধ হইতে হইল। ক্ষুব্ধ হইলেন বটে, কিন্তু যাগসিদ্ধি বিষয়ে এককালে হতাশ্বাস হইলেন না, তৎক্ষণাৎ (৯৯৯ সংবতে) কান্যকুব্জাধীশ্বরের নিকট পঞ্চগোত্রের পঞ্চজন সচ্চরিত্র সাগ্নিক, বেদজ্ঞ, যজ্ঞনিপুণ ও বিদ্বান ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করেন। (সম্বন্ধ নির্ণয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ১৪।১৫)

আদিশূর নবনবত্যধিক নবশতী শতাব্দে পঞ্চ-ব্রাহ্মণানানয়ামাস। কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্র, যজুর্ব্বিবাহ পৃঃ ১৫

রাজেন্দ্র বাবুর ইণ্ডো এরিয়ানের বংশমালা।

আদিশূর	(৯০০ খ্রীঃ—৯৫২)	পূর্ব্ববঙ্গে	
ভূশূর পুত্র	(স্বতন্ত্র বংশ)	বীরসেন (আদিশূর)	৯৮৬ খৃঃ
লক্ষ্মী কন্যা	(৯৫২-৯৭০)	সামন্তসেন	১০০৬
অশোক সেন	(৯৭০-৮১)	হেমন্তসেন	১০২৬
শূরসেন	(৯৮১-৯৪)	সমস্ত বঙ্গদেশে	
বীরসেন	(৯৯৪-১০১২)	বিজয় ওরফে শুকসেন	১০৪৬
সামন্ত সেন	(১০১২-১০৩০)	বল্লালসেন	১০৬৬
হেমন্ত সেন	(১০৩০-১০৪৮)	লক্ষ্মণসেন	১১০৬
বিজয়সেন	(বিদ্ধক) (১০৪৮)	মাধব সেন	১১৩৬
বল্লালসেন	(১০৬৬-১১০১)	কেশবসেন	১১৩৮

* "বিক্রমপুরের ইতিহাস" শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত

১ম লক্ষ্মণসেন	(১১০১-১১২১)	লাক্ষ্মণ্য বা অশোকসেন	১১৪২
মাধবসেন	(১১২১-২২)	বিক্রমপুরে	
কেশবসেন	(১১২২-২৩)	বল্লালসেন ২য়	
লাক্ষ্মণেয় বা ২য় লক্ষ্মণসেন		সুষেন	
ইহারই নাম লক্ষ্মণনারায়ণ	(১১২৩-১২০৩)	শূরসেন	

"মুখবংশ" প্রণেতা লালমোহন মুখোপাধ্যায় যাহা লিখিয়াছেন তাহা এইস্থলে উদ্ধৃত হইল।

আদিশূরের রাজত্ব সময়ে বঙ্গদেশে সদাচারসম্পন্ন, সাগ্নিক, বেদপারগ ব্রাহ্মণ না থাকায়, তিনি পুত্রেষ্টিযাগ করিবার অভিপ্রায়ে কান্যকুব্জাধীশ্বরের নিকট দূত প্রেরণ পূর্ব্বক পঞ্চ গোত্রের পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করেন। তদনুসারে কনোজাধিপতি মহারাজ বীরসিংহ গোত্রপ্রবর্ত্তক মুনিদিগের মধ্যে যে পঞ্চগোত্র অগ্রগণ্য দেখিলেন, সেই পঞ্চগোত্র হইতে বিশিষ্ট বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন সুকবি, সৎক্রিয়াশালী মুনিবিশেষ ও বাক্‌সিদ্ধ পঞ্চ ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা ৯৯৯ সংবতে অর্থাৎ ৯৪২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গে আগমন করেন।

শাণ্ডিল্য-গোত্রজ শ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ।
দক্ষোঽথ কাশ্যপ শ্রেষ্ঠো বাৎস্যশ্রেষ্ঠোঽথছান্দড়ঃ॥
ভরদ্বাজ কুলশ্রেষ্ঠঃ শ্রীহর্ষো হর্ষবর্দ্ধনঃ।
বেদগর্ভোঽথ সাবর্ণো যথা বেদ ইতি স্মৃতঃ॥

শাণ্ডিল্যগোত্রে—ভট্টনারায়ণ, কাশ্যপগোত্রে—দক্ষ, বাৎস্যগোত্রে—ছান্দড়, ভরদ্বাজগোত্রে—শ্রীহর্ষ এবং সাবর্ণগোত্রে—বেদগর্ভ, এই পঞ্চগোত্র সম্ভূত পঞ্চ ব্রাহ্মণ বঙ্গে আসিয়াছিলেন।

আদিশূরো নবনবত্যাধিক নবসতী শতাব্দে পঞ্চব্রাহ্মণানানয়ামাস।

"শুভক্ষণ শুভতিথি, যে অঙ্গের নাস্যগতি
ত্রিয়াবৃত্তি, তার মাঘ মাসে
শুক্লার পুষ্যায় আসি পঞ্চ ভৃত্য, পঞ্চ ঋষি,
প্রদীপ্ত করে রাজার বাসে॥"

"স্বভাবে নৈব যঃ ক্ষুদ্রোর্দিগুণা দক্ষতোঽপি বা।
না জহাতি নিজং ভাবং নবমাস্ত ইবেশ্বরঃ॥"

ভাস্করাচার্য্য।

কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ যজ্ঞোপকরণ সহিত বিক্রমপুরান্তর্গত রামপালের রাজদ্বারে উপনীত হইলে, দৌবারিক রাজসমীপে সংবাদ দেয়। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাহ্মণ-পঞ্চ কোন্ কোন্ বেশে আগমন করিয়াছেন। দৌবারিক পুটাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিল, ব্রাহ্মণেরা স্ত্রী এবং ভৃত্যসহ গো-যানে আরোহণ করিয়া, চরণে চর্ম্ম-পাদুকা ধারণপূর্ব্বক, তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি, দ্বারপালের প্রমুখাৎ ব্রাহ্মণগণের বিষয় অবগত হইয়া, অশ্রদ্ধা প্রযুক্ত সাক্ষাৎ করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন। দ্বারপালকে বলিলেন "ব্রাহ্মণদিগকে যাইয়া বল আমি কার্য্যান্তরে আছি, এক্ষণে সাক্ষাৎ করিতে পারিব না।" দ্বারপাল প্রত্যাগত হইয়া সংবাদ দিলে, পঞ্চ মুনিবর রাজার মনোগত ভাব যোগবলে জ্ঞাত হইয়া তাহার শুভানুষ্ঠান জন্য গৃহীত আশীর্ব্বাদীয় অর্ঘ-বারি ও পুষ্পাদি রাজ-দ্বারস্থ শুষ্ক গজারিগাছ,—যাহার সহিত রাজার হাতী বাধা হইত, তদুপরি অর্পণ করিয়া, তথা হইতে গমনোন্মুখ হইলেন। অলৌকিক-শক্তি প্রভাবে গজারি গাছ হইতে তৎক্ষণাৎ দুইটী অঙ্কুর উদ্গত হইল। এতদ্দৃষ্টে দৌবারিক পুনরায় অন্তঃপুরে রাজসমীপে সংবাদ দিলে রাজা বহির্ভবনে উপস্থিত হইয়া ভক্তিভাবে গললগ্নীকৃতবাসে ও কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণিপাত পুরঃসর তাহাদিগের চরণ ধারণ পূর্ব্বক নিজকৃত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। উদারপ্রকৃতি বিপ্রগণ ভূপতির স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া, "মহারাজের স্বস্তি হউক" বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ ও নিরুদ্বেগ করিলেন। পরে রাজা নির্দ্ধারিত শুভ দিবসে সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণদ্বারা পুত্রেষ্টি যাগ সম্পন্ন করাইলেন।

কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের ৫৯ জন সন্তান, ভট্টনারায়ণের ১৬, দক্ষের ১৬, শ্রীহর্ষের ৪, বেদগর্ভের ১২, ছান্দড়ের (পুত্রপৌত্রে) ১১, সর্ব্বশুদ্ধ ৫৯।

পঞ্চবিপ্রের এইরূপ বংশ বিস্তার হইতেছে দেখিয়া মহারাজ বল্লাল বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে ইহাদের সন্তানগণ যদি এতদ্দেশীয় পুরাতন অধিবাসী সপ্তশতী ইত্যাদি ব্রাহ্মণগণের সহিত ক্রিয়াকর্ম্ম করিয়া তাঁহাদের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়, তবে এ দেশে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের গৌরব রক্ষা হইবে না এবং পুনরায় ঐরূপ ব্রাহ্মণের অভাব হইবে। এজন্য তিনি ইহাদের মধ্যে কোন একটা প্রভেদ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি প্রথমতঃ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণের ৫৯ জন সন্তানগণকে বসতি করার জন্য, রাঢ়দেশে প্রত্যেককে এক এক খানা করিয়া মোট ৫৯ খানা গ্রাম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।

তদবধি ইঁহাদের অধস্তন সন্তানেরা সেই সেই গ্রামীন বা "গাই" নামে অভিহিত হন, এবং ঐ গাইগুলিই শেষে এক এক বংশের পরিচায়ক উপাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বর্ত্তমানে বিক্রমপুরে তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজ বল্লালসেন যে ৫৯ খানা গ্রাম রাঢ়দেশে দান করিয়াছিলেন—তাঁহারাই রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

এদেশে ভট্টনারায়ণাদির অভাব হইলে কান্যকুব্জবাসী পূর্ব্বপক্ষীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রেরা তাঁহাদের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া শ্রাদ্ধ করিলেন, কিন্তু, প্রতিবাসী ব্রাহ্মণেরা তাহাদের দান গ্রহণ কি অন্ন ভোজন না করায় তাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া স্ত্রীপুত্র সহিত গৌড়ে আসিলেন। গৌড়াধিপ তাঁহাদিগকে রাঢ় দেশে বাস করার উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু

বিপ্রগণ বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণের সহিত রাঢ় দেশে বসতি করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে, গৌড়াধিপতি রাজধানীর নিকটবর্ত্তী বরেন্দ্রভূমে অর্থাৎ পদ্মানদীর নিকটবর্ত্তী দেশে শস্যপূর্ণ মনোহর গ্রাম তাঁহাদের বাসস্থানের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। এইরূপে বরেন্দ্রভূমে বাস-হেতু তাঁহারা "বারেন্দ্র" খ্যাতিলাভ করিলেন।

সম্বন্ধনির্ণয়কার লিখিয়াছেন—বৈদিকেরা কোন গাই বা গ্রামীন বলিয়া খ্যাত নন, নিগাই বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। যদি ইঁহারা বঙ্গাধিপ কর্ত্তৃক আনীত হইতেন, তবে অবশ্য ইঁহাদিগেরও রাজদত্ত সম্মান-সূচক গ্রাম থাকিত। যখন উহা নাই, অথচ সম্মানেরও লাঘব দেখা যায় না, তখন অবশ্য ইঁহাদিগের বিষয়ে কোন নিগূঢ় কথা আছে। (বেদান্ বেত্তি যঃ স বৈদিকঃ) বৈদিকেরা কহেন, কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণদিগের আগমনের পূর্ব্বে যে প্রকার এদেশীয় ব্রাহ্মণগণ মধ্যে অর্থাৎ সাতশতীগণ মধ্যে বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যের লোপ হইয়াছিল, কালক্রমে কান্যকুব্জে সন্তানগণ মধ্যেও সেই প্রকার বেদাদি শাস্ত্রচর্চ্চার হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল। তখন ইহাদিগের অন্য উপদেষ্টার আবশ্যক হয়। তৎকালে দ্রাবিড়াদি দেশে বেদের বহুল আলোচনা ছিল। কান্যকুব্জীয়েরা দ্রাবিড় দেশ হইতে আগত বেদপারগ ব্রাহ্মণগণের নিকট বেদের যথার্থ উপদেশ পাইয়া তাঁহাদিগকে স্বকীয় আবাসের নিকটেই বাস করাইলেন। তদবধি ইঁহারা বৈদিক নামে খ্যাত হইলেন। ইহারা কোন্ সময়ে এদেশে আগমন করেন, তাহা নির্ণয় করা প্রকৃতপক্ষে বড় কঠিন। আবার আমাদের পূর্ব্ববঙ্গবাসী কোন কোন বৈদিক বলেন যে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ দ্রাবিড় হইতে বঙ্গদেশে আসেন নাই, কান্যকুব্জ হইতেই শ্যামলবর্ম্মার সময় আসিয়াছিলেন।

বৈদিক সম্বন্ধে এদেশে আগমনের হেতু অনেক গ্রন্থ ঘাটিয়া ও কিংবদন্তী শুনিয়া বৈদিক বংশের ইতিহাস লিখিত হয়। তবে মোটামোটী তাঁহারা শ্রাদ্ধ উপলক্ষে হিন্দুরাজগণের বৈদিকক্রিয়ায় পৌরহিত্য করিতে আসিয়াছিলেন এবং তদবধি বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বিক্রমপুরে ও বঙ্গদেশের অনেক স্থানে ব্রহ্মোত্তর দান পাইয়া বসবাস করিতেছেন। আজ পর্য্যন্ত রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের শ্রাদ্ধের বৈদিক ক্রিয়া—বৈদিক ব্রাহ্মণদ্বারা সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহারাই সেই সময় বেদীর উপর একমাত্র বেদ পাঠের অধিকারী।

মহারাজ বল্লালসেন পঞ্চ ব্রাহ্মণের উনষষ্টি সন্তানকে গাই আখ্যা প্রদান করিবার পরে বিবেচনা করিলেন, বঙ্গদেশীয় আদি অনগ্নিক দ্বিজদল হইতে তাঁহাদের প্রভেদের কেবল গাই মাত্র পরিচায়ক আছে, অন্য কোন বিশেষ চিহ্ন না থাকিলে, উভয় শ্রেণী মিশ্রিত হওয়া সম্ভব, এজন্য তিনি তাঁহাদের আচারাদি গুণ পরীক্ষা পূর্ব্বক, কুলীন ও শ্রোত্রিয় এই দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। দ্বাবিংশতি জনকে কুলীন এবং সপ্তত্রিংশৎ জনকে শ্রোত্রিয় আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছিল।

দ্বাবিংশতি গাই—কুলীনদিগের মধ্যে যে আট গাই সর্ব্বতোভাবে নবগুণ বিশিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদিগকে "মুখ্য" কুলীন এবং যে চতুর্দ্দশ গাই নবগুণে একটু হীন ছিলেন, তাঁহাদিগকে "গৌণ" কুলীন সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছিল।

মোট ৫৯ গাই মধ্যে ২২ গাই কুলীন বাদ দিলে ৩৭ গাই অবশিষ্ট থাকে। পালধি প্রভৃতি সেই সাইত্রিশ গাই অষ্টগুণ বিশিষ্ট অর্থাৎ নিম্নোক্ত নবগুণের মধ্যে ইহাঁরা আবৃত্তিগুণে বিহীন ছিলেন, এজন্য শ্রোত্রিয় সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন।

কুলীন লক্ষণ

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং॥

কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিবার পূর্ব্বে বঙ্গদেশে যে সব পুরাতন অধিবাসী আট গোত্র সাতশত ঘর ব্রাহ্মণ ছিলেন, কনোজাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ হইতে এই সাতশত ব্রাহ্মণের পার্থক্য রাখিবার জন্য "সপ্তশতী" আখ্যার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর সি, আই, ই, মহোদয় তাঁহার 'ভক্তির জয়' নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সুপ্রসিদ্ধ মাননীয় ডক্টার রাজেন্দ্র লাল মিত্রের মতামত সহ যাহা লিখিয়াছেন।— (বিক্রমপুর ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় তাহার গ্রন্থের নিবেদনে লিখিয়াছেন, বঙ্গগৌরব প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের ন্যায় মহৎ ব্যক্তির ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত সমূহই যখন দিন দিন ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে, তখন আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে কোন কথা জোর করিয়া বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতা নহে কি? আমার পক্ষেও স্বর্গীয় রাজমোহন চট্টোপাধ্যায় ও লালমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির অতি পুরাতন গ্রন্থ সমূহের বিশেষ প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠাগুলি উদ্ধৃত করা স্বত্বেও ভক্তির জয় গ্রন্থের কথা পুনঃ উল্লেখ করা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইবার ভয় থাকিলেও একটুকু উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।)

আমি যে সময়ের ইতিবৃত্ত কহিতে যাইতেছি, সে আজি প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসরের কথা। কিন্তু তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়েরও কিছু কিছু বৃত্তান্ত এখানে প্রসঙ্গ সঙ্গতির অনুরোধে সামান্যতঃ উল্লেখ করা আবশ্যক হইয়াছে। কারণ বঙ্গের রাজধানী কিরূপে যবনের গ্রাসে পড়িল, এবং যবন রাজ-পুরুষেরা পরিশেষে বঙ্গদেশে কিরূপে ভয়ঙ্কর পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন, সে কথার সহিত এই গ্রন্থের মুখ্য কথার প্রকৃতই নানা সূত্রে সম্পর্ক আছে।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজের কুল-ব্যবস্থা-পক ক্ষত্রবংশীয় ক্ষত্রবীর মহারাজাধিরাজ বল্লালসেন বাঙ্গালীমাত্রেরই নিকট সুপরিচিত। বল্লাল ১০৬৬ খৃঃ অব্দে বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন, এবং ৪১ বৎসর কাল স্বাধীন অধীশ্বর রূপে রাজত্ব করিয়া ১১০৬ খৃঃ অব্দে লোকান্তর প্রাপ্ত হন। বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণসেন বঙ্গীয় সেনরাজাদিগের মধ্যে বিখ্যাতনামা লোক। তাঁহার সময়ে মিথিলা—(বর্ত্তমান ত্রিহুত) প্রদেশও বঙ্গের অধিকারভুক্ত ছিল; এবং বারাণসী, প্রয়াগ ও শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থান সমূহেও তাঁহার বিজয়স্তম্ভ সংস্থাপিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার নিজ নামে মিথিলায় একটি অব্দ প্রচলন করিয়াছিলেন। সে অব্দের নাম লক্ষ্মণ সংবৎ। উহার ব্যবহার-চিহ্ন লং সং অথবা লসং। মিথিলার অনেক স্থলে এখনও উহার প্রচলন আছে। পণ্ডিত-প্রিয় লক্ষ্মণ, পিতার স্নেহে প্রস্ফুট—বাল্যে বহু শাস্ত্রে সুশিক্ষিত, এবং প্রথম যৌবনে যুবরাজের পদ-সম্পর্কেই রাজ্য-শাসনের সকল কার্য্যে সুশিক্ষিত হইয়া পিতৃবিয়োগের পরও সম্ভবতঃ সতর আঠার বৎসর জীবিত ছিলেন। তিনি যখন যুবরাজ নামেই দেশের রাজা, সেই সময় হইতেই ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব নামক গ্রন্থ প্রণেতা বিখ্যাত পণ্ডিত হলায়ুধ রাজ-পণ্ডিতরূপে তাঁহার প্রিয় সহচর, এবং তিনি যেকালে স্বয়ং কর্ত্তৃত্বে সিংহাসনে অধিরূঢ়, তখনও হলায়ুধই রাজমন্ত্রীরূপে তাহার প্রধান সুহৃৎ। আবুল ফজল বলেন যে, লক্ষ্মণসেন আট বৎসর মাত্র

বিক্রমপুরে রাজত্ব করিয়াছেন। এ কথা নিতান্তই অপ্রামাণিক। সুবিখ্যাত পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র অনুমান করেন যে, লক্ষ্মণসেন সম্ভবতঃ ত্রিশ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। ইহাও আমার নিকট একটু বেশী বলিয়া বোধ হয়।

বল্লালসেন, "দান সাগর" গ্রন্থে, "নিঃশঙ্কশঙ্কর গৌড়েশ্বর" বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন।*

কথিত আছে, বল্লালসেনের চরিত্র ভাল ছিল না। একদা তিনি মৃগয়া করিতে গিয়া একটী ডোম জাতীয়া স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন† ; তজ্জন্য লক্ষ্মণসেনের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য উপস্থিত হয়।‡ তখন লক্ষ্মণসেন পিতার নিকট হইতে দূরবর্ত্তী বিক্রমপুরের রাজধানীতে গিয়া অবস্থিতি করেন।

স্বামীর দীর্ঘ প্রবাস-নিবন্ধন লক্ষ্মণসেনের স্ত্রী দুঃখিত ছিলেন,—এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগের সংকল্প করিয়াছিলেন। সে সময়ে রাজান্তঃপুরের অনেক স্ত্রীলোক সংস্কৃত জানিতেন। লক্ষ্মণসেনের স্ত্রী আপনার মনোভাব প্রকাশ করিয়া একটী শ্লোক রচনা করেন, বল্লালসেন দৈবাৎ সেই শ্লোকটী দেখিতে পাইয়া উদ্বিগ্ন হন। শ্লোকটী এই—

"পতত্যবিরতং বারি নৃত্যন্তি শিখিনো মুদা।
অদ্য কান্তঃ কৃতান্তো বা দুঃখ শান্তিং করোতু মে॥"

বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেনকে বিক্রমপুর রাজধানী হইতে শীঘ্র আনিবার জন্য কৈবর্ত্তদের প্রতি আদেশ করেন। কৈবর্ত্তেরা লক্ষ্মণসেনকে শীঘ্র বিক্রমপুর রাজধানী হইতে গৌড়ে আনয়ন করে। বল্লালসেন সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে জলাচরণীয় করেন। তদবধি কৈবর্ত্তদের হালিক শাখা জলাচরণীয় হইয়াছে। ইহা আনন্দভট্টের কথা। কৈবর্ত্তেরা রাজকীয় নৌবিভাগে কার্য্য করিত। তাহারা রাজাজ্ঞায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে লক্ষ্মণসেনকে বিক্রমপুর রাজধানী হইতে গৌড়ে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ভৈরব ও ভাগীরথীর মধ্যবর্ত্তী বিভাগে কৈবর্ত্তগণ আধিপত্য করিত। এই ভূভাগের কিয়দংশকে লাটদ্বীপ ও কিয়দংশকে কঙ্কদ্বীপ বলিত। সূর্য্য নামক একজন প্রবল কৈবর্ত্তরাজের নাম পাওয়া যায়।

বল্লালসেন, মহেশ নামক কৈবর্ত্তকে "মহামাণ্ডলিক" উপাধি দিয়া দক্ষিণ ঘাটে প্রেরণ করেন।

মহারাজ বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন রচিত কতকগুলি উদ্ভট শ্লোক পাওয়া যায়। বিক্রমপুরে রামপালের দীঘির তীরে বল্লালসেনের রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই ভগ্নাবশেষের নাম "বল্লাল বাড়ী"। এই বাড়ীই কি আদিশূর কিম্বা বল্লালসেনের বাড়ী তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। ইহা একটী দুর্গবদ্ধ স্থান। ইহার পরিমাণ ৭০০ বর্গফুট ; ইহা ২০০ ফুট আয়ত পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। বল্লাল রাজবাড়ীর

* গৌড়ের ইতিহাস Page No. 186, Part No. 7.

† একদিন রাজা গেল মৃগয়া করিতে।
ঝড় বৃষ্টি দুর্য্যোগ হইল আচম্বিতে॥
ত্যজিয়া বিপিন, রাজা গেলা লোকালয়ে।
তথায় বসতি করে ডোমের আশ্রয়ে॥
সেই রাত্রি তথায় রহিল উপবাসী।
মিলিলেক ডোম কন্যা প্রাতঃকালে আসি॥
বিবাহ করিব বলি লৈয়া আইল ঘরে।
যেবা শুনে যেবা জানে শত নিন্দা করে॥ ঢাকুর, ২২ পৃঃ।

‡ ভীম ওঝা, বল্লালসেনের পুরোহিত ছিলেন। গৌড় নগরের নিকট কালিয়া গ্রামে তাঁহার বাস ছিল। বল্লালের চরিত্রদোষ ঘটিলে তিনি কালিয়া গ্রাম ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান পাবনা জেলার পূর্ব্ব দক্ষিণ ভাগে (—) ছাতক গ্রামে গিয়া বাস করেন।



রামপাল· বাবা আদমের মস্‌জিদ

অর্দ্ধ মাইল দূরে * "অগ্নিকুণ্ড" নামে একটী পুষ্করিণী আছে। আনন্দভট্ট বলেন, করতোয়া তীরবর্ত্তী মহাস্থানে উগ্রনামক একটী প্রাচীন শিবলিঙ্গ ছিল। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ সকলেই সেই মন্দিরে শিবপূজা করিতে যাইত। একদিন বল্লালমহিষী বহুমূল্য উপকরণ দ্বারা শিবপূজা করেন। পূজার দ্রব্যের ভাগ লইয়া মন্দিরের মহন্ত, ও রাজ-পুরোহিতের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়, মহন্ত পুরোহিতকে মন্দির হইতে তাড়াইয়া দেন, পুরোহিত রাজার নিকট মহন্তের ঈদৃশ আচরণ জ্ঞাপন করিলে, রাজা মহন্তকে স্বরাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করেন। মহন্ত, বৈর-নির্য্যাতন সাধনোদ্দেশে, বায়াদুম্ব বা বাবা আদম নামক মুসলমান ফকিরের শরণাগত হন, ফকির বল্লালসেনের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হন। যুদ্ধযাত্রার সময় বল্লাল একটী পারাবত সঙ্গে করিয়া লইয়া যান এবং অন্তঃপুরিকাগণকে বলিয়া যান যে, "যদি যুদ্ধে পরাজয় হয় তবে আমি এই পারাবত ছাড়িয়া দিব, এই পারাবত উড়িয়া আসিলে, তোমরা বুঝিতে পারিবে—যুদ্ধে আমার পরাজয় ঘটিয়াছে। তখন তোমরা জাতি ধর্ম্ম রক্ষার জন্য অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জ্জন করিবে।" আব্দুল্লাপুর নামক স্থানে এই যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সে যুদ্ধে মহারাজ বল্লালসেনের জয়লাভ হয় কিন্তু, দৈবপ্রতিকুলতা বশতঃ পারাবত বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে উড়িয়া রাজপুরে চলিয়া আইসে। অন্তঃপুরিকাগণ রাজার মৃত্যু সম্ভাবনা করিয়া অনলকুণ্ডে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। রাজা ফিরিয়া আসিয়া এই অসম্ভাবিত বিপদে মুহ্যমান হইয়া অগ্নিকুণ্ডে জীবন বিসর্জ্জন করেন। সেই অগ্নিকুণ্ডের স্থানে এই অগ্নিকুণ্ড পুষ্করিণী হইয়াছে।

বাবা আদম, বল্লালের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। কাজিকসবা নামক স্থানে তাঁহার কবর † প্রদর্শিত হইয়া থাকে। গৌড়ের ইতিহাস প্রণেতা অনুমান করেন, পাঠান রাজত্বকালে বাবা আদম নামক কোন ধর্ম্মোন্মত্ত দরবেশ, বল্লালসেনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলেন—বল্লালসেনের শিক্ষক গোপালভট্ট ১৩০০ শাকে "বল্লাল-চরিত" নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

বল্লালসেনের রাজত্ব সময়ে পশ্চিমাঞ্চল হইতে কতিপয় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবার বিক্রমপুরে বাসের জন্য আগমন করেন। মহারাজ তাঁহাদের বাসের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তাঁহারা বৈদিক ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

১০৬৭ শাকে সামবেদী বশিষ্ঠ গোবিন্দ উপাধ্যায় বিক্রমপুরে আগমন করেন। বল্লালসেনের খুল্লতাত সুখসেন কয়েক বৎসর বিক্রমপুরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তৎপর লক্ষ্মণসেন বিক্রমপুরে রাজত্ব করেন। সুখসেনের পুত্রের নাম ধ্রুবসেন। আনন্দভট্ট বলেন, ভবসেন নামক বল্লালসেনের এক পুত্র ছিল। ইঁহাদের কোন বিবরণ জানা যায় নাই।

বল্লালসেনের রাজত্বকালে মিথিলায় গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রাদুর্ভূত হন। ইনি ১১৫২ খৃষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাতে বিদ্যমান ছিলেন। গঙ্গেশ "তত্ত্ব চিন্তামণি" নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন। গঙ্গেশের পুত্র বর্দ্ধমানও নানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থের রচয়িতা।

গোবিন্দপুরের মান-রাজ বংশের শিলালিপি হইতে জানা যায়, জয়পাণি বল্লালসেনের ধর্ম্মাধিকারী ও রুদ্রমান অমাত্য ছিল।

‡ বল্লালসেনের আয় এক কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা ছিল। মুসলমানদের আগমনের পূর্ব্বে হিন্দুরা রঙ্গীন ইটের ব্যবহার করিতেন। সোনারগাঁ একডালা দুর্গ বল্লালসেন নির্ম্মাণ করেন।

---

* মৎপ্রণীত "বিক্রমপুর" দ্বিতীয় খণ্ডে রামপালের বিবরণে দ্রষ্টব্য।

† বাবা আদমের মসজিদ রামপালের অনতিদূরে এখনও দৃষ্ট হয়। এই মসজিদ নির্ম্মাণের তারিখ ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। "ঢাকার বিবরণ" Page No. 21. আদম সুমারি অধ্যায়।

‡ গৌড়ের ইতিহাস Page No. 193. Part VII.

* বিক্রমপুর সংস্কৃত বিদ্যালোচনার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের গৃহে এবং টোলে অহরহ নানা শাস্ত্রের আলোচনা হইত। কথিত আছে যে, এই বিক্রমপুরে বসিয়াই "ভট্টনারায়ণ" ও "শ্রীহর্ষ" প্রভৃতি কবিগণ তাঁহাদিগের গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন; রাজা বল্লালসেন বল্লালবাড়ীতে (বর্ত্তমান রামপাল) অবস্থান কালে "দানসাগর" রচনা করিয়াছিলেন; বল্লালের শিক্ষাগুরু গোপালভট্ট বল্লাল-চরিত রচনা করিয়াছিলেন; এই বিক্রমপুরেরই অধিবাসী হলায়ুধ ভট্টাচার্য্য "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" রচনা করিয়াছিলেন।

বিক্রমপুরের অন্তর্গত কাঠাদীয়া গ্রামে, রাঢ়ীয় কাশ্যপ গোত্রে, শুদ্ধ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ কুলে, হলায়ুধ ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেবের প্রধান মন্ত্রী। এই হলায়ূধের বংশে বহুপুরুষ পরে রত্নাকর মিশ্র নামক এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন।

ঢাকার বিবরণ প্রণেতা ঐতিহাসিক শ্রদ্ধেয় কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় হলায়ূধ ভট্টাচার্য্যকে কাশ্যপ গোত্রীয় বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। আবার গৌড়ের ইতিহাস প্রণেতা হলায়ূধকে বাৎস্য গোত্রীয় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম হলায়ূধের বংশধরগণ এখন আড়িয়ল, পাইকপাড়া প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন। তাঁহারা কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। গৌড়ের ইতিহাস প্রণেতার লিখিত পৃষ্ঠা নিম্নে উদ্ধৃত হইল †। হলায়ুধ লক্ষ্মণসেনের ধর্ম্মাধিকারী ছিলেন। তিনি স্বকৃত "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বে" লিখিয়াছেন, লক্ষ্মণসেন, তাঁহাকে বাল্যে রাজপণ্ডিতের পদ, যৌবনারম্ভে মন্ত্রীর পদ ও প্রৌঢ়াবস্থায় ধর্ম্মাধিকারীর পদ প্রদান করেন। যথা :—

"বাল্যে খ্যাপিত রাজপণ্ডিত পদঃ শ্বেতাংশুবিম্বোজ্জ্বল-
চ্ছত্রোৎসিক্ত-মহামহত্তমপদং দত্ত্বা নবে যৌবনে।
যস্মৈ যৌবনশেষে যোগ্যমখিল-ক্ষ্মাপাল-নারায়ণঃ
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন দেব নৃপতি ধর্ম্মাধিকারং দদৌ॥

লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব অতি দীর্ঘ হইয়া পড়ে। বোধ হয়, লক্ষ্মণসেনের যৌবরাজ্যসহ রাজত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে। লক্ষ্মণসেন, গৌড় ও নবদ্বীপ হইতে তাড়িত হইয়া বিক্রমপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বহু ব্রাহ্মণ পরিবার গৌড় ও নবদ্বীপের সন্নিহিত স্থান ত্যাগ করিয়া রাজার সঙ্গী হন। এইজন্য বিক্রমপুর অঞ্চলে সদ্ ব্রাহ্মণ সংখ্যা এত বেশী। লক্ষ্মণসেন বিক্রমপুরে কতদিন রাজত্ব করেন, তাহা জানা যায় না। সে সময়ে লক্ষ্মণসেনের যতটুকু রাজ্য ছিল, হলায়ুধকে তাহার ধর্ম্মাধিকার প্রদান করিয়াছিলেন।

হলায়ূধ মহা পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ধনঞ্জয় ও মাতার নাম উজ্জ্বলা। তিনি বাৎস্য গোত্রীয় ছিলেন। মহা পণ্ডিত হলায়ূধ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রের সার সংগ্রহ করিয়া "মৎস্য সূক্ত" রচনা করেন।

‡ পালরাজবংশের রাজত্ব কাল নির্ণয়

প্রথম	রাজা	গোপালদেব (১ম)	৭৭৫ খৃঃ	হইতে	৭৮৫ খৃঃ
দ্বিতীয়	„	ধর্ম্মপালদেব	৭৮৫	„	৮৩০
তৃতীয়	„	দেবপাল	৮৩০	„	৮৬৫
চতুর্থ	„	বিগ্রহপাল দেব (১ম)	৮৬৫	„	৯০০
পঞ্চম	„	নারায়ণপাল দেব	৯০০	„	৯২৫
ষষ্ঠ	„	রাজ্যপাল	৯২৫	„	৯৪০

* ঢাকার বিবরণ Page No. 64 & 67 ৺কেদারনাথ মজুমদার।

† গৌড়ের ইতিহাস Page No. 195.

‡ হস্ত লিখিত প্রাচীন পুঁথি হইতে সংগৃহীত হইল। পাল ও সেন বংশের "হিসাব নিকাশ"। এতৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। শ্রদ্ধেয় কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে। ১৩৩০ সন ২রা মাঘ।

সপ্তম রাজা	গোপালদেব (২য়)	৯৪০	খৃঃ হইতে	৯৭০	খৃঃ
	বিগ্রহপাল (২য়)	৯৭০	”	৯৮০	”
নবম ”	মহীপাল দেব (১ম)	৯৮০	”	১০৩৬	”
দশম ”	নরপাল দেব (২য়)	১০৩৬	”	১০৫৩	”
একাদশ ”	বিগ্রহপাল দেব (৩য়)	১০৫৩	”	১০৬৮	”
দ্বাদশ ”	মহীপাল দেব (২য়)	১০৬৮	”	১০৭৮	”
ত্রয়োদশ ”	শূরপাল দেব	১০৭৮	”	১০৯১	”
চতুর্দ্দশ ”	রামপাল দেব	১০৯১	”	১১০৩	”
পঞ্চদশ ”	কুমারপাল দেব	১১০৩	”	১১১০	”
ষোড়শ ”	গোপালদেব (৩য়)	১১১০	”	১১১৫	”
সপ্তদশ ”	মদনপাল দেব	১১১৫	”	১১৩০	”
অষ্টাদশ ”	গোবিন্দপাল দেব		——		

সেনরাজবংশের রাজত্ব কাল নির্ণয়

১।	সামন্তসেন	
২।	হেমন্তসেন	১০৪৫ খৃঃ—১০৭৯ খৃঃ
৩।	বিজয়সেন	১০৭৯ খৃঃ—১১১৯ খৃঃ
৪।	বল্লালসেন	১১১৯ খৃঃ—১১৬৯ খৃঃ
৫।	লক্ষ্মণসেন	১১৬৯ খৃঃ—১২০৬ খৃঃ
৬।	মাধবসেন	——
৭।	কেশবসেন	——
৮।	বিশ্বরূপসেন	——

“আইন-ই-আকবরী” মতে সেনবংশীয় সাতজন রাজা একশত বৎসর রাজত্ব করেন।

১।	সুখসেন	৩	বৎসর	রাজত্ব	করেন।
২।	বল্লালসেন	৫০	”	”	”
৩।	লক্ষ্মণসেন	৭	”	”	”
৪।	মাধবসেন	১০	”	”	”
৫।	কায়সুসেন	১৫	”	”	”
৬।	সদাসেন	১৪	”	”	”
৭।	নওজেসেন	১০	”	”	”

আমি আমার সামান্য সংগ্রহে যতদূর সন্ধান পাইতেছি, তাহাতে লক্ষ্মণসেনের স্বাধীন রাজত্ব সতর বৎসরের কম এবং আঠার বৎসরের অধিক হওয়া কোনক্রমেই সম্ভবপর হয় না। লক্ষ্মণসেন যখন সিংহাসনে অধিরোহন করেন, তখন তাঁহার বয়স খুব কম হইলেও চল্লিশ। চল্লিশের পর আঠার বৎসর নিতান্ত অল্প সময় নহে। লক্ষ্মণের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ মাধব, কনিষ্ঠ কেশব। মাধব রাজ্যাধিকার পাইয়াছিলেন কিনা, তাহা সংশয়ের বিষয়। যদি পাইয়া থাকেন সে অতি অল্পকালের জন্য। তদীয় অনুজ কেশবসেন, তিন বৎসর রাজত্ব করিয়া ১১২৪ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন, এবং তাঁহার পরলোক গমনের অল্প কিছুদিন পরে, অর্থাৎ ঐ ১১২৪ খৃঃ অব্দের শেষভাগে, বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজা, বল্লালের প্রপৌত্র লক্ষণেয়সেন জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম-মুহুর্ত্তের পরক্ষণ হইতেই বঙ্গের রাজাধিরাজ নামে রাজ্যের সর্ব্বত্র বিঘোষিত হন। লক্ষ্মণসেনের দ্বিতীয় পুত্র কেশবসেন বসুদেবীর গর্ভজাত। তিনি যে তিন বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার দানপত্রে সুন্দর-রূপে প্রমাণিত রহিয়াছে। লক্ষ্মণসেনের আরও তিনটি নাম ছিল; সুষেণ, শূরসেন ও অশোকসেন। হিন্দুর মধ্যে একজনের এইরূপ বহু নাম থাকা চির-প্রচলিত। অনেকেরই এইরূপ সংস্কার যে, লক্ষ্মণসেন আর লাক্ষণেয় একব্যক্তি। ইহা অসম্ভব। লক্ষ্মণসেন যে ১১০৬ খৃঃ অব্দে সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, সে বিষয়ে সংশয় হইতে পারে না। যদি তিনিই বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজা হন, তাহা হইলে, ১১০৬ খৃঃ অব্দ হইতে ১২০৪ খৃঃ অব্দ (অর্থাৎ রাজ্যপ্রাপ্তির সময় হইতে রাজ্যচ্যুতির সময়) ৯৯ বৎসর হইয়া পড়ে। তা ছাড়া, আর এরু কথা রহিয়াছে, বিশ্রুতনামা লক্ষ্মণসেন যে প্রৌঢ়যৌবনে সিংহাসনে উঠিয়াছিলেন, তাহা তৎপ্রণীত বিবিধ কবিতা, তদীয় সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্রী পণ্ডিতপ্রবর হলায়ুধ প্রণীত ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্বের লেখা, এবং তাঁহার দানপত্রাদি দ্বারা সুচারুরূপে প্রমাণিত। যদি সিংহাসনে আরোহণের সময় তাঁহার বয়স চল্লিশ বৎসর থাকা অনুমান করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে রাজ্যত্যাগের সময় তাঁহার বয়স ৪০+৯৯=১৩৯ একশত উনচল্লিশ বৎসর হয়। অপিচ তবকাৎ-ই-নাসিরী প্রণেতা মিন্‌হাজ্-উদ্দীন্ ভকৃতিয়ার কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের অল্প কিছুদিন পরেই গৌড়ে আসিয়াছিলেন। তিনি রাজ্যচ্যুত লাক্ষ্মণেয়সেন সম্পর্কে যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহার অনেক অংশই সত্য। তাহার লেখা অনু-সারে লাক্ষ্মণেয় ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্রই বঙ্গের রাজা, সুতরাং তখন পিতৃহীন। কিন্তু বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণ পিতার আজ্ঞাধীনরূপে সুদীর্ঘকাল যৌবরাজ্য ভোগ করিয়া পরিণত বয়সে রাজা হন। লক্ষ্মণ সেনের পুত্র মাধবসেন ও কেশবসেন রাজত্ব কালে প্রতিপত্তি লাভ করিবার সময় পান নাই, এই হেতু, ইতিহাসে তাঁহাদিগের তেমন নাম নাই, আমি যাহা বুঝিতেছি, তাহাতে ইহাই নিশ্চিত যে, মাধব আর কেশব সর্ব্বত্র সুপরিচিত না হইয়া পরলোকগত হওয়াতেই লক্ষ্মণ আর লাক্ষ্মণেয় পিতামহ ও পৌত্র, অনেকের কাছে এক ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত।

* বল্লালের পৈত্রিক ও পুরাতন রাজধানী বিক্রমপুর। বিক্রমপুরের অন্তর্গত চিরপরিচিত রামপাল গ্রামে অদ্যাপি লোকে সে রাজধানীর বিবিধ চিহ্ন ও বল্লালের সুবিস্তৃত দীঘি ও পরিখা প্রভৃতি দর্শনের জন্য গমন করে; আর বল্লালের

* "বিক্রমপুরের ইতিহাস" শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

পূর্ব্বপুরুষগণ, ঐ গ্রামের কোন্ স্থানে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠানে পঞ্চ ব্রাহ্মণের পূজা করিয়াছিলেন, এবং বল্লালই বা কোথায় কি স্মরণীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া সমাজে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, তাহা বড় বড় গাছের ছায়ায় বসিয়া, উপন্যাসপটু বৃদ্ধদিগের মুখে শুনিয়া থাকে।"

মাননীয় ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে, দাক্ষিণাত্য হইতে সমাগত এবং পূর্ব্ববঙ্গে প্রথম উপনিবিষ্ট, ক্ষত্র বংশোদ্ভব সেনরাজাদিগের প্রথম ও প্রধান রাজধানী ঢাকার নিকটে বিক্রমপুর।

"The Chief seat of power a Vikrampur near Dhaka, where the ruins of Ballal's palace are still shown to travellers." মিত্র মহাশয় তাঁহার এ কথার সমর্থনের জন্য, পুরাতন তত্ত্বসমালোচক ডক্টর ওয়াইজের লেখাকেও প্রামাণিক জ্ঞানে সম্মান করিয়াছেন।

ডক্টর ওয়াইজ বলেন, "A remarkable evidence of this is afforded by the names of the 56 villages assigned to the discendants of the five Brahmans whom Adishur brought from Kanauj. All those villages were situated within the delta, and none out of it." রাজেন্দ্রলালের উল্লিখিত সিদ্ধান্ত সর্ব্বতোভাবেই সুসঙ্গত। কারণ, সেনবংশীয়েরা যখন বঙ্গদেশে, প্রথম বাস গ্রহণ করেন, তখন বঙ্গের পশ্চিম ও উত্তর ভাগে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালরাজারা অতি প্রবল। এ সকল প্রমাণের উপর আর একটি কথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা সকলেই জানেন যে বঙ্গীয় সেনরাজাদিগের আদিপুরুষ প্রসিদ্ধনামা বীরসেন অথবা আদিশূর কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণকে পাঁচ খানি গ্রাম প্রদান করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। সেই পঞ্চ গ্রাম অদ্যাপি বিক্রমপুরের পূর্ব্ব দক্ষিণ ভাগে পাঁচগাঁ নামে বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং সেখানে এখনও বহুসংখ্যক কুলীন ব্রাহ্মণের বাস্তুগৃহ আছে। ঐ পাঁচগাঁই যে আদিশূরের প্রদত্ত "পাঁচ গ্রাম" তাহা তত্রত্য অধিবাসীরাও পুরুষ-পরম্পরাক্রমে শুনিয়া আসিতেছেন। পাঁচগাঁয়ে এখনও ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন বর্ণের প্রভুত্ব নাই, এবং সেখানকার ছোট বড় সমস্ত ব্রাহ্মণই অশূদ্র প্রতিগ্রাহী।

বল্লালের দ্বিতীয় রাজধানী গৌড়নগর। মুর্শিদাবাদের উত্তরে মালদহ জেলায় মহানন্দা নদীর পূর্ব্ব তটে, এবং কালিন্দী-গঙ্গার উত্তরে, পুণ্ড্র নামক একটি প্রসিদ্ধ নগর ছিল। বঙ্গদেশের পালবংশীয় বৌদ্ধরাজারা যখন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিশেষ সম্মানিত, তখন ঐ পুণ্ড্র নগর তাঁহাদিগের রাজধানী। পালবংশীয়েরা, তাহার পর, পুণ্ড্রের বহু দক্ষিণে, গঙ্গার পূর্ব্ব তটে, আর এক রাজধানী স্থাপন করেন তাহার নাম গৌড়। পালদিগের সেই পুণ্ড্র নগর এইক্ষণ পাড়ুয়ার জঙ্গলে পরিণত হইয়া পরিব্রাজকদিগের কাছে বঙ্গের বিলুপ্ত কীর্ত্তি-কাহিনী কহিতেছে; এবং সেই গঙ্গাসলিল-সিক্ত, জনকোলাহল-পূর্ণ গৌর নগরের পত্তনভূমিও এইক্ষণ পাণ্ডবের ইন্দ্রপ্রস্থের ন্যায়, মুখে বিষাদের কালিমা মাখিয়া বন্য জন্তুর বাসভূমি হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু এক সময়ে সেই পুণ্ড্র নগরের উত্তর প্রান্ত হইতে গৌড়ের দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত স্থান সমূহ দেবভোগ্য অমরাবতীর ন্যায় সকলেরই বাঞ্ছনীয় ছিল।

বোধহয় এই হেতু এবং বৌদ্ধের রাজধানীতে হিন্দুর দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠারূপ অতুল কীর্ত্তির অভিলাষেই কীর্ত্তিলিপ্সু বল্লাল গৌড় নগরে এক অভিনব রাজধানী স্থাপন করিয়া, তাঁহার প্রিয়তম পুত্র লক্ষ্মণসেনের পরিচয়ে উহাকে লক্ষ্মণাবতী নামে অভিহিত করাইলেন, অপিচ বঙ্গীয় পণ্ডিতদিগের সহিত প্রীতি ও শ্রদ্ধার সূত্রে একটুকু বেশী জড়িত হইয়া, সমাজে অধিকতর প্রতিপত্তি লাভের উদ্দেশ্যে, গঙ্গা ও জলঙ্গীর সঙ্গমস্থানে নবদ্বীপ নগরে আর এক নূতন রাজপ্রাসাদ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি তাঁহার এই তিন রাজধানীর মধ্যে, যখন যেখানে প্রবৃত্তি অথবা প্রয়োজন, তখন সেইখানে অবস্থান করিতেন এবং যতদূর জানা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, বয়সের শেষ সময়ে, নবদ্বীপের রাজধানীতে, পণ্ডিতদিগকে লইয়া শাস্ত্রালোচনে সময়-যাপন করিতেই বেশী ভালবাসিতেন। এই সময় হইতেই নবদ্বীপে রাজলক্ষ্মীর বিশেষ কৃপা। কিন্তু যখন লাক্ষ্মণেয় সিংহাসনে অধিরূঢ় তখন নবদ্বীপই বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান নগর। লাক্ষ্মণেয় সেনের পিতামহ লক্ষ্মণসেন কখনও লক্ষ্মণাবতী বলিয়া অভিহিত নূতন গৌড়ে এবং কখনও বা নবদ্বীপে থাকিয়া রাজ্য শাসন করিতেন। এরূপ প্রমাণ আছে যে, তিনি কোন কোন সময়ে বিক্রমপুরের রাজধানীতেও অবস্থান করিতেন। কিন্তু লাক্ষ্মণেয়সেন নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ স্থানেরই অধিক অনুরক্ত হইলেন, এবং জন্ম হইতে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ঐ এক স্থানেই অবস্থান করিলেন। রাজা লাক্ষ্মণেয় যে কোন দিনও রামপালের রাজধানীতে বাস করিয়াছিলেন, এমন জানা যায় না। আদিশূর ও বল্লালের বিক্রমপুরস্থ রাজপ্রাসাদ লাক্ষ্মণেয় সেনের সময়ে এক প্রকার রাজশূন্য পরিত্যক্ত পল্লী; কিন্তু লাক্ষ্মণেয়সেনের পুত্র পৌত্র প্রভৃতি পরবর্ত্তীরা বিপদে পড়িয়া পুনরায় বিক্রমপুরে শতবর্ষের অধিক কাল বাস করিয়াছিলেন।

সেনবংশের শেষ রাজা লাক্ষ্মণেয়সেন সম্বন্ধে রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর ভক্তির জয়ে যাহা লিখিয়াছেন—

"লাক্ষ্মণেয় সেনের বংশধরেরা বিক্রমপুর ও সুবর্ণগ্রামে শক্তির সামান্য একটু ছায়া পাইয়া, পূর্ব্ববঙ্গ প্রদেশে কিছুকাল রাজত্বের শ্বেতচ্ছত্র ও শোভামাত্র ভোগ করিতেছিলেন। কালে সেই বিক্রমপুর, সুবর্ণগ্রাম এবং ইদিলপুর ও চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি সুরক্ষিত ও সুপরিচিত স্থান সকলও যবনের নিকট মাথা নোয়াইল।"

অরিরাজ-দনুজ-মাধব শ্রীমদ্দশরথ দেবের তাম্রশাসন

গতবৎসর ভাদ্র মাসে এক দিন অপ্রত্যাশিতরূপে খবর পাইলাম যে, বিক্রমপুরে আদাবাড়ী গ্রামে একখানা তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। কাল-বিলম্ব না করিয়া তথায় চলিয়া গেলাম; এবং উহা ঢাকা মিউজিয়মের জন্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিলাম। তাম্রশাসনখানির তামা বোধ হয় খুব ভাল ছিল না, উভয় পৃষ্ঠেই এমন গভীর ভাবে সবুজ বর্ণের ঝঙ্কার পড়িয়াছিল যে, একটি অক্ষরও পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল না। লেখার ছন্দ দেখিয়া বুঝিতে পারা গেল, উহার বয়স খুব বেশী নহে, ১১শ—১২শ শতাব্দী অপেক্ষা পুরাতন নিশ্চয়ই নহে। তাম্রশাসনের উপরে রাজকীয় মুদ্রা সংযুক্ত থাকে, ইহা সকলেই জানেন। পূর্ব্ববঙ্গের এই পর্য্যন্ত চারিটি বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই লাঞ্ছন ভিন্ন ভিন্ন। কান্তিদেবের বংশের লাঞ্ছন সর্পবেষ্টিত নরসিংহ মূর্ত্তি। চন্দ্রদের লাঞ্ছন ধর্ম্মচক্র, দুই দিকে দুই মৃগ, অর্থাৎ মৃগদাববিহারে বুদ্ধদেবের ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন। বর্ম্মদের লাঞ্ছন বিষ্ণুচক্র। সেনদের লাঞ্ছন দ্বাদশ-হস্ত-

বিশিষ্ট যোগাসনস্থ সদাশিবমূর্ত্তি। এই শাসনখানায় কিন্তু চারি-হস্ত-বিশিষ্ট যোগাসনস্থ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণ মূর্ত্তি লাঞ্ছনরূপে বিরাজ করিতেছিলেন। তাম্রশাসনখানা আনিতে নৌকায় গিয়াছিলাম, নৌকায় বসিয়াই পাঠ করিলাম, রাজার নামের আগে বিশেষণ আছে—অন্বয়-কমল-বিকাশ-ভাস্কর-সোম-বংশ-প্রদীপ-প্রতিপন্নকর্ণ সত্যব্রত-গাঙ্গেয় ইত্যাদি। এই বিশেষণগুলি লক্ষ্মণসেনের পুত্রগণের তাম্রশাসনে রাজার প্রতি প্রযুক্ত সুপরিচিত বিশেষণ। ভাবিলাম, লক্ষ্মণসেনের ছেলেদেরই কাহারও তাম্রশাসন আবিষ্কার করিয়াছি। কিন্তু লাঞ্ছনের পরিবর্ত্তনের হেতু বুঝিলাম না। লক্ষ্মণসেন বৈষ্ণব হইয়াছিলেন বলিয়া কি তাঁহার পুত্রগণ পারিবারিক লাঞ্ছন সদাশিবমূর্ত্তি বদলাইয়া নারায়ণ-মূর্ত্তি করিয়া লইয়াছিলেন? এ রকম কোনও প্রাচীন রাজবংশ করিয়াছে বলিয়া তো কখনও শুনিয়াছি, মনে পড়ে না! অথবা, নূতন রাজবংশের তাম্রশাসনই বা আবিষ্কার করিলাম! মনে মনে একটু শঙ্কিতও হইলাম। অমনি তো পূর্ব্ববঙ্গের ইতিহাসে শ'-শোওয়াশ' বছরের মধ্যে চারিটি রাজবংশের প্রাদুর্ভাব আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহারাই ঠেসাঠেসি করিয়া দাঁড়াইবার যায়গা পায় না; আবার আর একটি!

তাম্রশাসন ঢাকায় লইয়া আসিলাম। ঢাকার প্রাত্নতত্ত্বিক মহলে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। ভোর হইতে না হইতেই মধুলুব্ধ ভৃঙ্গের মত বিক্রমপুর-মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের ষোড়শ বার্ষিক অধিবেশনের ইতিহাস-শাখার সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আসিয়া জুটিলেন। তার পরে দু'জনে চক্, জল ও নেকড়া লইয়া ঘষি আর মুছি, মুছি আর ঘষি। কিন্তু অকরুণ বিধাতা ছয় সাত শত বৎসর ধরিয়া সযত্নে তাম্রশাসনখানার উপরে এমনি অস্বচ্ছ সবুজ রং ফলাইয়াছেন যে, চক ঘষিয়া ঘষিয়া হাতের নখ ক্ষয় হইয়া যাইতে লাগিল, সভাপতি মহাশয়ের আঙ্গুল ক্ষয় হইয়া রক্ত বাহির হইল, নাকে, মুখে, গোফে, দাড়িতে খড়ি মাটির রং ধরিতে লাগিল, তবু রাজার নাম এবং বংশ পরিচয় আর কিছুতেই আত্মপ্রকাশ করিতে চাহে না! "দেবান্বয়-কমল-বিকাশ-ভাস্কর" না "সেনান্বয়-কমল-বিকাশ-ভাস্কর"? অনেক বিবেচনার পরে ঠিক হইল, উহা 'দেবান্বয়'ই হইবে। যাক্, বাঁচা গেল, তাম্রশাসন সেন বংশের নহে, নূতন এক দেববংশের। তার পরে রাজার নাম। অনেক বিচারের পরে স্থির হইল, নাম যাহাই হউক, উহার শেষে 'রথ' শব্দটা আছে। কোন্ রথ? ভূতিরথ? ভগীরথ? ভৃঙ্গরথ? ভৃশরথ? কোনটাই নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা চলে না, অথচ রথীর সংখ্যাও নিঃশেষ হইতে চলিল। অবশেষে দেখা গেল যে, খুব পরিচিত এক রথকে ছাড়িয়া কুটীল কুপথ ধরিয়া ভ্রমণ করিতেছি। ইনি হচ্ছেন আমাদের রামলক্ষ্মণের পিতা সুপরিচিত দশরথ! তখন দেখা গেল যে, রাজার নামটি সত্যই দশরথ। খণ্ড খণ্ড পাঠ যোজনা করিয়া নিম্নলিখিত অখণ্ড পাঠ খাড়া হইল:—

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠা)

(৩য় পংক্তি).........ইহ খলু বিক্রমপুর সমাবাসিত

(৪র্থ ") শ্রীমত্ বিজয়স্কন্ধাবারাত্ শ্রীমন্নারায়ণচরণ কৃপাপ্রসাদসমাসাদিতগৌড় * রাজ্যঃ অশ্বপতি গজপতি নরপতি রাজত্র

(৫ম ") য়াধিপতি দেবান্বয়-কমল-বিকাশ-ভাস্কর—সোমবংশপ্রদী[প]—প্রতিপন্ন কন্ন সত্যব্রতগাঙ্গেয় শরণাগত বজ্রপঞ্জর পরমে

(৬ষ্ঠ ") শ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ অরিরাজ দনুজমাধব শ্রীমদ্দশরথদেবপাদা বিজয়িনঃ

সকলেই বোধ হয় জানেন যে, ১০ম—১২শ শতাব্দীর তাম্রশাসনগুলি প্রায় সমস্তই রাজাকর্ত্তৃক ব্রহ্মোত্তর দানের দলিল,—তামার পাতে লোহার কলমে লেখা। এই গুলিতে প্রথমে থাকে রাজার বংশানুকীর্ত্তন, পরে 'ইহ খলু'

* রাজ্যটির নাম যে, 'গৌড়' রাজ্য, এই দুই-অক্ষরনিবদ্ধ তথ্যটি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক উদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনিও যে মধ্যে মধ্যে আসিয়া চক্ ঘসিয়া নখ ক্ষয় করিয়া গিয়াছেন, বলাই বাহুল্য।

ইত্যাদি ধরিয়া আরম্ভ করিয়া রাজা ও রাজধানীর নাম। পরে প্রদত্ত ভূমি ও দান-গ্রহীতার বংশপরিচয়। ভবিষ্য নরপতিগণ যেন এই দান নষ্ট না করেন, এই অর্থের কয়েকটি অনুরোধ ও অভিশাপাত্মক শ্লোকে শাসনলিপির সমাপ্তি হয়। নূতন তাম্রশাসন পাইলেই রাজার নাম ও রাজধানী জানিবার জন্য আমরা সর্ব্বাগ্রে 'ইহ খলু' ইত্যাদি খুঁজি। এই শাসনের 'ইহ খলু' ইত্যাদি পাঠ করিয়া রাজার নাম ও রাজবংশের নাম উদ্ধার করিয়া যখন দেখিলাম যে, এই শাসন বিক্রমপুর রাজধানী হইতেই প্রদত্ত হইয়াছে, তখন সন্দেহমাত্র রহিল না যে, বিক্রমপুরের নূতন এক রাজবংশের আবিষ্কার করিয়াছি।

দ্বিগুণ উৎসাহে তাম্রশাসনের পঠোদ্ধারে প্রবৃত্ত হইলাম। দুই ধারই এমন ক্ষরিয়া গিয়াছে যে, স্পষ্ট থাকিলে যে লিপিখানা প্রেমলিপির মত অনায়াসে পাঠ করা যাইত তাহার এক এক লাইন পড়িতে চারি-পাঁচ ঘণ্টার দারুণ পরিশ্রম ও অভিনিবেশ দরকার হইতে লাগিল। প্রায় মাসেকের চেষ্টায় গদ্যাংশের পাঠের এক রকম উদ্ধার হইল; পদ্যাংশে কিন্তু বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলাম না। ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক বৈজ্ঞানিকপ্রবর শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাম্রশাসন খানা অনেকটা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু মাসেকের চেষ্টার পরে চোখের অবস্থা এমন হইল যে, তখনকার জন্য তাম্রশাসনখানা রাখিয়া দেওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর রহিল না।

তাম্রলিপিখানি, উপরে রাজমুদ্রার জন্য বর্দ্ধিত অংশটুকু বাদ দিলে, দৈর্ঘ্যে পৌনে নয় ইঞ্চি এবং প্রস্থে পৌনে বার ইঞ্চি। উহাতে প্রথম পৃষ্ঠে ২৬ পংক্তি, এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠে ২৯ পংক্তি, এই মোট ৫৫ পংক্তি লেখা আছে। উহা রাজার রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে কার্ত্তিক মাসের ২১ তারিখে প্রদত্ত। প্রদত্ত ভূমির সঠিক বিবরণ এখনও বুঝিতে পারি নাই, তবে উহা অন্তর্ব্বাটী, বান্দিখাণ্ডা, নবসংখহ, বীষয়িপাড়া ইত্যাদি গ্রামে অবস্থিত ছিল। অন্তর্ব্বাটী বোধ হয় আদাবাড়ীরই পুরাতন নাম। বান্দিখাণ্ডা পরিষ্কারই বর্ত্তমান বাইন্‌খাড়া। বর্ত্তমানে বাইনখাড়া প্রকাণ্ড মৌজা, আদাবাড়ী উহারই অন্তর্গত নাতিবৃহৎ পাড়া। প্রদত্ত ভূমির চারিদিকের গ্রামগুলির নাম চৌহদ্দিনির্ণয়কালে উল্লিখিত হইয়াছে। উত্তরে নয়নাব ও মুলদাব,—বর্ত্তমান নয়না ও মালদা। দক্ষিণে বড়াইলা ও ভাঙ্গনিয়া, আজিও ঐ নামেই পরিচিত। পশ্চিমে গণাগ্রাম ও মান্তহটা। গণাগ্রাম বর্ত্তমানে গণাইসার বলিয়া পরিচিত। মান্তহটা বর্ত্তমানে কোন গ্রামের নাম তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না। নামটি ঠিক পড়িয়াছি কি না, সে বিষয়েও নিশ্চিত নহি। পূর্ব্ব সীমায় কি কি গ্রামের উল্লেখ আছে, তাহাও ঠিক করিতে পারিলাম না।

প্রদত্ত ভূমির আয় বোধ হয় প্রতি বৎসর পঞ্চশত পুরাণ, বর্ত্তমানের প্রায় আড়াই শত টাকার সমান। এই আয়ের ভূমি অনেকগুলি ব্রাহ্মণকে গাঞী উল্লেখ করিয়া ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যথা—

সন্ধ্যাকর	৭৫
ভরদ্বাজ গোত্রীয় দিণ্ডী গাঞী শ্রীমাক্রী	৪৫
... শ্রীশক্র	৮৫
পালী গাঞী শ্রীসুগন্ধ	২৭
সেউ গাঞী শ্রীসোম	৩০
পালি গাঞী শ্রীবাস্থ	৩০
মাসচটক শ্রীপণ্ডিত	৫০
মূল শ্রীমাণ্ডী	৫০
দিণ্ডী শ্রীরাম	২৫
সেহণ্ডায়ী শ্রীলেভু	২৫

পুতি শ্রীদক্ষ	৭
সেউ শ্রীভট্ট	২৪
মহান্তিয়াড়া শ্রীবালি	২৫
করঞ্জ গ্রামী শ্রীবাসুদেব	৫
মাসচড়ক * শ্রীমিকো	৫

তাম্রশাসনখানা শ্রীমন্নারায়ণ-মুদ্রা দ্বারা মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হইল, ইহারও উল্লেখ আছে।

উপরের তালিকা হইতেই ইতিহাসবেত্তাগণ বুঝিতে পারিতেছেন, দেশের ইতিহাসে এবং রাঢ়ী ব্রাহ্মণগণের সামাজিক ইতিহাসে এই তাম্রলিপিখানার গুরুত্ব কত দূর। গাঞী ও নাম দুই চারিটি পড়িতে পারি নাই, তবু রাঢ়ী শ্রেণীর ৫৬ গাঞীর মধ্যে এই শাসনে আপাততঃ নয়টি গাঞীর উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে।

দশরথ দেবের সময় নির্দ্ধারণ করা বিশেষ কঠিন নহে। তিনি বিশ্বরূপ ও কেশবসেনের তাম্রশাসনের পাঠ হুবহু নকল করিয়াছেন, তাম্রশাসন প্রচারের যেন অচিরকাল পূর্ব্বে নারায়ণের প্রসাদে গৌড়রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, এইরূপ বুঝা যাইতেছে। সহজেই বুঝা যায়, তিনি সেনদের পতনের পরে বিক্রমপুরে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তবকৎ-ই-নাসিরি মতে ১২৫৯ খৃষ্টাব্দেও (৬৫৮ হিঃ) (Raverty, P, 558) পূর্ব্ববঙ্গে লক্ষ্মণ সেনের বংশধরগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। কাজেই আপাততঃ ধরিয়া লওয়া যায়, দশরথদেব ১২৬০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে নারায়ণ-চরণ-কৃপা-প্রসাদে বিক্রমপুরে রাজা হইয়াছিলেন। ইহার পরে কুলগ্রন্থে যখন প্রাচীন কুলাচার্য্য হরিমিশ্রের উক্তি দেখি—

প্রাদুরভবৎ ধর্ম্মাত্মা সেনবংশাদনন্তরম্।
দনৌজা মাধবঃ সর্ব্ব ভূপৈঃ সেব্য পদাম্বুজম্॥
(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৫৬ পৃষ্ঠা)

তখন সন্দেহ মাত্র থাকে না যে, অরিরাজ দনুজমাধব শ্রীমদ্দশরথদেবের প্রসঙ্গই হইতেছে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই দনুজমাধবকে সেন বংশজ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু 'সেনবংশাদন্তরম্' কথাটিতে "সেনবংশলুপ্ত হইলে তাহার পরে" এই অর্থও বুঝাইতে পারে। তাম্রশাসনের প্রমাণে দেখা যাইতেছে, ইহাই প্রকৃত অর্থ। তিনি স্পষ্টই দেববংশজ, সেনবংশজ নহেন।

রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের সামাজিক ইতিহাসে এই দনুজমাধব বিশেষ বিখ্যাত রাজা। সেনদের পতনের পরে তিনিই রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের আশ্রয়স্থল হইয়াছিলেন। রাঢ়ীয় কুলীন সমাজে সমীকরণ অর্থাৎ পদমর্য্যাদায় কে কাহার সমান তাহার নির্দ্ধারণ একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। রাঢ়ীয়দের কুলগ্রন্থে এইরূপ ১১৭টি সমীকরণের বিবরণ নামাদি সহ লিপিবদ্ধ আছে। প্রথম সমীকরণ বল্লালসেনের সভায় হয়। দ্বিতীয় সমীকরণ লক্ষ্মণসেনের সভায় হয়। লক্ষ্মণ সেনের সভায় যাঁহাদের পদমর্য্যাদা সমান বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তাঁহাদের কাহারও কাহারও পুত্রের নাম দনুজমাধবের রাজসভায় তৃতীয় সমীকরণের তালিকায় দেখি। দনুজমাধব যে লক্ষ্মণসেনের বড় বেশী পরবর্ত্তী নহেন, ইহা হইতেও তাহা বুঝা যায়। এই দনুজমাধবের সভায় রাঢ়ীয় কুলীনগণের চারিবার সমীকরণ হইয়াছিল। ইহা হইতে বুঝা যায়, মহারাজ দনুজমাধব দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

সম্রাট গিয়াসুদ্দীন বলবন যখন তুঘ্রিলের বিদ্রোহ দমনের জন্য ১২৮৩ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গে আসেন, তখন জলপথে তুঘ্রিলের পলায়ন রোধ করিবার ভার লইয়াছিলেন সোণারগাঁর রাজা দনুজ রায়। অর্থাৎ ইনি ঢাকা, নোয়াখালি, ফরিদপুর, বরিশাল জেলার মধ্যবর্ত্তী জলপথগুলির প্রভু ছিলেন। অরিরাজ-দনুজ-মাধব দশরথ এবং এই তুঘ্রিলের জলপথে পলায়ন রোধকারী দনুজ রায় যে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি এমন অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

* মাসচটক এবং মাসচড়ক এই দুই বানানই দুই স্থানে আছে।

১২৮৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২৯১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসনে সুলতান বলবনের পুত্র নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার সময়ে সমস্ত বঙ্গদেশ মুসলমান শাসনে আনিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা আরব্ধ হয়। ১২৯১ খৃষ্টাব্দে নাসিরুদ্দিনের পুত্র রুকনুদ্দিন কৈকায়ুস্ লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসনে আরোহন করেন। কৈকায়ুসের রাজত্ব-কালেই বোধ হয় পূর্ব্ববঙ্গের স্বাধীনতা লুপ্ত হয়; কারণ কৈকায়ুসের একটি মুদ্রায় প্রথম বঙ্গের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই হিসাবে দেখা যায়, অরিরাজ-দনুজ-মাধব শ্রীমদ্দশরথ দেব আনুমানিক ১২৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিক্রমপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দশকে এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সমগ্র বঙ্গদেশ ও শ্রীহট্ট যে মুসলমান শাসনের অধীনে আসিয়াছিল, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। কৈকায়ুসের ভ্রাতা শামসুদ্দিন ফিরোজ লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসনে ১৩০১ হইতে ১৩২২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারই রাজত্বকালে ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট বিজিত হয়। শামসুদ্দিন ফিরোজের ১৩০৫ খৃষ্টাব্দে সুবর্ণগ্রামে মুদ্রিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

কৃত্তিবাসের যে আত্মবিবরণী পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে।—

পূর্ব্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা।
তার পাত্র আছিল নারসিংহ ওঝা॥
বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা:গঙ্গাতীর॥

(বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, ১ম খণ্ড, ৪৮৯ পৃষ্ঠা)

এই বেদানুজ (যে দনুজ?) রাজা অরিরাজ-দনুজ-মাধব শ্রীমদ্দশরথ দেব বলিয়াই বোধ হইতেছেন এবং যে প্রমাদে তাঁহার পাত্র নৃসিংহ ওঝা বঙ্গদেশ ছাড়িয়া গঙ্গাতীরে ফুলিয়া গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা কৈকায়ূসের আক্রমণে দনুজমাধবের রাজ্যনাশ বলিয়াই বোধ হয়।

তাম্রশাসনখানার প্রথম পৃষ্ঠায় দনুজমাধবের বংশপরিচয় রাজত্ব-প্রাপ্তির বিবরণ, সেন বংশের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ইত্যাদি লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া বোধ হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে এই ধার এমনি ক্ষয়িয়া গিয়াছে যে, এখন পর্য্যন্ত উহার এক রকম কিছুই পড়া যায় নাই।—এই অংশের পাঠোদ্ধার করিয়া যখন উঠিব, তখন আশা করি, বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে এবং অন্ধকারময় ত্রয়োদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক নূতন কথাই বলিতে পারা যাইবে।

আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিক-ইতিহাসকারগণ কুলগ্রন্থের উপর খড়্গাহস্ত। কিন্তু কুলশাস্ত্র হইতে প্রাপ্ত অনেক ঐতিহাসিক তথ্য সমসাময়িক লিপি দ্বারা সমর্থিত হইতেছে। আমাদের দেশের মত ইতিহাসহীন দেশে ইতিহাসের অমূল্য উপাদানের আধার এই কুলশাস্ত্রগুলি, আমার মতে, ব্যক্তিবিশেষের অপরাধে অযথা উপেক্ষিত ও উপহসিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকগণের পাণ্ডিত্য ও বিচারশক্তি যদি কুলশাস্ত্রধর্ষণে নিযুক্ত না হইয়া কুলশাস্ত্রগুলির বিশ্বাসযোগ্য সংস্করণ-সম্পাদনে ব্যয়িত হইত, তবে এত দিনে এই উপেক্ষিত কীটদষ্ট পুঁথিগুলি দেশের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের কাজকে অনেকখানি অগ্রসর করিয়া দিত, সন্দেহ নাই। *

---

* আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম, এ মহোদয়ের নিকট একদিন ঢাকা মিউজিয়ম লাইব্রেরীতে "বর্ম্ম-বংশ তাম্রশাসন" প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাকে ৩ খানা তাম্রশাসন দেখাইয়া অরিরাজ দনুজ মাধবভীমদ্দশরথ দেবের তাম্রশাসন খানা দেখাইয়া বিক্রমপুর ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। মনস্বীর ঔদার্য্যের উপর নির্ভর করিয়া আজও অধ্যাপক মহাশয়ের আদেশ অনুসারে (পৌষ ১৩৩২) ভারতবর্ষ হইতে অরিরাজ দনুজ মাধবভীমদ্দশরথ দেবের তাম্রশাসনের সমস্ত অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

মহারাজ আদিশূর ঐতিহাসিক ব্যক্তি কি না? এ বিষয় মীমাংসায় "গৌড়রাজমালায়" বিশেষ আলোচিত হইয়াছে।

রাজসাহী-বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সম্পাদক শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মহাশয় তাঁহার "গৌড়রাজমালা" গ্রন্থে আদিশূর, ভট্টদেব, বিজয়সেন, দানসাগরের রচনাকাল, লক্ষ্মণসেন, হিন্দুস্থানে তুরুস্ক ও মহম্মদ্-ই-বখ্‌তিয়ার প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

কুলপঞ্জিকা বা ঐ শ্রেণীর গ্রন্থ ভিন্ন, আর কোথায়ও আদিশূরের পরিচয় পাওয়া যায় না। এখন যে সকল কুলপঞ্জিকা দেখা যায়, তাহা আদিশূরের আনুমানিক আবির্ভাব-কালের অনেক পরে রচিত। পরবর্ত্তী কালের রচনা হইতে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিতে হইলে, বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। যে পরবর্ত্তী কালের গ্রন্থে তুল্যকালীন গ্রন্থোক্ত প্রমাণ উদ্ধৃত থাকে, তাহাই কেবল ইতিহাসের উপাদানের ভাণ্ডাররূপে গৃহীত হইতে পারে। কুলগ্রন্থনিচয়ে উল্লিখিত আদিশূর রাজার বিবরণ যে সেরূপ প্রমাণ অবলম্বনে সঙ্কলিত, তাহা এযাবৎ কেহই প্রতিপাদন করিতে পারেন নাই। কারণ, আদিশূরের সময়ের কোন চিহ্নই এখনও পাওয়া যায় নাই। অনেকে বলিতে পারেন, কুলপঞ্জিকার আদিশূর রাজার বিবরণ প্রত্যক্ষ প্রমাণমূলক না হইলেও, জনশ্রুতিমূলক; এবং জনশ্রুতির যদি ইতিহাসে স্থানলাভ করিবার অধিকার থাকে, তবে আদিশূর রাজার বিবরণ ইতিহাসে স্থান পাইবে না কেন? জনশ্রুতিমাত্রই যে প্রামাণ্য এবং ঐতিহাসিকের নিকট আদরণীয়, এমন নহে। যে জনশ্রুতি প্রবল এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণের অবিরোধী, তাহাই ঐতিহাসিকের বিবেচ্য; এবং যে প্রবল জনশ্রুতি প্রত্যক্ষ প্রমাণের অনুকূল, তাহাই ইতিহাসে স্থান লাভের যোগ্য।

এখন আদিশূর সম্বন্ধীয় জনশ্রুতির পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক, উহার ঐতিহাসিকতা কত দূর। রাঢ়ীয় কুলজ্ঞগণের মধ্যে প্রচলিত আদিশূর সম্বন্ধীয় জনশ্রুতি নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে বিনিবদ্ধ আছে—

"আসীৎ পুরা মহারাজ আদিশূর প্রতাপবান্।
আনীতবান্ দ্বিজান্ পঞ্চ পঞ্চগোত্র-সমুদ্ভবান্॥"*

এখানে পাওয়া গেল,—আদিশূর ছিলেন (আসীৎ)। বারেন্দ্র কুলজ্ঞগণের গ্রন্থে আরও কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁহারা আদিশূরের এবং বল্লালসেনের সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়াছেন। যথা—

"জাতো বল্লালসেন গুণি-গণিত স্তস্য দৌহিত্র-বংশে।"

---

*রাজসাহীর রাণী হেমন্তকুমারী-সংস্কৃতকলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক বিক্রমপুর-নিবাসী পণ্ডিতবর শ্রীযুত বামনদাস বিদ্যারত্ন মহাশয় লেখককে যে পাতড়া দিয়াছেন, তাহার আরম্ভে এই শ্লোকটি আছে। তৎপরে আর ১৩টি শ্লোকে পঞ্চব্রাহ্মণের আগমনবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, এবং উপসংহারে আছে—"ইতি আদিশূর ব্যাখ্যানং সমাপ্তং।" বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন, এই শ্লোক কয়টি "কুলরমার" সূচনায় দৃষ্ট হয়। আমার পরীক্ষিত রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থ মধ্যে ধ্রুবানন্দমিশ্রের "মহাবংশাবলী"-গ্রন্থে কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আগমনের কোন উল্লেখ নাই। ধ্রুবানন্দ "নত্বা তাং কুলদেবতাং" ইত্যাদি শ্লোকে মঙ্গলাচরণ করিয়া আরম্ভ করিয়াছেন—

"আযিতো বহুরূপাখ্যঃ শিরো গোবর্দ্ধনঃ সুধীঃ।
গাং শিশো মকরন্দশ্চ জাম্বনাখ্যঃ সমা ইমে॥"

মহেশের "নির্দ্দোষ কুলপঞ্জিকায়"—

"ক্ষিতীশো তিথিমেধা [চ] বীতরাগঃ সুধানিধিঃ।
সৌভরিঃ পঞ্চধর্ম্মাত্মা আগতা গৌড়-মণ্ডলে॥"

এই পর্য্যন্ত উল্লিখিত হইয়াছে, আদিশূরের নাম নাই।

"আদিশূর রাজা পঞ্চগোত্রে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করিলেন [পঞ্চব্রাহ্মণের পরিচয়] এহি পঞ্চগোত্রে পঞ্চব্রাহ্মণ সংস্থাপন করিয়া আদিশূর রাজার সর্গারোহণ॥ তদন্তে কিছুকালানন্তর তত দহিত্র কুলেত উদ্ভব হইলেন বল্লালসেন [বল্লালসেন কর্ত্তৃক কুলমর্য্যাদা স্থাপন এবং রাঢ়ী ও বারেন্দ্রবিভাগ] ইত্যবকাশে অন্যান্য দেশীয় রাজাসকল ব্রাহ্মণহীন দেশ বিবেচনা করিয়া বল্লালসেনের নিকট ব্রাহ্মণ যাচিঞা করিয়া কহিলেন স্নহে বল্লালসেন তোমার মাতামহ কুলোদ্ভব আদিশূর পঞ্চগোত্রে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া গৌড়মণ্ডল পবিত্র করিয়াছেন। আমরা যবনাক্রান্ত দেশে বাস করি আমারদিগের দেশে কিঞ্চিৎ ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিয়া আমারদিগের দেশ পবিত্র করি।"*

আদিশূর সম্বন্ধে যে সকল জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। কুলজ্ঞগণের মুখ্য উদ্দেশ্য ইতিহাস-সঙ্কলন নহে, বংশাবলী-রক্ষা। বংশাবলী অনুসারে হিসাব করিলে, আদিশূরের যে সময় নির্দ্ধারিত হয়, তাহার সহিত এই জনশ্রুতির সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে।" গৌড়ে ব্রাহ্মণ"-কার বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণগণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, †—"শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় বর্ত্তমান ব্যক্তির পুরুষ সংখ্যা ভট্টনারায়ণ হইতে ৩৬।৩৭ এবং ৩৮ পুরুষ, কাশ্যপগোত্রে ৩১।৩২।৩৩।৩৪ পুরুষ, ভরদ্বাজগোত্রে ৩৫ হইতে ৩৯ পুরুষ, কিন্তু বাৎস্যগোত্রে ২৫ হইতে ২৮ পুরুষ দৃষ্ট হয়।" রাঢ়ীয় সমাজে ৩৫ হইতে উর্দ্ধতন পর্য্যায়ের লোক বিরল। বাৎস্য-গোত্র ছাড়িয়া দিলে, বর্ত্তমান কালকে আদিশূর-আনীত ব্রাহ্মণগণের কাল হইতে গড়পড়তায় ৩৪।৩৫ পুরুষের কাল বলা যাইতে পারে। প্রতি পুরুষে ২৫ বৎসর ধরিয়া লইলে, আদিশূর ৮৫০ বৎসর পূর্ব্বে [১০৬০ খৃষ্টাব্দে] বর্ত্তমান ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। এই অনুমান "বেদবাণাঙ্ক-শাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ"

* বারেন্দ্র-কুলপঞ্জিকার ঐতিহাসিক অংশ "আদিশূর রাজার ব্যাখ্যা"-নামে পরিচিত। লালোর-নিবাসী শ্রীযুত মনোমোহন মুকুটমণির, মাঝগ্রামের শ্রীযুত জানকীনাথ সার্ব্বভৌমের, এবং রামপুর-বোয়ালিয়ার শ্রীযুত নৃত্যগোপাল রায় মহাশয়-সংগৃহীত পুঠিয়া নিবাসী ৺মহেশচন্দ্র শিরোমণির ঘরের পুস্তক মধ্যে পাঁচ প্রকার "আদিশূর রাজার ব্যাখ্যার" পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে দুই খানিতে বল্লালসেন আদিশূরের দৌহিত্র-বংশোদ্ভব বলিয়া কথিত। উপরে তাহা উদ্ধৃত হইল। "গৌড়েব্রাহ্মণ"-গ্রন্থে (দ্বিতীয় সংস্করণ, ৯৬ পৃ) উদ্ধৃত একটি শ্লোকে কথিত হইয়াছে—রাজা শ্রীধর্ম্মপাল ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিগাঞিকে যজ্ঞান্তে দক্ষিণা-দানার্থ ধামসার গ্রাম দান করিয়াছিলেন। শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসুর মতানুসারে, এই ধর্ম্মপালকে যদি পালবংশীয় ধর্ম্মপাল মনে করা যায়, তবে আদিশূরকে ধর্ম্মপালের পিতা গোপালের তুল্যকালীন বিবেচনা করিতে হয়। এইরূপ সিদ্ধান্ত "গৌড়ে ব্রাহ্মণে" ধৃত (৮৩ পৃঃ) "ভাদুড়ি-কুলের বংশাবলীর" নিম্নোক্ত বচনের বিরোধী—

"তত্রাদিশূরঃ শূরবংশসিংহো বিজিত্য বৌদ্ধং নৃপপালবংশং।
শশাস গৌড়ং" ইত্যাদি।

"গৌড়েব্রাহ্মণ"-ধৃত এই শেষোক্ত বচন শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক "বারেন্দ্র-কুলপঞ্জিকা" ধৃত, "শাকে বেদকলঙ্কষট্‌ক-বিমিতে রাজাদিশূরঃ স চ" ("বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, প্রথম ভাগ, ৮৩ পৃঃ) এই বচনের, অর্থাৎ আদিশূর ৬৫৪ শকাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন, এই মতের বিরোধী। যে যে কুলজ্ঞগণের সহিত আলাপ করিয়াছি, তাঁহারা এই সকল বচনের কোনটির বিষয়ই অবগত নহেন। সুতরাং এই সকল বচন প্রবল জনশ্রুতিমূলক বলিয়া স্বীকার করা যায় না। আদিশূর সম্বন্ধে যদি কোনও জনশ্রুতি নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হয়, তবে তাহা উপরে উদ্ধৃত আদিশূর ও বল্লালসেনের সম্বন্ধবিষয়ক জনশ্রুতি। "গৌড়েব্রাহ্মণ"-ধৃত "ভাদুড়ী-কুলের বংশাবলীর" বচন প্রকারান্তরে ইহারই পোষকতা করে; এবং "লঘুভারতকার"ও আদিশূর কর্ত্তৃক গৌড়ের পালবংশ উচ্ছেদের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন ("গৌড়েব্রাহ্মণ", ৩২ পৃঃ ৪নং টীকা)।

† ১০৯ পৃঃ টীকা।

[৯৫৪ শাকে বা ১০৩২ খৃষ্টাব্দে গৌড়ে ব্রাহ্মণগণ আগমন করিয়াছিলেন] এই কিম্বদন্তীর বিরোধী নহে, এবং তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে কর্ণাট-রাজকুমার বিক্রমাদিত্যের সহিত বল্লালসেনের পূর্ব্বপুরুষের গৌড়ে আগমনকালের সহিত ঠিকঠাক মিলিয়া যায়। প্রথম রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয়-লিপিতে দক্ষিণরাঢ়ের অধিপতি রণশূরের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আদিশূরকে রণশূরের পুত্র বা পৌত্র ধরিয়া লইলে, কোন গোলই থাকে না।

ভুবনেশ্বরের প্রশস্তিতে উল্লিখিত ভট্টভবদেবের বংশ-বৃত্তান্তের সহিত আদিশূর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণানয়ন-বৃত্তান্তের সামঞ্জস্য অসম্ভব। ভবদেব সাবর্ণ-গোত্রীয়, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ সিদ্ধলগ্রামবাসী, এবং তাঁহার জননী বন্দ্যঘটী-বংশীয়া ছিলেন। সুতরাং ভবদেব যে রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তদ্বিষয়ে আর সংশয় হইতে পারে না। প্রশস্তির রচয়িতা, ভবদেবের সুহৃদ্ বাচস্পতি, যে ইদানীন্তনকালের ঘটকগণের অপেক্ষা ভবদেবের পূর্ব্বপুরুষগণসম্বন্ধে অনেক অধিক খবর রাখিতেন, একথা অস্বীকার করা যায় না। প্রশস্তিতে ভবদেব-বালবলভীভুজঙ্গকে ধরিয়া, সাত পুরুষের বিবরণ আছে। প্রশস্তিতে উল্লিখিত প্রথম ভবদেব খৃষ্টীয় দশম শতাব্দের শেষপাদে বর্ত্তমান ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে; এবং এই প্রথম ভবদেব যে গৌড়-নৃপ হইতে হস্তিনীভিট্টগ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি সম্ভবত প্রথম মহীপাল। বাচস্পতি যে ভাবে প্রশস্তির সূচনায় সিদ্ধলগ্রামবাসী সাবর্ণগোত্রীয় ব্রাহ্মণ-গণের প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, যেন স্মরণাতীত কাল হইতে সাবর্ণগোত্রীয় শ্রোত্রিয়েরা তথায় বাস করিতেছিলেন। এখন যেমন সাবর্ণগোত্রীয় রাঢ়ীয়-বারেন্দ্র ব্রাহ্মণমাত্রই আদিশূর-আনীত বেদগর্ভ বা পরাশর হইতে বংশপরিচয় দিয়া থাকেন, তখন এই প্রবাদ প্রচলিত থাকিলে, বাচস্পতি বোধহয় প্রিয়-সুহৃদের প্রশস্তিতে তাহার উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইতেন না। ভবদেবের ভুবনেশ্বরের প্রশস্তিতে আদিশূর-কর্ত্তৃক সাবর্ণগোত্রীয় ব্রাহ্মণ আনয়নের প্রতিকুল প্রমাণ দেখিয়া, আদিশূর-বৃত্তান্তের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে ঘোর সংশয় উপস্থিত হয়। যত দিন না কোনও তাম্রশাসন বা শিলালিপি দ্বারা এই সংশয় অপসারিত হয়, ততদিন পরস্পর-বিরোধী কুলশাস্ত্রের প্রমাণ অবলম্বনে, আদিশূরের ইতিহাস-উদ্ধারের যত্ন বিড়ম্বনা মাত্র।

ভবদেব-বালবলভীভুজঙ্গের অতি-বৃদ্ধ-বৃদ্ধ-প্রপিতামহ প্রথম ভবদেবের সময়ে, রাঢ় গৌড়রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত এবং গৌড়-নৃপের পদানত ছিল, এবং প্রথম ভবদেব গৌড়-নৃপের প্রসাদে হস্তিনীভিট্টগ্রাম লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভবদেবের পিতামহ আদিদেবের সময়ে, রাঢ়ে-বঙ্গে "বঙ্গরাজের" প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল, এবং আদিদেব তাঁহার সন্ধিবিগ্রহী ছিলেন। ভট্ট গুরবের এবং বৈদ্যদেবের বংশবৃত্তান্ত হইতে জানা যায়, তৎকালে মন্ত্রিপদ বংশানুগত ছিল। আদিদেব যে বঙ্গ-রাজের সন্ধিবিগ্রহী ছিলেন, তিনি সম্ভবতঃ হরিবর্ম্মদেবের পিতা (?) জ্যোতিবর্ম্মা। জ্যোতিবর্ম্মা হয়ত গৌড়েশ্বর কুমারপালের সময়ে, দক্ষিণ বঙ্গে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনে যত্নবান্ হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার দমনার্থ প্রেরিত বৈদ্যদেব-কর্ত্তৃক নৌ-যুদ্ধে পরাভূত হইয়াছিলেন। কুমারপালের মৃত্যুর পর, জ্যোতিবর্ম্মার অভিলাষ পূরণের আর কোন বাধা ছিল না। আদিদেবের পুত্র গোবর্দ্ধন যুদ্ধক্ষেত্রে [বীরস্থলীষু] বাহুবলে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন [বর্দ্ধয়ন্ বসুমতী ;] বলিয়া কথিত হইয়াছেন ; কিন্তু তিনি কখন মন্ত্রিপদ লাভ করিয়াছিলেন, এরূপ কোনও প্রমাণ নাই। গোবর্দ্ধন হয়ত জ্যোতিবর্ম্মা বা হরিবর্ম্মার একজন সেনানায়ক ছিলেন, এবং পিতার জীবদ্দশায় পরলোক গমন করায়, মন্ত্রিপদে উন্নীত হইবার অবসর পাইয়াছিলেন না। সুতরাং আদিদেবের মৃত্যুর পর, ভট্ট-ভবদেব বালবলভীভুজঙ্গ হরিবর্ম্মার মন্ত্রিপদ লাভ করিয়াছিলেন ; এবং হরিবর্ম্মার মৃত্যুর পর, তাঁহার অনুল্লিখিতনামা পুত্রের এবং উত্তরাধিকারীর সময়েও সেই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রশস্তিকার বাচস্পতি ১৮টি শ্লোকে ভবদেব বালবলভীভুজঙ্গের গুণগ্রামের এবং কীর্ত্তিকলাপের বর্ণন করিয়াছিলেন ; তিনি কি কি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহারও পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু ভবদেবের বাহুবলে এবং নীতিকৌশলে তাঁহার প্রভুর রাজ্য কতটা উন্নতি এবং বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল,

এই সুদীর্ঘ প্রশস্তিমধ্যে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। ইহাতে অনুমান হয়, সেনবংশের অভ্যুদয়ের পর, ভবদেব স্বীয় প্রভুকে সেনবংশীয় গৌড়াধিপের অধীনতা স্বীকারে উপদেশ দিয়া, স্বয়ং অগস্ত্যবৎ বৌদ্ধাম্ভোনিধি-গণ্ডূষকরণে, পাষণ্ড-তার্কিক-দলনে, এবং স্মৃতি, জ্যোতিষ, এবং মীমাংসা-শাস্ত্রের চর্চ্চায়, মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

বর্ম্মবংশের অভ্যুদয় এবং মদনপালের দুর্ব্বলতা নিবন্ধন গৌড়রাষ্ট্র যখন বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল, তখন সামন্তসেনের পৌত্র [হেমন্তসেন ও রাজ্ঞী যশোদেবীর পুত্র] বিজয়সেন বরেন্দ্রভূমিতে একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হেমন্তসেন একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু তিনি বাহুবলে গৌড়রাজ্যের কোন অংশ করতলগত করিতে পারিয়াছিলেন কি না, তাহা বলা যায় না। হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়সেন, রাঢ়ে এবং বঙ্গে, বর্ম্ম-রাজের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে অসমর্থ হইয়াই, সম্ভবত স্বীয় অভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য, বরেন্দ্র-অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন। অথবা হেমন্তসেনই হয়ত বরেন্দ্রে আশ্রয় লইয়াছিলেন, এবং পরে সুযোগ পাইয়া, বিজয়সেন তথায় স্বতন্ত্র রাজ্যস্থাপনে ব্রতী হইয়াছিলেন। বল্লালসেন "দানসাগরের" ভূমিকায় লিখিয়া গিয়াছেন—

"তদনু বিজয়সেনঃ প্রাদুরাসীৎ বরেন্দ্রে"

"(হেমন্তসেনের) পর বিজয়সেন বরেন্দ্রে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।"

বিজয়সেনের অভ্যুদয়কাল সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। কিল্‌হর্ণের অনুসরণ করিয়া, সামন্তসেনকে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদে, হেমন্তসেনকে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে, এবং বিজয়সেনকে দ্বিতীয় পাদে [আনুমানিক ১১২৫—১১৫০ খৃষ্টাব্দে] স্থাপিত করা যাইতে পারে। এ পর্য্যন্ত আর কোন লেখক এই মত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানি না, এবং কিল্‌হর্ণও তাঁহার মতের অনুকূল যুক্তিগুলি বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

প্রধানতঃ দুইটি প্রমাণ-বলে, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দের চতুর্থপাদ বিজয়সেনের অভ্যুদয়কাল বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। বিজয়সেনের দেবপাড়া প্রশস্তিতে (২১ শ্লোক) উক্ত হইয়াছে, তিনি "নান্য" নামক নৃপতিকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। নেপালের রাজা জয়প্রতাপমল্লের কাটামুণ্ডুতে প্রাপ্ত ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দের [৭৬৯ নেপালী-সম্বতের] শিলালিপিতে উল্লিখিত মিথিলার এবং নেপালের "কার্ণাটক"-বংশীয় রাজগণের বংশ-তালিকায় এক "নান্যদেব" উক্ত বংশের আদিপুরুষরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। * জর্ম্মণির প্রাচ্যবিদ্যানুশীলন-সমিতির পুস্তকালয়ে রক্ষিত একখানি পুঁথিতে নান্যদেব [১০১৯ শকে ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে] বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। † প্রত্নবিদ্‌গণ দেবপাড়া প্রশস্তির "নান্য" এবং কার্ণাটক-বংশের আদিপুরুষ "নান্যদেব"কে অভিন্ন মনে করিয়া থাকেন। এই মত গ্রহণ করিলেও, একাদশ শতাব্দের শেষ পাদে বিজয়সেনের রাজত্বকাল নিরূপণ অনাবশ্যক; পরন্তু নান্যদেব দ্বাদশ শতাব্দের দ্বিতীয় পাদ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন; এবং সেই সময়ে, বিজয়সেনের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কার্ণাটক-বংশীয় নৃপতিগণের বংশ-তালিকা-অনুসারে নেপাল-বিজয়ী হরিসিংহ নান্যদেব হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ। হরিসিংহের মন্ত্রী চণ্ডেশ্বর ঠক্কুরের সংগৃহীত "বিবাদ-রত্নাকরের" মঙ্গলাচরণ হইতে জানা যায়, হরিসিংহ ১২৩৯ শকাব্দে [১৩১৭ খৃষ্টাব্দে] জীবিত ছিলেন। সুতরাং, প্রতি পুরুষ গড়ে ২৫ বৎসর হিসাবে, হরিসিংহের উর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ নান্যদেব, মোটামুটী ১১৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। গৌড়রাষ্ট্রের সেই অধঃপতনের সময়, কর্ণাটক্ষত্রিয়-বংশোদ্ভব বিজয়সেন

*Keilhorn's List of Northern Inscriptions, Appendix to **Epigraphia Indica**, Vol V.

†Deutsche Morganlandische Gesselschaft.

‡**Epigraphia Indica**, Vol. I, p.

বরেন্দ্রে যে কার্য্য-সাধনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, অপর একজন কর্ণাট-ক্ষত্রিয়, নান্যদেব, পূর্ব্বাবধিই মিথিলায় সেই কার্য্যেই ব্রতী হইয়াছিলেন। সুতরাং নূতন ব্রতী বিজয়সেনের সহিত পুরাতন ব্রতী নান্যদেবের সংঘর্ষ স্বাভাবিক।

দ্বিতীয় প্রমাণ লক্ষ্মণ-সম্বৎ। কিল্‌হর্ণ স্থির করিয়াছেন,—১১১৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাস হইতে এই সম্বতের গণনা আরম্ভ হইয়াছিল; এবং তিনি দেবপাড়া-প্রশস্তির ভূমিকায় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের আরম্ভ হইতে এই সম্বৎ-গণনার আরম্ভ হয়। আবুল ফজলের "আকবর-নামা"-রচনার সময়েও, লক্ষ্মণ-সম্বতের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ কিম্বদন্তি প্রচলিত ছিল।* সুতরাং লক্ষ্মণসেনের পিতামহ বিজয়সেন অবশ্য একাদশ শতাব্দের শেষপাদে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু বল্লালসেন-রচিত দানসাগর-নামক নিবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে—†

"নিখিল চক্রতিলক-শ্রীমদ্বল্লালসেনেন পূর্ণে
শশি-নব-দশমিতে শক-বর্ষে দানসাগরো রচিতঃ।"

অর্থাৎ ১০৯১ শকাব্দ (১১৬৯ খৃষ্টাব্দ) পূর্ণ হইলে, বল্লালসেন "দানসাগর" রচনা করিয়াছিলেন।

ডাক্তার ভাণ্ডারকার বোম্বাই-প্রদেশে সংগৃহীত বল্লালসেন-রচিত "অদ্ভুত সাগরের" যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে উল্লিখিত হইয়াছে,—বল্লালসেন "শাকে খ-নব-খেন্দ্বব্দে" [১০৯০ শকাব্দে =১১৬৮ খৃষ্টাব্দে] "অদ্ভুত সাগর" আরম্ভ করিয়াছিলেন।‡ বোধ হয় এই নিমিত্ত কিল্‌হর্ণ পূর্ব্ব মত পরিত্যাগ করিয়া, লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দের শেষ পাদে এবং বল্লালসেনের রাজত্ব তৃতীয় পাদে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।§ শ্রীযুত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় অদ্ভুত সাগর হইতে বল্লালসেনের রাজ্যাভিষেকের কালও আবিষ্কৃত করিয়াছেন।‖ অদ্ভুত সাগরের, "সপ্তর্ষীনামদ্ভুতানি"-প্রকরণে লিখিত আছে,—"ভুজ-বসু-দশ মিতে (১০৮১) শকে শ্রীমদ্বল্লালসেন-রাজ্যাদৌ" ইত্যাদি। ইহাতে ১০৮১ শক (১১৫৯ খৃষ্টাব্দ) বল্লালসেনের রাজত্বের প্রথম বৎসর রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "দানসাগরের" এবং "অদ্ভুত সাগরের" রচনা কাল-বিজ্ঞাপক শ্লোক প্রামাণ্যরূপে গৃহীত হইতে পারে না বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার এরূপ মনে করিবার প্রথম কারণ,—"দানসাগরের" এবং "অদ্ভুতসাগরের যে সকল পুঁথিতে কাল বিজ্ঞাপক শ্লোক আছে, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে লিপিবদ্ধ হইয়াছে; এবং উহা ছাড়া, এই দুই গ্রন্থের আরও কয়েকখানি প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে এই সকল শ্লোক নাই। সুতরাং, উভয় গ্রন্থের কাল-বিজ্ঞাপক শ্লোক পরবর্ত্তী কালে প্রক্ষিপ্ত হওয়া সম্ভব।

আর এক হিসাবে দেখিতে গেলে, ঠিক বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। "দানসাগর" স্মৃতি-নিবন্ধ, এবং "অদ্ভুত সাগর" জ্যোতিষের নিবন্ধ। যাঁহারা স্মৃতি বা জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনুশীলন করিতেন, তাঁহারাই এই সকল পুস্তকের প্রতিলিপি প্রস্তুত করিতেন বা করাইতেন। স্মৃতি, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রের অনুশীলন-কারিগণ, গ্রন্থকারের জীবনী সম্বন্ধে বা গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে, চিরকালই উদাসীন। সুতরাং, কোন কোন

---

* **Journal of the Asiatic Society of Bengal,** 1888, Part I, p. 2.

† **J. A. S. B,** 1896, Part I, p. 23. India office এর পুস্তকালয়ে যে একখণ্ড "দানসাগর" আছে, তাহার উপসংহারেও, এই শ্লোকার্দ্ধ আছে। (Eggeling's Catalogue, p. 545) রাজসাহী কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিত শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন,—তিনি সিভিলিয়ান Mr. Ranking এর নিকট একখণ্ড "দানসাগর" দেখিয়াছিলেন; তাহাতেও এই শ্লোক আছে।

‡ **Bhandarkar's Report** on the search for Sanskrit Manuscripts during 1887—88 and 1890-91, p. lxxxv.

§ **Epigraphia Indica,** Vol, viii, Synchronous Table for Northern India, A. D. 400—1400; column 7.

‖ **Journal of the Asiatic Society of Bengal,** 1906, p. 17 note.

লিপিকর, অনাবশ্যক বোধে, আদর্শ পুস্তকের কাল-বিজ্ঞাপক বচন পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন। সেই জন্য সকল পুস্তকে এই বচন দৃষ্ট হয় না।

এসিয়াটিক্ সোসাইটীর পুস্তকালয়ে যে "অদ্ভুত সাগরের" পুঁথি আছে, তাহার মঙ্গলাচরণের সহিত ভাণ্ডারকার-বর্ণিত পুঁথির মঙ্গলাচরণের তুলনা করিলে, এইরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়। বোম্বাইএর পুঁথির মঙ্গলাচরণের প্রথম নয়টি শ্লোকে, সেনরাজ-বংশত গ্রন্থকার বল্লালসেন, এবং তাঁহার সহযোগী শ্রীনিবাস প্রশংসিত হইয়াছেন। এসিয়াটিক্ সোসাইটীর পুঁথিতে, এই নয়টি শ্লোকের পাঁচটি মাত্র দৃষ্ট হয়; ২, ৩, ৪ এবং ৬নং শ্লোক একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। বোম্বাইএর পুস্তকে এই নয়টি শ্লোকের পরে, সাতটি শ্লোকে, যে যে মূল গ্রন্থ হইতে "অদ্ভুত সাগরের" বচন-প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে; এবং তৎপরে আর দ্বাদশটি শ্লোকে গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে এইরূপ তালিকা এবং বিষয়-সূচী অনেক নিবন্ধেই দৃষ্ট হয়। কিন্তু এসিয়াটিক্ সোসাইটীর পুঁথির ভূমিকায় এই ১৯টি শ্লোকের একটিও স্থানলাভ করে নাই। এই সকল শ্লোকও কি তবে প্রক্ষিপ্ত? বিষয়-সূচীর পর বোম্বাইএর পুঁথিতে নিম্নোক্ত শ্লোক তিনটি আছে—

"শাকে খ-নব-খেন্দ্বব্দে আরেভে দ্ভুতসাগরং।
গৌড়েংদ্র কুংজরালান-স্তংভবাহু র্মহীপতিঃ॥ ১॥
গ্রংথেস্মিনসমাপ্ত এব তনয়ং সাম্রাজ্যরক্ষা-মহা-
দীক্ষাপর্বণি দীক্ষণান্নিজকৃতে র্নিষ্পত্তিমভ্যর্থ্য সঃ।
নানাদান-চিতাংবু-সংচলনতঃ সূর্য্যাত্মজা-সংগমং
গংগায়াং বিরচয্য নির্জরপুরং ভার্য্যানুযাতো গতঃ॥ ২॥
শ্রীমল্লক্ষ্মনসেন-ভূপতি রতিশ্লাঘ্যো যদুদ্যোগা গতো
নিষ্পন্নোদ্ভুতসাগরঃ কৃতি রসৌ-বল্লাল-ভূমিভুজ।
খ্যাত-কেবলমগ্রুবঃ (?) সগরজঃস্তোমস্ত তত্ পূরণ-
প্রাবীণ্যেন ভগীরথ স্ত ভুবনেম্বদ্যাপি বিদ্যোততে॥ ৩॥

মর্ম্মানুবাদ—রাজা বল্লালসেন ১০৯০ শাকে "অদ্ভুত-সাগরের" আরম্ভ করিয়াছিলেন (১)। তিনি এই গ্রন্থ অসমাপ্ত রাখিয়া, এবং তনয়ের উপর সমাপ্ত করিবার ভার অর্পণ করিয়া, স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন (২)। লক্ষ্মণ-সেনের উদ্যোগে "অদ্ভুতসাগর" সমাপ্ত হইয়াছিল (৩)।

এই তিনটি শ্লোক একসূত্রে গ্রথিত। ইহার একটি ফেলিয়া, আর একটি রাখিবার উপায় নাই। কিন্তু এসিয়াটিক্ সোসাইটীর পুঁথিতে তাহাই করা হইয়াছে। প্রথম দুটি পরিত্যক্ত এবং তৃতীয়টি মাত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এ অবস্থায়, "শাকে খ-নব-খেন্দ্বব্দে" ইত্যাদি শ্লোকটিকে প্রক্ষিপ্ত বলা যায় না।

রাখালবাবুর দ্বিতীয় যুক্তি,—বোধগয়ার দুইখানি শিলালিপির* উপসংহারে আছে।

"শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনস্যাতীতরাজ্যে সং ৫১ ভাদ্র দিনে ২৯"
"শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন—দেব-পাদানা-মতীতরাজ্যে সং ৭৪ বৈশাখ-বদি ১২ গুরৌ॥"

তীতরাজ্যে সং ৫১"—ইহার অর্থ লক্ষ্মণসেনের রাজ্য লুপ্ত হওয়ার পর হইতে গণিত ৫১ সম্বতে, অথবা লক্ষ্মণসেনের রাজ্যলাভ হইতে গণিত ৫১ সম্বতে, অথচ লক্ষ্মণসেনের রাজ্যলোপের পরে। কিলহর্ণ এক সময় শেষোক্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া, সং ৫১=১১২০+৫১=১১৭১ খৃষ্টাব্দ ধরিয়াছিলেন। রাখালবাবু এই অর্থই বজায় রাখিতে যত্ন করিয়াছেন। এখানে শব্দার্থ লইয়া কাট্যাং কুট্যাং না করিয়া, এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই দুইখানি বোধগয়ার লিপির অক্ষরের, [বিশেষতঃ প এবং দএর,] সহিত গয়ার ১২৩২ সম্বতের (১১৭৫ খৃষ্টাব্দের) গোবিন্দপালদেবের গতরাজ্যের চতুর্দ্দশ সম্বৎসরের শিলা-লিপির,† অথবা বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনের ‡ প এবং দ অক্ষরের তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—১২৩২ সম্বতের গয়ার লিপির এবং বিশ্বরূপ-সেনের তাম্রশাসনের প এবং দ পুরাতন নাগরীর ঢঙ্গের;

*সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৭শ ভাগ (১৩১৮), ২১৪ এবং ২১৬ পৃঃ।

†**Cunningham's Archæological Survey Report**, Vol. III, plate রাখালবাবু অনুসন্ধান-সমিতিকে এই শিলা-লিপির একখানি প্রতিলিপি প্রদান করিয়া উপকৃত করিয়াছেন।

‡**J. A. S. B.**, 1896, Part, I, plates I and II.

পক্ষান্তরে, আলোচ্য বোধগয়ার লিপিদ্বয়ের প এবং দ বর্ত্তমান বাঙ্গালা প এবং দ এর মত। ঠিক এই প্রকারের প এবং দ চট্টগ্রামে প্রাপ্ত ১১৬৫ শকাব্দের [১২৪৩ খৃষ্টাব্দের] তাম্রশাসনে * দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতাব্দের শেষ ভাগে গৌড়-মণ্ডলে পুরাতন নাগরী ঢঙ্গের প, এবং দ'ই যে প্রচলিত ছিল, বল্লভদেবের "শকে নগ-নভো-রুদ্রৈঃ সংখ্যাতে" অর্থাৎ ১১০৭ শকের (১১৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দের) আসামের তাম্রশাসন তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে। † সুতরাং "শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনস্যাতীতরাজ্যে সং ৫১" ১১৭১ খৃষ্টাব্দরূপে গ্রহণ না করিয়া, [আনুমানিক ১২০০ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেনের মৃত্যু ধরিয়া,] ১২৫১ খৃষ্টাব্দ বলিয়া গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। এই সিদ্ধান্তের এক আপত্তি আছে। লক্ষ্মণসেনের "অতীত রাজ্য" হইতে কোন সম্বৎ প্রচলিত হইবার প্রমাণ নাই। উত্তরে বলা যাইতে পারে—গোবিন্দপালদেবের "গতরাজ্য" বা "বিনষ্টরাজ্য" হইতেও কোন সম্বৎ প্রচলিত নাই। পক্ষান্তরে গোবিন্দপালদেবের রাজ্যলাভ হইতেও কোন সম্বৎ প্রচলিত হওয়ার প্রমাণ নাই। "গতরাজ্যে" "অতীতরাজ্যে" বা "বিনষ্টরাজ্যে" প্রভৃতি বিশেষণ-পদের এই রূপ অর্থ প্রতিভাত হয়—গোবিন্দপালদেবের রাজ্যলোপের পরে, মগধে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। লক্ষ্মণ-সেনের রাজ্যলোপের পরেও মগধে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। তখন মগধে কেহ "প্রবর্দ্ধমান-বিজয়রাজ্য" প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন না; অথবা যিনি মগধ, করায়ত্ত করিয়াছিলেন, মগধবাসিগণ তাঁহাকে তখনও অধিপতি বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই নিমিত্ত "গতরাজ্যের" বা "অতীতরাজ্যের" সম্বৎ-গণনা প্রচলিত হইয়া থাকিবে। এই সম্পর্কে আর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে,—লক্ষ্মণ-সম্বতের সূচনা এবং প্রচলন হইল কবে হইতে? পুত্র বিশ্বরূপসেনের সময়ে লক্ষ্মণ-সম্বৎ প্রচলিত ছিল না। বিশ্বরূপসেনের (কেশবসেনের ?) ইদিলপুরের তাম্রশাসনের সম্পাদন-কাল "সং ৩ জ্যৈষ্ঠ দিনে—" এবং মদনপাড়ে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের সম্পাদন-কাল, "সং ১৪ আশ্বিনদিনে ১॥" পাল এবং সেন-রাজগণের সময় গৌড়-মণ্ডলে শকাব্দ বা বিক্রম-সম্বৎ প্রচার লাভ করিয়াছিল না; নৃপতিগণের বিজয়-রাজ্যের সম্বৎসরই প্রচলিত ছিল। পাল এবং সেনবংশের রাজ্য-নষ্টের পর, কিছুদিন "বিনষ্টরাজ্যের" বা "অতীতরাজ্যের" সম্বৎ ব্যবহৃত হইয়াছিল। তাহার পরে, প্রচলিত অব্দের অভাব পূরণের জন্য, "লক্ষ্মণাব্দ" উদ্ভাবিত হইয়া থাকিবে।

লক্ষ্মণাব্দের মূল যাহাই হউক, আমরা কুমরদেবীর সারনাথ-লিপিতে, রামপালচরিতে, বৈদ্যদেবের এবং মদনপালের তাম্রশাসনে, বরেন্দ্রদেশের যে ইতিহাস প্রাপ্ত হই, তাহার উপর নির্ভর করিতে গেলে, দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের পূর্ব্বে বিজয়সেন কর্ত্তৃক বরেন্দ্রে স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা একেবারে অসম্ভব বোধ হয়। বিজয়সেন যখন বরেন্দ্রে স্বাধীনতা অবলম্বনে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন প্রথমেই অবশ্য তাঁহার সহিত গৌড়পতি পাল-নরপালের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। দেবপাড়ার প্রশস্তিতে উক্ত হইয়াছে,—বিজয়সেন "গৌড়েন্দ্রকে সবলে আক্রমণ" করিয়াছিলেন (২০ শ্লোক)। সম্ভবতঃ এই আক্রমণের ফলেই "গৌড়েন্দ্র" বরেন্দ্র ত্যাগ করিয়া, মগধে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তৎপর প্রতিবেশী নৃপতিমাত্রই হয়ত তাঁহার প্রতিকুলতাচরণে উদ্যত হইয়া-ছিলেন। কার্য্যত না হউক, নামতঃ কামরূপ-রাজ এবং কলিঙ্গ-রাজ, গৌড়েশ্বরের অনুগত ছিলেন। গৌড়েন্দ্রকে বরেন্দ্র হইতে বিতারিত হইতে দেখিয়া, হয়ত তাঁহারা বিদ্রোহী বিজয়সেনকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। প্রশস্তিকার উমাপতি ধর লিখিয়াছেন—বিজয়সেন "কামরূপভূপকে দমন করিয়াছিলেন, এবং কলিঙ্গ [রাজকে] পরাজিত করিয়াছিলেন (২০)।" মিথিলাপতি নান্যদেব বিজয়সেনকে আক্রমণ করিতে আসিয়া, ধৃত এবং কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। উমাপতি ধর লিখিয়াছেন,—বিজয়সেন নান্য ব্যতীত রাঘব, বর্দ্ধন, এবং বীর নামক আরও তিনজন নৃপতিকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন (২১ শ্লোক)। গৌড়রাষ্ট্রের পশ্চিমাংশ ["পাশ্চাত্য-চক্র"] জয় করিবার

* **J. A. S. B** 1874, Part I, plate XVIII.

† **Epigraphia Indica**, Vol. V, plates 19-20.

জন্য, তিনি যে "নৌবিতান" প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না (২২ শ্লোক)। দক্ষিণ দিকে, বঙ্গে এবং রাঢ়ে, বর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক বিজয়সেনের গতি রুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু বরেন্দ্রে বিজয়সেনের আধিপত্য বদ্ধমূল হইয়াছিল, এবং সেখানে তিনি অনেক লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানের অবসর পাইয়াছিলেন। উমাপতি ধর লিখিয়া গিয়াছেন,—বিজয়সেন অনেক "উত্তুঙ্গ দেবমন্দির" এবং "বিস্তীর্ণ (বিতত) তল্ল" প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বিজয়সেন-প্রতিষ্ঠিত প্রদ্যুম্নেশ্বর-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এবং তাঁহার রাজধানী—[জনশ্রুতির "বিজয়রাজার বাড়ী"]—বিজয়নগর বরেন্দ্রভূমির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। উমাপতি ধর-বিরচিত বিজয়সেনের প্রশস্তি-সম্বলিত শিলা-ফলক বরেন্দ্রের অন্তর্গত দেবপাড়ায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

বিজয়সেনের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী [বল্লালসেন] পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, সমগ্র গৌড়রাষ্ট্র করায়ত্ত করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। বিজয়সেন পালবংশজ "গৌড়েন্দ্র"কে আক্রমণ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। বল্লালসেন, স্বীয় অভীষ্ট সাধনের জন্য, পাল-রাজবংশ উন্মূলিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। ১১৬১ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দপালদেব সম্ভবত বল্লালসেন কর্ত্তৃকই রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। বর্ম্মরাজকে পদচ্যুত বা পদানত করিয়া বল্লালসেন বঙ্গে এবং রাঢ়ে স্বীয় আধিপত্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন। রাজত্বের "সং ১১ বৈশাখদিনে ১৬" সম্পাদিত, [কাটোয়ার নিকটে প্রাপ্ত] তাম্রশাসনে তাঁহার বঙ্গ এবং রাঢ় অধিকারের পরিচয় পাওয়া যায়। এই তাম্রশাসন "শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারে" সম্পাদিত হইয়াছিল, এবং এতদ্বারা "শ্রীবর্দ্ধমান-ভুক্ত্যন্তঃপাতী উত্তররাঢ়া-মণ্ডলের" ভূমি দান করা হইয়াছিল। বল্লালসেন সম্ভবত কলিঙ্গ-রাজ্যও আক্রমণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে—লক্ষ্মণসেন "কলিঙ্গরমণীগণের সহিত কৌমার-কেলি করিয়াছিলেন।" ইহার অর্থ এই,—লক্ষ্মণসেন যখন যুবরাজ, তখন পিতার সহিত অথবা পিতার আদেশানুসারে, কলিঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন।

১১৫৯ খৃষ্টাব্দে বল্লালসেনের রাজ্যলাভ ধরিলে, "সং ১১" [কাটোয়ার তাম্রশাসনের সম্পাদনকাল] ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে নির্দ্ধারিত হইতে পারে। এই বৎসর বল্লালসেন "দানসাগর" সঙ্কলিত করিয়াছিলেন, এবং ইহার পূর্ব্ব বৎসর, "অদ্ভুতসাগরের" সঙ্কলন আরম্ভ করিয়া, তাহা সমাপ্ত না হইতেই, স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে অনুমান হয়,—"দানসাগর" সঙ্কলিত হওয়ার [১১৬৯ খৃষ্টাব্দের] পরে, বল্লালসেন বড় অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। "দানসাগরের" মঙ্গলাচরণে তিনি আপনাকে "গৌড়েশ্বর" বলিয়াছেন। পরবর্ত্তী-কালের গৌড়রাষ্ট্রের ইতিহাস আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হয়,—বল্লালসেন গৌড়রাষ্ট্র প্রতিদ্বন্দিহীন করিতে সমর্থ হইলেও, দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ বর্ষস্থায়ী রাজত্বকালে,—বিস্তীর্ণ গৌড়-মণ্ডলের বিভিন্ন অংশ সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করিবার—গৌড়রাষ্ট্র পুনরায় সুগঠিত এবং এককেন্দ্রীভূত করিবার—অবসর পাইয়াছিলেন না।

বল্লালসেন যে গৌড়রাষ্ট্র-পুনর্গঠনব্রত অসমাপ্ত অবস্থায় রাখিয়া, পরলোক গমন করিয়াছিলেন; তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন তাহা সমাপ্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন না। লক্ষ্মণসেনের এই অক্ষমতাই গৌড়ের সর্ব্বনাশের কারণ। লক্ষ্মণসেন পিতৃপিতামহের আরব্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে যত্নের ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু দেশ-কাল-পাত্র কিছুই সে মহদনুষ্ঠানের উপযোগী ছিল না। লক্ষ্মণসেনের, ধর্ম্মপাল-মহীপাল-রামপালের তুল্য প্রতিভা ছিল না। প্রজাপুঞ্জের নির্ব্বাচিত [বহুকাল গৌড়সিংহাসনের অধিকারী] গোপালের বংশধরগণকে গৌড়জন যেরূপ ভক্তি-নেত্রে দেখিতেন, বিদেশাগত পালরাজকুল-উন্মূলনকারী বিজয়সেনের এবং বল্লালসেনের উত্তরাধিকারী লক্ষ্মণসেন সেরূপ ভক্তি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন না। সেকাল আর একালে প্রভেদও অনেক ছিল। বরেন্দ্রের বিদ্রোহে গৌড়ের প্রজাশক্তি এবং রাজশক্তি এই উভয়ের মধ্যে যে ভেদ উপস্থিত হইয়াছিল, কর্ণাটাগত সেনবংশের অভ্যুদয়ে, তাহা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল; এবং "মাৎস্য-ন্যায়" নিবারণের, অথবা "অনীতিকারম্ভের" প্রতীকারের অধিকার বিস্মৃত হইয়া, গৌড়জন কালস্রোতে গা ঢালিয়া

দিয়াছিলেন। মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের অভ্যুদয় গৌড়ের সর্ব্বনাশের মূল বা সর্ব্বনাশের ফল বলিয়া কথিত হইতে পারে না; বিজয়সেনের অভ্যুদয়ই গৌড়ের সর্ব্বনাশের প্রকৃত মূল বা ফল বলিয়া কথিত হইতে পারে।

গৌড়াধিপ লক্ষ্মণসেনও অবশ্যই কলিঙ্গ-পতি এবং কামরূপ-পতিকে বশীভূত রাখিতে যত্ন করিয়াছিলেন; এবং ১১৪২ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দচন্দ্রের আক্রমণ-মূলে কান্যকুব্জেশ্বরের মগধের উপর যে দাবী জন্মিয়াছিল, তাহার নিকাশ করিবার জন্য কান্যকুব্জেশ্বরের সহিতও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মাধাইনগরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে লক্ষ্মণসেন "বিক্রম-বশীকৃত-কামরূপঃ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। লক্ষ্মণসেনের সময়, গৌড়-সেনা যে কামরূপ আক্রমণ করিয়াছিল, তৎসম্পর্কে অপর পক্ষও সাক্ষ্যদান করিতেছে। আসামে প্রাপ্ত কুমার বল্লভদেবের ১১০৭ শক-সম্বতের [১১৮৪—৮৫ খৃষ্টাব্দের] তাম্রশাসন * হইতে জানা যায়, বল্লভদেবের পিতামহ রায়ারিদেব-ত্রৈলোক্য-সিংহের সময়, গৌড়সেনা কামরূপ আক্রমণ করিয়াছিল। এই শাসনে উক্ত হইয়াছে—"ভাস্কর-বংশীয় নৃপ-শিরোমণি রায়ারিদেব বঙ্গের মহাকায় করি-নিচয়ের উপস্থিতি-নিবন্ধন-ভয়াবহ সমরোৎসবে শত্রুগণকে অস্ত্রচালনা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন (৫ শ্লোক)।" রায়ারিদেব গৌড়-সেনা পরাজিত করিয়াছিলেন, এ কথা এখানে স্পষ্ট বলা হয় নাই। সুতরাং মাধাইনগর-তাম্রশাসনে উক্ত—"বিক্রমবশীকৃতকামরূপঃ"—নিরর্থক না হইতেও পারে।

লক্ষ্মণসেনের এবং বিশ্বরূপসেনের প্রশস্তিকার, লক্ষ্মণসেন কর্ত্তৃক কাশি-রাজের (কান্যকুব্জ-রাজের এবং কলিঙ্গ-রাজেরও পরাজয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মাধাইনগরের তাম্রশাসনে ক্ষোদিত রহিয়াছে,—"তিনি সমরক্ষেত্রে কাশি-রাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন।" বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে,—দক্ষিণসাগরের তীরে, পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে—অসি, বরণা, এবং গঙ্গাসঙ্গমে বিশ্বেশ্বরের কাশীধামে—ত্রিবেণী-সঙ্গমে প্রয়াগধামে—লক্ষ্মণসেন উচ্চ যজ্ঞ-যূপের সহিত সমর-জয়স্তম্ভ-মালা স্থাপিত করিয়াছিলেন (১২ শ্লোক)। লক্ষ্মণসেন যখন গৌড়াধিপ, তখন কান্যকুব্জের সিংহাসনে গাহাড়-বাল-রাজ জয়চ্চন্দ্র, এবং কলিঙ্গের সিংহাসনে দ্বিতীয় রাজরাজ, এবং তৎপরে দ্বিতীয় অনঙ্গভীম, সমাসীন ছিলেন। ইঁহারা কেহই গৌড়াধিপের তুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন না। সুতরাং ইঁহাদিগের সহিত যুদ্ধে গৌড়াধিপের জয়লাভ অসম্ভব নহে। কিন্তু লক্ষ্মণসেন গৌড়-রাষ্ট্রের বহিঃশত্রু দমনে সমর্থ হইয়া থাকিলেও, প্রজাপুঞ্জের সহযোগিতার অভাবে, আভ্যন্তরীণ ঐক্যসাধনে, এবং বিভিন্ন অংশের রক্ষার সুব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন না। সেই জন্যই মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার অবাধে মগধ এবং বরেন্দ্র অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন।

তুরুষ্কগণের গৌড়বিজয়-রহস্য বুঝিতে হইলে, তুরুষ্ক-চরিত্র এবং তাহাদিগের উত্তরাপথের অপরাপর অংশের বিজয়-বৃত্তান্ত সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন। আরবগণ উত্তরাপথের সিংহদ্বারোদ্‌ঘাটনে সমর্থ হইয়াছিলেন না। যাঁহারা সেই দুরূহ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাঁহারা [সবুক্তিগিন, মামুদ, এবং তাঁহাদের অনুচরগণ] তুরুষ্ক-জাতীয়। মধ্য এসিয়ার মরুময় মালভূমি তুরুষ্কগণের আদি-নিবাস; নিয়ত পালিত পশুপাল লইয়া, গোচারণক্ষেত্রের অনুসন্ধান করাই ইহাদিগের বৃত্তি ছিল। আদিবাস-ভূমির জলবায়ু এবং চিরঅভ্যাস মধ্য-এসিয়ার অধিবাসিগণকে কঠোরক্ষম, চঞ্চল এবং অগ্রগমনশীল করিয়া তুলিয়াছিল। চিরচাঞ্চল্য এবং অগ্রগমনশীলতা মধ্য-এসিয়ার অধিবাসিগণের জাতীয় চরিত্রের উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। এই জাতীয় চরিত্রের বলে বলীয়ান ইউচিগণ, আদি-নিবাসস্থান হইতে বহির্গত হইয়া, [খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দে] কুষাণসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত

* **Epigraphia Indica,** Vol. V. pp. 184.

"যেনাপাস্ত-সমস্ত-শস্ত্র-সময়ঃ সংগ্রামভূমৌ রিপু-
শ্চক্রে বঙ্গ-করীন্দ্র-সঙ্গ-বিষমে সাটোপ-যুদ্ধোৎসবে।
যেনাত্যর্থময়ং স্বয়ং সফলিত স্ত্রৈলোক্যসিংহো বিধিঃ
সাংভুস্তাস্কর-বংশ-রাজতিলকো রায়ারিদেবো নৃপঃ॥"

করিয়াছিলেন; হূণগণ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দে পূর্ব্ব-ইউরোপ এবং দক্ষিণ-এসিয়া ধ্বস্তবিধ্বস্ত করিয়াছিলেন; খৃষ্টীয় নবম হইতে পঞ্চদশ শতাব্দ পর্য্যন্ত তুরুষ্কগণ এবং [তাঁহাদের জ্ঞাতি] মোগলগণ, অবিরলধারে দলে দলে আসিয়া, ক্রমে আরব-সাম্রাজ্য, রোম-সাম্রাজ্য, চীন-সাম্রাজ্য এবং আরও অনেক প্রাচীন রাজ্য এবং প্রাচীন সভ্যতা বিনষ্ট করিয়াছিলেন। কি এসিয়ায়, কি ইউরোপে, সুসভ্য স্থির-নিবাস কৃষি-জীবি জনগণ কখনও মরুভূমির কঠোরকর্ম্মী চঞ্চল সন্তানগণের আক্রমণবেগের গতিরোধ করিতে পারে নাই। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দের সূচনা হইতে, যাহাদিগের আক্রমণ-প্রবাহ উত্তরাপথে প্রধাবিত হইয়া, ক্রমে হিন্দু-স্বাধীনতা বিলুপ্ত এবং হিন্দু-সভ্যতা ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহারা তুরুষ্ক-জাতীয়। মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী হইলেও, জাতীয় চরিত্রের প্রেরণাই তাহাদিগকে ভারত-আক্রমণে ব্রতী করিয়াছিল; এবং আদি-নিবাসভূমির কঠোর শিক্ষা তাহাদিগকে শস্য-শ্যামলা ভারতমাতার আদরে লালিত পালিত সন্তানগণের পক্ষে দুর্জ্জেয় করিয়া তুলিয়াছিল। উত্তরাপথের একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দের রাজনীতিক অবস্থা—ঐক্যবিধানক্ষম সার্ব্বভৌম-নৃপতির অভাব, এবং অন্তর্দ্রোহ. আক্রমণকারিগণের পথের প্রকৃত বাধা অন্তর্হিত করিয়া রাখিয়াছিল।

গজনীর সুলতান মামুদের মৃত্যুর অনতিকাল পরেই, সেল্‌জুকিয়া-তুরুষ্কগণ, মধ্য-এসিয়া হইতে বিনির্গত হইয়া মামুদের সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশ কাড়িয়া লইয়া, গজনী-রাজ্যের তুরুষ্কগণকে হীনবল এবং তুরুষ্ক-প্রবাহের প্রস্রবণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু তথাপি তাহারা পঞ্জাবের পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। সুলতান মসুদের সময়, আহম্মদ নিয়াল্‌তিগীন্ কর্ত্তৃক বারানসী-আক্রমণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। মসুদের উত্তরাধিকারী সুলতান ইব্রাহিম (১০৫৮—১০৯৯ খৃষ্টাব্দ) সেল্‌জুক-সম্রাট্ মালিক শাহের তনয়ার সহিত স্বীয় তনয়ের বিবাহ দিয়া, রাজ্যের পশ্চিম প্রান্ত সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া, পুনঃ পুনঃ হিন্দুস্থান আক্রমণ করিয়া, অনেকগুলি স্থান এবং দুর্গ হস্তগত করিয়াছিলেন।* আলাউদ্দিন মসুদের সময় (১০৯৯—১১১৬ খৃষ্টাব্দ), "তুঘাতিগিন্ হিন্দুস্থানে [বিধর্ম্মিগণের সহিত] ধর্ম্ম-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার জন্য, গঙ্গা পার হইয়াছিলেন; এবং এমন একস্থান পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, যেথানে সুলতান মামুদ ভিন্ন, আর কেহ কখনও সসৈন্য উপনীত হইতে পারেন নাই।" † সুলতান বহরাম শাহ (১১১৮—১১৫৮ খৃষ্টাব্দ), সেল্‌জুক-সুলতান সঞ্জরের প্রসাদে গজনীর সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সময়ে ঘোরের অধিপতি আলাউদ্দীন একবার গজনীনগর ভস্মসাৎ করিয়াছিলেন। তিনিও হিন্দুস্থানে ধর্ম্ম-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। ‡

সুলতান মামুদের মৃত্যুর পরে, একাদশ শতাব্দে, পঞ্জাব এবং গৌড়-রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের শাসন-ভার যাঁহাদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল, তাঁহাদিগের গজনী-রাজ্যবাসী তুরুষ্কগণের আক্রমণ-বেগ সহ্য করিবার শক্তি ছিল কিনা সন্দেহ। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দে এক দিকে গজনীরাজ্য যেমন নিতান্ত শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছিল, অপর দিকে শাকম্ভরীর (আজমীরের) চৌহান-রাজগণ এবং কান্যকুব্জের গাহড়বাল-রাজগণ তেমনি পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সময় যদি চৌহান এবং গাহড়বাল মিলিত হইতে পারিতেন, তবে বোধ হয় অনায়াসে উত্তরা-পথের সিংহদ্বার শত্রুশূন্য করিতে পারিতেন। কিন্তু, একশত বৎসরের মধ্যে কখনও ইঁহারা সম্মিলিত হইয়া শত্রুর সম্মুখীন হইবার অবসর পাইয়াছিলেন না; অবশেষে মুইজুদ্দিন মহম্মদ ঘোরী আসিয়া, একে একে উভয় রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিলেন। দুর্ব্বল গজনবী-তুরুষ্কগণও গাহড়বাল এবং চৌহান-রাজগণকে বিশ্রাম দিয়াছিলেন না। বহরাম শাহ সম্ভবত বারাণসী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন।

---

*Raverty's "Tabakat-i-Nasiri", p 105, note 4.

†Ibid, p. 107.

‡Ibid, p. 110.

কুমরদেবীর সারনাথের শিলালিপিতে উক্ত হইয়াছে—গাহড়বাল-রাজ গোবিন্দচন্দ্র (+১১১৪—১১৫৪+খৃষ্টাব্দ) মহাদেব কর্ত্তৃক "দুষ্ট তুরুষ্ক-সৈন্যের হস্ত হইতে বারানসী রক্ষা করিবার জন্য" [বারাণসীং.........দুষ্ট-তুরুষ্ক-সুভটা-দবিতুং] নিযুক্ত হইয়াছিলেন। * তুরুষ্ক-সৈন্যের হস্ত হইতে গোবিন্দচন্দ্র যে বারাণসীর উদ্ধার-সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু বারাণসী রক্ষা করিয়াই, তাঁহার তৃপ্ত হওয়া উচিত ছিল কি ?

চৌহান-রাজ বীসলদেব, এবং গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র গাহড়বাল-রাজ বিজয়চন্দ্রকেও, গজনবী-তুরুষ্কগণের আক্রমণ-বেগ সহ্য করিতে হইয়াছিল। ১২২০ সম্বতের [১১৬৪ খৃষ্টাব্দের] দিল্লী-শিবালিক স্তম্ভ-লিপিতে উক্ত হইয়াছে—চৌহান-রাজ বীসলদেব

"আর্য্যাবর্ত্তং যথার্থং পুনরপি কৃতবান্ ম্লেচ্ছ-বিচ্ছেদনাভিঃ" † "ম্লেচ্ছ নাশ করিয়া, আর্য্যাবর্ত্তের নাম পুনরায় যথার্থ করিয়াছিলেন।" প্রশস্তিকার হয়ত এখানে চৌহানরাজ্য-অর্থে "আর্য্যাবর্ত্ত" শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। কারণ, বীসলদেব বা অন্য কোন হিন্দু-নরপতি কখনও পঞ্জাব আক্রমণ করিয়াছিলেন, গজনবী সুলতানগণের ইতিহাসে এরূপ আভাস পাওয়া যায় না। ১২২৪ সম্বতের [১১৬৮ খৃষ্টাব্দের] গাহড়বাল-রাজ বিজয়চন্দ্রের [কমৌলীতে প্রাপ্ত] তাম্রশাসনে তিনি

"ভুবন-দলন-হেলাহর্ম্ম্য হম্মীর-নারী
নয়নজলদ-ধারা-ধৌত-ভূলোক-তাপঃ" ‡

"হেলায় ভুবনদলক্ষম হম্মীরের নারীগণের নয়ন-জলধারা দ্বারা ভূলোকের তাপ-ধৌতকারী" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। "হম্মীর" এ স্থলে আমীর বা গজনবী-সুলতান অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। চৌহান বীসলদেব এবং গাহড়বাল বিজয়চন্দ্রের সময়ের গজনবী-সুলতান খুসরু শাহ, গজনী হইতে তাড়িত হইয়া আসিয়া, লাহোরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ দুরবস্থায় পতিত হইয়াও, তিনি তুরুষ্কের স্বভাবগত অগ্রগমনশীলতা ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন না ; সম্ভবত চৌহান এবং গাহড়বাল, এই উভয় রাজ্যই, একবার একবার আক্রমণ করিয়াছিলেন। তুরুষ্ক-যোদ্ধৃগণ এযাবৎ গাহড়বাল-রাজ্য জয় করিতে অসমর্থ হইলেও, তুরুষ্ক-ঔপনিবেশিকগণ রাজ্যের নানা স্থানে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। গাহড়বাল-রাজ চন্দ্র-দেবের, মদনচন্দ্রের, গোবিন্দচন্দ্রের এবং বিজয়চন্দ্রের অনেক তাম্রশাসনে "তুরুষ্ক-দণ্ড" নামক রাজকরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। "তুরুষ্ক-দণ্ড" নাম হইতে বুঝিতে পারা যায়,—তুরুষ্ক-প্রজাগণকে এই বিশেষ কর প্রদান করিতে হইত।

১১৬৮ কি ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে, শেষ গজনবী-সুলতান খুসরু-মালিক, লাহোরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন ; ১১৭০ খৃষ্টাব্দে গাহড়বাল জয়চন্দ্র কান্যকুব্জের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন ; ১১৭০ হইতে ১১৮২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে, চৌহান দ্বিতীয় পৃথ্বিরাজ আজমীরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন ; এবং ১১৭৩ খৃষ্টাব্দে সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন ঘোরী গজনীনগর অধিকার করিয়া, অনুজ মুইজুদ্দীন মহম্মদ ঘোরীকে সুলতান মামুদের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মহম্মদ-ঘোরী পরাজয়েও পরাঙ্মুখ না হইয়া, কেমন করিয়া একে একে এই সকল প্রতিদ্বন্দীকে বিনাশ করিয়া হিন্দুস্থানে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণন এখানে নিষ্প্রয়োজন। লাহোরের সুলতান, দিল্লী ও আজমীরের চৌহানরাজ এবং কনোজের গাহড়বালরাজ [সমবেত ভাবে না হউক] স্বতন্ত্র ভাবে আক্রমণকারীর গতিরোধার্থ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের দমনার্থ মহম্মদ ঘোরীকে পুনঃ পুনঃ গজনী ত্যাগ করিয়া হিন্দুস্থানে আসিতে হইয়াছিল। কিন্তু শশাঙ্ক, ধর্ম্মপাল দেবপাল এবং মহীপালের গৌড়রাষ্ট্র [একরূপ নির্ব্বিবাদে]

* **Epigraphia Indica,** Vol. IX, p. 324.

† **Indian Antiquary,** Vol. XIX, p. 215. মনুসংহিতার (২৷২২ শ্লোকের) ভাষ্যে মেধাতিথি আর্য্যাবর্ত্তের এইরূপ অর্থ লিখিয়াছেন—"আর্য্যা বর্ত্তন্তে যত্র ;পুনঃ পুনরুদ্ভবন্ত্যাক্রম্যাপি ন চিরং যত্র ম্লেচ্ছাঃ স্থাতারো ভবন্তি।" প্রশস্তিকার এইরূপ অর্থেই এখানে আর্য্যাবর্ত্ত-শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন।

‡ **Epigraphia Indica,** Vol. IV, p. 119.

মহম্মদঘোরীর একজন দাসানুদাসকে রাজপদে বরণ করিয়াছিল।

মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার নামক খল্‌জ্‌ বা খিলজি বংশীয় একজন তুরুস্ক, মুইজুদ্দীন মহম্মদের সেনাশ্রেণীতে কর্ম্মের অনুসন্ধানে, গজনী গমন করিয়াছিলেন। মহম্মদের চেহারা পছন্দসহি না হওয়ায়, সেনাসংগ্রহ-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী তাঁহাকে একটি অল্প বেতনের কর্ম্ম দিতে চাহিয়াছিলেন। মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার প্রস্তাবিত কর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া হিন্দুস্থানে—দিল্লীতে গমন করিলেন। মহম্মদ ঘোরীর প্রতিনিধি কুতবুদ্দীন তখন দীল্লিতে অবস্থান করিতেছিলেন। দিল্লীতেও মহম্মদের আকৃতি তাঁহার মনোমত পদপ্রাপ্তির অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। হতাশ হইয়া, মহম্মদ অযোধ্যায় গিয়া, মালিক হুসামুদ্দীন আগুলবকের শরণাগত হইলেন। হুসামুদ্দীন মহম্মদের ক্ষিপ্রকারিতার এবং সাহসের পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে "ভগবত" এবং "ভিউলি" নামক দুইটি পরগণা জায়গীর দান করিয়াছিলেন। মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের জায়গীর দক্ষিণ বিহার বা মগধের পশ্চিম সীমা কর্ম্মনাশা নদীর পশ্চিমে, চুনারগড়ের নিকটে, অবস্থিত ছিল। এখান হইতে মহম্মদ মাঝে মাঝে মগধে (বিহারে) প্রবেশ করিয়া গ্রাম লুটপাট আরম্ভ করিলেন; এবং লুণ্ঠিত অর্থের দ্বারা ক্রমশঃ যুদ্ধের অশ্ব, অস্ত্রশস্ত্র, এবং সেনা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বীরত্বের খ্যাতি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইলে, হিন্দুস্থানের যত খল্‌জ্‌ বা খিলজি-বংশীয় তুরুস্ক ছিল, তাহারা আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইল। সুলতান কুতবুদ্দীন মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের সুখ্যাতি শুনিয়া, তাঁহাকে খিলাত পাঠাইয়া দিলেন। প্রোৎসাহিত হইয়া মহম্মদ পুনঃ পুনঃ "বিলায়ৎ বিহার" আক্রমণ করিয়া, অনেক স্থান লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। "এক দো সাল" এইরূপ আক্রমণ ও লুণ্ঠন চলিল।

অবশেষে মহম্মদ বিহার দুর্গ অধিকার করিতে মনস্থ করিলেন। এই "কিল্লা-বিহার" পাটনা জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান বিহার মহকুমার প্রধান নগর বিহার বলিয়া অনুমিত হয়। মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার কর্ত্তৃক "বিহার-দুর্গ", এবং তৎপর বৎসর, "নোদিয়া" অধিকারের সময় লইয়া, পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। রেভার্টির মতে, মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে বিহার দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন।* ব্লকম্যান এই ঘটনা ১১৯৭ কি ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপন করিতে চাহেন। ব্লকম্যানের অনুমানই সমীচীনতর বোধ হয়। "বিহার" এবং "নোদিয়া" অধিকারের বিবরণ সম্বন্ধে আমাদের প্রধান অবলম্বন—মিন্‌হাজুদ্দীনের "তবকাত্‌-ই-নাসিরি" নামক পারস্য ভাষায় রচিত ইতিহাস গ্রন্থ।

১১৯৩ খৃষ্টাব্দে, কুতবুদ্দীন কর্ত্তৃক দিল্লী অধিকারের বৎসরে, মিন্‌হাজুদ্দীন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং সুলতান ইয়াল্‌ তিমিসের এবং তাঁহার বংশধরগণের রাজত্বকালে, প্রথমে গোয়ালিয়রের এবং পরে দিল্লীর প্রধান কাজির পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১২৪২ খৃষ্টাব্দে প্রধান কাজির পদ ত্যাগ করিয়া, মিন্‌হাজুদ্দীন বাঙ্গলায় আসিয়াছিলেন; এবং এখানে দুই বৎসরকাল অবস্থান করিয়া, দিল্লী ফিরিয়া গিয়াছিলেন। এই সুযোগেই, মিন্‌হাজ বিহার এবং বাঙ্গালার তৎকালীন ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। "বিহার" এবং "নোদিয়া" অধিকারের ৪৫ বৎসর পরে, বিবরণ-সঙ্কলনে ব্রতী হইয়া মিন্‌হাজুদ্দীন বৃদ্ধ সৈনিক এবং "বিশ্বস্ত লোকের" মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মিন্‌হাজুদ্দীন যখন "তবকাত্‌" রচনায় প্রবৃত্ত, তখন অবশ্যই পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের প্রবর্ত্তিত প্রমাণ-পরীক্ষা-রীতি কাহারও জানা ছিল না, এবং তৎকালের জনসাধারণের ন্যায় মিন্‌হাজেরও অতিপ্রাকৃত এবং আজগুবি কথায় বিশ্বাস স্থাপনের প্রবৃত্তি যথেষ্ট ছিল। উপরন্তু, স্বধর্ম্মে অনুরাগ এবং পৌত্তলিকতায় অশ্রদ্ধা, মিন্‌হাজের ন্যায় লেখকগণকে স্বজাতির একান্ত পক্ষপাতী করিয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং মিন্‌হাজবর্ণিত "বিহার" এবং "নোদিয়া" অধিকারের বিবরণ বিশেষ বিচার পূর্ব্বক গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

"বিশ্বাসী লোকের" এবং ঐ ঘটনায় লিপ্ত একজন বৃদ্ধ সৈনিকের মুখের কথা শুনিয়া, মিন্‌হাজুদ্দীন বিহার-

*Raverty's Tabakat-i-Nasiri. App. D.

কিল্লা অধিকারের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার যখন "বিহার" আক্রমণ করেন, তখন তাহার অনুচরগণের মধ্যে নিজামুদ্দীন এবং সমসামুদ্দীন এই দুই ভ্রাতা ছিল। ১২৪৩ খৃষ্টাব্দে মিন্‌হাজুদ্দীন যখন "লখ্‌নাবতী" নগরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন সমসামুদ্দীনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; এবং সমসামুদ্দীনের মুখে যেরূপ শুনিয়াছিলেন, তিনি তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন। বিহার-অধিকার-প্রসঙ্গের সূচনায় মিন্‌হাজুদ্দীন লিখিয়াছেন,—"বিশ্বাসী লোকেরা এইরূপ বলিয়াছেন যে, মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার, দুই শত বর্ম্মাচ্ছাদিত-গাত্র অশ্বারোহী লইয়া, বিহারদুর্গের দ্বারদেশে উপনীত হইয়াছিলেন; এবং হঠাৎ ঐ স্থান আক্রমণ করিয়াছিলেন।" পরে সমসামুদ্দীনের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—আক্রমণকারিগণ দুর্গের দ্বারে উপস্থিত হইলে, "মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার সাহসে ভর করিয়া, দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কিল্লা অধিকার করিয়াছিলেন, এবং বিস্তর দ্রব্য লুণ্ঠিত করিয়াছিলেন। ঐ স্থানের অধিকাংশ অধিবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং ইঁহাদের সকলেরই মস্তক মুণ্ডিত ছিল। তাঁহারা সকলেই নিহত হইয়াছিলেন। ঐ স্থানে অনেকগুলি পুস্তক ছিল। যখন এই সকল পুস্তক মুসলমানগণের নয়নগোচর হইল তখন উহাদের মর্ম্ম বুঝাইবার জন্য তাঁহারা কতকগুলি হিন্দুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন; কিন্তু সমস্ত হিন্দুই নিহত হইয়াছিল। যখন তাঁহারা [প্রকৃত কথা] জানিতে পারিলেন, তখন দেখা গেল—"তামাম হিসার (দুর্গ) ও সহর একটা বিদ্যালয়, এবং হিন্দী ভাষায় বিদ্যালয়কে (মাদ্‌রাসাকে) 'বিহার' বলে।" *

এস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়,—মিন্‌হাজুদ্দীন "কিল্লা বিহার" অধিকারের প্রকৃত বিবরণ জানিতে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার বিবরণ সম্পূর্ণ নির্ভর-যোগ্য। কিন্তু তিনি যে শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাদের পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি যে কত দুর্ব্বল, তাহার দুইটি প্রমাণ পাওয়া গেল। তাহারা একটি বৌদ্ধবিদ্যালয়কে "কিল্লা' বলিয়া ভ্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিল; এবং অনুসন্ধান করিয়াও, তাহারা ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই যে—মুণ্ডিত মস্তক বিহারবাসীরা ব্রাহ্মণ নহে, বৌদ্ধ শ্রমণ।

মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার "কিল্লা-বিহার" লুণ্ঠন করিয়া, বহু ধন লাভ করিয়াছিলেন। যে বৌদ্ধবিহার আক্রমণ-কারিগণের নিকট কিল্লা এবং সহর বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহাতে যে বহু কালের বহু ভক্ত-জনের প্রদত্ত বহু অর্থ সঞ্চিত থাকিবে, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি? মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার এই লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া, স্বয়ং দিল্লীতে কুতবুদ্দীন আইবকের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। কুতবুদ্দীন তাঁহাকে বহু সম্মান করিয়াছিলেন। মিন্‌হাজ লিখিয়াছেন,—মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিয়া, "বিহার জয় করিয়াছিলেন [বিহার ফতে কর্‌দ]"। এই "বিহার ফতের" কথাটা অতি সাবধানে গ্রহণ করিতে হইবে। "বিহার" বলিতে এখন আমরা যাহা বুঝি, মিন্‌হাজুদ্দীন সে অর্থে বিহার-শব্দের ব্যবহার করেন নাই। তিনি সুলতান ইয়াল্‌তি-মিসের রাজত্বের বিবরণের শেষে, বিজিত প্রদেশ-সমূহের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে "বিহার" এবং "তিরহুত" স্বতন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে। মিন্‌হাজের "বিহার" দক্ষিণ বিহার বা সাহাবাদ, পাটনা, গয়া, মুঙ্গের, এবং ভাগলপুর জেলা। মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার তিরহুত জয় করা দূরে থাকুক, কোন দিন উহার কোন অংশ আক্রমণও করিয়াছিলেন না। যাঁহার শৈথিল্যে বা দুর্ব্বলতায়, দক্ষিণ-বিহার মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের ন্যায় সামান্য জায়গীরদার কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত লুণ্ঠিত এবং অবাধে বিজিত হইতে পারিয়াছিল, সেই "গৌড়েশ্বরের" রাজধানীতে "বিহার ফতের" কাহিনী ঘোর আতঙ্ক উপস্থিত করিয়া, নির্বিরোধে বরেন্দ্র এবং রাঢ়দেশ অধিকারের পথ পরিষ্কার করিয়া থাকিবে।

মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের অভ্যুদয়-কালে, যিনি উত্তরা-পথের পূর্ব্বাংশের প্রধান নরপাল বা "গৌড়েশ্বর" [মিন্‌হাজের ভাষায় "হিন্দের রায়গণের পুরুষানুক্রমিক খালিফাস্থানীয়"] ছিলেন, মিন্‌হাজুদ্দীন তাঁহাকে "রায় লখ্‌মনিয়া" এবং তাঁহার "দার-উল্‌-মুল্‌ক্‌" বা রাজধানীকে

*Raverty's Tabakat-i-Nasiri, pp. 551—552.

"সহর নোদিয়া" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। মিন্হাজ "রায় পিথোরার" [চৌহান-রাজ পৃথ্বীরাজের] এবং "রায় জয়চাঁদের" [গাহড়বাল-রাজ জয়চন্দ্রের] নামোল্লেখ মাত্র করিয়াছেন, কিন্তু "রায় লখ্মনিয়ার" জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করিতেও যত্ন পাইয়াছেন; তাঁহার শাসনরীতির সুখ্যাতি করিয়াছেন; দানশীলতার জন্য তাঁহাকে "সুলতান করিম কুতবদ্দীন হাতেমুজ্জমান" বা সেই যুগের হাতেম কুতবুদ্দীনের সহিত তুলনা করিয়াছেন; এবং উপসংহারে পৌত্তলিক-বিদ্বেষ বিস্মৃত হইয়া, আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন;—"আল্লা [নরকে] তাঁহার শাস্তির লাঘব করুন।"* এই "রায় লখ্মনিয়া" কে, তদ্বিষয়ে পণ্ডিত-সমাজে বিস্তর মতভেদ আছে। মিন্হাজুদ্দীনের "রায় লখ্মনিয়া" গৌড়াধিপ লক্ষ্মণসেনের নামের অপভ্রংশ বলিয়াই বোধ হয়। মিন্হাজুদ্দীন লখ্মনিয়ার যে জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা তিনি "বিশ্বাসী লোকের" উক্তি (সেফাৎ রোয়াৎ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জনশ্রুতির বাহক এই সকল "বিশ্বাসী লোক" যাঁহাকে ভক্তির চক্ষে দেখেন, তাঁহার জীবনীকে অনেক অলৌকিক ঘটনায় সাজাইতে ভালবাসেন। মিন্হাজুদ্দীন-লিখিত লক্ষ্মণসেনের জন্মবৃত্তান্ত, জন্মমাত্র রাজ্যাভিষেক, এবং সুদীর্ঘ-রাজ্যশাসন কাহিনী "বিশ্বাসী লোকের" কল্পনা বলিয়াই মনে হয়। তবে মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ারের "নোদিয়া" আক্রমণের সময় লক্ষ্মণসেন ঠিক অশীতিবর্ষীয় না হউন, বার্দ্ধক্যে পদার্পণ করিয়াছিলেন, এ কথা বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

তাহার পর জিজ্ঞাস্য—"সহর নোদিয়হ্" কোন্ খানে ছিল? আবুল্ ফজল্ মিন্হাজের 'নোদিয়হ্কে" "নদীয়া" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বাঙ্গালায় সংস্কৃত-চর্চ্চার গুরুস্থান নবদ্বীপই যে লখ্মনিয়ার "নদীয়া" তাহার আভাস দিয়াছেন।† আবুল্ ফজলের মতই এখন সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করিয়াছে। কিন্তু আবুল্ ফজলের সময়েও, সকলে "নোদিয়হ্"কে "নদীয়া" বলিয়া মনে করিত না। "মুন্তখাব্-উৎ-তওয়ারিখ"-গ্রন্থে আবদুল কাদির বেদৌনি মিন্হাজের "নোদিয়হ্"কে "নোদীয়া" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।‡ সংস্কৃত সাহিত্যে, লক্ষ্মণসেনের দুইটি স্বতন্ত্র রাজধানী, 'বিজয়পুর' এবং 'লক্ষ্মণাবতীর' উল্লেখ পাওয়া যায়। "পবনদূতে" ধোয়ী কবি সুহ্ম বা রাঢ়দেশের বর্ণনা করিয়া এবং

"ভাগীরথ্যা স্তপনতনয়া যত্র নির্য্যাতি দেবী" (৩৩)

সেই মুক্তবেণী (ত্রিবেণীর) উল্লেখ করিয়া,

"স্কন্ধাবারং বিজয়পুর মিত্যুন্নতাং রাজধানীং" (৩৭)

বর্ণন করিয়াছেন। "প্রবন্ধচিন্তামণি"-গ্রন্থে মেরুতুঙ্গ আচার্য্য লিখিয়াছেন,—"গৌড়দেশে লক্ষ্মণাবতী নগরে—লক্ষ্মণসেন নামক রাজা দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।" মিন্হাজ লিখিয়াছেন, § "মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ার ঐ (রায় লখ্মনিয়ার) মুল্লুক সকল (মমল্কৎ) দখল (জব্ত) করিয়া সহর নোদিয়হ্কে "খরাব" করিলেন, এবং যে মৌজা [এখন] লখ্ণাবতী, তাহার উপর রাজধানী (দার-উল্-মুল্ক্) স্থাপন করিলেন।" এখানে দেখা যায়—মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ার যেন লখ্ণাবতী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। "লখ্ণাবতী" লক্ষ্মণাবতীর অপভ্রংশ। মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ার যে ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ স্থানের নাম "লক্ষ্মণাবতী" রাখিয়াছিলেন, এমন সম্ভব নহে। ঐ স্থানের নাম আগেই "লক্ষ্মণাবতী" ছিল, এবং উহাই লক্ষ্মণসেনের অন্যতম রাজধানী ছিল। সেনরাজগণের কীর্ত্তিচিহ্ন সেখান হইতে এখনও লুপ্ত হয় নাই। কিম্বদন্তী অনুসারে, লখ্ণাবতী বা গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের সমীপবর্ত্তী বিশাল সাগরদীঘি লক্ষ্মণসেন খোদাইয়াছিলেন; এবং সাগরদীঘির অনতিদূরস্থিত একটি প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও "বল্লালগড়" নামে কথিত হইয়া আসিতেছে। লক্ষ্মণসেনের অপর রাজধানী "বিজয়পুর" মিন্হাজুদ্দীন কর্ত্তৃক "নোদিয়হ্" নামে অভিহিত হইয়া থাকিতে পারে। "পবনদূতের" প্রকাশক প্রবীণ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী "নোদিয়হ্"

*__Raverty__, pp. 554—556. __Text__, pp. 148—149.

†__Jarrett's Ain-i-Akbari__, Vol. II, p 148.

‡__Text (Bibliotheca Indica)__, Vol. I p. 58.

§__Raverty's Tabakat-i-Nasiri__, p. 569 ; __Text__, p. 151.

এবং "নদীয়া" অভিন্ন মনে করিয়া, নদীয়াই বিজয়পুর এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু রাজসাহী জেলার রামপুর বোয়ালিয়া সহরের ১০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত [জনশ্রুতি অনুসারে] কুমার রাজার রাজধানী "কুমার পুরের" নিকটবর্ত্তী বিজয় রাজার রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষপূর্ণ "বিজয়নগর"ই পবনদূতের 'বিজয়পুর' বলিয়া বোধ হয়। বিজয়সেনের নামানুসারে যে বিজয়পুরের নামাকরণ হইয়াছিল, এ বিষয়ে সংশয় নাই; এবং 'বিজয়নগরে'ও জনশ্রুতি অনুসারে এক বিজয় রাজা ছিল। দানসাগর-মতে বিজয়সেনের প্রাদুর্ভাব-স্থানে [বরেন্দ্রেই] "বিজয়-নগর" অবস্থিত এবং ইহার ৭ মাইল ব্যবধানে বিজয়সেনের শিলালিপির প্রাপ্তি স্থান "দেবপাড়া" অবস্থিত। দেবপাড়ার 'পদ্মসহর' নামক তল্ল বিজয়সেনের প্রতিষ্ঠিত প্রদ্যুম্নেশ্বরের স্মৃতি এখনও জাগ্রত রাখিয়াছে, এবং "পদ্মসহরের" তীরে একটি বৃহৎ দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। সুতরাং বিজয়নগরকে বিজয়পুর বলিয়া গ্রহণ করাই সমীচীন বোধ হয়। বিজয়নগর লক্ষ্মণাবতীর ভগ্নাবশেষ হইতে ৪৫ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত; নদীয়া ১১০ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। মিন্‌হাজের বর্ণনানুসারে 'লখ্‌নাবতী' হইতে 'নোদিয়া' খুব বেশী দূরে অবস্থিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না, এবং এই নিমিত্ত বিজয়নগরকেই "নোদিয়াহ্" বলিতে প্রবৃত্তি হয়।

মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার কর্ত্তৃক "কিল্লা-বিহার" অধিকারের বিবরণ সঙ্কলনে ব্রতী হইয়া, মিন্‌হাজুদ্দীন যেমন সেই ব্যাপারে স্বয়ং লিপ্ত একজন বৃদ্ধ সৈনিকের সাক্ষ্য গ্রহণে সমর্থ হইয়াছিলেন, "নোদিয়াহ্" অধিকার সম্বন্ধে তেমন কোন সাক্ষাৎ দ্রষ্টার মুখের কথা শুনিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়া যান নাই। "নোদিয়াহ্" অধিকার-ব্যাপারে তাঁহার একমাত্র অবলম্বন "বিশ্বাসযোগ্য লোকের" উক্তি। এই সকল "বিশ্বাসযোগ্য লোকেরা", অর্থাৎ ১২৪২—১২৪৩ খৃষ্টাব্দের লখ্‌নাবতীর তুরুষ্ক রাজপুরুষগণ, মিন্‌হাজকে মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের এবং তাহার অনুচর-গণের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সম্ভবত খাটি খবরই দিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের "নোদিয়াহ্" প্রবেশের পূর্ব্বে এবং তাঁহার পরোক্ষে নোদিয়ায় যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে ইঁহাদের প্রদত্ত বিবরণ তত নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হইতে পারে না। সুতরাং মিন্‌হাজুদ্দীনের বর্ণিত মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার কর্ত্তৃক অধিকারের পূর্ব্বের নোদিয়া-বিবরণ বিশেষ বিচার পূর্ব্বক গ্রহণ করা কর্ত্তব্য; এবং যুক্তিবিরুদ্ধ অংশ অমূলক গুজব বলিয়া উপেক্ষনীয়। মিন্‌হাজ লিখিয়াছেন, "যখন মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার কর্ত্তৃক "বিহার ফতে" হওয়ার সংবাদ রায় লখ্‌মনিয়ার রাজ্যের "আত্রাফে" পহুঁছিল, তখন এক দল জ্যোতিষী ব্রাহ্মণ-রাজমন্ত্রী রাজার নিকট গিয়া নিবেদন করিল যে, পুরাকালের ব্রাহ্মণগণের পুস্তকে লেখা আছে যে, এই দেশ তুরুষ্কগণের হস্তগত হইবে; এবং এই শাস্ত্রীয় ভবিষ্যৎবাণী সফল হইবার সময়ও আসিয়াছে। সুতরাং সকলেরই এ দেশ হইতে পলায়ন করা উচিত। শাস্ত্রে লেখা ছিল, আজানুলম্বিতবাহু একজন তুরুষ্ক দেশ অধিকার করিবে। মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার আজানুলম্বিতবাহু কি না, দেখিয়া আসিবার জন্য রাজা বিশ্বাসী চর পাঠাইলেন; চরেরা আসিয়া বলিল, মহম্মদ বখ্‌তিয়ার যথার্থই আজানুলম্বিতবাহু। যখন এই সংবাদ নোদিয়ায় প্রচারিত হইল, তখন "ঐ মৌজার" ব্রাহ্মণগণ এবং সাহাগণ (ব্যবসায়ীগণ) সঙ্কনতে, বঙ্গে, এবং কামরূপে (কামরূদে) চলিয়া গেল। কিন্তু রাজ্য ছাড়িয়া যাওয়া রায় লখ্‌মনিয়ার পছন্দ "মাফিক" হইল না। সুতরাং মিন্‌হাজের মতে, যাঁহার খান্দানকে (বংশকে) হিন্দের "রাইয়ান্" বা রাজগণ "বুজুর্গ" মনে করিত, এবং হিন্দের খলিফা বলিয়া স্বীকার করিত, এবং যাঁহার ফরজন্দান্ [বংশধরগণ] "তবকত-ই-নাসিরি" রচনার সময় [১২৬০ খৃষ্টাব্দ] পর্য্যন্ত বঙ্গের শাসনকর্ত্তা ছিল, সেই রায় লখ্‌মনিয়া একটি বৎসর জনশূন্য নদীয়ায় পড়িয়া রহিলেন।

"দোয়ম সাল (পরের বৎসর) মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার লস্কর প্রস্তুত করিয়া, বিহার হইতে ধাবিত হইলেন; এবং সহসা নদীয়া সহরের নিকট এমন ভাবে উপস্থিত হইলেন যে, ১৮ জনের বেশী সওয়ার (অশ্বারোহী) তাঁহার সঙ্গে

ছিল না; এবং "দিগর লস্কর" পশ্চাতে আসিতেছিল। যখন মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার সহরের দরজায় পহুছিলেন, কাহাকেও আঘাত করিলেন না, ধীর, স্থির ভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কেহ মনে করিল না, ইনি-মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার; লোকে অনুমান করিল, হয়ত একদল সওদাগর বিক্রয় করিবার জন্য ঘোড়া আনিয়াছে। যখন রায় লখ্‌মনিয়ার বাড়ীর (সরাই) দরজায় পহুঁছিলেন তখন তলোয়ার খুলিয়া হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

"তখন রায় লখ্‌মনিয়া আহারে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট সঠিক খবর পহুঁছিবার পূর্ব্বেই, মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়াছিলেন। তখন বৃদ্ধ রায় নগ্নপদে বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগ দিয়া বাহির হইয়া, সঙ্কনাতে ও বঙ্গে প্রস্থান করিলেন। তথায় অল্পকাল পরেই তাঁহার রাজত্বের পরিসমাপ্তি হইয়াছিল।"*

লক্ষ্মণসেনের কাপুরুষতায় বাঙ্গালা তুরুষ্কের পদানত হইল, ইদানীং অনেকেই এ কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু মিন্‌হাজুদ্দীন যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রতি অক্ষরও যদি সত্য হয়, তাহা হইলে লখ্‌মনিয়াকে বা লক্ষ্মণসেনকে "কাপুরুষ" না বলিয়া, বীরাগ্রগণ্য বলিয়া পূজা করাই সঙ্গত। শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, সকলে নোদিয়া ছাড়িয়া সুদূর কামরূপে ও বঙ্গে পলায়ন করিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ বীর লখ্‌মনিয়া নোদিয়া ছাড়িয়া এক পদও নড়িলেন না, একটি জনশূন্য রক্ষিশূন্য রাজধানীতে একটি বৎসর শত্রুর প্রতীক্ষায় রহিলেন। যখন শত্রু আসিল, তখন যে অপাত্রের হস্তে নগরদ্বার-রক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছিল, তাহারা তুরুষ্ক সওয়ারগণকে ঘোড়ার সওদাগর ভ্রমে বাধা দিল না। সতত শত্রুরপ্রতীক্ষাকারী নগরদ্বার-রক্ষকগণ সশস্ত্র অশ্বারোহীদিগকে ঘোড়ার সওদাগর ভ্রমে নগর প্রবেশ করিতে দেয়, মিন্‌হাজুদ্দীন ভিন্ন আর কোন ঐতিহাসিক,এরূপ অদ্ভুত ঘটনা বর্ণনার অবসর পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। যখন রাজভবনে প্রবেশ করিয়া মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার হত্যাকাণ্ড আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন খবর পাইয়া, যদি রক্ষকহীন অশীতিবর্ষের বৃদ্ধ রাজা সরিয়া যাওয়া সঙ্গত মনে করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে কাপুরুষ বলা যায় না।

তথাপি লক্ষ্মণসেনের "নোদিয়া" হইতে পলায়ন-কাহিনী প্রকৃত ঘটনা বলিয়া স্বীকার করা যায় না;— তাহা অজ্ঞ লোকের পরিকল্পিত উপকথা মাত্র। বিশ্বরূপ এবং কেশব নামক লক্ষ্মণসেনের অন্যূন দুইটি পুত্র ছিল; তিনি যাঁহাকে বাল্যে রাজপণ্ডিত-পদ, যৌবনে প্রধান মন্ত্রিপদ, এবং যৌবনান্তে যৌবনশেষযোগ্য ধর্ম্মাধিকারির পদ প্রদান করিয়াছিলেন, হলায়ুধের ন্যায় এরূপ হাতেগড়া অমাত্য ছিল; এবং তিনি যাঁহাদিগকে লইয়া কাশী হইতে কামরূপ পর্য্যন্ত যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, এরূপ সৈন্যসামন্তও ছিল। মিন্‌হাজ লখ্‌মনিয়াকে যেরূপ প্রজারঞ্জনকারী এবং দানশীল রাজা বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি অনেকের ভক্তিও আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সুতরাং, এরূপ নৃপতিকে বার্দ্ধক্যে সকলে দল বাঁধিয়া শত্রুর দ্বারা পদদলিত হইবার জন্য "নোদিয়ায়" ফেলিয়া আসিবে, এবং এক বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার কোন খোজ খবর লইবে না, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। অনুমান হয়—যখন "ব্রাহ্মণগণ" এবং "ব্যবসায়িগণ" নোদিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন," নোদিয়ার অধীশ্বরও তখনই রাজধানী ত্যাগ করিয়া বঙ্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার কর্ত্তৃক এরূপ নির্ব্বিবাদে পশ্চিম-বরেন্দ্র অধিকারের প্রকৃত কারণ এই যে, যখন মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার কর্ত্তৃক মগধ আক্রমণের সংবাদ বিজয়পুরে পহুছিয়াছিল, তখনই হয়ত ভয়াতুর মন্ত্রিবর্গের উপদেশে লক্ষ্মণসেন (পূর্ব্ব) বঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; এবং তাহার অনতিকাল পরে [তুরুষ্ক নায়কের "দোয়ম সালে", নোদিয়া আক্রমণের পূর্ব্বে] পরলোক গমন করিয়া থাকিবেন। লক্ষ্মণসেনের বংশধরগণের যে দুইখানি তাম্রশাসন

* **Raverty**, pp. 556—558. **Text**, 150—151.

আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার একখানিতে লক্ষ্মণসেন পাদানুধ্যাত বিশ্বরূপসেনের নাম উৎকীর্ণ রহিয়াছে ; এবং আর একখানিতে অপর একটি নাম বিলুপ্ত করিয়া, লক্ষ্মণ-সেন পাদানুধ্যাত কেশবসেনের নাম উৎকীর্ণ রহিয়াছে। ইহাতে মনে হয়—লক্ষ্মণসেনের অভাবে, সিংহাসন লইয়া পুত্রগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। লক্ষ্মণসেনের পরলোক গমনের অব্যবহিত পরে,—এই ভ্রাতৃবিরোধ বহ্নি প্রধূমিত হইবার সময়ে—মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার পশ্চিম বরেন্দ্র অধিকার করিবার অবসর পাইয়া থাকিবেন।

"যে কালে লক্ষ্মণসেন নীলাচলে চলে।
হিন্দু রাজ্য শেষ হইল যবনের বলে॥" *



* মেঘ-মালা

বিক্রমপুর

অষ্টম অধ্যায়।

মুসলমান শাসনকাল।

অযোধ্যা প্রদেশে যে সকল মুসলমান সৈন্যাধ্যক্ষগণ প্রেরিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে মহম্মদ বখ্‌তিয়ার নামক খিলিজী বংশীয় একজন যুবক বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন; তিনি পরে মগধরাজ্য অধিকার করিয়া বাঙ্গালা আক্রমণ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। সেনরাজ বংশে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

বখ্‌তিয়ার অধিকৃত প্রদেশ দুই ভাগে বিভক্ত করেন। বাগ্‌ড়ির কিয়দংশ এবং বরেন্দ্র ভূমি লইয়া এক ভাগ। দিনাজপুর সন্নিহিত দেব কোটে ইহার রাজধানী। রাঢ় ও মিথিলার কিয়দংশ লইয়া অপর ভাগ; রাজধানী গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী। উত্তর প্রদেশস্থ হিন্দুরাজাদিগের আক্রমণ নিবারণার্থ বখ্‌তিয়ার রঙ্গপুরের দুর্গ নির্ম্মাণ করেন; এবং কুচবিহারের রাজার সহিত বন্ধুত্ব করিয়া কামরূপ এবং তির্ব্বত অধিকার করিতে অগ্রসর হন। কিন্তু কামরূপের রাজার সহিত যুদ্ধে তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য বিনষ্ট হয়; এবং কতিপয় সহচর সঙ্গে দেবকোটে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি অল্পদিন মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

পাঠান শাসনকর্ত্তাগণ মুখে দিল্লীর প্রভুত্ব স্বীকার করিতেন, কিন্তু কার্য্যে প্রায় স্বাধীন ছিলেন। কেহ কেহ প্রকাশ্যরূপে সম্রাটের অধীনতা অস্বীকার করিতে গিয়া বিলক্ষণ প্রতিফল পাইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের শাসন কালে কখন কখন অরাজকতা উপস্থিত হইত, সন্দেহ নাই; কিন্তু রাস্তা নির্ম্মাণ প্রভৃতি শুভকর কার্য্যও মধ্যে মধ্যে অনুষ্ঠিত হইত। বাঙ্গালার পূর্ব্ব এবং দক্ষিণাংশ তাঁহাদিগের হস্তগত হইলে তাঁহারা সমস্ত প্রদেশটীর নাম বাঙ্গালা রাখেন।

লক্ষ্মণাবতী, সুবর্ণগ্রাম এবং সপ্তগ্রাম যথাক্রমে পশ্চিম পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ বিভাগের রাজধানী ছিল। বখ্‌তিয়ার খিলিজীর সময় হইতে ১৩৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সমুদয় দক্ষিণ বেহার ও কখন কখন সারণ পর্য্যন্ত উত্তর বেহার প্রদেশ বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল।

সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্ত্তা বহরমখাঁর মৃত্যু হইলে পর তদনুচর ফকিরুদ্দিন পূর্ব্ব বাঙ্গালার স্বাধীনতা পতাকা উড্ডীন করেন (১৩৩৮) এবং তিনি দশবৎসর রাজত্ব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৎপুত্র গাজিখাঁ সিংহাসনে আরোহন করেন। তাহার শাসনকালে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই।

সেরসা দিল্লীশ্বর হইয়া একবার মাত্র বাঙ্গলায় আসিয়াছিলেন। আসিয়া এদেশকে কয়েক খণ্ডে

বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেক খণ্ডে এক এক জন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। তিনি একজন সমরকুশল সেনাপতি ছিলেন। লোকের হিতকর কার্য্যেও তাহার বেশ মতি ছিল। তিনি উৎপন্নের এক চতুর্থাংশ রাজকর ধরিয়া বাঙ্গালার ভূমির বন্দোবস্ত করেন। সেরসা সুবর্ণগ্রাম হইতে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত একটি রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া তাহার দুই ধারে বৃক্ষ রোপন এবং প্রয়োজনানুরূপ পান্থনিবাস নির্ম্মান ও কূপ খনন করান। তিনিই প্রথমে ভারতবর্ষে ঘোড়ার ডাকের সৃষ্টি করেন। বর্ত্তমানে বিক্রমপুর মুন্সিগঞ্জ হইতে যে প্রশস্ত রাস্তা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই ঘোড় দৌড়ে রাস্তা বলিয়া কথিত হয়, এবং ইহাই সেরসা কর্ত্তৃক সুবর্ণগ্রাম হইতে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমানে প্রাচীন ঘোড় দৌড়ের রাস্তাটির বিক্রমপুরে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। মুন্সিগঞ্জ, রামপাল, বালীগাঁ, বেজগাঁ প্রভৃতি গ্রামগুলির ভিতর দিয়া গিয়াছে। গত সেটেলমেণ্ট জরিপের সময় রাস্তাটির প্রশস্ত প্রায় ৩৪ হাত ছিল; বর্ত্তমানে বিক্রমপুরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকদারগণ তাহা আত্মসাৎ করিতে দ্বিধা বোধ না করিয়া কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছেন। ১৫৪৫ খৃঃ অব্দে সেরসার মৃত্যু হয়।

* **দেশের অবস্থা,**—১৩৩৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৭৫ অব্দ পর্য্যন্ত এদেশে স্বাধীন পাঠান রাজ্য ছিল। পাঠানেরাই এতদ্দেশে মুসলমান জয় পতাকা উড্ডীন করেন।

সে সময়ে তাহারা ১,৪০,০০০ পদাতিক, ৪০,০০০ অশ্বারোহী এবং ২০,০০০ কামান দেখাইতে পারিতেন। তখনও এদেশের অনেকাংশ তাঁহাদিগের হস্তগত হয় নাই। পাঠানদিগের রাজত্ব কালে সাধারণ হিন্দুর অবস্থা কিরূপ ছিল ভাল করিয়া জানা যায় না। কিন্তু সমৃদ্ধিশালী হিন্দু অনেক ছিল এবং তাহারা সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিত এমন বোধ হয়। লিখিত আছে যে, হোসেনসার রাজ্যারম্ভ সময়ে এতদ্দেশীয় হিন্দু জমিদারগণ স্বর্ণ পাত্র ব্যবহার করিতেন এবং যিনি নিমন্ত্রিত সভায় যত স্বর্ণ পাত্র দেখাইতে পারিতেন, তিনি তত মর্য্যাদা পাইতেন।

বর্ত্তমানে যেসকল ভগ্ন অট্টালিকা লক্ষিত হয়, তদ্দারাও তাৎকালিক বাঙ্গালার ঐশ্বর্য্য ও শিল্প নৈপুণ্যের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। বাস্তবিক তখন বাঙ্গালাদেশে স্থাপত্য বিদ্যার আশ্চর্য্যরূপ উন্নতি হইয়াছিল। বর্ত্তমানে সে সব শিল্প নৈপুণ্য দেখিয়া লোকে 'বিশ্বকর্ম্মা নিজ হাতে গড়িয়াছেন' বলিয়া, অনুমান করিয়া থাকেন। বিক্রমপুরের কেন, বাঙ্গালাদেশের মৃত্তিকা খনন কালীন যেরূপ রাশি রাশি পাথর, ইষ্টক, দেবমূর্ত্তি দৃষ্ট হয় তাহাতে অনুমান হয় যে বিক্রমপুর নগরবাসী বহুসংখ্যক ব্যক্তি হিন্দু ভূম্যাধিকারী ছিলেন এবং তাহাদের বিস্তর ক্ষমতা ছিল। পাঠান রাজ্য ধ্বংসের কিয়ৎকাল পরে সঙ্কলিত "আইন আকবরীতে" (Ain Akbari and Seir Mutaks harinএ) লিখিত আছে যে, জমিদারেরা প্রায়ই কায়স্থ এবং তাহারা সম্রাটের সাহার্য্যার্থ ২৩,৩৩০ অশ্বারোহী, ৮,০১,১৫৮ পদাতিক ১,১৭০ গজ, ৪,২৬০ কামান এবং ৪,৪০০ নৌকা যোগাইয়া থাকে। এরূপ যুদ্ধের উপকরণ যাহাদিগের ছিল, তাহাদিগের পরাক্রম নিতান্ত কম ছিল না। স্বতন্ত্র পাঠান রাজত্ব কালে এতদ্দেশে অনেক সামাজিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। দেবীবর ঘটক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের মেল বন্ধন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন।

* History of Bengal by R. K. Mookerjee M. A. B. L. 1888 AD. Page no 30.

তাহার কিছুকাল পূর্ব্বে তাহেরপুরের রাজা কংশ নারায়ণের সময়ে কুলশাস্ত্র বিশারদ উদয়-নাচার্য্য ভাদুড়ী, বারেন্দ্র কুলীনগণকে আটটী শাখায় বা পটিতে বিভক্ত করেন। এদিকে দেবী-বরের সমকালবর্ত্তী পুরন্দর বসু দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থদিগের মধ্যে সমান পর্য্যায়ে বিবাহ দিবার নিয়ম প্রচলিত করেন, এবং চন্দ্রদ্বীপের রাজা পরমানন্দ রায় বঙ্গজ কায়স্থদিগের সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম অবধারণ করেন।

স্বাধীন পাঠান ভূপতিদিগের সময়ে বাঙ্গালায় সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রের যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল, তাহাতে বোধ হয় যে, তৎকালে হিন্দুগণ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিয়া চিন্তা করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। এই সময়েই বাঙ্গালার আদি কবি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির আবির্ভাব (১); এই সময়েই রূপ সনাতন অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন; এই সময়েই স্মার্ত্ত রঘুনন্দন বঙ্গের আচার ব্যবহার বিধান করেন; এই সময়েই চৈতন্য জাতি-ভেদ-বিলোপী ভক্তি প্রধান বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন, এবং এই সময়েই রঘুনাথ শিরোমণি (২) অলৌকিক বিচার শক্তির পরিচয় দিয়া ন্যায়শাস্ত্রে, ভারতবর্ষ-মধ্যে নবদ্বীপের প্রাধান্য সংস্থাপন করেন।

বাঙ্গালার ওয়াশিল তুমার জমা।—রাজা তোড়লমল বেহার হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের রাজস্বের একটী হিসাব প্রস্তুত করেন। এই হিসাবের নাম "ওয়াশিল তুমার জমা" ইহাতে বঙ্গভূমি ১৮টী সরকারে ও ৬৮২ মহলে বিভক্ত হয় এবং এদেশের রাজস্ব ১,০৬,৮৫,৯৪৪ এককোটি, ছয়লক্ষ, পাচাশি হাজার, নয়শত, চৌচল্লিশ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত হয় (১৫৮২)।

[রাজস্বের দ্বিতীয় হিসাব] সুজার রাজ্য শাসন কালে কয়েক বৎসর প্রজাগণ সুখে

(১) খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহারা উভয়েই ব্রাহ্মণ ছিলেন। চণ্ডীদাসের বাসস্থান বীরভূমের অন্তর্গত "নান্নুর" নামক গ্রামে ছিল; তাঁহার রচিত কবিতা সকলের ভাষা প্রায়ই বিশুদ্ধ বাঙ্গালা। বিদ্যাপতির লেখা হিন্দিভাবাপন্ন। তাহার জন্মস্থান মিথিলা এবং তিনি তথাকার রাজা শিবসিংহ ও রাজ্ঞী লখিমা দেবীর আশ্রিত ছিলেন। "পদাবলী" ব্যতীত তাহার লিখিত অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ আছে; যথা, দুর্গাভক্তি তরঙ্গিনী, পুরুষ পরীক্ষা ইত্যাদি।

(২) ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে চৈতন্যের জন্ম, ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অন্তর্দ্ধান। তাঁহার পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মাতার নাম শচীদেবী। তাঁহার মতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি ও প্রীতিই মুক্তি লাভের উপায়। তিনি পশ্চিমে বৃন্দাবন ও দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করেন, এবং জীবনের শেষভাগ জগন্নাথ ক্ষেত্রে যাপন করেন। তাঁহার প্রভাবে এদেশে মদ্য মাংস দ্বারা তান্ত্রিক উপাসনার প্রাদুর্ভাব অনেকাংশে কমিয়া যায়। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য, শিরোমণি ও চৈতন্য, একই সময়ে নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হন। ইঁহারা বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র। বাসুদেব মিথিলা হইতে ন্যায় শিক্ষা করিয়া আসিয়া নবদ্বীপে চৌপাঠী সংস্থাপন করেন। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য "অষ্টবিংশতি তত্ত্ব" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, দুর্গোৎসব প্রভৃতির যেরূপ পদ্ধতি ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, বাঙ্গালা দেশে তাহাই প্রচলিত।

রঘুনাথ শিরোমণি "চিন্তামনি দীধিতি" নামক প্রসিদ্ধ ন্যায় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং মিথিলার পক্ষধর মিশ্রকে বিচারে পরাস্ত করিয়া ন্যায় বিষয়ে নবদ্বীপের মহিমা বিস্তার করেন। রূপ ও সনাতন চৈতন্যের শিষ্য ছিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বে গৌড়ের রাজ সরকারে চাকরী করিতেন ও ম্লেচ্ছ ভাবাপন্ন ছিলেন।

স্বচ্ছন্দে ছিল। ১৬৫৭ সালে তিনি বাঙ্গালার রাজস্বের নূতন হিসাব প্রস্তুত করেন, ইহাতে বঙ্গভূমি ৩৪ সরকারে ও ১৩৫০ মহলে বিভক্ত হয় এবং রাজস্ব ১,৩১,১৫,৯০৭ টাকা নির্দ্ধারিত হয়।

[রাজস্বের তৃতীয় হিসাব] মুরসিদকুলি খাঁ বাঙ্গালার রাজস্বের একটি নূতন হিসাব প্রস্তুত করেন (১৭২২); তদ্দারা বার্ষিক রাজস্ব ১,৪২,৮৮,১৮৬ টাকা নির্দ্ধারিত হয়, এবং বঙ্গভূমি ১৩ চাকলা, ৩৪ সরকার ও ১৬৬০ পরগণায় বিভক্ত হয়। সুবাদার জমিদারদিগের নিকট হইতে টাকা আদায় করিতেন এবং জমিদারেরা প্রজাদিগের নিকট হইতে লইত। রাজস্ব না দিবার দোষে যে সকল জমিদার কারারুদ্ধ ছিল, তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া এবং আলমচাঁদ নামক একজন হিন্দুকে সহকারী দেওয়ান করিয়া ও তাঁহার জন্য দিল্লী হইতে রায় বাঁইয়া উপাধি আনাইয়া, সূজা প্রথমেই হিন্দুদিগের ভক্তিভাজন হন। আলম চাঁদ, জগৎশেঠ, এবং হাজি মহম্মদ ও আলিবর্দ্দি খাঁ নামক দুইজন আত্মীয় এই চারিজন লইয়া সূজা একটি মন্ত্রী সভা সৃষ্টি করেন। এবং এই সভার পরামর্শ গ্রহণ পূর্ব্বক রাজ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

সূজা বাঙ্গালার সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ২৫,০০০ করেন; তাঁহার অন্যরূপ জাঁকজমকও ছিল, এবং তিনি নিয়মিত রূপে দিল্লীতে রাজস্বও পাঠাইতেন। এইরূপে তাঁহার ব্যয় বাড়িয়া যায়। এ নিমিত্ত তিনি নির্দ্দিষ্ট রাজস্বের অতিরিক্ত আবওয়াব নামক কর সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। আবওয়াব তাঁহার সময়ে প্রায় ২২ লক্ষ হইয়া উঠে; আলিবর্দ্দি ও মীরকাশিমের শাসন কালে উহার এত বৃদ্ধি হয় যে, যখন কোম্পানির হস্তে দেওয়ানী যায় (১৭৬৫) তখন বাঙ্গালার মোট রাজস্ব আড়াই কোটিরও অধিক ছিল। ১৭৩২ অব্দে ঢাকার দেওয়ান মীরহবিব ত্রিপুরা জয় করেন। অনন্তর সরফরাজ খাঁ ঢাকার শাসন-কর্ত্তৃত্ব-পদে নিয়োজিত হন। তাহার আমলে টাকায় ৮ মন চাউল বিক্রয় হইত। (১৭৩৫)

স্বাধীন পাঠানদিগের সময়ে বঙ্গদেশে যে প্রকার প্রতিভাশালী ব্যক্তিবর্গ জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন; মোগলাধীন সুবাদারদিগের শাসনকালে সে প্রকার কাহারও আবির্ভাব লক্ষিত হয় না; যদিও কবি কঙ্কণের চণ্ডী, কাশীদাসের মহাভারত, রাম প্রসাদের পদাবলী এবং ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গল, শেষোক্ত সময়ে লিখিত, তথাপি এ সকল গ্রন্থকারদিগকে শিরোমনি, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য বা চৈতন্যের তুল্য বলা যায় না। কিন্তু কবি কঙ্কণাদি কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষা ক্রমশঃ মার্জ্জিত হইয়া পদরচনা সম্বন্ধে ভারতচন্দ্রের হস্তে বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, স্বীকার করিতে হইবে। *

* এস্থলে কৃত্তিবাসের রামায়ণের উল্লেখ করা গেল না; কারণ কৃত্তিবাস পাঠানদিগের কি মোগলাধীন সুবাদারদিগের সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, স্থির করা যায় না। কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস কথকতা শুনিয়া রামায়ণ ও মহাভারত রচনা করেন, তাঁহাদিগের কৃত গ্রন্থ পাঠ করিয়াই জানিতে পারা যায়। সুতরাং কথকদিগের দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক উপকার সাধিত হইয়াছে, বলিতে হইবে। কৃত্তিবাস ব্রাহ্মণ এবং প্রসিদ্ধ ফুলিয়া গ্রাম নিবাসী, তাঁহার রচনা প্রণালী দেখিয়া তাঁহাকে কবি কঙ্কণের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। কাশীরাম দাস "দেব" উপাধি ধারী কায়স্থ; কাটোয়ার সন্নিহিত সিঙ্গি গ্রামে তাঁহার বাসস্থান ছিল। তিনি কিঞ্চিদধিক দুই শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত দামুন্যা গ্রামে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুসলমানদিগের অত্যাচারে বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া মেদিনীপুরের অন্তর্ব্বর্ত্তী আবড়া গ্রাম নিবাসী রাজা

মুসলমান শাসনকালে রাইতদিগের সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধে এইমাত্র জানা যায় যে, তাহাদের মধ্যে ক্রমে মুসলমান এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিস্তার হইয়াছিল ; ইহার অতিরিক্ত তাহাদিগের অবস্থা সম্বন্ধে কোন কথাই স্থির করিয়া বলা যায় না। কিন্তু অনুমান হয়, যে তাহাদিগের অনাহার কষ্ট ছিল না। নবাব সায়েস্তা খাঁ এবং নবাব সুজাউদ্দিনের সময়ে টাকায় আটমন দশমন করিয়া চাউল বিক্রয় হইয়াছিল। মুরশিদকুলি খাঁর আমলে টাকায় ৪ মন চাউল ছিল ; এবং সাধারণতঃ বলিতে গেলে তৎকালে খাদ্যদ্রব্য মাত্রই এখন অপেক্ষা অনেক পরিমাণে সস্তা ছিল। অধিকন্তু একাল অপেক্ষা সেকালে দরিদ্রদিগকে অন্ন দিতে সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের প্রবৃত্তি ছিল। "আইন আকবরী" পাঠ করিয়া বোধ হয় যে, এতদ্দেশীয় প্রজাদিগের সঙ্গতিও কম ছিল না, উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে "বাঙ্গালার রাইয়তেরা অবাধ্য বা কর দিতে পরাঙ্মুখ নহে। বৎসরের আটমাস দেয় অর্থ তাহারা কিস্তি বকিস্তি দিয়া থাকে। তাহারা আপনারাই নির্দ্দিষ্ট স্থানে রৌপ্য এবং স্বর্ণমুদ্রা লইয়া আসে। শস্য প্রদ্দান রীতি নাই, শস্য সর্ব্বদাই সস্তা।" বেহারেও শস্য দিবার রীতি ছিল না। রাইয়তেরা খাজনা স্বরূপ মুদ্রাই দিত এবং প্রথম কিস্তির খাজনা দিবার সময়ে পরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরিয়া আসিত।

দিল্লীর অধীন সুবাদারদিগের সময়ে এদেশে বাণিজ্যের কিছু উন্নতি হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ ফরাসী পর্য্যটক বর্ণিয়ার স্বচক্ষে বাঙ্গালার অবস্থা দুইবার প্রত্যক্ষ করিয়া, তৎসম্বন্ধে ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে যে পত্র লিখেন, তাহা পাঠ করিয়া জানা যায় যে, তৎকালে বাঙ্গালা হইতে বহুল পরিমাণে চাউল ও চিনি বিদেশে যাইত, এবং বাঙ্গালা, কার্পাস ও পট্টবস্ত্র সম্বন্ধে কেবল ভারত ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য সমূহের নহে, ইউরোপ খণ্ডেরও সাধারণ ভাণ্ডার স্বরূপ ছিল। এতদ্ব্যতীত সোরা, লাক্ষা, আফিং, মোম, লঙ্কা, মরিচ প্রভৃতির অনেক রপ্তানি হইত। সম্রাট বা সুবাদার নিজে ব্যবসা করিতেন না। সুলতান আজিমওসান একবার কয়েকটী দ্রব্য এক চেটিয়া করিতে গিয়া বাদসাহ আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হন।

যদিও অনেক নদ-নদী থাকায় এদেশের বাণিজ্য প্রধানতঃ জলপথে চলে, তথাপি বাণিজ্য কার্য্য ও গমনাগমনের সুবিধার জন্য মুসলমানদিগের সময়ে এদেশে বড় বড় রাজবর্ত্ম ছিল। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের একখানি মাত্র চিত্রে, (Vanden Brouck's Map) এই কয়েকটী প্রধান রাস্তা লক্ষিত হয় (১) যে স্থলে ভাগীরথী ও পদ্মা পৃথক হইয়াছে ; পাটনা, মুঙ্গের, ও রাজমহল দিয়া সেইস্থল পর্য্যন্ত একটী রাস্তা আসিয়া, দুইটী শাখায় বিভক্ত হইয়াছে ; একটী মুক্সদাবাদ,

বাঁকুড়াদেবের আশ্রয়ে অবস্থিতি করেন এবং তৎপুত্র রঘুনাথ রায়ের আদেশে চণ্ডী কাব্য রচনা করেন। প্রায় তিনশত বৎসর হইল চণ্ডী কাব্য রচিত হইয়াছে। কবি রামপ্রসাদ সেন বৈদ্য জাতীয়, হালি সহরের মধ্যবর্ত্তী কুমার হট্ট নামক স্থান তাঁহার জন্মভূমি। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে ১০০ বিঘা নিষ্কর ভূমি এবং "কবি রঞ্জন" উপাধি দেন। বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী ভুরস্থট পরগণার অন্তর্গত পেঁড়ো গ্রামে ভারতচন্দ্র রায়ের নিবাস ছিল। তিনি মুখুটী কুল সম্ভূত। তিনি এক সময়ে বর্দ্ধমান রাজা কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। পরে তিনি নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ হইয়া অন্নদা মঙ্গল রচনা করেন। (১৬৭৪ শক অর্থাৎ ১৭৫২ খৃঃ অঃ)।

History of Bengal by R. K. Mookerjea M. A. B. L. March 1888 AD. page no. 57.

পলাশী, অগ্রদ্বীপ, বৰ্দ্ধমান ও মেদিনীপুর দিয়া কটকাভিমুখে গিয়াছে, অপরটী পদ্মার দক্ষিণ ধারদিয়া ফাতাবাদ (ফরিদপুর) পর্য্যন্ত যাইয়া ঢাকার অভিমুখে গিয়াছে। (২) আর একটী রাস্তা বৰ্দ্ধমান হইতে বীরভূমের মধ্য দিয়া কাশিম-বাজার হইয়া পদ্মার তীর পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং নদী পার হইয়া রামপুর বোয়ালিয়ার অনতি-দূরবর্ত্তী হাজরাহাটী দিয়া করতোয়া কূলস্থ ঘোড়াঘাট হইয়া ব্রহ্মপুত্রের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। (৩) অপর একটী রাস্তা বৰ্দ্ধমান হইতে হুগলী, যশোহর, ভূষণা ও ফাতাবাদ দিয়া পদ্মার পার হইয়া বিক্রমপুর ধলেশ্বরী ও লখিয়ার (লক্ষা) সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত গিয়াছে। (৪) আর একটী রাস্তা ঢাকা হইতে বাহির হইয়া বিক্রমপুর ধলেশ্বরী নদী পার হইয়া পীরপুর দিয়া পাবনা জেলার অন্তর্ব্বর্ত্তী সাহাজাদপুরের অভিমুখে গিয়াছে।

যদিও বিদ্যালোচনা সম্বন্ধে মুসলমান শাসন-কর্ত্তাদিগের বিশেষ যত্ন ছিল না, কিন্তু তাৎকালিন জমিদারদিগের এ বিষয়ে অনেক উৎসাহ দেখা যায়। তাঁহারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের অর্থ চিন্তা দূর করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে ব্রহ্মোত্তর নামে কত নিষ্কর ভূমি দিয়াছিলেন। তাঁহারা সংস্কৃত শিক্ষার্থী ছাত্রদিগের নিমিত্ত টোল চৌপাঠীর ব্যয় যোগাইতেন এবং গুণীলোক দেখিলে তাঁহাকে আশ্রয় দিতেন। কবি রামপ্রসাদ সেন এবং ভারতচন্দ্র রায় নদীয়ার জমিদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় পাইয়াছিলেন। কবি-কঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী মেদিনীপুরের জমিদার বাঁকুড়া রায় ও তৎপুত্র রঘুনাথ রায়ের আশ্রিত ছিলেন।

এস্থলে আর একটি কথা বলা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এ দেশে বাঙ্গালা, ফসলী ও বিলায়তী সন নামে যে কয়েকটী অব্দ প্রচলিত আছে, তাহাদিগের উৎপত্তি মোগল-শাসন সময়ে। আকবর সাহ সৌর বৎসরের পক্ষপাতী ছিলেন; এজন্য যে বৎসর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন, সেই বৎসর হইতে হিজিরার চান্দ্র বৎসরের পরিবর্ত্তে সৌর মানানুসারে

স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলেন বাঙ্গালা ইতিহাস লিখিবার সময় অনেক প্রাচীন গ্রন্থসমূহ হইতে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে মোটামুটী নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ :—

Bengal Administration Reports, Bengal Census Reports, Muir's Sanskrit Text Mahawansa, Fa Hian's Travels and Hiouen Shang's Memoirs, Contributions to Bengal History by such writers as Dr. Rajendra Lala Mitra, Mr. Thomas Mr. Blochman, Dr. Wise, Mr West macot, Rev. J. Long, Dr, Huster Babu Kisory Chand Mittra, &c. &c.

Articles on Sriharsha and on Historical Errors from the Bangadarsana of 1281 B. E.

Article on Vidyapati from the Bangadarsana of 1282 B. E.

Rajani Kanta's life of Jayadeva.

Elliot's History of India told by her own Historians.

Ain Akbari and Seir Mutakharin. Stewarts Marshman's and Lethbridge's History of Bengal. Elphinstone's Marsnman's MllI's and Orme's History of India, ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতম্

Krishna Chandra Roy's History of British India in Bengal.

Ramgati Nyayaratna's discourse on the Bengali Language and Literature.

গণনা করিতে হইবে, সমুদয় মোগল সাম্রাজ্যে তিনি এই আদেশ প্রচার করেন। সাহজাহান সরকারী কাগজ পত্রে সৌর গণনা রহিত করেন, কিন্তু আকবর সাহের অব্দ স্থানে স্থানে এরূপ প্রচলিত হইয়াছিল যে উহার উচ্ছেদ হইল না; উহাই বাঙ্গালা, ফসলী ও বিলায়তী সন নামে এদেশে চলিতেছে। আকবর সাহ ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট হন। তৎকালে ৯৬৩ হিজিরা চলিতেছিল। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩৩২ সৌর বৎসর গত হইয়াছে। ৯৬৩ হিজিরায় ৩৩২ যোগ করিলে বঙ্গাব্দ ১২৯৫ হইবে। বৈশাখ মাসে বঙ্গাব্দের গণনারম্ভ হয়; পরবর্ত্তী ভাদ্র মাসে ফসলী ও বিলায়তী সনের আরম্ভ।

সুবা বাঙ্গালায় প্রায় সাত কোটি লোকের বাস। ইহার মধ্যে প্রায় দুই কোটি সতের লক্ষ মুসলমান; প্রায় একুশ লক্ষ সাঁওতাল, পাহাড়িয়া প্রভৃতি অসভ্য জাতি; প্রায় দেড়লক্ষ বৌদ্ধ এবং সওয়া লক্ষ খৃষ্টান; অবশিষ্ট সাড়ে চারি কোটির অধিক হিন্দু। সুবা বাঙ্গালায় প্রধানতঃ তিনটী ভাষা প্রচলিত, ১ বাঙ্গালা, ২ হিন্দি, ৩ উড়িয়া, বাঙ্গালা ভাষী লোকের সংখ্যা প্রায় ৩ কোটী ৬৪ লক্ষের উপর, হিন্দি ভাষীর সংখ্যা প্রায় ২ কোটি ৪৮ লক্ষ, উড়িষ্যা ভাষীর সংখ্যা প্রায় সারে ৬৪ লক্ষ। সুবা বাঙ্গালা বলিতে গেলে সেই সময়ে তিন ভাগে বিভক্ত ছিল ১। বাঙ্গালা, ২। বেহার, ৩। উড়িষ্যা [1888 A. D.]

বাঙ্গালার মুসলমান শাসন কর্ত্তাগণ

১২০৩—৫	বখ্‌তিয়ার খিলিজী
১২০৫—৯	মহম্মদ শিরান
১২০৯—১১	আলিমর্দ্দান
১২১১—২৭	মুলতান গায়সুদ্দিন
১২২৭—২৯	নাসিরুদ্দিন
১২২৯—৩৩	আলাউদ্দিন সৈফ উদ্দিন
১২৩৩—৪৪	তুগন খাঁ
১২৪৪—৪৬	তৈমুর খাঁ
১২৪৬—৫৮	তুগ্রল খা
১২৫৮—৫৯	মসায়ুদ মালিকজান, ইজুদ্দিন বলবন
১২৫৯—৭৯	তাতা খাঁ সের খাঁ আমিন খাঁ
১২৭৯—৮২	তুগ্রল (মুগিম উদ্দিন)
১২৮২—৯২	নাসিরুদ্দিন বাখরা খাঁ

১২৯২—৯৭	কৈকায়ুস
১২৯৭—(?) ১৩১৮	ফেরোজ সা
১৩১৮	সিহাবুদ্দিন (গৌড়)
১৩১১—১৯	বাহাদুর সা (পূঃ বা)
১৩১৯—২৩	বাহাদুর (সমুদয়)
১৩২৩—২৫	নাসিরুদ্দিন (গৌড়)
১৩২৫—৩১	বাহাদুর সা (পূঃ বা)
১৩২৬—৩৯	কদর খাঁ (গৌড়)
১৩২৫—৩৮	বহরম খাঁ (পূঃ বা)
১৩২৪—৩৯	আজম উলমুলক (সপ্তগ্রাম)
১৩৩৮—৫০	ফকিরুদ্দিন (পূঃ বা)
১৩৫০—৫৩	মুজাফর গাজি সা (পূঃ বা)
১৩৩৯—৪৫	আলি সা (পঃ বা)
১৩৩৯—৫৩	সামসুদ্দিন ইলিয়াস (পঃ বা)
১৩৫৩—৫৮	সামসুদ্দিন (সমুদয় বাঙ্গালা)
১৩৫৮—৮৯	সেকন্দর সা
১৩৮৯—৯৮	গায়স উদ্দিন

১৩৯৮—১৪০২	সৈফ উদ্দিন হামজাসা
১৪০২—৫	সামসুদ্দিন
১৪০৫—১৪	রাজা গণেশ
১৪১৪—৩০	যদু (জেলালুদ্দিন)
১৪৩০—৪৫	আহম্মদ সা
১৪৪৫—৬০	নাসিরুদ্দিন মামুদ সা
১৪৬০—৭৪	বর্ব্বক সা
১৪৭৪—৮১	যুসুফ সা
১৪৮১	সেকন্দর সা (দ্বিতীয়)
১৪৮১—৮৭	ফত সা
১৪৮৭	সুলতান সাহাজাদা
১৪৮৭—৯০	সৈফ উদ্দিন ফেরোজ সা
১৪৯০	মামুদ সা
১৪৯০—৯৪	মুজাফর সা
১৪৯৪—১৫২৩ বা ২৫	হোসেন সা
১৫২৩ বা ২৫—১৫৩৩	নসরৎ সা
১৫৩৩	ফেরোজ সা
১৫৩৩—৩৬	মামুদ সা
১৫৩৬—৪৫	সের সা
১৫৪৫—৫৫	মহম্মদ খাঁ
১৫৫৫—৬১	বাহাদুর সা
১৫৬১—৬৩	জেলাল ও তৎপুত্র গায়সউদ্দিন
১৫৬৩—৭২	সুলেমান
১৫৭২	বয়াজিদ
১৫৭৩—৭৬	দায়ুদ
১৫৭৬—৭৮	হোসেন কুলি খাঁ
১৫৭৯—৮০	মুজাফর খাঁ
১৫৮০—৮২	রাজা তোডরমল
১৫৮২-৮৪	আজিজ খাঁ আজম
১৫৮৪	সাবাজ খাঁ
১৫৮৭	উজির খাঁ
১৫৮৭—১৬০৬	রাজা মানসিংহ
১৬০৬—৭	কুতবুদ্দিন
১৬০৭—৮	জাহাঙ্গীর কুলি খাঁ
১৬০৮—১৩	সেখ ইস্‌লাম খাঁ
১৬১৩—১৮	কাশিম খাঁ
১৬১৮—২৩	ইব্রাহিম খাঁ
১৬২৩—২৪	সাহজাহান
১৬২৪—২৮	মহবৎ খাঁ, মকরিম খাঁ ফেদাই খাঁ
১৬২৮—৩২	কাশিম খাঁ যুবৈনী
১৬৩২—৩৭	আজিম খাঁ
১৬৩৭—৩৮	ইস্‌লাম খাঁ মাশহাদি
১৬৩৯—৬০	সুলতান সুজা
১৬৬০—৬৪	মীরজুম্লা
১৬৬৪—৭৭	সায়েস্তা খাঁ
১৬৭৭—৭৮	ফেদাই খাঁ
১৬৭৮—৭৯	সুলতান মহম্মদ আজিম
১৬৭৯—৮৯	সায়েস্তা খাঁ (দ্বিতীয়বার)
১৬৮৯—৯৭	ইব্রাহিম খাঁ
১৬৯৭—১৭১২	সুলতান আজিম ওসান
১৭০১	মুরশিদ কুলি খাঁ দেওয়ান
১৭০৩	মুরশিদ কুলি সহকারী নাজিম
১৭১৩—২৫	মুরশিদ কুলি নাজিম
১৭২৫—২৯	সুজাউদ্দিন
১৭২৯—৪০	সরফরাজ খাঁ
১৭৪০—৫৬	আলিবর্দ্দি খাঁ
১৭৫৬—৫৭	সেরাজউদ্দোলা

বঙ্গদেশে মোগল শাসন প্রবর্ত্তিত হইলে দিল্লীশ্বর আকবর শাহ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তদীয় রাজস্ব সচিব টোডরমল্ল বাঙ্গালার রাজস্ব ও ভূমির বন্দোবস্ত করেন। টোডরমল্লের বন্দোবস্ত কাগজে ঢাকা জেলার দক্ষিণভাগ ও পূর্ব্বভাগ সরকার সোনারগাঁও এবং উত্তরভাগ সরকার বাজুহার অন্তর্গত ছিল। ইংরেজ শাসন প্রবর্ত্তিত হইলে সরকার সোণারগাঁও ও সরকার বাজুহা "ঢাকা নেয়াবতের" অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ক্রমে জেলা স্থাপিত হইলে তাহা "ঢাকা জেলা" নামে অভিহিত হইয়াছে * ঢাকার নাম আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে "ঢাকা বাজু" নামে যে পরগণার নাম লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতেই ঢাকা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে টোডরমল্ল ঢাকা বাজুর (পরগণার) বন্দোবস্ত করেন; তৎকালে বুড়ীগঙ্গার উত্তর তীর ভূমি ঢাকা বাজু নামে পরিচিত থাকিয়া তাহা সরকার বাজুহার অন্তর্গত ছিল। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে নবাব ইছলাম খাঁ এই ঢাকা বাজুতে আসিয়া স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন ও পরগণার বা বাজুর নামানুসারে রাজধানীর নাম প্রদান করেন। তদবধি এই স্থান ঢাকা নামে পরিচিত। এই জেলা স্থাপন সময় ইহার আকার বর্ত্তমান আকার অপেক্ষাও ৬ গুণ বৃহৎ ছিল, ক্রমে পার্শ্ববর্ত্তী জেলা সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহার আয়তন হ্রাস হইয়া বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। †

মুসলমান শাসনকালে সোনারগাঁয় একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত থাকিতেন। তিনিই এতৎপ্রদেশ শাসন করিতেন, স্থানে স্থানে কাজি ও কাননগুদিগের কার্য্যালয় ছিল। কাজিরগাঁ, কাজিরকসবা ও কাজিরপাগলা গ্রামে তাহাদের হেড্ কোয়ার্টার ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে এতৎপ্রদেশে দ্বাদশ ভৌমিকের প্রভুত্ব বিস্তৃত হয় এবং কিছুদিন তাঁহাদের হস্তেই দেশ শাসিত হয়।

১৬০৮ খৃষ্টাব্দে ঢাকানগরী স্থাপিত হইলে এই স্থানে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজধানীতে যথারীতি বিচার, শাসন ও রাজস্ব বিভাগের কার্য্য চলিতে থাকে। মফঃস্বলের বিচার ও শাসন ক্ষমতা তখনও কাজিদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল। কাননগু জমাজমির বিচার করিতেন। কেন্দ্রে কেন্দ্রে ফৌজদারী প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরগনার জমিদারগণও নিজনিজ "এলাকার" বিচার করিতেন। রাজস্বের জন্য জমিদারগণ দায়ী ছিলেন। পরগণার জমিদারগণের রাজস্ব প্রদানের ক্রটির বিচার রাজধানীতে হইত। রাজস্ব প্রদানের ক্রটি ব্যতীত জমিদারদিগের অন্য কোন বিষয়ের ক্রটি, ক্রটি বলিয়াই গণ্য হইত না। ক্ষমতাবান জমিদারেরা রীতিমত রাজস্ব প্রদান করিলে "সাতখুন মাপ" পাইতেন। এরূপ অবস্থায় প্রজা সাধারণ যম যাতনা ভোগ করিত।

ঢাকা হইতে বিভিন্ন সময়ে রাজধানী রাজমহল ও মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। সুলতান সুজা ঢাকা হইতে রাজধানী রাজমহলে স্থানান্তরিত করেন। মীরজুম্লা পুনরায় রাজধানী ঢাকায় আনয়ন করেন। অতঃপর মুর্শিদ কুলি খাঁ তাহা মুর্শিদাবাদে স্থাপন করেন। ঐ সময়ে ঢাকায় নায়েব নাজিমের কার্য্যালয় থাকিত; সুতরাং এখানেও বিচার, শাসন ও রাজস্ব বিভাগের কার্য্য যথারীতি পূর্ব্ববৎ পরিচালিত হইত। ইংরেজ

* ঢাকার বিবরণ Page No. 2,

† ঢাকার বিবরণ প্রথম অধ্যায় Page No. 4/5

শাসনের প্রারম্ভে ঢাকা জেলার শাসন-প্রথার কতকটা পরিবর্ত্তন হয়। *

শাসন প্রণালী।

স্বর্গীয় দুর্গাচন্দ্র সান্যাল প্রণীত সামাজিক ইতিহাসে পাঠান-শাসন-প্রণালী যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এই—গৌড়ীয় পঞ্চ রাজ্য পাঠানদিগের অধিকৃত হইলে তাহারা মিথিলা রাজ্য মগধ দেশের সহ মিলিত করিয়া সুবে বেহার নাম দিয়াছিলেন। অবশিষ্ট চারিটি রাজ্য দ্বারা সুবে বাঙ্গালা গঠিত করিয়াছিল, এই দুই সুবায় কদাচিৎ পৃথক্ পৃথক্ নবাব নিযুক্ত হইত। সচরাচর একজন নবাবই এই দুই সুবা শাসন করিতেন। গৌড়নগরে নবাবের রাজধানী ছিল। সুবর্ণ গ্রাম, সপ্ত গ্রাম, পাটনা ও সাসারাম, এই চারিটি স্থানে চারিজন শরীফ বা উপনবাব ছিল।

তাহারা নিকটবর্ত্তী প্রদেশের রাজা ভূঁইয়া ও গাঁইয়াদিগের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিয়া নবাব সরকারে পাঠাইত। ঐ পাঁচটি নগরে দুর্গ ছিল। তাহাতে কতকগুলি করিয়া পাঠান সৈন্য থাকিত। ঐ সকল নগরের আশে পাশে পাঠান সর্দ্দারদিগের জায়গীর এবং মুসলমান সাধুদিগের পীরপাল ছিল। অবশিষ্ট সমস্ত দেশ হিন্দু জমিদারেরাই শাসন করিতেন। কিন্তু সেই সকল জমিদারদের জমিদার উপাধি ছিল না। বৃহৎ জমিদারদিগের “রাজা” বা “মহারাজ” উপাধি ছিল। আর ক্ষুদ্র জমিদারগণের “গাঁইয়া” বা “ভূঁইয়া” উপাধি ছিল। রাজা মহারাজাগণের অধীনেও অনেক গাঁইয়া, ভূঁইয়া ছিল। মোগল রাজত্ব কালে সেই সকল রাজা মহারাজদের জমিদার উপাধি হইয়াছিল। তাঁহাদের অধীন গাঁইয়া

* ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মুন্সীগঞ্জ প্রথম মহকুমা স্থাপিত হয়। ঢাকা জিলা,—উত্তর নিরক্ষ ২৩°—১৪′ ও ২৪°—২০′ কলার মধ্যে এবং পূর্ব্ব দ্রাঘিমা ৮৯°—৪৫′ ও ৯০°—৫৯′ কলার মধ্যে অবস্থিত। এই জিলার পরিমান ফল ২৭৮২ বর্গমাইল। নিম্নে লোকসংখ্যার তালিকা দেওয়া গেল :—

	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে	……	……	৯,৩৮,৭১২
১৮২৪ „	……	……	৫,১২,৩৮৫
১৮৫১ „	……	……	৬,০০,০০০
রেভিনিউ সার্ভে গণনায় লোকসংখ্যা			৯,০৪,৬১৫
১৮৬৮—৬৯ খৃঃ	……	……	১০,১৯,৯২৮
১৮৭২ খৃঃ ১৬ই জানুয়ারী	……	……	১৮,৫২,৯৯৩
১৮৮১ খৃঃ ১৭ই ফেব্রুয়ারী	……	……	২১,১৬,৩৫০
লোক সংখ্যার তুলনা			
১৮৭২ খৃঃ	৮,৯৩,২৪৪	৯,৩৪,৬৮৭	১৮,২৭,৯৩১
১৮৮১ খৃঃ	১০,২১,০৫৪	১০,৬৯,৮২৩	২০,৯০,৮৭৭
১৮৯১ খৃঃ	১১,৮৭,৭৩৯	১২,০৭,৬৯১	২৩,৯৫,৪৩০
১৯০১ খৃঃ	১৩,১২,৪১৭	১৩,৩৭,১০৫	২৬,৪৯,৫২২

১৮৭২ সনে লোকগণনার পরে জেলার কতক স্থান ভিন্ন জেলায় পরিবর্ত্তিত হয়। ঐ সকল পরিবর্ত্তিত স্থান সমূহের লোকসংখ্যা বাদ না দিলে মোট লোকসংখ্যা ১৮,৫২,৯৯৩ হয়। ঐরূপ ১৮৮১ সনের সংখ্যাও ২১,১৬,৩৫০ হয়।

[আদম সুমারি “ঢাকার বিবরণ”]

ভূঁইয়াদের উপাধি তালুকদার হইয়াছিল। আর যে সকল গাঁইয়া ভূঁইয়া কোন রাজার অধীন ছিল না, তাহাদের উপাধি হুজুরী তালুকদার হইয়াছিল। তাহারা নবাব সরকারে রাজস্ব দিত।

পাঠানেরা কুটিল রাজনীতি জানিত না। রাজ্য-মধ্যে জরিপ জমাবন্দি কিংবা অন্য কোন পাকা বন্দোবস্ত ছিল না। জমীদারেরা যে রাজস্ব দিত, এবং বণিকেরা যে শুল্ক দিত, তাহাই নবাবদিগের আয় হইত। তাহা হইতে নিজ ব্যয় বাদে অবশিষ্ট টাকা নবাবেরা দিল্লীর সম্রাট্‌কে পাঠাইতেন। জরিমানা ও উপঢৌকন স্বরূপে নবাবেরা যাহা পাইতেন তাহা তাহাদের নিজস্ব ছিল। তাহার জন্য কোন হিসাব নিকাশ বাদশাকে দিতে হইত না। নবাবেরা সম্রাট্‌কে মালগুজারী দিতেন বটে, কিন্তু নিজ নিজ সুবায় তাঁহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিতেন। সেইরূপ, জমীদারেরা নবাবকে রাজস্ব দিয়া নিজ নিজ চত্বরে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতেন, প্রভু কখন অধীনগণের আভ্যন্তরিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না।

বহুলোক এক যৌথ পরিবার রূপে বাস করা হিন্দুদিগের মধ্যে চিরকাল প্রচলিত ছিল। রাজা, মহারাজাদিগের রীতিমত অভিষেক হইত এবং তাঁহাদের কেবল একজন মাত্র উত্তরাধিকারী হইত তাঁহাদের অপর দায়াদগণ ভরণ পোষণ জন্য আয়মা * পাইত।

গাঁইয়া ভূঁইয়াদের অভিষেক হইত না এবং তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণ শাস্ত্রমত দায়ভাগ করিয়া লইতেন। জমিদারগণের উত্তরাধিকার লইয়া বিবাদ হইলে অথবা দুই জমিদারের মধ্যে রাজ্যের সীমানা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে, তাহার মীমাংসা যুদ্ধ কিংবা সালিস দ্বারা হইত। কদাচিৎ পরাজিত পক্ষ নবাবের দরবারে নালিশ করিত। ঈদৃশ নালিশ করা নিতান্ত কাপুরুষের কার্য্য বলিয়া গণ্য হইত। নবাবের কর্ম্মচারী সমস্তই ঘুষ-খোর ছিল। তাহারা বিনা বেতনে প্রায় সকলেই থাকিত অর্থাৎ নাম মাত্র বেতন পাইত। বিবাদের পক্ষগণ মধ্যে যে বেশী টাকা ব্যয় করিতে পারিত, বিচারে প্রায়শঃ তাহারই জয় হইত। সুতরাং পরাজিত পক্ষ নালিশ করিয়া প্রায়ই কোন ফল পাইত না। তজ্জন্য ঈদৃশ নালিশ অতি অল্পই হইত। জমিদারদিগের অধীন প্রজারা কখন নবাব দরবারে নালিশ করিতে যাইত না। নবাবেরাও তাদৃশ প্রজা সাধারণ সম্বন্ধে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতেন না। সুতরাং সাধারণ প্রজার সহিত নবাবের কোন সম্বন্ধ ছিল না।

বেহার প্রদেশে অধিকাংশ জমিদার ক্ষত্রিয় ছিল, অবশিষ্ট ব্রাহ্মণ ছিল। বাঙ্গালাদেশে ক্ষত্রিয় না থাকায় ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থেরাই সমস্ত দেশের জমিদার ছিল। পাঠান শাসনকালে কোন নিকৃষ্ট জাতীয় লোক ভূম্যধিকারী হইতে পারিত না। নবাব কিম্বা শরীফগণ সময় সময় উচ্চ কর্ম্মচারীকে গাঁইয়া ভূঁইয়া নিযুক্ত করিতেন।

কিন্তু প্রজারা তাদৃশ জমিদারকে মান্য করিত না এবং সুযোগ পাইলেই হত্যা করিত। পাঠান রাজত্ব দূরীভূত হইলে নবাবেরা হিন্দু জমিদারদিগকে বিচ্যুত করিয়া পাঠান সর্দ্দারগণকে জমিদারী দিতে

* আয়মা শব্দ আরবী ভাষা মূলক। কোন রাজপুত্র বা অপর বড় মানুষের ভরণ পোষণ জন্য প্রদত্ত ভূমির নাম আয়মা। ইহা সংস্কৃত "নাম্নুকর" শব্দের তুল্য। ৪৯ পৃষ্ঠা।

পারিতেন। কিন্তু নবাবেরা তদ্রূপ চেষ্টা বা ইচ্ছা করেন নাই। তাহার অনেকগুলি কারণ ছিল। বাঙ্গালা দেশে এক্ষণে যেরূপ সুরক্ষিত সমতল ক্ষেত্র, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। নদী, হ্রদ ও জঙ্গল দ্বারা বাঙ্গালাদেশ অতি দুর্ভেদ্য স্থান ছিল।

ঈদৃশ দুর্গম দেশের অভ্যন্তরে স্বল্প সংখ্যক পাঠান ছড়াইয়া পড়িলে হিন্দুগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবার ভয় ছিল। যদি পাঠান সর্দ্দারের সঙ্গে উপযুক্ত সৈন্য সামন্ত থাকিত, তবে তাহাদের ব্যয়েই সমস্ত রাজস্ব নিঃশেষ হইত। নবাবের ভাণ্ডারে কিছুই প্রেরিত হইত না। অধিকন্তু পাঠান সর্দ্দারেরা অনেকেই লেখা পড়া জানিত না, আদায় তহশীল কার্য্য কিছু মাত্র বুঝিত না অথচ অতিশয় উগ্র প্রকৃতি এবং বহুব্যয়ী ছিল। তাহারা যুদ্ধস্থলে যেমন বীর ছিল, তেমনই আবার শান্তি সময়ে নিতান্ত অলস ও বিলাসী ছিল। তাহাদিগকে জমিদারী দিলে তাহারা উপযুক্ত পরিমানে রাজস্ব আদায় করিতে পারিত না এবং যাহা আদায় করিত, তাহাই ব্যয় করিয়া ফেলিত। সুতরাং নবাবের নিকট মালগুজারী দিতে পারিত না।

সেই বাকির জন্য পীড়াপীড়ি করিলে অমনি পাঠান সর্দ্দার বিদ্রোহী হইত। এই সমস্ত কারণে নবাবেরা পাঠানদিগকে দেশের অভ্যন্তরে জমিদারী দিতে পারিত না। সুতরাং বাঙ্গালাদেশ মুসলমান-দিগের অধিকৃত হইলেও দেশের অভ্যন্তরে হিন্দু রাজ্যই চলিতে ছিল

* আইন-আদালত--বিচার প্রণালী

(ক) **মন্ত্রীবর্গ।**

(১) দেওয়ান্-ই-আলা=প্রধান মন্ত্রী (Prime minister)

(২) দেওয়ান্ খালশা শরিফা=বা উজীর মালী (Finance minister)

(৩) দেওয়ান্-ই-তন্=তন্ খা দেওয়ান (Paymaster general and minister of the musters)

(৪) দেওয়ান্-ই-বেয়ুতাৎ (Minister of domestic affairs or Home secretary)

(৫) দেওয়ান্-খান্-সামান্ (Lord High Steward)

(খ) **প্রাদেশিক বিভাগ।**

(১) নায়েব্ সুবাদার (বেহার, উড়িষ্যা ও ঢাকায়, তিনজন)

(২) দেওয়ান্ সুবাজাৎ—প্রাদেশিক মন্ত্রী, ইনিই উল্লিখিত তিন সুবার রাজস্ব সচিবও ছিলেন।

(গ) **বিচার বিভাগ।**

(১) কাজী উল কোজাৎ=প্রধান কাজী (Chief Justice) ইনি বাদশাহের নিয়োজিত এবং তাঁহারই অধীন ছিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁর সময়েই বাদশাহী প্রভাবের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে এই পদে সুবাদারের নিয়োজিত যে বিচারপতি স্থাপিত হইয়াছিলেন, পরবর্ত্তী কালে তাঁহার উপাধি সদরস্ সদুর্ হয়। ইনি রাজধানীর প্রধান বিচারপতি।

(২) মুফ্তী=মহম্মদীয় আইনের ব্যাখ্যাকারক। (এইরূপ হিন্দু শাস্ত্র ব্যাখ্যার নিমিত্ত প্রধান প্রধান বিচারালয়ে একজন পণ্ডিত নিযুক্ত হইতেন)

(৩) দারোগা-ই-আদালৎ=নিজামতী ও দেওয়ানী এই দুই প্রধান বিচারালয়ের কর্ম্মকর্ত্তা (Registrar); ভবিষ্যতে ইঁহারই হস্তে বিচারভার ন্যস্ত হয়।

* "বাঙ্গালার ইতিহাস" অষ্টাদশ শতাব্দী নবাবী আমল ঐতিহাসিক গ্রন্থের—কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় প্রণীত। Page No. 468 to 485.

(৪) মোহ্‌তসীব্‌ (মদ্যপায়ী প্রভৃতি কুপথগামীর বিচারক এবং ওজন প্রভৃতির তত্বাবধায়ক=Town Magistrate)

(ঘ) **সামরিক বিভাগ।**

(১) মীর্‌ বক্সী কুল বা সেপাসালার আজম (প্রধান সেনাপতি)

(২) বক্সী দুয়েম্‌, সুয়েম্‌, চাহারম্‌ প্রভৃতি।

(৩) বক্সী আহাদিয়ান্‌ (Commander, royal Guards)

(৪) বক্সী সাগের্দ্দ পেসা (চোপদার প্রভৃতির অধিনায়ক)

(৫) বক্সী সুবাজাৎ; প্রাদেশিক নায়েব সুবার অধীন সেনাপতি।

(৬) জমাদার=পদাতিক সেনানায়ক।

(৭) হাজারী—পঞ্চশত হইতে সহস্র পর্য্যন্ত সেনা-নায়ক। নৌবিভাগে দারোগা এবং তাঁহার অধীন কর্ম্মচারী ছিল।

(ঙ) **সেরেস্তার কর্ম্মচারী।**

(১) মুস্তোফী (দেওয়ানী সেরেস্তাদার)

(২) মুসরেফ্‌ (সেরেস্তার ইন্‌স্পেক্টর)

(৩) খাস্‌ নবীস্‌ (নিজামৎ-প্রাইভেট্‌ সেক্রেটারী)*

(৪) হুজুর নবীস্‌ (সনদ, ফর্ম্মান্‌ প্রভৃতির অধ্যক্ষ)

(৫) দারোগা কাছারী (দেওয়ান্‌ খানার অধ্যক্ষ)

(৬) দারোগা কারখানাজাৎ ও দারোগা-সহরৎ-ই-আম্‌ (Building inspector and inspector, public works)

(৭) আমীন্‌ কাছারী ও আমীন্‌ সুবাজাৎ।

(৮) করোরিয়ান্‌ খালসা (রাজস্ব বিভাগের প্রধান আদায়কারীগণ)।

(৯) পরগণা কানুন্‌গো, পেস্কার প্রভৃতি।

(১০) নানা প্রকার মুন্সী ও মোহরের।

(চ) **খাজাঞ্চীখানা**

(১) খাজাঞ্চী খাজনা জমা—ও খাজাঞ্চী খাজনা খরচ (দুইজন)।

(২) ফোতাদার (পোদ্দার) মুদ্রা পরীক্ষক—ও তদধীন কর্ম্মচারীবর্গ।

(৩) তহবিলদার (মণিমাণিক্যাদি বহুমূল্য দ্রব্যের)।

(ছ) **দৌত্য ও সংবাদ বিভাগ।**

(১) এল্‌চিয়ান্‌ (Ambassadors) ও উকীল।

(২) ওয়াকে নবীস্‌ (দরবারের দৈনন্দিন বৃত্তান্ত লেখক)।

(৩) সওয়ানে নেগার্‌ (সংবাদপত্র লেখক—সরকারী)।

(জ) **ফৌজদারী ও শান্তি রক্ষা।**

(১) ফৌজ্‌দার (আধুনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের মত) কার্য্য বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(২) থানাদার (কোন কোন নগরে স্থাপিত ডেপুটী ফৌজদার)

(৩) কোতোয়াল্‌ (বৃহৎ নগরের পুলিস অধ্যক্ষ)।

(৪) দারোগা-ই-দাগ্‌ (অপরাধীর সন্ধান রক্ষা প্রভৃতি কার্য্য) (কোতোয়াল্‌ প্রভৃতির অধীনে নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারী ছিল)

(ঝ) **অন্যান্য বিভাগ**

(১) মীর্‌ তোজক্‌, (দরবার, জৌলুস্‌ প্রভৃতির তত্ত্ব বিধায়ক)।

(২) মীর এমারৎ (এমারৎ বিভাগের অধ্যক্ষ)।

(৩) দারোগা সায়ের্‌—শুল্ক বিভাগের অধ্যক্ষ; ইহার অধীনে 'আমিন-চৌকিয়াৎ'—নামে প্রত্যেক চৌকীর (শুল্কগ্রহণ স্থানের) প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন সুবাদারের অধীন উল্লিখিত বিভাগগুলি ভিন্ন প্রধান কানুন্‌গো বা সমগ্র ভূসম্পত্তির সাধারণ রেজিষ্ট্রার ছিলেন। ইনি বাদশাহ-নিয়োজিত কর্ম্মচারী। তাঁহার নায়েব, সেরেস্তাদার প্রভৃতি কর্ম্মচারী ছিল। এক্ষণে কতকগুলি প্রধান বিভাগের কার্য্য প্রণালী ও কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

(১) **দেওয়ান**—মুর্শিদকুলী খাঁর রাজ্যকালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাদশাহ নিয়োজিত বাঙ্গলার দেওয়ানই প্রাদেশিক রাজস্ব সচিব ছিলেন। রাজস্ব সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণভাবে সুবাদারের ক্ষমতার বাহিরে। তিনি স্বতন্ত্রভাবে এই

* ষোলঘরের খাস্‌নবীস্‌গণ

বিভাগের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া বাদশাহ দরবারে উজীরের নিকট হিসাব দাখিল করিতেন। বিশেষ গুরুতর কার্য্যে উভয়ে পরামর্শ করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন এইমাত্র ব্যবস্থা ছিল। সরকারী কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত সুবাদারের প্রয়োজন মত টাকা দিতে দেওয়ান বাধ্য ছিলেন বটে, কিন্তু রাজস্ব কার্য্যে তাঁহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। রাজ্যের আয় ব্যয় সম্বন্ধে সমগ্র ভার তাঁহার; এ বিষয়ে তিনি একমাত্র বাদশাহী খাল্সা দপ্তরে দেওয়ানের অধীন ছিলেন। বাদশাহী দেওয়ানের কার্য্য ও অধিকার পরিশিষ্টে প্রদত্ত দেওয়ানী সনন্দের অনুবাদ হইতে দৃষ্ট হইবে। দেওয়ানী বিভাগের কর্ম্মচারীবর্গ সম্পূর্ণরূপে বাদশাহী দেওয়ানের অধীন ছিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁ স্বয়ং শেষ স্বাধীন বাদশাহী দেওয়ান। তাঁহার সুবাদারী আমল হইতে এইরূপ স্বতন্ত্র দেওয়ান নিয়োগের প্রথা উঠিয়া গেল; বাদশাহের ক্ষমতা হ্রাসও ইহার অন্যতম কারণ। কুলী খাঁ দৌহিত্র সর্‌ফরাজের নামে দেওয়ানী পদ লিখাইয়া লইয়া, কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিলেন। বাদশাহী দেওয়ানের জায়গীর ছিল; পরবর্ত্তীকালে এই জায়গীর-ভোগই নবাবের আত্মীয় দেওয়ান্ বাহাদুরের এক মাত্র কার্য্য হইয়া পড়ে। দেওয়ান মুর্শিদকুলী খাঁ সুবাদার হইয়া বাঙ্গলায় খাল্সা দেওয়ানের (রাজস্ব সচিবের) পদ নূতন সৃষ্টি করিলেন। প্রথমে তিনি স্বয়ং এই বিভাগের কার্য্য পরিদর্শন করিতেন; নিজের অধীনে পেস্কার নাম দিয়া একজন প্রধান কর্ম্মচারী রাখিয়াছিলেন। শেষে দেওয়ান্ খাল্সা শরিফা নাম দিয়া এই বিভাগের গুরুভার একজন দেওয়ানের হস্তে অর্পণ করেন। বাদশাহী দেওয়ানের স্থানে পরে 'দেওয়ান-ই-আলা' নাম দিয়া একজন কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হয়। মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে কার্য্যতঃ কেহই দেওয়ান্ আলা ছিলেন না; সরফরাজ্ নামে মাত্র দেওয়ান। সুজা খাঁর সময়ে হাজি আহম্মদ-ই প্রকৃতপক্ষে প্রধান দেওয়ান হইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। সুবাদারী মোহর এই প্রধান দেওয়ানের নিকট থাকিত; রাজকার্য্য সম্বন্ধে গুরুতর ভার সমস্তই তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল।

খাল্সা দেওয়ানের কার্য্য বর্ত্তমান রাজস্ব সচিবের অনুরূপ নহে। রাজ্যের সমগ্র আয় ব্যয় নির্ব্বাহের ব্যাপার ও রাজস্ব বন্দোবস্ত ভিন্ন দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারকের কার্য্যও তাঁহার হস্তে ন্যস্ত ছিল। জমিদার ও প্রজার মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে তিনি স্বয়ং বা তাঁহার প্রতিনিধি দারোগা তাহার বিচার করিতেন। দেওয়ানী আদালতের কার্য্য প্রণালী পরে বিবৃত হইবে। অন্যান্য দেওয়ান্ বা সেরেস্তার কর্ম্মচারীগণের কার্য্য-বিভাগ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ দিবার প্রয়োজন নাই; তাঁহাদের নামই অনেক স্থলে পরিচয় প্রদান করিবে। বর্ত্তমানেও গভর্ণমেণ্টের অনেক বিভাগের কার্য্য প্রণালী প্রায় পূর্ব্ব আদর্শেই পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। রেভেনিউ বোর্ডের মেম্বরে পূর্ব্বতন খাল্সা দেওয়ানের কার্য্য কিয়ৎ পরিমাণে অর্পিত হইয়াছে।

(২) **প্রাদেশিক নায়েব-নাজিম**—রাজকীয় গুরুতর কার্য্য ভিন্ন অন্য সমস্ত কার্য্যই স্বাধীনভাবে নির্ব্বাহ করিতেন। উড়িষ্যা, ঢাকা ও পাটনা এই তিন স্থানেই প্রতিনিধি সুবাদার নিয়োগ করিবার নিয়ম ছিল। কার্য্যতঃ পাটনা ও উড়িষ্যাতেই লোকের প্রয়োজন হইত। ঢাকার নায়েবী পদ নবাবের স্বসম্পর্কীয় কাহারও নামে লিখিত থাকিত মাত্র; একালে তিনি কদাচিৎ তথায় পদার্পণ করিতেন। তাঁহার দেওয়ানই তাঁহার নামে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া জায়গীরের উপস্বত্ব তাঁহার নিকটে পৌছাইয়া দিতেন। প্রাদেশিক নায়েব-নাজিমগণের দেওয়ানের হস্তে রাজস্ব বিভাগ ব্যতীত অন্যান্য বিভাগের কার্য্যও ন্যস্ত ছিল। মুর্শিদকুলী খাঁর রাজ্যকাল হইতে ফৌজদারগণ নায়েব-নাজিমের অধীনে স্থাপিত হন। প্রাদেশিক নায়েব নাজিমগণের পারিবারিক ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য জায়গীর ছিল। নবাবী আমলের শেষ অবস্থায় নবাব পরিবারের সহিত সম্পূর্ণ অসংস্পৃষ্ট হিন্দু ও মুসলমান ওমরাহগণ কিয়ৎকাল নবাব-নাজিমী পদ ভোগ করিয়াছেন।

(৩) **ফৌজদারী ও ফৌজদার**—নবাবী আমলে সমগ্র বঙ্গদেশ নিম্নলিখিত দশটী ফৌজদারীতে বিভক্ত ছিল:—ইস্‌লামাবাদ (চট্টগ্রাম), শ্রীহট্ট, রঙ্গপুর, রাঙ্গামাটী, জেলালগড় (পূর্ণিয়া), আকবর নগর (রাজমহল), রাজশাহী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও বক্‌স-বন্দর (হুগলী)। ইহা ব্যতীত মুর্শিদাবাদ সহরে একজন ফৌজদার ছিলেন ও সুজা খাঁর সময়ে ত্রিপুরা আংশিকরূপে আয়ত্ত হইলে তথায়

একজন ফৌজদার কিয়ৎকাল অস্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বেহার প্রদেশ আটটী ফৌজদারীতে বিভক্ত ছিল; যথা শাহাবাদ, রোটাস, মুঙ্গের, চম্পারণ, বেহার, শারণ, ত্রিহুত ও হাজিপুর। মোগল অধিকারে প্রত্যেক সুবায় প্রত্যন্তভাগ রক্ষা, বিদ্রোহী বা অনায়ত্ত জমিদারবর্গের শাসন ও আন্তর্জ্জাতিক শাসনের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য এই সকল ফৌজদার নিয়োজিত হইতেন। মোগল সম্রাটগণের উন্নতির অবস্থায় এই সমস্ত ফৌজদার বাদশাহ দরবার হইতেই নিয়োজিত হইতেন। দিল্লীশ্বরের প্রতাপের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গলার নবাবগণ অন্যান্য কার্য্যের মত ফৌজদার নিয়োগের ভার স্বহস্তেই গ্রহণ করেন। মুর্শিদকুলী খাঁই প্রথমে এইরূপ স্বীয় মনোনীত ব্যক্তিগণকে নিয়োগ আরম্ভ করেন।

বাদশাহ দরবারে দিল্লীর নিয়োজিত ফৌজদারগণের যথেষ্ট সম্মান ছিল; অনেক সময়ে তাঁহারা সুবাদার অপেক্ষা অল্প সমাদর পাইতেন না। কার্য্যদক্ষ ফৌজদারগণই সুবাদারী প্রভৃতি উচ্চ কার্য্য দ্বারা পুরস্কৃত হইতেন। ফৌজদারগণের মধ্যে অনেকেই কেহ বা এক হাজারী, কেহ দোহাজারী কেহ বা চারী হাজারী পর্য্যন্ত সেনানায়কত্ব (মন্‌সবদারী) প্রাপ্ত হইতেন। পদ ও কার্য্যের গুরুত্ব অনুসারে পাঁচশত হইতে সহস্রাধিক সৈন্য ফৌজদারী সৈন্যরূপে তাঁহাদের অধীনে রক্ষিত হইত; অন্য রূপেও ফৌজদার রীতিমত রাজ সম্মানে ভূষিত হইতেন। তিনি বহির্গত হইলে সঙ্গে ছাতা, আড়ানী ও রণবাদ্য চলিত। (১)

বাদশাহী আমলে ফৌজদার ও তাঁহার অধীন মন্‌সবদারগণ, সদরস্ সদূর্ (প্রধান বিচারপতি), কাজী, বেকায়া-নবীস্ ও সওয়ানেনেগার্ প্রভৃতি কর্ম্মচারীগণ কাগজে কলমে দিল্লী দরবারেরই অধীন ছিলেন। নাজিমের সহিত মিলিত হইয়া বাদশাহী দস্তর উল্ আমল্ অনুসারে কার্য্য করিবেন ইহাই ব্যবস্থা ছিল। এইরূপে নাজিম নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্র কার্য্য হইলেও বস্তুগত্যা তাঁহারা সুবাদারের অধীন কর্ম্মচারীর মতই ব্যবহার করিতে বাধ্য হইতেন। কচিৎ কেহ স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা করিয়া সুবাদারের বিষদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। প্রত্যেক ফৌজদারীর মধ্যে নিয়োজিত সেনানী ও মন্‌সবদারগণ ফৌজদারের আদেশে আপন আপন সৈন্যসহ প্রয়োজন মত তাঁহার সাহায্যার্থ মিলিত হইতেন। ফৌজদারের এলাকা মধ্যে কোন জমিদার বা অন্য কেহ অযথা দুর্গ নির্ম্মাণ বা অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিতে না পারেন এ বিষয়ে ফৌজদারকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইত। অবাধ্য জমীদারগণকে বশীভূত বা উৎখাত করা তাঁহার অন্যতম কার্য্য ছিল; কোন জমীদার বিদ্রোহী হইলে তাঁহাকে ধৃত করিয়া ফৌজদার সুবাদারের নিকট প্রেরণ করিতেন।

দস্যু তস্করাদির শাসন দমন ফৌজদারের অপর কর্ত্তব্য কর্ম্ম; অশান্ত উপদ্রবকারিগণের অত্যাচার হইতে দেশ রক্ষাই তাঁহার কার্য্য ও লক্ষ্য ছিল। দলবদ্ধ দস্যু প্রভৃতির বিরুদ্ধে সসৈন্যে ধাবমান হইয়া তাহাদের সমূলোৎপাটন করিয়া তবে ফৌজদার নিরস্ত হইতেন। প্রয়োজন হইলে প্রতিনিধির উপর কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া ফৌজদার সসৈন্যে সুবাদারের সাহায্যার্থ যাত্রা করিতেন। এইরূপে ফৌজদারগণ সর্ব্বদা স্বকার্য্য সাধনে যত্নশীল হওয়ায় রাজ্য মধ্যে অশান্তির লেশ মাত্র ছিল না। লোকে সচ্ছন্দ চিত্তে নিজ নিজ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ও নিশাযোগে সুখ শয়নে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে নিঃশঙ্ক মনে নিদ্রা যাইত (২)। দস্যু তস্করাদির উপদ্রব সম্পূর্ণভাবে নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে ফৌজদারগণের অধীনে রাজ্যের স্থানে স্থানে থানা স্থাপিত করিয়া তাহাতে থানাদার ও অন্যান্য কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হইত। বর্ত্তমান কালের পুলীস দারোগার ন্যায় শান্তি রক্ষাই থানাদারগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল। ফৌজদারই শান্তিরক্ষা বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। প্রধান প্রধান নগরে এক এক জন কোতোয়াল্ ও তাঁহাদের অধীনে চৌকীদার প্রভৃতি ছিল। গ্রাম্য চৌকীদার ও মণ্ডল, থানাদার ও ফৌজদারের নিকট শাসন ও শান্তি রক্ষার জন্য দায়ী ছিলেন। দূর প্রদেশের ফৌজদারগণের হস্তে রাজস্ব আদায়ের ভার ন্যস্ত ছিল। অন্যান্য স্থানে সরকারী আমিল্ ও ক্রোরী প্রভৃতি কর্ম্মচারীই রাজস্ব আদায় করিতেন।

(১) Mutakherin Trans II. 567-70.

(২) Mutakh II. 572-573.

(৪) **সদরস্ সদুর্**—প্রত্যেক সুবায় এই নামে বাদশাহ নিয়োজিত একজন প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ইনি কাজীগণের উপর আপীল আদালত। আমলাক্, আয়মা ও অন্যান্য মুসলমান ধর্ম্ম বিহিত কার্য্য করিবার জন্য যাঁহারা রাজদত্ত ভূমি ভোগ করিতেন, তাঁহাদের উপর বিশেষতঃ কাজিগণের কার্য্যে দৃষ্টি রাখা ইঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল; মূর্খ ধর্ম্মজ্ঞানহীন লোকে কাজীর পদ পাইয়া যাহাতে উহার অপব্যবহার করিতে না পারে তাহা ইঁহার লক্ষ্য থাকিত। ধর্ম্মার্থে দেয় ভূমির অসদ্ব্যবহার হইলে বা প্রথমতঃ যে উদ্দেশ্যে ব্যক্তি বিশেষকে ভূসম্পত্তি প্রদান করা হইয়াছে—কার্য্যে তাহার ব্যভিচার ঘটিলে ইনি সেই ভূমির পুনর্ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। আয়মাদার-গণের মধ্যে বিবাদ ইঁহার নিকট নিষ্পত্তি হইত। মুসলমান ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মোকদ্দমায় কাজীর বিচারের উপর ইঁহার নিকট আপীল হইত। মুর্শিদাবাদে 'দার উল্ কাজা' নামক প্রধান বিচারালয়ে এইরূপ একজন সদরস্ সদুর্ ছিলেন। নবাবী আমলে অন্যান্য কার্য্যের মত এই বিচার বিভাগও নাজিমের অধীন হইয়াছিল।

(৫) **মোহতসীব্**—সহরবাজারে ব্যবসায়ীগণের কার্য্য পরিদর্শন, বাজার দর নির্দ্দিষ্ট করা ও ওজনের বাট্-খারা প্রভৃতিতে দৃষ্টি রাখা, এই কর্ম্মচারীর প্রথম কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে সর্ব্ব প্রকার বিবাদের মীমাংসা এবং মদ্যপায়ী, দুষ্ট, লম্পট ও অন্যান্য কুপথগামী লোকে প্রকাশ্য স্থানে কোনরূপ অন্যায়াচরণ করিতে না পারে, ইহাও তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য থাকিত।

(৬) **সওয়ানে নেগার্**—(News Writer) নামে সংবাদ লেখক কর্ম্মচারিগণ রাজ্যের নানা স্থানে নিয়োজিত থাকিতেন। কোন স্থানে কি ঘটনা হইতেছে লিপিবদ্ধ করিয়া নবাব বা বাদশাহ দরবারে জ্ঞাপন করাই ইঁহাদের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম ছিল।

বেকায়ানবীস্ নামে এইরূপ একজন কর্ম্মচারী নবাব দরবারে থাকিতেন। দরবারের ও স্থানীয় নানা ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া ইনি বাদশাহের গোচরার্থ প্রেরণ করিতেন। প্রধান প্রধান নগরের সওয়ানে-নেগারগণের সহিত ইঁহার সংবাদ আদান প্রদান চলিত। নবাবী আমলে এই কর্ম্মচারীগণও নাজিমের সম্পূর্ণ অধীন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

(৭) **প্রধান কানুনগো**—[পদের সৃষ্টির বিস্তৃত বিবরণ ইতিপূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে (৮৩—৮৫ পৃষ্ঠা)।] দেশমধ্যে সুবাদার নিয়োজিত পরগণা কানুনগো ছিলেন। পরগণা কানুনগোগণের হস্তে যে সমুদয় কার্য্যভার ছিল, তাঁহাদের রক্ষিত নিম্নলিখিত কাগজগুলি দৃষ্টে তাহা নির্ণীত হইবে (১) দস্তুর উল্ আমল (২) আমল দস্তুর (৩) ফিরিস্ত দেহাৎ (৪) শাহী আমদানী (৫) আব্ওয়াব্গী (৬) দৌল তক্সিস্ বন্দোবস্ত (৭) জমাবন্দী খাস্ (৮) জমা সায়ের চবুতরা কোতয়ালী মায় চৌকীয়াৎ ও গুজার ঘাট (৯) জমা পাঁচ উৎরা (১০) জমা মহল মীর বক্সী (১১) ইসম্নবিসী জমিদারান্ (১২) হকিকৎ বাজে জমা (১৩) জমা মোকররী ও ইস্তমুরারী (১৪) উশুলবাকী (১৫) হকিকৎ ফৌজদারান্। ইহাতে দেশের সমুদয় বার্ষিক বিবরণী প্রদত্ত হইত। কত জমী আবাদী, কি পরিমাণে পতিত, কত মাল, কত লাখেরাজ, প্রজাওয়ারী জমাবন্দী এবং কোন্ শ্রেণীর জমির হার কত ইত্যাদি তাঁহাদের কাগজে দেখান হইত। কানুনগোর কাগজের কল্যাণে গবর্ণমেণ্টের কিসে সুবিধা হয়, জমিদারবর্গের ও আদায়কারীগণের তাহা গোপনের উপায় ছিল না; এবং প্রজাবর্গেরও ক্রমাগত নিরিখ বৃদ্ধির ভয় ছিল না। সদর কানুনগো রাজধানীতে বাস করিতেন। তাঁহার হস্তে সমস্ত প্রদেশের সবিস্তার জমাবন্দী থাকিত। ইনি সম্রাট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেন। সুতরাং বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন এবং প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ও দেওয়ানের অদ্বিতীয় ক্ষমতার উপরে ইঁহারা কিয়ৎ পরিমাণে প্রতিবন্ধকস্বরূপ ছিলেন।

নবাবী আমলে সামরিক বিভাগে দেওয়ান্ ই তন্ নামে (Paymaster of the forces)—কর্ম্মচারী বেতন ও সৈন্যপরিসংখ্যার দেওয়াঁন থাকিতেন। সেপাসালার হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতন সাধারণ সৈনিক পর্য্যন্ত বেতন পাইতেন—ইহাদের জায়গীর

ছিল না। কয়েকজন প্রাদেশিক সামন্তের জন্যই কেবল জায়গীর নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই সামন্ত (মন্‌সবদার) গণ প্রায়ই প্রত্যন্ত প্রদেশে নিয়োজিত থাকিতেন। মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে এইরূপ একবিংশতি সংখ্যক মন্‌সব্‌দারের জায়গীরের পরিমাণ ২০ পরগণায় ১১০৮৫২ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল, ইহাদের অনেককেই পঞ্চশত হইতে সহস্র পর্য্যন্ত সৈন্য লইয়া প্রয়োজন হইলে যুদ্ধকার্য্যে যোগ দিতে হইত। আবার এই মন্‌সব্‌দারগণের মধ্যে দুই একজন ফৌজদার ছিলেন। ইহা ব্যতীত আম্‌লা-ই-আসাম নামে আসামের দিকে প্রত্যন্তভাগ রক্ষার জন্য কিঞ্চিদধিক অষ্ট সহস্র সৈন্য রক্ষার জন্যও জায়গীর নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই সমস্ত সৈন্য পূর্ব্বসীমান্তে চট্টগ্রাম হইতে রাঙ্গামাটী (ব্রহ্মপুত্র তীরে) পর্য্যন্ত সীমান্ত দুর্গাদি রক্ষার জন্য নিয়োজিত ছিল। এই সীমান্ত-রক্ষক মন্‌সব্‌দার ও সৈন্যগণের জায়গীর প্রভৃতি পূর্ব্বব্যবস্থামত নির্দ্দিষ্ট ছিল; নবাবী আমলে জায়গীরের পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস করা হয়।

অনেকের ভ্রান্ত বিশ্বাস আছে যে জায়গীর আমির্ উল্ উম্‌রা বক্সী নামে যে বিস্তীর্ণ জায়গীর নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহাই বাঙ্গালার নবাবী সেনাপতির জায়গীর। এই জায়গীর বাদশাহী প্রধান সেনাপতির, তাহা পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুজাখাঁর সময় হইতে বিশেষতঃ তাৎকালিক বাদশাহ মন্ত্রী ও সেনাপতি খান্ দৌরানের মৃত্যুর পর ক্রমশঃ এই জায়গীরের আয় বঙ্গীয় সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য প্রযুক্ত হইত।

আবুল্ ফজল সুবিখ্যাত আইন্ আকবরী গ্রন্থে বঙ্গের তাৎকালিক সৈন্য সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—পদাতিক ও অশ্বারোহী—২৩৩৩০, কামান ৪২৬০, হস্তী ১১৭০ ও ৪৪০০ রণতরী। তারিখ্ বাঙ্গালা গ্রন্থকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, মুর্শিদকুলী খাঁ দুই সহস্র অশ্বারোহী ও চারি সহস্র পদাতিক সৈন্যই দেশশাসন ও রাজস্ব আদায়ে সাহায্য জন্য যথেষ্ট মনে করিতেন। এই মুষ্টিমেয় সৈন্য বেতনভোগী রাজকীয় সৈন্যদল। মনসবদারগণের অধীন প্রান্ত-রক্ষক সৈন্য ও উল্লিখিত আসাম প্রান্তের নির্দ্দিষ্ট সৈন্য ইহার বহির্ভূত। যুদ্ধে গৌরবলাভ বা পররাষ্ট্র অধিকার দ্বারা রাজ্যবিস্তার নিশ্চয় কুলী খাঁর উদ্দেশ্য ছিল না; সময়ে সময়ে বিদ্রোহদমন আবশ্যক হইলেও এই সামান্য সৈন্যবল সাহায্যে বিংশতি বর্ষ ব্যাপিয়া তিনি সমগ্র বঙ্গ সুশাসনে রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সুজাখাঁ এই মুষ্টিমেয় সৈন্য রাজ্যরক্ষার ও বাঙ্গলার সুবাদারের পদগৌরবের পক্ষে অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া সৈন্যসংখ্যা ২৫০০০ করেন—ইহার অধিকাংশ গোলন্দাজ পদাতি ও অর্দ্ধাংশ অশ্বারোহী। সুজার সময়ে ত্রিপুরা কুচবিহার প্রভৃতি আক্রমণ করা হইয়াছিল। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ে যুদ্ধবিগ্রহে স্থায়ী সৈন্যসংখ্যা ক্রমে বস্তুগত্যাই বর্দ্ধিত হয়। পলাশীর যুদ্ধকালে নবাবের সৈন্যসংখ্যা ৫০ হাজার মিশ্র পদাতিক ও ১৮ হাজার শিক্ষিত অশ্বারোহী, ইংরেজ লেখকগণের গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে।

নবাব মুর্শিদ্‌কুলী খাঁর রাজস্ব বন্দোবস্তে নৌ-বিভাগে ৭৬৮ খানি সশস্ত্র রণতরী ও নৌকা সুসজ্জিত থাকার উল্লেখ আছে। এই গুলি মগ ও অন্যান্য বৈদেশিক জলদস্যুর উৎপাত হইতে উপকূলভাগ রক্ষার জন্য নিয়ন্ত্রিত ছিল। নৌ-সৈন্য ও নাবিকগণের মধ্যে ৯২৩ জন পর্ত্তুগীজ ফিরিঙ্গী ছিল; ইহারা প্রধানতঃ কামান চালাইবার জন্যই নিযুক্ত থাকিত। নবাব ইব্রাহিম খাঁর সঙ্গে প্রথমে এই ফিরিঙ্গীগণ * ঢাকায় যায়। নৌ বিভাগের প্রধান কার্য্যালয় অন্যান্য কার্য্যের সহিত ঢাকা হইতে উঠাইয়া আনা হয় নাই। পূর্ব্বাঞ্চলে ও উপকূল রক্ষার জন্য নদীবহুল ঢাকা হইতেই নৌ-যুদ্ধ পরিদর্শনের সুবিধা। এই নৌ-বিভাগের সমগ্র ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য বাৎসরিক প্রায় আট লক্ষ টাকার জায়গীরের ব্যবস্থা ছিল।

মুর্শিদ্ কুলী খাঁ পূর্ব্বতন নবাবী বিচারপ্রণালীর আমূল সংশোধন করিয়া মুর্শিদাবাদে চারিটী বিচার বিভাগ ও তৎসংসৃষ্ট বিচারালয় স্থাপন করেন:—

(১) আদালৎ উল্ আলিয়া-ই-নিজামত।

---

* "বিক্রমপুর" ফিরিঙ্গীবাজারে তাহারা প্রথম বসবাস করেন।

(২) মহকুমে আদালতে দেওয়ানী।

(৩) মহকুমে কাজা (কাজির আদালত)

(৪) আদালৎ ফৌজদারী।

(১ম) **নিজামত আদালতে** স্বয়ং নাজিম, কাজি, মুফ্‌তী ও উলামাগণ সহ উপবেশন করিতেন। এখানে ওয়াকে-নবীস (রাজকীয় সংবাদদাতা) ও হরকরা প্রভৃতি উপস্থিত থাকিত। অভিযোগ শ্রবণ ও তর্কবিতর্কের পর নাজিম স্বয়ং আদেশাদি প্রদান করিতেন। রাজকীয় অন্যান্য কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকায়, যথাসময়ে এই বিচারালয়ের কার্য্য স্বয়ং নির্ব্বাহ করা কঠিন দেখিয়া এবং বৃদ্ধ দশায় পূর্ব্বের মত পরিশ্রমও সম্ভবপর নহে বিবেচনা করিয়া, এইরূপ অভিযোগে অর্থী প্রত্যর্থীর ও তাহাদের পক্ষের সাক্ষীগণের সমস্ত বক্তব্য শ্রবণ করিয়া সওয়াল্ জবাব আনুপূর্ব্বিক অবগত হইয়া বিচার বিতরণের জন্য নবাব শেষে 'দারোগা আদালৎ উল্ নিজামৎ' নামে একজন প্রধান কর্ম্মচারীকে ধর্ম্মাধিকার স্বরূপে নিয়োগে করিয়াছিলেন। ইনি নবাবের প্রতিনিধি স্বরূপে মোকদ্দমার ফয়সলা, রোয়দাদ, ওজোহাৎ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া, কোন্ পক্ষের ন্যায্য দাবী কি, স্থির হইলে নাজিম-সমক্ষে এক রিপোর্ট পেশ্ করিতেন। কুলী খাঁ সপ্তাহে দুইদিন এই আদালতের কার্য্য পরিদর্শন করিয়া স্বয়ং আদেশ দিতেন; পরবর্ত্তীকালে কার্য্যভার ক্রমশঃ দারোগার হস্তেই অর্পিত হয়। জমিদারে জমিদারে ও জমিদার এবং প্রজার মধ্যে বিশেষ বিবাদ, হিন্দুর বিরুদ্ধে গুরুতর ফৌজদারী অভিযোগ বা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐরূপ মোকদ্দমার বিচার এই আদালতে নিষ্পত্তি হইত। আদালতে জনৈক হিন্দু পণ্ডিতও থাকিতেন।

(২য়) **দেওয়ানী আদালত।** মালী ও মুল্‌কী অর্থাৎ রাজকীয় ও অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত মোকদ্দমার বিচার এই আদালতে নির্ব্বাহ হইত। অনেক সময়ে নিজামত আদালত হইতে এই প্রকারের মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে সোপর্দ্দ হইত। এ বিষয়ে বর্ত্তমান জজ আদালতের ও সব্‌জজের যেরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, উক্ত আদালত দ্বয়ের মধ্যেও সেই সম্বন্ধ ছিল। দেওয়ান্ খাল্‌সা শরিফা অর্থাৎ রাজস্ব সচিব এই আদালতের বিচারপতি। নবাব সুজাউদ্দৌলার সময়ে এই আদালতের অভিযোগ সংখ্যা বড়ই অধিক ও বিচার কার্য্যে বহুদিন ধরিয়া ব্যাপৃত থাকিলে দেওয়ানের অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যে ব্যাঘাত ও ক্ষতি দেখিয়া ব্যবস্থা হয় যে নিজামত আদালতের ন্যায় এখানেও একজন দারোগাই প্রধান বিচারপতি দেওয়ানের অধীনে থাকিয়া কার্য্য-নির্ব্বাহ করিবেন।

(৩য়) **মহকুমে কাজা** বা প্রধান কাজির আদালতে দেশের প্রধান কাজি (বা সদরস্ সদুর) বিচারপতি। মুসলমান ধর্ম্ম ও মুসলমানী বিষয়াধিকার সম্বন্ধে বিচারই এই কাজীর হস্তে ছিল। ইতিপূর্ব্বে এই কাজীর আদালতে হিন্দুর ফৌজদারী বিচারও নিষ্পত্তি হইত। কাজী শরফের ব্যবস্থা হইতে শিক্ষা পাইয়া নবাব কুলী খাঁ ফৌজদারী বিচার কিয়দংশ নিজামত আদালতে ও কিয়দংশ সদর ফৌজদারের আদালতে বিচারের ব্যবস্থা করেন। মফঃস্বলের কাজীর কার্য্য বিবরণ নিম্নে বিবৃত হইল।

(৪র্থ) **আদালৎ-ফৌজদারী**—এই বিচারালয় বহুল পরিমাণে বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতের অনুরূপ; মুর্শিদাবাদের ফৌজদার ইহার বিচারপতি। সহর ও সদর ফৌজদারীর অন্তর্গত স্থানে শান্তি-রক্ষা ও চৌর্য্য প্রভৃতি সাধারণ অপরাধের বিচার এই স্থানে হইত। মফঃস্বলের ফৌজদারগণের কার্য্য বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ঢাকা ও উড়িষ্যায় 'মহকুমে আদালৎ নায়েব-নাজিম' নামে নবাবের প্রতিনিধির এক বিচারালয় স্থাপিত ছিল, এখানে পৃথক দেওয়ানী আদালত ছিল না; অন্যান্য বিচারালয় ও অফিস রাজধানীর মতই ছিল। ঢাকার ফৌজদারী অফিসের নাম 'মহকুমে সহর আমীন' ছিল। 'দার্ উল কাজা' এই উভয় স্থানেই ছিল। দেশের অভ্যন্তরে অনেক স্থলে রাজস্ব আদায় ভারও ফৌজদারগণের হস্তে অর্পিত ছিল। থানাদারগণের সাহায্যে ফৌজদার রাজস্ব বিভাগের কার্য্যও নির্ব্বাহ করিতেন। এই সমস্ত স্থানে ফৌজদারী ও কাজির আদালত দুই থাকিত। অন্যান্য প্রধান নগরে ও মফঃস্বলে স্থান বিশেষে কাজির আদালত স্থাপিত ছিল।

নিজামত আদালতে দারোগার নিকট বাদীর দরখাস্ত পেশ্ হইত। প্রতিবাদীর বাসস্থান নিকটবর্ত্তী হইলে দারোগার মোহর ও চিহ্নযুক্ত আর্জির নকল সেরেস্তা হইতে পদাতিক যোগে ঐ গ্রামে মির্দ্ধা বা মণ্ডলের নিকট প্রেরিত হইত। মণ্ডল প্রতিবাদীর উপর ঐ দস্তক (সমন) জারি করিয়া ধার্য্য দিনে উপস্থিত হইবার জন্য জামিন লইয়া ছাড়িতেন। প্রতিবাদী বহু দূরবর্ত্তী স্থানের অধিবাসী হইলে তত্তৎ স্থানের জমিদারের রাজধানীস্থ উকীলের উপর ঐ প্রজাকে উপস্থিত করিয়া দিবার ভার হইত। উকীল অসমর্থ হইলে একখানি এব্‌রানামা (অসামর্থ্য জন্য স্বীকার পত্র) লিখিয়া জানাইতেন—এই কারণে উক্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত করিয়া দিতে তিনি বা তাঁহার জমিদার অক্ষম। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে সরকারী হরকরা দ্বারা মণ্ডলের যোগে প্রত্যর্থীকে উপস্থিত করা হইত। অর্থী প্রত্যর্থী উপস্থিত হইলে দারোগাই বিচার করিতেন— প্রয়োজন হইলে অন্যের সাহায্যও গ্রহণ করিতেন। প্রত্যেক ব্যক্তি আপন সাক্ষী লইয়া আসিত। সাক্ষী আনয়নে অক্ষম হইলে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে সাক্ষী উপস্থিত করার ব্যবস্থা ছিল।

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ প্রতিদিন (চেহেল্‌সুতুন্ দরবার-গৃহে) এই কাছারীতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইতেন। প্রথমে প্রত্যেক প্রধান স্থানের রিপোর্ট শুনান হইত। এই সমস্ত রিপোর্টের মধ্যে হত্যাকাণ্ড, ডাকাইতি, রাহাজানী প্রভৃতির উল্লেখ থাকিলে অপরাধীকে ধৃত করণ জন্য ফর্ম্মান বাহির হইত। প্রতি বর্ষে জলুসের (বাদশাহের সিংহাসনারোহণের) দিন এখানে প্রকাণ্ড দরবার হইত— এই দরবারে সমস্ত প্রধান কর্ম্মচারী ও দেশস্থ গণ্যমান্য লোক উপস্থিত থাকিতেন। এ দিন দারোগার নিকট পক্ষগণের বক্তব্য শুনিয়া কাজি মুফ্‌তী প্রভৃতির পরামর্শে নবাব জটিল মোকদ্দমার বিচার নিষ্পত্তি করিতেন। নরহত্যার মোকদ্দমা সাধারণতঃ নবাব স্বয়ং বিচার করিতেন। নবাব সপ্তাহে দুইদিন বিচারাসনে উপবিষ্ট হইতেন। এই আদালতে মোকদ্দমার ভার সাধারণতঃ দারোগার উপরেই অর্পিত ছিল। বাকী-কর সম্বন্ধীয় মোকর্দ্দমা খালসা দেওয়ানের এবং ফৌজদারী ও সৈন্যগণের সম্বন্ধে মোকদ্দমা নিজামত দেওয়ানের নিকট বিচার জন্য সোপর্দ্দ হইত। গুরুতর মোকদ্দমায় নাজিমের সম্মতি ভিন্ন বিচার হইত না। উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে অধিকাংশ মোকর্দ্দমা সালিশগণের হস্তে সমর্পিত হইত। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গুরুতর মোকর্দ্দমা বিদ্বানগণের সমবেত দরবারে বা কাজির নিকট সোপর্দ্দ হইয়া বিচারের ব্যবস্থা ছিল। অনেক সময়ে ফৌজদার, আমিল্ প্রভৃতি মফঃস্বলের কর্ম্মচারীগণের নিকটেও কোন কোন মোকর্দ্দমা বিচার জন্য প্রেরিত হইত।

কোন জমিদার বা তালুকদারকে উৎখাত ও প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নাজিম নিজামত আদালতে বা দরবারে খালসা দেওয়ানের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া তাহার আদেশ দিতেন। ইতিপূর্ব্বে নরহত্যার মোকর্দ্দমা প্রধান কাজিই নির্ব্বাহ করিতেন; অনেক সময়ে (কাজি শরফ্ ও বৃন্দাবনের ঘটনা) কাজির ধর্ম্মান্ধতায় অবিচার হওয়ার সন্দেহে কুলী খাঁ এই জাতীয় মোকর্দ্দমা স্বীয় আম্ দরবারে নিষ্পত্তি করিবার ব্যবস্থা করেন। কাজির হস্তে এই অবধি মুসলমান ধর্ম্ম ও দায়াধিকার প্রভৃতির বিচার ভারই ছিল। নরহত্যা, ডাকাইতি প্রভৃতি মুসলমান সরার মতে হইত; অন্যান্য বিষয়ে হিন্দুদের হিন্দু শাস্ত্রমতে, মুসলমানগণের মুসলমান শাস্ত্রমতে কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। হিন্দুগণের এই জাতীয় মোকর্দ্দমা দেওয়ান স্বীয় আদালতে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের মীমাংসা মতে নিষ্পত্তি করিতেন।

দেওয়ানী আদালতেও একজন প্রধান কর্ম্মচারী বা দারোগা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। দারোগা উভয় পক্ষের বাদ প্রতিবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া খালসা দেওয়ানের নিকট পেশ্ করিলে দেওয়ান বিচার করিতেন। অনেক সময়ে সেরেস্তাদার, কানুনগো প্রভৃতির পরামর্শ মতে বিচার কার্য্য নিষ্পন্ন হইত। জমিদারগণের সীমানা সরহদ্দ লইয়া বিবাদ এবং প্রজার দেয় বাকী খাজানার জন্য প্রধান প্রধান মোকর্দ্দমাই এই সদর কোর্টে প্রধানতঃ বিচার্য্য ছিল। প্রজার মধ্যে বিবাদ সেকালে সাধারণতঃ জমিদারই নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন; সামান্য বিবাদ, গ্রাম্য মণ্ডল ও পঞ্চায়েৎ মীমাংসা করিতেন। সীমানা সংক্রান্ত বিবাদে আনুপূর্ব্বিক অনুসন্ধান জন্য কানুনগোর সহিত জনৈক

প্রধান আমিল সরেজমিন তদন্তে প্রেরিত হইতেন। নিজামত আদালতের প্রথামত দেওয়ানের আদালতের দস্তক ও পরোয়ানা জারি হইত। নিকটবর্ত্তী স্থানে হইলে দেওয়ানের দস্তখতের চিহ্ন ও মোহর যোগে প্রেরিত হইত। দূরবর্ত্তী স্থানে নাজিমের মোহরও প্রদত্ত হইত এবং 'মুলাহিজা সোদ' = দৃষ্ট হইল, বলিয়া লেখা থাকিত। অর্থী প্রত্যর্থীর অভিমতানুসারে কোন মোকর্দ্দমা সালিশে সোপর্দ্দ হইলে সালিশ মধ্যস্থগণ তাহার বিচার করিয়া স্বীয় দস্তখত ও মোহরযুক্ত ফয়সলা প্রস্তুত করিতেন; দেওয়ান উহার উপরে চূড়ান্ত আদেশ দিতেন। প্রজা বা সামান্য তালুকদারগণের বিবাদে জমিদারগণের বিচারের উপর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইত। হিসাব নিকাশ সম্বন্ধের বিবাদে মুতঃসুদ্দী ও কানুন্‌গোগণের হস্তে তদন্ত হইয়া রিপোর্ট আসিলে দেওয়ান তাহার যথাযথ বিচার করিতেন। জমিদার প্রভৃতির বা সাধারণ হিন্দু প্রজার দায়ভাগ বা উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিচার বিষয়ে পণ্ডিত-গণের ব্যবস্থাপত্র এবং মুসলমান হইলে আলেম্ (পণ্ডিত) গণের 'ফতুয়া' দৃষ্টে দেওয়ান চূড়ান্ত আদেশ দিতেন। কানুন্‌গো বা মুতঃসুদ্দীগণ ইহার যথারীতি ফয়সলা প্রস্তুত করিয়া দিলে নাজিমের নিকটে পেশ হইত এবং তাহার দস্তক ও মোহর দিয়া লওয়ার ব্যবস্থা ছিল। অবশ্য সকল ক্ষেত্রে নাজিমের সমস্ত বিষয় পরিদর্শন অসম্ভব ছিল। প্রথামত তাহার মোহর পড়িত মাত্র। অনেক মোকর্দ্দমা আবার দেওয়ানী আদালত হইতে নিজামত আদালতে সোপর্দ্দ হইত। শাসন ও বিচার বিভাগ স্বতন্ত্র হইলেও সকল বিভাগেরই চূড়ান্ত বিচার নাজিমের নিজ হস্তে ছিল।

মুসলমানগণের বিবাহ সম্বন্ধীয় মোকর্দ্দমা, নিরুদ্দেশ লোকের বিষয় সম্বন্ধে ব্যবস্থা, অসিয়ৎ (উইল্), উত্তরাধিকার, তৌলিয়ৎ (trustee—ন্যাসরক্ষী) প্রভৃতি ও সর্ব্বপ্রকার লোকের বিষয় ক্রয়বিক্রয়, স্থিতাবদ্ধ, কট্-কোবালা (বয়বিল্ ওফা,) মুসালেহা (মীমাংসা নিষ্পত্তি), এব্‌রা (নাদাবিনামা), ইজারা, হেবা (দান) ইত্যাদি বিষয়ের বিচারভার কাজির হস্তে ন্যস্ত ছিল। কার্য্যপ্রণালী নিজামত আদালতেরই মত; পার্থক্যের মধ্যে এই, এখানে জমিদারের বা অন্য কাহারও উকীল উপস্থিত থাকিতেন না। কাজী স্বাধীনভাবে বিচার করিতেন; কচিৎ নাজিমের নিকট আদেশ জন্য প্রেরিত হইত। দস্তক-গুলিতে কাজীর মোহর থাকিত। স্বয়ং কাজী বা তাহার বিচারালয়ের জনৈক উলামা (বিদ্বান্) মুসলমান ব্যবহার-শাস্ত্রমতে বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। মফঃস্বলের কোন মোকর্দ্দমা শহরের কাজীর আদালতে উপস্থিত হইলে তাহার সুবিচার জন্য তত্তৎ স্থানের ফৌজদার বা কাজীর মতামত অবগত হওয়া ব্যবস্থা ছিল।

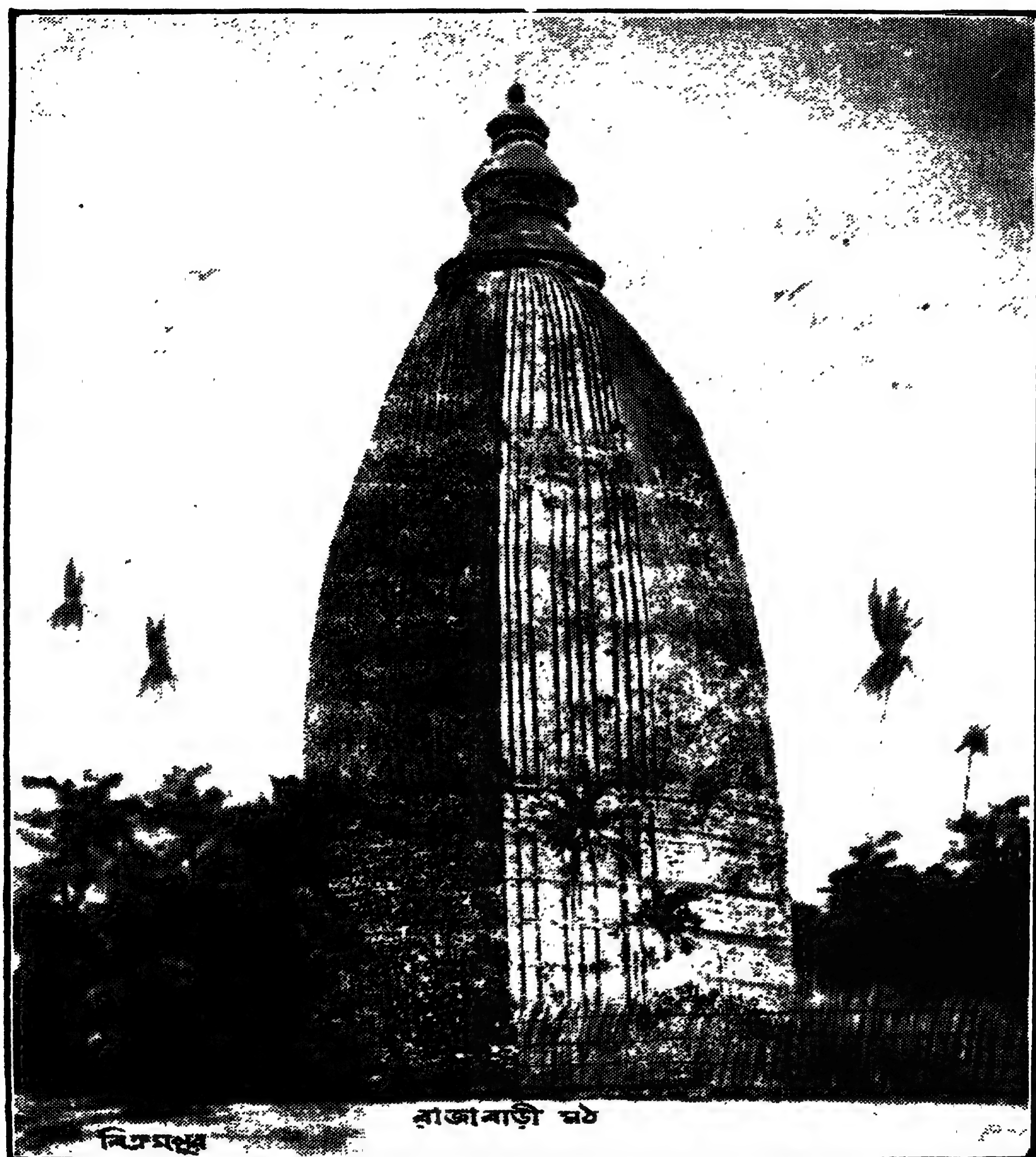
কাজীর আদালতের একটী প্রাচীন ফয়সলার নমুনা দৃষ্টে অনুমিত হয় যে, বর্ত্তমান ফয়সলা ইহারই আদর্শে রচিত। ইহাতে সংক্ষেপে উভয় পক্ষের বাদ প্রতিবাদ উল্লেখ করিয়া আদেশ মাত্র দেওয়া আছে।

থানাদারেরা নগরের ফৌজদারের নিকট দৈনন্দিন ঘটনার বিবরণী পাঠাইতেন। ফৌজদার গুরুতর বিষয়ে নাজিমের আদেশ গ্রহণ করিতেন। পল্লীর সমস্ত ঘটনা এইরূপে থানাদার ও ফৌজদারের মীমাংসার উপর নির্ভর করিত। ফৌজদারের আদালতে কানুন্‌গো ও মোহরের থাকিতেন। নরহত্যার মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইলে কাজী, মুফ্‌তী প্রভৃতির পরামর্শ গ্রহণ করিয়া নাজিমের নিকট বৃত্তান্ত ও আইনঘটিত সমস্ত বিষয় বিজ্ঞাপিত করা হইত। কোন সময়ে এইরূপ মোকর্দ্দমা কাজীর নিকটও সোপর্দ্দ হইত। নাজিমের আম্ দরবারে সরার মতানুসারে প্রাণদণ্ডের বিচার হইলে সহরের ফৌজদার ঐ আদেশ কার্য্যে পরিণত করাইতেন। এই আদালতের দস্তক জারির প্রণালী অন্যান্য আদালতের মত ছিল। সদর ফৌজদার স্বয়ং কোন মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তি করিতে পারিতেন না; প্রাথমিক তদন্ত ও অনুসন্ধানই প্রধানতঃ তাঁহার কার্য্য ছিল। মুর্শিদাবাদ ফৌজদারীর অন্তর্গত স্থানেই সহরের ফৌজদার শাসনদণ্ড চালনা করিতেন এমন নহে; দূরস্থ স্থানের পুলিস্ সম্বন্ধীয় কর্ত্তৃত্ব ও অনুসন্ধানও সহরের ফৌজদারের ভার ছিল। মফঃস্বলের (প্রাদেশিক) ফৌজদারগণের কার্য্য ও অধিকার পূর্ব্বেই বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা গিয়াছে।

দেওয়ানী বিচার সম্বন্ধে জমিদারী বা রাজকীয় বিচারালয়ে হিন্দুর হিন্দুশাস্ত্র মতে ও মুসলমানের কোরাণ-সম্মত বিধান অনুসারে (সরা) বিচার হইলেও ফৌজদারী বিচার ও শাস্তি মুসলমান আইন্ মতে প্রদত্ত হইত।

বলা বাহুল্য হিন্দু ব্যবস্থা-শাস্ত্রের শাস্তি শান্তশীল সমাজের উপযোগী বলিয়া মুসলমান বিধান অপেক্ষা যথেষ্ট কোমলতর ছিল। প্রাণদণ্ড প্রচলিত থাকিলেও ভালদেশে উত্তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা চিহ্ন প্রদান ও অর্থদণ্ডই হিন্দুসমাজে ব্যবহার্য্য ছিল; অপরাধীকে সমাজের চক্ষে অবনত করাই হিন্দু ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য। মুসলমান আইনে প্রাণদণ্ড ভয়াবহ ছিল; শূলে আরোপণ, বিবাহিত পুরুষের পরস্ত্রীগমনে বা বিধর্ম্মীর মুসলমানের ধর্ম্মহানিতে লোষ্ট্র-নিক্ষেপে বধ (কাজীশরফের দৃষ্টান্তে তীরক্ষেপে)—ভয়ানক ডাকাইতি বা রাহাজানী ও নরহত্যায় শরীর দ্বিধা বিভিন্ন করিয়া সাধারণ স্থানে বা বৃক্ষোপরি লম্বায়মান করা, প্রভৃতির প্রচলন ছিল। অবিবাহিত পুরুষ বা স্ত্রীর ব্যভিচারে একশত পর্য্যন্ত বেত্রাঘাত দণ্ড, চুরি ডাকাইতি প্রভৃতি অপরাধে অঙ্গহানি প্রভৃতি শাস্তি প্রদত্ত হইত। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে হাবড়ায় এইরূপ এক আদর্শ শাস্তির কথা উল্লিখিত আছে। (১) 'চৌদ্দজন ডাকাইত হুগলীর ফৌজ্‌দারের বিচারে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় প্রত্যেকের বামপদ ও দক্ষিণ হস্ত মণিবন্ধ পর্য্যন্ত কর্ত্তিত হইল। হস্তপদ বন্ধন এবং চীৎকার নিবারণার্থ মুখ বন্ধ করিয়া এই কর্ত্তন ব্যাপার সম্পন্ন হইল। তৎপরে একে একে কর্ত্তিত স্থানগুলি উত্তপ্ত ঘৃত-কটাহে নিমজ্জিত করিয়া লইয়া হতভাগ্যগণকে পরিত্যাগ করা হয়।' তৎক্ষণাৎ কেহ পঞ্চত্ব না পাইলেও পরিণাম ফল অবশ্যই সহজবোধ্য। মুর্শিদ্‌কুলী খাঁর রাজ্যকালে কাটোয়ার ফৌজদারের আদেশে রাজপথে রাহাজানীর নিমিত্ত অপরাধিগণকে উর্দ্ধাধভাবে দ্বিখণ্ড করিয়া বৃক্ষোপরি লম্বিত করিবার কথা আছে। এই ফৌজ্‌দার-প্রবর 'কুড়ালিয়া' উপাধি লাভ করেন,—বহির্গত হইবার সময় ইঁহার অগ্রে অগ্রে কুড়ালী-ধারী ঘাতক যাইবার প্রবাদও আছে।

(১) Busteed, Echoes from old Calcutta.



রাজাবাড়ী মঠ

বিক্রমপুর

নবম অধ্যায়।

চাঁদ কেদার রায়

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিক্রমপুরের রাজনৈতিক আকাশ এক নবীন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। স্বাধীনতার ভীষণ আহবে বিক্রমপুরের তদানীন্তন অধিপতি কেদার রায় তদীয় সুশিক্ষিত বাঙ্গালী যোদ্ধবৃন্দের সহায়তায় মোগলের বিরুদ্ধে বৎসরের পর বৎসর লড়িতে ভয় পান নাই। বরং তিনি নানারূপ বিপদের মধ্যে পতিত হইয়াও অপরিসীম সাহসিকতা ও অসামান্য বীর্য্যবত্তার সহিত মোগলকুল-তিলক সম্রাট আকবরের সেনাপতি শত যুদ্ধজয়ী মহারাজ মানসিংহের বিশ্ববিজয়ী ভ্রূকুটী উপেক্ষাই করিয়াছিলেন। কেদার রায় ইতিহাস প্রসিদ্ধ "বার ভূঁঞার" অন্যতম ভূঁঞা। *

ভূঁঞা শব্দটী সংস্কৃত ভৌমিক শব্দের অপভ্রংশ। ভৌমিক অর্থে ভূমির অধিপতি, জমিদার। সৃষ্টির প্রারম্ভে একাদশ প্রজাপতি দ্বারা পৃথিবী শাসিত হইত। সেই নিয়ম অনুযায়ী পরবর্ত্তী যুগে সম্রাট কর্ত্তৃক দ্বাদশ জন সামন্ত নৃপতির সাহায্যে সাম্রাজ্য শাসন করিবার নীতি প্রচলিত হয়। সামন্ত নৃপতিগণ স্বীয় রাজ্য-শাসনাদি কার্য্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন; কেবল সম্রাটকে বাৎসরিক একটা কর তাহারা দিতেন। ভূমির অধিপতি বলিয়া এই সমস্ত সামন্ত রাজগণকে ভৌমিক বলা হইত। ভৌমিক শব্দই পরবর্ত্তী কালে কথ্য ভাষায় রূপান্তরিত হইয়া "ভূঁঞা" শব্দে পরিণত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে বহুদিন হইতেই বার"ভূঁঞা" শব্দটী প্রচলিত; কিন্তু কে এই সমস্ত ভূঁঞাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহার সঠিক কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্য, কবিকঙ্কণের চণ্ডী এবং মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থেও ভূঁঞা শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে বলেন, যে মুসলমান শাসন সময়ে এই সমস্ত ভূঁঞাগণের উৎপত্তি হয়। কিন্তু এই মতটী কোনমতেই সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কারণ মুসলমান সময়ের উপাধি প্রভৃতিতে আরবী বা পারসী শব্দই ব্যবহৃত হইত। তাই মনে হয়, এই সংস্কৃত ভৌমিক, তদপভ্রংশে ভূঁঞা শব্দটী গৌড়

* শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তীর পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত

বা নবদ্বীপের হিন্দু নৃপতিগণের প্রদত্ত। ডাক্তার ওয়াইজ সাহেবও এই মত পোষণ করেন *। ঐতিহাসিক নিখিল বাবু বলেন যে পালরাজত্ব সময়ে এই ভূঞাগণের প্রচলন হয় †। ঐতিহাসিক Hunter সাহেব বলেন যে, পালবংশীয় বৌদ্ধ শাসনকর্ত্তাগণ ভূঁঞা উপাধিতে অভিহিত হইতেন। ‡ যথা :—"The Bhuya or Budhist Rajas (Founders of the Paldynasty of the Kings of Bengal) are the next rulers spoken of.—আমাদের কিন্তু মনে হয় যে, মুসলমান শাসনের বহুপূর্ব্ব হইতেই হিন্দুশাসন সময়ে সম্রাট স্বীয় সাম্রাজ্যকে সুশাসিত করিবার জন্য স্থানে স্থানে শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করিতেন এবং উহাদের অধীনে আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার প্রভৃতিকেও নিয়োগ করিতেন। হিন্দু আমলে এই ভাবে রাজ্যশাসনের ব্যবস্থা ভারতের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তর পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। এই সমস্ত শাসন-কর্ত্তাদিগকে যথাক্রমে বড় ভূঁঞা, মধ্য ভূঁঞা, ছোট ভূঁঞা প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইত। ডাক্তার জে, ওয়াইজ সাহেব বলেন যে—"The Raja of Kachar conferred the titles of Bara Bhuya, Madhya Bhuya, and Chotta Bhuya on any petty land-holder (Mirasdar) who paid him a fee of fifty rupees. § পরবর্ত্তীকালে হয়'তো এই বড়ভূঁঞা শব্দটাই রূপান্তরিত হইয়া বারভূঞা শব্দে পরিণত হইয়া থাকিবে। পরবর্ত্তীকালে মুসলমান শাসন সময়ে বড় ভূঁঞা শব্দটী বারভূঞা নির্ব্বাচনেই কায়েমী বন্দোবস্ত করিয়াছিল। বঙ্গদেশ দিল্লী হইতে বহু দূরবর্ত্তী এবং নদী বহুলা বলিয়া দিল্লীর সম্রাটের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ বাংলার বুকে কখনও অপ্রতিহত ক্ষমতা বিস্তার করিতে পারে নাই। বাংলায় একজন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা দিল্লীর পক্ষে নিযুক্ত থাকিতেন, কিন্তু দেশ শাসন করিতেন, প্রকৃত পক্ষে এই সমস্ত বারভূঁঞা উপাধি ভূষিত নৃপতিবৃন্দ। সময়ে সময়ে এই সমস্ত ভূঞাগণ সুযোগ ও সুবিধামত স্বাধীনতার বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াইয়া দিল্লীর অধীনতা পাশ ছেদন করিতেন।

প্রকৃতপক্ষে সেই সময়ে ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, ভুলুয়া, যশোহর, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলা বারভূঁঞাগণ কর্ত্তৃকই শাসিত হইত। মোগল সম্রাট আকবর যখন দিল্লীর সিংহাসনে আসীন, তখন বঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশের

* The titles bestowed by the Delhi Kings were mostly Arabic or Persian, rarely Sanskrit. It is probable therefore, that Bhowmik was conferred by the Hindu Princes of Gour or Nadiya. J. R. A. S. 1874. P. 198.

† যে সময়কার সাহিত্যে ও অন্যান্য গ্রন্থাদিতে ভূঁইয়া শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, সে সময়ে পালরাজগণ বাঙ্গালা দেশের অধিপতি। তাঁহারা সমগ্র বঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর থাকায়, সম্ভবতঃ ভূঁইয়াগণ তাঁহাদের অধীন সামন্ত-রাজ রূপেই গণ্য হইতেন। ধর্ম্মমঙ্গলাদি গ্রন্থে পালরাজগণের সঙ্গে বারভূঁইয়াগণের উল্লেখ দেখা যায়। ধর্ম্মমঙ্গলে রাজসভা বর্ণনোপলক্ষে বারভূঁইয়ারও বর্ণনা দৃষ্ট হয়। বিবাহাদি উৎসবে বারভূঁইয়ারা বরমাল্য প্রভৃতি দান করিতেন। মাণিক গাঙ্গুলী কামরূপাধিপতিকে গৌড়েশ্বরের বারভূঁইয়ার অন্যতম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বারভূঁইয়াগণ সামন্ত-রাজাই ছিলেন।

‡ Hunter's Statistical Account of Dacca, P. 118,

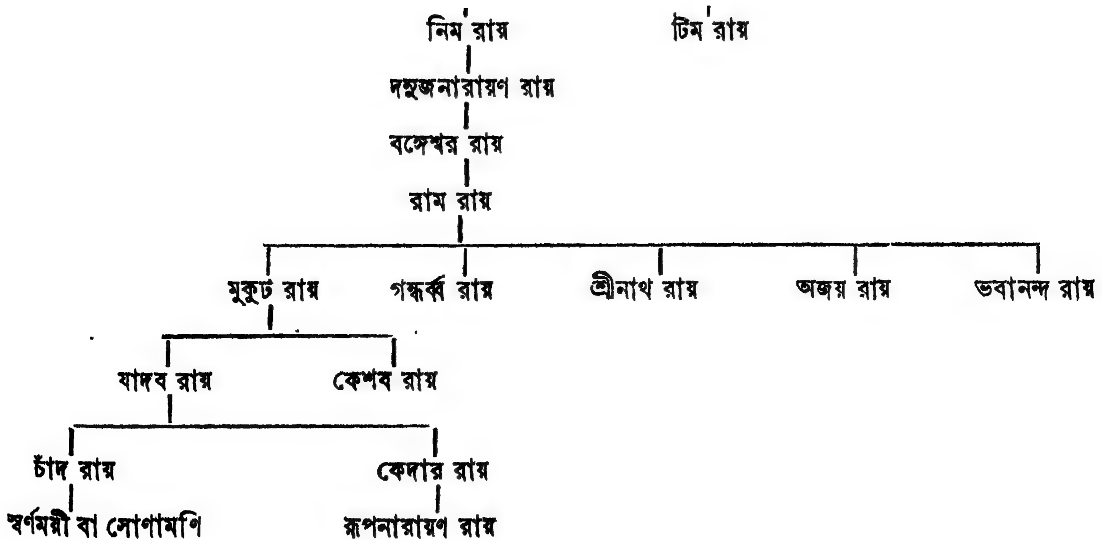
§ J. R. A. S. on the Barah Bhuyas of Eastern Bengal by J. wise, Page 198.

শাসনকার্য্য নিম্নলিখিত বিভিন্ন ভুঁঞার দ্বারা নির্ব্বাহ হইত। ফজল গাজী—ভাওয়াল; ঈশাখাঁ মস্‌নদআলী—খিজিরপুর (সোনারগাঁ); চাঁদরায়, কেদার রায়—বিক্রমপুর; কন্দর্পনারায়ণ—চন্দ্রদ্বীপ লক্ষ্মণ মাণিক্য—ভুলুয়া; মুকুন্দ রায়—ভূষণা; রামকৃষ্ণ—মাতৈল; চাঁদগাজি, চাঁদপ্রতাপ, প্রতাপাদিত্য—যশোহর; এবং হাম্বির মল্ল যথাক্রমে বিষ্ণুপুর শাসন করিতেন।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতানুসারে চাঁদরায় কেদাররায়ের পূর্ব্বপুরুষ দাক্ষিণাত্য হইতে এদেশে আসেন এবং এই দেশীয় রাজশক্তির সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া ধীরে ধীরে ভৌমিকত্ব লাভ করেন। ডাক্তার Wise সাহেব বলেন যে, "The tradition is, that about a hundred and fifty years before the reign of Akbar, Nimrai came from Karnata and settled at Araphulbaria in Vikrampur. He is believed to have been the first Bhuan, and to have obtained the sanction of the ruling monarch to his retaining the title as a hereditary one in family. (১) ডাক্তার Wise এর মতে চাঁদ কেদারের পূর্ব্ব পুরুষ নিমরায় সম্রাট আকবরের প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে কর্ণাট হইতে বঙ্গে আগমন করেন। কিন্তু ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় যে বংশলতা মূলচর গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রায় মহাশয়ের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে নিমরায়ের উৰ্দ্ধতন দুই পুরুষের নাম পাওয়া যায়। (২) আবার কেহ কেহ বলেন যে, কেদার চাঁদরায়ের পুত্র ছিলেন। সে যাহা হউক, কেদার যে চাঁদরায়ের ভ্রাতা ছিলেন এই কথাটাই আমাদের নিকট বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয়। বিক্রমপুরের সর্ব্বজনবিদিত সুপ্রচলিত প্রবাদ,

(১) James Wise—"On the Barah Bhuyah, Asiatic Society Journal. 1874 .

(২)



এবং কোন কোন বৈদেশিক ঐতিহাসিক বলেন যে, কেদার রায় ও চাঁদরায় সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। স্বর্ণময়ী বা সোণামণি চাঁদরায়ের কন্যা। কোন কোন ঐতিহাসিক স্বর্ণময়ীকে চাঁদ কেদাররায়ের ভগ্নী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ইংরেজী ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে পর্ত্তুগীজ পাদ্রী নিকোলা পিমেণ্টা কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুরে থাকিয়া, খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেন। তিনি তাহার Relatio Historica de Rebues in India Orientali নামক গ্রন্থে কেদার রায়কে চাঁদ রায়ের ভ্রাতা বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।

চাঁদরায় কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি ভূঁঞাগণের অভ্যুদয়ের প্রথমাবস্থায় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র শক্তি কতকটা নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। পাঠানেরা মোগলের পদতলে দিল্লীর সিংহাসন বিসর্জ্জন দিলেও বহু বৎসর পর্য্যন্ত, বঙ্গ, বিহার এবং উড়িষ্যা নিজেদের করতলগত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মোগল সম্রাট আকবর তৎপর বহু যুদ্ধবিগ্রহ এবং শোণিত সিঞ্চনে ধীরে ধীরে পাঠানদিগকে পরাভূত করিয়া বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন মাত্র। দেশব্যাপী এই ঘোর অরাজকতা এবং বিষম গণ্ডগোলের মধ্যে বাংলার ভূস্বামিগণ ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিয়া পরাক্রমশালী হইয়া উঠিতেছিলেন। পাঠানগণ ধীরে ধীরে বঙ্গ হইতে বিদূরিত হইলেও সময় সময় বিহার, বঙ্গ, উড়িষ্যার নানা স্থানে বিদ্রোহের সৃষ্টি করিয়া আকবরের শাসন শক্তিকে এমন ভাবে ব্যাপৃত রাখিয়াছিলেন যে, বঙ্গের এই সমস্ত ভূঁঞাগণের শক্তি সঞ্চয়ে বাধা দিতে দিল্লীর সম্রাটের তখন কোন উপায়ই ছিল না। তৎপরে বহু যুদ্ধাদির পর পাঠানেরা সর্ব্বত্র পরাভূত, বিজিত এবং বিচ্ছিন্ন হইয়া, মোগলের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। পাঠানের পতনে দেশে ঘোর বিশৃঙ্খলার অবসান হইলে, দিল্লীর রাষ্ট্রশক্তি বঙ্গের এই সমস্ত ভূস্বামিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার সুযোগ পান। অতঃপর সম্রাট আকবর তাঁহার বিশ্বস্ত সূক্ষ্মদর্শী রাজনীতিজ্ঞ কর্ম্মচারীবৃন্দের সহায়তায়, বাংলার ভূস্বামিগণের ক্ষমতা খর্ব্ব করার মানসে, বাঙ্গালায় শাসনকার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য কূটরাজনীতিজ্ঞ টোডরমল্লকে দিয়া সমস্ত বঙ্গদেশ জরিপ জমাবন্দী করান। রাজা টোডরমল্ল ইংরাজী ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের ওয়াশীল তুমারজমা প্রস্তুত করেন, তাহাতে ১,০৬,৯৩,১৫২ এক কোটী ছয়লক্ষ তিরানব্বই হাজার একশত বায়ান্ন টাকা বঙ্গ রাজ্যের মালগুজারী নির্দ্দিষ্ট হয়। এই সমস্ত নূতন বন্দোবস্তে ভূস্বামিগণের ক্ষমতা অনেকাংশে খর্ব্ব হইয়া পড়ে;—ইহাতে রুষ্ট হইয়া বঙ্গীয় ভূঁঞাগণ দলবদ্ধ হইয়া নিয়মিত রাজস্ব প্রদানে বিরত হন। দিল্লীর ক্ষমতাকে এমনভাবে উপেক্ষা করায় সম্রাট আকবর ভীষণ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠেন এবং প্রধান সেনাপতি অম্বরাধিপতি মানসিংহকে এই ভূঁঞা-বিদ্রোহ দমন জন্য বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। বহু যুদ্ধের পর মানসিংহ বঙ্গে শান্তিস্থাপন করিতে সমর্থ হন। বারভূঁঞাদের মধ্যে বিক্রমপুরাধিপতি চাঁদরায় কেদার রায়, সোণারগাঁর অধিশ্বর ঈশাখাঁ মসনদ আলী এবং যশোহর কেশরী প্রতাপাদিত্য রায় স্বাধীনতার যুদ্ধে বীরকেশরী মানসিংহের সহিত শক্তি পরীক্ষায় পশ্চাৎপদ হন নাই। ঈশা খাঁ মসনদ আলী ধনে এবং জনবলে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি মানসিংহ কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া মোগলের পাদুকালেহন করতঃ কৃতার্থ হইয়াছিলেন। কেবলমাত্র হিন্দুবীর কেদার, ভূষণাধিপতি

মুকুন্দ রাম এবং যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্য তাঁহাদের শেষ রক্তবিন্দুর বিনিময়েও মোগলের অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ হন নাই।

টোডরমল্লের জরিপ ও জমাবন্দীতে বিক্রমপুরকে সরকার সোণারগাঁয়ের অন্তর্ভূক্ত বলিয়া ঘোষণা করেন; ইহাতে ক্রুদ্ধ চাঁদরায় ও কেদাররায় মোগলের বিপক্ষে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীয়মান করতঃ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন; এবং শ্রীপুর রাজধানীতে পূর্ণ স্বাধীনভাবে রাজকার্য্য পরিচালন করিতে আরম্ভ করেন। শ্রীপুর সুবর্ণগ্রাম হইতে নয় ক্রোশ দূরে কালীগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। ধন দৌলত এবং সভ্যতায় শ্রীপুর তখন বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান নগরী বলিয়া পরিগণিত হইত। ভূঁঞাগণের ঔদ্ধত্যের সংবাদ যখন দিল্লীর রাজপ্রাসাদে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, তখন বাংলার বীরবৃন্দও নিশ্চিন্ত বিলাসে বসিয়া থাকেন নাই; পরন্তু তাহারা সুদৃঢ় একতাবন্ধনে বদ্ধ হইয়া যাহাতে একযোগে মোগল আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিতে পারেন তদুদ্দেশ্যে যত্নবান হইয়া উঠেন। চাঁদ রায় ও কেদার রায় মিলনোদ্দেশ্যে সোণারগায়ের অধিপতি ঈশা খাঁকে নিজ রাজ্যে আহ্বান করেন; কিন্তু উদ্ধত পাঠানের অবিমৃষ্যকারিতায় রায়ভ্রাতৃদ্বয়ের মিলনের আকাঙ্ক্ষা ভীষণ শত্রুতায় পর্য্যবসিত হয়। শ্রীপুরে অবস্থান কালে ঈশা খাঁ কোন সুযোগে চাঁদরায়ের বিধবা কন্যা অসামান্যা রূপলাবণ্যশালিনী স্বর্ণময়ী বনামে সোণামণিকে দেখিয়া মোহিত হন এবং লোকললামভূতা সোণামণির স্মৃতি হৃদয়ে স্থাপন করিয়া নিজ রাজধানী খিজিরপুরে প্রস্থান করেন। কিয়দ্দিবস পরে ঈশা খাঁ বিক্রমপুরাধিপতি চাঁদরায়ের নিকট সোণামণিকে বিবাহ করিবার মানসে এক দূত প্রেরণ করেন। ঈশা খাঁয়ের দূত শ্রীপুরে উপস্থিত হইয়া চাঁদ ও কেদার রায়ের নিকট এই সংবাদ গোচর করিলে উভয় ভ্রাতাই ভীষণ ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন এবং অবিলম্বে পাঠানের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করতঃ তাঁহার দূতকে ফিরাইয়া দেন। এই ঘটনায় বঙ্গের তদানীন্তন দুইজন পরাক্রমশালী ভূঁঞার মিত্রতাবন্ধন শিথিল হইয়া তৎস্থলে ঘোরতর বৈরিতার সৃষ্টি হয় এবং এই শত্রুতা-চরণের দুর্ব্বলতায় উভয় রাজাকেই পরিশেষে মোগল সৈন্যের সম্মুখে পরাজয়ের লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। যে রূপের আগুনে দশাননের স্বর্ণলঙ্কা ভস্মীভূত হইয়াছিল, যে রূপের অনলে ট্রয় নগর বিধ্বস্ত হইয়াছিল, সেই রূপের আগুণে বাংলার বুকের উপর যে প্রলয় তাণ্ডবের জন্ম হইল, তাহাতে কালক্রমে সমগ্র বাংলা মোগলের পাদমূলে নতশির হইতে বাধ্য হইয়াছিল। নহিলে ভারত বিজয়ী মানসিংহের যোদ্ধ শক্তি এই দুই বঙ্গীয় ভূস্বামীর মিলিত শক্তির ব্যূহভেদ করিতে সমর্থ হইত কিনা সন্দেহ।

ক্রুদ্ধ কেশরীর মত ভীমবিক্রমে রায় ভ্রাতৃদ্বয় ঈশা খাঁর কলাগাছিয়ার দুর্গ আক্রমণ করেন এবং অত্যল্পকাল মধ্যেই চাঁদ রায়ের বিদ্বেষ বহ্নিতে কলাগাছিয়ার দুর্গ বিধ্বস্ত ও ধ্বংস হইয়া যায়। কলাগাছিয়ার পতনে ঈশা খাঁ ত্রিবেণীর দুর্গে থাকিয়া আত্মরক্ষা করিতে থাকেন। প্রচণ্ড বিক্রমে চাঁদ রায় ত্রিবেণীর দুর্গ অবরোধ করিয়া খিজিরপুরে ও নানাস্থানে বহুতর অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ঈশা খাঁ তখন বহু চেষ্টায় চাঁদ রায়ের প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীমন্ত খাঁকে বহু অর্থের বিনিময়ে হস্তগত করেন। বিশ্বাস-ঘাতক শ্রীমন্ত রাজার সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে ছিল। কোন ছলে শ্রীপুরে উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহ

রায় কেদার রায় পাঠানের হস্তে বন্দী হইয়াছেন বলিয়া, সংবাদ রটায় এবং ঈশা খাঁর লোলুপ দৃষ্টি হইতে সোণামণিকে রক্ষার একমাত্র উপায়, তাহাকে স্বামীর বাড়ীতে প্রেরণ করা ইত্যাদি যুক্তি দ্বারা সকলকে সন্তুষ্ট করতঃ স্বর্ণময়ীকে স্বামীগৃহে পৌঁছাইবার অছিলায় তাহাকে খিজিরপুরে আনিয়া লুব্ধ পাঠানের অঙ্কশায়িনী করিয়া দেয়। (১) ঈশা খাঁ স্বর্ণময়ীকে বিবাহ করিয়া তাহার নাম রাখেন আলিনেয়ামত বিবি। কিন্তু ইতিহাসে সোণাবিবি বা সোণামণি নামেই তিনি পরিচিতা। ডাক্তার ওয়াইজ Asiatic Societyর Journalএ লিখিয়াছেন যে, সোনারগাঁধিপতি ঈশা খাঁ বাহুবলে চাঁদ ও কেদার রায়কে পরাজিত করিয়া চাঁদরায়ের অসামান্যা সুন্দরী কন্যা স্বর্ণময়ী বা সোণামণিকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করেন (২)। বৈদেশিক ভ্রমণকারী E. F. Bradley Birt তাহার "Romance of an Eestern Capital" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ঈশা খাঁর শৌর্য্যবীর্য্যে মোহিত হইয়া সোণামণি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করতঃ মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়া স্বামীর উপযুক্ত সঙ্গিনী হন (৩)। চাঁদ রায় এবং কেদার রায়ের মত মহাবীরদ্বয়কে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া বাহুবলে সোণামণিকে লাভের উপাখ্যান বৈদেশিক ভ্রমণকারীগণের স্বকপোলকল্পিত কিংবা ঐ দেশীয় কোন উর্ব্বর মস্তিষ্ক ব্যক্তির কল্পনা প্রসাদে জাত বলিয়াই আমাদের মনে হয়। স্থানীয় জনপ্রবাদ বা কিংবদন্তী কিংবা ঐতিহাসিক প্রমাণ কিন্তু ইহার বিপক্ষতাই করিতেছে। রায় ভ্রাতৃদ্বয়ের বিক্রমে ঈশা খাঁর কলাগাছিয়ার দুর্গ, ত্রিবেণীর দুর্গ প্রভৃতি যে, চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল—ঐ সমস্ত সত্য, মুক কিংবদন্তী এখনও প্রচার করিতেছে। রায় ভ্রাতৃদ্বয়কে পরাজিত করিয়া শ্রীপুর বিধ্বস্ত করতঃ সোণামণিকে লাভ করা যে, ঈশা খাঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল, এ'কথা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিবেন। মোগলের বিক্রম

(১) চাঁদ ও কেদার রায়ের অজ্ঞাতসারে, শ্রীমন্ত শ্রীপুরে আসিয়া প্রকাশ করিল যে, রায় ভ্রাতৃদ্বয় শত্রু হস্তে বন্দী হইয়াছেন। ঈশা খাঁ অচিরে সসৈন্যে শ্রীপুর আক্রমণ করিয়া আত্মসাৎ করিবে। এই সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র রাজপুরীতে হাহাকার পড়িয়া গেল। কিরূপে রাজধানী ও সোণামণিকে রক্ষা করা যাইতে পারে তাহারই পরামর্শ চলিতে লাগিল ... ... পরে শ্রীমন্তের প্ররোচনায় স্থির হইল যে, সোণামণিকে তাহার শ্বশুরালয় চন্দ্রদ্বীপে রাখিয়া আসিলে একরূপ নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে ... ... নৌকাযোগে রাজকন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠান স্থিরীকৃত হইলে, ধূর্ত্ত শ্রীমন্তই তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইয়া চলিল। এদিকে নাবিকদের সহিত পূর্ব্বেই শ্রীমন্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। তদনুসারে তাহারা চন্দ্রদ্বীপের পরিবর্ত্তে নৌকা সোনারগাঁর অভিমুখে চালাইয়া দিল। বলা বাহুল্য, সোণামণির সহিত শ্রীমন্ত খাঁ অচিরে সোনারগাঁ পৌঁছিয়া চাঁদ রায়ের সেই অসামান্যা রূপবতী তনয়াকে ঈশা খাঁর হস্তে সমর্পণ করিল। (আনন্দনাথ রায়, বারভূঞা)

(২) Between Isa Khan of Khizirpur, whose stronghold was on the opposite bank of the Ganges, and the two brothers there was constant warfare. Isa Khan made a successful raid into his enemies country, carried off and forcibly married Sonai (Svarnamayi) the only daughter of Chand Rai. (Vol. XLIII. Part I, 1874, P. 202).

(৩) Sona Bibi won by the courage and address of her Captor soon ceased to repine her lot, and renouncing Hinduism she embraced her husband's faith remaining throughout his [illegible] a devoted help-mate, and defending the kingdom against his enemies, kith and kin, [illegible]fter his decease. Page 79-80.

যাঁহার নিকট বারবার পরাজিত বিপর্য্যস্ত ও লাঞ্ছিত হইয়াছিল, বীরেন্দ্রকুলাগ্রগণ্য মানসিংহের বিশ্ববিজয়ী শৌর্য্য যাঁহার বীরত্বপ্রভায় স্তম্ভিত ও চমৎকৃত হইয়াছিল;—সেই কেদার রায় যে ঈশা খাঁর মত একজন সমলোকবল সম্পন্ন ভৌমিক কর্ত্তৃক দেহে একবিন্দু শোণিত থাকিতে চিরতরে বংশ গৌরবে জলাঞ্জলী দিয়া, পরাজয়ের কলঙ্ক কালিমা এমন করিয়া বদনে অঙ্কিত করতঃ লাঞ্ছিত, অবমানিত জীবন যাপন করিয়াছেন তাহা একেবারেই অবিশ্বাস্য। কন্যা অপহরণের তীব্র জ্বালা চাঁদরায়ের বুকের ভিতর তুষানলের সৃষ্টি করিয়া দিল। তিনি ঈশা খাঁর রাজধানী আক্রমণের ভার কেদাররায়ের উপর অর্পণ করিয়া ভগ্নোৎসাহে স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পাঠানকর্ত্তৃক বংশগৌরবে কালিমা লেপনের প্রতিহিংসায় কেদার ক্রুদ্ধ কেশরীর মত উন্মত্ত আস্ফালনে ঈশা খাঁয়ের রাজ্য মধ্যে ঘোর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়া দিলেন। ঈশা খাঁ প্রাণপণ শক্তিতেও কেদারের সৈন্যগণের অগ্রগতি রোধ করিতে সক্ষম হইলেন না। রোগোন্মত্ত কেদার গ্রামের পর গ্রাম জয় করিয়া ছারখার করিয়া শনৈঃ শনৈঃ সোনারগাঁয়ের রাজধানী খিজিরপুরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ঈশা খাঁর বক্ষশোণিতে তর্পণ করিবার জন্য কেদার রায় ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন।

কন্যা অপহরণ জনিত লোকলজ্জায় ম্রিয়মান চাঁদ রায় অবশেষে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া শ্রীপুর রাজধানীতে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। এক দিবস রাত্রিতে স্বপ্নে তাঁহার প্রতি এই দৈবাদেশ হইল যে "বৎস, যাহা হইবার হইয়াছে, এখন আরও ভয়ানক বিপদের জন্য প্রস্তুত হও।" চাঁদ রায় স্বপ্ন দেখিয়া পরদিবসই অবরোধ উঠাইবার জন্য কেদার রায়কে আদেশ করিয়া পাঠান।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশে কেদার অবরোধ উঠাইয়া আনেন বটে, কিন্তু প্রতিহিংসার অনল তাহার অন্তর মধ্যে এক আগ্নেয়গিরির রচনা করিয়া তুলিয়াছিল। কেদাররায় যত দিন জীবিত ছিলেন ততদিন পর্য্যন্ত তিনি সোনারগাঁ বিধ্বস্ত করিবার সংকল্প নিয়াই যেন ছিলেন। ভূঁঞাগণের এই মনোমালিন্য মোগল সেনাপতি মানসিংহ অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতেছিলেন। এখন সময় বুঝিয়া তিনি বাংলার এই উদ্ধত ভূম্যধিকারিগণের প্রতিবিধান করিবার জন্য প্রস্তুত হন। চাঁদ রায় মোগলের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়ার উদ্দেশ্যেই কেদাররায়কে খিজিরপুরের অবরোধ হইতে উঠাইয়া আনেন। কিন্তু কন্যা-শোকে ম্রিয়মান এই বীর কেশরীর লাঞ্ছিত, অবমানিত বিকৃত জীবনলীলা মোগলের সহিত রণলীলা অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্ব্বাহ্নেই শেষ হয়। ভ্রাতার মৃত্যুতে কেদার মুহ্যমান না হইয়া, প্রকৃত বীরের মত, প্রকৃত দেশ প্রেমিকের মত, স্বাধীনতা-পহরণাভিলাষী শত্রুকে শোণিত তর্পণে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। মোগলের আক্রমণ প্রতিহত করিবার যথেষ্ট আয়োজনে ব্যাপৃত কেদার ঈশা খাঁর প্রতিও শ্যেন দৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন। সময় ও সুযোগ মত ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূলের ন্যায় পাঠানের বুকের উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাহার জীবনান্ত করিবেন, ইহাই কেদারের মনোগত ইচ্ছা ছিল।

মোগলের শ্যেনদৃষ্টি বাংলার উপর পতিত হইলে বিক্রমপুরাধিপতি কেদাররায় ঈশা খাঁকে কিছুদিনের সময় দিয়া নিজের শক্তিবৃদ্ধির দিকে বিশেষ মনোযোগী হইয়া উঠিলেন। সাহবাজ খাঁ প্রমুখ সুদক্ষ কর্ম্মচারী প্রভৃতি বঙ্গের বিদ্রোহ

দমনে অসমর্থ হওয়ায় দিল্লীশ্বর অম্বরাধিপতি হিন্দুকুলকলঙ্ক মানসিংহকে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। যথাসময়ে মানসিংহও প্রচুর সৈন্যদল সহ বাংলার প্রান্তে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং পাঠান বিদ্রোহী নেতা ঈশা খাঁর দর্প চূর্ণ করিবার মানসে বঙ্গের তদানীন্তন রাজধানী ঢাকা নগরীতে অবস্থান করিয়া বর্ষাবসানের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বর্ষাশেষে মানসিংহ ঢাকা নগরী হইতে বহির্গত হইয়া নগরোপকণ্ঠস্থিত কমলাপুর ও রাজারবাগ হইতে বালু ও লক্ষ্যার সঙ্গমস্থল ডেমরা পর্য্যন্ত দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তর মধ্যে মোগলের সৈন্যাবাস স্থাপন করিলেন। সোনারগাঁ আক্রমণ এই স্থান হইতেই সহজসাধ্য ছিল। সৈন্যগণের জলপানের সুবিধার জন্য রাজা মানসিংহ রাজারবাগে এবং প্রান্তর মধ্যে আরও তিন চারিটী দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। আজিও ঐ সমস্ত দীর্ঘিকা সংস্কারের অভাবে জীর্ণশীর্ণ শরীরে অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মোগল সৈন্য সিংহবিক্রমে ঈশাখাঁর রাজ্য আক্রমণ করিল। সে সৈন্যস্রোতের মুখে এক একটী করিয়া দুর্গ ভাসিয়া যাইতে লাগিল; ঈশা খাঁ উপায়ান্তর না দেখিয়া একডালার দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অনতিবিলম্বে মানসিংহ একডালা অবরোধ করিবার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালী ও মোগলের রণহুঙ্কারে সোনারগাঁর আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। মানসিংহের ভীষণাক্রমণে একডালার পতন অবশ্যম্ভাবী বুঝিতে পারিয়া ঈশা খাঁ অবশেষে মৈমনসিংহ জিলাস্থিত জঙ্গলবাড়ীর নিকটবর্ত্তী এগারসিন্দুর দুর্গে যাইয়া মোগল আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন। এগারসিন্দুর দুর্গের বামপার্শ্বে দুর্গমূল ধৌত করিয়া ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত। কিয়দ্দূর দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া ব্রহ্মপুত্র বক্রগতিতে দুর্গের দক্ষিণে এক ভীষণ পরিখার সৃষ্টি করতঃ মৈমনসিংহ সহরের দিকে চলিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মপুত্র যে স্থানে বাঁক নিয়াছে সে স্থান হইতে একটী জলপ্রবাহ বানার নাম ধারণ পূর্ব্বক সোজা দক্ষিণদিকে চলিয়া আসিয়া বর্ম্মির সন্নিকটে লক্ষ্যা নামে পরিচিতা হইয়াছে। এগারসিন্দুরের পূর্ব্ব পার্শ্বে বিল এবং উত্তরে কতকাংশে বিল এবং কতকাংশে শ্বাপদ সমাকুল ঘোর অরণ্যানী। প্রকৃতির সযত্নে রক্ষিত এগারসিন্দুরের দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় নিয়া ঈশা খাঁ নিশ্চিন্ত হইয়া সৈন্যবল বৃদ্ধি করিতে যত্নবান হইলেন। বানারের পূর্ব্বতীরে 'তোপ' এবং পশ্চিমতীরে 'চাঁদপুর' নামক গ্রাম। তোপের বহুদূর বিস্তৃত সমতলভূমিব্যাপী স্থানে মোগল সৈন্যের ছাউনী পড়িল। মানসিংহ এ'স্থানে থাকিয়া এগারসিন্দুর আক্রমণের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন তোপ হইয়া এগারসিন্দুর দুর্গে যাই, তখন মৈমনসিংহ জিলা বাসী জনৈক বিশিষ্ট পণ্ডিত আমার সহযাত্রী ছিলেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম যে, ঐ স্থানে মোগলের তোপখানা অবস্থিত ছিল বলিয়া উহার নাম তোপ হইয়াছে। মোগলপক্ষীয় গোলন্দাজ সৈন্য ঐস্থান হইতে আক্রমণ চালাইয়াছিল। 'তোপ' শব্দটাই এখন রূপান্তরিত হইয়া 'টোক' শব্দে পরিণত হইয়াছে। বানারের অপর তীরবর্ত্তী চাঁদপুরে মোগল সৈন্যের সহিত ঈশা খাঁর এক ভীষণ সংঘর্ষ ঘটে এবং সেই যুদ্ধে মোগল সৈন্য বাঙ্গালীর নিকট পরাজিত হইয়া কোনমতে তোপে আসিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। বহুদিন অবরোধ এবং উভয়পক্ষে

বহু শোণিতপাতের পর ঈশা খাঁ মানসিংহের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। বঙ্গীয় প্রধানতম বারভূঁইয়ার মুকুট মোগল সম্রাটের পদতলে পাতিত করিয়া মানসিংহ বিজয়গৌরবে দিল্লীতে প্রস্থান করেন। কথিত আছে অতঃপর ঈশা খাঁ সম্রাট আকবরের সনন্দ গ্রহণান্তর সোনারগাঁর ভৌমিকত্ব পদে বহাল হন এবং নিয়ম মত রাজকর প্রদানে জীবন অতিবাহিত করেন।

ঈশা খাঁর পতনে বিক্রমপুরে কেদার রায় এবং যশোহরে প্রতাপাদিত্য, এই দুইজন মাত্র ভৌমিক মোগলের অধীনতা নিগড়ে বন্দী হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করিলেন না। এদিকে মোগল সম্রাট বিক্রমপুরকে সরকার সোনারগাঁর অন্তর্ভূক্ত বলিয়া ঘোষণা করেন এবং পূর্ব্ববঙ্গ বিজয়ের সময় সন্দীপ মোগল সাম্রাজ্যের অধীনস্থ বলিয়া সরকার ফতেয়াবাদের অন্তর্ভূক্ত করিয়া ফেলেন। চাঁদ রায়ের মৃত্যুর পর কেদার মহাপরাক্রমে তদীয় রাজ্যের সীমা বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করেন। ইহাতে ত্রিপুরার কতকাংশ এবং সন্দীপ তাহার অধীনস্থ হইয়াছিল। মোগলের উপরোক্ত ঘোষণায় কোনই ফল হইল না। কেদার মহাবিক্রমে নিজ অধিকার রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইলেন এবং তদীয় ভীষণ শত্রু ঈশা খাঁ শাসিত সোনারগাঁ সরকারের অধীনতা, তিনি কিছুতেই মানিয়া নিতে পারিলেন না। ঈশা খাঁর উপর কেদার রায়ের জাতক্রোধ এই ঘটনায় আরও ভীষণতর হইয়া উঠিল। প্রতিহিংসার তীব্র অনলে জর্জ্জরিত কেদার সোনারগাঁ রাজ্যের বিভিন্নাংশ আক্রমণ করিতে লাগিলেন। যে সময় পূর্ব্ববঙ্গে এই সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হইতেছিল তখন চারিদিকে একটা ঘোর অরাজকতার তাণ্ডব-চলিতেছিল ; বঙ্গদেশ আরাকান বাসী মগদস্যুগণের নির্ম্মম নিষ্ঠুর পীড়ণে সন্ত্রাসিত, এবং গৃহলুণ্ঠন ও নারীর সতীত্বাপহরণে জর্জ্জরিত। ঈশা খাঁর গৌরবের সময়ে মগগণ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতে সাহসী হয় নাই ; কিন্তু এখন তাঁহারা কিয়ৎপরিমাণে চঞ্চলতা প্রকাশ করিতে লাগিল। রাজ্যের এই ঘোর বিপদের দিনে ঈশা খাঁ মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিংবদন্তী এবং বৈদেশিক ঐতিহাসিকের গ্রন্থপাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর সোনাবিবি নিজে রাজ্যশাসন এবং দেশরক্ষায় ব্রতী হন। এদিকে কেদার রায় ত্রিপুরেশ্বর এবং মগদিগের সহিত সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হইয়া সোনারগাঁর নানাদিক দিয়া আক্রমণ করিয়া বসেন। নানাদিকে ভীষণভাবে বিব্রত হইয়া পড়িলেও সোনাবিবি অসীম সাহসিকতার সহিত ত্রিশক্তির সম্মিলিত আক্রমণ হইতে স্বীয় রাজ্যরক্ষা করিতে 'কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া শীতললক্ষী তটবর্ত্তী সোনাকান্দার দুর্গে অগ্নি সংযোগ করিতে আদেশ দিলেন। দেখিতে দেখিতে ভীষণ অনল লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া সোনাকান্দার দুর্গটীকে ভস্মস্তূপে পরিণত করিল। সোনাবিবি সেই অনলে প্রকৃত বীরাঙ্গনার ন্যায় আত্মবিসর্জ্জন করিলেন সোনাকান্দা নামক স্থানে সেই দুর্গের শেষ চিহ্ন একটী মৃত্তিকাস্তূপে পরিণত হইয়া, অতীতের ব্যথা আজও বুকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর উপযুক্ত শাসকের অভাবে তাহার রাজ্য নষ্ট হইয়া যায়। মৈমনসিংহ জিলান্তর্গত জঙ্গলবাড়ীর জমিদার বংশ ঈশা খাঁর বংশধর বলিয়া দাবী করেন। মোগলের পদানত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঈশা খাঁ এগারসিন্দুর দুর্গে থাকিয়াই সোনারগাঁর শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন ; কারণ খিজিরপুর এবং

একডালার দুর্গ প্রভৃতি মানসিংহের আক্রমণে এবং প্রতিহংসা প্রণোদিত কেদার রায়ের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। মোগল আক্রমণের পরে ঈশা খাঁ আর অধিকদিন জীবিতও ছিলেন না। এই সমস্ত নানা কারণে এবং জঙ্গলবাড়ীর জমিদারগণের তাঁহার উত্তরাধিকারীত্বের দাবী প্রভৃতি হইতে, আমাদের মনে হয় যে, শেষ জীবনে ঈশা খাঁ সোনারগাঁয়ে আর না আসিয়া, এগারসিন্দুর হইতেই শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন। ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর সোনামনি ওরফে সোনাবিবির সোনাকান্দা দুর্গে অবস্থান ও কেদার রায়ের সহিত যুদ্ধাদির মনোরম কাহিনী আমাদের নিকট বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। মোগলাক্রমণের সময়ে ঈশা খাঁ যখন ক্রমশঃ হটিতে হটিতে এগারসিন্দুরে যাইয়া আশ্রয় নিয়াছিলেন, তখন অবশ্য তাঁহার প্রাণাধিকা প্রেয়সী সোনাবিবিকে সঙ্গে নিয়াই পলায়ন করিয়াছিলেন। এবং তৎপরবর্ত্তী কালে ঈশা খাঁর তিরোধানের পর তাঁহার বংশধরগণের সোনারগাঁ পরগনায় অবস্থানের কোন প্রমান না থাকায়, সোনাবিবির সোনাকান্দা দুর্গে অবস্থান প্রভৃতি কথা কাল্পনিক বলিয়াই আমাদের মনে হয়। ঈশা খাঁ ও সোনামনির মিলনকাহিনী সত্য হইলেও খাঁ সাহেবের মৃত্যুর পর সোনামনির পক্ষে এগারসিন্দুর দুর্গ ছাড়িয়া কয়েকজন সৈন্য মাত্র নিয়া, সোনাকান্দার দুর্গে অবস্থান বিশ্বাস্য কিনা, তাহা পাঠকবর্গই বিচার করিবেন। কারণ ঈশা খাঁর মৃত্যুতে রাজ্য অরাজকতায় পূর্ণ হইলে মগের নিষ্ঠুর অত্যাচারে ও পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণের অবাধ লুণ্ঠনে পূর্ব্ববঙ্গবাসী জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল; সর্ব্বোপরি কেদার রায়ের. জিঘাংসা জীবন্ত প্রেতের মত এই দারুণ স্মৃতির পশ্চাতে অহরহ নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ঘুড়িতেই ছিল। ঈশা খাঁ মোগলের অধীনতা স্বীকার করিলে তাঁহার রাজ্য মোগলের মিত্ররাজ্যে পরিণত হইয়াছিল, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর কেদার রায় সোনারগাঁ আক্রমণ করিলে ঢাকার মোগল শাসনকর্ত্তা এই মিত্ররাজ্যটী রক্ষা করিবার কোন উপায় করেন নাই, ইহাই বা কিরূপে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে? এবং পরবর্ত্তীকালে মোগল যখন কেদার রায়ের বিপক্ষে যুদ্ধযাত্রা করে, তখনও ঈশা খাঁর বংশধর কেহ মোগলের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া কোন কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠা অঙ্কিত করে নাই। এই সমস্ত নানা কারণে আমাদের মনে হয় যে, সোনামনির অপহরণ বৃত্তান্ত এবং তাহার অগ্নিতে আত্মবিসর্জ্জনের কাহিনী এবং সোনাকান্দার দুর্গ ধ্বংসের কথা সত্য হইলে, তাহা ঈশা খাঁর মোগলের অধীনতা স্বীকারের পূর্ব্বেই সংঘটিত হইয়াছিল। কিংবদন্তী, নানাভাবে বহু পত্রপল্লব বিস্তার করিয়া বহুদিন যাবত এ'দেশে চলিয়া আসিতেছে সন্দেহ নাই; কিন্তু বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই, তাই আজ আমরা জীবন্মৃত। বৈদেশিক ঐতিহাসিকের লেখা হইতে আমরা সোনামনির কাহিনীর উপাদান পাই; কিন্তু উপাদান কতখানি সত্য ভিত্তির উপর প্রোথিত তাহা যাচাই করিবার উপায় আমাদের নাই।

মোগলসম্রাট আকবরের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র সেলিম ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর উপাধি গ্রহণ করতঃ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালেই কেদার রায়ের সহিত সন্দীপের অধিকার নিয়া মোগলের যুদ্ধের সূচনা হয়। সেই সময়ে সন্দীপে প্রচুর পরিমাণে লবণ উৎপন্ন হইত। বিক্রমপুরাধিপতি কেদার

রায় স্বীয় বাহুবলে সন্দীপ তাঁহার রাজ্যভুক্ত করিয়া নেন; কিন্তু মোগল সুবাদার চট্টগ্রাম প্রভৃতি বিজয়ের পর সন্দীপ মোগল রাজ্যভুক্ত করিয়া পরগণে ফতেয়াবাদের অন্তর্ভূক্ত বলিয়া ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় সন্দীপ অধিকার চ্যুত হইয়া পড়ায় কেদার রায় ভীষণ ক্রোধান্বিত হইয়া উঠেন এবং পর্ত্তুগীজ বীর কার্ভালোর রণনৈপুন্যে সন্দীপ দখল করিবার জন্য যত্নবান হন। পর্ত্তুগীজগণ ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে বানিজ্য ব্যপদেশে সর্ব্বাগ্রে ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া, গোয়া, ম্যাঙ্গালোর, সিলোন, নাগাপত্তন প্রভৃতি স্থানে ব্যবসার কেন্দ্র স্থাপন করে (১)। ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে একদল পর্ত্তুগীজ সর্ব্বপ্রথম গৌড়রাজের সৈন্যদলে প্রবেশ লাভ করে (২) পর্ত্তুগীজগণ দলবাঁধিয়া নিম্নবঙ্গের নদীতে ও নদীতটবর্ত্তী গ্রামে সময় সময় দস্যুবেশে উপস্থিত হইয়া লুণ্ঠনাদি নানা দুষ্কর্ম্ম করিত এবং মানুষ ধরিয়া নিয়া দাসব্যবসায় চালাইত। ইহাদের সম্বন্ধে "The good old days of Honourable Johu Company নামক পুস্তকের Vol, III এ উল্লেখ আছে যে "In 1538 a large body of Portuguese entered Bengal as military adventurs in the Service of the King of Gour ... they used to engage in piratical voyages to the lower districts of Bengal, Kidna-pping the natives and pillaging and destroying the populated villages and towns at the month of the Gaujes ;— "এই সমস্ত জলদস্যুর অত্যাচারে কত সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ও নগর যে, স্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে পরিণত হইয়াছে তাহার সংখ্যা কে করে? পর্ত্তুগীজগণের armada শব্দ রূপান্তরিত হইয়া বঙ্গভাষায় "হারমাদ" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। যথা—

ফিরিঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রিতে বাহিয়া যায় হারমাদের ডরে॥
কবিকঙ্কনের চণ্ডী॥

এই সকল পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণ অধিকাংশই জলযুদ্ধে সুকৌশলী বীর ছিলেন। বাংলার ভুস্বামিগণ ও আরাকান রাজ প্রভৃতি জলপথে নিজ নিজ প্রাধান্য স্থাপন জন্য, বহু পর্ত্তুগীজ বীরকে নিজ নিজ সৈন্যদলে গ্রহণ করিয়া, পরাক্রান্ত নৌসেনার সৃষ্টি করিতে মনন করিয়াছিলেন। কেদার রায় স্বয়ং এক জন, নৌযুদ্ধে সুদক্ষ বীর ছিলেন। নিজের নৌবল অপরাজেয় করিবার মানসে দুর্দ্দান্ত মগের আক্রমণ ও মোগলের আক্রমণ প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি পর্ত্তুগীজ বীর কার্ভালোকে নৌসৈন্যাধ্যক্ষের পদে বরণ করেন। এবং অল্পসময় মধ্যেই কার্ভালোর সহায়তায় কেদার রায় তাঁহাব নৌশক্তির চরমোৎকর্ষতা সাধন করিয়াছিলেন। মোগলের হস্ত হইতে সন্দীপ উদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প কেদার রায়, কার্ভালোর অধিনায়কত্বে একদল সুশিক্ষিত বাঙ্গালী যোদ্ধা সজ্জিত রণতরী সহ সন্দীপ আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে কেদার নিজেও উপস্থিত ছিলেন। ভীষণ জলযুদ্ধের পর মোগলদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিয়া কেদার রায় সন্দীপ পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হন। কার্ভালোর রণ নৈপুন্যের পুরস্কার স্বরূপ কেদার তাহার উপর সন্দীপের শাসনভার প্রদান করিয়া নিজ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত "চাঁদকেদার রায়" Page nos 38—39.

করেন। কার্ভালো নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া অদ্ভুত সাহসিকতার সহিত পুনরুদ্ধৃত দ্বীপ শাসন করিতে থাকেন, ইত্যবসরে দ্বীপবাসিগণ তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। মহাবীর কার্ভালো ভীষণ বিপদে পতিত হইলেন,—দুর্গের বাহিরে আসিবার উপায় নাই; এদিকে দুর্গাভ্যন্তরেও সৈন্যগণের প্রাণধারণোপযোগী রসদ নাই। এইরূপ বিষম বিপদে পতিত হইয়াও পর্ত্তুগীজ বীর কার্ভালো একেবারে নিরাশ বা ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়েন নাই। তিনি কোন উপায়ে জনৈক পর্ত্তুগীজ বীরকে চট্টলপ্রদেশের পর্ত্তুগীজ সেনাপতি Emmanuel dee matos এর (ইমানুয়েল মাটুস) নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়া প্রেরণ করেন। ইমানুয়েল মাটুস কয়েকশত পর্ত্তুগীজবীরের সাহায্যে সন্দীপ আক্রমণ করেন এবং ঘোরতর যুদ্ধের পর বিদ্রোহিগণকে পরাজিত করিয়া অবরুদ্ধ পর্ত্তুগীজগণের উদ্ধার সাধন করেন। অতঃপর মাটুস ও কার্ভালো উভয়েই এই দ্বীপটীকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া শাসন কার্য্য পরিচালন করিতে থাকেন।

কেদার রায়ের সন্দীপ অধিকার এবং বঙ্গোপসাগর প্রান্তে পর্ত্তুগীজ শক্তির প্রতিষ্ঠা, আরাকান রাজ মেংরাগাজী বা সেলিমশা নিরাপদ মনে করিলেন না। তিনি আশঙ্কা করিলেন যে, পর্ত্তুগীজগণকে সন্দীপ হইতে বিতাড়িত না করিতে পারিলে, অদূর ভবিষ্যতে বঙ্গোপসাগরের বুকের উপর পর্ত্তুগীজের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে; এবং তাঁহার রাজশক্তি সাগরবক্ষে পর্ত্তুগীজশক্তির নিকট লাঞ্ছিত হইয়া ক্রমশঃ হীনপ্রভ হইয়া পড়িবে। আরাকান রাজ সন্দীপ হইতে পর্ত্তুগীজ-শক্তি নির্ম্মূল করিবার জন্য সৈন্যসজ্জা করিতে লাগিলেন। এই সংবাদ পরিজ্ঞাত হইয়া কার্ভালো কেদার রায়ের নিকট সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করেন। অনতিবিলম্বে কেদার রায় সন্দীপরক্ষায় কার্ভালোকে সাহায্য করিবার জন্য একশত কোষা নৌকা প্রেরণ করেন। ওদিকে আরাকান রাজ আগ্নেয়াস্ত্রে সুসজ্জিত দেড়শত ক্ষুদ্রবৃহৎ রণতরী উপযুক্ত সেনানায়কের অধীনে সন্দীপ আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। আরাকান রাজের রণতরী সমূহ সাগরতরঙ্গে নাচিতে নাচিতে বীরদর্পে শনৈঃ শনৈঃ সন্দীপের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ইংরেজী ১৬০২ অব্দের ১০ই নবেম্বর তারিখে উষালোকের সঙ্গে সঙ্গেই মগ রণতরীর কামান ভৈরবগর্জ্জনে গর্জ্জিয়া উঠিল; কেদার রায়ের যুদ্ধ জাহাজ হইতেও ইহার প্রত্যুত্তর দিতে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হইল না। সমস্ত দিন রণলীলা চলিল। নিশার সঙ্গে সঙ্গে উভয় পক্ষীয় বীরগণ যুদ্ধে মাতিয়া উঠিল। উভয়পক্ষের কামান মুহুর্মুহ গর্জ্জনে সাগরগর্জ্জন ছাপাইয়া আকাশে বাতাসে সাগরবক্ষে মৃত্যুর বিষাণ নিনাদিত করিতে লাগিল। অসমসাহস বাঙ্গালী ও পর্ত্তুগীজগণের রণনৈপুণ্যের নিকট মগের ক্ষাত্রশক্তি রজনী প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই নিস্তেজ হইয়া পড়িল। কার্ভালো মাত্র ৫০ খানি রণতরী নিয়া আরাকানের দেড়শত রণতরী বিধ্বস্ত করিয়া ফেলেন। শত্রুপক্ষীয় প্রায় সমুদয় যুদ্ধ জাহাজ কেদার রায়ের সৈন্যগণ অধিকার করিয়া, তীর বন্দুক কামান প্রভৃতি বহু যুদ্ধোপকরণ লাভ করে। এই যুদ্ধে আরকান রাজের পিতৃব্য প্রভৃতি বহু পদস্থ সৈন্যাধ্যক্ষ নিহত হন এবং বহু সৈন্য অতল জলধিতলে নিমজ্জিত হয়।

এই পরাজয়ের কলঙ্ক আরাকান রাজের ক্রোধকে দ্বিগুণ মাত্রায় বর্দ্ধিত করিল। তিনি কিছুদিনের মধ্যেই বিপুল যুদ্ধোপকরণে সুসজ্জিত এক সহস্র রণপোতের আক্রমণে সন্দীপ

অধিকারের প্রয়াস পাইলেন। যথা সময়ে মগ নৌসেনাপতি বিপুলবাহিনী সহ সন্দীপ আক্রমণে পূর্ব্ব পরাজয়ের কালিমা অপলেপনে অগ্রসর হইলেন। সন্দীপ রক্ষক বীরবর কার্ভালো পূর্ব্বেই কেদাররায়ের নিকট নূতন সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু বাংলার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত মোগলের আক্রমণের ভয়ে, কেদার প্রতাপাদি বীরগণ সকলেই স্ব স্ব নৌবল এবং সেনাবল বৃদ্ধির দিকে বিশেষ ব্যাপৃত ছিলেন বলিয়া, কেদাররায় কার্ভালোর সাহায্যার্থ নূতন সৈন্য সাহায্য প্রেরণে অসমর্থ হইয়া পড়েন। কার্ভালো অতি অল্প সংখ্যক রণপোত সাহায্যে মগের গতিরোধে অগ্রসর হইলেন,—মাত্র কয়েকজন মৃত্যুঞ্জয়ী বাঙ্গালী ও পর্ত্তুগীজের সাহায্যে। অন্যান্য পর্ত্তুগীজগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেও, প্রভুভক্ত বীর কার্ভালো জীবনের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া বিপুল বিক্রমের সহিত, অতর্কিত আক্রমণে ও অপূর্ব্ব রণকৌশলে, মগরাজের বিপুল নৌবাহিনীকে কয়েকদণ্ডের যুদ্ধেই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সম্পূর্ণভাবে পরাজিত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিলেন। মুষ্ঠিমেয় বাঙ্গালী ও পর্ত্তুগীজের অপূর্ব্ব বীরত্বে পরাজিত লাঞ্ছিত মগগণ প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। এই যুদ্ধে প্রায় দুই সহস্রাধিক মগবীর জীবন বিসর্জ্জন করে এবং তাহাদের ১৩০ খানা রণপোত ভস্মীভূত হইয়া যায়। এই রণজয়ে ফিরিঙ্গী ও বাঙ্গালীর বীরত্ব কাহিনী সমগ্র বঙ্গদেশে ব্যাপৃত হইয়া পড়ে। এই যুদ্ধে রণপোত সমুহ শত্রুর গোলার আঘাতে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় এবং মগের পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকায়, সেগুলি মেরামত করিবার জন্য কার্ভালো রণপোত সহ শ্রীপুরে উপনীত হন। তখন মোগল সেনাপতি মানসিংহ বাংলার দ্বারে যুদ্ধার্থী অতিথি এবং বাংলার শেষ হিন্দু দুইবীর, যশোহরের প্রতাপ ও বিক্রমপুরের কেদাররায় "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়" পণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; বিক্রমপুরে তখন সাজ সাজ রব। বীরবর কার্ভালো মোগল যুদ্ধের জন্য নিজেও প্রস্তুত হইলেন এবং সৈন্যগণকেও সুশিক্ষিত করিতে যত্নবান হইলেন। এদিকে কার্ভালোর অনুপস্থিতির সুযোগে আরাকান রাজ সন্দীপ অধিকার করিয়া লইলেন। আসন্ন যুদ্ধায়োজনে ব্যস্ত কেদার সন্দীপ পুরাধিকারে আর মনোনিবেশ করিবার অবসর পাইলেন না।

সন্দীপের যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতেই কেদার রায়কে এক প্রবল প্রতিদ্বন্দী শত্রুর সম্মুখীন হইতে হইল। বাংলার ভৌমিকগণ মধ্যে সকলেই ধীরে ধীরে মোগলের পদানত হইলেও বিক্রমপুরাধিপতি কেদার ও যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্য তখনও বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। শতযুদ্ধ জয়ী বীরেন্দ্র প্রবর মানসিংহ এই দুই বীরের বীরত্বগর্ব্ব খর্ব্ব করিবার মানসে সসৈন্যে বাংলায় উপস্থিত হয় এবং প্রথমে স্বয়ং প্রতাপাদিত্যকে আক্রমণ করিয়া জলপথে কেদাররায়ের রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য সেনাপতি মন্দারায়কে প্রেরণ করেন। মন্দারায় মহাসাহসী বীর বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। একশত রণতরীর অধিনায়ক মন্দারায় শ্রীপুরের স্বাধীনতা অপহরণের জন্য বীরদর্পে মেঘনা নদীতে উপনীত হইলেন। সতর্ক কেদার পূর্ব্ব হইতেই এই সমস্ত সংবাদ রাখিতেন। কার্ভালোর অধিনায়কত্বে কেদাররায়ের বাঙ্গালী সৈন্য ভীমবিক্রমে মোগল সৈন্যকে আক্রমণ করিয়া বসিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে যুদ্ধের বেগ তীব্রতর হইয়া উঠিল। উৎসাহিত সৈন্যগণের রণকোলাহলে, আগ্নেয়াস্ত্রের গভীর গর্জ্জনে মেঘনার উভয় তীর কম্পিত, শত শত রণতরীর ইতঃস্তত বিচরণে মেঘনার বারিরাশি

আলোড়িত এবং নর রক্তে মেঘনার বক্ষ রঞ্জিত হইয়া উঠিল। বাঙ্গালী বীরগণের অলোক-সামান্য বীরত্বে ও অদ্ভুত রণনৈপুন্যে মোগল সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইল। সেনাপতি মন্দারায় নিহত হইলেন, মোগল সৈন্যগণও অধিকাংশ নিহত হইল। পার্কাস সাহেব তাঁহার গ্রন্থে কার্ভালোর সৈনাপত্যে অন্যান্য জলযুদ্ধের সহিত এই যুদ্ধেরও উল্লেখ করিয়াছেন। (১) বাঙ্গালীর বাহুবলের সম্মুখে মোগল শৌর্য্য লাঞ্ছিত হওয়ার সংবাদ মানসিংহের নিকট পৌঁছিলে, তিনি যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া শতযুদ্ধ জয়ী সুশিক্ষিত সৈন্য সমভিব্যাহারে স্বয়ং বিক্রমপুরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। মানসিংহের এই যুদ্ধের বৃত্তান্ত জয়পুরী ভাষায় লিখিত "বংশাবলী" নামক পুস্তকে বর্ণিত আছে। মানসিংহ বিপুল বিক্রমে কেদারের রাজ্য আক্রমণ করিয়াও বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে না পারায় অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে কেদারের রাজ্য রক্ষয়িত্রী শিলামাতা নামক এক দেবী আছেন। শিলামাতার প্রভাবে তাহার রাজ্য অজেয় ছিল। (২) মানসিংহ অতঃপর হোমাদি ক্রিয়া দ্বারা দেবীকে প্রসন্ন করেন। দেবীর সহিত কেদারের অঙ্গীকার ছিল যে যখন কেদার তিন বার "তুই যা" বলিবেন তখনই দেবী চলিয়া যাইবেন। বংশাবলীতে কথিত আছে যে, কেদার একদিবস পূজায় বসিলে দেবী তাঁহার কন্যার রূপ ধারণ করতঃ তাহাকে বিরক্ত করিতে থাকিলে, তিনবার তাহাকে যাইতে বলায় দেবী অন্তর্দ্ধান হন এবং কেদার প্রতিমাকে সাগরজলে নিক্ষেপ করেন। (৩) অতঃপর দেবী সমুদ্র হইতে উঠাইবার জন্য মানসিংহকে আদেশ করেন। শিলামাতার অন্তর্দ্ধানে দুর্ব্বল কেদার মানসিংহের সিংহবিক্রমে তিষ্ঠিতে না পারিয়া জলযানে পলায়ন করেন। কেদারের দেওয়ান মানসিংহের সহিত সন্ধি করেন। মানসিংহ কেদার কন্যার পাণি গ্রহণ করেন (৪)। সন্ধি হইয়া গেলে কেদারকে স্বরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া, শিলামাতাকে সমুদ্র হইতে উঠাইয়া নিয়া আসেন। শ্রদ্ধেয় রামনাথ বারেট মহাশয় কৃত "ইতিহাস রাজস্থান" নামক গ্রন্থেও এই যুদ্ধের ইতিহাস পাই ;—শিলামাতার কথা,—যুদ্ধে পরাজিত কেদারের সমুদ্রাভিমুখে পলায়নের

1. ... ... Then he was attacked by, one hundred koshas under Command of 'Mendaray' a man famous in these parts. The Maghal fleet was defeated and its admiral Mandaray killed. (Purchas's bilgrims, Part IV, Bonk V Page 513).

(২) সো উকৈ শিলামাতা ছী॥ সো মাতা কা প্রতাপ সে উনে কৈ ভীজীৎ তো নহী।

(৩) অর কেদার রাজা স্যুঁ মাতাকো যো বচন ছো— সো তু রাজী হোয় কহসী সো তূজা—জদি জাস্যু। বেটী কো স্বরূপ করি দেবী পূজন মেঁ আয় বৈঠী। জদি রাজা আপ্‌কী বেটী জানী॥ অর কহী তূজা— মুনে পূজন করবা দে। তূজা ঈয়াঁ তীনবার কহী। জদি মাতা বোলী থারী মহা কো বচন পূরো হো চুক্যো ছৈ। জদি রাজা কহী মুনৈ ছাল লীয়ো আপ্‌কী মরজী হোয় সো কীজে। জদি মাতা নৈ সমুদ্র মেঁ নাখি দীনী।

(৪) জদি রাজা মানসিংঘজী কো দেবী আরাজ দীনা—সো সমুদ্রমেঁ নাখি দীনা ছৈ। সো উঁঠা স্যুঁ কাটলীজ্যো সেহ তো স্যুঁ প্রসন্ন হুবা। জদি রাজা মানসিংঘজী কেদার রাজানে দবাব দীয়োঁ জদি রাজা তো জাজী মেঁ বৈঠ ভাজ্যো। অর দীবান নেঁ মানসিংঘজী কোঠে ভেজ্যো সো দিবান আপো মিল্যো। জদি রাজা মানসিংঘজী উঁকী বেটী মাঁগী॥ জদি রাজা কেদার দেনী করী॥ অর মিলাপ হুবো।



অম্বরের শিলামাতা।

The Sila-mata of Ambar.

(The Patron-Goddess of Kedar Roy of Vikrampur : removed in 1604 A. D. by Manasinha, general of Akbar)

কথা,—মানসিংহকে কন্যাদানের ইতিবৃত্ত,—সন্ধির উল্লেখ সমস্তই পাওয়া যায় (১)। অন্যান্য ঐতিহাসিক প্রমাণ হইতেও আমরা জানিতে পারি যে, মানসিংহের সহিত কেদাররায়ের চারিবার যুদ্ধ হইয়াছিল। হইতে পারে যে দ্বিতীয়বারের যুদ্ধে কেদার পরাজিত হইয়াছিলেন, অবশেষে সন্ধি সংস্থাপন করিয়া মানসিংহ কেদারকে বাদসাহের "পাদসেবী" করিয়া দিয়া দিল্লীতে প্রস্থান করেন। কিন্তু কেদার যে মানসিংহকে কন্যাদান করিয়াছিলেন তাহার কোন প্রমাণ বা উল্লেখ আমরা বৈদেশিকগণের ইতিহাসে দেখিতে পাই না; এমন কি এতদ্দেশ প্রচলিত কোন জন প্রবাদও উহার যথার্থ্য প্রমাণে সচেষ্ট নহে। সর্ব্বদেশে সকল সময়েই জন প্রবাদের গর্ভে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত থাকে। মানসিংহ ও কেদার কন্যার পরিণয় ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকিলে, তৎসম্পর্কে কোনও জনপ্রবাদ নিশ্চয়ই প্রচলিত থাকিত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। দ্বিতীয়বারের যুদ্ধে কেদার পরাজিত হইলে, কেদার মানসিংহের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন এবং মানসিংহ তাঁহাকে করদ রাজারূপে পুনরায় স্বরাজ্যে অভিষিক্ত করেন; ইহাই ঐতিহাসিক সত্য; কেদারের কন্যাদানে সন্ধি স্থাপনের কথা অতিরঞ্জন ভিন্ন অন্য কিছু নহে

মানসিংহ সন্ধিস্থাপন করতঃ প্রস্থান করিলেন কেদার নিজ রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন

মোগলের সহিত তৃতীয়বার যুদ্ধ

স্বাধীনতার উপাসক বীরেন্দ্রপ্রবর কেদার কি সহজে বশ মানিবার? পরাজয়ের অপমান তাহার হৃদয়ে তীব্র শেলের মত বিদ্ধ হইয়াছিল। কেদার ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অনতিকাল মধ্যেই শক্তি সঞ্চয় করিয়া মোগলের সহিত শক্তি পরীক্ষায় সাহসী হইলেন। নির্দ্দিষ্ট দিবস অতীত হইল, কেদাররায় কোনও কর প্রদান করিলেন না। মোগলদূত কেদারকে তাঁহার কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া চলিয়া গেল; কেদার গ্রাহ্য করিলেন না। যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। বাঙ্গালীর এই স্পর্দ্ধায় রাজপুত মানসিংহ গর্জ্জিয়া উঠিলেন। সেনাপতি কিলমক মোগল দরবারের আদেশে বিপুল বাহিনী সহ শ্রীপুরাভিমুখে ধাবিত হইল। কেদাররায়ও নিশ্চেষ্ট বসিয়া ছিলেন না। কেদার তাহার স্বদেশভক্ত বীরগণের এবং কার্ভালোর অধিনায়কত্বে পর্ত্তুগীজগণের সহায়তায় মোগলের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

সেনাপতি কিলমক সসৈন্যে শ্রীপুরের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন।* শ্রীনগর নামক এক সমৃদ্ধিশালী গ্রামের নিকটে উভয়পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। স্বাধীনতা রক্ষায় উন্মত্ত বঙ্গবীরগণ জীবন পণে রণরঙ্গে মাতিয়া উঠিল। উভয়পক্ষের সৈন্যগণের রণকোলাহলে, কামানের ভৈরব গর্জ্জণে চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত এবং অশ্বক্ষুরোত্থিত ধূলিপটলে গগণমণ্ডল সমাচ্ছাদিত হইয়া উঠিল। বারবার বাংলার স্বাধীনতাকামী বীরসৈন্যগণ মোগল কামানের অগ্নিবৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া অগ্রসর

(১) প্রতাপাদিত্যকো জীতকর রাজা কেদারকো রাজ্যপর চড়াই হী। বহ জাতিকা কায়স্থ থা, উর সল্লামাতা নামী দেবী কউস্‌কে ইঅথা; মানসিংজীকী লড়াইকে সমাচার সুনকর কেদার নৌকামে বৈঠকর সমুদ্রকী উর ভগ্‌গয়া। উর মন্ত্রী সে কহ গয়া কি যদি হোস্‌কে তো মেরী পুত্রী মানসিংজীকো দে কর সন্ধি করলে না। মন্ত্রীনে ঐসা হী কিয়া মানসিংজীনে প্রসন্ন হো কর কেদার কো বাদশাহকা পাদসেবী বনাকর উস্‌কা রাজ্য পীছা দে দিয়া, উর সল্লা দেবীকো আম্বের লে আয়ে॥

* দক্ষিণ বিক্রমপুর বর্ত্তমানে ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত নগর সাম গ্রাম।

হইতে লাগিল; বারবার তাহারা ক্ষতবিক্ষত হইয়া ফিরিয়া গেল, আবার নূতন দল মোগলব্যূহ ভেদ করিবার জন্য অগ্রসর হইল। এই ভাবে সমস্ত দিন যুদ্ধ চলিল। তারপরে কেদাররায় তাঁহার সমগ্র বাহিনীকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া একবারে মোগল সৈন্যের তিনটী পার্শ্ব আক্রমণ করিয়া বসিলেন, সেনাপতি কিলমক প্রমাদ গণিল। মোগল সৈন্য এই ঘোর বিপদের মধ্যেও ভগ্নোৎসাহ না হইয়া শত্রু প্রতিহত করিবার জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিতে লাগিল। কিন্তু মোগলের সমস্ত যত্ন চেষ্টা ও বীরত্ব ব্যর্থ হইল; দলে দলে মোগল ও রাজপুত রণভূমি আলিঙ্গন করিতে লাগিল। কেদারের অতুলনীয় শৌর্য্যের নিকট মোগল গর্ব্ব লজ্জাস্কর ভাবে লাঞ্ছিত হইল; সেনাপতি কিলমক সসৈন্যে কেদার রায়ের হস্তে বন্দী হইলেন। শ্রীনগরের যুদ্ধে কেদার লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিলেন; তাঁহার বাহুবলের গৌরব মোগল এবার উত্তমরূপে বুঝিতে পারিল।

সেনাপতি কিলমকের এই পরাজয়ের কাহিনী অম্বরাধিপতির নিকট পৌঁছিলে; মানসিংহ বিপুল বাহিনী সহ শ্রীপুরের স্বাধীনতা অপহরণের জন্য বীরদর্পে অগ্রসর হইলেন। শ্রীনগরের যুদ্ধের পরে কেদারও নিশ্চিন্ত বিলাসে বসিয়া ছিলেন না। তিনি উত্তম রূপেই জানিতেন যে, অতি শীঘ্রই মানসিংহের সহিত শক্তি পরীক্ষায় তাঁহাকে প্রতিদ্বন্দী হইতে হইবে। বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে দূত প্রেরিত হইল; দলে দলে ভাটগণ বীরত্ব ব্যঞ্জক রণ কাহিনী কীর্ত্তনে দেশের যুবকশক্তির উদ্বোধনে প্রবৃত্ত হইল। সমস্ত বিক্রমপুর ব্যাপী এক অসীম উৎসাহের এবং দুর্দ্দমনীয় উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। দেশের শক্তিমান পুরুষ মাত্রই স্বাধীনতার এই ভীষণ আহবে হৃদয় শোণিত ঢালিয়া দেশের সুযশ ও সুনাম রক্ষার জন্য উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। রাজধানী শ্রীপুরে বিরাট একটা কর্ম্মোৎসাহের সাড়া পড়িয়া গেল। কারখানায় কামানাদি অস্ত্রশস্ত্র দিবারাত্রি প্রস্তুত হইত লাগিল (১)। চারিদিক হইতে রসদ ও খাদ্য দ্রব্য শ্রীপুরের রাজভাণ্ডারে মজুত হইতে লাগিল। বিক্রমপুরাধিপতি কেদার, অক্লান্ত পরিশ্রমে সেনাপতি রঘুনন্দন রায়, রাজারাম সর্দ্দার, কালিদাস ঢালী, কার্ভালো, ফ্রান্সিস প্রভৃতির সহায়তায় সংগৃহীত সৈন্যগণকে যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত করিয়া তুলিলেন। রোমের আক্রমণ হইতে কার্থেজ রক্ষার জন্য কার্থেজবাসী নরনারী যেমন সর্ব্বস্বপণ করিয়াছিলেন; তেমনি বিক্রমপুরের আবালবৃদ্ধবনিতা মোগলাক্রমণ হইতে দেশ রক্ষার জন্য উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। শতযুদ্ধ জয়ী মানসিংহ প্রতাপাদিত্য, ইশা খাঁ প্রভৃতিকে পরাজিত করিয়া ভাবিয়াছিলেন যে, বিক্রমপুরাধিপতি কেদাররায় অতি সহজেই মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিবেন। কিন্তু সেনাপতি কিলমকের দুর্দ্দশার বার্ত্তা শ্রবণে তাঁহার ধারণা পরিবর্ত্তিত হইল, তিনি বিরাট বাহিনীসহ আগ্নেয়াস্ত্র এবং রণতরীতে সুসজ্জিত

(১) তৎকালে বিক্রমপুরের রাজধানী শ্রীপুরে আগ্নেয় অস্ত্রাদি প্রস্তুত হইত, তাহার বিশেষ প্রমান আছে। যথা :— The only memorial of this Bhu'yas is a brass gun, still preserved Chandradip with his name and that of the mark Rupiya khan of Sripur engraved on the breech. This gun is 7½ feet in length, 2½ feet in girth at the breech; and 19½ inches at the mwyzle. Through the trunnious, rings had been inserted by which the gun was fastened to tho Carriage. J. R. A. S. B. 207 Page, 1874.

হইয়া চারিদিক হইতে কেদার রায়কে ব্যতিব্যস্ত করিয়া সমূলে বিনষ্ট করিবার মানসে অতি সন্তর্পণে ও সতর্কতার সহিত দ্রুত কুচ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শ্রীপুর নগর প্রকৃতির অতি দুর্ভেদ্য স্থলে অবস্থিত ছিল। উত্তাল তরঙ্গ সমাকুল মেঘনা ও কীর্ত্তিনাশা বা পদ্মার সম্মিলন স্থলে একটী দ্বীপের উপর কেদারের প্রিয় রাজধানী শ্রীপুর নগর বিরাজিত ছিল। বর্ত্তমানে চড়া পড়িয়া ঐ দ্বীপটী ভূখণ্ডের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীপুর টেক নামে পরিচিত থাকিয়া অনুসন্ধিৎসুক ঐতিহাসিকের কাণে কাণে অতীতের কত কথা কহিয়া যায়। (১) এক সময়ে শ্রীপুর নগরী সুরম্য হর্ম্ম্যরাজি সুশোভিত ইন্দ্রপুরী সম কালীগঙ্গার তীরে শোভা পাইত। (২) এই নগরীতে তৎকালে সুন্দর কারুকার্য্য খচিত রাজপ্রাসাদ, দুর্গ এবং সুপ্রশস্ত রাজপথের উভয় পার্শ্বে সুসজ্জিত অসংখ্য বিপণি শ্রেণী দর্শক ও নাগরিকগণের নয়ন ও মনের তৃপ্তি সম্পাদন করিত। কথিত আছে শ্রীপুরের কোটীশ্বর পল্লীতে রায়ভ্রাতৃদ্বয় এককোটী রৌপ্য মুদ্রা প্রোথিত করতঃ তদুপরি শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া, ঐ পল্লীর নাম কোটীশ্বর হয়। এই পল্লীতে দশ মহাবিদ্যা এবং স্বর্ণ নির্ম্মিত দশভূজা দুর্গা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। দৈনিক এইখানে মহাসমারোহে পূজা হইত।

পাশ্চাত্য ভ্রমণকারিগণের লিখিত বিবরণ হইতেও আমরা শ্রীপুরের সমৃদ্ধির পরিচয় পাইতে পারি। ষোড়শ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজগণ এবং জেসুইট যাত্রীগণ এখানে ব্যবসা এবং ধর্ম্মপ্রচারোদ্দেশ্যে বাস করিত। ঐতিহাসিক টেইলার সাহেব বলেন :—"Seeripur" was situated about six leagues to the south of Sunergong. The Portuguese are said to have settled here, about the middle of the 16th Century." (৩)

ইংরেজ ভ্রমণকারী Ralph Fitch ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীপুরে গিয়াছিলেন। তিনি শ্রীপুরকে "Great city" আখ্যায় বিভূষিত করিতে দ্বিধা করেন নাই। তৎকালে শ্রীপুরে বস্ত্রশিল্পের চরমোৎকর্ষতা সম্পন্ন হইয়াছিল। বস্ত্রশিল্পের কথায় বলিয়াছেন, "Great store of cotton cloth is made here" বস্তুতঃ ষোড়শ শতাব্দীতে কেদাররায়ের সময়ে বিক্রমপুরের তথাকথিত শ্রীপুরের সমৃদ্ধি উন্নতির চরম সীমায় উত্থিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু হায়! কালের কুটিল গতিতে শ্রীপুরের সেই সমৃদ্ধি দর্শকের নয়ন মন তৃপ্তি করিবার জন্য আর জীবিত নাই। পূর্ব্বের ক্ষীণকায়া কালীগঙ্গা কালস্রোতে বর্দ্ধিতায়তন হইয়া বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার তাড়নায় তুঙ্গ তরঙ্গা-

(১) Near Rajabari, where two great rivers (Megna and Padma) meet, an island called Sripur has always existed. There is still a tradition that it was formerly a place of great trade. At the present day, this island has joined on to the mainland, and is called Sripur Tek i. e. Sripur point. There was formerly a custom-house here where Sayir, or transit duties were collected by the Government. J. Wise—Notes on Sunergaon, Page 86—87. J. R. A. S. B. 1874.

(২) The first of these channels, which is represented as the Kaliganga in Rennel's maps is now called Kirtinessa, or Sreepur river. It runs in a little to the north of Rajnagar and Mulfatganj and is considered to be the principal branch of Ganges." Topography of Dacca by Surgeon James Taylor.

(৩) Topography of Dacca. Page. 70.

ভিঘাতে চাঁদ ও কেদার রায়ের কীর্ত্তি, স্বীয় কুক্ষিগত করিয়া, চিরকালের জন্য লোকলোচনের অন্তরালে লইয়া গিয়াছে। (১) বর্ত্তমান পদ্মাই পূর্ব্বতন নির্ম্মল সলিলা কালীগঙ্গা। চাঁদ কেদারের শত শত কীর্ত্তি ধ্বংস করিয়া পদ্মা কীর্ত্তিনাশা নাম লাভ করিয়াছে। বিক্রমপুর অঞ্চলে এখনও শ্রাদ্ধ ও বিবাহ উপলক্ষে ভাটব্রাহ্মণগণ ঐ সমস্ত ছড়া গাহিয়া লোককে শুনান ঃ—

"চাঁদ কেদার রায়ের কীর্ত্তি চমৎকার
ভেঙ্গে নিল কোটীশ্বর ;
গোবিন্দ মঙ্গল, সোনার দেউল,
খাকুটিয়াদি গ্রাম বহুতর।" (২)

চাঁদ কেদার নাই, তাঁহাদের কীর্ত্তিও নাই ; আছে শুধু তাঁহাদের স্মৃতি। পূর্ব্ববঙ্গের সমৃদ্ধিশালিনী নগরী প্রধানা শ্রীপুর নাই, কিন্তু এখনও শ্রীপুর টেক দর্শকের মানস-নেত্রের সম্মুখে অতীতের সেই মহা নগরীর একখানা মহিমোজ্জ্বল অস্পষ্ট আলেখ্য অঙ্কন করে। কেদাররায় মানসিংহের অগ্রগমনে বাধা দেওয়ার জন্য সুশিক্ষিত স্থল-সৈন্য এবং কার্ভালোর অধিনায়কতায় ৫০০ শত রণতরী সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। মানসিংহও বিশেষ সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইয়া বিক্রমপুরের প্রান্তে আসিয়া শিবির স্থাপন করিলেন এবং একজন সুকৌশলী দূত শ্রীপুর দরবারে প্রেরণ করিলেন। দূতের সঙ্গে এক খানা শাণিত তরবারি ও শৃঙ্খল প্রদান করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, কেদাররায় যদি শৃঙ্খল গ্রহণ করিয়া মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেন তবে, মানসিংহ বৃথা নরশোণিত পাতে বসুধাবক্ষ সিক্ত করিতে ইচ্ছুক নহেন। আর যদি কেদার রায় তরবারি গ্রহণ করেন তবে, শীঘ্রই ভারতবিজয়ী মানসিংহ তাহার সুশিক্ষিত সৈন্য নিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে সমুচিত শিক্ষা দিবেন। দূতের মারফতে মানসিংহ একখানা লিপিও প্রেরণ করেন। তাহার মর্ম্ম এইরূপ ঃ—

"ত্রিপুর-মঘ-বাঙ্গালী-কাক-কুলী-চাকুলী।
সকল পুরুষমেতৎ ভাগ যাও পলায়ী॥
হয়-গজ-নর-নৌকা-কম্পিত-বঙ্গভূমিঃ।
বিষম সমরোসিংহো মানসিংহঃ প্রয়াতি॥" (৩)

কেদাররায় এই পত্র পাইয়া ভীষণ ক্রোধান্বিত হন এবং সদর্পে মানসিংহ প্রেরিত তরবারি গ্রহণ করেন এবং পত্রের উত্তর দেওয়ার জন্য মুন্সী বিশ্বনাথ সেনের উপর আদেশ করেন। বিশ্বনাথ মোগল দূতের হস্তে মানসিংহের পত্রের নিম্নলিখিত রূপ উত্তর লিখিয়া প্রদান করেন।

"ভিনত্তি নিত্যং করিরাজ কুম্ভং
বিভর্ত্তি বেগং পবনাতিরেকং।
করোতি বাসং গিরিরাজ শৃঙ্গে
তথাপি সিংহ পশুরেব নান্যঃ॥" (৪)

মানসিংহ তাঁহার পত্রের এইরূপ অপমানজনক প্রত্যুত্তরে ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া কেদারের রাজধানী আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। বীরেন্দ্র কেদারও পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়া

(১) The city on the opposite side of the Megna was not Sonargong, but Seripore, which stood in Bikrampore, and was destroyed by the Kirtinessa. (Taylor's Topography of Dacca, Page 108).

(২) স্বর্গীয়া সৌদামিনী দেবীর শ্রাদ্ধবাসরে ভাট ব্রাহ্মণ ১৩৩৬ সনের অক্ষয় তৃতীয়া দিবস এই ছড়াটী আবৃত্তি করিয়া নিমন্ত্রিত অভ্যাগতগণকে শুনাইয়াছিলেন।

(৩) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত "কেদার রায়"।

(৪) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত "কেদার রায়"।

অপেক্ষা সম্মুখ যুদ্ধে প্রকৃত বীরের মত রণ-শয্যায় শয়নে অনন্ত গৌরবের আকাঙ্খায় বেগে মোগল বাহিনী আক্রমণ করিলেন। মানসিংহ কেদাররায়কে শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষরূপেই প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন। অগণিত মোগল সৈন্য জলে স্থলে সমভাবে কেদারের রাজ্য আক্রমণ করিয়া বসিল। রাজধানীর অতি সন্নিকটে মোগল নৌ-সৈন্যের সহিত কেদাররায়ের নৌ-সৈন্যের ভীষণ যুদ্ধ বাঁধিল। কালীগঙ্গার বিশাল বক্ষ রুধিরে রঞ্জিত হইয়া গেল। মহাবীর কার্ভালোর শিক্ষায় নৌসেনা অদ্ভুত রণনৈপুণ্যের পরিচয় প্রদানে বিপক্ষের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করিয়া তুলিল। এদিকে স্থলযুদ্ধে বীরেন্দ্র প্রবর কেদার এবং বঙ্গের সেনাপতি রঘুনন্দন, রাজারাম সর্দ্দার, কালিদাস ঢালী, Francis, মধুমুকুট রায়, কালু সেক প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বীরগণের অনুপ্রেরণায় উৎসাহিত বাঙ্গালী সৈন্য অকুতোভয়ে জীবনের মায়ায় জলাঞ্জলি দিয়া, মোগল ও রাজপুতের সম্মিলিত ব্যূহ ছিন্ন করিবার প্রয়াসে, পর্ব্বতকন্দর-নিসৃতা খরস্রোতা স্রোতস্বিনীর মত পুনঃপুনঃ শত্রুর উপর আপতিত হইয়া তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। প্রথম দিনের যুদ্ধে মোগল সৈন্য একপদও অগ্রসর হইতে সক্ষম হইল না। বিজাতীয় ঐতিহাসিক "আকবর নামাতে" এই যুদ্ধের বিবরণ অতি সংক্ষেপে প্রদান করিয়াছেন। যথা :—

Raja Mansingh ... . turned his attention towards Kaid Rai of Bengal who has collected nearly 500 vessels of war and had laid seize to Kilmak the Imperial Commander in Srinagar. Kilmak held out, till a body of troops was sent to his aid by the Raja. These finally overcame the enemy and after a furious Cannonade took Kaid Rai prisoner who died of his wounds soon after he was brought before the Raja.

মুসলমান ঐতিহাসিক তিন কথায় যুদ্ধের বিবরণ শেষ করিয়াছেন। কিংবদন্তী কিন্তু এ'কথা বলে না। শ্রীনগরের বিশাল প্রান্তরে সপ্ত দিবস ব্যাপী ঘোর যুদ্ধের পর কেদার সাংঘাতিক আহতাবস্থায় ধৃত হন এবং মোগল শিবিরে নীত হইবার অল্প সময় পরেই স্বাধীনতার মহামন্ত্রের উপাসক বীরেন্দ্র কেশরী বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন ভূঁয়া কেদার চিরতরে নয়ন নিমীলিত করেন। যে স্থানে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, মানসিংহ যুদ্ধে বিজয় লাভ করিয়া তাহার নাম ফতেজঙ্গপুর রাখেন। ফতেজঙ্গপুর এখনও বিদ্যমান আছে। শ্রীনগরের প্রান্তর, বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন নৃপতির অস্থি কঙ্কাল সাদরে বক্ষে ধারণ করতঃ একটা বিরাট ধ্বংসের মহাশ্মশান স্বরূপ এখনও বর্ত্তমান থাকিয়া অতীতের কত কাহিনী নীরবে কহিয়া যাইতেছে। দক্ষিণ বিক্রমপুর "নগর" নামে একটী গ্রাম শ্রীহীনাবস্থায় এখনও বর্ত্তমান থাকিয়া অতীতের সাক্ষ্য দান করিতেছে।*

কেদাররায়ের মৃত্যু এবং পরাজয় সম্বন্ধে দেশীয় জনপ্রবাদ এই যে, কেদার যখন মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, তখন তাঁহার গুরুদেব মহাসিদ্ধ পুরুষ গোসাই ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে এই যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার জন্য বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও, কেদার স্বীকৃত না হওয়ায়, তিনি বলেন যে, প্রতিদিবস তিনি ইষ্টদেবীর পূজা করিয়া আশীর্ব্বাদ ও নির্ম্মাল্য প্রদান করিলে যেন, কেদার রণক্ষেত্রে প্রবেশ করেন; তবেই কেদার জয়ী হইতে পারিবেন। কেদার গুরুর আদেশানুযায়ী প্রত্যহই

*R. K. Chakrabarty, Mukter.

রণবেশে সজ্জিত হইয়া কোটীশ্বর পল্লীতে মন্দিরে যাইয়া গুরুদত্ত আশীর্ব্বাদী নিয়া যুদ্ধে যাত্রা করিতেন। এইভাবে সিদ্ধগুরুর কৃপায় কেদার কোন্ এক ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল প্রভাবে মানসিংহের বিশ্বগ্রাসী শক্তিকে সপ্তদিবস ব্যাপী ঘোর যুদ্ধে একস্থানে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। মানসিংহও সম্মুখ যুদ্ধে কেদারকে পরাজিত করিতে অসমর্থ হইয়া কুটিলতার আশ্রয় গ্রহণ করতঃ কৌশলে কেদারের বিনাশ সাধনে কৃত-সংকল্প হন। এবং বহু অর্থ ব্যয়ে তাঁহার এক মন্ত্রীকে হস্তগত করিয়া জানিতে পারেন যে, রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে কেদার একাকী দুর্গের অনতিদূরে কোটীশ্বর পল্লীতে মন্দিরে গিয়া থাকেন (১)। কেদারগুরু গোসাই ভট্টাচার্য্য (২) বীরাচারী শাক্ত ছিলেন। বীরাচারীগণ পঞ্চতত্ত্বের সহায়তায় সাধনা করেন। একদিবস গোসাই ভট্টাচার্য্য পূজার্থে মন্দিরে যাইবার অল্পক্ষণ পরেই কেদার যোদ্ধবেশে মন্দিরে গেলে, গোসাই ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে নির্ম্মাল্য লওয়ার নিমিত্ত আহ্বান করেন। কারণবারি পানে অপ্রকৃতিস্থ গুরুদেবের খামখেয়াল মনে করিয়া কেদার এই আহ্বানে অবজ্ঞা প্রকাশ করিলে, গোসাই ভট্টাচার্য্য সক্রোধে পূজার ছিপ নিয়া পাষাণময়ী প্রতিমার পদে আঘাত করেন। সেই মুহূর্ত্তে প্রতিমার পদ হইতে দরবিগলিত ধারে শোণিত স্রোত প্রবাহিত হইতে দেখিয়া, ভীত স্তম্ভিত কেদার গুরুর পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করেন। গোসাই ভট্টাচার্য্য কেদারকে অভিশাপ প্রদান করেন যে, "কেদারের রক্তে শ্রীপুর সিক্ত না হইলে ইহার প্রায়শ্চিত্ত নাই।"

এদিকে মানসিংহ গৃহশত্রুর সহিত পরামর্শ করিয়া তৎপর দিবস কয়েকজন ঘাতক পাষাণময়ী প্রতিমামণ্ডলীর পশ্চাৎভাগে লুক্কায়িত রাখেন কেদার যখন স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় দশ মহাবিদ্যার সম্মুখে প্রণাম করিতেছিলেন, তখন ঘাতকের শাণিত খড়্গে তাঁহার মস্তক ছিন্ন হয়। কথিত আছে কেদারের দ্বিখণ্ডিত ভূলুণ্ঠিত মস্তক "ছিন্নমস্তে নমস্তে" বলিয়া উচ্চারণ করিয়া চিরতরে মূক হইয়া গিয়াছিল। এই কিংবদন্তীর মূলে কতখানি ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে তাহা আমাদের অজ্ঞাত। কুচক্রী সুকৌশলী মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধে ভবানন্দ প্রভৃতি দেশদ্রোহীর সহিত গুপ্ত ষড়যন্ত্রে যেভাবে কার্য্যোদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহাতে কেদারের সর্ব্বনাশ সাধনে কোনও দেশদ্রোহীর সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকিলেও থাকিতে পারেন।

কেদারের মৃত্যুতে তাঁহার ভগ্নোৎসাহ সৈন্যগণের হৃদয়ে উৎসাহের সৃষ্টি করিয়াছিলেন—কেদারমহিষী স্বয়ং নিজ হস্তে রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মহিয়সী মহিলার নাম কোন ইতিহাসেই পাওয়া যায় না; তিনি যেভাবে সদ্য স্বামী-শোক বুকের মধ্যে চাপিয়া, দেশের ঘোর বিপদের দিনে মানসিংহের সৈন্য স্রোতের মুখে নির্ভীক ভাবে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাহাতে এই অনাথা মহিলার গৌরবরাশি মধ্যাহ্ন ভাস্করের প্রভায় বিক্রমপুর-

(১) অনেকে বলেন শ্রীমন্ত খাঁ নামক মন্ত্রী মানসিংহের উৎকোচে বশীভূত হইয়া এই গুপ্ত সংবাদ তাহাকে দেয়। আমাদের কিন্তু এ'কথা বিশ্বাস হয় না। সোণামণির অপহরণে শ্রীমন্ত খাঁ'র যদি কোন হাত থাকে, তবে তাঁহার মত একজন বিশ্বাসঘাতক যে কেদারের রাজ্যে পুনর্ব্বার স্থান পাইবেন, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সোণামণির অপহরণ যদি মিথ্যা হয় কিংবা শ্রীমন্ত যদি উহাতে লিপ্ত না থাকেন, তবে ইহা সম্ভবপর বটে।

(২) কেহ কেহ ব্রহ্মানন্দ গিরিকে কেদারের গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

বাসীর স্মৃতিপটে চিরদিন জাগরুক থাকিবে। এমনও শুনা যায় যে, তিনি নিরুৎসাহ সৈন্যগণকে নবীন উৎসাহে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য নিজে অস্ত্রধারণ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কোমল-প্রাণা বাঙ্গালী নারীর পক্ষে ইহা কি কম গৌরবের বিষয় ? মোগল সেনাপতি এই শক্তিময়ী মহিলার নির্ভীকতা ও বীর্য্যবত্তায় মুগ্ধ হইয়া নিজেই উপযাচক হইয়া অবশেষে সন্ধির প্রস্তাব করেন। রাণী তখন সেনাপতি রঘুনন্দন রায়, মন্ত্রী রঘুনন্দন দাস চৌধুরী, কালীদাস ঢালী, রাজারাম সর্দ্দার ও কালু সেক প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিয়া সকল অবস্থাধীনে সন্ধি করিতে সম্মত হন। উভয় পক্ষ মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হওয়ায় এই লোক ক্ষয়কর যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হইল। কেদার মহিষী জীবিতা-বস্থায় নিজেই রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছেন। এই গরিয়সী মহিলার মৃত্যুতে কেদাররায়ের রাজ্য তাঁহার মন্ত্রী ও সেনাপতিগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে।

"মন্ত্রী রঘুনন্দন দাশ চৌধুরী বিক্রমপুরের জমিদার। ইনি বৈদ্যবংশ সম্ভূত, ভরদ্বাজ গোত্রীয়, নপাড়ার চৌধুরী বংশের আদিপুরুষ। সেনাপতি রঘুনন্দন ইদিলপুরের জমিদার বংশের আদিপুরুষ। সেক কালু কার্ত্তিকপুরের জমিদার। কালিদাস ঢালী ও রামরাজা সর্দ্দার দেওভোগ ও মুলপাড়া পৃথক্ দুই তালুক প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে বাস করেন, এই বংশীয়গণই পরে মুখুটী ও চাটাতি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।" (১)

স্বর্গীয় রাজমোহন চট্টোপাধ্যায় বলেন— তারা নামে চাঁদরায়ের একজন ভৃত্য ছিল। রণক্ষেত্রে তাহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া রাজা তাঁহাকে "মীর" উপাধিতে ভূষিত করেন এবং তাহার নাম অনুসারে "মীর তাঁরা" ও "বীর তাঁরা" গ্রাম অভিহিত হয়। বর্ত্তমানে "মীতারা" ও "বীর তারা" গ্রাম উক্ত নামেরই রূপান্তর মাত্র।

বিক্রমপুর কামারখাড়া গ্রামে বর্ত্তমানে "মণ্ডলের ছাড়া" "গুপ্তের ছাড়া" "রমার ছাড়া" প্রভৃতি অনেক ছাড়া ও দীঘি দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলি চাঁদকেদাররায়ের আমলাদের বাসস্থান ছিল। কেদারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ভগ্নোৎসাহ হইয়া বাড়ী ঘর ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যায়, এই হেতু ঐ সকল স্থান "ছাড়া" আখ্যায় অবিহিত হইয়াছে।

কেদার স্মৃতি

কেদাররায়ের অভাবে কিছুদিনের মধ্যে তাঁহার রাজ্য খণ্ড বিখণ্ড হইয়া পড়ে। একসময়ে সমগ্র বিক্রমপুর পরগণা, ত্রিপুরার দক্ষিণাংশ, সমগ্র কার্ত্তিকপুর পরগণা ও প্রায় সমগ্র ফরিদপুর জেলা কেদাররায়ের রাজ্যভুক্ত ছিল। ইংরাজী ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে চাঁদরায়ের মৃত্যুর পর বীরেন্দ্রবর কেদার এই বিস্তৃত রাজ্যাধিপতি হইয়া আজীবন যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্য দিয়াই জীবন অতিবাহিত করিয়া-ছিলেন। এই যুদ্ধ বিগ্রহে,—এই ক্ষাত্রশক্তির উদ্বোধনে, ষোড়শ শতাব্দীতে বিক্রমপুরের জাতীয় জীবনের যে, একটা গৌরবময় অঙ্কের অভিনয় হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। বাঙ্গালী তখন ক্ষাত্রশক্তির উন্মাদনায়, বক্ষ রক্তের বিনিময়ে মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় কার্পণ্য করে নাই। বিক্রমপুর তখন স্বাধীনতার রুদ্রমন্ত্রে দীক্ষিত; বিক্রমপুরের আবালবৃদ্ধবনিতা তখন মরণের

(১) "কেদার রায়" পৃষ্ঠা ১১৬ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

আহ্বানে স্থির, ধীর, অটল। প্রকৃতপক্ষে ষোড়শ শতাব্দীতে বিক্রমপুরবাসী প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারিয়াছিল যে,—

মৃত্যু হেথায় অমৃতের সেতু,
শব নাই শুধু শিব।" (১)

সেই মহিমময় ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালী স্বদেশ রক্ষায় যে বীরত্বের, যে শৌর্য্যের পরিচয় দিয়াছিল তাহা, বাস্তবিকই আমাদের গৌরবের জিনিষ। বাঙ্গালী কবি তাই গর্ব্বোন্নত কণ্ঠে বিশ্ববাসীর সমক্ষে—

"এক হাতে মোরা মগেরে রুখেছি, মোগলেরে আর হাতে
চাঁদপ্রতাপের হুকুমে হঠিতে হয়েছে দিল্লীনাথে।" (২)

বলিয়া প্রচার করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।

বাঙ্গালার শক্তি এখন পঙ্গু, বাঙ্গালার ইতিহাসের উপাদান ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত, লুপ্ত; বাঙ্গালা বর্ত্তমানে দুর্ব্বল, ভীরু, কাপুরুষের বিচরণভূমি বলিয়া বিশ্ববাসীর উপহাসাস্পদ;—কিন্তু, বাঙ্গালীত চিরদিন এমন ছিল না,—পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালীর ভীমবাহুতে মত্ত হস্তীর বল, বক্ষে অপরাজেয় সাহস, চক্ষে মর্ম্মভেদী জ্যোতিস্ফুলিঙ্গ ক্রীড়া করিত। পৌরাণিক যুগ হইতে নানা সময়ে বাঙ্গালীর বাহুবলের পরিচয় জগৎ বহুবার পাইয়াছে। কাশ্মীরের রম্য শিখরে বাঙ্গালীর পরিচয় আছে, বারাণসীর তোরণ-প্রান্তে বাঙ্গালী-বীর্য্যের চিহ্ন আছে। বাঙ্গালীর বাহুবলে দুর্দ্ধর্ষ পাঠান ভীত, ত্রস্ত হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর বাহুবলের সম্মুখে মোগল বীর্য্যের অগ্নি-পরীক্ষা হইয়াছিল।

ষোড়শ শতাব্দীতে বিক্রমপুর শৌর্য্যে, বীর্য্যে, ব্যবসা বাণিজ্যে, ও অর্থ সম্পদে, সুখ-সৌভাগ্য-বিলাস-বিলোলা ইন্দ্রাণীর মত উন্নতির চরমসীমায় আরোপিত ছিল। কেদারের রাজধানী শ্রীপুর ও সন্দীপ তৎকালে বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। শ্রীপুর কার্পাস বস্ত্র এবং আগ্নেয় অস্ত্রাদি প্রস্তুতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ভিনিস দেশীয় পরিব্রাজক ফ্রেডারিক সন্দীপ দর্শনে লিখিয়াছেন যে, এই বন্দরে এত অল্প ব্যয়ে জাহাজ তৈরী হইত যে, তুরস্কের সুলতান আলেকজান্দ্রিয়ার পরিবর্ত্তে এখান হইতে আবশ্যকমত পোতাদি নির্ম্মাণ করাইয়া নিতেন। (৩) প্রকৃত পক্ষে তৎকালে বিক্রমপুর সভ্যতার আবাসস্থলে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু হায়! রায়ভ্রাতৃগণের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রমপুরের গৌরব ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়াছে। চাঁদ কেদার নাই, অথচ তাঁহাদের স্মৃতিচিহ্ন এতদিন বিক্রমপুরের বুকের উপর সগর্ব্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহাদের অক্ষয়কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছিল;—কিন্তু রাক্ষসী পদ্মা রায়রাজগণের প্রাচীন চিহ্নের শেষ অস্তিত্বটুকুও বুঝি ধরাবক্ষে লোকলোচনের সমক্ষে রাখিতে একান্তই নারাজ;—তাই রাজাবাড়ীর সুপ্রসিদ্ধ মঠ প্রভৃতিও অল্পদিন হইল গ্রাস করিয়া, চিরকালের জন্য লোকচক্ষুর অন্তরালে লইয়া গিয়াছে। রায়রাজগণের কীর্ত্তির মধ্যে রাজাবাড়ীর মঠ, কেদারবাড়ী, কেশারমায়ের দীঘি এবং কাচ্‌কীর দরজা প্রভৃতিই এতদিন

(১) স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

(২) স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

(৩) ভৌগলিক টেলার ফ্রেডারিকের উক্তি সম্বন্ধে বলেন :—"Two hundred ships are laden yearly with Salt, and that such was the abundance of materials for ship-building in this part of the country that the Sultan of Constantinople found it cheaper to have his vessels built here, than at Alexandria."—A sketch of the Topography and Statistics of Dacca, by Dr James Taylor.

যাবত কেদারের কথা সকলকে স্মরণ করাইয়া দিতেছিল; কিন্তু হায় তাহাও বুঝি আর থাকে না।

পদ্মার উত্তর তীরে রাজাবাড়ী নামে একটী গ্রাম ছিল; সেখানে রায়ভ্রাতৃগণের নির্ম্মিত অপূর্ব্ব কারুকার্য্য খচিত মেঘস্পর্শী একটী ইষ্টক রচিত মঠ, চাঁদ ও কেদারের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করতঃ বহুদিন পর্য্যন্ত পদ্মাসৈকতে দণ্ডায়মান থাকিয়া, মেঘনা ও পদ্মা বক্ষ-বিহারী বাষ্পীয় যান চালকগণের দিক্‌নির্ণয়ের বিশেষ সহায়তা করিত।* কথিত আছে কেদার জননীর চিতার উপর এই মঠটী স্থাপিত হইয়াছিল,—সে আজ ৩৪ শতাব্দীর পুরাতন কথা। এই মঠটীর নির্ম্মাণ সম্বন্ধে নানা রকম প্রবাদ প্রচলিত আছে। কথিত আছে মঠের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করিয়া কেদার বলিয়াছিলেন যে, "এত দিনে মাতৃদায় হইতে মুক্ত হইলাম।" এই কথা উচ্চারিত হইবামাত্র মঠের শীর্ষদেশ ভীমশব্দে পতিত হয়। দ্বিতীয় প্রবাদ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত মহাশয় এইরূপ বলেন যে, "স্থপতি বহু বৎসর পর্য্যন্ত মঠের কার্য্য করিয়া অন্যান্য অংশ যেরূপ সুন্দর করিতে সক্ষম হইল, শীর্ষদেশ সেইরূপ মানানসই করিয়া উঠিতে পারিল না। যেরূপ ভাবে চূড়া নির্ম্মিত হইলে মঠের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইত, সেইরূপ না হওয়ায় কেদার রায় স্থপতিকে ভর্ৎসনা করিলেন ও প্রাণদণ্ডের ভয় দেখাইলেন; স্থপতি ভাবিল কিছুতেই যখন আমাদ্বারা ইহা অপেক্ষা সুন্দর চূড়া হইবে না, তখন এক রকমে না এক রকমে আমার প্রাণ যাইবেই যাইবে, যখন মরিতেই বসিয়াছি তখন একটা অনিষ্ট করিয়াই যাই। মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া স্থপতি কেদাররায়কে কহিল "মহাশয় আপনি আদেশ করিলে আমি পুনরায় মঠের সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হই।" কেদাররায় তাহাকে অনুমতি দিলেন, স্থপতি স্বকীয় উদ্দেশ্য সাধনার্থ মঠের উপর আরোহণ করিয়া উহার চূড়া ভগ্ন করতঃ সেই সঙ্গে সঙ্গে নিম্নে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। প্রকৃতপক্ষেই রাজাবাড়ীর মঠের চূড়া ছিল না। কিংবদন্তী বক্ষনিহিত সত্য উদ্ধারে অসমর্থ হইয়া যোগেন্দ্রবাবু অনুমানের সাহায্যে বলেন,—"আমাদের বিশ্বাস যে কেদার রায় যুদ্ধবিগ্রহে পতিত হইয়া, যথা সময়ে মন্দিরের কার্য্য শেষ করাইতে না পারায় পল্লীবৃদ্ধগণের উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে এইরূপ নানা গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে।" আমাদের বিশ্বাসও তাহাই। শ্রদ্ধেয় যোগেন্দ্রবাবুর অনুমানই আমরা সমীচীন মনে করি। কাহারও মতে এই মঠে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং কেহ কেহ ইহাকে শিবালয় বলিয়াও অভিহিত করেন (১)। কথিত আছে যে এই স্থানে কেদাররায় একটী বাসোপযোগী ভবন তৈয়ার করায়, এই স্থান রাজাবাড়ী আখ্যা প্রাপ্ত হয়। বারভূঁইয়া লিখক শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয় বলেন "বহুদিন হইতে বিক্রমপুরে দুইটী স্থান

*The Mutt of Raja-baree which forms a conspicuous land mark from the Ganges and Megna is said to have been erected by this Raja (Chand Ray)—Topography of Dacca. Page 103.

(১) "ডাক্তার ওয়াইজের অনুসরণে "বিশ্বকোষের" নগেন্দ্রবাবুও উহাকে শিবালয় নামে অভিহিত করিয়াছেন। আমরা কিন্তু ঐ উক্তির সত্যাসত্যের প্রমাণ পাই নাই।"—কেদার রায় পৃঃ ৮৬ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

আমরা কিন্তু শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত থাকার উক্তি, অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করি না, কারণ শ্মশানোপরি মঠ স্থাপিত হইলে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠাও এ'দেশে স্বাভাবিক এবং শাস্ত্রীয় প্রচলিত বিধি

কালীক্ষেত্র পীঠস্থানবৎ পূজিত হইয়া আসিতেছে। তন্মধ্যে একটী চাচইরতলার ঠাইরণ বাড়ী অপরটী মাঐসারের দিগম্বরীবাড়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রবাদ যে, চাচইরতলাতে ব্রহ্মানন্দগিরি ও মাঐসারে গোঁসাই ভট্টাচার্য্য সিদ্ধিলাভ করেন। কেদার রায় মাতৃনির্দ্দেশ ক্রমে, এই পীঠস্থানবৎ চাচইরতলার নিকট অপর একটি বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন যাহা অদ্যাপি রাজাবাড়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই স্থানে বাস করিয়া অনায়াসে সর্ব্বদা দেবীর অর্চ্চনা করা যাইতে পারিবে, এই মানসেই ঐ বাড়ী নির্ম্মিত হইয়া, রাজাবাড়ী আখ্যা প্রাপ্ত হয়।" আনন্দ বাবুর অনুমান ঠিক বলিয়াই আমাদের মনে হয়—কারণ রাজাবাড়ী গ্রামের চতুর্দ্দিকস্থ পারিপার্শ্বিক প্রাচীন চিহ্নের কঙ্কালগুলি এখনও জীর্ণশীর্ণাবস্থায় পড়িয়া থাকিয়া আনন্দ বাবুর অনুমানের যৌক্তিকতাই প্রমাণ করিতেছে।

মঠটী ৮০ ফিট উচ্চ এবং ভিত্তির বেষ্টন ১২০ ফিট ছিল। মঠের সম্মুখ ভাগ নানারূপ সুন্দর কারুকার্য্য খচিত ছিল। গবর্ণমেণ্টের "List of Ancient Monuments in the Dacca Division" নামক রিপোর্টে নিম্নলিখিত মন্তব্য আছে—"It is a monumental tower of bricks masonry built, it is said, over the funeral pyre of the mother of Chand Rayya and Kedar Rayya who were about 300 hundred years ago some independent princes of the locality. It is known as the Rajabari Math. It measures 30 feet square at base and 80 feet in height and has a small room within it. The dimensions of the Math are large and its proportions elegant. It stands up as a conspicuous land mark visible for many miles across the Ganges on the south and the Megna on the north" (Page 24). ডাক্তার James Wise এই মঠের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—"There is the lofty Rajabari Math which is a prominent land mark for miles around, on the left bank of the river Padma. It stands at a short distance from where the great city of Sripur formerly was. This Math is a four-sided tower, twenty-nine ft. square at the base. In the first thirty feet, the walls are ornamented with various patterned bricks in imitation of flowers. The middle of each fare raised and ribbed, The walls are eleven feet thick, and the bricks used in these construction are of peculiar shape. They are larger than those found in Mahmeddan buildings of the same age, and being eight inches square, and one and a half thick. On the summit is a large spherical mass, round which several picturesque pipul trees thus have entwined their roots and are gradually destroying the suitable of the spire. This Math was a shrine dedicated to Shiv. But as it is buried in the midst of dense jungle and marshes, it is rarely visited at the present day. —J. R. A. S. B., 1874.

কালক্রমে তিনশত বৎসরের রৌদ্রবৃষ্টির প্রবল পীড়নে মঠটী জীর্ণশীর্ণ হইয়া পড়িলে ইংরেজী ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ভাগ্যকুলের রাজা শ্রীনাথ নিজ ব্যয়ে মঠটীর সংস্কার সাধন করেন এবং মঠের শীর্ষভাগের চূড়াটী নির্ম্মাণ করান। সংস্কারের পরে একখানা প্রস্তর ফলক মঠের দ্বারদেশের উপরিভাগে স্থাপিত হয়; তাহাতে লিখা ছিল,—

"This structure being an ancient and sacred Hindu monument and a valuable land mark for the District erected by Chand Ray and Kedar Ray over the funeral pyre of their mother in the sixteenth century was repaired in 1896 at the cost of Raja Sree Nath Ray of Bhagykul by Babu Sashi Bhusan Mitter, District Engineer under the order of C. J. S. Eoulder, Esqr. Collector of Dacca".

মনে পড়ে বিরাট গৌরবের ধ্বংসাবশেষ মহিমময় এই মঠটী একদিন দেখিয়াছিলাম—প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে Mixed Steamer'এ নারায়ণগঞ্জ আসিবার সময়। দারুণ গ্রীষ্মের এক জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে Steamer রাজাবাড়ী মঠের অনতিদূরে আসিলে, জ্যোৎস্না স্নাত এই মঠটী দেখিয়া পুলকে আত্মহারা হইয়াছিলাম! অতীত কাহিনীর এই মহিমময় নিদর্শন অতীতের মোহন স্বপ্ন আমাকে কিয়ৎকালের জন্য মুগ্ধ করিয়াছিল; তখন কেবল মনের ভিতর মৃদু গুঞ্জনে ধ্বনিত হইতেছিল মহাকবির সেই অমর বাণী :—

"কথা কও, কথা কও *
অনাদি অতীত, অনন্ত রা'তে
কেন জেগে বসে রও?
কথা কও কথা কও॥
যাঁহাদের কথা ভুলেছে সবাই,
তুমি তাঁহাদের কিছু ভুল নাই,
বিস্মৃত যত অতীত কাহিনী—
স্তম্ভিত হয়ে রও।
ভাষা দাও তারে হে মুনি অতীত
কথা কও কথা কও॥"

বিক্রমপুরের বিরাট গৌরবের স্মৃতিটী বিগত ১৩৩০ সালের ২২শে ভাদ্র রাক্ষসী পদ্মার অতল বক্ষে আত্মগোপন করিয়াছে। বিক্রমপুরের ইতিহাস লেখক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় তদীয় রাজাবাড়ীর মঠ নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, "পদ্মা যখন ইহার পদপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন মঠটী ধীরে ধীরে কাঁপিতেছিল, এবং চূড়ার নিম্নবর্ত্তী অংশের খানিকটা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেলে দেখা গেল যে, নিম্নে যেমন একটী প্রকোষ্ঠ ছিল, তেমনি চূড়ার কিছু নীচুতেও ঐরূপ একটী ছোট বদ্ধ কক্ষ ছিল, কক্ষের অভ্যন্তর ভাগের গাঁথুনি দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন, এইমাত্র স্থপতি নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছে। একদিন সকলে বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন যে, উহার মধ্যভাগ ধসিয়া পড়িয়া পদ্মাগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। তারপর যেদিন মঠটি চিরদিনের জন্য বিলীন হইবার মত অবস্থায় দাঁড়াইল, তখন বিক্রমপুরের ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম হইতে শত শত ব্যক্তি আসিয়া তীরে সমবেত হইলেন, প্রত্যেকের মুখে প্রিয়জনের আসন্ন মৃত্যু সময়ের গভীর বেদনার ন্যায় একটা আন্তরিক বিষাদ চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছিল। প্রত্যেকের মুখে হাহাকার। এই যে মঠটি এখনও দাঁড়াইয়া আছে—এই যে পদ্মা,—রাক্ষসীর ন্যায় বিকট-বদন ব্যাদান করিয়া ফেনিল উচ্ছ্বাসে উন্মাদ কলনাদে ছুটিয়া আসিতেছে। চারিদিক বেড়িয়া ভীষণ আবর্ত্ত নিম্নস্থ ভিত্তিমূল আল্‌গা করিয়া গড়িয়া উঠিল।

* শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তারপর একটা শ্রবণ-বিদারী ভৈরব রব, বিরাট তরঙ্গোচ্ছ্বাস-উৎক্ষিপ্ত জলরাশি চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, পলকে সব মিলাইয়া গেল। কোথায় মঠ! কোথায় সেই বিরাট বিজয়স্তম্ভ! কোথায় বিক্রমপুরের গৌরবধ্বজা। নাই! নাই! কিছুই নাই! প্রিয়জনের শবদেহ শ্মশানের বুকে ভস্মে পরিণত করিয়া সেই চিতাভস্ম নদীর জলে ফেলিয়া যেমন আত্মীয় স্বজনেরা ঘরে ফিরিয়া যায়, তেমনি ধীরে ধীরে হাহাকার করিতে করিতে হতভাগ্য বিক্রমপুরবাসী, তাহাদের শেষ গৌরব-স্মৃতি-চিহ্ন চিরদিনের জন্য রাক্ষসী পদ্মার বুকে ডালি দিয়া চলিয়া গেলেন। পদ্মা তেমনি আকুল বেগে ছুটিয়া চলিল—তেমনি কলোচ্ছ্বাসে তরঙ্গ আবার, নাচিয়া উঠিল। আকাশে বাতাসে মহাকালের বিজয় গর্ব্বের একটা বিকট অট্টহাসি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল—হা-হা-হা।

*　　*　　*　　*

সংবাদপত্রে এই সংবাদ প্রচারিত হইল, দেশে বিদেশে বাঙ্গালী যে যেখানে এই সংবাদ পাইলেন, তিনিই কাঁদিলেন। যে বিক্রমপুরবাসী দেশকে ভুলিয়া চিরপ্রবাসী হইয়াছিল, তাহার নয়ন বহিয়াও দুই ফোঁটা উষ্ণ অশ্রু গড়াইয়া পড়িল! বিক্রমপুরের কবি বজ্রাহত কণ্ঠে গাহিয়া উঠিলেন

"আজি সে কীর্ত্তি নিদ্রামগন,
পদ্মার বুকে পড়েছে লুটে;
মানসনেত্রে তবু ক্ষণে ক্ষণ
স্মৃতি জ্যোতিঃ তার উঠিবে ফুটে।
চির পবিত্র চিত্র তাহার
আঁখি পল্লবে হেরিব না আর,
সামালিতে হায় পারি না এ ব্যথা
বুক ফেটে মোর কান্না ছুটে।" *

সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ী বা চাঁচুরতলার ঠাইরণ-বাড়ী কেদাররায়ের অন্যতম কীর্ত্তি, রাজাবাড়ী মঠের সন্নিকটেই অবস্থিত ছিল। কালীমন্দিরটিও বিগত ১৩৩৩ সনের ১৫ই শ্রাবণ তারিখে পদ্মাগর্ভে বিলুপ্ত হইয়াছে। লোকে এখানে মানস করিয়া ঈপ্সিত লাভের পরে চাচর অর্থাৎ কেশ বা চুল দিত বলিয়া ইহার নাম চাচরতলার কালী বলিয়া প্রসিদ্ধ। চাচইরতলার খাল নামে পরিচিত একটী খালের ধারে বনচ্ছায়াস্নিগ্ধ মনোরম তপোবনের মত এই মন্দিরটী বহুকাল যাবত দেশবিদেশাগত সহস্র সহস্র ভক্তের নিকট পরম পবিত্র পীঠস্থানের সম্মান প্রাপ্ত হইতেছিল। প্রবাদ এইরূপ যে, ব্রহ্মানন্দ গিরি (১) (কেদাররায়ের গুরু) এখানে সিদ্ধিলাভ করেন। সময় সময় বহু মহাপুরুষ এখানে সাধনা করিয়া থাকেন। চাচইরতলার কালীবাড়ীর প্রসিদ্ধি পূর্ব্বে এতদূর ছিল না। সাধক প্রবর বিজয়রাম শর্ম্মা নামক একজন পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণ-সন্তান এখানে কঠোর সাধনার পর সিদ্ধিলাভ করেন। তৎপূর্ব্বে এই পবিত্র স্থানটী জঙ্গলাকীর্ণ থাকায়, লোকজনের তেমন যাতায়াত

* শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ (রাজাবাড়ী মঠ)

(১) এই জনপ্রবাদের মূলে কতখানি সত্য আছে তাহা বিবেচ্য। ব্রহ্মানন্দ শাক্তের প্রধানতম পীঠস্থান কামেক্ষ্যাতে সিদ্ধিলাভ করেন বলিয়া অনেকের মত। রমনার কালীবাড়ীতে ব্রহ্মানন্দের গুরু বাস করিতেন। সিদ্ধিলাভের পর ব্রহ্মানন্দ ত্রিপুরা জিলাতে বিবাহ করিয়া বহু বৎসর তথায় অবস্থান করেন। গুরুর তিরোধানে ব্রহ্মানন্দ রমনার কালীবাড়ীর সেবাইত হন। অদ্যাপি ব্রহ্মানন্দের বংশধরগণ উক্ত কালীবাড়ীর সেবাইত পদে প্রতিষ্ঠিত। তবে ব্রহ্মানন্দের চাচইরতলার কালীবাড়ীতে কিছুদিন অবস্থান একেবারে অসম্ভব নয়। কেদাররায়ের গুরু ব্রহ্মানন্দগিরি নহেন—ব্রহ্মাণ্ডগিরি বা গোসাই ভট্টাচার্য্য। আমাদের বিশ্বাস ব্রহ্মাণ্ডগিরি গোসাই ভট্টাচার্য্যের সন্ন্যাসের নাম হওয়াতে লোকে কেদারের গুরু পদে ব্রহ্মানন্দ গিরিকে নিয়া টানাটানি করিতেছেন।

ছিল না। বিজয়রাম এখানে স্থায়ীভাবে বাস করায় এবং সর্ব্বাঙ্গীন পূজা অর্চ্চনার ব্যবস্থা করায়, এই কালীবাড়ীর মাহাত্ম্য সর্ব্বজনবিদিত হইয়া পড়ে। বিজয়রাম এই পবিত্র পীঠস্থানে পঞ্চমুণ্ডী আসন স্থাপন করেন এবং তাম্রফলকে বীজমন্ত্র খোদিত করিয়া তদুপরি ঘটস্থাপন করেন। সেই তাম্র-ফলক অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে (১)। কথিত, বিজয় রামের সিদ্ধিলাভের পরে চাচইরতলার কালীবাড়ী, সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ী নামে সাধারণ্যে পরিচিত হয়। বিজয়রামের চেষ্টায় অতি অল্পকাল মধ্যেই সেই ঘোর বনাকীর্ণ স্থান, একটী সুন্দর গ্রামে পরিণত হয়। বিজয়রাম ভূম্যধিকারী হইতে দেবোত্তর এবং ব্রহ্মোত্তর স্বরূপ বহু ভূমি প্রাপ্ত হন(২)। কালক্রমে ঐ দেবোত্তর এবং ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি নিয়া "বিজয়রাম শর্ম্মা তালুক" নামে একটী সম্পত্তির সৃষ্টি হয়। বাহেরক সত্যাশ্রম হইতে প্রকাশিত "শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ী" নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে, "বিজয়রামের বংশ লোপ পাওয়ায় ঐ বংশের দৌহিত্রগণ উহা ভোগ করিতে থাকেন, কিন্তু কিছুদিন পর অর্থাভাব নিবন্ধন ঐ সম্পত্তি তাহরা বিক্রয় করিতে বাধ্য হন। বর্ত্তমানে উক্ত তালুক মালপদিয়া নিবাসী শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় উক্ত গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত মথুরা মোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া ভোগ করিতেছেন। বর্ত্তমানে উহারাই বিজয়রাম শর্ম্মা তালুকের খরিদসূত্রে মালীক।"

কীর্ত্তিনাশা পদ্মা কি একটা বিরাট ক্ষুধার তাড়-নায় ভীমতরঙ্গ প্রহারে একবার দেশ গ্রাম ক্রমাগত কুক্ষিগত করিতে করিতে কালীমন্দিরের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে, কথিত আছে যে, তখন গ্রাম-বাসী সকলে বিখ্যাত মুসলমান ফকীর মনাইকে পদ্মার রাক্ষসী গ্রাস হইতে কালীবাড়ী রক্ষার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, তিনি বলিলেন—"তোমরা আমার হস্তপদ বন্ধন করিয়া আমাকে নদীবক্ষে নিক্ষেপ কর; সপ্তাহান্তে এখানেই আমাকে পাইবে, তখন তোমাদের কথার উত্তর দিব।" তাঁহার কথামত কার্য্য করা হইল। সপ্তাহান্তে ঐ স্থানেই ফকীর ভাসিয়া উঠিলেন এবং সমবেত কৌতুহলী ভক্তমণ্ডলীর সমক্ষে বলিলেন, যে পদ্মার উত্তর তীরে চাচইর-তলার কালীবাড়ী এবং দক্ষিণ তীরে মাঐসারের দিগম্বরীতলা চিরদিন বিরাজমান থাকিবে। মধ্যবর্ত্তী সকল স্থানই পদ্মাগর্ভে অচিরে বিলীন হইবে;—তবে "শ্রীপুরের টেক" কোন কালেই ধ্বংস হইবে না। বাস্তবিক কি জানি কি কারণে পদ্মা ভীমগর্জ্জনে অগ্রসর হইতে হইতে হঠাৎ গতি রুদ্ধ করিল; তখন সকলেই মনে করিয়াছিল যে, সিদ্ধ মহাপুরুষের কথা মিথ্যা হইবে না;—চাচইরতলার বিখ্যাত কালীক্ষেত্র কোন কালেই পদ্মার কুক্ষিগত হইবে না। কিন্তু হায়! দুর্ভাগা বিক্রমপুরবাসীর অদৃষ্টের দোষে মহাপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণীও মিথ্যায় পরিণত হইল। বিগত ১৩৩৩ সালে পদ্মা তাহার লোলুপ রসনা ব্যাদানে ভীমবেগে কালীক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইয়া জীয়স পুকুরের নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িল। পদ্মার গতি প্রতিহত করিবার মানসে দৈবশক্তির সহায়তার জন্য স্থানীয় জনসাধারণ ১৩৩২ সনের ১৩ই আশ্বিন তারিখে বিরাট ভাবে এক বারোয়ারী পূজা ও হোমযজ্ঞের ব্যবস্থা করেন (৩)। ইহার

(১) "শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ী" বাহেরক সত্যাশ্রম হইতে প্রকাশিত, পৃঃ ৯

(২) ... ... পৃঃ ১১

(৩) ... ... পৃঃ ২১

কিছুদিন পরে এক সন্ন্যাসী এই স্থানে এক বিরাট মহোৎসবের অণুষ্ঠান করেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ১৩৩৩ সাল বিক্রমপুরবাসীর এক স্মরণীয় দিন। প্রাবৃটে তুম্ব-তরঙ্গাভিঘাতে ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে পদ্মা রুদ্রমূর্ত্তিতে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। শত শত লোক সমবেত হইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে এই পূত পীঠস্থানের চরম পরিণতি দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। শত শত ব্যক্তির বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠের 'মা' 'মা' আর্ত্তনাদে সেই স্থানটী এক মহাশোককর মহাশ্মশানের অনুভূতি জাগাইয়া দিল। ১৫ই শ্রাবণ শনিবার দেবী-মন্দির বর্ষাবায়ু বিতাড়িত পদ্মার ভীষণাবর্ত্তে পড়িয়া মুহূর্ত্তমধ্যে কোথায় মিলাইয়া গেল। শত শত দর্শক শোকদগ্ধ হৃদয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

মন্দিরটী ভাঙ্গিয়া পড়িবার কিছুদিন পূর্ব্বেই মন্দিরাভ্যন্তরস্থ বিগ্রহ স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। কেদারপুর বা কেদার বাড়ী নামে পরিচিত গভীর জঙ্গলাকীর্ণ সর্পাদি হিংস্র প্রাণীসঙ্কুল এক বিস্তীর্ণ স্থান রাশি রাশি ভগ্ন ইষ্টকস্তূপ এবং প্রারব্ধ ও অসম্পূর্ণ অট্টালিকার চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। Topography of Dacca নামক পুস্তকে Taylor সাহেব কেদারপুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে,—"At Kedderpore there are remains of residence, which is said to have belonged to Rajah of the name Chand Roy, or the Boounahs, who appear to have extended their authority to several parts of the country, west and south of the Borrigangas during the decline of the Kingdom of Bongoz. This place which is now a heap of bricks, is of considerable extent but is so overgrown with jungle and infested with snakes that its outline cannot be ascertained."

কাচ্‌কীর দরজা বলিয়া একটী রাস্তা ইদিলপুর পরগণার অন্তর্গত বুড়ীরহাট হইতে ধলেশ্বরী তটে আসিয়া পঁহুছিয়াছিল (১)। রাস্তাটী এখন প্রায় লুপ্ত। কথিত আছে মাছের কাটা গলাতে বিদ্ধ হইয়া কেদার জননীর মৃত্যু হইবে বলিয়া কোন জ্যোতিষী মত প্রকাশ করায়, কেদার জননীর খাদ্যের জন্য কাচ্‌কী মাছের সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে এই পথটী তৈরী করান। এই প্রবাদের মূলে কোন সত্য আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। মনে হয়, কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই এই রাস্তাটী রায় রাজগণের আমলে প্রস্তুত হইয়াছিল।

বিক্রমপুরে "কেশার মার দীঘি" নামে পরিচিত একটী প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা রাজাবাড়ী গ্রামের উত্তর দিকে অবস্থিত। প্রবাদ যে, কেশার মা নামে একজন রমণী কেদারের ধাত্রী মা ছিল। তাহার ইচ্ছানুসারে কেদার এই দীর্ঘিকাটী খনন করান। কথিত আছে যে, কেশার মা যতদূর পর্য্যন্ত একবারে পদব্রজে যাইতে পারিবে দীর্ঘিকাটীও ততদূর দীর্ঘ হইবে। কেশার মা একমাইল পথ অতিক্রম করিয়া বিশ্রাম নেওয়ায় দীঘিটীও এক মাইল লম্বা করিয়া খনন করা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে দীঘিটী ভরিয়া অর্দ্ধমাইল লম্বা ও পোয়ামাইল প্রশস্ত হইয়াছে। ইহার চারিপারেই এখন বস্তি। ইহার তীরে একটী হাট বসে—তাহা দীঘির পারের হাট বলিয়া প্রসিদ্ধ।

(১) "কেদার রায়" শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত পৃঃ ৮৪

বিক্রমপুরের নানাস্থানে চাঁদরায় ও কেদার রায়ের বহুকীর্ত্তির* চিহ্ন এখনও বিদ্যমান আছে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিস্মৃতির গাঢ় যবনিকায় সে সকলের ইতিহাস লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। প্রধান প্রধান কতকগুলি কীর্ত্তি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইয়াছে। কেদাররায়ের রাজধানী শ্রীপুর বহুকাল পূর্ব্বে পদ্মাগর্ভে লুপ্ত হইয়াছে; রাজাবাড়ীর সুপ্রসিদ্ধ মঠ, সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ী, ঢোলসমুদ্র প্রভৃতি পদ্মার বুকে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে;—অনেক গিয়াছে—আরও যাইতে বসিয়াছে;—আছে কেবল একটা গৌরবময় স্মৃতি। কেদাররায়ের মত নগণ্য একটা ভূঁঞা ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট আকবরের শক্তি উপেক্ষা করিয়া বুকের রক্তে দেশমাতৃকার অর্চ্চনা করিয়াছে;—আছে শুধু বিক্রমপুরবাসীর তথা বঙ্গবাসীর সেই গৌরবময় স্মৃতিটুকু। বৈদেশিক ঐতিহাসিক এই ঘটনাটিকে যতই উপেক্ষার চক্ষে দেখুক,—কিন্তু ইহাই বিক্রমপুরবাসীর অতি গর্ব্বের ইতিহাস। বিক্রমপুরবাসী তাহার ভবিষ্যতকে বর্ত্তমানকে ভুলিতে পারেন, কিন্তু অতীতকে ভুলিতে পারেন না। বিক্রমপুর আর সব ভুলিতে পারে—কিন্তু কেদাররায়কে ভুলিতে পারেন না।

†চাচরতলার কালীবাড়ী

বিক্রমপুরের প্রাচীন কীর্ত্তি-সমূহ একে একে সকলই কালসাগরের বুকে মিশিয়া যাইতেছে। ধ্বংসরূপিনী পদ্মা হা হা করিয়া বিকট উল্লাসে মুখ ব্যাদান করিতে করিতে যাহা কিছু গৌরবের, যাহা কিছু আদরের, যাহা কিছু স্মরণীয় এবং বরণীয় ছিল তাহা গ্রাস করিয়াছে। গ্রাস করিয়া আবার হা! হা! করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। সমগ্র বিক্রমপুরটাকে তাহার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা পূর্ণ করিবার জন্যই যে এই ব্যাকুলতা তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। এই সেদিন চাচরতলা-কালীবাড়ী—একটী পীঠস্থান, চির বিলুপ্ত হইল।

চাচরতলার কালীবাড়ীর ইতিহাস এখানে একটু সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।

চাচরতলা চলিত কথায় চাচইরতলার কালীবাড়ীর প্রকৃত প্রাচীন ইতিহাস কেহই বলিতে পারেন না। প্রাচীন কাগজপত্রাদি হইতে বিশেষ কিছুই জানা যায় না, তেমন কোন কাগজপত্র অনুসন্ধান করিয়াও পাই নাই। মালপদিয়ার ভট্টাচার্য্যগণ এই স্থানের এক স্বত্বাধিকারী ছিলেন, তাঁহাদের নিকট যাইয়াও কিছু জানিতে পারি নাই। পদ্মার উত্তর পারে এই পীঠস্থান অবস্থিত ছিল। কতবার পদ্মা ইহার কাছে আসিয়া সরিয়া গিয়াছে, কতবার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় বলিয়া জনসাধারণের মনে ভীতির সঞ্চার হইয়াছে, কিন্তু বিধাতার আশ্চর্য্য বিধান বলে তাহা হয় নাই, কিন্তু এইবার সর্ব্বপ্রকার বিশ্বাস বিলুপ্ত করিয়া দিয়া পদ্মা মাতৃমন্দির তাহার বুকে টানিয়া লইয়াছে।

চাচরতলার কালীবাড়ী কোন কালে বিলুপ্ত হইবে না বলিয়া জনসাধারণের একটা বিশ্বাস ছিল, সে বিশ্বাসের সহিত একজন ফকীরের নাম সংশ্লিষ্ট। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে পাঁচচর বরমগঞ্জ নামক স্থানে মনাই ফকীর নামে এক বৃদ্ধ ফকীর বাস করিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে বিবিধ অলৌকিক জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল। সে সময়ে সুধারাম বাউল নামে একজন ফকীর ছিলেন। সুধারাম বাউল ও মনাই ফকীর সমসাময়িক। কথিত আছে যে মনাই ফকীর ব্যাঘ্রারোহণে সুধারামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। খড়ম পায়ে দিয়া নদী উত্তীর্ণ হওয়া, মৃত ব্যক্তির জীবন প্রদান ইত্যাদি বিবিধ কিংবদন্তীর ত অভাবই নাই! সুধারাম বাউলের ন্যায় মনাই ফকীরের রচিতও দুই একটী সঙ্গীত ফকীর ইত্যাদির মুখে গীত হইতে শুনা যায়। সেগুলি কবিত্ব মাধুর্য্যে বা শব্দসম্পদে গরীয়ান্ নহে কিন্তু সরল সাধুর অন্তর্নিহিত মধুর ভাব—

* মাথরা গ্রামের বাসুদেব মূর্ত্তি চাঁদ ও কেদারের শেষ কীর্ত্তি। "বিক্রমপুরের" দ্বিতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

† "বীণা" ১৩৩১ সন ৪র্থ সংখ্যা।

সাধনের গূঢ় তথ্যসমূহ সে সকলের মধ্যে পদ্মকোষবদ্ধ মধুর ন্যায় গুপ্ত ভাবে সংশ্লিষ্ট আছে। একবার কয়েকজন বিজ্ঞ মনাই ফকীরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে কীর্ত্তিনাশা নদী কালে কতদূর বিস্তৃতি-লাভ করিবে? তাহাতে ফকীর বলিলেন যে "তোমরা আমার হস্তপদ বন্ধন করিয়া একটী থলিয়ার ভিতর পুরিয়া কীর্ত্তিনাশা জলে নিক্ষেপ কর সপ্তাহান্তে আমাকে এখানেই পাইবে। তখন আমি তোমাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিব। তাঁহার আদেশ অনুযায়ী কার্য্য হইল। সপ্তাহান্তে সকলে সমবেত হইয়া জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর চাহিলে তিনি বলিলেন, "দেখ উত্তর পারে এক ঢেলা মাটী ও দক্ষিণ পারে এক ঢেলা মাটি দেখিলাম। ইহার অর্থ এই যে কীর্ত্তিনাশার উত্তর পারে চাচরতলা ঠাকরুণবাড়ী এবং দক্ষিণ তটে মাঐসারের দিগম্বরীতলা বিরাজমান থাকিবে। আর এই দুই পীঠ-স্থানের মধ্যবর্ত্তী যে সব স্থান দেখিতেছ সে সমুদয়ই অচিরাৎ কীর্ত্তিনাশার কুক্ষিগত হইবে। রাজনগরের শতরত্ন মঠ ও একুশরত্ন মঠের নীচে সোণার ইলিস মৎস্য ক্রীড়া করিতেছে দেখিতে পাইয়াছি।"

এই চাচরতলার কালীবাড়ীর প্রসিদ্ধি যে কত দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহার সঠিক বৃত্তান্ত কেহই বলিতে পারেন না। পদ্মাবক্ষ হইতেই এই কালীবাড়ী দেখা যাইত। এরূপ সুন্দর শান্তিপূর্ণ স্থান বিক্রমপুরের মধ্যে অতি বিরল ছিল। জনকোলাহল হইতে দূরে একটী খালের পারে (চাচইরতলার খাল নামেই এই খাল পরিচিত) সুরম্য তপোবনের ন্যায় তেঁতুল, আম্র, প্রভৃতি প্রাচীন মহীরূহরাজির শীতল ছায়ায় শষ্পাচ্ছাদিত প্রান্তর ভূমে জগন্মাতা বিক্রমপুরবাসীর স্নেহময়ী রক্ষয়িত্রীরূপে বিরাজিতা ছিলেন। নানা দেশদেশান্তর হইতে প্রতিদিন দেবীকে দর্শনের নিমিত্ত লোক সমাগত হইত। এই কালী প্রত্যক্ষা জাগ্রতা দেবী বলিয়াই লোকে বিশ্বাস করিতেন। ইঁহার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর কিংবদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়। এখানে আমরা তাহার একটীর উল্লেখ করিতেছি। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী একবার এইখানে আগমন করেন, তিনি যখন কীর্ত্তনাদি করিতে-ছিলেন সে সময়ে বটবৃক্ষ ও আম্রবৃক্ষ ইত্যাদি হইতে পুষ্প বর্ষণ হইয়াছিল। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এস্থানকে সিদ্ধ পীঠ বলিয়া বলিতেন। বিক্রমপুরের অনেকেই এ স্থানের মাহাত্ম্য ও অনেক অলৌকিক ব্যাপারের কথা জানেন।

অনেকে বলেন বারভূঁইয়ার স্বাধীন ভূঁইয়া চাঁদরায় কেদার রায়ের সময়ই এই স্থান সিদ্ধপীঠ বলিয়া পরিচিত হয়। এই জাগ্রতাদেবীর অর্চ্চনা করিতে করিতে দিব্যধাম লাভের কামনা সে কালের ধর্ম্মপরায়ণা প্রাচীনা রমণীগণের হৃদয়ে উদ্রেক হওয়া খুব স্বাভাবিক। কাজেই কেদাররায়ের জননী দেবীর অর্চ্চনায় সুবিধা হইবে বলিয়া বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়াই নিকটবর্ত্তী স্থানের নাম রাজাবাড়ী হইয়াছে। পূর্ব্বে এস্থানে নরবলি হইত এ বিষয়ে বহু প্রামাণিক বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। চাচর অর্থ কেশ, লোকে এস্থানে সন্তানের কল্যাণ কামনায়, বন্ধ্যা-নারীর গর্ভোৎপাদন কামনায় উপস্থিত হইয়া অর্চ্চনা করিত। মন্দিরের পাশে 'জিয়স পুকুর' বলিয়া একটী পুকুর ছিল, সেখানে স্নান করা ও কালীর নামে চুল দেওয়ার প্রথা দীর্ঘকাল হইতেই প্রচলিত ছিল।

চাচরতলার গলইয়ার মেলা বিক্রমপুরে প্রসিদ্ধ ছিল। প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ এখানে মেলা বসিত। নানা দেশের নানাস্থানের লোক আসিয়া এই মেলায় সমবেত হইত। দোকান পশারী বেশ দু' পয়সা উপার্জ্জন করিত। ছেলে মেয়েরা বাঁশী কিনিয়া, জিলিপি খাইয়া প্রচুর আনন্দ ভোগ করিত! বর্ষীয়সী রমণীরা, তরুণীরা শাখা সিন্দুর কিনিয়া উলুধ্বনি সহকারে মাতৃমূর্ত্তির পূজা করিত। গৃহস্থেরা এক বৎসরের ব্যবহারোপযোগী মসল্লা সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইত। ঢাক ঢোলের বাদ্যে উলুরবে জনকোলাহল মুখরিত তপোবন সে সময়ে নাগরিক সমৃদ্ধি লাভ করিত। বাল্যকালে আমরা এই শুভদিনটীর প্রতীক্ষা করিতাম, দল বাধিয়া অতি প্রত্যুষে এই মেলায় উপস্থিত হইতাম। সেদিন এখন কোথায়? তখন একটা বিস্তৃত চরাভূমির বহু দূর দিয়া পদ্মা কল কল নাদে এই পুণ্য পীঠের চরণ ধোয়াইয়া বহিয়া যাইত। ক্ষেতে ক্ষেতে সোনার ফসল ফলিত! এইস্থানে কোন নাটমন্দির বা যাত্রী নিবাস ছিল না—ছিল আম্র বট তিন্তিড়ির ঘন কুঞ্জ, সিন্দুরচিহ্নিত অবনত বটশাখা। কত পাখী মধুর স্বরে গান গাহিত। পূজারী দিবসে পূজা করিয়া বাড়ী

ফিরিতেন, সন্ধ্যার পর গভীর নিশীথে এখানে আসিতে কেহ সাহস পাইতেন না। একপাশে বটগাছের ছায়ায় সময় সময় এক একজন সাধু ধূনা জ্বালাইয়া বসিয়া থাকিতেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে একবার যখন পদ্মা এই দেবস্থানের সন্নিকটে আসিয়াছিলেন তখন জিয়স পুকুরের জলে ইলিস মাছ দেখা গিয়াছিল।

প্রাচীন মন্দিরটী জীর্ণ ছিল। তাহার ইষ্টকপঞ্জর দেখিয়া ইহা যে অতি প্রাচীনকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা অনুমিত হইত। পরে ইহা সংস্কৃত হইয়া নবকলেবর ধারণ করিয়াছিল। মায়ের কোন মূর্ত্তি ছিল না, কলসীর উপর নারিকেল, তাহাই মুখাকৃতি রূপে গঠিত হইয়া পূজিত হইত! অনেকে বলেন ব্রহ্মানন্দ গিরি, কেহ বলেন গোঁসাই ভট্টাচার্য্য এখানে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাহার কোনও প্রামাণিক বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তবে প্রধান পূজারী ঠাকুর বলিয়াছিলেন বেদীর নীচে পাদপীঠের নিম্নে ভূগর্ভে তাম্রফলকে বীজমন্ত্রে সিদ্ধ পুরুষের কাহিনী লিখিত আছে, যাহা দেখি নাই, সে কথা বলিতে পারি না।

গত বৎসর মাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। পদ্মা তখন মাত্র শত হস্ত দূরে। জিয়স পুকুরের কোণ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বক্রধনুর ন্যায় পদ্মা বহিয়া চলিয়াছে। শত শত নরনারী দলে দলে আসিতেছে যাইতেছে, দেবীর পূজা করিতেছে দেখিয়াছিলাম। আর আজ মাতৃমন্দির অন্তর্হিত। মা কেমন করিয়া থাকিবেন? অনাচারে অবিচারে ভক্তিহীন অনুষ্ঠানে মা কি থাকিতে পারেন? তাই জননী অভিমানে চলিয়া গিয়াছেন। যদি আমাদের তেমন ভক্তি থাকিত, যদি আমরা জননীকে তেমন করিয়া ডাকিতে পারিতাম, তাহা হইলে কি মা আমাদের ছাড়িয়া যাইতে পারিতেন? তাহা ত পারিতেন না। ভক্তের আহ্বান-বাণী জননী কবে উপেক্ষা করিয়াছেন? হতভাগ্য বিক্রমপুরবাসী দেশকে ভুলিয়াছে, দেশকে ভালবাসিতে ভুলিয়াছে, ভক্তি ভুলিয়াছে, দেশজননীকে ভুলিয়াছে, তবে আর কেমন করিয়া দেশজননীর রক্ষয়িত্রী দেবী থাকিবেন? কাহার জন্যই বা থাকিবেন?

আবার পদ্মাকে দেখিলাম। বর্ষার প্রবল উচ্ছ্বাসে আতটপ্লাবিনী বিপ্লবিনী মূর্ত্তিতে ঘন গরজনে হা! হা! হা! করিয়া ফেনিল অট্টহাস্যে বহিয়া যাইতেছে। মায়ের চিহ্ন নাই, মন্দিরের চিহ্ন নাই, সেই বট, তিন্তিড়ী সহকারকুঞ্জের সবুজ সুন্দর পত্রশোভা নাই, সেখানে ঘন আবর্ত্তে, প্রবল তরঙ্গে পদ্মার বিপুল জলোচ্ছ্বাস আর কল কল রব। আর দীনা বিক্রমপুর-জননীর শোকোচ্ছ্বাস বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া পদ্মার তরঙ্গ নর্ত্তনে শ্বাসিয়া শ্বাসিয়া বলিতেছে হা! হা! হা!



বিক্রমপুর

দশম অধ্যায়

মহারাজ রাজবল্লভ সেন

রাজনগরের কীর্ত্তির বর্ণনা *

বর্ত্তমানে পদ্মানদীর এক শাখা বিক্রমপুর পরগণাকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া "কীর্ত্তিনাশা" নামান্তর গ্রহণ করিয়াছে। কীর্ত্তিনাশার দুর্দ্দমনীয় স্রোতোবেগ, অত্যুত্তাল তরঙ্গমালা ও বিশাল আয়তন দর্শন করিতে হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হয় না, এমন লোক অতি বিরল। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই স্রোত প্রবাহের অবস্থান স্থলে "রাজনগর" নামে এক সমৃদ্ধ জনপদ বিদ্যমান ছিল। Hunter's Statistical Account of Dacca, Page No. 71. ধ্বংসাবশিষ্ট রামপালের কথা ছাড়িয়া দিলে সমগ্র বিক্রমপুর পরগণার অন্য কোন স্থানে এ পর্য্যন্ত রাজনগরের সমৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় নাই। সার্ভে নক্সা ভাওরাইয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে যে কীর্ত্তিনাশার বক্ষে এখন যে চর জাজিরা নামে খ্যাত, তাহার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশেই রাজনগর অবস্থিত ছিল। ক্ষুদ্র বৃহৎ এবং বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত অট্টালিকা বাহুল্যে একমাত্র রাজনগরই রাজনগরের তুলনাস্থল ছিল। স্বয়ং প্রকৃতি দেবী এই জনপদের সৌন্দর্য্য সাধনে সর্ব্বদাই মুক্তহস্ততা প্রদর্শন করিতেন।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে রাজনগরের অনেক উত্তরে পদ্মানদীর এক শাখা ক্ষুদ্র কলেবরে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত ছিল। লোকে সেই সময় হইতেই এই ক্ষুদ্র শাখানদীকে "রথখোলার" নদী নামে অভিহিত করিত।

অতি পূর্ব্বে "রথখোলার" নদীরও অস্তিত্ব ছিল না। ঐ স্থানের দক্ষিণভাগে বিলদাওনীয়া ও উত্তরভাগে হাতরাভোগ, নওপাড়া ও অন্যান্য গ্রাম অবস্থিত ছিল। নদীর অবস্থান স্থলে উভয় পার্শ্বস্থ গ্রামবাসীগণ রথোৎসব সম্পন্ন করিত। রথচক্রের নিয়মিত আবর্ত্তনে ঐ স্থান ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে হইতে নিম্ন হইয়া গিয়াছিল এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে সেই স্থান দিয়া ক্রমে বৃষ্টির জল নির্গত হওয়ায় উহা খালের আকার ধারণ করিয়া পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছিল। তদবধিই উহা "রথখোলার নদী" বলিয়া অভিহিত হইতেছিল।

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে মেজর রেনেল সাহেব বঙ্গদেশের যে মানচিত্র অঙ্কিত করেন, তাহাতে রথখোলা নদীর অস্তিত্বই পরিলক্ষিত হয় না। রেনেল সাহেবের সময় পদ্মানদী ঢাকা জিলার পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত হইত এবং বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত মেহন্দিগঞ্জ স্থানে সুপ্রসিদ্ধ মেঘনাদ নামক নদের সহিত সম্মিলিত ছিল। Hunter's Statistical Account of Dacca, Page No. 71.

* "রাজনগর" Page No. 4—Sj. Rashik Lal Gupta, B. L. Maharaja Raj Ballav Sen.



মহারাজা রাজবল্লভ

রাজনগরের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে এক পয়ঃপ্রণালী প্রবাহিত ছিল। ঐ খালের সাহায্যেই তথায় অতি সহজে পণ্যদ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী হইত। খালের পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম দিকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে "রাজসাগর" নামক এক সুবিস্তৃত জলাশয় আগন্তুকের নয়নপথে পতিত হইত। ঐ সরোবর ২২০ বিঘা ১৬ কাঠা জমি লইয়া বিস্তৃত ছিল। রাজসাগরের প্রত্যেক তটদেশের মধ্যস্থলে ইষ্টক নির্ম্মিত সোপানাবলী সংস্থাপিত ছিল। রাজসাগরের উত্তর তটে, "রাজসাগরের হাট" নামক সুপ্রসিদ্ধ বন্দর অবস্থিত ছিল। বন্দরের মধ্য দিয়া বহু সংখ্যক রাস্তা পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম ও উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে বন্দরের প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পশ্চিম তটে একটি কাছারী বাড়ী ও ইষ্টক নির্ম্মিত এবং বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত দুইটি সুবৃহৎ দেবালয় বিদ্যমান ছিল। এক দেবালয়ে "মহাপ্রভু" ও অপর দেবালয়ে "জগন্নাথদেব" প্রতিষ্ঠাপিত ছিলেন। উভয় দেবতারই প্রত্যহ ষোড়শোপচারে অর্চ্চনা করা হইত। প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে ঐ উভয় দেবমন্দিরেই শঙ্খ-ঘণ্টা প্রভৃতি সংযোগে আরতি ধ্বনি হইত। রাজসাগরের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ তটে বহু সংখ্যক ব্যবসায়ী বাস করিত।

রাজনগরের খালের উত্তর তট দিয়া পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম অভিমুখে এক বর্ত্ম বিদ্যমান ছিল। জনপদের পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে সেই পথ অবলম্বনে প্রায় এক মাইল পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইলে, উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত এক রাস্তার দক্ষিণ প্রান্তে সমুপস্থিত হওয়া যাইত। এই শেষোক্ত রাস্তার পরিসর ৬৫ হাতের ন্যূন ছিল না। উত্তর দক্ষিণ বাহী রাস্তা ধরিয়া উত্তর দিকে প্রায় অর্দ্ধ মাইল অতিক্রম করিলে "পুরাতন দীঘি" নামক সরোবরের পশ্চিম তটের সমীপবর্ত্তী হওয়া যাইত।

"রাজসাগর" অপেক্ষা এই সরোবরের আয়তন কিঞ্চিৎ ন্যূন ছিল। "পুরাতন দীঘির" পশ্চিম তটে "কালবৈশাখীর" মেলা সন্নিবিষ্ট হইত। প্রতি বর্ষের শেষ দিবস হইতে পরবর্ত্তী দুই মাস পর্য্যন্ত সেই মেলা অবস্থিত থাকিত। মুন্সীগঞ্জ কার্ত্তিক বারুণীর মেলার ন্যায় এই মেলারও খ্যাতি ছিল।

প্রতি বিষুবসংক্রান্তিতে "পুরাতন দীঘির" পশ্চিম তটে অতি সমারোহের সহিত চড়ক পূজার অনুষ্ঠান হইত। তৎকালে এক বিশাল চড়ক বৃক্ষ প্রোথিত করিয়া তাহার শীর্ষ দেশে এক নহবত খানা নির্ম্মাণ করা হইত। ষোড়শ সংখ্যক পুরুষ এক যোগে ঐ চড়ক বৃক্ষে ঘূর্ণিত হইত এবং বাদকগণ নহবত খানায় উপবেশন পূর্ব্বক নানাবিধ তান লয় মান সহকারে বাদ্যোদ্যম করিয়া ঘূর্ণ্যমান লোকদিগকে প্রোৎসাহিত করিত। স্বচক্ষে এই দৃশ্য অবলোকন করিয়াছেন এমন অনেক লোকের নিকট অবগত হওয়া গিয়াছে যে, চড়ক পূজার সময় শতাধিক পঠক একত্রে নিনাদিত হইয়া প্রলয়কালীন বাত্যা নির্ঘোষের ন্যায় গুরু গম্ভীর শব্দ উৎপাদন করিত।

পুরাতন দীঘি অতিক্রম করিয়া উত্তর দিকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই রায় মৃত্যুঞ্জয়ের তোরণ দ্বার সম্মুখে পতিত হইত। রায় মৃত্যুঞ্জয় মহারাজ রাজবল্লভের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র, ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যে রাজনগর মধ্যে তিনি রাজবল্লভের পরেই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। রায় মৃত্যুঞ্জয়ের নিকেতন বহু সংখ্যক অট্টালিকায় পরিশোভিত ছিল এবং সেই সমস্ত অট্টালিকায় যথেষ্ট স্থাপত্য-কৌশল দৃষ্ট হইত।

সরোবরের পশ্চিম তটের উত্তর প্রান্ত হইতে এক রাস্তা পশ্চিম দিকে প্রসারিত ছিল। ইহাই রাজ নগরের সুপ্রসিদ্ধ "পুরাতন দরজা।" "পুরাতন দরজার" উভয় পার্শ্বে কতিপয় ছোট ও

বড় জলাশয় এবং পশ্চিম দিকে রাজ বল্লভের পিতা কৃষ্ণজীবন মজুমদারের ভদ্রাসন অবস্থিত ছিল। এই ভদ্রাসনের হর্ম্ম্যমালা মধ্যে "নবরত্ন" নামক প্রাসাদই সমধিক উল্লেখযোগ্য। "নবরত্ন" একটি দ্বিতল অট্টালিকা। প্রথমতলের ছাদের প্রত্যেক কোণে এক একটি সমায়তন ছোট ছোট ঝিকটি ঘর-- দোচালা অথবা চৌচালা ঘরের ছাদের আকাশ বিশিষ্ট ইষ্টক অথবা প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহ বিশেষ। এবং প্রত্যেক দুইটি ছোট ঝিকটি ঘরের মধ্যে এক একটি বৃহদায়তন ঝিকটি ঘর ও ছাদের মধ্যস্থলে একটি সুবৃহৎ মঠ দণ্ডায়মান ছিল। মঠের উচ্চতা ভূতল হইতে একশত হস্তের অধিক ছিল।* আটটি ঝিকটি ঘর ও একটি মঠের সমবায় নিবন্ধন লোকে এই প্রাসাদকে "নবরত্ন" বলিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টক এবং প্রস্তর খণ্ড দ্বারা "নবরত্ন" নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং তাহার প্রাচীরে নানাবিধ লতা পাতা এবং ফুল ফল অতি সুকৌশলে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রসিকলাল গুপ্ত মহাশয় আরও বিশেষভাবে লিখিয়া গিয়াছেন যে রাজ-নগরের পুরাতন দীঘির পশ্চিম তটের মধ্য হইতে এক রাস্তা পশ্চিম দিকে বিস্তৃত ছিল। এই রাস্তার পরিসর ৬৫ হাতের ন্যূন ছিল না। মহারাজ রাজবল্লভের রাজপুরীর মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে এই রাস্তা ভিন্ন দ্বিতীয় রাস্তা ছিল না। রাজবাটীর পূর্ব্বদিকে "একবিংশতি রত্ন" নামক এক বিশাল তোরণ-দ্বার সংস্থাপিত ছিল। "একবিংশতি-রত্ন" একটি দ্বিতল অট্টালিকা ; নিম্নতর তলের ছাদের মধ্যভাগে উৰ্দ্ধতর তল গঠিত হইয়াছিল। প্রথম তলের মধ্যভাগে সিংহদ্বার ; তাহার পরিসর এত বিস্তৃত ছিল যে, তিনটী হাতী হাওদা সহ পাশাপাশি হইয়া অনায়াসে তন্মধ্য দিয়া গমনাগমন করিতে পারিত। দ্বারের উপরিভাগ অর্দ্ধ বৃত্তাকারে গঠিত ছিল। দুইটি বেদিকা দ্বারের সম্মুখভাগে সংস্থাপিত ছিল। শান্ত্রীগণ ঐ বেদিকায় দণ্ডায়মান থাকিয়া অষ্টপ্রহর দ্বারদেশ রক্ষা করিত। সিংহদ্বারের উভয় পার্শ্বে একাদশটি প্রকোষ্ঠ বিদ্যমান ছিল ; রাজকীয় সেনাগণ ঐ সমস্ত প্রকোষ্ঠে অবস্থান করিত। এক তলের ছাদের প্রত্যেক কোণে এক একটি সমায়তন ঝিকটি ঘর ও সম্মুখস্থ দুইটি ঝিকটি ঘরের মধ্যভাগে সিংহদ্বারের সমসূত্রে তিনটি ঝিকটি ঘর সংস্থাপিত ছিল। মধ্যস্থিত ঝিকটি ঘরটি অপর দুইটি ঝিকটি ঘর অপেক্ষা বৃহদায়তন ছিল। প্রত্যহ ঐ তিনটি ঝিকটি ঘরে নহবত বাজিত। দ্বিতলের ছাদের সম্মুখস্থ দুই কোণে এক একটি সমায়তন ঝিকটি ঘর ও মধ্যভাগে একাদশটি মঠ দণ্ডায়মান ছিল। এই একাদশটি মঠের মধ্যস্থ মঠটি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চভাবে এবং তাহার পার্শ্বের প্রত্যেক পরবর্ত্তী মঠ পূর্ব্ববর্ত্তী মঠ অপেক্ষা ক্রমশঃ নিম্নভাবে গঠন করা হইয়াছিল।

এই সমস্ত মঠের শিরোভাগ এরূপ ভাবে বিন্যস্ত ছিল যে, দূর হইতে অবলোকন করিলে উহাদের সমষ্টি একখানি সুবৃহৎ ধনুর ন্যায় দেখাইত। একাদশটি মঠ ও দশটি ঝিকটি ঘর ছিল বলিয়া এই অট্টালিকা "এক বিংশতি রত্ন" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

আমরা আবশ্যক বোধে শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের "বিক্রমপুরের ইতিহাসের" সপ্তম অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

এই স্বনামখ্যাত রাজার কল্যাণে বিক্রমপুর একদিন ধনৈশ্বর্য্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মহারাজা বল্লালসেনের রাজত্ব সময়ে বীরভূমের অন্তর্গত সেনভূম নামক স্থানে শ্রীহর্ষ নামক জনৈক মহাত্মা

* স্বর্গীয় রাজমোহন চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন একটী মঠের উচ্চতা ১২৫ হাত হইবে। সবচেয়ে ছোট মঠটি ১০০ হাত হইবে।

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি সে সময়ে বৈদ্য বংশ মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। সেনভূম পরগণা সম্পূর্ণ তাঁহার করায়ত্ত ছিল। তাঁহার কমল ও বিমল নামে দুইটি পুত্র জন্মে, বিমল সেনের পুত্র বিনায়ক সেন, তৎপুত্র ধন্বন্তরি সেন, ধন্বন্তরির পুত্র গাণ্ডেয়ী, গাণ্ডেয়ীর পুত্র হিঙ্গু, হিঙ্গুর পুত্র বলভদ্রসেন। *

বিনায়ক সেনের আরও বহু পুত্রসন্তান ছিল, তাঁহার মধ্যে তিনিই কেবল পৈতৃক কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন †। হিঙ্গুসেনের উচলী, ডমন, বিকর্ত্তন, বলভদ্র, হল ও কমল সেন এই ছয় পুত্র হয়, ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ কুলীন ও কেহ কেহ মৌলিক স্থির হন। বলভদ্রের পুত্র অনিরুদ্র, অনিরুদ্রের পুত্র অর্জ্জুন, অর্জ্জুনের পুত্র বাচস্পতি, বাচস্পতির পুত্র হৃষীকেশ বা যশশ্চন্দ্রসেন—যশশ্চন্দ্রসেনের পুত্র গোবিন্দসেন, গোবিন্দের পুত্র রামভদ্র ও বেদগর্ভ। বেদগর্ভ সেন যশোহর জেলার অন্তর্গত ইতনা গ্রামে বাস করিতেন, তিনি বিদ্যাভ্যাস করিবার নিমিত্ত পাণ্ডিত্যের লীলা নিকেতন বিক্রমপুরের অন্তর্গত বিল দাওনীয়া গ্রামে আগমন করেন। সে সময়ে প্রসিদ্ধ নওপাড়ার চৌধুরীবংশের দেওয়ান সত্যমন্ত দাস সে গ্রামে বাস করিতেন। বেদগর্ভ উঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া বিলদাওনীয়াতেই স্থায়ীরূপে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে স্বকীয় বিদ্যাবত্তা ও প্রতিভাবলে বহু অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক দায়নিয়, জপ্‌সা, ভোজেশ্বর প্রভৃতি গ্রাম ক্রয় করিয়া সম্পত্তি বৃদ্ধি করেন। বেদগর্ভের শ্রীকৃষ্ণ ও নীলকণ্ঠ নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে নীলকণ্ঠ সেন জপ্‌সা গ্রামে গিয়া বাস করিতে থাকেন, তাঁহার বংশে রামগতি রায়, লালা জয়নারায়ণ, আনন্দময়ী দেবী গঙ্গাদেবী প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা কবি জন্মগ্রহণ করিয়া বংশ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। জপ্‌সা গ্রামের রায় বংশীয়গণ নীলকণ্ঠেরই অধস্তন পুরুষ। শ্রীকৃষ্ণ সেন দাওনীয়াতেই বাস করিয়া থাকেন। তাঁহার শ্রীমুখ, নরসিংহ এবং মহেশচন্দ্র নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীমুখ সেনের বংশধরগণ রাজনগরের অন্তর্গত মান্দারিয়া নামক পল্লীতে এবং মহেশচন্দ্রের উত্তর পুরুষগণ পশ্চিমপাড়া নামক পল্লীতে বাস করিতেন। মধ্যম নরসিংহ সেন ঢাকা নগরীতে রাজস্ব বিভাগে কার্য্য করিয়া মজুমদার উপাধি লাভ করেন, তদবধি তাঁহার বংশধরগণ এই উপাধি ভূষণে ভূষিত হইয়া আসিতেছেন। রামচরণ, রামনারায়ণ এবং রামগোবিন্দ নামে নরসিংহের তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে রামচরণ নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। রামনারায়ণের বংশধরগণ রাউতপাড়া নামক পল্লীতে অবস্থান করিতেন। সর্ব্ব কনিষ্ঠ রামগোবিন্দের কৃষ্ণজীবন নামক এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন, তন্মধ্যে প্রাণবল্লভ ও রামবল্লভ শৈশবেই কালগ্রাসে নিপতিত হন। ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজবল্লভ জন্মগ্রহণ করেন। ‡

* হিঙ্গু রাঢ় দেশ পরিত্যাগ করিয়া খুলনার অন্তর্গত সেনহাটি গ্রামে আসিয়া বাস করেন, পূর্ব্বে ঐ স্থানের নাম ছিল ছুঁচহাটি, সেন মহাশয়ের আগমনের পর হইতেই উহা সেনহাটি নামে সাধারণের নিকট পরিচিত হইয়া উঠে।

† কবি কণ্ঠহার প্রণীত 'কুল পঞ্জিকা'।

‡ রাজবল্লভের জন্ম তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। ৺চন্দ্রকুমার রায় প্রণীত মহারাজা রাজবল্লভের জীবন-চরিত পাঠে জ্ঞাত হই যে 'রাজবল্লভ ১১০৫ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ ও ১১৭৩ বঙ্গাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।' প্রবীণ

মহারাজা রাজবল্লভের পিতা কৃষ্ণজীবন মজুমদার তদীয় জ্যেষ্ঠতাত রামচরণের অনুকম্পায় প্রথমতঃ নাওয়ার মহলের এহেতেমাস ও পরিশেষে খাসনবিসের পদে উন্নীত হইয়া পশ্চাৎ মজুমদারী পদলাভ করেন। কাহারও কাহারও মতে তিনি মালখানগর নিবাসী দেবীদাস বসুর এক মোহরের নিযুক্ত হন। সে যাহা হউক কৃষ্ণজীবন নবাব সরকারে কার্য্য গ্রহণ করিয়া স্বকীয় অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। রাজবল্লভের কীর্ত্তিরাশি নির্ম্মিত হইবার বহু পূর্ব্বেই তিনি 'নবরত্ন' নামক সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

রাজবল্লভ শৈশবেই পিতৃহীন হন। পিতার মৃত্যুর পরে তিনি অন্যান্য জ্ঞাতি ও ভ্রাতাগণের সহিত জপ্‌সা গ্রামে দেওয়ান কৃষ্ণরামের বাড়ীতে থাকিয়া রঘুনন্দনের নিকট লেখা পড়া শিক্ষা করেন। সেকালে বিলদাওনীয়া গ্রামে কোনও চতুষ্পাঠী বা মক্তব ছিল না, জপ্‌সা গ্রামই সে সময়ে সংস্কৃত ও পারসিক শিক্ষার নিমিত্ত বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। সেখানে মক্তব ও চতুষ্পাঠী উভয়ই থাকায় দেশ দেশান্তর হইতে ছাত্র আসিয়াও সেখানে অধ্যয়ন করিত। রাজবল্লভ শৈশব হইতেই অতিশয় প্রতিভাশালী ছিলেন, একদিকে যেমন তৎকাল প্রচলিত মল্লযুদ্ধ, অসি চালনা প্রভৃতি শারীরিক ব্যায়ামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন তদ্রূপ বিদ্যাবত্তায়ও সকলের মন আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। রূপে গুণে সর্ব্ববিষয়েই তাঁহার কৃতিত্ব ছিল।

রাজবল্লভ সর্ব্ব প্রথমে কানুনগো সেরেস্তার মুহুরীর পদে নিযুক্ত হন (১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে) পরে মোরাদ আলি নাওয়ার বিভাগের অধ্যক্ষ পদ লাভ করিয়া ঢাকা নগরে আগমন করেন। তখন তিনি জমানবিশের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মোরাদ ঢাকার নায়েব সুবেদার হইলে রাজবল্লভ তাঁহার অনুকম্পায় নাওয়ার বিভাগের পেস্কারের পদ লাভ করিলেন। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নবাব সুজার্খাঁর মৃত্যুর পরে সরফরাজ খাঁ বাঙ্গালার সিংহাসনারোহণ করেন। যখন লোকের অদৃষ্ট-লক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হয় তখন নানাদিক্ হইতেই সুযোগ সুবিধা ঘটে, রাজবল্লভেরও তাহাই হইল, তিনি নবাব সরফরাজ খাঁর কৃপাকটাক্ষে একেবারে নাওয়ার বিভাগের অধ্যক্ষপদ লাভ করিলেন।

সরফরাজ খাঁর মৃত্যুর পরে আলীবর্দ্দী খাঁ বাঙ্গালার নবাব হন এবং নিবাইস মহম্মদ ঢাকার নায়েব নবাব হইলেন, নিবাইস মুর্শিদাবাদে থাকিয়াই তাঁহার বিশ্বস্ত প্রতিনিধি হোসেনকুলী খাঁকে দিয়া কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন। তখন হোসেনকুলী খাঁর অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। গোকুলচাঁদ নামক হোসেনকুলীর একজন প্রিয়পাত্র তাহার পেস্কার ছিলেন, গোকুল কোনও কারণে স্বীয় প্রভুর উপর অসন্তুষ্ট হইয়া আলীবর্দ্দীর নিকট অভিযোগ করিলে হোসেনকুলী পদচ্যুত হন, কিন্তু আলীবর্দ্দীর জ্যেষ্ঠা তনয়া নিবাইস মহম্মদের পত্নী ঘাসেটী বেগমার সহায়তায় পুনরায় পূর্ব্বপদ লাভ করেন ও হিসাব নিকাশের দায়িত্বে ফেলিয়া গোকুলচাঁদের সর্ব্বনাশ সাধন করেন।

ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয়ও এমতাবলম্বী। তিনি লিখিয়াছেন, "আমরা ১১০৫ বঙ্গাব্দ বা ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দই রাজবল্লভের জন্মমাস ধরিয়া লওয়া সঙ্গত বিবেচনা করি।" শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায়ের সিদ্ধান্তই যথার্থ বোধে আমরাও রাজবল্লভের জন্ম সন ১১৯৯ খ্রীঃ. অঃ বলিয়া উল্লেখ করিলাম। 'ঐতিহাসিক চিত্র' ভাদ্র ও আশ্বিন শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় লিখিত 'মহারাজা রাজবল্লভ সেন' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

হোসেনকুলী রাজবল্লভের প্রতিভা ও কার্য্য-কুশলতা অবগত ছিলেন, এদিকে গোকুলচাঁদের স্থলে একজন উপযুক্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত না করিলেও হয় না, এজন্য রাজবল্লভকে তিনি সহকারীর পদে নিযুক্ত করিয়া মুর্শিদাবাদ হইতে রাজোপাধি আনয়ন করিয়া দিলেন।

এই ঘটনার কিছুকাল পরেই ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আলিবর্দ্দী খাঁর মৃত্যু হইলে পর তাঁহার দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা বাঙ্গালার নবাব হইলেন। ঘাসেটী বেগম তদীয় পোষ্যপুত্র এক্রামউদ্দৌলাকে মসনদে বসাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল। সিরাজউদ্দৌলার আদেশে ঘাসেটির প্রিয়পাত্র হোসেন কুলিখাঁর হত্যাকাণ্ড সাধিত হইল। হোসেন কুলিখাঁর মৃত্যুর পরে রাজা রাজবল্লভ নিবাইস মহম্মদের দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন। নিবাইস অধিকাংশ সময়ই মুর্শিদাবাদে থাকিতেন কাজেই রাজবল্লভ ঢাকায় এক প্রকার সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন—তাঁহার শক্তি অসাধারণ হইল; ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ বলেন যে এ সময়ে তিনি অত্যন্ত প্রজাপীড়ন ও ইংরেজ এবং ফরাসী বণিক্‌দিগের উপর জুলুম করিয়া ৪৩০০ টাকা আদায় করিয়াছিলেন। *

সে সময়ে ঢাকায় রাজবল্লভের প্রতিপত্তি এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে তৎপুত্র কৃষ্ণদাসকে লোকে 'নবাব' নামে অভিহিত করিতেও কুণ্ঠিত হইত না।

নিবাইসের মৃত্যুর পরে রাজবল্লভ ঘাসেটি বেগমের সর্ব্ব বিষয়ে পরামর্শদাতা হইয়াছিলেন। আলিবর্দ্দী যখন মৃত্যুমুখে উপনীত, তখন বেগমের পক্ষ হইতে প্রায় দশ সহস্র সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক তিনি মুর্শিদাবাদের এক ক্রোশ দক্ষিণে মতিঝিল নামক উদ্যান মধ্যে ছাউনী করিলেন। যুদ্ধ বিদ্যা পারদর্শী রাজবল্লভ জানিতেন যে জয় পরাজয় অনিশ্চিত, যদি পরাজিত হন তাহা হইলে তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি সিরাজউদ্দৌলার হস্তগত হইবে। এমতাবস্থায় ধন সম্পত্তি নিরাপদ করিবার নিমিত্ত তিনি তাঁহার মধ্যম পুত্র কৃষ্ণদাসকে সমস্ত সম্পত্তি সহ কলিকাতায় ড্রেক সাহেবের আশ্রয়ে থাকিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। কৃষ্ণদাস পিতার আদেশে জগন্নাথ যাইবার ছল করিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। সে সময়ে ইংরেজেরা সামান্য ব্যবসায়ী মাত্র ছিল, এমন কি দুর্গ নির্ম্মাণের ক্ষমতা পর্য্যন্ত তাহাদের ছিল না। বাঙ্গলার সুবেদারের গৃহ বিবাদ দর্শনে ইংরেজ এক পক্ষ অবলম্বনের সুযোগ দেখিতেছিলেন—ঠিক এমনি সময়ে রাজবল্লভের অনুরোধে কাশিমবাজারের কুঠির অধ্যক্ষ ওয়াটস সাহেবের লিখিত কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দিবার জন্য অনুরোধ সূচক পত্র পাইয়া ড্রেক † সাহেবের অনুপস্থিতিতেও কৌন্সিলের অপরাপর সাহেবেরা কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় প্রদান করিলেন। কৃষ্ণদাস ধন সম্পত্তি ও পরিজনবর্গ সহ ওমিচাঁদের ভবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। একথা শীঘ্রই সিরাজের কর্ণগোচর হইল, বৃদ্ধ আলিবর্দ্দী তখনও জীবিত, সিরাজ আলিবর্দ্দীর নিকট কৃষ্ণদাসের পলায়ন ও ইংরাজেরা ঘাসিটি বেগমের সহিত যোগ দিয়াছেন এই কথা বিবৃত করিলেন। কাশিমবাজারের কুঠির ডাক্তার ফোর্থ সাহেব তখন

* Selection from the Records of Govt. India.

† ড্রেক সাহেব তখন বায়ু সেবনার্থ বালেশ্বর গমন করিয়াছিলেন।

আলিবর্দ্দীর চিকিৎসা করিতেন, অলিবর্দ্দী ফোর্থকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করায় ফোর্থ সাহেব সমুদয় অস্বীকার করিলেন। সাহেব চলিয়া গেলে বৃদ্ধ নবাব সিরাজকে বলিলেন "বৎস, যদি তুমি ইংরেজ বণিক্‌দিগকে দমন করিতে না পার তাহা হইলে তোমার রাজ্য স্থায়ী হইবে না। সকলের আগেই ইংরেজ বণিক্‌কে দমন করা আবশ্যক।" এই ঘটনার কিছুদিন পরে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল তারিখে বর্ষীয়ান নবাব মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনারোহণ করিয়াই দৌত্য বিভাগের অধ্যক্ষ রামরাম সিংহের ভ্রাতাকে পত্র দিয়া কলিকাতায় ড্রেক্ সাহেবের নিকট অগৌণে কৃষ্ণদাসকে সমর্পণ করিবার আদেশ প্রদান করেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে তারিখে রামরামের ভ্রাতা কলিকাতায় পহুছিলেন কিন্তু সেখানকার ইংরেজগণ দূতের কথায় কোন কর্ণপাত না করিয়া তাহাকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। ইহাতে সিরাজের ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, তিনি ইংরাজ দিগকে দমন করিবার নিমিত্ত কলিকাতা অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ইংরেজ সৈন্য নবাব সৈন্যের নিকট পরাজিত হইল। যে দিন কলিকাতা জয় হইল তার পর দিবস প্রাতঃকালে সিরাজ দরবারে উপবিষ্ট হইয়া বন্দীদিগকে তাঁহার নিকট আনয়ন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন, সর্ব্ব প্রথমেই কৃষ্ণদাস আনীত হইলেন, প্রহরী বেষ্টিত হইয়া বিষণ্ন চিত্তে ইষ্টদেবের নাম স্মরণ করিতে করিতে তিনি উপস্থিত হইলেন। সকলেই ভাবিয়াছিল না জানি কি গুরুতর শাস্তিই ইহার উপর অর্পিত হয়। কিন্তু এ কি? নবাব কোন কঠোর বিধান করা দূরে থাকুক, বরং বিশেষ ভদ্রতার সহিত তাহাকে গ্রহণ করিয়া দরবারে বসিবার অনুমতি দিয়া সম্মানিত করিলেন এবং তাঁহাকে বহুমূল্য পরিচ্ছদ প্রদান করিয়া যথেষ্ট সৌজন্য দেখাইলেন; ওমিচাঁদও অত্যন্ত ভদ্রতার সহিত গৃহীত হইলেন।

সিরাজের দুর্ভাগ্য তাই অল্পদিনের মধ্যেই তদীয় প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণের ষড়যন্ত্রে রাজ্য হারাইলেন ও পাপিষ্ঠ মীরণের আদেশে মহম্মদীবেগ নামক জনৈক দুর্বৃত্তের তরবারির আঘাতে জীবন: হারাইলেন! হায়! সিরাজ! হায়! আলিবর্দ্দীর নয়ন পুতলী, হায়! বঙ্গ বিহার ও ওড়িষ্যার নবাব! কেহ কি কল্পনা করিতেও পারিয়াছিল তোমার এই পরিণাম হইবে?

সিরাজের মৃত্যুর পর অহিফেনসেবী মীরজাফর বঙ্গ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। সিরাজের শাসন সময়ে রাজবল্লভ কর্ম্মচ্যুত অবস্থায় ছিলেন। এক্ষণে মীরণ নিজামতের দেওয়ান হইয়া রাজবল্লভকে পূর্ব্বপদ প্রদান করিলেন, এই সময় হইতে তিনি পুনরায় নিজামতের প্রধান সচিবের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন ও রাজা কৃষ্ণদাসের উপর ঢাকার শাসন কার্য্য অর্পিত হইল। এই সময়ে সম্রাট সাহ আলম তাঁহাকে মহারাজা রাজবল্লভ রাঁয় রাঁইয়া সলারজঙ্গ বাহাদুর উপাধি সহ পুরস্কার প্রদান করেন ও মুঙ্গেরের সুবেদারের পদে নিযুক্ত করেন। কৃষ্ণদাস ঢাকার শাসন কার্য্যে ও রাজবল্লভ মুঙ্গেরের সুবেদারী পদে নিযুক্ত থাকিয়া সে সময়ে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেন। অতঃপর কৃষ্ণদাস মীরজাফর কর্ত্তৃক 'রাজা বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হন।

মীরজাফরের রাজত্ব সময়ে রাজবল্লভের বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ ঘটিয়াছিল। কিন্তু মীর কাসিমের শাসন সময়ে তাঁহাকে এক প্রকার বন্দীভাবে জীবন যাপন করিতে হইয়াছিল।

মীরকাসিম গিরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া উদয়নালায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে যাইবার পূর্ব্বে হঠাৎ দরবার গৃহে উপস্থিত হইয়া রাজা রাজবল্লভ ও তৎপুত্র কৃষ্ণদাসকে গলদেশে বালুকাপূর্ণ গোণী বদ্ধ করিয়া মুঙ্গেরের নিকট গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করিয়া প্রাণবধ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। যে সময়ে পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে ঘাতক রাজবল্লভকে তাড়না করিল সে সময়ে "হা রাম!" এই একটী মাত্র শব্দ করিয়া নদীগর্ভে পতিত হইলেন, কৃষ্ণদাসও পিতার অনুগমন করিলেন। হায়! এইরূপে বিক্রমপুরের গৌরব—দেশের অলঙ্কার—বুদ্ধি ও বিদ্যার অপূর্ব্ব প্রতিভা মহারাজা রাজবল্লভ ১৭৬৪ খ্রীঃ অব্দে নিষ্ঠুর নবাবের কঠোর অত্যাচারে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। কথিত আছে যে মুর্শিদাবাদে কিরীটেশ্বরীর আলয়ে রাজবল্লভ যে পাষাণময় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ঐ রাজবল্লভেশ্বর লিঙ্গ—যে সময়ে রাজবল্লভ মুঙ্গেরের দুর্গের উপরিভাগ হইতে ভাগীরথী গর্ভে নিপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন তখন ভয়ঙ্কর শব্দ হইয়া বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, অদ্যাপি সে ভগ্ন মন্দির ও ভগ্ন শিবলিঙ্গ বিদ্যমান আছে।

এইরূপে রাজবল্লভের মৃত্যু হইলে তাঁহার জমিদারী তদীয় পঞ্চপুত্রের মধ্যে সমান পাঁচ অংশে বিভক্ত হয়, তখন সর্ব্ব সুদ্ধ জমিদারীর আয় চৌদ্দ লক্ষ টাকা ছিল। রাজবল্লভের প্রথম পুত্র রামদাস ও চতুর্থ পুত্র রতন কৃষ্ণ পিতার জীবদ্দশায় মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় তাঁহাদের দত্তকগণ জমিদারীর অংশ না পাইয়া ভরণ পোষণার্থ প্রত্যেকে মাসিক ৫০০৲ টাকা প্রাপ্ত হইলেন।

রাজা বাহাদুর কৃষ্ণদাসের তিনপুত্র রাজকৃষ্ণ, হৃদয়কৃষ্ণ ও রমণকৃষ্ণ এক অংশ পান। প্রাণকৃষ্ণ নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার পত্নী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু সেই পুত্র জমিদারীর কোনও অংশ পান নাই। রাজবল্লভের মৃত্যুর পরে তাঁহার তৃতীয় পুত্র গঙ্গাদাস কিছু দিন রাজত্ব করেন, তাঁহার কাল কবলে নিপতিত হওয়ার পরে রাজার পঞ্চম পুত্র গোপালকৃষ্ণ জমিদারী গ্রহণ করেন। গোপালকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রতাপশালী ও বুদ্ধিমান জমিদার ছিলেন, তিনি সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক কার্ত্তিকপুরের ভূস্বামীগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া তাহাদিগকে পরাভূত করতঃ কার্ত্তিকপুর সুজাবাদ পরগণার পুনরুদ্ধার সাধন করেন। এই যুদ্ধে যে সকল সৈন্য নিহত হইয়াছিল তাহাদের ছিন্ন শির সমূহ রাজনগরে আনয়ন করিয়া ভূগর্ভে প্রোথিত করতঃ তদুপরি বিজয় চিহ্ন স্বরূপ রণদক্ষিণাকালী নামক এক দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন। এই অপরাধের নিমিত্ত তাঁহার প্রথম ইংরেজ রাজত্বে ২॥ ঘণ্টা মেয়াদ হইয়াছিল।

রাজা রাজবল্লভের স্মৃতি।

১৩১১ সনের 'নবনূর' পত্রে প্রকাশিত উমাচরণ কানুনগো প্রণীত মহারাজ রাজবল্লভ সেনের জীবন চরিত পাঠে জানিতে পারা যায় যে তিনি "যজ্ঞের দক্ষিণা ৩০০০০০৲ লক্ষ মুদ্রা এবং দেশীয় পণ্ডিতগণের প্রত্যেক জনে ২০৲ টাকা, আর বিদেশীয় পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণকে যথাযোগ্য হস্তী ঘোটক উষ্ট্র যান স্বর্ণ রৌপ্যাদি ভূষণাভরণ দান করিয়াছিলেন। সর্ব্ব সাকল্যে এই মহৎ ব্যাপারে কত ব্যয় হইয়াছিল তন্নিরাকরণ করা সুকঠিন।"

দেব দ্বিজের প্রতি তিনি নিয়ত ভক্তিমান ছিলেন। * বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শ্রীখণ্ড গ্রামে ভূতনাথ দেবের মন্দির, তাঁহার দত্ত বহুবৃত্তি, ব্রহ্মত্র দেবত্র ও লাখেরাজ ভূমি হইতেই ইহা স্পষ্টরূপে, হৃদয়ঙ্গম হয়। রাজবল্লভের জমিদারীর অধিকাংশই লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের নামে ছিল। তাঁহার সর্ব্বসমেত প্রায় নয় লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি ছিল। তিনি জ্ঞানী পণ্ডিতবর্গের বিশেষ সমাদর করিতেন, তাঁহার সভাসদ্‌বর্গের মধ্যে পণ্ডিত কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ, কৃষ্ণদাস সিদ্ধান্ত ও কবি রাজচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি ছিলেন। রাজবল্লভ কর্ম্মঠ, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ছিলেন ও পার্সী ভাষায় তাঁহার এতদূর দখল ছিল যে যখন তিনি পার্সীতে কথোপকথন করিতেন তখন অতি অভিজ্ঞ মৌলভীরাও অবাক্ হইয়া যাইতেন—এমন কি কেহ কেহ তাঁহাকে পশ্চিম প্রদেশবাসী মুসলমান মৌলভী বলিয়াই মনে করিতেন। রাজনগর তাঁহার এক অতুল্য কীর্ত্তি।

গোপালকৃষ্ণ কবীন্দ্র লিখিয়াছেন :—

"বিক্রমপুরে পরমানন্দ বংশস্থিত।
তন্মধ্যে কৃষ্ণজীবন শুভক্ষণে জাত॥
কৃষ্ণজীবনের চারি পুত্র, রাজারাম।
ধনিরাম, রাজবল্লভ আর রাম রাম॥
যে কালে মহম্মদ সাহ দিল্লীর পালক।
নবাব মহবৎজঙ্গ বঙ্গাদি শাসক॥
সাহবৎ জঙ্গ নামে তস্য ভ্রাতৃপুত্র।
পাদসাহী দেওয়ান মুর্শিদাবাদে স্থিত॥
তাহার দেওয়ান রাজবল্লভ সুকৃতী।
সর্ব্বকার্য্যাধ্যক্ষ তাঁর মহারাজ খ্যাতি॥
ষোলশত একষট্টি শকাব্দ অবধি।
সাতোত্তর পর্য্যন্ত তাহার রাজোন্নতি॥
বহুবিধ যজ্ঞ আর স্বজাতি পোষণ।
যথাসাধ্য করে নানা দান বিতরণ॥
* * * *
অগ্নিষ্টোম অত্যগ্নিষ্টোম যজ্ঞকারী।
মহারাজ রাজবল্লভ দাতা শুদ্ধাচারী॥"

তালতলার খালও মহারাজ রাজবল্লভের অন্যতম কীর্ত্তি। তিনি যখন ঢাকায় নায়েব সুবেদারের পদে নিযুক্ত ছিলেন তখন স্বীয় বাসগ্রাম রাজনগর হইতে ঢাকা এক দিবসের মধ্যে যাতায়াত করিবার নিমিত্ত এই খাল খনন করাইয়াছিলেন। এই বিখ্যাত পয়ঃপ্রণালী বিক্রমপুরের বক্ষ ভেদ করিয়া 'কীর্ত্তিনাশা' নদীর সহিত 'ধলেশ্বরী' নদীকে সংযুক্ত করিয়াছে। পূর্ব্বে রাজনগর হইতে ঢাকায় নৌকা পথে যাইতে হইলে 'কীর্ত্তিনাশা', মেঘনা ও ধলেশ্বরী ঘুরিয়া যাইতে হইত ইহাতে প্রায় তিন দিবস সময় লাগিত। কিন্তু এই খাল খনিত হওয়ার পর হইতে তাহা অর্দ্ধদিবসে পরিণত হইয়াছিল। † তালতলা বন্দরের বিপরীত দিকে একটী ইষ্টক নির্ম্মিত একতল

* বিক্রমপুরের কামার খাড়া গ্রামে অদ্যাপিও তাঁহার প্রদত্ত শিবমন্দির ও টোলের দালান বিদ্যমান থাকিয়া পণ্ডিতবর্গের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও ভক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। বিক্রমপুর দ্বিতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

† The Taltala Khal, said to have been dug by Raja Rajballabh to facilitate communication between Rajnagar and Dacca. This water course extends from Bahar on the Padma to Taltala on the Dhaleswari, but has now been allowed to silt up, so that it is only open during four months of the year for large boats. It effects a saving of about twenty or twenty five miles on the outer route between Barisal and Dacca, besides avoiding the somewhat perilous navigation of the large rivers.

Hunter's Statistical Account of Dacca District Page 23.



রাজনগরের একবিংশ রত্নমঠ

KING HALF-TONE PRESS, CALCUTTA

মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়, কথিত আছে যে রাজবল্লভ রাজনগর হইতে রাত্রির শেষাংশে রওয়ানা হইয়া এই স্থানে আসিলেই প্রভাত হইয়া যাইত এবং প্রাতঃ সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইত, এই ক্ষুদ্র গৃহটি সন্ধ্যাবন্দনাদি নির্ব্বাহের জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই ক্ষুদ্র দেবমন্দির মধ্যে, মহারাজার স্থাপিত একটী শিবলিঙ্গ ও "আনন্দময়ী" নামক এক পাষাণময়ী কালিকা মূর্ত্তি স্থাপিতা আছেন। এই উভয় দেবমূর্ত্তি রাজবল্লভ প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া তাঁহাদের সেবার নিমিত্ত যে তিনশত বিঘা ভূমি উৎসর্গ করিয়াছিলেন আজ পর্য্যন্তও সেই বৃত্তি হইতেই উক্ত দেবতাদ্বয়ের সেবাকার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে। তালতলার খালের বর্ত্তমান দৈর্ঘ্য প্রায় পনের মাইল হইবে।

রাজনগর বর্ণনা

মহারাজার অতুল কীর্ত্তি বিলুপ্ত রাজনগরের কাহিনী আমরা এখন বর্ণনা করিব। অত্যুত্তাল তরঙ্গ-মালা-সঙ্কুলা বিভীষিকাময়ী পদ্মার দক্ষিণতটে প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে রাজনগর নামে এক সমৃদ্ধিশালী গ্রাম বিদ্যমান ছিল। এই গ্রাম ইতিহাস প্রসিদ্ধ বৈদ্য কুলোদ্ভব মহারাজা রাজবল্লভ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পূর্ব্বে ইহার নাম ছিল বিল দাওনীয়া, তখন উহা বিল পরিপূর্ণ বিরল বসতির একটী ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র ছিল। বিক্রমপুরের গৌরব রামপাল নগরীর ধ্বংসাবসানে এবং দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক চাঁদরায় কেদাররায়ের বড় সাধের শ্রীপুর নগরী পদ্মার কুক্ষিগত হইলে পর, রাজনগরের ন্যায় সুন্দর ও সমৃদ্ধিশালী স্থান কেবল বিক্রমপুরে কেন সমগ্র বঙ্গদেশেও তৎকালে অতি বিরল ছিল।

রাজনগর সে সময়ে সত্যসত্যই রাজনগর ছিল। তখন উহা "নবরত্ন", "পঞ্চরত্ন", "সপ্তদশরত্ন" বা "শতরত্ন" ও "একবিংশ রত্ন" প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর সৌধাবলীর দ্বারা পরিশোভিত হইয়া সৌন্দর্য্যে ও স্থপতি-কৌশলের শ্রেষ্ঠতার জন্য বঙ্গদেশে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। যিনি এ সমুদয় অট্টালিকা একবার দর্শন করিয়াছেন, তিনি তাহাদের সৌন্দর্য্য-স্মৃতি হৃদয় হইতে কখনও মুছিয়া ফেলিতে পারিবেন না! কিন্তু হায়! সে সমুদয় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানা কারুকার্য্য খচিত অট্টালিকাসমূহ চিরদিনের জন্য রাক্ষসী পদ্মার উদরে অন্তর্হিত হইয়াছে, আর সে সমুদয় নয়নাভিরাম সৌধাবলী কাহারও দৃষ্টি পথে পতিত হইবে না।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিক্রমপুর কেন, সমগ্র বঙ্গভূমির মধ্যেই ইহার কীর্ত্তি-গরিমা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন এই স্থান ধনে, জনে, মানে, সম্ভ্রমে, বিদ্যায় ও শিক্ষায় দেশের আদর্শ স্বরূপ বিবেচিত হইত। যখন রাজনগর নির্ম্মিত হয় তখন কি কেহ কল্পনা করিতে পারিয়াছিল যে একদিন ইহার বক্ষোপরি পদ্মার চঞ্চল তরঙ্গ ভীষণ রোলে নৃত্য করিবে! শতাধিক বৎসরের মধ্যে বিক্রমপুরের ভৌগোলিক পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে যুগপৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পদ্মার এক অতি ক্ষুদ্র শাখা রাজনগরের বহু উত্তর দিক দিয়া ক্ষীণকলেবরে পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রবাহিত হইত। সে সময়ে জন সাধারণ ইহাকে "রথখোলার" নদী নামে অভিহিত করিত। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ জন প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, এই ক্ষুদ্র খালের অবস্থান স্থলে গ্রামবাসী জনসাধারণের রথোৎসব সম্পাদিত হইত; রথের চক্রের আবর্ত্তনে কালক্রমে উভয় পার্শ্বস্থ ভূমি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও ক্রমে নিম্ন হইয়া যায় এবং বৃষ্টির জল প্রবাহিত হইতে

হইতে খালের আকার ধারণ করিয়া রথখোলার খাল নামে অভিহিত হয়। এই উক্তি কেবল অযৌক্তিক বলিয়া প্রতীয়মান হয় না, কারণ ১৭৮১ সনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকার সময়ে, বোর্ড অব ডাইরেক্টরগণের অনুমত্যানুসারে তৎকালীন বঙ্গদেশের সার্ভেয়ার জেনারেল জেমস রেনেল, এফ্, আর, এস, সাহেব ঢাকার ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমুহের যে ম্যাপ অঙ্কিত করেন তাহাতেও এস্থানে কোনও নদীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না, সে সময়ে পদ্মা নদী ঢাকা জেলার দক্ষিণ পশ্চিম দিক্ দিয়া প্রবাহিত হইয়া বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত মেহেদিগঞ্জ নামক স্থানে মেঘনা বা মেঘনাদ নদীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। তখন রাজনগরের মধ্য দিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে একটী খাল থাকায় এস্থানে নানাবিধ দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানী হইত। এদিকে যেমন সুন্দর ২ অট্টালিকা ও "রাজসাগর", "পুরাতন দীঘি", "কালীসাগর", "কৃষ্ণসাগর", "মতিসাগর" ও "শিব পাড়ার দীঘি" প্রভৃতি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জলাশয়সমূহ এ স্থানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিত। অন্যদিকে আবার তেমনি "নারিকেলতা", "মান্দারিয়া", "চাক্লাদার পল্লী", "ভরদ্বাজ পল্লী", "রাইয়ত-পাড়া" প্রভৃতি জনপূর্ণ পল্লীসমূহ থাকায় রাজনগর গ্রাম সর্ব্বদাই আমোদ-কোলাহল-মুখরিত থাকিত। সেকালে সাধারণতঃ সকলেরই অবস্থা ভাল ছিল, খাওয়া পরার চিন্তা বড় কাহাকেও একটা করিতে হইত না, সকলের ঘরেই মরাই ভরা ধান থাকিত, কাজেই সকলে হয় লাঠি তরোয়াল খেলা নয়ত গান বাজনা প্রভৃতি নির্দ্দোষ আমোদে দিন কাটাইত। এই নিমিত্তই সেকালের রাজনগর গ্রামে বর্ত্তমানের ভয়ঙ্করী অন্ন চিন্তায় কাহাকেও ব্যতিবস্ত থাকিতে হইত না। এস্থানে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, কামার, কুমার, গোপ, মালাকার, কাংস্যবণিক্, গন্ধবণিক, তন্তুবায় প্রভৃতি বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের যত বিভিন্ন শ্রেণীস্থ লোকের বাস ছিল তদ্রূপ বর্ত্তমান সময়েও বিক্রম-পুরের কোনও বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে এত বিভিন্ন শ্রেণীস্থ লোকের বাস পরিলক্ষিত হয় না। সেকালের রাজনগরবাসিগণের কেবল যে আমোদ প্রমোদ ও ব্যায়ামের প্রতি লক্ষ্য ছিল তাহা নহে, শিক্ষার প্রতিও তাঁহাদের বিশেষ মনোযোগ ছিল। জন সাধারণের মধ্যে যাহাতে শিক্ষা প্রচারিত হয় সে বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। ছোট বড় সকলেই যাহাতে শিক্ষা লাভ করিয়া নিজ নিজ অবস্থার উন্নতি ও সঙ্গে ২ জ্ঞান লাভ করিতে পারে এ বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ মনোযোগ করিতেন। রাজনগরের প্রতি পল্লীতেই বাঙ্গালা শিক্ষার জন্য পাঠশালা, পারস্য ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য মক্তব ও সংস্কৃত শিক্ষার্থ চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত ছিল। অভিভাবকগণ নিজ নিজ রুচি অনুসারে স্বীয় স্বীয় সন্তানগণকে সুশিক্ষিত করিতেন। তবে পারসী ও সংস্কৃতের আদরই বেশী ছিল, বালকেরা সামান্য বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়া সকলেই মৌলভীর নিকট পারসী ভাষার শিক্ষা লাভার্থ দুই বেলা পুথি হস্তে অধ্যয়ন করিতে যাইত। অন্তঃপুরেও শিক্ষার দ্বার অবরুদ্ধ ছিল না। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে বিদুষী আনন্দময়ী ও গঙ্গাদেবীর সুমধুর কবিত্ব ঝঙ্কারে বর্ত্তমান বিদুষী মহিলাগণও গৌরবান্বিতা বোধ করিতেন না।

বিধাতার আশ্চর্য্য বিধান হৃদয়ঙ্গম করা মানব বুদ্ধির অগোচর। বিক্রমপুরবাসীর দুর্ভাগ্য তাই ১২৭৬ সনে কীর্ত্তিনাশার তরঙ্গ-প্রহারে রাজনগর চিরদিনের জন্য লোকলোচনের অদৃশ্য হইয়াছে। আমরা এস্থানে রাজনগরের দ্রষ্টব্য জলাশয়গুলি ও সুপ্রসিদ্ধ সৌধাবলীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম।

ভরসা করি পাঠকগণ ইহা হইতেই মহারাজা রাজবল্লভের বাসগ্রামের একটী ছায়া-চিত্র হৃদয়ে অনুভব করিতে পারিবেন।

রাজনগরের বক্ষভেদ করিয়া যে খালটি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত ছিল, সেই খাল ধরিয়া পূর্ব্ব দিকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই "রাজসাগর" নামক একটা হ্রদের ন্যায় প্রকাণ্ড সরোবর দৃষ্টিপথে পতিত হইত। এই জলাশয়ের জল অত্যন্ত নির্ম্মল ও সুপেয় ছিল। ইহার চারি তীরেই ইষ্টক নির্ম্মিত সোপানাবলী থাকায় জনপদ-বধূগণের জল লইবার পক্ষে বিশেষ সুবিধাও ছিল। এই সরোবরের উত্তর তীরে "রাজসাগরের হাট" নামক রাজনগরের সুবিখ্যাত বন্দর থাকায় এস্থান সর্ব্বদাই জন-কোলাহল-মুখরিত থাকিত। সে কালের সভ্যতা ও রুচি অনুযায়ী এই হাটে সমুদয় দ্রব্যই পাওয়া যাইত। বন্দরের ভিতরে বহু রাস্তা এবং নানাবিধ পণ্যদ্রব্যের দোকান ছিল। রাজসাগরের পশ্চিম তটে স্থপতি-কৌশলের নিদর্শন স্বরূপ নানা কারুকার্য্য খচিত দুইটী দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার একটীতে "মহাপ্রভু" নামক দেবতা ও অপরটীতে "জগন্নাথ দেব" প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। প্রতিদিন ষোড়শোপচারে এই বিগ্রহের অর্চ্চনা ও যথারীতি প্রাতে সন্ধ্যায় শঙ্খ ঘণ্টার গগনভেদী নিনাদে আরতি হইত। এই সরোবরের অন্যান্য তীরে নানা জাতীয় বণিকবৃন্দ পরমানন্দে বাস করিত। এই সরোবরের বৃহত্ত্ব সম্বন্ধে একথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যদি ইহার এক তীর হইতে বন্দুকের আওয়াজ করা যাইত, তবে অপর তীর হইতে তাহা শুনা যাইত না। মৃদু পবন স্পর্শেই ইহার বক্ষে তরঙ্গনিচয় উত্থিত হইয়া ক্রীড়া করিত।

আমরা পূর্ব্বে যে পথের উল্লেখ করিয়াছি, সেই পথ অনুসরণ করিয়া প্রায় এক মাইল পর্য্যন্ত পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইলে পুরাতন দীঘি নয়ন গোচর হইত। রাজসাগর অপেক্ষা ইহা আয়তনে ছোট ছিল। এই দীঘির পশ্চিম তটে চৈত্র সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত দুই মাস কাল স্থায়ী একটি মেলা বসিত। এই মেলা "কাল বৈশাখীর মেলা" বলিয়া বিখ্যাত ছিল। ঢাকা জেলাস্থ উত্তর বিক্রমপুরের "কার্ত্তিক বারুণীর মেলা" অপেক্ষা ইহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি কম ছিল না। প্রাচীন ব্যক্তিদের মুখে অবগত হওয়া যায় যে, এই স্থানে চড়ক পূজায় যেরূপ সমারোহ হইত পূর্ব্ব-বঙ্গের আর কোথাও সেরূপ হইত না। শতাধিক ঢাকের প্রচণ্ড নিনাদে হৃদয়ে এক আশ্চর্য্য ভাবের উদয় হইত। এক বিশাল চড়ক বৃক্ষে ষোড়শ সংখ্যক বলিষ্ঠ যুবক একত্র ঘূর্ণিত হইত, তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য চতুর্দ্দিকস্থ অগণন দর্শকবৃন্দের কল-কোলাহল ও ঢাকের ভীষণ শব্দে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিত।

পুরাতন দীঘি ছাড়াইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই সম্মুখে মহারাজ রাজবল্লভের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র মৃত্যুঞ্জয়ের বাটীর তোরণ দ্বার দৃষ্টি অবরোধ করিত। রাজবল্লভের মৃত্যুর পরে রায় মৃত্যুঞ্জয়ই রাজনগরের মধ্যে ধনে, মানে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মৃত্যুঞ্জয়ের আবাসবাটীও নানারূপ সুন্দর সুন্দর অট্টালিকাসমূহে পরিশোভিত ছিল। পুরাতন দীঘির পশ্চিম তীরের উত্তর দিক হইতে একটী রাস্তা বরাবর পশ্চিম দিকে গিয়াছিল। এই পথের পার্শ্বে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বহু সরোবর ছিল, সে সকলের বিস্তৃত বিবরণ অনাবশ্যক। এই পথটি রাজনগরের "পুরাতন দরজা" নামে অভিহিত ছিল। ইহার পশ্চিম

দিকে রাজা রাজবল্লভের পিতা কৃষ্ণজীবন মজুমদারের বাড়ী ছিল। এখানে বহু ছোট বড় অট্টালিকা বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তন্মধ্যে "নবরত্ন" নামক রমণীয় প্রাসাদটির কথাই বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

একটী চতুষ্কোণ একতল অট্টালিকার হলের চারিদিকে চারিটি ও প্রত্যেক কোণে এক একটী চতুষ্কোণ মঠ ও দুইটি মঠের প্রত্যেকটির মধ্যভাগে এক একটি "ঝিকটী ঘর" (যে ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহের দোচালা ঘরের ন্যায় চাল) সন্নিবিষ্ট। ছাতের মধ্যস্থলে যে মঠটি ছিল তাহার উচ্চতা চতুর্দ্দিকস্থ ঝিকটি ঘর হইতে অধিক ও মাটি হইতে প্রায় শতাধিক হস্ত উচ্চ ছিল। এই অট্টালিকা ইষ্টক ও প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং উহার প্রাচীরের গায়ে নানাপ্রকার লতা, পাতা ও ফুল ফল অঙ্কিত থাকায় ইহা বড়ই সুন্দর দেখাইত।

ইহাই রাজা রাজবল্লভের বাড়ীর সিংহদরজা বা তোরণ দ্বার ছিল। পুরাতন দীঘির পশ্চিম তটস্থ সুপ্রশস্ত রাজপথ ধরিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই এই সুবিশাল তোরণ দ্বার দৃষ্টি গোচর হইত। এই তোরণ দ্বার একটী ত্রিতল অট্টালিকা। প্রথম তলের নিম্নে সিংহদ্বার, ইহার ছাত অর্দ্ধবৃত্তাকারে নির্ম্মিত ছিল এবং ইহার নিম্নস্থ পথ এতদূর সুপ্রশস্ত ছিল, যে তাহার মধ্য দিয়া অনায়াসে তিনটী হস্তী হাওদা সহ পাশাপাশি ভাবে যাতায়াত করিতে পারিত। এই দ্বারের দুই দিকে দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেদী ছিল; উহাদের উপর দণ্ডায়মান হইয়া দিবারাত্রি দৌবারিকগণ প্রহরায় নিযুক্ত থাকিত।

এই তোরণ দ্বার পার্শ্বস্থ উভয়দিকের একতল অট্টালিকার মধ্যে অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ ছিল। সে সকল প্রকোষ্ঠে রাজকীয় সৈন্যগণ বাস করিত। এই একতল অট্টালিকার ছাতের প্রতিকোণে এক একটি মঠ ও সম্মুখস্থ দুই মঠের মধ্যাংশে ও সিংহ দরজার উপরে তিনটি "ঝিকটী" ঘর পরস্পর সংলগ্ন ছিল। প্রতিদিন প্রভাতে যখন পূর্ব্ব গগন লোহিত রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিত, যখন বিহঙ্গম কুল বৃক্ষশাখায় বসিয়া মনের আনন্দে সুমধুর স্বর লহরীতে চারিদিকে সুধা বর্ষণ করিত, তখন এ সকল ঝিকটি ঘর হইতে নহবতের সুমধুর প্রভাতী রাগিণী সানাইয়ের মোহিনী আলাপের সঙ্গে সঙ্গে রাজনগরবাসীর হৃদয়ে অপূর্ব্ব পুলক সঞ্চার করিয়া দিত। দ্বিতলের ছাতের প্রত্যেক কোণে এক একটী মঠ ও ত্রিতলের ছাতের মধ্যদেশে একাদশটি মঠ বিদ্যমান ছিল। ত্রিতলের ছাতের এই একাদশটি মঠের মধ্যস্থিত মঠটি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ এবং ইহার উভয় পার্শ্বের মঠগুলি ক্রমনিম্ন থাকায় দূর হইতে ইহাকে ধনুকের উপরার্দ্ধের ন্যায় দৃষ্ট হইত।

পশ্চিম দিকের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সেঘরা বা তিনটি প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট একটী দ্বিতল অট্টালিকা বিরাজিত ছিল। উৎসব উপলক্ষে বাদকগণ এস্থান হইতে বাদ্যধ্বনি করিত। সেঘরার উত্তর দিকে কারুকার্য্য খচিত একটী ঝিকটি ঘর ছিল। কথিত আছে যে মহারাজা রাজবল্লভ এক কোটি শিব লিঙ্গ পূজা করিয়া তাহার উপর ঐ ঘরটি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই প্রথম তোরণ দ্বার উত্তীর্ণ হইলেই দ্বিতীয় তোরণ দ্বার। ইহা পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল। দ্বিতীয় তোরণদ্বার পার হইলেই সম্মুখস্থ বিস্তৃত প্রাঙ্গণের দক্ষিণ ভাগে "রঙ্গমহাল" নামক সুসজ্জিত ও কলানৈপুণ্য পূর্ণ বৈঠকখানার দালান দর্শকের নয়নগোচর হইত। ইহার সম্মুখেই সুন্দর একটী মন্দিরে বাসুদেব নামক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই মন্দিরের উত্তর দিকে আর

একটী সিংহদ্বার স্থাপিত ছিল। সেই সিংহদ্বার পার হইলেই সুপ্রসিদ্ধ "সপ্তদশরত্ন" বা "শতরত্ন" নামক দোলমঞ্চ তৃতীয় প্রাঙ্গণের পুরোভাগে দৃষ্টিগোচর হইত।

একটী উচ্চ চারিতল অট্টালিকা এরূপভাবে নির্ম্মিত ছিল যে প্রত্যেক উর্দ্ধতল তাহার নিম্নতলের মধ্যভাগে অবস্থিত ছিল। এবং প্রতি তলের কোণে এক একটী সমআয়তন চতুষ্কোণ মঠ বিদ্যমান ছিল। সর্ব্বোচ্চ তলে অর্থাৎ চতুর্থ তলের ছাতের মধ্যদেশে মঠের আকারে একটী মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল, উহা চতুর্দ্দিকস্থ অন্যান্য মঠ অপেক্ষা উচ্চ ছিল। যখন বসন্তের শুভাগমনের সঙ্গে সঙ্গে সেকালের দোলের একটা উন্মাদ উচ্ছৃঙ্খলতা পাড়ায় পাড়ায় জাগিয়া উঠিত ও বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে দুইদল বাঁধিয়া গানের প্রতিযোগীতা চলিত, সে সত্য সত্যই একটা আনন্দের ব্যাপার ছিল। মৃদঙ্গের তালে তালে হোরীর সুমধুর সঙ্গীত লহরীর সহিত দোল-পূর্ণিমার সেই শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত নিশীথে ঐ সর্ব্বোচ্চ তলস্থ মন্দিরের মধ্যে রাজ বল্লভের স্থাপিত ৺লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র কুঙ্কুম-রাগে সুরঞ্জিত হইয়া স্বর্ণ-সিংহাসনে দোলায়মান হইতেন। প্রত্যেক তলের এবং প্রত্যেক মঠের নীচেই বাসোপযোগী এক একটী প্রকোষ্ঠ বিদ্যমান ছিল। প্রতি নিম্নতল হইতে তদূর্দ্ধতলে আরোহণ করিবার জন্য সুপ্রশস্ত সোপানাবলী নির্ম্মিত ছিল। এই হিন্দোল-মন্দিরের অভ্যন্তরে দণ্ডায়মান হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে নিসর্গের প্রাণারাম পবিত্র সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতে হইত। বিশাল মহীরুহরাজি ছোট ছোট গুল্মের ন্যায় এবং অদূরস্থ রথখোলার নদীকে একখানি শুভ্র বস্ত্রের ন্যায় দেখাইত। এই উচ্চ মন্দিরের সর্ব্বোচ্চ মঠ প্রায় ১৫০ দেড়শত হাত উচ্চ ছিল। শতরত্ন মঠের অঙ্গনের একভাগে একতল অট্টালিকায় বৈষয়িক কার্য্যাদি নিষ্পন্ন হইত, ও সেঘরার পার্শ্বস্থ একটী ঝিকটি ঘরে মাতা সর্ব্বমঙ্গলা শরতে পূজিতা হইতেন। পদ্মার অপরতীর হইতে লোকে শতরত্ন মঠের অভ্রভেদী চূড়া লক্ষ্য করিয়া পদ্মা নদীতে পাড়ি ধরিত।

এই প্রাঙ্গণেই "পঞ্চরত্ন" নামক সুন্দর শিল্প চাতুর্য্যময় দেবালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজনগরের মধ্যে শিল্পচাতুর্য্যে ও স্থপতিনৈপুণ্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল। পাঁচটি দ্বিতল মন্দির একত্র সংযুক্ত ভাবে নির্ম্মিত হওয়ায় ইহাকে পঞ্চরত্ন মন্দির কহিত। এই সকল মন্দিরের একটী মধ্যস্থলে এবং অবশিষ্ট চারিটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির উহার প্রত্যেকের কোণদেশের সহিত সংলগ্ন ভাবে গঠিত হইয়াছিল। এই পাঁচটী মন্দিরের প্রত্যেকটীর প্রাচীর গাত্রেই নানাবিধ দেবদেবী ও লতাপাতার চিত্র অতি সুন্দর ভাবে অঙ্কিত ছিল। এই মন্দিরের এক কক্ষে সুবিখ্যাত লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র, এক কক্ষে রাজরাজেশ্বরী, এক কক্ষে অন্যান্য দেবতাগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পঞ্চরত্ন মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ উত্তীর্ণ হইলে অন্তঃপুর খণ্ডে প্রবেশ করা যাইত। অন্তঃপুর খণ্ডের চারিধারে চারিটি সুবৃহৎ সৌধ পরস্পর সংলগ্ন ছিল। প্রত্যেকটি অট্টালিকার ভিতরেই বহু প্রকোষ্ঠ ও সম্মুখে বারান্দা ছিল। উত্তর ভাগের অট্টালিকাটি ত্রিতল ও অন্যান্য অট্টালিকাগুলি একতল ছিল। ত্রিতল অট্টালিকার একটী প্রকোষ্ঠ মহারাজার শয়ন কক্ষ ছিল। তিনি বাড়ী আসিয়া সে স্থানেই বাস করিতেন।

রাজবল্লভের বাড়ীর পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে তাঁহার গুরু কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশের বাসভবন ছিল। ইঁহার বাড়ীতেও তোরণ দ্বার এবং মনোহর

অট্টালিকাসমূহ বিরাজমান থাকিয়া সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিত।

আমরা পূর্ব্বে রাইয়ত পাড়া, নারিকেলতা পাড়া প্রভৃতি রাজনগরান্তর্গত যে সকল পল্লীর নাম করিয়াছি, সে সব স্থানেও বিস্তৃত সরোবর, মঠ ও বহু সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা বিদ্যমান ছিল। হাণ্টার সাহেব তৎ সঙ্কলিত ঢাকার Statistical Accountএর একস্থানে রাজা রাজবল্লভ ও তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ রাজনগরের বাড়ীর বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি উহাকে splendid residence বলিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।

১২৭৬ সনে ক্ষুদ্র রথখোলার নদী ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতে করিতে বিশাল পদ্মার সহিত মিলিত হইয়া চিরদিনের জন্য রাজনগরের অতুল গৌরব-প্রভা প্রকাশক প্রাসাদাবলী গ্রাস করিয়া ফেলিল। চিরদিনের জন্য যাহা পৃথিবীর বুক হইতে মিলাইয়া গিয়াছে—তাহার স্মৃতি আর কত দিন থাকিবে? মহারাজা রাজবল্লভের এ সকল কীর্ত্তিস্তম্ভ যিনি দর্শন করিয়াছেন তিনি জীবনে তাহা কখনও ভুলিতে পারিবেন না। রাজনগরের এই দারুণ দুর্গতির সময় শ্রীহট্ট নিবাসী জয়চন্দ্র ভট্ট নামক একজন ব্যক্তি রাজনগরের রাজকবি স্বরূপ বাস করিতেছিলেন; তিনি রাজনগরের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া মনের দুঃখে যে সুদীর্ঘ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন অদ্যাপি তাহা বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে ভাট কবিগণ স্বরসংযোগে গান করিয়া দর্শকের মনে একটা বিষাদের ভাব জাগাইয়া দেন।

(নমো) লক্ষ্মীনারায়ণ, চক্র সুদর্শন
শ্রীপতি শ্রীজনার্দ্দন।
গোলোক-বিহারী গোলোকেশ্বর হরি
বৈকুণ্ঠেতে নারায়ণ॥
ভক্তাধীন হরি ভক্তের বাঞ্ছাকারী
ভক্তকে করেন উদ্ধার।
অসংখ্য মহিমা, বেদে নাহি সীমা
জীবের বুঝা সাধ্য ভার॥

* * * * * *

ক্ষুদ্র তালুকদাররা বিত্তহারা হল হতজ্ঞান।
বলে জীবনে সাধ কি ভবে কিসে রবে মান।
কেহ বলে ভাই কি হইল রে এই ছিল কি লেখা।
বুঝি এই রাজ্যে আর কার সঙ্গে কার না হইবে দেখা॥
নদীর বেগ অতি রাজ্য প্রতি কি হল আক্রোশ।
যাচ্ছে মহারঙ্গে রাজ্য ভেঙ্গে মধ্যে দিয়ে ঢোস॥
লোকে কোথা যাবে কি করিবে হয়ে সশঙ্কিত।
(হায়রে) কিবা দশা কীর্ত্তিনাশা কল্লে আচম্বিত॥
এমন চমৎকার কীর্ত্তি আর হবেনা ভুবনে।
এমন সোনার নগর কীর্ত্তি সাগর পাব কোন স্থানে॥
কত দেশ বিদেশী লোক আসি দেখে বলে হায়।
নদী কি তরঙ্গে কীর্ত্তি ভেঙ্গে রাজ্য লয়ে যায়॥
কত দালান পাকা চকমিলান বাঁকা ভাঙ্গিল বহুতর।
প্রথম কুম্ভের বাড়ী ভেঙ্গে ধরিলেক সুখ সাগর॥
নিল সুখের সাগর সুখ সাগর মহাসাগর ধরে।
নদীর কি প্রতাপ অসম্ভব প্রাণটি কাঁপে ডরে॥
সাধের মতিসাগর মুহূর্ত্তেক পর ভাঙ্গিলরে ভাই।
দেখ কোথা গেল রাউতপাড়া আকশার চিহ্ন নাই॥
নিল রাণীসাগর কৃষ্ণসাগর গুরুধাম আর।
(হায়রে) খালে বিলে এক সমান কি করলে একাকার॥
(হায়রে) পুরাণদীঘী কালবৈশাখী হইত যার পার।
নিল সেই মেলা জুয়া খেলা লাল বাজার বাহার॥
যাচ্ছে ক্রমাগত ভেঙ্গে যত রাজবংশের কীর্ত্তি।
রায় মৃত্যুঞ্জয়ের কীর্ত্তি পরে করিল নিবৃত্তি॥
যখন শতরতন হইল পতন চমৎকার নগরে।
হল কাশীতে যে ভূমিকম্প পঞ্চক্রোশী পরে॥

ভট্ট জয়চন্দ্রে পদবন্দে করিল বর্ণন।
(পরে) পুরাণ হাবেলীর কথা বলি শুন সর্ব্বজন॥
(হায়রে) কীর্ত্তিনাশা কীর্ত্তি সব নিল।
বুঝি এতদিনে মহারাজার নামটি লোপ হল।
সোণার রাজনগর কি জলাকার হইল॥
ভেঙ্গে রায় মৃত্যুঞ্জয়ের হাওলী বাউলি দিয়ে অকস্মাৎ।
পুরাণ হাওলী যেয়ে ধরল একি বজ্রাঘাত॥
(হায়রে) বাবু সবকে করিয়ে অনাথ।
সাধের নবরতন পড়ল যখন নদীর মাঝারে॥
যেন নীরাকারে বটপত্র প্রায় ভাসে নীরে।
এমন দেখি নাই আর জগত সংসারে॥
বলেন বাবু সবে বিষাদ ভরে বিধির হল কোপ।
একে কালে মহারাজের নামটি করলে লোপ॥
(হায়রে) কীর্ত্তিনাশা হয়ে কাল স্বরূপ।
অমনি সোণার মঞ্চ দোল মঞ্চ হইল পতন॥
রাজা লক্ষ্মীনারাণ থাকতে হল এরূপ লাঞ্ছন।
বুঝি দেব ধর্ম্ম নাই কলিতে এখন॥
যদি থাকৃত সত্য মাহাত্ম্য ব্রাহ্মণ দেবতার।
তবে কি আর ছিন্ন ভিন্ন হয়রে এ সংসার॥
জানিলাম কলিতে হবে সব একাকার।
হায়রে কীর্ত্তিনাশা কি নিরাশা করলে একেবার॥
একটি চিহ্ন না রাখিল নাম রাখিতে আর।
হায়রে জহ্নু মুনি নাইরে এ সংসার॥
দেখি স্থলে কাঁদে স্থলচর জলে কাঁদে মীন।
আকাশের চন্দ্র সূর্য্য হইল মলিন॥
হায়রে একুশ রতন পড়িল যে দিন।
যত পাখী সব উড়ে উড়ে ঘুরিয়ে বেড়ায়।
আশা বাসা কীর্ত্তিনাশা ভেঙ্গে নিয়ে যায়॥
তারা বসিবার স্থান নাহি পায়।
কেহ যায়রে হাসের কাঁদি কেহ মিলগায়॥
কেহ কেহ পাতনা দিয়ে বসে দিন কাটায়।
বলে নদী নীরে একবার ফিরে যায়॥
ভট্ট জয়চন্দ্রের এই নিবেদন শুন সর্ব্বজন।
কাছার জিলায় ভূমিকম্পে এরূপ করয়॥
তাতে হয়েছে এক আশ্চর্য্য প্রলয়।
জানলেম বিধিকৃত কর্ম্ম যত খণ্ডন না যায়॥
যা হবার তা হয়ে গেছে আমার কি উপায়।
এরূপ মান্য আমি পাব আর কোথায়॥

স্বর্গীয় উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহারাজ রাজ বল্লভের জীবনী সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন:—

বিক্রমপুর বিলদাওনীয়ার প্রসিদ্ধ বৈদ্যবংশজ রাজা রাজবল্লভ ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কৃষ্ণজীবন মজুমদার, দেবীদাস বসুর অধীনে ঢাকার কাননগোর সেরেস্তার এক মোহরের পদে নিযুক্ত ছিলেন। রাজবল্লভের জ্যেষ্ঠ দুই সহোদর, রাজারাম ও ধনীরাম এবং কনিষ্ঠ রামদাস। সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ রাজারাম বিক্রমপুর পরগণার তহশীলদার ছিলেন এবং রাজবল্লভ কাননগো সেরেস্তার মুহুরী ছিলেন। ১৭৩৪ খৃষ্টাবে যশোবন্ত রায় ঢাকার নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত হইলে, রাজা বল্লভ তাঁহার (১) অনুগ্রহে কর্ম্মক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করেন। অতঃপর নবাব আলীবর্দ্দি খাঁর সময়ে তদীয় জামাতা নিবাইস মোহাম্মদ ঢাকার নবাব হন। নিবাইস মোহাম্মদ মুর্শিদাবাদে থাকিয়াই স্বীয় প্রতিনিধি হুসেনকুলী খাঁ দ্বারা

(১) ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মীরকাসেম স্বীয় পলায়মান সৈন্যের সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি মুঙ্গের হইতে পলায়নের সময় রাজবল্লভ ও তৎপুত্র কৃষ্ণদাসের গলায় বালুকাপূর্ণ থলিয়া (Bag) আবদ্ধ করিয়া মুঙ্গেরের নিকট ভাগীরথী নদীতে নিক্ষেপ করেন। এইরূপে ৬৫ বৎসর বয়সে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে (১১৭০ বঙ্গাব্দ) শ্রাবণ মাসে ভাগীরথী জলে মগ্ন হইয়া পুত্র কৃষ্ণদাসের সহিত রাজবল্লভ প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার বিক্রমপুরস্থ ভবন বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত ছিল। এই বিখ্যাত রাজভবন পদ্মাগর্ভে

লীন হওয়াতে পদ্মার এই অংশ কীর্ত্তিনাশা নামে খ্যাত হইয়াছে। রাজা রাজবল্লভ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের মত গ্রহণ করিয়া বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজে যজ্ঞসূত্র প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেন। এই ব্যাপার উপলক্ষে তাঁহার বাটীতে এক বৃহৎ পণ্ডিত সভার অধিবেশন হয়। সমাজের উন্নতি সাধনে যত্নপর হওয়াতে রাজবল্লভ বঙ্গীয় বৈদ্য সমাজে সমাজপতি বলিয়া গৃহীত হন। পৃথিবীতে প্রতিভা কোনদিনও অনাদৃত থাকে না। মহারাজ রাজবল্লভ অনেকদিন হয় চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু তাঁহার প্রতিভা ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে কেমন করিয়া মুছিয়া যাইবে!

ঢাকা জালালপুর *

আলিবর্দ্দি খাঁর সময়ে ঢাকা প্রদেশে এক সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ নোয়াজিস্ মহম্মদের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রদত্ত হয়। মীরজাফর খাঁর সময়ে রাজা রাজবল্লভের হস্ত মারফত এই আয়ের কিয়দংশ মাত্র নবাব সরকারে পৌঁছিত। এক্ষণে রাজবল্লভ পাটনার নবাবী প্রাপ্তির আশায় ঢাকা বিভাগের সমগ্র আয় দেখাইয়া দিলেন। ঢাকার সরকারী ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া যে লাভ থাকে, তাহার পরিমাণ ১২, ০১, ৩১৫ টাকা।

নওয়াজিস্ মহম্মদ খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার প্রণয়িনী ঘেসেটী বেগম আপনার যাবতীয় সম্পত্তি লইয়া মতিঝিলের প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই সময়ে আলিবর্দ্দি খাঁ মৃত্যুশয্যায় শায়িত হন। ঘেসেটী বেগম সিরাজের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি জানিতেন যে, আলিবর্দ্দির মৃত্যুর পর সিরাজ বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবেন। ঘেসেটী আত্মরক্ষার জন্য ও সিরাজের সিংহাসনারোহণে বাধা প্রদানের জন্য আপন স্বামীর সৈন্যদিগকে হস্তী ও লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিয়া তাঁহার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে অনুরোধ করেন। দশ সহস্র সৈন্য প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক একবাক্যে তাঁহার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে কৃতসংকল্প হয়।

হোসেনকুলী খাঁর মৃত্যুর পরে রাজা রাজবল্লভ ঢাকার সহকারী শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হন, আলিবর্দ্দির মৃত্যু সময়ে তিনি মুর্শিদাবাদে উপস্থিত ছিলেন। ঘেসেটী বেগম তাঁহাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন।

অর্ম্মে সাহেব লিখিয়াছেন যে, রাজা রাজবল্লভের সহিত ঘেসেটী বেগমের অবৈধ প্রণয় ছিল। বেগমের রক্ষার জন্য রাজা গোপনে কাশীমবাজারের ইংরেজ কুঠীর অধ্যক্ষ ওয়াট্স্ সাহেবের সহিত সিরাজের বিরুদ্ধে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তিনি স্বীয় পুত্র কৃষ্ণদাসকে সপরিবারে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। সিরাজ তাঁহার সহিত ইংরেজদের এইরূপ অসদ্ব্যবহারের কথা মৃত্যু শয্যায় আলিবর্দ্দিকে জানাইলে, নবাব কাশীম বাজারের সার্জ্জন ফোর্থ সাহেবকে একথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ফোর্থ সাহেব সেকথা অস্বীকার করিয়াছিলেন। সিরাজ কিন্তু ইহার প্রমাণের জন্য পুনর্ব্বার চেষ্টা করিতে থাকেন, ইতিমধ্যে আলিবর্দ্দি খাঁর জীবনের অবসান হয়। [Page No. 140]

নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর মৃত্যুর পরে সিরাজউদ্দৌল্লা বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আপনার জ্যেষ্ঠতাত পত্নী ও মাতৃ-স্বসা ঘেসেটী বেগমের মতিঝিলের প্রাসাদ আক্রমণ করিতে লোক প্রেরণ করেন। ঘেসেটী বরাবরই সিরাজের বিরুদ্ধে ছিলেন, এবং যাহাতে সিরাজ সিংহাসনে আরোহণ করিতে না পারেন, তজ্জন্য তাঁহার দেওয়ান রাজা রাজবল্লভের দ্বারা ইংরাজদিগের সহিত যুক্তি করিতেছিলেন। আলিবর্দ্দি সে কথা বুঝিতে পারিয়া ইংরাজদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট হন, এবং তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য মৃত্যুশয্যায় উপদেশ দিয়া যান। সিরাজ সিংহাসনে আরোহণ করার অব্যবহিত পরই ঘেসেটীর মতিঝিলের প্রাসাদ আক্রমণ করেন। আলিবর্দ্দির বেগম এই বিবাদ মিটাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। [Page no. 156]

আলিবর্দ্দি খাঁর সমর ক্ষেত্রে অবস্থান কালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা নওয়াজিস্ মহম্মদ খাঁর প্রতি মুর্শিদাবাদ রক্ষার ভার থাকিত। নওয়াজিস্ মহম্মদ খাঁ ঢাকার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে অধিকাংশ সময়েই মুর্শিদাবাদ বাস করিতে হইত। যাহার সহকারী হোসেনকুলী খাঁর প্রতি শাসনের ভার ছিল। হোসেনকুলী খাঁর মৃত্যুর পর রাজা রাজবল্লভ উক্ত পদে নিযুক্ত হন।

* নবাবী আমল "ফৌজদারী ও সায়রাৎ" Page No. 380 By K. P. Banerjee B. A.

ঢাকার কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। নিবাইস্ মোহাম্মদের পত্নী ঘেসেটীবেগমের অনুগ্রহে রাজবল্লভ ঢাকার নবাব সরকারে পেস্কারী পদে নিযুক্ত হন। হুসেনকুলী রাজবল্লভের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে আপন সহকারী পদে নিযুক্ত করেন। মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ রাজবল্লভের কার্য্যে প্রীত হইয়া হুসেনকুলীখাঁর অনুরোধ ক্রমে তাঁহাকে রাজোপাধিতে ভূষিত করেন। নিবাইস মোহাম্মদের পত্নী ঘেসেটী বেগমের ইচ্ছা ছিল যে, তাঁহার বৃদ্ধ পিতা আলীবর্দ্দিখাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার পোষ্যপুত্র মুর্শিদাবাদের নবাব পদে অভিষিক্ত হন; কিন্তু আলিবর্দ্দি খাঁ তাঁহার অপর কন্যার গর্ভজাত সন্তান সিরাজুদ্দৌলাকে স্বীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।

সিরাজুদ্দৌলা নবাব হইয়া মাতৃস্বসা ঘেসেটী বেগমের প্রিয়পাত্র হুসেনকুলীখাঁর প্রাণদণ্ড করেন। হুসেনকুলীর মৃত্যুর পর রাজা রাজবল্লভই নিবাইস মহম্মদের প্রতিনিধিরূপে ঢাকা শাসন করিতে লাগিলেন; তিনি ঢাকার সর্ব্বময় কর্ত্তা ও ঘেসেটী বেগমের প্রধান পরামর্শদাতা হইয়া উঠিলেন; কাজেই তাঁহাকে অধিকাংশ সময় ঢাকা ছাড়িয়া মুর্শিদাবাদে থাকিতে হইত। আলীবর্দ্দির মৃত্যুর পরে তিনি সিরাজুদ্দৌলার কোপে পতিত হন। ঘটনাচক্রের পরিবর্ত্তনে সিরাজ রাজ্য হারাইলেন ও শত্রুহস্তে নিহত হইলেন এবং অহিফেন সেবনকারী মীরজাফর মুর্শিদাবাদের মসনদে আসীন হইলেন। মীরজাফর রাজা রাজবল্লভকে কার্য্যদক্ষ জানিতেন। তিনি রাজবল্লভকে তাঁহার মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত করিয়া রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে ঢাকার শাসনকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে দিল্লীর সম্রাট শাহ আলম রাজা রাজবল্লভকে "মহারাজ রায় রাইয়ান্ সলারজঙ্গ বাহাদুর" উপাধি দিয়া ও পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে একখানা তরবারি অর্পণ পূর্ব্বক মুঙ্গেরের সুবাদারী পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু কিয়ৎকালপরে নূতন নবাব মীরকাসেম রাজবল্লভের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। মীরকাসিমের শেষাবস্থায় রাজবল্লভ ও তৎপুত্র কৃষ্ণদাস একপ্রকার বন্দীভাবে ছিলেন।

বাঙ্গালার ইতিহাস-প্রণেতা শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় অষ্টাদশ শতাব্দী নবাবী আমল গ্রন্থে (Page no 192) লিখিয়াছেন :—

১১৬৬ হিঃ সালে (১৭৫৩ খ্রীঃ) নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সর্ব্বপ্রকারে হিতাকাঙ্ক্ষী কর্ম্মচারী ও বিশ্বস্ত বন্ধু রাজা জানকীরাম ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে নবাব তাঁহার পুত্রচতুষ্টয়কে শোকের খেলাৎ দিয়া সমবেদনা জানাইলেন। রাজা দুর্ল্লভরাম পিতার নামে সৈন্য পরিসংখ্যার দেওয়ানী করিতেছিলেন; এক্ষণে এই কার্য্যে স্থায়ী ভাবে নিয়োজিত হইলেন। রাজা রামনারায়ণ পাটনায় নায়েব-নাজিমের কার্য্য পাইলেন। রায়রায়ান্ চিন্ময় রায়ের মৃত্যুর পর যথাক্রমে বীরুদত্ত, উমেদ রায় এবং আলম চাঁদের পুত্র রাজা কীর্ত্তিচাঁদ রাজস্ব বিভাগের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হন। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর হস্তে এইরূপে পূর্ব্বতন ধীমান্ মুসলমান-নরপতিগণের অবলম্বিত প্রথার যথেষ্ট সদ্ব্যবহার হওয়ায়, হিন্দু প্রীতি বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই কারণেই হিন্দু-মুসলমান সেনানীগণ দশ বর্ষ ধরিয়া একপ্রাণে দেশ রক্ষার জন্য নবাবের ধ্বজার নিম্নে অবিচলিত উৎসাহে দণ্ডায়মান ছিলেন। বলাবাহুল্য, সেকালের উচ্চপদস্থ হিন্দু-কর্ম্মচারী মাত্রেই মন্‌সব্‌দার (সেনানায়ক)ও ছিলেন।

(১১৬৯ হিঃ) ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে নবাবের ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় নোয়াজিস্ ও সইদ্ আহম্মদ উভয়েই কালগ্রাসে পতিত হন। নোয়াজিস্ মহম্মদ দুর্ব্বলচিত্ত হইলেও দাতা ও বিপন্নের বন্ধু ছিলেন। আপামর সাধারণের নিকটে তাঁহার মতিঝিল প্রাসাদের বিরাট তোরণদ্বার উন্মুক্ত ছিল।

ইহাদের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই, ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁও শোথ এবং উদরীরোগে শেষ শয্যাশায়ী হইলেন; তাঁহার এই শেষ পীড়ার অবস্থায় কিয়ৎকাল তাঁহার পরামর্শমত সিরাজুদ্দৌল্লা রাজকার্য্য আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

অতঃপর নোয়াজিস্ মহম্মদের পত্নী নবাবের জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘেসেটী বেগম আপন পালিত পুত্র সিরাজুদ্দৌল্লার কনিষ্ঠ সহোদর একরামউদ্দৌল্লার এক অপোগণ্ড শিশুর নামে সিংহাসন লাভের আশায় আত্মপক্ষ সবল করিতে প্রয়াসী হইলেন। হোসেনকুলী খাঁর শোচনীয় মৃত্যুর পূর্ব্ব হইতেই রাজা রাজবল্লভ সেন ঢাকায় সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াছিলেন। নোয়াজিস্ মহম্মদের মৃত্যুঘটনার সময় তিনি মুর্শিদাবাদে উপস্থিত ছিলেন। তিনি চিরদিনই একজন চক্রী বলিয়া বিখ্যাত; এক্ষণে ঢাকার তহবিলের হিসাব নিকাশের সময় তিনি বুঝিলেন, সিরাজুদ্দৌল্লার পক্ষ সমর্থন করিলে তাঁহার নিজের কোন লাভের আশা নাই; সিরাজুদ্দৌল্লার হস্তে সম্মান রক্ষা হইবে, এ ধারণাও তখন দরবারের প্রধান পক্ষের মধ্যে কাহারও মনে ছিল না। রাজা রাজবল্লভ সেন চিরকাল নোয়াজিসের অনুগত, ঘেসেটী বেগমও শুভানুধ্যায়ী বলিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন।

নিঃসন্তান নোয়াজিস্ মহম্মদ সিরাজের কনিষ্ঠ একরাম্‌উদ্দৌল্লাকে স্নেহে পালন করিয়াছিলেন; একরাম উদ্দৌলার শোকেই নোয়াজিসের প্রাণবায়ুর অবসান হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বেই নোয়াজিস্ মহম্মদ একরামের শিশুপুত্রকে নিজের উত্তরাধিকারী করিয়া যান; এক্ষণে বেগমের পক্ষ হইতে ঐ শিশুসন্তানকে মসনদে বসাইবার কল্পনায়, রাজা রাজবল্লভ বেগমের অনুগত সেনানী দলের সহিত মতিঝিলের প্রাসাদে মন্ত্রণা আঁটিতে লাগিলেন।

ঐতিহাসিক শ্রদ্ধেয় মিঃ অর্ম্ম সাহেব বাহাদুর বলিয়াছেন, নোয়াজিস্ মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নীর উপরও রাজা রাজবল্লভের আধিপত্য স্থায়ী থাকিল; বেগমের সহিত রাজা রাজবল্লভের অন্তরূপ সম্বন্ধও লোকে সন্দেহ করিত, যাহা একের উচ্চপদ ও অপরের ধর্ম্মের অনুযায়ী নহে। With whom he was supposed to be more intimate than became either her rank or his religion..... ....

"The Chief minister and favorite of his (Rajballav's) mistres, the young BEGUM"

(৪) বেহার—অঞ্চলে ইংরেজের সহিত নবীন বাদশাহের ঘণিষ্ঠতা লক্ষ্য করিয়া নবাব সচকিত হইলেন। [মুতাক্ষরীণ। ২—১৭০ পৃষ্ঠা]

মেজর কার্ণাক্ ভান্সিটার্টের বন্ধু নহেন, বাদশাহের হইয়া রামনারায়ণও রাজবল্লভকে হস্তগত করিয়া বিপত্তি ঘটাইতে পারেন—অনুধাবন করিয়া, মীর কাসেম্ শীঘ্রগতি পাটনা যাত্রা করিলেন। মেজর ইয়র্কের দলও তাঁহার সঙ্গে চলিল। ১লা মার্চ্চ (১৭৬১) পাটনার উপান্তে বৈকুণ্ঠপুরে নবাবের তাম্বু পড়িল। ইতি পূর্ব্বেই নবাবের আদেশে রাজা রাজবল্লভ বঙ্গীয়-সৈন্য সহ পাটনায় উপনীত হইয়াছিলেন। রাজা রামনারায়ণ ও রাজবল্লভ নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; রাজবল্লভ সেনাদলসহ নবাব শিবিরে মিলিত হইলেন। অতঃপর মেজর কার্ণাক্ও নবাব শিবিরে আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। কার্ণাক্ মীরকাসেমের সিংহাসন লাভের ফলভোগ করেন নাই; সুতরাং প্রথম সূচনায় বাদানুবাদে নবাবের সহিত তাঁহার প্রীতি বর্দ্ধিত হইল না। গয়াপ্রদেশ হইতে রাজবল্লভকে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দিবার সময়ে ইংরেজ সেনাপতির সম্মতি গৃহীত হয় নাই বলিয়া স্বতঃই তাঁহার ক্ষোভের কারণ হইয়াছিল। তিনিও নবাবের উক্ত আদেশের কথা শুনিয়া ইংরেজ-সেনানায়ক মিঃ চ্যাম্পিয়ণকে সদলে পাটনা আগমনের আদেশ প্রদান করেন। [Page no 364]

"বাঙ্গালার ইতিহাস" শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ, প্রণীত [অষ্টাদশ শতাব্দী—নবাবী আমল] [1308 B. S.]

Hunter's Statistical Account of Dacca.

"The History of the Dacca and neighbouring Districts, from this time to the acquisition of the Diwani by the Honourable East India Company, in 1765, presents little worthy of note. It may be mentioned, however, that the Tipperah territory, the subjection of which to the Mughul Government had hitherto been merely nominal, was annexed to 'the Province during the Government of Mirza Latifullah, who was appointed Naib in 1713.

The subsequent Naibs appear to have resided for the most part at Murshidabad, the government at Dacca being administered by deputies.

The natural consequences of this State of things followed. The prosperity or otherwise of the country depended chiefly on the personal character of the Naib Nazim or the deputies, some of whom seem to have governed well and wisely, while others made it their chief object to amass wealth at the expense of the provinces committed to their charge. Among these latter may be mentioned *Rajballabh*. peshkar of the Nawara and subsequently appointed Deputy-Governor, who is said, during his short term of office, to have amassed the enormous sum of two crores of rupees (£ 2, 000, 000).

He also acquired a great quantity of land, which afterwards constituted the valuable Zamindari of *Rajnagar*. Near a village of the same name, on the south side of the Padma or Kirtinasa, are still to be seen the ruins of the splendid residence erected by this *Raja Rajballabh*, whose descendants are still living, though greatly reduced in circumstances. A large portion of the money amassed by this man was conveyed out of the District *by his son Krishna Das*, who was supposed to have taken it into *Fort-William.*

It was in search of this treasure, it is said, that Siraj-ud-Daulah was induced to commence hostilities against the English, which ended in their obtaining possession of the country in 1757.

[Statistical Account of Dacca District, Page No 123].

Porgana Bazargomedpur.—Of the five, the most interesting is Bozargomedpur Fiscal Division, from its early history in connection with *Raja Rajballabh*, the Finance Minister, and afterwards Governor of Dacca, under the Nawab Nazim of Bengal ; from its numerous subordinate tenures ; and from the trouble which it gave to the Collector at the time of the Permanent Settlement, and for some few years after it. In the Settlement of 1721 A. D. by Nawab Jafar Khan, the rental of Pargana Bazargomedpur was entered at £465. In 1867 it was returned at £ 34. 059. Bazargomedpur, with the Fiscal Divisions of *Rajnagar* and *Kartikpur*, *Shujabad*, formed the

Zamindari of Raja Rajballabh, into whose possession the property came in 1761. A. D.

The assessment (Jamabandi) of the estate, formed after a careful measurement made the previous year, amounted to £20. 903. Previously to *Raja Rajballabh's* death, he subdivided his estate by creating Bazargomedpur and Rajnagar into a Zamindari in the name of the God *Lakshmi Narayan*, and *Shujabad* Fiscal Division into a separate estate in the name of the goddes *Durga*. Rajballabh's death opened the way to intrigues and frauds not unknown in the present day. One of his grandsons, Pitambar Sen, claimed a five-sixteenths share of the property ; and on the latter's death, his widow, *Sonamukhi* revived the claim on the ground of Raja Rajballabh's **Loyalty** to the East India Company,—a loyalty which cost him his life at the hands of the Nawab Kasim Ali Khan.

Bozargomedpur Comprised 594 taluks, or Shikmi tenures as they are locally called. The papers of Mr. G. P. Thompson, Head Assistant to the Collector of Dacca, show that the gross Government revenue (Sadr Jama), about 1760, was Bari(Rs. 2, 39, 653, from which Rs. 5798 were deducted for deserted lands, Mr. Massie, the Collector, in his letter dated 22d December 1801, states that "the deserted lands had been brought, either wholly or in part, in to cultivation since Mr. Thompson's time, and had been re-annexed to the rent-roll of the Jama, so that the net mufassal Jama is now what the gross Fical Division was before, via., Bari Rs. 2.39·653—15—0 from which deducting batta at the rate of 3 per cent; Viz, Rs. 7,118—1—5—1, the amount of the Mufussal Jama in the Sikka specie is Rs. 2,32.534—14—9—3". A Pargana which included a great many independent subordinate tenures naturally gave constant trouble to the Collector in the collection of the Government revenue. The early records are full of the steps taken at different times to realise Government arrears. In 1801 A.D., the Fiscal Division was bought in by Government for arrears of revenue ; and after having been held during many years under khas management, it was finally settled in 1857. Some time ago the right of Government to resume several shikmi taluks was duly confirmed by the Civil Court. The proprietary rights of Government in very many of the estates have been sold under the Board's rules.

[Statistical Account of Bakarganj District, Page nos. 222 & 223].

The Taltala Khal, said to have been dug by *Raja Rajballabh* to facilitate communication between Rajnagar and *Dacca*. This water course extends from *Bahar* on the Padma to Taltola on the Dhaleswari, but has now been allowed to silt up, so that it is only open during four months of the year for large boats.

It effects a saving of about twenty or twenty five miles on the outer route between Barisal and Dacca, besides avoiding the somewhat perilous navigation of the large rivers.

[Page no 23].

Rajnagor, area 300 acres, or ·47 square miles ; 10 estates ; land revenue £85—4s ; population, 100 ; whithin the Jurisdiction of the Court at Daulat khan.

[Page no 241].

Baidya ; this caste ranks next to the Brahmans. They are chiefly employed as physicians, ministerial officers, and landed proprietors, and may be considered as the upper middle class of the District. They are said to have sprung from the Sudra caste, but claim for themselves a higher descent. The investiture of the sacred cord was purchased for this caste about a hundred years ago by Raja Raj Ballabh of Rajnagar, Prime Minister, and afterward Governor of Dacca under the Muhammadan Government. The thread, however, differs from the true Brahmanical cord, in consisting of only two instead of three strings. The Census Report of 1872 gives the number of Baidyas in the District at 8420.

[Page no 47].

মহারাজ রাজবল্লভের দেওয়ান

প্রাণকৃষ্ণ বাড়ুরী ১০৯০ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ১১৮০ বঙ্গাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। আমরা আবশ্যক বোধে তাঁহার একটুকু পরিচয় দিতেছি। তৎকালে জমিদারীর কার্য্য ও আইন কানুন ভালরূপ বুঝিতে হইলে পার্শী ও আরবী ভাষা শিক্ষা করা অতীব প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় অগাধ জ্ঞানলাভ করিয়া তিনি এক মুসলমান মৌলবীর নিকট পার্শী ও আরবী ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে উক্ত দুই ভাষায়ই ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। ইংরেজ গবর্ণমেন্টের আইন আদালতের একটা প্রসার ও প্রতিপত্তি তখন ছিল না ; শাণ্ডিল্য গোত্রিয় কবি ভট্টনারায়ণ হইতে যে বংশের উৎপত্তি হয় সেই বংশে তাঁহার জন্ম হয় এবং তিনি বন্দ্যঘটী খড়দহ মেল বলিয়া স্থিরীকৃত হন, তৎসময়ের কতিপয় দলিল দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি পারশ্য ও সংস্কৃত ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন। তাঁহারা দুই সহোদর, প্রাণকৃষ্ণ ও হৃদয়কৃষ্ণ।

প্রাণকৃষ্ণ প্রথমে মহারাজ রাজবল্লভের পিতা কৃষ্ণজীবন মজুমদারের অনুগ্রহে দেবীদাস বসুর বাড়ী মোকামে এক মোহরের পদে নিযুক্ত হন। প্রাণকৃষ্ণ বাল্যকাল হইতেই অতিশয় প্রতিভাশালী ছিলেন, তৎকালীন প্রচলিত মল্লযুদ্ধ, অসি চালনা, লাঠি খেলা প্রভৃতি শারীরিক বিদ্যাবত্তায় অল্প সময় মধ্যে কৃষ্ণজীবনের বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র হইলেন। পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে রাজবল্লভ শৈশবেই পিতৃহীন হন, পিতার মৃত্যুর পরে তিনি বিলদাওনীয়ায় বসবাস করিতে ছিলেন। সেই সময় প্রাণকৃষ্ণ প্রভু পুত্র রাজবল্লভের একমাত্র অভিভাবকভাবে বিলদাওনীয়াতে থাকিয়া রঘুনন্দন পণ্ডিতের উপর রাজবল্লভের শিক্ষাভার ন্যস্ত করেন। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে যখন রাজবল্লভ মোরাদ-আলি-নাওয়ার বিভাগের অধ্যক্ষ-পদ লাভ করিয়া ঢাকা নগরে যাত্রা করেন, তখন প্রাণকৃষ্ণের উপর রাজসংসারের ভার অর্পিত হয়। রাজকার্য্যে জটিল পরামর্শ অনেকটা প্রাণকৃষ্ণের সহায়তা রাজা আবশ্যক

বোধ করিতেন। সুতরাং রাজনগরের সকলেই প্রাণকৃষ্ণকে "দেওয়ানজী" বলিয়া ডাকিতেন ও সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। রাজবল্লভের জমিদারীর অর্দ্ধাংশ গৃহ-দেবতা-লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের নামে ছিল। "প্রাণকৃষ্ণ দেওয়ানজীর" হিসাব দৃষ্টে দেখা যায়, রাজ সরকারের তদানিন্তন বার্ষিক আয় ন্যুনাধিক নয় লক্ষ টাকা ছিল।

দেওয়ানজীর পরামর্শ ক্রমে মহারাজ তাঁহার সভাসদ্‌বর্গের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য ১৫০০০৲ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। তাহার সভাসদ্ পণ্ডিত কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ, পণ্ডিত কৃষ্ণদাস সিদ্ধান্ত ও কবি রাজচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি ছিলেন। রঘুনন্দনদেবের নিকট শৈশবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন এই কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ মহারাজ তাঁহার পরিবারবর্গের জন্য মাসিক ১০০৲ টাকা আয়ের নিষ্কর সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন, এবং প্রাণকৃষ্ণের জন্য বেজগাঁ গ্রামে সুন্দর পরিখা-বেষ্টিত একখানা সুবৃহৎ বাড়ী ও একখানা তালুক প্রদান করেন। আমরা এখন প্রাণকৃষ্ণের বেজগাঁ বাড়ীর কিঞ্চিৎ আভাষ দিব। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্যে অনেক কষ্টে প্রায় দুইশত বৎসরের একখানা জীর্ণ পুস্তক সংগ্রহ করিয়া প্রাণকৃষ্ণ বাড়ুরীর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিতে সাহসী হইলাম। সেই অতিপুরাতন পুস্তকখানা সেকেলে বাঙ্গালা কাগজে লিখিত এবং স্থানে স্থানে কীটদষ্ট। পৃষ্ঠার মাঝে মাঝে অনেক শব্দই বুঝিতে পারা যায় না। তজ্জন্য ভাবগ্রহণ পূর্ব্বক বিলুপ্ত শব্দ রাশির পাঠ উদ্ধার সাধন করিতে বেজগাঁ নিবাসী স্বর্গীয় হরলাল চক্রবর্ত্তী মোক্তার মহাশয়ের অনেক আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে। বেজগাঁ গ্রামের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহোদয় বলেন— বেজগাঁ অর্থাৎ বৈদ্যগ্রাম। অতএব বলা যাইতে পারে অন্যূন ২০০ বৎসর পূর্ব্বে বেজগাঁর নামকরণ হইয়াছিল।

মহারাজ স্বজাতি-বৎসল ছিলেন তাই স্বজাতি প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক গ্রামের নাম বেজগাঁ রাখিয়াছিলেন। ইহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে এই গ্রামের নাম "সংগ্রাম বীর" ছিল। রাজপ্রদত্ত তালুকান্তর্গত গ্রামের প্রায় অর্দ্ধাংশ স্থান প্রাণকৃষ্ণ প্রাপ্ত হইলেন। প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আজও অনেকস্থানে বিদ্যমান। ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, পরিখা-বেষ্টিত সুবৃহৎ বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ বঙ্গদেশে অনেক বাড়ীই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তৎকালে প্রজাদ্বারা প্রাচীর ও সুবৃহৎ দীঘিদ্বারা একমাত্র প্রাণকৃষ্ণ দেওয়ানজীর বাড়ীই দেখা যাইত। প্রত্যেক দীঘিরই নামের অর্থ আছে। "দোকান ঘরের দীঘি," সে দীঘির উত্তর পারে প্রাণকৃষ্ণের বাজার ছিল, বাড়ীর পূর্ব্বদিকে যে দীঘি ছিল সে দীঘির নাম "পূবের দীঘি," বাড়ীর ভিতর স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহারের জন্য যে দীঘি ছিল তাহার নাম "ভিতরা" দীঘি, যখন মহারাজ রাজবল্লভ সেন খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন সে সময় যে দীঘি খনন করা হয় তাহার নাম "সেন-খাঁর" দীঘি, পূজা ও পার্ব্বণ উপলক্ষে আতপ তণ্ডুলাদি যে দীঘিতে ধোয়া হইত তাহার নাম "আলা-চাউলের" দীঘি, শীতলা পূজা উপলক্ষে যে দীঘিতে কুলা ভাসাইত সে দীঘির নাম "কুলা-ভাসানের" দীঘি। "নহবৎখানা" দীঘি। প্রাতেঃ, সন্ধ্যাবেলা বাদকগণ উহার পারে নহবতখানায় বসিয়া নানাবিধতান লয়মান সহকারে সময়োপযোগী বাদ্যোদ্যম করিত। এইরূপে সাতটি বৃহৎ দীঘি যুক্ত নানা শ্রেণীর হিন্দু প্রজা- দ্বারা বেষ্টিত বাড়ীতে তিনি বাস করিতেন।

ইহা ব্যতীত পাঁচটি পুকুর ছিল তাহা "পূণী" নামে খ্যাত; যথা বৌদিগের ব্যবহারের জন্য "বৌ-পূণী" ধোপার ব্যবহারের জন্য "ধোপা-পূণী" ইত্যাদি। তারপর বাড়ীর আঙ্গিনাখানা খণ্ডে বা অংশে অভিহিত ছিল; যথা রাসখণ্ড, দোলখণ্ড, নীলখণ্ড দেবার্চ্চনার জন্য নির্দ্দিষ্ট দেবোত্তর খণ্ড গুরু পুরোহিতের জন্য নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মোত্তর খণ্ড ইত্যাদি। কৃষ্ণদেব চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত হরিদাস সিদ্ধান্ত প্রভৃতি প্রাণকৃষ্ণের সভাসদ্ পণ্ডিত ছিলেন। বাড়ীতে লক্ষ্মী জনার্দ্দন বিগ্রহ ছিল, পূজার জন্য নরোত্তম ঠাকুর, দুখাই ঠাকুর প্রভৃতি পূজারী ছিল। প্রাণকৃষ্ণ যেমন মিষ্টভাষী, তেমনই সদাশয় মহাপুরুষ ছিলেন। ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল। তিনি প্রত্যেক পূজা পার্ব্বণ উপলক্ষে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করাইতেন। চিত্র এবং সঙ্গীত-বিদ্যায় প্রাণকৃষ্ণের প্রতিভা ছিল। ফলতঃ তাঁহার মত গুণবাণ পুরুষ নিতান্ত বিরলই ছিল। তিনি মহারাজ রাজবল্লভের প্রতিমূর্ত্তি নিজ হস্তে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তখনকার দিনে ফটোগ্রাফ ছিল না। কিন্তু চিত্র-বিদ্যার বিশেষ আদর ছিল। বহর হইতে বেজগাঁ পর্য্যন্ত খালও মহারাজের অন্যতম কীর্ত্তি। রাজবল্লভের মৃত্যুর পরেই প্রাণকৃষ্ণ শোকে দুঃখে একরূপ মুহ্যমান ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন। অবস্থার পরিবর্ত্তনে বাধ্য হইয়া অবশেষে প্রাণকৃষ্ণ, রাজবল্লভের বিধবা পত্নীর পেনসন্ জন্য রেভিনিউ বোর্ডে আবেদন করিয়াছিলেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্য ও যে পরিবর্ত্তনশীল তাহা বিধির বিধান।

১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে ৭০১৭নং রেভেনিউ বোর্ডের পত্রে দেখা যায় যে রাজবল্লভের বিধবা পত্নী,পতির কার্য্যের জন্যও স্বীয় বৈধব্যজনিত অসহায় অবস্থার উল্লেখ করিয়া মাসিক ভাতা চাহিয়া ছিলেন। মৃত্যুকালে প্রাণকৃষ্ণের বয়স ৮৩ বৎসর হইয়াছিল।

কিন্তু হায়! কালের কুটিল গতিতে রাজ নগরের সেই সমৃদ্ধি আজ দর্শকের নয়ন মন তৃপ্ত করিবার সাক্ষ্য দিতে অক্ষম কিন্তু প্রাণকৃষ্ণ দেওয়ান-জীর উক্ত কীর্ত্তি সমূহ আজও প্রায় দুইশত বর্ষের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মহারাজ রাজবল্লভের মৃত্যুর পর বিক্রমপুর শক্তিহীন পঙ্গু, বিক্রমপুরের ইতিহাসের উপাদান ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত, লুপ্ত; বিক্রমপুর দুর্ব্বল, ভীরু, কাপুরুষের বিচরণ ভূমি বলিয়া প্রবাসী বাঙ্গালীর নিকট উপহাস্যাস্পদ।

কবি সত্যই গাহিয়া ছিলেন:—

"দেখ একবার এই সে তোমার হৃতগরিমার চিতার শেষ—
বিক্রম যার বঙ্গে অপার কীর্ত্তি যাহার ছিল অশেষ!" *

স্বর্গীয় রাজমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "পাণ্ডুলিপি" হইতে "রাজবল্লভ কীর্ত্তি" সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় অবগত হওয়া যায়।

(১) মুর্শিদাবাদে কিরীটেশ্বরীর ও পাষাণময় শিবলিঙ্গ মহারাজ রাজবল্লভ সেন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

(২) কামারখাড়া গ্রামের অতি প্রাচীন টোলের দালান মহারাজ রাজবল্লভের অর্থব্যয়ে প্রস্তুত হইয়াছিল।

(৩) তিনি স্বজাতির উন্নতি কল্পে সংগ্রামবার গ্রামের কতক অংশে বৈদ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া গ্রামের নাম বেজগাঁ রাখেন—

বৈদ্যকুল পঞ্জিকায় লিখিত আছে যে:—

"দ্বিজের আজ্ঞায় বৈদ্য পুনঃ উপনীত,
পুনরায় দ্বিজ ভাব যথা পূর্ব্বরীত।"

* "বিক্রমপুরসম্মিলনী" ২০ | ২ | ১৬

(৪) তালতলার খাল বিক্রমপুরবাসীর পক্ষে ও ব্যবসায়ীর পক্ষে বিশেষ সুবিধা জনক কিন্তু ইহাও মহারাজ রাজবল্লভের অর্থব্যয়ে খনিত হইয়াছিল। (See Hunter's Report)

(৫) মহারাজ রাজবল্লভ কর্ত্তৃক ফেগুনাসার গ্রামে শিবলিঙ্গ মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

(৬) তালতলার ইষ্টক নির্ম্মিত পুল ও মহারাজ রাজবল্লভ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

(৭) রায়পুরা গ্রামে আনন্দময়ী নামক এক পাষাণময়ী কালিকা মূর্ত্তির মন্দির স্থাপন করিয়া ছিলেন (মহারাজ রাজবল্লভ কর্ত্তৃক ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে)।

(৮) স্বর্ণগ্রাম—কামারখাড়া গ্রামে একটী শিবলিঙ্গ মহারাজ রাজবল্লভ কর্ত্তৃক জীর্ণ-সংস্কার করতঃ প্রতিষ্ঠিত।

(৯) মহারাজ রাজবল্লভ কুরাগী গ্রামে তিনটী দীঘি, শিবলিঙ্গ ও মঠ প্রতিষ্ঠা করেন।

(১০) মহারাজ রাজবল্লভ ফেগুনাসার ও রায়পুরা গ্রামের মন্দিরের প্রত্যহ পূজার জন্য তিনশত বিঘা জমি দেবোত্তর দিয়াছিলেন।

(১১) বর্দ্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড গ্রামে শিবলিঙ্গ (ভূতনাথ দেব) মন্দির, ব্রহ্মোত্তর ১২০০ বিঘা ও দেবোত্তর ১০০০ বিঘা জমি মহারাজ রাজবল্লভ দান করিয়াছিলেন।

(১২) বেজগাঁ গ্রামে "বুড়াশিব" মহারাজ রাজবল্লভ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

(১৩) মহারাজ রাজবল্লভ গাওদীয়া গ্রামেও অনেক ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর জমি দান করিয়াছিলেন।

(১৪) মহারাজ রাজবল্লভ সেনের দেওয়ান প্রাণকৃষ্ণ বাড়রীকে বেজগাঁ গ্রামের অর্দ্ধাংশ দান করা হইয়াছিল। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে প্রাণকৃষ্ণ দেওয়ানজীর বেজগাঁ গ্রামের আয়ও তৎসংলগ্ন জমির আয় ছিল ২০৩০৭৲ টাকা। (১) "দোকানঘরের দীঘি," (২) "আলাচাউলের দীঘি," (৩) "পূবেরদীঘি," (৪) "ভিত্রাদীঘি," (৫) "সেনখাঁর দীঘি," (৬) "কুলা ভাসাণের দীঘি" ও (৭) "নহবৎপানার দীঘি" এই সাতটী দীঘি ও পরিখা বেষ্টিত একখানা বৃহৎ বাড়ী মহারাজ রাজবল্লভ তাহাকে দান করিয়াছিলেন।

(১৫) বিক্রমপুরের ঘোড়দৌড়ের রাস্তাটীর জীর্ণ সংস্কার মহারাজ কর্ত্তৃক সংসাধিত হইয়াছিল।

প্রবাদ আছে মহারাজ রাজবল্লভ একবিংশটী শিবলিঙ্গ মফঃস্বলে স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং একাদশটী কালিকা মূর্ত্তি ও মন্দির তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

প্রগ্রাম খণ্ড সমাপ্ত

Sj. Rajmohan Chatterjee's notes [1890. A. D.]

পরিশিষ্ট

লক্ষ্মণসেনের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন।

প্রাপ্তিবৃত্তান্ত

মুর্শিদাবাদ জেলার বর্ত্তমানে সদর (পূর্ব্বে কান্দী) মহকুমার অন্তর্গত শক্তিপুর গ্রামে লক্ষ্মণসেনের একখানি নূতন তাম্রশাসন সম্প্রতি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ছাত্র-সভ্য শ্রীযুক্ত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের যত্নে আবিষ্কৃত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত শক্তিপুর নামক গ্রামে স্বর্গীয় শিবচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে এই তাম্রশাসন ছিল।

বিষয় ও ব্যক্তি

এই শাসনখানি একাধারে দান ও বিনিময়ের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হইয়াছিল। এইরূপ দুই কার্য্যের জন্য একখানিও মাত্র শাসন বোধ হয় বঙ্গদেশে ইতিপূর্ব্বে পাওয়া যায় নাই। মহারাজাধিরাজ শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন তাঁহার রাজত্বের ৩য় বৎসরে ২রা শ্রাবণ তারিখে সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে অনিরুদ্ধ দেব শর্ম্মার প্রপৌত্র, পৃথ্বিধর দেব শর্ম্মার পৌত্র, অনন্ত দেব শর্ম্মার পুত্র শাণ্ডিল্য-সগোত্র শাণ্ডিল্যাসিতদেবল-প্রবর ও সামবেদীয় কৌথুমশাখাচরণানুষ্ঠায়ী কুবের দেবশর্ম্মাকে বৎসরে ৫০০ উৎপত্তিযোগ্য ৯৮ ভূদ্রোণ পরিমিত ৬ পাটক ভূমি দান করিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত সেন রাজাদের যতগুলি শাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে সাক্ষাৎ ভাবে কোন ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করা হইয়াছে। কিন্তু এই শাসনে আমরা এই বিশেষত্ব দেখিতে পাই যে, পূর্ব্বে শ্রীমদ্বল্লালসেন দেবের নিকট হইতে হরিদাস নামক গয়াল ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রতিগৃহীত বৎসরে ৫০০ উৎপত্তিযোগ্য ছত্রপাটক নামক শাসনের বিনিময়ে এই তাম্রশাসনে উল্লিখিত ভূমি দান করা হইয়াছিল। বঙ্গদেশীয় আর কোনও শাসনে গয়াল ব্রাহ্মণের উল্লেখ দেখা যায় না।

দেশ ও স্থান

এই শাসনে প্রাচীন ও বিস্তৃত সেনরাজ্যের কোন্ অংশের বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমানে বুঝিবার উপায় নাই, কারণ এযাবৎ প্রকাশিত অন্য কোন লিপিতে এই শাসনে লিখিত স্থানের নামগুলি পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রাচীন বঙ্গের স্থানীয় ভূগোল আলোচনায় এই শাসনখানি নূতন আলোকপাত করিবে। ইহার শ্রীমধুগিরি মণ্ডল এবং কুম্ভীনগর ও কঙ্কগ্রাম ভুক্তি প্রভৃতি কোথায় ছিল তাহা

বর্ত্তমানে জানিবার কোন উপায় নাই। * ঐ অঞ্চলে কুমারপুর চতুরকে যে দুই খণ্ড ভূমি দেওয়া হইয়াছিল তাহার যে সীমা, পরিমাণ এবং বাৎসরিক উৎপত্তি পাওয়া যাইতেছে তাহা নিম্নে দেখানো হইল।

তাম্রশাসনের পাঠ

(সম্মুখ)

১। (ৰ্ণ)[১] ওঁ নমো নারায়ণায়॥ বিদ্যুদ্যত্রমণিদ্যুতিঃ ফণিপতের্ব্বালেন্দুরিন্দ্রায়ুধং বারিস্বগ্‌র্গতরঙ্গিনী[২] সি-

২। ত শিরোমালা বলাকাবলিঃ (।) ধ্যানা ভ্যাস [স] মীরণোপনিহিত শ্রেয়োঙ্কুরোদ্ভূতয়ে ভূয়াদ্বঃ স ভবার্ত্তিতাপভিদু-

৩। রঃ শম্ভোঃ কপর্দ্দাম্বুদঃ॥ [১] [৩] আনন্দোম্বুনিধৌ চকোরনিকরে দুষ্খ[৪] চ্ছিদাত্যন্তকী কহ্লারে হতমো-

৪। হতা রতিপতাবেকোহমেবেতি ধীঃ (।) যস্যামী অমৃতাত্মনঃ সমুদয়ন্ত্যাশু প্রকাশাজ্জগত্য-

৫। ত্রিধ্যান-পরম্পরাপরিণতং জ্যোতিস্তদাস্তাম্মুদে॥ [২] [৫] সেবাবনম্রনৃপকোটী-কিরীট-রোচির-

৬। স্মু (স্মু)ল্লসৎপদনখদ্যুতি-বল্লরীভিঃ (।) তেজোবিষজ্বরমুষো দ্বিষতামভূবন্ ভূমীভুজঃ স্ফুটমথৌষ-

৭। ধিনাথবংশে॥ [৩] [৬] আকৌমার-বিকস্বরৈ[৭]র্দ্দিশি দিশি প্রস্যন্দিভির্দ্দোর্যশঃ-প্রালেয়ৈররিরাজ[৮]-বক্ত্র নলি-

* এই শাসনের প্রাপ্তিস্থান শক্তিপুরের পশ্চিমোত্তরে কান্দীর তিন ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পাঁচথুপী (পঞ্চস্তূপী ?)। এই গ্রামের উত্তরাংশে বারকোণার দেউল রহিয়াছে। এই বারকোণাই কি প্রাচীন 'বারহকোণা' ? এই অঞ্চলে কুমারপুরও আছে। এই শাসনে 'বাল্লিহিতা' নামে স্থানের উল্লেখ আছে। ইহার সহিত বল্লালসেনের নৈহাটী শাসনের (৪৪) 'বাল্লহিট্‌ঠা' গ্রামের কোন সম্পর্ক আছে কি না, বলিবার কোন সূত্র নাই। টা মরবড়া নামের 'বড়া' অংশটুকু অন্য স্থানেও পাওয়া যায়, যথা—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালাভুক্ত বিশ্বরূপসেনের শাসনে (৪৩) 'বাঙ্গাল বড়া'।

১। এই চিহ্নটিকে পণ্ডিতেরা ওঁ বলিয়া ধরিয়াছেন। ইহা ওঁ নহে, স্বস্তিবাচক চিহ্ন।

২। স্বর্গ (৫১ ও ৫৪ পংক্তিতেও স্বগ্‌র্গ আছে)। ৩। শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ।

৪। দুঃখ। দুষ্খ পাঠ আনুলিয়া, তর্পণদীঘি, ও গোবিন্দপুর শাসনে আছে।

৫। শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ। ৬। বসন্ততিলক ছন্দ। ৭। সুধু গোবিন্দপুর শাসনে 'বিকমারকস্বরৈ'

৮। আ, গো, ও ত, শাসনে—'রিপুরাজ'।

৮। ম্লানীঃ[৯] সমুন্মীলয়ন্ (।) **হেমন্তঃ** স্ফুটমেব সেনজননক্ষেত্রস্য[১০] পুণ্যাবলী শালিশ্লাঘ্যবিপাকপীব-

৯। রগুণস্তেষামভূদ্বংশজঃ॥ [৪][১১] যদীয়ৈরদ্যাপি প্রচিতভুজঃ স্ফুট[১২] সহচরৈর্যশোভিঃ শোভন্তে পরিধি-

১০। পরিণদ্ধা ইব দিশঃ (।) ততঃ কাঞ্চীলীলা-চতুর-চতুরম্ভোধিলহরী-পরীতোর্ব্বী-ভর্ত্তাজনি **বিজ-**

১১। **য়সেন**[ঃ] স বিজয়ী॥ [৫][১৩] প্রত্যূহঃ কলিসম্পদামনলসো বেদায়নৈকাধ্বগঃ সঙ্গ্রামঃ[১৪] শ্রিতজঙ্গমা-

১২। **কৃতিরভূদ্বল্লালসেনস্ততঃ** যশ্চেতোময়মেব শৌর্যবিজয়ী দত্তোষধং[১৫] তৎক্ষণ দক্ষীণা রচয়াঞ্চ-

১৩। কার বশগাঃ স্বস্মিন্ পরেষাং শ্রিয়ঃ॥ [৬][১৬] সংভুক্তান্যদিগঙ্গনাগণ-গুণাভোগ-প্রলোভাদ্দিশামীশৈরংশ-

১৪। সমর্প্পণেন[১৭] ঘটিতস্তত্তৎপ্রভাব-স্ফুটৈঃ (।) দোরুষ্মক্ষপিতারি-[১৭ক] সঙ্গরসো রাজন্য-ধর্ম্মাশ্রয়ঃ শ্রীম-

১৫। **লক্ষ্মণসেন**-ভূপতিরতঃ সৌজন্যসীমাজনি॥ [৭][১৮] শশ্বদ্বন্ধ-ভয়াদ্বিমুক্তবিষয়াস্তন্মাত্র-নিষ্ঠীকৃত-

১৬। স্বান্তা যাস্তু কথং ন নাম রিপবস্তস্য প্রয়োগাল্লয়ম্ (।) যৈরাত্মপ্রতিবিম্বিতেপি[১৯] চক্ষুতৃ[২০]-

১৭। ণেপ্যদ্বৈতেন যতস্ততোপি সপরো বেদঃ পরং বীক্ষ্যতে॥ [৮][২১] স খলু **শ্রীবিক্রমপুর**সমাবাসিত-শ্রীম-

১৮। জ্জয়স্কন্ধাবারাৎ মহারাজাধিরাজ **শ্রীবল্লালসেন**-দেবপাদানুধ্যাত-পরমেশ্বর-পর-

১৯। মভট্টারক-পরমবৈষ্ণব-মহারাজাধিরাজ-**শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন**দেবঃ কুশলী। সমুপ-

৯। নলিন-ম্লানী (আ, গো, ও ত, শাসনে)
১০। আ, ও ত, শাসনে 'ক্ষেত্রৌঘ' কিন্তু গো, শাসনে 'ক্ষেত্রস্য' আছে।
১১। শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ। ১২। আ, গো, ও ত, সবগুলিতে 'তেজঃ' আছে।
১৩। শিখরিণী ছন্দ। ১৪। আ, গো, ত, শাসনেও ঙ ও গ সম্পূর্ণ লেখা আছে।
১৫। দত্ত্বা। ১৬। শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ।
১৭। সমর্পণ—আ. (সমর্প্প ণ), গো. ও ত. শাসনে (শমর্প্প ণ)।
১৭ক। আ. ও ত. শাসনেও আছে, কিন্তু গ. শাসনে 'ক্ষয়িত'।
১৮। শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ।
১৯। ইহার পর ত. শাসনে 'নিপতৎপত্রেপি' অধিক আছে, উহা এখানে না থাকায় ছন্দপতন হইয়াছে।
২০। —তৃ— ২১। শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ; এই শ্লোকটি সুধু ত. শাসনে আছে, অন্যগুলিতে নাই।

২০। গতাশেষ-রাজ-রাজন্যক-রাজ্ঞী-রাণক-রাজপুত্র-রাজামাত্য-মহাপুরোহিত-ম-

২১। হাধর্ম্মাধ্যক্ষ-মহাসান্ধিবিগ্রহিক-মহাসেনাপতি-মহামুদ্রাধিকৃত-অন্তরঙ্গ-

২২। বৃহদুপরিক-মহাক্ষপটলিক-মহাপ্রতীহার-মহাভোগিক-মহাপীলুপতি-মহা-

২৩। গণস্থ-দোঃসাধিক-চৌরাদ্ধরণিক-নৌবলহস্ত্যশ্বগোমহিষাজাবিকা-দিব্যাপৃতক-গৌল্মি-

২৪। ক-দণ্ডপাশিক-দণ্ডনায়ক-বিষ(য়)পত্যাদীন্ অন্যাংশ্চ সকলরাজপাদোপজীবিনোধ্যক্ষ-প্রচারো-

২৫। ক্তানিহাকীর্ত্তিতান্ চট্টভট্টজাতীয়ান্[২২] ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণেতরান্ যথার্হং মান-

২৬। য়তি বোধয়তি সমাদিশতি চ মতমস্তু ভবতাম্ যথা **শ্রীমধুগিরিমণ্ডলাবচ্ছিন্ন-কুম্ভীনগর-**

২৭। প্রতিবদ্ধঃ **কঙ্কগ্রামভু-ক্ত্যন্তঃ**পাতি দক্ষিণবীথ্যামুত্তরবাটায়াং [২৩]**কুমারপুরচতুরকে** পূর্ব্বে অপ-

২৮। রা **জোলি**সমেত-মালিকুণ্ডাপরিসরভূঃ সীমা দক্ষিণে বষস্থলীয় **ভাগড়ীখণ্ডক্ষেত্রং** সীমা-

২৯। পশ্চিমে **অচ্ছমা গোপথঃ** সীমা উত্তরে **মোচনদী**সীমা ইত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নঃ ষট্‌ত্রিংশট্‌ক (৩৬ক) দ্রোণাত্মক (ঃ)

(পশ্চাৎ)

৩০। সম্বৎসরেণ সার্দ্ধশতদ্বয়োৎপত্তিকঃ **বারহকোণা-বাল্লিহিতা-নিঝাপাটক**-সম্বদ্ধিভূদ্রো-

৩১। ণ চতুষ্টয়োপেত-পাটকদ্বয়সমেত-**রাঘবহট্টপাটক**স্তথাচতুরকে পূর্ব্বে**চাকলিয়াজো-**

৩২। **লী**সীমা দক্ষিণে **শ্চ (?)**[২৪] **প্রবদ্ধাজোলী**সীমা পশ্চিমে **লাঙ্গলজোলী**সীমা উত্তরে **পরজাণ-**

৩৩। **গোপথঃ**সীমা ইত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নস্ত্রিপঞ্চাশদ্‌দ্রোণাত্মকঃ সম্বৎসরেণ সার্দ্ধশ-

৩৪। তদ্বয়োৎপত্তিকো [ঃ] **টামরবড়া**সমেত-**বিজহারপুর-পাটক(ঃ)** এবমেতদ্ব[দ্ব]য়-বিলিখিত-

৩৫। নাম-সীমং ভূসীমান্তবচ্ছিন্নং দেবব্রাহ্মণাদিভূ-বহিঃ-গোপথান্তভূবাস্ত-ভূসহিতং[২৫] বৃষভশং-

২২। আ. গো. ও ত. শাসনে ইহার পর 'জনপদান্' অধিক আছে; এই শব্দটি বিজয়সেনের ব্যারাকপুর লিপি এবং বল্লালসেনের নৈহাটী লিপিতেও আছে।

২৩। =বাটে। ২৪। অস্পষ্ট।

২৫। 'দেব'-হইতে 'সহিতং' পর্য্যন্ত অংশটুকু লক্ষ্মণসেনের ত. শাসনে 'দেবগোপথান্তসারভূবহিঃ' এইরূপ আছে।

৩৬। স্করনলেন[২৬] উ (উ)ননবতি ভূদ্রোণাত্মকং সম্বৎসরেণ পঞ্চশতোৎপত্তিকং রাঘবহট্ট-বারহ-
৩৭। কোণা-নিঝাবস্থিত-খণ্ডক্ষেত্রভূদ্রোণচতুষ্টয়াত্মক-বাল্লিহিতাপাটক-টামরবড়া-
৩৮। পাটকসমেত-বিজহারপুরপাটকমেতৎ ষট্পাটকং সঝাট-[২৭] বিটপ(ং) সজলস্থলং সগ-
৩৯। র্ত্তোষরং সগুবাকনারিকেলং সহৃদশাপরাধং পরিহৃত-সর্ব্বপীড়ং অচট্টভট্টপ্রবেশ-
৪০। মকিঞ্চিৎপ্রগ্রাহ্যং তৃণযূতি-[২৮] গোচরপর্য্যন্তং **অনিরুদ্ধ-দেবশর্ম্মণঃ**প্রপৌত্রায়
৪১। **পৃথ্বীধরদেবশর্ম্মণঃ** পৌত্রায় **অনন্তদেবশর্ম্মণঃ** পুত্রায় শাণ্ডিল্য-সগোত্রায় শা
৪২। ণ্ডিল্যাসিত-দেবল-প্রবরায় সামবেদ-কৌথুমশাখাচরণানুষ্ঠায়িনে আচার্য্য-শ্রী-
৪৩। **কুবেরদেবশর্ম্মণে** পুণ্যে[হ]**অহ**নি বিধিবদুদকপূর্ব্বকং ভগবন্তং শ্রীমন্নারায়ণ-ভট্টা-
৪৪। রকমুদ্দিশ্য মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্য-যশো(হ) ভিবৃদ্ধয়ে **শ্রীবল্লালসেনদেব**প্রদত্ত-
৪৫। গয়াল-ব্রাহ্মণ-**হরিদাসেন** প্রতিগৃহীত-পঞ্চশতোৎপত্তিক-চ্ছত্রপাটকাভিধান-শাস
৪৬। নো[ন] বিনিময়েন এতদ্রাঘবহট্টাদি ষট্পাটকম্প্রত্যেকমুপরি লিখিতপ্রমাণং পঞ্চশতো
৪৭। [তো][২৯]ৎপত্তিযোগ্যংছত্রপাটকংকোষ্ঠীকৃত্য[২৯ক] অস্মৈপুনর্ব্বাহ্মণায় শ্রীকুবেরাভিধানায় সূর্য্যগ্রহে
৪৮। এতৎসমুৎসৃজ্যাচন্দ্রার্ক(ং) -ক্ষিতিসমকালং যাবদ্ভু[ৎভূ] মিচ্ছিদ্রন্যায়েন-তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্ত-
৪৯। মস্মাভিস্তস্তবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবানুমন্তব্যম্ (।) ভাবিভিরপি নৃপতি ভিরপহরণে নরকপাত-
৫০। ভয়াৎ পালনে ধর্ম্মগৌরবাৎ পালনীয়ং[ম্] (।) ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ(।) ভূমিং
৫১। যঃ প্রতিগৃহ্লাতি যশ্চভূমিং প্রযচ্ছতি(।) উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ ॥ [৯] [৩১]
৫২। বহুভির্ব্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ(।) যস্য যস্য যদা ভূমি স্তস্য [তস্য][৩২]তদা ফলং (ম্)॥[১০][৩৩] আস্ফোট-

২৬। বল্লালসেনের নৈহাটী শাসনেও (৪৫) পাওয়া যায়। পূর্ব্বে ইহা অনেকে 'নলিন' এইরূপ পাঠ করিয়াছিলেন। Inscriptions of Bengal —III— p. 87, footnote 1 ; কিন্তু ল-এর একার বেশ স্পষ্ট।

২৭। ভূমিকায় পাঠ আলোচিত হইয়াছে। পূর্ব্বে অনেক 'সসাট' পড়িয়াছিলেন।

২৮। ভূমিকায় পাঠ আলোচিত হইয়াছে। পূর্ব্বে অনেকে 'পূতি' পাঠ করিয়াছিলেন।

২৯। ভুলে 'তো' দুইবার লিখিত হইয়াছে।

২৯ক। ভূমিকায় আলোচিত হইয়াছে।

৩০। বিজয়সেনের ব্যারাকপুর, বল্লালসেনের নৈহাটী এবং লক্ষ্মণসেনের আ. ত. ও মাধাইনগর শাসনে-ক্ক-এইরূপ আছে, শুধু গো, শাসনে -র্ক আছে।

৩১। অনুষ্টুভ্ ছন্দ। ৩২। ভুলে 'তস্য' শুধু একবার লেখা হইয়াছে। ৩৩। অনুষ্টুভ্ ছন্দ।

৫৩। য়ন্তি পিতরো বল্গয়ন্তি পিতামহা (:) (।) ভূমিদাতা কুলে জাতঃ স ন স্ত্রাতা ভবিষ্যতি॥ [১১][৩৪] ষষ্টি [ং] বর্ষ [ং]-

৫৪। সহস্রাণি স্বর্গে্ তিষ্ঠতি ভূমিদঃ (।) আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ তান্যেব নরকং ব্রজেৎ॥ [১২] [৩৫] স্বদত্তাং

৫৫। পরদত্তাম্বা [ংবা] যো হরেত বসুন্ধরাং (।) স বিষ্ঠায়াং ক্রিমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে॥ [১৩][৩৬] ইতি কমল

৫৬। দলাম্বু বিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্য জীবিতঞ্চ (।) সকলমিদ মুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা[৩৭] নহি।

৫৭। পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো ঃবিলোপ্যাঃ॥ [১৪][৩৮] শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন ক্ষোণীন্দ্রঃ[৩৯] সান্ধিবিগ্রহিকম্ [ং] ত্রিপুরা

৫৮। রিনাহমকরোৎ[৪০] কুবেরকস্য শাসনে দূতম্॥ [১৫][৪১] সং ৩ [৪২] শ্রাবণদিনে২[৪৩] শ্রীনিমহাসাংনি

৩৪। অনুষ্টুভ্ ছন্দ। ৩৫। অনুষ্টুভ্ ছন্দ। এই শ্লোকটি লক্ষ্মণসেনের আর কোনও শাসনে দেখা যায় না, কিন্তু বল্লালসেনের নৈহাটী শাসনে আছে।

৩৬। অনুষ্টুভ্ ছন্দ। ৩৭। বুদ্ধা,

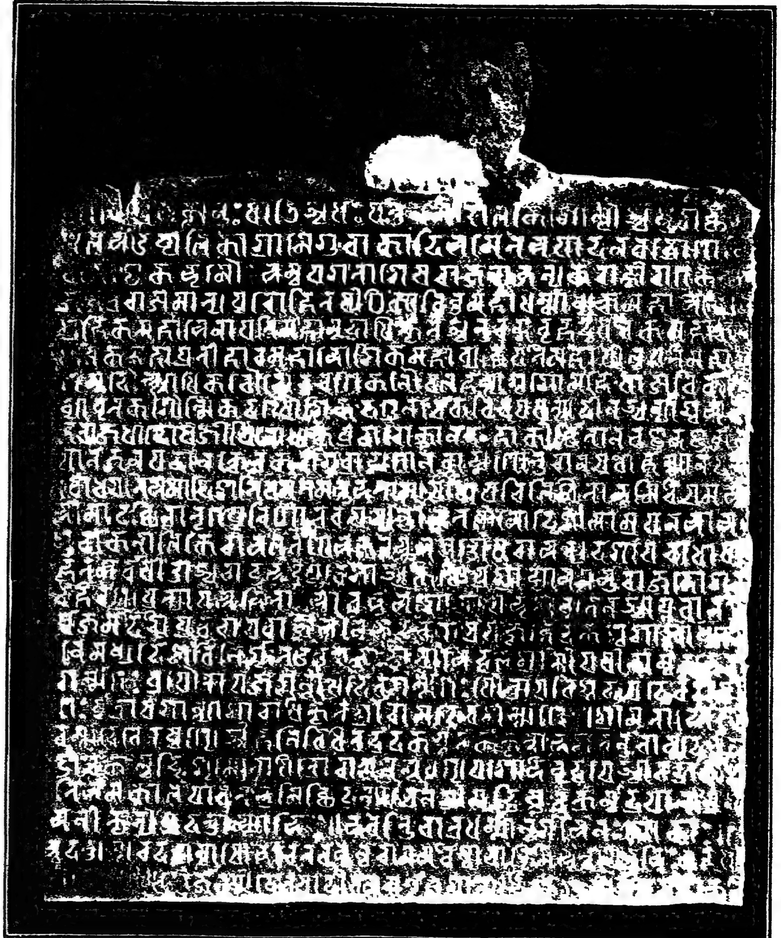
৩৮। পুষ্পিতাগ্রা ছন্দ। শ্রীযুক্ত ননীগোপালবাবু আ. ও গো. শাসানে এই শ্লোকের ছন্দকে পুষ্পিতাগ্রা লিখিয়াছেন, তাহার পুস্তকের অন্য সব জায়গায় মালিনী লিখিয়াছেন। Inscriptions of Bengal—III—pp. 75. 88. 97. 126. 138. 155.

৩৯। ক্ষৌণীন্দ্রঃ।

৪০। লক্ষ্মণসেনের অন্যান্য শাসনে রাজদূতের নাম নারায়ণ দত্ত। এই শাসনের দূতের নামটি নূতন পাওয়া যাইতেছে। বোধ হয়, ত্রিপুরারিনাথ শব্দটি লৌকিক উচ্চারণে ত্রিপুরারিনাহ হইয়াছিল।

৪১। আর্য্যা ছন্দ। ৪২, ৪৩। সংবতের অঙ্কটি ৩ বলিয়া মনে হয়, এবং তারিখটি ১৩ হইতে পারে।





ভোজবর্ম্মার বেলাব গ্রামে প্রাপ্ত তাম্র-শাসন।

সম্মুখের পৃষ্ঠা।

পশ্চাতের পৃষ্ঠ

ভোজবর্ম্মার বেলাব গ্রামে প্রাপ্ত তাম্র-শাসন

সম্মুখ পৃষ্ঠার পাঠ

বিষ্ণু চক্র সমন্বিত রাজমুদ্রা।

১। ওঁ সিদ্ধি॥ স্বায়ম্ভুব মিহাপত্যং মুনিরত্রি দি (র্দি) বৌকসাং। তস্য চন্নাযনং তেজ স্তেনাজা
২। য়ত চন্দ্রমাঃ। রৌহিণেয়ো বুধস্তস্মাদস্মাদৈলঃ পুরূরবাঃ স্বয়ং-বৃতঃকীর্ত্ত্যা
৩। চোর্ব্বশ্যাচ ভুবাচয়ঃ॥ সোপ্যায়ুং সমজীজনন্ননু সমোরাজ্ঞস্ততো জজ্ঞিবান্ ক্ষ্মা
৪। পালো নহুষস্ততোজনি মহারাজোযযাতিঃ সুতম্ সোপি প্রাপ যদুং ততঃক্ষিতি ভু
৫। জাং বংশোয় মুজ্জম্ভতে বীরশ্রীশ্চ হরিশ্চ যত্র ব শঃ প্রত্যক্ষ মেবৈক্ষত সোপীহ
৬। গোপীশত কেলিকারঃ কৃষ্ণো মহাভারত সূত্রধারঃ অর্ঘঃ পুমানংশ কৃতাবতা
৭। রঃ প্রাদুর্ব্বভূবেদ্ধিত ভূমিভারঃ॥ পুংসামাবরণং ত্রয়ী নচ তয়া হীনা ন নগ্না ইতি
৮। ত্রয্যান্ (ং) চাদ্ভুত সঙ্গরেষু চ রসাদ্রোমোদ্গমৈ বর্ম্মণঃ বর্ম্মাণোতি গভীর নাম দধতঃ
৯। শ্লাঘ্যো ভুজৌ বিভ্রতো ভেজুঃ সিংহপুরং গুহামিব মৃগেন্দ্রাণাং হরের্ব্বান্ধবাঃ॥
১০। অভবদথকদাচিদ্যাদবীনাং চমূনাং সমরবিজয়ধারাঃ মঙ্গলং বজ্রবর্ম্মা শম
১১। ন ইব রিপুণাং সোমবদ্ধান্ধবানাং কবিরপি চ কবিনাং পণ্ডিতঃ (প) ণ্ডিতানাম্॥ জা
১২। ত্রবর্ম্মা ততো জাতো গাঙ্গেয়ইব শান্তনোঃ (।) দয়াব্রতং রণক্রীড়া ত্যাগো যস্যমহো
১৩। ৎসবঃ গৃহ্নম্বৈণ্য পৃথুশ্রিয়ং পরিণয়ন্ কর্ন্নস্য বীরশ্রিয়ং যো * * * প্রথম শ্রিয়ং পরিভবং
১৪। স্তাং কামরূপশ্রিয়ং নিন্দন্দিব্য ভুজশ্রিয়ং
১৫। সাচ্ছ্রিয়ং বিতত বাত্যাং সার্ব্ব ভৌমশ্রিয়ং॥ বীর শ্রিয়ামজনি সামলবর্ম্ম দেবঃ
১৬। শ্রীমাঞ্জগৎ প্রথম মঙ্গল নামধেয়ঃ কিম্বণ্র্যাম্যখিল ভূপগুণোপ পন্নো দোষৈ
১৭। ম নাগপি পদংনকৃতঃ প্রভুম্নে। তথোদয়ী সুনুরভূত প্রভূত প্রত্যপ বীরেষ্বপিসঙ্গ
১৮। রেষু যশ্চন্দ্রহা (স) প্রতিবিম্বিতং স্বমেকং মুখং সম্মুখমীক্ষতে স্ম॥ তস্যমালব্য দেব্যা
১৯। সীৎ কন্যা ত্রৈলোক্যসুন্দরী। জগদ্বিজয়মল্লস্য বৈজয়ন্তী মনোভুবঃ॥ পূর্ব্বেপ্যাশে
২০। য-ভূপাল পুত্রীণামবরোধনে তস্যাসীদগ্রমহিষী সৈব সামল বর্ম্মণঃ॥ আসী
২১। ত্তয়োঃ সু (সূ) নুবিহান্তরং যঃ শ্রীভোজ বর্ম্মোভয় বংশ (দী) পঃ পাত্রেষু সর্ব্বাসু দশাসু যে
২২। নস্নেহোনু লুপ্তশ্চ হতং তমশ্চ॥ হাধিক (ক) ষ্টমবীর মদ্য ভুবনং ভূয়োপি কং (কিং) রক্ষসা
২৩। মুৎপাতয়ো মু (প) স্থিতোস্ত কুশলী শঙ্কা স্যলঙ্কাধিপঃ॥ ইতি যং গুণগাথাভি স্মৃষ্টা
২৪। বপুরুষোত্তমঃ মজ্জযন্নিব বাগ্ ব্রহ্মময়ানন্দ মহোদধৌ॥ সখলু শ্রীবিক্রমপু
২৫। র সমাবাসিত শ্রীমজ্জয় স্কন্ধাবারাৎ মা (ম) হারাজাধিরাজ শ্রীসামল বর্ম্ম দেবপা
২৬। দানুধ্যাত পরমবৈষ্ণব পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্ভোজ

পশ্চাৎ পৃষ্ঠার পাঠ

২৭। শ্রীপৌণ্ড্র ভুক্ত্যন্তঃপাতি অধঃপত্তন মণ্ডলে কৌশাম্বী অষ্টগচ্ছ খ
২৮। ণ্ডল সং উষ্যলিকা গ্রামে গুবাকাদি সমেত সপাদনব দ্রোণাধি
২৯। ক পাটক ভূমৌ সমুপ গতাশেষ রাজরাজন্যক রাজ্ঞী রাণক রা
৩০। জপুত্র রাজামাত্য পুরোহিত পীঠিকাবিত্ত মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ মহাসান্ধি বি
৩১। গ্রহিক মহাসেনাপতি মহামুদ্রাধিকৃত অন্তরঙ্গ বৃহদুপরিক মহাক্ষপ
৩২। টলিক মহাপ্রতিহার মহাভোগিক মহাব্যূহপতি মহাপীলুপতি মহাগ
৩৩। ণস্থ দৌস্‌সাধিক চৌরোদ্ধরণিক নৌবলহস্ত্যশ্ব গোমহিষাজাবিকাদি
৩৪। ব্যাপৃতক গৌল্মিক দণ্ডপাশিক দণ্ডনায়ক বিষয় পত্যাদীন্ অন্যাংশ্চ সক
৩৫। ল রাজ পাদোপ জীবিনোধ্যক্ষ প্রচারোক্তান ইহা কীর্ত্তিতান্ চট্টভট্ট জাতী
৩৬। য়ান্ জনপদান ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণোত্তরান্ যথার্হ্মানয়তি
৩৭। বোধয়তি সমাদিশতি চ মতমস্তুভ (ব) তাম্। যর্থোপরিলিখিতা ভূমিরিয়ম্ স্ব
৩৮। সীমাবচ্ছিনা তৃণ পূতি গোচর পর্য্যন্তা সতলা সো দেশা সাম্রপনসা স
৩৯। গুবাক নালিকেরা সলবণা সজলস্থ (লা) সগর্ত্তোষরা সহ দশাপরাধা পরি
৪০। হৃত সর্বপীড়া অচাডভড প্রবেশা অকিঞ্চিৎ প্রগ্রাহ্যা সমস্ত রাজভোগক
৪১। র হিরণ্য প্রত্যায় সহিতা সাবর্ন্ন সগোত্রায় ভৃগু চ্যবন আপ্নবান ঔ
৪২। র্ব্ব জমদগ্নি প্রবরায় বাজসনেয় চরণায় যজুর্ব্বেদ কন্ব শাখাধ্যায়ি
৪৩। নে মধ্যদেশ বিনির্গত উত্তর রাঢ়ায়াং সিদ্ধল গ্রামীয় পীতাম্বর দেব
৪৪। শর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় জগন্নাথ দেব শর্ম্মণঃ পৌত্রায় বিশ্বরূপ দেব শর্ম্ম
৪৫। ণঃ পুত্রায় শান্ত্যাগারাধিকৃত শ্রীরাম দেব শর্ম্মণে শ্রীমতা ভোজ
৪৬। বর্ম্মদেবেন পুণ্যে অহনি বিধিবদুক পূর্ব্বকং কৃত্বা ভগবন্তং বাসুদেব ভ
৪৭। ট্টাবক মুদ্দিশ্য মাতা পিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্য যশোভি বৃদ্ধয়ে আচন্দ্রার্কং ক্ষি
৪৮। তি সমকালং যাবদ্ভূমি ছিদ্রন্যায়েন শ্রীবিষ্ণু চক্রমুদ্রয়া তাম্রশা
৪৯। সনীকৃত্য প্রদত্তাস্মাভিঃ॥ ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ॥
৫০। স্বদত্তাম্পরদত্তা স্বা যো হরেত বসুন্ধরাম সবিষ্ঠায়াং ক্রিমির্ভূর্ত্বা পিতৃভিঃ সহ প চ্যতে
(৫১) শ্রীমদ্ভোজ দেব পাদীর সম্বৎ ৫ শ্রাবণ দিনে ১৯ নি অনুমহাক্ষনি। *

* কেহ কেহ এই শ্লোকের ভিন্নার্থ করিয়া থাকেন:—"বেদ মনুষ্যের বস্ত্র স্বরূপ; যাহারা বেদ মানে না তাহারা নগ্ন অথবা যথেচ্ছাচারী। কৃষ্ণের পরবর্ত্তী যাদবেরা তেমন ছিলেন না; যখন নগ্ন বৌদ্ধমত প্রবল হইয়া ত্রয়ীর নিন্দা চতুর্দ্দিক হইতে প্রচার পূর্ব্বক এতদ্দেশ আক্রমণ করে, তৎকালীন যাদবেরা গম্ভীরভাব গ্রহণে অটল ছিলেন। ত্রয়ীর প্রতি আস্থা জনিত রসে তাঁহাদের এমন তীব্র রোমাঞ্চ ঘটিয়াছিল, তাহা যেন শরীরের বর্ম্ম ভেদ করিয়া বহির্দ্দেশে ফুটিয়া উঠিত। সেই ধর্ম্মমন্দিরে তাঁহারাই শ্লাঘ্যবাহু ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অধিষ্ঠিত সিংহপুর আস্তিকতার স্বাপক্ষে দুর্ভেদ্য দুর্গ স্বরূপ হইয়াছিল। সেই আস্তিকদিগের কুলে এই তাম্রশাসন-কর্ত্তার প্রপিতামহের জন্ম সুতরাং এই রাজবংশ অন্যান্য বৌদ্ধদিগের ন্যায় নাস্তিক নহে।" ঢাকা প্রকাশ।

* শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন রায় মহাশয় ঢাকার ইতিহাসের প্রথমখণ্ডে ইহার অনুবাদ করিয়াছেন আবশ্যক বোধে এই স্থলে উদ্ধৃত হইল।

ওঁ সিদ্ধি। স্বর্গবাসী দেবগণের মধ্যে অত্রিমুনি স্বয়ম্ভুর অপত্য ছিলেন। তাঁহার নয়ন হইতে তেজঃ সমুত্থিত হইয়াছিল, তাহা হইতে চন্দ্রমা জন্মগ্রহণ করেন। (১–২)

তাহা (চন্দ্রমা) হইতে রৌহিণেয় বুধ এবং বুধ হইতে ইলার পুত্র পুরূরবা জন্ম গ্রহণ করিয়া কীর্ত্তি এবং উর্ব্বশী এবং বসুন্ধরা কর্ত্তৃক স্বয়ংবৃত হইয়াছিলেন। (২—৩)।

সেই মনুপ্রতিম (পুরূরবা) আয়ুর জন্মদান করিয়াছিলেন। রাজা আয়ু হইতে ভূপাল নহুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নহুষ হইতে মহারাজ যযাতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিও যদুকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহা হইতে যে রাজবংশ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল তাহাতে বীরশ্রী এবং হরি বহুবার প্রত্যক্ষবৎ পরিদৃষ্ট হইয়াছিলেন। ৩—৫

এই বংশে, পূজ্য-পুরুষ, অংশাবতার, মহাভারতের সূত্রধার গোপীশতকেলীকার শ্রীকৃষ্ণ প্রাদুর্ভূত হইয়া পৃথিবীর ভার উদ্ধার করিয়াছিলেন। ৫—৭

ত্রয়ী (বেদবিদ্যা) পুরুষের আবরণ। তাহার (বেদবিদ্যার) অভাব ছিল না বলিয়াই অনগ্ন, ত্রয়ী বিদ্যার এবং অদ্ভুত সমর ক্রীড়ায় আনন্দহেতু রোমোদ্গম দ্বারা বর্ম্মিণঃ হরির বান্ধব সমূহ "বর্ম্মন" এই গভীর নাম এবং শ্লাঘ্য বাহুযুগল ধারণ করিয়া সিংহ বিবরতুল্য সিংহপুর নামক স্থানে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। ৭—৯

অনন্তর কোনও সময়ে বজ্রবর্ম্মা যাদবীয় সৈন্যের মঙ্গলময় এবং অপ্রতিহত বিজয়শ্রীর হেতুভূত হইয়াছিলেন। তিনি অরিকুলের শমন, বান্ধবগণের চন্দ্র, কবিকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি এবং পণ্ডিতগণের মধ্যে পণ্ডিত ছিলেন। ১০—১১

শান্তনু হইতে যেমন গাঙ্গেয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ বজ্রবর্ম্মা হইতেও জাত্রবর্ম্মা জন্মগ্রহণ করেন। দয়াই তাঁহার ব্রত এবং যুদ্ধই তাঁহার ক্রীড়া এবং ত্যাগই তাঁহার মহোৎসব ছিল। (১১—১৩)

তিনি বৈণ্য পৃথুশ্রীকে ধারণ করিয়া কর্ণের (কন্যা) বীরশ্রীকে বিবাহ করিয়া, * * কামরূপ শ্রীকে পরাভব করিয়া দিব্যের ভুজশ্রীকে নিন্দা করিয়া, গোবর্দ্ধনের শ্রীকে বিফল করিয়া, শ্রীকে শ্রোত্রীয় সাৎ করিয়া, সার্ব্বভৌম শ্রী বিস্তৃত করিয়াছিলেন। ১৩—১৫

জগতে প্রথম মঙ্গল নামধারী শ্রীমান সামল বর্ম্ম দেব বীরশ্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন। কি আর বলিব? (যেমন) সেই অখিলভূগগুণোপন্ন আমার প্রভুতে কিয়ৎ পরিমাণেও দোষ স্পর্শ করে নাই। ১৫—১৭

সেইরূপ প্রভূত প্রতাপশালী বীরগণ মধ্যেও উদয়ী স্তম্ভ বীরসমাকীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি চন্দ্রহাস নামক খড়্গ ফলকে স্বীয় মুখ প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাইতেন। ১৭—১৮

সেই জগদ্বিজয় মল্লের মালব্য দেবী নাম্নী কামদেবের বৈজয়ন্তী রূপিনী, ত্রৈলোক্যসুন্দরী এক কন্যা ছিল। ১৮—১৯

অশেষ ভূপাল-কন্যাগণ কর্ত্তৃক রাজান্তঃপুর পূর্ণ থাকিলেও তিনিই (মালব্যদেবী) সামল বর্ম্মার অগ্রমহিষী ছিলেন। ১৯—২০

উভয়কুল-প্রদীপ শ্রীভোজবর্ম্মা নামে তাহাদের পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সর্ব্বপ্রকার অবস্থাতেই উপযুক্ত পাত্রে স্নেহের লোপ করিতেন না; অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া দিতেন। ২০—২১

হা ধিক। কষ্টের বিষয়, অস্য ভুবন বীরশূন্য হইয়াছে। তবে কি আবার রাক্ষসগণের উৎপাৎ উপস্থিত? এখন ভুবন অলঙ্কাধিপ অর্থাৎ রাবন শূন্য বা শত্রুশূন্য। (এই রাজাভোজ) কুশলী হউন। এইরূপে বাগ্‌ব্রহ্মানন্দ মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া গুণগাথা সমূহে পুরুষোত্তম যাহাকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন:—

শ্রীবিক্রমপুর সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার (রাজধানী হইতে মহারাজাধিরাজ শ্রীসামলবর্ম্মদেব পাদানুধ্যাত পরমবৈষ্ণব, পরমেশ্বর, পরম ভট্টারক, মহারাজাধিরাজ সেই শ্রীমদ্‌ভোজ শ্রীপুণ্ড্রভুক্তির অন্তঃপাতি অধঃপত্তন মণ্ডলে, কৌশাম্বী অষ্টগচ্ছ খণ্ডল উপ্যলিকা গ্রামে, গুবাকাদি সমেত সপাদ নবদ্রোণাধিকপাটক ভূমিতে (এক পাটক

গোয়া নয় দ্রোণ পরিমিত) সমুপগত সমুদয় রাজা, রাজন্যক, রাজ্ঞী, রাণক, রাজপুত্র, রাজামাত্য, পুরোহিত, পীঠিকাবিত্ত, মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ, মহাসান্ধি, বিগ্রহিক, মহাসেনাপতি, মহামুদ্রাধিকৃত, অন্তরঙ্গ-বৃহদুপরিক, মহাক্ষপটলিক, মহাপ্রতিহার, মহাভোগিক, মহাব্যূহপতি, মহাপীলুপতি, মহাগণস্থ, দৌঃ সাধিক, চৌরোদ্ধরণিক, নৌবলব্যাপৃতক, হস্তিব্যাপৃতক, অশ্বব্যাপৃতক, মহিষ ব্যাপৃতক, অজব্যাপৃতক, অবিকাদি ব্যাপৃতক, গৌল্মিক, দণ্ডপাশিক, দণ্ডনায়ক, বিষয়পতি, প্রভৃতি এবং অধ্যক্ষ প্রচারোক্ত কিন্তু অকথিত অন্যান্য রাজপাদোপজীবীদিগকে চটভট্ট জাতীয় জনপদবাসীগণকে, ক্ষেত্রকর ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণোত্তমগণকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন, বিজ্ঞাপন করিতেছেন, এবং আজ্ঞা করিতেছেন,—সকলের অভিমত হউক, স্বসীমাবচ্ছিন্ন, তৃণ পূতি গোচর পর্য্যন্ত সতল, সোদ্দেশ, আম্র, পনস, গুবাক, নারিকেল বৃক্ষ সমেত সলবণ সজলস্থল, সগর্ত্তোষরা, যাহার (যে ভূমি সম্বন্ধে প্রতিগৃহীতার)। দশটী অপরাধ সহ্য হইবে, সর্ব্বপ্রকার উৎপীড়ন রহিত, চাট, ভাট জাতীর প্রবেশাধিকার বিরহিত, যাহা হইতে কোনও প্রকার করাদি গৃহীত হইবে না, রাজভোগ্যকর ও হিরণ্যপ্রত্যয় সহিত, উপরিলিখিত ভূমি সাবর্ণ্য গোত্রীয়, ভৃগুচ্যবন আপ্নবান, ঔর্ব, জমদগ্ন প্রবর বাজসনের চরণোক্ত যজুর্ব্বেদের কন্বশাখাধ্যায়, মধ্যদেশ হইতে বিনির্গত উত্তর রাঢ়ায় অবস্থিত সিদ্ধল গ্রামবাসী পীতাম্বর দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র, জগন্নাথ দেবশর্ম্মার পৌত্র, বিশ্বরূপ দেবশর্ম্মার পুত্র, শান্ত্যাগারাধিকৃত শ্রীরাম দেব শর্ম্মাকে এই পুণ্য দিনে বিধিবৎ উদক স্পর্শ পূর্ব্বক ভগবান বাসুদেব ভট্টারককে উদ্দেশ্য করিয়া মাতা পিতা ও স্বীয় পুণ্য ও যশ বৃদ্ধির জন্য, চন্দ্র সূর্য্য ক্ষিতি সমকাল পর্য্যন্ত ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়ানুসারে শ্রীমদ্বিষ্ণুচক্র মুদ্রাদ্বারা তাম্রশাসন করিয়া আমি শ্রীভোজ বর্ম্মদেব প্রদান করিলাম। এতদ্বিষয়ে ধর্ম্মানুশাসনের শ্লোক আছে:—স্বদত্তই হউক বা পরদত্তই হউক যিনি ভূমি হরণ করিবেন তিনি বিষ্ঠার কৃমি হইয়া পিতৃগণ সহ পচিতে থাকিবেন। শ্রীমদ্ভোজ বর্ম্মদেব পাদীয় সংবৎ ৫, শ্রাবণ ১৯ দিনে ৫৮ নি (বদ্ধ)। অনু। মহাক্ষ (পটলিক) নি [বদ্ধ]।

চন্দ্রদেবের কেদারপুরের তাম্রশাসন।*

বঙ্গদেশস্থ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ইদিলপুরে প্রাপ্ত শ্রীচন্দ্রদেবের একখানি তাম্রশাসন সম্বন্ধে স্বর্গীয় মনীষী গঙ্গামোহন লস্কর, এম-এ প্রদত্ত এক বিবরণ জে, টি, রেঙ্কিন, আই-সি-এস্ মহোদয় ঢাকা রিভিউ পত্রিকার ১৯১২ সনের অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশ করেন। প্রায় দশম কি একাদশ শতাব্দীতে "চন্দ্র" উপাধিধারী একটী বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী রাজবংশ যে বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছেন, উক্ত পত্রে প্রকাশিত ঐ প্রবন্ধ হইতেই এই বিষয় সর্ব্বপ্রথম প্রতিপাদিত হয়। অতঃপর বঙ্গদেশের প্রত্নতাত্তিকগণ বিক্রমপুরে চন্দ্ররাজগণের কাহিনী পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমে তাহাদের দেশের সহিত সংযোজিত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার অন্তঃপাতী রামপাল গ্রামে অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক দ্বিতীয় তাম্রফলক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তদ্দ্বারা এই বিষয়টী আরও প্রবলতর ভাবে সমর্থিত হইতেছে। অধ্যাপক বসাক মহাশয় উহা বাংলা "সাহিত্য" পত্রিকার বঙ্গাব্দ ১৩২০ সনের শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায় সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত করেন। পরিশেষে উহা "এপিগ্রেফিয়া ইণ্ডিকার" দ্বাদশ খণ্ডের ১৩৬ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান তাম্রশাসনখানি শ্রীচন্দ্রদেবের তৃতীয় তাম্রশাসন। উহা ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত কেদারপুর গ্রামে মৃত্তিকা খননকালে পাওয়া গিয়াছে। কেদারপুর মধ্য ইংরেজী

* No. 12—The Kedarpur plate of Sri Chandra Deva by Sj. Nalini Kanta Bhattasali, M. A. Curator, Dacca Museum—Epigraphia Indica Vol. XVII pp. 186-192. (Translated).

শ্রীচন্দ্রের কেদারপুর গ্রামে প্রাপ্ত তাম্র-শাসন

স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে উহা সংরক্ষিত হয়। আমি জনৈক বন্ধুর নিকট ইহা অবগত হই। ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, এন, রায়, আই-সি-এস ও মাদারীপুরের মহকুমা হাকিম মিঃ এন, সেন মহোদয় দ্বয়ের সৌজন্যে মাননীয় মিঃ টি, ইমারসন, সি-আই-ই, আই-সি-এস মহোদয় কর্ত্তৃক ঢাকা যাদুঘরের জন্য উহা সংগৃহীত হয়।

এই তাম্রশাসনখানি ৮॥ ইঞ্চি দীর্ঘ ও ৭। ইঞ্চি প্রস্থ, বসাক মহাশয়ের তাম্রশাসনখানি ৯॥ ইঞ্চি দীর্ঘ ও ৮ ইঞ্চি প্রস্থ; সুতরাং ইহা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। এই তাম্রফলকের শীর্ষদেশের ঠিক মধ্যভাগে চন্দ্ররাজগণের রাজকীয় মোহর অঙ্কিত আছে। ইহার উভয় পার্শ্বে দুইটী শায়িত উন্নত-শীর্ষ মৃগ "ধর্ম্মচক্র" সূচনা করিতেছে এবং উহা ডিয়ারপার্কের (মৃগদাব)—কাশীর অন্তর্গত বর্ত্তমান সারনাথের—"ধর্ম্ম চক্রের প্রথম ঘূর্ণনের" নিদর্শন স্বরূপ। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে চন্দ্রদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী বঙ্গের "পালবংশের" রাজগণেরও অনুরূপ মোহর ছিল, এবং এই পালরাজগণও বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। এই চক্রের নিম্নদেশে "শ্রীশ্রীচন্দ্রদেবের" নাম গ্রথিত আছে।

এই তাম্রশাসনখানি অসমাপ্ত এবং দেখিয়া বোধ হয় ইহার দ্বারা কোনও "দান" সম্পাদিত হয় নাই। ইহাতে কেবল দানের মঞ্জুরীকৃত অংশগুলি খোদিত হইয়া বক্রী অংশ অবস্থানুযায়ী অনুশাসন দ্বারা পূর্ণ করিবার অপেক্ষায় মুদ্রাগৃহে সংরক্ষিত হইয়াছিল। এই তাম্রফলকখানি মুদ্রাকরের গুরুতর ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে কেদারপুর গ্রাম যেখানে এই তাম্রফলকখানি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে—সেখানে প্রশস্ত পরিখা বেষ্টিত রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ও বিনষ্টপ্রায় এক বিশাল দীর্ঘিকার চিহ্ন বর্ত্তমান। দীর্ঘিকাটী মোগল শাসনের প্রাক্কালে যে পরাক্রান্ত দ্বাদশ ভৌমিকগণ বঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়াছেন তাহাদের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ কেদাররায়ের স্মৃতির সহিত বিজড়িত। কেদাররায়ের রাজধানী শ্রীপুরে অবস্থিত ছিল। রাল্ফ ফিচের বর্ণনাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীপুর একটী সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল। কেবলমাত্র কতিপয় ক্রোশ দূরে কেন যে দ্বিতীয় রাজধানী গঠিত হইয়াছিল উহার যুক্তিসিদ্ধ কারণ উপলব্ধি করা যায় না। অবশ্য কেদারপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনখানির উক্ত গ্রামে আসার বহুল প্রকার কারণ থাকিতে পাবে, কিন্তু এই সমাপ্ত তাম্রশাসনের আবিষ্কারে ইহাই অনুমিত হয় যে কেদারপুরে যে ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয় উহা চন্দ্রবংশীয় রাজগণের এবং তাঁহারা কেদাররায়ের অনুমান ৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

এই তাম্রফলকের কেবল একদিক মুদ্রিত এবং নিম্নদেশে প্রায় দুই ইঞ্চি পরিমিত স্থান শূন্য। ইহাতে ১৮ পংক্তি খোদিত লিপি আছে। এই অক্ষরগুলি '২৪ হইতে '৩০ ইঞ্চি উচ্চ, এবং অধিকাংশ স্থলেই সুস্পষ্টরূপে মুদ্রিত হইয়াছে। অবশ্য খোদাইকার বা লেখকের ভ্রম প্রচুর পরিমাণেই পরিলক্ষিত হয় এবং তদ্দরুণ পরিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধার কার্য্যও বিষম কষ্টকর ব্যাপারে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

এই অনুশাসনে চন্দ্ররাজ বংশোদ্ভব শ্রীচন্দ্রদেবের রাজত্বের উল্লেখ আছে। উত্তরবঙ্গে পাল রাজত্বের শেষভাগে ও পূর্ব্ববঙ্গে বর্ম্মণ ও সেন রাজগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে ইঁহারা পূর্ব্ববঙ্গে কতিপয় শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহা দশম-একাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালা অক্ষরে খোদিত। কেবল মুদ্রাকরের ভ্রমাত্মক অংশ ব্যতীত সমুদয় উৎকীর্ণ বিবরণটী বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় ও পদ্যে লিখিত। শেস তিন পংক্তি গদ্যে লিখিত।

বর্ণশুদ্ধি বিদ্যা সম্বন্ধে ইহাতে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই নাই। পূর্ব্ব ভারতীয় গৃহগাত্রোৎকীর্ণ লিপিতে "ব" এর পরিবর্ত্তে "ব" লেখাই একরূপ রীতি ছিল এবং আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার ন্যায় এতদুভয়ের ব্যবহারে তখন কোনও বৈষম্য—করা হইত না। "অবগ্রহ" কখনও ব্যবহৃত কখনও বা পরিত্যক্ত হইয়াছে। অনুস্বার সম্বলিত "নিস্ত্রিংশ" শব্দের বর্ণবিন্যাস উল্লেখযোগ্য। ´ (রেফ্) অধিকাংশ স্থলেই ব্যঞ্জনবর্ণকে দ্বিত্ব করিয়াছে।

"ঢাকা রিভিউ"তে প্রকাশিত ইদিলপুরের শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনের সহিত বর্ত্তমান তাম্রশাসনের তুলনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে উভয় তাম্রফলক একই মুসাবিদার প্রতিলিপি। ইদিলপুর তাম্রশাসনের শেষভাগে শ্রীচন্দ্রের

রামপাল তাম্রশাসন হইতে গৃহীত একটী শ্লোক অতিরিক্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে ; এতদ্ব্যতীত উহার প্রতিলিপি ইদিলপুর ও কেদারপুর তাম্রশাসন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এস্থলে ইহা প্রণিধান যোগ্য যে তিন খানি তাম্রশাসনেরই আবাহন শ্লোক অভেদাত্মক।

এ পর্য্যন্ত যে তিনখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে উহার প্রত্যেক খানিই শ্রীচন্দ্রের নামাঙ্কিত কাজেই মনে হয় তিনিই চন্দ্রবংশের একমাত্র প্রতাপশালী রাজা যিনি তাম্রশাসন প্রদানের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার ইতিহাস সঙ্কলনের নিমিত্ত যে সমস্ত অনুলিপি উপকরণ পাওয়া যায় তাহা একত্র সংগৃহীত করিবার অভিপ্রায়ে ঢাকারিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত বাবু গঙ্গামোহন লস্করের ইদিলপুর অনুশাসনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতে আবশ্যক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাম্রশাসনখানি এখনও বর্ত্তমান আছে বলিয়া শোনা যায় কিন্তু উহা যাহাদের হেফাজতে আছে তাহারা পুনরায় উহা অন্য কাহাকেও দেখাইতে অনিচ্ছুক।

"অনুশাসনে তিন জন রাজার নাম খোদিত আছে—(১) সুবর্ণচন্দ্র (২) তাঁহার ছেলে ত্রৈলোক্যচন্দ্র (৩) ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র (শ্রী) চন্দ্রদেব। এই রাজাদের মধ্যে শেষোক্ত রাজা সতত পদ্মাবতী ভুক্তির অধীন কুমারতালকা মণ্ডলে অবস্থিত লেলিয়াগ্রামে কতক জমি দানের আদেশ বিক্রমপুর ছাউনি হইতে প্রদান করেন। সতত পদ্মাবতীর আক্ষরিক অর্থ 'তীর সমাহিত পদ্মার ঘর' এবং খুব সম্ভবতঃ পদ্মার তীরে অবস্থিত কোন ভুক্তির নাম ছিল। কোন দান গৃহীতার নাম এখনও পড়া যায়, এবং আসরাফ্‌পুর অনুশাসনের ন্যায় পরিমাপ কাঠিকে দানের ভূমির দ্রোণ এবং পাটক নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সার্ব্বভৌমিকত্ব সূচক উপাধি যথা পরমেশ্বর, পরমভট্টারক এবং মহারাজাধিরাজ (শ্রী) চন্দ্রদেবের নামের সহিত সংযোজিত হইয়াছে। পরমসৌগত (সৌগত বুদ্ধের অতি ভক্ত পূজক) উপাধি দাতার নামের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইয়াছে। ১২ শ শতাব্দীর বাংলা অক্ষরের অনুরূপ লিপি সম্ভবতঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। অনুশাসনের উর্দ্ধভাগের মোহর বঙ্গদেশের পালরাজাদের অনুশাসনের মোহরের অনুকৃতি।

মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ বিজিত হইবার কিছু পূর্ব্বে বৌদ্ধ রাজত্ব যে পূর্ব্ববঙ্গে বর্ত্তমান ছিল আসরাফপুরের দেবখড়্গ অনুশাসনের ন্যায় বর্ত্তমান আলোচনার বিষয়ীভূত অনুশাসনখানি তাহার পরিচয় দেয় তজ্জন্য এই অনুশাসন খানি অতি প্রয়োজনীয়।

অনুশাসনখানি একদিকে সম্পূর্ণভাবে খোদিত বিপরীত দিকে কতকাংশ খোদিত। বিপরীত দিকের লেখা প্রায় মুছিয়া গিয়াছে। লুপ্তপ্রায় অংশে দান গৃহীতার নাম ও জমির পরিচয়। সর্ব্বসাকুল্যে ৩৬ লাইন লেখা ইহাতে আছে।

পংক্তি ১—৪ সম্ভবতঃ বুদ্ধের সম্মানের জন্য এক পংক্তি পদ্য। পংক্তি ৪—৫ সুবর্ণচন্দ্র নামে এক রাজা যাহাকে অগ্নিদ্বারা পবিত্রীকৃত কিংবা তুলাদণ্ডে ওজন করা হয় নাই যিনি প্রকৃতি কর্ত্তৃক মহত্ব দ্বারা ভূষিত হইয়াছিলেন যাহার কার্য্য সকল সাধু ছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

পংক্তি ৫—৬ রাজাকে কেন সুবর্ণচন্দ্র বলা হইত ইহা পদ্যে বলা হইয়াছে।

পংক্তি ৬—৯ উপরিলিখিত রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্র নামে এক পুত্র লাভ করিয়াছিলেন তিনি পবিত্র দর্শন ছিলেন—তাঁহার পরলোকের ভয় ছিল—তিনি জীবজগতের সান্ত্বনা স্বরূপ ছিলেন ত্রিভুবনে তাঁহার যশস্বী কার্য্যাবলী সকল সর্ব্বত্র বিদিত ছিল।

পংক্তি ৯—১০ সেই রাজা সম্বন্ধে আরও কতকগুলি শব্দ—তিনি সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া আশা পূরণ করিয়াছিলেন এবং তাহার শত্রুদের অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়াছিলেন।

পংক্তি ১১—১৩ ত্রৈলোক্যচন্দ্র দেব সম্বন্ধে আরও কতকগুলি প্রশংসাসূচক (শব্দ) বাক্য।

পংক্তি ১৪—১৫ উপরিউল্লিখিত রাজার (শ্রী) চন্দ্র নামে এক পুত্র ছিল। তিনি ইন্দ্রের সমতুল্য ছিলেন এবং তাঁহার বীর্য্য ইন্দ্রের ন্যায় ছিল এবং তিনি শুভ মুহূর্ত্তে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্ম সময়ে শুভ চিহ্ন সকল রাজৈশ্বর্য্য দ্যোতক ছিল।

পংক্তি ১৫—১৮ (শ্রী) চন্দ্রদেব সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশংসা বাক্য।

পংক্তি ১৮—১৯ বিক্রমপুর স্থিত বিজয়বাহিনী ছাউনী হইবে।

পংক্তি ২০ সৌগতের (বুদ্ধের) ঐকান্তিক পূজক পরমভট্টারক পরমেশ্বর মহারাজাধিরাজ ত্রৈলোক্য চন্দ্র দেব পাদপদ্ম ধ্যানকারী পুত্র।

পংক্তি ২১ মহারাজাধিরাজ শ্রীমান শ্রীচন্দ্র দেব সুস্থ শরীরে লেলিয়া গ্রামে সমবেত নিম্নলিখিত রাজকীয় কর্ম্মচারিবৃন্দ ও গ্রামবাসীদিগকে সম্মান করিয়া—

পংক্তি ২২ সতত পদ্মা ভুক্তিতে অবস্থিত কুমারতালকা মণ্ডলে

পংক্তি ২৮ এইরূপে উপরিউল্লিখিত কর্ম্মচারিবৃন্দকে আদেশ দিতেছেন।

পংক্তি ২৯—৩০ দান গৃহীতাদের নাম লেখা আছে।

বর্ত্তমান কেদারপুর অনুশাসনের নিম্নে সংক্ষিপ্ত পরিচয় :— বৌদ্ধমতাবলম্বীদের ত্রিরত্ন বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্গ অভিবাদন প্রণাম (নমস্কার) করিয়া অনুশাসনখানি আরম্ভ হইয়াছে। ইহার পর বর্ণিত হইয়াছে পূর্ণচন্দ্র নামে একজন লোক ছিলেন—তাঁহার বহু সৈন্য সামন্ত ছিল। তিনি রাজবংশ সম্ভূত ছিলেন না কিন্তু কোন উচ্চ বর্ণে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সুবর্ণচন্দ্র (স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল) পবিত্র নামে এক পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। সুবর্ণচন্দ্র ধার্ম্মিক লোক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র ছিল। ত্রৈলোক্যের দেশ জয় বহুদূর বিস্তৃত ছিল এবং তিনি তাঁহার শত্রুগণের ভীতি উৎপাদক ছিলেন (v5) ত্রৈলোক্যের পুত্র শ্রীচন্দ্র—তিনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন। (v6) তিনি প্রসিদ্ধ বিজয়ী ছিলেন—তাঁহার যুদ্ধ খ্যাতি স্বর্গে পৌঁছিয়াছিল। (v7) এই শেষ রাজা শ্রীচন্দ্রদেব যাহার শ্রীবিক্রমপুরের বিজয়ী ছাউনী হইতে এই অনুশাসন খানি প্রদান করিবার কথা ছিল—এই পর্য্যন্ত আসিয়া অনুশাসন লিপি সমাপ্ত হইয়াছে।

ঢাকা যাদুঘরে সংরক্ষিত তাম্র-শাসনের খোদিত লিপির পাঠোদ্ধার

মোহর —।

শ্রীচন্দ্রদেব [ঃ।]

১। সিদ্ধিরস্তু স্বস্তি। বন্দ্যো জিনঃ স ভগবান্ করুণৈক পাত্রং

২। ধম্মো[১]প্যসৈ[২] বিজয়তে জগদেকদীপঃ [।*] যৎসেবয়া

৩। সকল এব মহানুভাবঃ সংসার পারমুপগচ্ছতি ভিক্ষুসজ্ঘঃ॥ [১*] পূর্ণ-

৪। চন্দ্র ইতি শ্রীমানাসীন্নাসীরজং রজঃ। যস্যোষষ[৩] য়োষংৎবৃ [৩] মাতপত্রমপত্র

৫। পাঃ[৪] [২*] নাগ্নৌ বিশুদ্ধো ন তুলাধিরূঢ়ঃ কিন্তু প্রকৃত্যৈব যুতো গরিম্না। তথাপি ক-

৬। ল্যাণসুবর্ণকল্পঃ সুবর্ণচন্দ্রস্সুকৃতী ততোভূৎ॥ [৩*] পুণ্যাবলোকঃ পরলো-

৭। কভীরোর্লোক্যঃ সমাশ্বাসিত জীবলোকঃ [।*] ত্রৈলোক্যসংকীর্ত্তিতপুণ্যকীর্ত্তেঃ ত্রৈ-

৮। লোক্যচন্দ্রোঽস্য ব(ব)ভুব পুত্রঃ॥ [৪*] চতুঃপয়োরাশি সমাপ্তপৃথ্বীজয়াভিলাষোবি-

(১) পাঠ—ধর্ম্মো। (২) পাঠ—সৌ। (৩) পাঠ—প। (৪) পাঠ—ষি। [এই ভ্রমাত্মক পাদ যথোপযুক্তরূপে ব্যাখ্যাত হয় নাই। "ষ"এর পর "বৃ" অক্ষরটী মুদ্রিত হয় নাই। যদিও আমি স্থিরনিশ্চয় নহি

৯। যয়েত্বলুব্ধঃ [।*] যুদ্ধেষু নিস্ত্রিংশলতাজলেন যো বৈরিবহ্নিং স° ময়াঞ্চকার ॥[৫]
১০। শ্রীমান্ শ্রীচন্দ্রদেবঃ সমজনি তনয়স্তস্য সদ্বর্ত্ত্ব (ব) ন্ধোঃ ক্রূরারম্ভে স'য়ালুঃ
১১। পরগুণমুখরো দোষবাদৈকমূকঃ [।*] প্রেক্ষ্যঃ পীনো গুণানাং নিধিরিতি
১২। বিষয়াসক্তিপক্ষাদ্বিপক্ষে যস্মিনা(ন্না)ধত্ত বেধা[৮] শ্রিয়মতিরভসাদর্থতো না-
১৩। মতশ্চ ॥ [৬*] স্পৃষ্টঃ পার্থিবপাংস্তদোহর সল্লঘাঘনদিগ্নজৈ[৯] র্নেত্রাণামনিমে-
১৪। ষতঃ পরিহৃতো দূরেণ বৃন্দারকৈঃ [।*] কেশেষ্বপ্সরসামপূর্ব্বপলিতভ্রান্তিং
১৫। সমারোপয়ন্ সন্তানো রজসাং রণেষ্ব[১০]ষু জয়িনো যস্য দ্যুমার্গং গতঃ ॥ [৭*]
১৬। স খলু শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাত্ পরমসৌগতো
১৭। মহারাজাধিরাজঃ শ্রীত্রৈলোক্যচন্দ্রদেবপাদানুধ্যাতঃ পরমেশ্বরঃ প—
১৮। রমভট্টারকো মহারাজাধিরাজঃ শ্রীমান্ শ্রীচন্দ্রদেবঃ কুশলী।

আমার মনে হয়—সম্ভবপর পাঠ এইরূপ হইবে—"যস্মা (দ্দ্বি) ষ [ঃ*] সি [যে*] ধুঃ [স্ব] এবং ইহার এইরূপ অনুবাদ করিতেছি :—"যাহার (ধুলি) ভয়ে শত্রুবর্গ (রাজন্যবর্গ) সমস্ত লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার ছত্রতলে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

(৫) পাঠ—পং। (৬) পাঠ—শ। (৭) পাঠ—দ। (৮) পাঠ—বেধাঃ। (৯) এই পংক্তিটীর এইরূপ পাঠোদ্ধার করা গেল :—স্পৃষ্টঃ পার্থিবপাংশুদোহদরসল্লাঘাধনৈর্দিগ্‌গজৈঃ।

(১০) স্ব—বাদ হইবে।

অনুবাদ।

১ পংক্তি। সিদ্ধি লাভ হউক। মঙ্গল হউক।

১ম শ্লোক। করুণার একমাত্র পাত্র, ভগবান্ জিন বন্দ্যনীয়। জগতে একমাত্র আলোক ধর্ম্মেরই জয় হয়। ইঁহাদের উপাসনা করিয়া উদারচেতা ভিক্ষু সঙ্ঘ পরপারে চলিয়া যান।

২য় শ্লোক। ভাগ্যদেবীর বরপুত্র পূর্ণচন্দ্র নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার যুদ্ধ বাহিনী উত্থিত ধূলিকণায় চন্দ্রাতপের সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই পূর্ণচন্দ্রকে সূর্য্যদেবের পত্নী সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

৩য় শ্লোক। (সুবর্ণ ও রাজার ন্যায়) অগ্নিদ্বারা শুদ্ধীকৃত অথবা তুলাদণ্ডে তৌলিত না হইয়াও প্রকৃতি দত্ত মহত্ত্ব থাকায় তাঁহা হইতে সুবর্ণ দীপ্তি বিশিষ্ট সুবর্ণ চন্দ্রের উদ্ভব হইল।

৪র্থ শ্লোক। পরলোক পাপভীত, ত্রিভুবনবিদিত যশস্বী সুবর্ণ চন্দ্রের পুণ্যদর্শন, সুশ্রী ও মানবজাতির সান্ত্বনাদায়ক ত্রৈলোক্যচন্দ্র নামে এক পুত্র ছিল।

৫ম শ্লোক। বিষয়ে অনাসক্ত হইলেও চতুঃসাগর বেষ্টিত এই পৃথিবী-জয়াভিলাষী হইয়া তিনি জলদ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপণের ন্যায় যুদ্ধে তরবারীদ্বারা শত্রু নিপাত করিয়াছিলেন।

৬ষ্ঠ শ্লোক। সাধুজনের বন্ধু এই ত্রৈলোক্য চন্দ্রের শ্রীচন্দ্রদেব নামে মহা সৌভাগ্যশালী এক পুত্র জন্মিয়াছিল। তিনি সকলের প্রতি এমন কি ক্রূরকর্ম্মাদের প্রতিও দয়ালু, পরগুণকীর্ত্তনকারী, পরের দোষ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্ব্বাক ছিলেন। তাঁহার প্রিয়দর্শন সুগঠিত দেহ সর্ব্বগুণের আধার ছিল। জাগতিক সর্ব্ব বিষয়ে অনাসক্ত ইঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্ নামে ও কার্য্যতঃ "শ্রী" অর্থাৎ লক্ষ্মীযুক্ত করিয়াছিলেন।

৭ম শ্লোক। সমরজয়ী সেই নৃপতি যে ধূলিরাশি উত্থিত করিয়াছেন, দিঙ্‌নাগগণ সেই ধূলিপটলের সংস্পর্শলাভজনিত গর্ব্ব অনুভব করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। দেবতাগণ দূর হইতেই সেই পাংশুজাল পরিহার করিয়াছিলেন,—কেননা, তাঁহাদের লোচন নিমেষশূন্য (সুতরাং তাঁহারা লোচন নিমীলিত করিতে অসমর্থ)। সেই রজোরাশি আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া অপ্সরোগণের কেশে সংলগ্ন হইয়াছিল এবং বার্দ্ধক্যবশতঃ তাঁহাদের কেশ শুভ্রবর্ণ হইয়াছে, এই অপূর্ব্ব ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়াছিল।

১৬—১৮ পংক্তি :—পরম সৌগত (সৌগত—সুগতের উপাসক, বৌদ্ধ,) মহারাজাধিরাজ, পরমেশ্বর, পরম ভট্টারক (প্রজাগণের রক্ষাকর্ত্তা), শ্রীমান্, কুশলী চন্দ্রদেব শ্রীত্রৈলোক্যচন্দ্র দেবের পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া থাকেন। তাঁহার সমৃদ্ধিশালী (শ্রীমৎ) রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর হইতে—

উত্তরবিক্রমপুরের জন-সংখ্যা

ক্রমিক নম্বর	গ্রামের নাম	প্রত্যেক গ্রামের বাড়ী বা ঘর মোট সংখ্যা	প্রত্যেক গ্রামের মোট স্ত্রী পুরুষ লোক সংখ্যা	থানা	মুসলমান		হিন্দু	
					পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
১	দিঘলী	৬১৩	২৬৫২	লৌহজঙ্গ	২৯১	৩৮১	৯৭৪	১০০৬
২	বেজগাঁও	৭৬৪	৩৬৩০	ঐ	৩৭৩	৩৬৩	১৩৬০	১৫৩৪
৩	হুয়াল্লী	৩২৫	১৩৬১	ঐ	৩৩০	৪৩১	৩০৪	২৯৬
৪	গাউপাড়া, গাউতলি	১০৫৩	৪৩৯০	ঐ	১৩৭০	১৮০৭	৫৫৮	৬৫৫
৫	গাওদিয়া	৭০৮	৩৫০০	ঐ	৯৭১	১০৭৮	৬৪৪	৮০৭
৬	ধানকুনিয়া	৪৭৭	১৬০৩	ঐ	১৮৫	৭৬	৮০৩	৫৩৯
৭	ব্রাহ্মণগাঁও	৩১৬	১৫৩০	ঐ	১৩৯	১৮০	৫৮০	৬৩১
৮	যশলদিয়া, রুশরা, বিলকুলিয়াণী	৬৩৯	২৬৮৪	ঐ	১০৬৬	১২৬৮	১৬৬	১৮৪
৯	কাজিপাড়া	৫৪৮	২৮২১	ঐ	৮৪৯	৮৪২	৫৬৭	৫৬৩
১০	সাতথরিয়া	৫২৪	২৩৮০	ঐ	৫৯৯	৮৫১	৪১৯	৫১১
১১	শিমুলিয়া	৫৬০	২৬৩৭	ঐ	৬৫৬	৭১৩	৬৩৩	৬৩৫
১২	নাগেরহাট	৫২৮	২৬৬৪	ঐ	৪৯৭	৫০৮	৭৪৫	৯১৪
১৩	কুড়িগাঁও, আটীগাঁও	৪৪১	১৮২০	ঐ	৭৭১	৮২০	১০৩	১২৬
১৪	বৌলতলি, সেরপাড়া	৪০৪	২০১৩	ঐ	৬১০	৬৭০	৩১৬	৪১৭
১৫	পূর্ব্ব নওপাড়া	২৩৯	১৩২৫	ঐ	৩৫০	৪০১	২৭৮	২৯৬
১৬	ক্ষিতীরপাড়া	৪৪৮	১৯৪০	ঐ	৫৭৯	৫৯৭	৩০৩	৪৬১
১৭	ধাইরপাড়া	৮০	৪৬৬	ঐ	১২	৮	১৯২	২৫৪
১৮	বাসুদিয়া	২৯৬	১৪২৫	ঐ	৩৮৪	৩৯৩	২৯৯	৩৪৯
১৯	সংগ্রামবিল	১০৬৯	৫২৬১	ঐ	১৫৯৯	১৪০২	১১০১	১১৩৯
২০	কালিকট	৬৫৫	২২৬৫	ঐ	৬৭৯	৮৩৯	৩২৫	৪২২
২১	তেওতা	৩৫০	১২৯২	ঐ	৪৪১	৫৫৫	১৩৪	১৬২
২২	তেঁতুলিয়া	৭৫০	৩০৯৪	ঐ	৮৬৭	৯৪৮	৫৯০	৬৮৯
২৩	উত্তর কুমারভোগ দক্ষিণ কুমারভোগ							
২৪	তারপাশা ষ্টেশন	৬৪৪	৪২৯৯	ঐ	২০৩৬	১৮৬৭	১৯৩	২০৩
২৫	মাওয়া	১৬০	৬৩২	ঐ	১১২	১১৮	১৯০	২১২
২৬	উত্তর মেদিনী মণ্ডল দক্ষিণ মেদিনী মণ্ডল	৮৪৭	৪৬৩৮	ঐ	১১৮৭	১৫৫৮	৮৯৫	৯৯৮

ক্রমিক নম্বর	গ্রামের নাম	প্রত্যেক গ্রামের বাড়ী বা ঘর মোট সংখ্যা	প্রত্যেক গ্রামের মোট স্ত্রী পুরুষ লোক সংখ্যা	থানা	মুসলমান		হিন্দু	
					পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
২৭	সুন্ধিসার	৫৯	৭৯৮	লৌহজঙ্গ	১৭৫	২০১	২০০	২২২
২৮	রাজাবাড়ী, দিঘীরপাড় ·	৪৩৯	২০৮৮	ঐ	৩৬৮	৩৭৯	৬৩৩	৭০৮
২৯	পাঁচগাঁও ·	৪৫২	২১৯৩	ঐ	৩৪৩	৩৩৩	৭২৩	৭৯৪
৩০	আটপাড়া (বজ্রযোগিনী)·	৩৫১	১৬৩৪	মুন্সীগঞ্জ	২২০	২৪৬	৫৪৪	৬২৪
৩১	বজ্রযোগিনী ·	৫৪০	২২৬১	ঐ	২৭৪	১২৬	৮৭০	৯৯১
৩২	মুন্সীগঞ্জ ·	৩৪৬	১৯৩৩	ঐ	২৭১	১৬৯	৮৩৩	৬৭০
৩৩	সুখবাসপুর	৩৩৯	১৮৬৪	ঐ	৫১৭	৫০৫	৪২০	৪২২
৩৪	রামপাল, কালাজীপাড়া ·	৩৬৬	১৯২৯	ঐ	৮৯৪	৮১০	৭৪	৯১
৩৫	চাঁপাতলী ·	২৪০	১৫১৯	ঐ	৮৩	৯০	৬৪৪	৭০২
৩৬	কাঁটাখালি, কাটাগাঁও ·	৩৩৩	১৬৫২	ঐ	৫৩২	৪৪৬	৩৬৩	৩১১
৩৭	সুয়াপাড়া ·	৪৫৭	২২৮৮	ঐ	২৫৩	২৯৯	৮৫৪	৮৮২
৩৮	ধামদা ·	৩০৫	১৫৩৫	ঐ	১৮৯	১৭৪	৫৭৬	৫৯৬
৩৯	চূড়াইন, (মুন্সীগঞ্জ)·	৪৯৭	২২৮৯	ঐ	৫৩৫	৫২৮	৫৮৪	৬৪২
৪০	নাহাপাড়া ·	২৭২	১৪৬৭	ঐ	২৮	.২১	৬৯৫	৭২৩
৪১	মহাকালী ·	৭৮৩	৪৩৪৪	ঐ	১৫৯০	১৫৫২	৫৮৫	৬১৭
৪২	কেওয়ার	৫৪০	২৯৫৭	ঐ	১২৬৩	১২১৪	২৫৩	২২৭
৪৩	বিনোদপুর	২৬৮	১৬০৬	ঐ	২৮৬	২৯৫	৪৫০	৫৭৫
৪৪	রামগোপালপুর	৩৮১	১৭১৮	ঐ	৫৬৫	৫৭৭	২৭৮	২৯৮
৪৫	পঞ্চসার ·	২০৩৩	৮৬২৪	ঐ	২২৬২	২০৭৭	১৯৮৫	২৩০০
৪৬	পানাম	৩৯৬	২০২২	ঐ	৬১০	৫৯১	৪০৯	৪১২
৪৭	জোড়ার দেউল	৪৮৮	২৯২৫	ঐ	৯৪৫	১০১৯	৪৬০	৫০১
৪৮	দেওভোগ	৬৪৮	৩৬৫৪	ঐ	৮৮৫	৯০০	৮৯০	৯৭৯
৪৯	রন্‌সিং	৩৮২	১৮৭৬	ঐ	৮০৯	৭৫৬	১৪৭	১৬৪
৫০	ফিরিঙ্গী বাজার, পুরাণ বাজার ·	৩২৩	১৮৯৮	ঐ	৩০০	৩০২	৮০৪	৪৯২
৫১	বিলিহোগ্‌লা	৪৩৭	২০২৮	ঐ	৯৯২	১০৩৬	×	×
৫২	ভাসানচর	৫০৪	২৩৭১	ঐ	৭৬০	৮৫৫	৩৪২	৪১৪
৫৩ ৫৪	মাকোহাটি বাজার · ও মহেশপুর	৪৫৫	২২১৭	টঙ্গিবাড়ী	৭১৭	৬৮৬	৪২০	৩৯৪
৫৫	টকি	২৬০	১৪৯২	ঐ	৬৯৯	৬৫৪	৬৫	৭৪
৫৬	কাজিরকস্‌বা	৩৭০	১৮৪৬	ঐ	৯১৩	৯৩৩	×	×

ক্রমিক নম্বর	গ্রামের নাম	প্রত্যেক গ্রামের বাড়ী বা ঘর মোট সংখ্যা	প্রত্যেক গ্রামের মোট স্ত্রী পুরুষ লোকসংখ্যা	থানা	মুসলমান পুরুষ	মুসলমান স্ত্রী	হিন্দু পুরুষ	হিন্দু স্ত্রী
৫৭	কল্‌কা গোবিন্দপুর							
৫৮	বল্লালবাড়ী	৫২২	২৬২৮	ঙ্গবাড়া	১১৮৪	১০৭৮	২০৩	১৬৩
৫৯	শাঁখারীবাজার							
৬০	আমতলী	৪৬৬	১৮৬৬	ঐ	২৮৯	২৮৬	৫৬৮	৭২৩
৬১	পুরাপাড়া	৩৫০	১০৫০	ঐ	১০০	১৫০	৩৯০	৪১০
৬২	আউটসাহী							
	ও	৮৩৯	৪১৯৯	ঐ	৫৫৬	৫৭৫	১৪২৮	১৬৪০
৬৩	নোয়াদ্দা							
৬৪	কাইচাইল	৩২০	১৫০০	ঐ	৩৫০	৩০০	৪৭০	৩৮০
৬৫	বালীগাঁও	৪৪৭	১৭৪০	ঐ	৫৪৬	২২৬	৪৩৯	৫৩১
৬৬	আরিয়ল	৬১৭	২৪৫৫	ঐ	৬২৮	৬৯১	৫০৯	৬২৭
৬৭	কল্‌মা	৯৪৯	৩৩৩০	ঐ	৯৩৫	৯৯৫	৬৯০	৭১০
৬৮	ভরাকর	১০৯১	৪৪২৬	ঐ	৯৪০	১১৩০	১০৫০	১৩০৬
৬৯	টঙ্গিবাড়ী	২৫০	৯৪৮	ঐ	১৪	২৪	৪২০	৪৯০
৭০	নাটেশ্বর	৯৭	৪২১	ঐ	১২১	১৩১	৮৩	৮৬
৭১	সোনারং	৮৯৪	৪০১৮	ঐ	১০১৪	১০৬১	৯৩০	১০১৩
৭২	পাইকপাড়া	১৩৩৮	৬৪৮৫	ঐ	৮৪৪	৮৫৮	২০৭৭	২৭০৬
৭৩	আবদুল্লাপুর	৪৫৮	১৮৯২	ঐ	৩	×	৮৯৪	৯৯৫
৭৪	খিলপাড়া	২৫৪	১০৯৮	ঐ	৪০১	৪০৪	১২৫	১৬৮
৭৫	কান্দাপাড়া	২১০	৭০১	ঐ	২০২	১৯৯	১১৫	১৮৫
৭৬	দক্ষিণ বেতকা	৩৫৬	১৯২৫	ঐ	৪০১	৩৯৪	৫৩৫	৫৯৫
৭৭	উত্তর বেতকা	৪৭৩	২৬৬৪	ঐ	৬২৫	৫৫৮	৬৮৬	৭৯৫
৭৮	বিন্দুসার	১৬৫	৬৮২	ঐ	২৮০	৩২০	৩৭	৪৫
৭৯	ভাটপাড়া	৫০১	২৪০৩	ঐ	৭০৪	৭৬৮	৪৩৭	৪৯৪
৮০	বাইনখাড়া	৪৩৩	২১৬৮	ঐ	৭৮৫	৮৪২	২২৭	৩১৪
৮১	কাঠাদিয়া							
৮২	শিমুলিয়া	৯২৮	৫২৬১		১৩৫৬	১৪১৩	১১৬৮	১৩২৪
৮৩	দ্দী							
৮৪	ধাইদা	৭১৩	২৭১১	ঐ	৯৮৭	১২৯৪	২০০	২৩০
৮৫	চাঠাতিপাড়া	১৩৫	৫৩৬	ঐ	১৪০	১৩০	১১৮	১৪৮
৮৬	নয়ানন্দ	৪৭৬	২৪৬০	ঐ	৫৭৬	৬৩৭	৫৫৮	৬৮৯

ক্রমিক নম্বর	গ্রামের নাম	প্রত্যেক গ্রামের বাড়ী বা ঘর মোট সংখ্যা	প্রত্যেক গ্রামের মোট স্ত্রী পুরুষ লোক সংখ্যা	থানা	মুসলমান		হিন্দু	
					পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
৮৭	ঝুলিহাটা	৪৭২	২৩০৮	টঙ্গিবাড়ী	১০০৭	১০৭২	১১৪	১১৫
৮৮	ধীপুর	৬৩৪	৩২২৭	ঐ	৫৪৯	৪৬৬	৯৯০	১২২২
৮৯	ধামারণ	৪২২	২৪২৭	ঐ	৫৭৪	৪২৩	৬৩৮	৭৯২
৯০	হাটখাড়া	৩১৩	১৬৮৫	ঐ	৬৮৯	৬১৬	২১২	১৬৮
৯১	ছোট কেওয়ার	২০১	৯৬৭	ঐ	৩৫৮	৪০৬	৯৬	১০৭
৯২	সেরাজাবাদ	৫৬৫	২৮২৯	ঐ	৫০৫	৫৬৪	৮৩৭	৯২৩
৯৩	পুড়া	৪৭৩	১৯২৬	ঐ	২০১	২২৯	৬৯০	৮০৬
৯৪	বাঘিয়া	৩৪৪	১৭২৭	ঐ	১৪৮	১৫৪	৬৫৬	৭৬৯
৯৫	নয়না	২৫৯	১৩৭১	ঐ	১৩৬	১৩৯	৫৪০	৫৫৬
৯৬	মান্দ্রা	২২০	১২৫২	ঐ	৪০৪	৪১০	১৮৫	২৫৩
৯৭	নশঙ্কর	৩৬২	১৭৪৬	ঐ	২২৬	২৫৮	৫৪০	৭২২
৯৮	কামারখাড়া (স্বর্ণগ্রাম)	৮৩৩	৩৮২২	ঐ	৫৬০	৬৪৭	১২৩৬	১৩৭৯
৯৯	মুলচর	৭৫৭	৩৪৯৬	ঐ	৮৬৩	৯৪৮	৭৩৫	৯৫০
১০০	পয়সাগাঁও	৩৫৩	১৫২৪	ঐ	২৬২	৩৩৫	৪০৪	৫২৩
১০১	বানরি	৬৪৯	৩১১৬	ঐ	১২২৯	১২২৭	২৯৮	৩৬২
১০২	হাসাইল	৪৮১	২২২৫	ঐ	৪৪৪	৫২৫	৫৭৩	৬৮৩
১০৩ ১০৪	বেড়পাড়া বাহেরক	৪২২	১৮২৮	ঐ	৪৬১	৩৯০	৫৬১	৪১৬
১০৫	বাঐসার	২৮৫	১২২৩	লৌহজঙ্গ	২১৭	২৯৯	৩২২	৩৮৫
১০৬	মরিচাঙ্গ	৫৪৬	২৬২২	সেরাজদীঘা	৯০৩	৮২৯	৪৩৮	৪৫২
১০৭	ভাগুিগাঁও	৪৭৪	২০৩৭	ঐ	৪২২	৪১০	৬৪০	৫৬৫
১০৮	শূলপাড়া, আট্টিগাও	৫৩২	১৫৫০	ঐ	২৯০	৩৯৭	৩৫০	৫১৩
১০৯ ১১০	খালপাড় চিত্রকোট	৬০৮	৩৪২৯	ঐ	৯৬৭	১০০৪	৬৯০	৭৬৮
১১১	শেখেরনগর	৭২১	৩১০৪	ঐ	১০৮	৭৫	১৩২৬	১৫৯৫
১১২	টেঘরিয়া	৩৩০	১৬১৫	ঐ	৪৫৯	৫২১	২৯৫	৩৪০
১১৩	রাজানগর	৫২৭	২২১১	ঐ	৩৩৮	২৮৫	৮০৭	৭৮১
১১৪	নয়ানগর	৪৮৪	২১২৯	ঐ	৩৩৪	৩৯১	৬৮৪	৭২০
১১৫	কাজীশাল	[illegible]	[illegible]	ঐ	৩৯২	৩৯৩	১১২২	১২৯৫

ক্রমিক নম্বর	গ্রামের নাম	প্রত্যেক গ্রামের বাড়ি বা ঘর মোট সংখ্যা	প্রত্যেক গ্রামের মোট স্ত্রী পুরুষ লোক সংখ্যা	থানা	মুসলমান		হিন্দু	
					পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
১১৬	টোলবাসাইল	৬৬৫	৩৪৬১	সেরাজদীঘা	৬৬৮	৭০২	১০২৮	১০৬৩
১১৭	বেজেরহাটী	৪৩১	১৯৩৩	ঐ	৫৯৫	৩২০	৫১৪	৫০৪
১১৮, ১১৯	বয়রাগাদী, গোবরদী	৬৫২	৩৬১১	ঐ	৫০৫	৪৬১	১২৪৩	১৪০২
১২০	ফুরসাইল	৬৩৩	২৬৫৬	ঐ	৪৫১	৩৩১	৯৬৬	৯১৮
১২১	কাজীরবাগ	১০০	৫৬৭	ঐ	১৫১	২৯৫	৫৬	৬৫
১২২	ফেগুনাসার	৩৬৩	২১৪৬	ঐ	২০৪	২২৭	৭৯০	৯২৫
১২৩	মালখাঁনগর	২০০	১৪৭৫	ঐ	৩৬৭	৩৫০	৩৫০	৪০৮
১২৪, ১২৫	মালপদিয়া, তেলিপাড়া	৬৪৬	৪০৫৩	ঐ	৪৩২	৪২৯	১৪৯৫	১৬৯৭
১২৬	চোরমর্দ্দন	৫৯১	২৫৮৬	ঐ	৪২৯	৪৬৩	৭৭৬	৯১৮
১২৭	থৈরগাঁও	১৫০	৭২৬	ঐ	৫৭০	১৮	২২১	৪৩০
১২৮	বাহেরকুচি, খালদি	৩১১	১৭১৭	ঐ	৪১৯	৪৪৫	৩৯৩	৪৬০
১২৯	শিয়ালদী	৫৬৩	৩২৮০	ঐ	১০৭৫	১১৪৬	৪৯১	৫৬৮
১৩০	মধ্যপাড়া	৬২৪	৩৩৭৮	ঐ	৫৮৯	৬১১	৯৯৯	১১৭৫
১৩১, ১৩২	ভুইরা, পাত্রৈলদিয়া	৪৪০	২২০৬	ঐ	১৭৭	১৮৫	৯১৩	৯৩১
১৩৩	পান্‌সা, কৃষ্ণনগর, সিঙ্গারদক	৫৭১	২৬১৫	ঐ	৯৮৯	১১৬৩	২২৫	২৩৮
১৩৪	রাজদীয়া	৪৯৭	২৯০৫	ঐ	৭৬৮	৭৯১	৬৪১	৭০৫
১৩৫	উত্তর হল্‌দিয়া	৫১২	২৪৩৩	লৌহজঙ্গ	৩১৫	২৮৫	৯২৯	৯০৪
১৩৬	দক্ষিণ হল্‌দিয়া	৪২৯	২১৫৬	ঐ	৭৩০	৮১৮	২৫৬	৩৫২
১৩৭	কনকসার	৫৩৯	২৩১৯	ঐ	১৮৩	২৮১	৮১৪	৯৪১
১৩৮	কাঁঠালতলি	১৪০	৯৩৬	সেরাজদীঘা	৩৯৮	৪২৯	৪৪	৬৫
১৩৯	খিলগাঁও	৩০০	১২২৭	ঐ	২৮৪	২৬৪	৩৩২	৩৪৭
১৪০, ১৪১	জৈনসার, ভবাণীপুর	৪১১	২১০৪	ঐ	৪৯৯	৫১৭	৪৯৭	৫৯১
১৪২, ১৪৩	ভাটিমভোগ, চাইনপাড়া	৫২৯	২৫৪১	লৌহজঙ্গ	৬৮৬	৬৭৫	৫২৩	৬৫৭

ক্রমিক নম্বর	গ্রামের নাম	প্রত্যেক গ্রামের বাড়ী বা ঘরের মোট সংখ্যা	প্রত্যেক গ্রামের মোট স্ত্রী পুরুষ লোক সংখ্যা	থানা	মুসলমান		হিন্দু	
					পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
১৪৪ ১৪৫ ১৪৬ ১৪৭	রক্ষিত পাড়া গৌরীপুরা হাটের পাড়া জীবসারা	৩২৬	২০৬৯	সেরাজদীঘা	১৩৮	১৭৯	৮২৪	৯২৮
১৪৮	ছায়তানতলি	১৫৩	৯৩৪	ঐ	৭৯	৭২	৩৫৩	৪৫০
১৪৯	কোলা	৪০১	২৩১০	ঐ	২৪০	৩৭০	৭৯৮	৯০২
১৫০	তাজপুর	৬২১	৩৭১৬	ঐ	৬০১	৬৮১	১১৪১	১২৯৩
১৫১	রসুনিয়া	৫৩২	২৪৬২	ঐ	১৮৭	১৮২	১০০১	১০৯২
১৫২	কুসুমপুর	৩৫০	২০৫২	ঐ	৯১১	১০৫২	৪৬	৪৩
১৫৩	চন্দন ধূল	১৮৯	১১৪১	ঐ	১৮৪	২০৩	৩৪৭	৪০৭
১৫৪	চামরদি	২০৪	১৪৬৯	ঐ	১৪৪	১৭৭	৫৫৭	৫৯১
১৫৫	পশ্চিমপাড়া	৩০৪	১২৪০	ঐ	১৩৮	১৪৯	৩৯৫	৫৫৮
১৫৬	ইছাপুরা	৫৮৪	৩০৩৬	ঐ	১৬৫	১৬৭	১২৩৪	১৪৭০
১৫৭	আইরল বিল	৪৫৬	২২১৭	শ্রীনগর	৫৫০	৫১৭	৫৫৫	৫৯৫
১৫৮	বারৈখালি	৮৬৭	৪১৩৩	সেরাজদীঘা	৮৮৭	৯৩৩	১০৯১	১২২২
১৫৯	শ্রীধরপুর	৩৯২	১৯৬৮	ঐ	৪৭৬	৫৩১	৪২৯	৫৩২
১৬০	কামার গাঁও	১৭০০	৯৪৯১	শ্রীনগর	২৪৬২	২৬৭৬	২৩৮৬	২২৮৭
১৬১	মান্দ্রা (শ্রীনগর)	৩৯৩	২১৫৩	ঐ	৭০১	৬৭৪	৩৬৯	৪০৯
১৬২	রাড়ী খাল	৮৩৫	৩৭০৮	ঐ	১০২৯	৭৭১	১০০২	৯০৬
১৬৩	গাইজপাড়া	৪৬	২৮৫	ঐ	১৮	১৩	১০৪	১৫০
১৬৪	কুশারীপাড়া	২০৩	১২৩০	ঐ	২০০	২১০	৩৫০	৪৭০
১৬৫	পরাণী মণ্ডল	৬৯০	৩৬২৩	ঐ	৪৮০	৪৪৯	১২০৭	১৪৮৭
১৬৬	দক্ষিণ পাইক্‌সা	৫৪৫	২৩০৪	ঐ	৬৫৫	৮৪৫	৩৪০	৪৬৪
১৬৭	শ্রীনগর	৬৮৪	৩০৯৪	ঐ	২৪৫	২১৯	১২৯৮	১৩৩২
১৬৮	ষোলঘর	২০৩৯	১০০০৯	ঐ	১৭৭২	১৭৮৩	২৮৪৪	৩৬১০
১৬৯	হাসাড়া	১৬০৫	৭৫২৯	ঐ	৮৯৪	৯৫৩	২৬১৪	৩০৬৮
১৭০	আলমপুর	৪২৭	১৮৪১	ঐ	৫৯০	৫৯২	৩২৬	৩৩৩
১৭১ ১৭২	কেওট খালি, উমাপাড়া	৪৮৭	২৪৮৭	ঐ	৭৯২	৭৮২	৪৩৮	৪৭৫
১৭৩ ১৭৪	দয়হাটা, হৃদপুর	৬৫৬	৩২৯৪	ঐ	১১৯৬	১৩১১	৩১৯	৫৮৮

ক্রমিক নম্বর	গ্রামের নাম	প্রত্যেক গ্রামের বাড়ী বা ঘর মোট সংখ্যা	প্রত্যেক গ্রামের মোট স্ত্রী পুরুষ লোক সংখ্যা	থানা	মুসলমান		হিন্দু	
					পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
১৭৫	হরপাড়া	২৩০	১৬১৩	শ্রীনগর	২১	৩০	৭৬০	৮০২
১৭৬	শ্যামসিদ্ধি	৫৫৬	২৬৯২	ঐ	৮০	৮৭	১১২০	১৪০৫
১৭৭	কয়কীর্ত্তন	৩৫৯	১৫৯৯	ঐ	২৭৪	২৮৭	৪৭০	৫৬৮
১৭৮	শীলামতি	৪৯৬	২২৪৩	ঐ	৯৬৪	১০৯২	৯১	৯৬
১৭৯	পাটাভোগ	৩৯৮	৩০৪৮	ঐ	৭৬৭	৮৩৫	৬৯৩	৭৫৩
১৮০	আটপাড়া (বেলতলী)	৪২৯	২০৫৫	ঐ	৪৫৪	৫৫৮	৪৬৯	৫৭৪
১৮১	চাইরগাঁও							
১৮২	নিমতলী	৬২১	৩১২৮	ঐ	২৩১	২৫৪	১২০৪	১৪৩৯
১৮৩	বড় সাত গাঁও							
১৮৪	বীরতারা, সাহাপুর	৪২৮	২১৮৫	ঐ	৪৫৫	৪৫৭	৫৫২	৭২১
১৮৫	বেলতলি	৩৭২	২০২৮	ঐ	৩৫	৪৪	৮৫৯	১০৯০
১৮৬	সিংপাড়া	৪২১	২০৭৩	ঐ	৬৭৬	৬৫৫	৫৮৫	৩৫৭
১৮৭	সুন্দরদি							
১৮৮	ব্রাহ্মণ খোলা	৫৯৬	৩১৪৪	ঐ	৫৭৭	৬৪৭	৯০৭	১০১৩
১৮৯	কাননিসার							
১৯০	পানিয়া							
১৯১	উত্তর গাঁও	৫২৩	২৮৮০	ঐ	৪৪৭	৪৭৪	৯২০	১০৭৯
১৯২	কুঞ্জদি							
১৯৩	তন্তর	৫৩১	২৬২৪	ঐ	৯১৪	৯৮৪	৩৩৫	৩৯১
১৯৪	পাড়াগাঁও							
১৯৫	সুরদিয়া							
১৯৬	পাইলভোগ	৩৫৮	১৬৬২	ঐ	৬২৩	৬৭২	১৭৩	১৯৪
১৯৭	নোয়াপাড়া							
১৯৮	নাগর ভাগ	৪৮০	২০২৫	ঐ	৪১৫	৪৬৫	৫১৪	৬৩১
১৯৯	কুকুটীয়া	৮১৮	৪২৯৪	ঐ	৭২০	৮৩০	১২৫০	১৪৯৪
২০০	বিবন্দী							
২০১	আবিরপাড়া	৬১৫	৩২৩২	সেরাজদীঘা	৪৮৮	৪২২	১০৬১	১২৬১
২০২	সন্তোষপাড়া							

ক্রমিক নম্বর	গ্রামের নাম	প্রত্যেক গ্রামের বাড়ী বা ঘর মোট সংখ্যা	প্রত্যেক গ্রামের মোট স্ত্রী পুরুষ লোক সংখ্যা	থানা	মুসলমান		হিন্দু	
					পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
২০৩ ২০৪	হোগলা গাঁও ছোট বেজগাঁও	৪০৮	১৮৫২	শ্রীনগর	৮৪০	৮৫৭	৭৫	৮০
২০৫	বাঘরা	১৪০৪	৬৯৫২	ঐ	২১০৭	১৯৯২	১৪২২	১৪৩১
২০৬	ভাগ্যকুল	৭৭০	৩৯২২	ঐ	৮৭৮	৮১৮	১১৭২	১০৫৪
২০৭	নয়াবাড়ী	৩৭৫	৩১০৭	ঐ	৬৭০	৫৩৭	৮৯০	১০১০
২০৮	কাইঠা পাড়া	৫৭৩	২৯৩২	ঐ	৮৬০	৯৭৪	৫২৬	৫৭২
২০৯	শ্রীধরপুর	৩৯২	১৯৬৮	ঐ	৪৭৬	৫৩১	৪২৯	৫৩২
২১০	কোলাপাড়া	৫৭৭	২৯২৭	ঐ	৮৫০	৯৬৩	৫০৩	৬১১
২১১	দোগাছি	২১৬	১৩২৪	ঐ	২৫০	২৮০	৩৬০	৪৩৪
২১২	ভোগদীয়া	১৪১	১৭৬৫	লৌহজঙ্গ	২৯৯	২৪২	৭৬১	৪৬৩
২১৩	কলিকাতা	১১০	৩১৩	ঐ	১৩০	১৮০	×	×
২১৪	বড়মোকাম	১২৯	৫৪৪	ঐ	২১৩	৩৩১	×	×
২১৫	গৌড়গঞ্জ	২৯৯	১৭৯৪	ঐ	৩১৭	৪১২	৫৫২	৫১৩
২১৬	ডহরী	২৩০	১৯১৩	ঐ	৩২১	৪১৩	৬৭৬	৫০৩
২১৭	ছত্রিশ	২২১	৩৪৩	ঐ	১৯৬	১৪৭	×	×
২১৮	মালীঅঙ্ক	১৫৯	৬৯৩	ঐ	১৭৬	২২০	১২৪	১৭৩
২১৯	কুসমাসার	২৮৬	১৯৮৯	ঐ	৪৯৩	৪০৯	৫৮৪	৫০৩
২২০	পালগাঁও	২০১	১৬৮৪	ঐ	২২১	৩৮৩	৫১৭	৫১৩
২২১	চৌদ্দ হাজারী	৫৭	২২০	ঐ	৯৮	১২২	×	×
২২২	রাণাদিয়া	১৯১	১৪৯৯	ঐ	৪২০	২৬২	৪০২	৪১৫
২২৩	মৌছা	২১৪	১৬৭৪	ঐ	২১৩	২৯৮	৬২৬	৫৩৭
২২৪	দক্ষিণ চারিগাঁ	১৮৩	৯৪৩	ঐ	২৩১	২১৮	২৬১	২৩৩
২২৫	পিঙ্গনাইল	১৬৩	১০৮৯	ঐ	৩২২	৪১৮	১৬৬	১৮৩
২২৬	মহৎ গাঁ	১৩০	৯৭৪	ঐ	১১৩	২৪০	৩৭৮	২৪৩
২২৭	নাগরনন্দী	১৩৯	৫১৮	শ্রীনগর	৪৭	৫৯	১৭৬	২৩৬
২২৮	কাজির পাগলা তেতুলিয়া	৩১৩	১৭৩১	ঐ	২৮৩	৩৪৯	৫৯৩	৫০৬
২২৯	সুজানগর	২৯১	১২৭৩	সেরাজদীঘা	২১৭	১৯৩	৪৩৭	৪২৬
২৩০	বালিগাঁ	২৩৯	১৬২১	টঙ্গিবাড়ী	৪৯৩	৬৩৬	২৭৯	২১৩
২৩১	রাউত ভোগ	২১৩	২০৮০	ঐ	৫২৬	৫৭৪	৪৭৪	৫০৬
২৩২	শিলিমপুর	২৫৩	১৯৩৫	ঐ	২৬৩	৩১৭	৭৪২	৬১৩

ক্রমিক নম্বর	গ্রামের নাম	প্রত্যেক গ্রামের বাড়ী বা ঘর মোট সংখ্যা	প্রত্যেক গ্রামের মোট স্ত্রী পুরুষ লোক সংখ্যা	থানা	মুসলমান		হিন্দু	
					পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
২৩৩	সুবচনী	৩৮১	৭৫৭	ঐ	১৮৩	৬৮	২৩১	২৯৩
২৩৪	মাল্‌ধা	৫৩৭	৮২৬	ঐ	৬৮	৯৪	৩৪৩	৩২১
২৩৫	ঝাউটিয়া	১০৭	১২০৭	লৌহজঙ্গ	৩৭৪	৩০৭	২৮৩	২৪৩
২৩৬	কুরার বাগ	১১৯	৯০৬	ঐ	২৫২	১১৭	২৪৪	২৯৩
২৩৭	রঙ্গু	২১৩	১৪২০	মুন্সীগঞ্জ	৪৯৩	৩৯৩	২৫১	২৮১
২৩৮	মুন্সীর হাট	২০৫	১৪১০	ঐ	৪৫৭	৪৬৩	৩১৭	১৭৩
২৩৯	দেউলভোগ	১৭৭	৮২২	শ্রীনগর	৩৪৯	৩২৬	৯৪	৫৩
২৪০	ছুট্‌ফটিয়া	২৬৩	৯৮১	টঙ্গিবাড়ী	২৮৫	২৮২	২১৭	১৯৭
২৪১ ২৪২	মাইজগাঁও পয়সা, পশ্চিমপাড়া	২৮২	১৬৩৫	লৌহজঙ্গ	৪৯৮	৪৫১	৩৭৭	৩০৭
২৪৩	নওপাড়া	১৬৩	১০৭০	ঐ	৩২৯	৩১১	২১১	২১৯
২৪৪	কাদিরপুর	৩৮৩	১৬৩৪	শ্রীনগর	৫৫৩,	৫২৭	২৭১	২৮৩
২৪৫	বিদগাঁ	১০৯	৯৬৯	লৌহজঙ্গ	১৭৪	১৪১	৩৪৭	৩০৭
২৪৬	বহর	৪০৭	২১৭৪	ঐ	৬৭৫	৬০৭	৪৫১	৪৮১
২৪৭	সেনহাটী	৬৯	৪৮৬	ঐ	৯৭	৮৩	১৮৩	১২৩
২৪৮	তারাটিয়া	৫৪	৪৭৬	ঐ	৮৯	৭৮	১৪৬	১৬৩
২৪৯	পাইকারা	৮৩	৫৯৬	ঐ	১০৩	৯৪	২১২	১৮৭
২৫০	মীতারা	২১৯	৮৭৬	টঙ্গিবাড়ী	১৪৯	২৫৩	২৬৯	২০৫
২৫১	গারুরগাঁও	৮৪	৭৩৪	ঐ	২৯৪	২৪৩	১০৩	৯৪
২৫২	সুভরীয়া	৩৭২	১৩৮৩	লৌহজঙ্গ	১৬৩	২৪৭	৫৭১	৪০২
২৫৩	মালিনী	১৯১	৮০০	ঐ	২৯৯	২৬৫	১৯৩	৭৩
২৫৪	উয়ারী	২৩৪	৯৯৫	ঐ	৯৪	১০৯	৪০৯	৩৮৩
২৫৫	মিটুসার	৮৭	৬৯১	ঐ	২১৪	২৬৩	১২১	৯৩
২৫৬	আউটপাড়া	১১৯	৮৫৬	টঙ্গিবাড়ী	১৮০	২৩৭	২২২	২১৭
২৫৭	দ্বিপাড়া কুণ্ডের বাজার	১৮০	৯৬২	ঐ	১৯৪	২৬৩	২৩১	২৭৪
২৫৮	মীরেশ্বর	১৯৭	৮৯৭	মুন্সীগঞ্জ	২৯০	২০৫	১৯৭	২০৫
২৫৯	সোন্ধারদিয়া	২১৭	১৪১৬	শ্রীনগর	২৯৭	২৫৩	৪০৪	৪৬২
২৬০	করারবাগ	৮৩	৯০২	সেরাজদীঘা	২৯০	২৬৩	১১৩	২৩৬
২৬১	ধামালিয়া	১০১	১২০২	লৌহজঙ্গ	২১৭	৩৪৯	২৪২	৩৯৪

ক্রমিক নম্বর	গ্রামের নাম	প্রত্যেক গ্রামের বাড়ী বা ঘর মোট সংখ্যা	প্রত্যেক গ্রামের মোট স্ত্রী পুরুষ লোক সংখ্যা	থানা	মুসলমান		হিন্দু	
					পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
২৬২	তালতলা	৪০২	১৫৭৩	সেরাজদীঘা	৮৪১	১৮	৬২১	৯৩
২৬৩	সিংহের নন্দন	২৬	৪৬০	টঙ্গিবাড়ী	১২১	২২৯	৮৪	২৬
২৬৪	রিকাবি বাজার	৩০৭	২০৬১	মুন্সীগঞ্জ	৭৯৪	৪৩৩	৭৪১	৯৩
২৬৫	কলিকাল	৬৩	৪৪৬	লৌহজঙ্গ	১৬৩	২৮৩	—	—
২৬৬	কাকালদী	৭৮	৭৯২	সেরাজদীঘা	২২১	১১৪	২১৮	২৩৯
২৬৭	রায়ের বাগ	৬৩	৬৪২	ঐ	২৬৩,	১৯৭	৫৩	১২৯
২৬৮	চিকৃণীসার	৯৪	৪৭৫	ঐ	১২৯	১০৩	১২৪	১১৯
২৬৯	পাউসার	১১৭	৮৮৩	সেরাজদীঘা	৪৯৩	৩৯০	—	—
২৭০	শিমুলী	১৯৩	১০২১	ঐ	২৬৩	২৭৮	২৭৩	২০৭
২৭১	চাচুরতলা	৫৩	৭২৯	টঙ্গিবাড়ী	১৮৯	১২৯	১৯৮	২১৩
২৭২	কোরহাটি	৬৩	৯৯৬	লৌহজঙ্গ	২৫৩	৩১৭	২১৭	২০৯
২৭৩	বাহিরঘাটা	৭৪	৬৪১	সেরাজদীঘা	২০৭	২৫১	৯৪	৮৯
২৭৪	শিবরামপুর	১০৭	১১৭৬	ঐ	৩৯৩	৩৬৩	১৮৪	২৩৬
২৭৫	কুচিয়ামোরা	১২৩	১১৭৮	ঐ	৪৯৩	৫০৯	৯৩	৮৩
২৭৬	কর্ম্মকার হাউলী	৯৪	৮১৪	ঐ	২২৩	১১৯	২২৯	২৪৩
২৭৭	দশলং	৭৮	৮০২	টঙ্গিবাড়ী	২৬৭	১৯৩	১৯৩	১৫৩
২৭৮	লতব্দী	২২৯	১৮২৫	সেরাজদীঘা	৪২৭	৪১৭	৪৮৪	৪৯৭
২৭৯	ঘোলতলী	৩১৯	১৮২১	লৌহজঙ্গ	৩২১	৪১৩	৫১৪	৫৭৩
২৮০	বনসেওৎ	১৮৭	১২৩৬	ঐ	৪০৩	৪৩৩	১৯১	২০৯
২৮১	পাটলী	১৮৪	১৩২৯	ঐ	২৮২	২৪৭	৩৮৭	৪১৩
২৮২	চৌদ্দ হাজারী	৫৭	২৪৯	ঐ	৯৮	১২২	২৯	—
২৮৩	তেলির বাগ	৩১১	১২৫৬	ঐ	২৯৩	২০৭	৪০৫	৩৫১
২৮৪	চাঙ্গরী	৩২৭	৯২৪	টঙ্গিবাড়ী	২১৩	২৪২	২৬৬	২০৩
২৮৫	লস্করপুর	১৯১	১৭৭৬	সেরাজদীঘা	৬১৬	৬২৯	২৫৩	২৭৮
২৮৬	বাসনিয়াহাটী	২০০	২০০২	ঐ	৭২০	৭৮২	২১৭	২৮৩
২৮৭	ঘনশ্যামপুর	১৩৭	২১৫৪	ঐ	৮৯০	৮২১	১৮০	২৬৩
২৮৮	হাজীগাঁও	৩১৭	২৩৮৬	ঐ	৯২৫	৯০৫	২৮১	২৭৫
২৮৯	গোপালপুর	২২৯	২৩৬১	ঐ	৮২৯	৮৫৪	৩৮০	২৯৮
২৯০	মোহনপুর	৪০৭	২০১৮	ঐ	৭২৯	৭৬৪	২৫০	২৭৫
২৯১	নারায়ণনগর	২০১	১৫৮৫	ঐ	৫২৯	৫৪২	২৫৮	২৫৬
২৯২	বরালিয়া	২৮৩	২১৬৮	ঐ	৭২০	৭৪৯	৩২১	৩৭৮

ক্রমিক নম্বর	গ্রামের নাম	প্রত্যেক গ্রামের বাড়ী বা ঘর মোট সংখ্যা	প্রত্যেক গ্রামের মোট স্ত্রী পুরুষ লোক সংখ্যা	থানা	মুসলমান		হিন্দু	
					পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
২৯৩	গোপীনাথপুর	১২৮	১৯২৮	সেরাজদীঘা	৬৮৯	৬৯২	২৭৮	২৬৯
২৯৪	মজিদপুর	২৫৯	১৯৬৬	ঐ	৫০১	৫৩৫	৪৯৩	৪৩৭
২৯৫	বাড়ী হাজি	৩২১	২৩১৯	ঐ	৭৮৩	৭৮৮	৫৮১	৩৬৭
২৯৬	শোলপুর	২৮১	২৩০৪	ঐ	৫২০	৭২৭	৫২০	৫৩৭
২৯৭	শিকারপুর	১৮৯	১১৫৭	ঐ	৩২০	৩৪৬	২১০	২৮১
২৯৮	ভোজগাঁও	১৩০	১১৯০	লৌহজঙ্গ	৪১৩	৪৯৪	১৩৬	১৪৭
২৯৯	আপরকাঠি	২১৬	৭৭৬	টঙ্গিবাড়ী	২৫৬	২৪৭	১৪২	১৩১
৩০০	ডোরাবটি	১২৪	৩৫৭	ঐ	১৪৬	১২৮	৪৭	৩৬
৩০১	কুর্শ্মিরা	১০৬	৪৭৩	ঐ	২১০	২০৫	২৭	৩১
৩০২	বলই	২০১	২৭৩	ঐ	১০০	১০৯	৩৪	৩০
৩০৩	তৈল্‌কা	৫৭	৪৫৭	ঐ	২১৬	২০৫	১৫	২১
৩০৪	তাম্তিপুর	১৬৮	৬৬৬	ঐ	৩২৫	২৫৬	৩৭	৪৮
৩০৫	ভোরান্দা	৫৬	১৫০	ঐ	৬২	৩৯	২১	২৮
৩০৬	বাঁশদিয়া	১২১	৮২২	ঐ	৪২১	৩০২	৫৬	৪৩
৩০৭	ফুলকোচি	৩২	২৯৫	লৌহজঙ্গ	১৫৬	১৩৯	×	×
৩০৮	ঘাসভোগ	৫৭	২১১	ঐ	১০৯	১০২	×	×
৩০৯	জাঙ্গালিয়া	৬৭	৩০৪	ঐ	১৫৬	১৪৮	×	×
৩১০	পাঁচলদিয়া	৪২	২৬৪	ঐ	৯৭	৮১	৫২	৫৪
৩১১	দামলা	৫১	৩৩৫	শ্রীনগর	১৩৩	১৪২	৩১	২৯
৩১২	দেওপাড়া	১৮৪	৫৬২	ঐ	১০২	১০৬	১৯৮	১৫৬
৩১৩	তিনগাঁও	১৪৪	৬৫৮	ঐ	১২৬	১০৫	২১৮	২০৯
৩১৪	আরদ্ধিপাড়া	৫৬	২৭৯	ঐ	১২৪	১০৮	২১	২৬
৩১৫	উত্তর রাঙ্গামালিয়া	৯৮	৪০৮	সেরাজদীঘা	৯৮	৫৯	১২৯	১২২
৩১৬	দক্ষিণ রাঙ্গামালিয়া	৮১	২০৬	ঐ	৫৬	৩৩	৬৪	৫৩
৩১৭	পাড়াভূমি	৫৬	১৬৭	ঐ	৬৯	৫৩	২৬	১৯
৩১৮	চরবিশ্বনাথ	৩২	৮৪	ঐ	৪৬	৩৮	×	×
৩১৯	ছাতুরচর	৩৫	২৭৩	ঐ	১৩১	১৪২	×	×
৩২০	পাথরঘাটা	১৪৬	৫৬৮	ঐ	১৫০	১৬১	১৩১	১২৬
৩২১	ঘোড়ামারা	১০৭	৫৪৩	ঐ	১৪৩	১২৯	১৪১	১৩০
৩২২	রামকৃষ্ণদি	৫৯	৩৭২	ঐ	৫৬	৩৮	১৫২	১৪৬
৩২৩	কৈরাখোলা	৪৩	১৯৫	ঐ	৬৩	৫৮	৩২	৪২

ক্রমিক নম্বর	গ্রামের নাম	প্রত্যেক গ্রামের বাড়ী বা ঘর মোট সংখ্যা	প্রত্যেক গ্রামের মোট স্ত্রী পুরুষ লোক সংখ্যা	থানা	মুসলমান		হিন্দু	
					পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
৩২৪	ধালপুর	৫৬	৩:১১	সেরাজদীঘা	৬৪	৩১	১৪২	১৫৪
৩২৫	চণ্ডিবর্দ্দী	৪৬	১৭১	ঐ	৫৬	৩৩	৪৪	৩৮
৩২৬	আরমহল	১১৬	৫৭৮	ঐ	১৪০	১৩৭	১৫২	১৪৯
৩২৭	রামানন্দ	৪৭	২৪০	ঐ	১৪	১৬	১০২	১০৮
৩২৮	কমলাপুর	৬৪	৩৪২	ঐ	১৪০	১২১	৩৬	৪৫
৩২৯	গয়াতলা	৩৪	২২৬	ঐ	১২১	১০৫	×	×
৩৩০	মামুদপুর	৫৬	২৬২	ঐ	১৪১	১২১	×	×
৩৩১	মধুটুপী	১৪১	৪০৮	ঐ	১৩১	১০৬	৯৩	৭৮
৩৩২	শাসনগাঁও	৫৯	১৪৬	লৌহজঙ্গ	৩৬	২৫	৪৮	৩৭
৩৩৩	ধরারহাট	৪৮	১৬৭	ঐ	৫৬	৪৭	৩৩	৩১
৩৩৪	ঘাসিরপুকুরপাড়	৪১	১৬৮	মুন্সীগঞ্জ	৬৪	৫৯	২১	২৪
৩৩৫	নৈরপুকুরপাড়	৫২	২৭০	ঐ	১৩৩	১৩৭	×	×
৩৩৬	বাগেশ্বর	৬১	২৯৯	ঐ	১৪৬	১৫৩	×	×
৩৩৭	মহিষপুর	৫৯	৩১৯	ঐ	১৬১	১৫৮	×	×
৩৩৮	খোদদাদপুর	৬৮	৩০০	ঐ	১৫১	১৪৯	×	×
৩৩৯	ছাপরা	৪১	৯৮	ঐ	৪৪	৫৪	×	×
৩৪০	গণকপাড়া	১৫১	৪৫৩	ঐ	৬১	৫৬	১৬৪	১৭২
৩৪১	দানীয়াপাড়া	২৩৩	৫২৩	সেরাজদীঘা	১০৪	১০৭	১৬২	১৫০
৩৪২	ধোপরা পাশা	১১৬	৩৫৩	টঙ্গিবাড়ী	৬৪	৫৮	১২৪	১০৭
৩৪৩	আদা বাড়ী	১৬৪	৩৭১	ঐ	৪৮	৫৯	১২৬	১৩৮
৩৪৪	বিয়ানিয়া	১২৮	৪৩৬	ঐ	৬৯	৭৮	১৩৩	১৫৬

উত্তর বিক্রমপুরের থানা সমূহের জন-সংখ্যা

	থানার নাম	বাড়ীর মোট সংখ্যা	মুসলমান		হিন্দু		মোট লোক সংখ্যা
			পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	
১	টঙ্গিবাড়ী	৩১,৫৪৮	৩৬,২২২	৩৬,৮৪৮	৩৫,৬১৩	৪০,৬৮৪	১,৪৯,৩৬৭
২	লৌহজঙ্গ	৩২,১৪৭	৪৮,৪৪৫	৫১,৩৪৯	২৪,৯৯৪	২৬,৯১২	১,৫১,৭০০
৩	মুন্সীগঞ্জ	২৪,৬৬২	৪১,৫৫৪	৪০,৫০৪	১৯,৭০০	১৯,৩০১	১,২১,০৫৯
৪	শ্রীনগর	৩০,৯৩৪	৪৩,৬০০	৪৪,৯০৮	৩২,২৮১	৩৬,৫১৪	১,৫৭,৩০৩
৫	সেরাজদীঘা	৩৫,৭৪১	৩৮,৮৮৯	৪০,৪২৬	৪৬,৮১৫	৫১,৩৬৪	১,৭৭,৪৯৪
	মোট—	১,৫৫,০৩২	২,০৮,৭১০	২,১৪,০৩৫	১,৫৯,৪০৩	১,৭৪,৭৭৫	৭,৫৬,৯২৩

ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী (উত্তর বিক্রমপুর) ঃ— পুরুষ ২,৭০৫, স্ত্রীলোক ২,০৭৮, মোট সংখ্যা ৪,৭৮৩.

* উত্তর বিক্রমপুর মধ্যপাড়া নিবাসী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক উত্তর বিক্রমপুরের জনসংখ্যা সংশোধিত হইল।

দক্ষিণ বিক্রমপুরের জন-সংখ্যা।

ক্রমিক নম্বর	গ্রামের নাম	হিন্দু		মুসলমান		মোট লোক সংখ্যা
		পুরুষ	স্ত্রীলোক	পুরুষ	স্ত্রীলোক	
১	পালং	৯৭৭	৭৭২	১৯৭০	১১৪৫	৪৮৬৪
২	কার্ত্তিকপুর	৫০৭	৫৩০	১১৭০	১২০৬	৩৪১৩
৩	ছয়গাঁও	৬০০	৪১৬	১৫০	৩৩১	১৪৯৭
৪	উপসী	৫৩০	২৬১	৩০০	৪৫২	১৫৪৩
৫	বিঝারী	৪০৭	৭৪১	৪০৯	২০১	১৭৫৮
৬	জপসা	৬১৪	৭৩৯	৬৩০	৭১৮	২৭০৫
৭	নগর, ফতেজঙ্গপুর	৩০০	২৮২	৫০৭	৮১০	১৮৯৯
৮	বিলাসখান	২০৯	২৭৭	২৭০	৩২১	১০৭৭
৯	চিকন্দী	৭০২	১১০৩	১০৪০	৭৮২	৩৬২৭
১০	রুদ্রকর	১৩৭০	১১০১	৪৫০	২৯১	৩২১২
১১	কাকৃদী	৭০০	৪০৭	৩১০	৪৭১	১৮৮৮
১২	ভোজেশ্বর	৭৭০	৩০১	৩০০	৫১৭	১৮৮৮
১৩	জাজিরা	২৭০	৩০২	৩০৯	৪৭৭	১৩৫৮
১৪	কোঁয়রপুর	৪৪৫	৩২১	৫০৭	৫১৯	১৭৯৮
১৫	রামভদ্রপুর	৭০৭	৫৪০	১০২	২৩১	১৫৮০
১৬	লোনসিং	২১১	৩০১	৭০১	১০০৯	২২২২
১৭	নরিয়া	৩১৭	৩১১	৮০২	৭০৯	২১৩৯
১৮	চান্দনি	৩০৪	৩১৩	৭৭১	৫০১	১৮৮৯
১৯	মুলফৎগঞ্জ	১৪৪	১৯১	৮০২	৩০৭	১৪৪৪
২০	ধানুকা	২০৭	৭১১	২০৯	৪৬১	১৫৮৮
২১	দাসার্ত্তা	৩৯১	৩০১	১৪০	২৫২	১০৮৪
২২	গয়ঘড়	২০১	২৮৩	৩৫৯	২৮২	১১২৫
২৩	তিলৈ	২০৭	৩১৭	২৫২	৩০৭	১০৮৩
২৪	চাকদহ	৫০৭	৩০৮	৬৭২	৭৯৮	২২৮৫
২৫	বুড়ীর হাট	৩০৭	৪২১	৫২৯	৪৭১	১৭২৮
২৬	কুরাসী	৩২৬	৪২২	৬২৩	৭২৮	২০৯৯
২৭	কোটাপাড়া	৩৭৪	৪৮৯	১৮০	২৯২	১৩৩৯
২৮	পাটনীগাঁও	৬০১	৫১৯	৪২০	৪২২	১৯৬২
২৯	বাঘিয়া	৪১৭	৫১৩	২২৫	২৪৩	১৩৯৮
৩০	ডোমসার	৫৯৭	২৪২	৫১০	৪২২	১৭৬৭
৩১	ভক্তাইসার	৬৩৭	৭২১	২৯১	৩২০	১৯৬৭

ক্রমিক নম্বর	গ্রামের নাম	হিন্দু		মুসলমান		মোট লোক সংখ্যা
		পুরুষ	স্ত্রীলোক	পুরুষ	স্ত্রীলোক	
৩২	তুলুখণ্ড	৫৯৭	৬৯২	৪২৭	৪১১	২১২৭
৩৩	দেওভোগ	৩৭৪	৪২২	১৪২	২৮২	১২২০
৩৪	বালাখানা	১১৩	১৫২	৩৬৫	৪৯১	১১২১
৩৫	রায় নন্দলালপুর	২২২	২৩২	৩৫১	৩১৩	১১১৮
৩৬	ধামারণ	৬৫১	২২৯	৪৭৭	৫১০	১৮৬৭
৩৭	আকৃসা	৭২৭	৫০৯	৮১০	৯২০	২৯৬৬
৩৮	মসুরা	৮৮৭	৩১৩	৭৩১	৮২২	২৭৫৩
৩৯	শিলংঘড়	২৮২	৪১০	৬৮২	৩৯৯	১৪৭৩
৪০	স্বর্ণ ঘোষ	৭১০	৮৯১	৩২০	৪২৮	২৩৪৯
৪১	পাটানিধি	১৯২	২৪২	১২১	২৪৩	৭৯৮
৪২	আচুরা	২৪১	১৪১	৩২১	৪১৬	১১১৯
৪৩	কাপাসপাড়া	৩৯১	৪০৫	২৩০	৩৩১	১৩৫৭
৪৪	ভড্ডা	১৪১	২৩০	২৭১	৩১৭	৯৫৯
৪৫	কান্দাপাড়া	৭১৬	৯৩৮	১০৯	১৯৭	১৯৬০
৪৬	নিলগুণ	১৬১	২৯৭	২০৭	৩২১	৯৮৬
৪৭	চাম্‌টা	১৯১	২৩৩	২৮২	৩১৯	১০২৫
৪৮	তেলীপাড়া	৩১০	৪২৭	১০৭	২৩১	১০৭৫
৪৯	আনাথণ্ড	১১১	১৩৯	২০৭	২৫১	৭০৮
৫০	দেওজুরী	৭৭১	৫১৬	৪৭০	৪৭৮	২২৩৫
৫১	কাঞ্চনপাড়া	৪০১	৬৭০	৬০৭	৫৮১	২২৫৯
৫২	বালুচরা	২৩১	৩১৯	২০৯	৩৮১	১১৪০
৫৩	হুগলী	২১৪	৪০৯	৩৬১	৪৩২	১৪১৬
৫৪	আমতলী	২১৮	২৭০	১০৯	১৩৭	৭৩৪
৫৫	আটীপাড়া	৩৩৬	৩৭৯	১৭০	১৭১	১০৫৬
৫৬	মানাথাঁন	৪০১	৪০৯	৫২৯	৪২০	১৭৫৯
৫৭	সিংহল মুরি	১৭০	১৭৯	২৩১	৩১৭	৮৯৭
৫৮	রাহাপাড়া	৩১৭	৪৯০	৪১০	৪৮৩	১৭০০
৫৯	বাজনপাড়া	৪৯৭	৫৭১	৩১৭	৪৩৩	১৮১৮
৬০	রুকুনপুর	৩৭১	২৩৮	৪১৭	৪৭৭	১৫০৩
৬১	ভুম্‌সরা	২১১	৩০৭	৩১২	৪২১	১২৫১
৬২	কাজিশুকর	২২৭	৩২২	২২০	৪৭৯	১২৩৮
৬৩	শাস্তা	৩১৭	৩৩৭	৫০২	৫৬১	১৭১৭

ক্রমিক নম্বর	গ্রামের নাম	হিন্দু		মুসলমান		মোট লোক সংখ্যা
		পুরুষ	স্ত্রীলোক	পুরুষ	স্ত্রীলোক	
৬৪	বানিয়াচুয়া	৯২০	৭৮১	৭০৮	৭৮৫	৩১৯৪
৬৫	রাজগঞ্জ	৯১৮	৯১৩	২২০	১৯৮	২২৪৯
৬৬	কাঁঠালবাড়ীয়া	৯৭০	৯৮২	২৭১	২৫২	২৪৭৫
৬৭	কাঁশাভোগ	২৭০	৩২৩	১০৭	২২০	৯২০
৬৮	নাগেরপাড়া	২৭৩	৪১৭	২০৩	৩০১	১১৯৪
৬৯	সূর্য্যমণি	২১৮	৩৯০	৮০৯	৯১৭	২৩০৪
৭০	মাত্রৈসার	২৯৩	৪৯৭	৪২৩	৫৮৩	১৭৯৬
৭১	পণ্ডিতসার	৭৩৭	৫৫১	২৪২	১১৭	১৬৪৭
৭২	কাঠহুগলী	৫৭১	৫৩৮	১৩৮	১৬৭	১৪১৪
৭৩	সালদহ	১২৩	১৯৭	২০৬	২৯১	৮১৭
৭৪	জালিয়াহাটী	২০২	৩৪৩	৪৩৮	৫২০	১৫০৩
৭৫	ভয়মঙ্গল	৪১০	৬৭০	৫৯৮	৪২৮	২০৮৬
৭৬	দিনারা	৩০২	৩৮১	১৯৮	২২৩	১১০৪
৭৭	সিঙ্গাচুরা	৪০৮	৪১৭	৫২২	৬৯৩	২০৪০
৭৮	কান্দিগাঁও	২২১	৫১১	২০৪	৩৩৭	১২৭৩
৭৯	সানাইসার	৯১২	৯৫৭	২০৫	২৬১	২৩৩৫
৮০	পাচক	৪৩৪	৫০৭	৯১	৪৩	১০৭৫
৮১	কমলাপুর	৬০৯	২১২	১১২	৯৩	১০২৬
৮২	ভুচুরা	৪২২	২৪২	৩২০	২৪১	১২২৫
৮৩	তুলাসার	২১৩	৩৩৬	১৮০	১৯২	৯২১
৮৪	সাজনপুর	৫৪৩	৫৭৯	১১০	৯৭	১৩২৯
৮৫	বাইকান্দি	২৬২	৩১৩	৯০	১০৭	৭৭২
৮৬	কেদারবাড়ী	২১৩	১৯৬	৩১৩	২২১	৯৪৩
৮৭	গৌরাঙ্গের ভাঙ্গা	১১০	২২০	৩০৭	৪৩১	১০৬৮
৮৮	রূপসার	১২৬	১৪১	১০৩	১০৪	৪৭৪

ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী (দক্ষিণ বিক্রমপুর) :—	পুরুষ	স্ত্রীলোক	মোটসংখ্যা
	১,৩৭৪	১,০৮৫	২,৪৫৯

* দক্ষিণ বিক্রমপুর কুরাসী নিবাসী নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের দ্বারা দক্ষিণ বিক্রমপুরের জন-সংখ্যা সংশোধিত হইল।

বর্ণানুক্রমিক নাম সুচী।

জ

ঝ

ড

ত

থ

র

ল

শ

ষ

স

ক্ষ

য়